শতাব্দীর সেরা ভূতের গল্প

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

চ্যাটার্জি পাব্‌লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশকের নিবেদন

ভূতের অস্তিত্ব আছে কি নেই সে এক প্রাচীন বিতর্কের বিষয়। কেউ বলে ভূত আছে, আবাব কেউ বলে কাযাহীন ভূত মানুষেব কল্পনার সৃষ্টি। ভূত দেখার উদগ্র ইচ্ছে নিয়ে বনে-বাদাড়ে, শ্মশানে-মশানে হন্যে হয়ে ঘুবেও ভূতেব অস্তিত্বেব নাগাল পায়নি এমন মানুষের সংখ্যাই বা কম কোথায়?

ভূত আছে কি নেই, ওদেব নিয়ে গল্পের কিছু কমতি নেই। দেশ-বিদেশে ভূতের গল্পেব ছড়াছড়ি সেই আদিকাল থেকেই। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই ভূতেব গল্প শুনতে চায়। নামীদামী গল্প লেখকদেব কাঁধে ভব করে তাদের কলম থেকে বেবিয়েছে হরেক বকম ভূতের হরেকরকম কীর্তি কাহিনী।

ভয় ধবানো, রক্ত-হিম কবা নিঝুম রাতে ভূতেব গল্প পড়তে কাব না ভালো লাগে। বাংলাব ছোট-বড় সব লেখকই ভূত নিয়ে বিভিন্ন ধবনেব গল্প লিখেছেন। স্বযং রবীন্দ্রনাথও ভূত নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন।

ছোট-বড় সকলেব প্রিয় লেখক শ্রদ্ধেয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রবীন ও নবীন লেখকদেব সেবা একশত বাইশটি ভূতেব গল্প চযন কবে একটি ভৌতিক গল্পমালা গ্রথিত করে দিযেছেন তাঁব প্রিয় পাঠকদেব জন্য। ভৌতিক গল্পমালাব নামকবণ কবে দিযেছেন "শতাব্দীব সেবা ভূতের গল্প"। তাঁব এই শ্রম আমাদেব কৃতজ্ঞতাভাজন করেছে। নির্বাচিত সেরা ভৌতিক গল্পের ডালাটি আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। তারা পবিতৃপ্ত হলেই আমাদেব শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

ভূতের গল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমি ভূতের গল্প ভালোবাসি। তোমরা পাঁচজন মিলিয়া ভূতেব গল্প কর, সেখানে পাঁচঘন্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা , একটা শুনিলে আব একটা শুনিতে ইচ্ছা কবে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছে কিনা জানি না, বোধহয় আছ। তাই আজ তোমাদেব কাছে একটা গল্প বলিব। গল্পটা একখানি ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদেব সুবিধার জন্য ইংবাজি নামগুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদলাইলে চলিবে না। সুতবাং ঠিক যেরূপ পডিয়াছি প্রায় সেইরূপ অনুবাদ করিয়া দেওযাই ভাল বোধ হইতেছে।

স্কট্লনের ম্যাপটার দিকে একবাব চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহাব উপরেরটির নাম নর্থ উইষ্ট্, নীচেরটির নাম সাউথ উইষ্ট্। এর মাঝামাঝি ছোট-ছোট আরও কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সেকালের কথা, তখন ষ্টীম এঞ্জিনও ছিল না, টেলিগ্রাফও ছিল না, আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটি দ্বীপে স্কুলে মাস্টারী করিতেন।

সেখানে লোক বড় বেশি ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র মেষ চরান,

আর কষ্টেসৃষ্টে কোনমতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ , তারি একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয় আর জমিদারকে খাজনা দেয়। . . . এবা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐ রকম কষ্টে থাকিয়া এবং সামান্য খাইয়াও বেশ একপ্রকার সুখে-স্বাচ্ছন্দে কাল কাটাইত।

এই দ্বীপে এল্যান ক্যামেরন নামে একজন লোক ছিলেন। তাঁহার বাড়ি গাঁ থেকে প্রায় একমাইল দূরে । এল্যানের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কত রকমের মজার গল্প কবিতেন। হঠাৎ একদিন ক্যামেরন বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহাব কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁহার সমস্ত বিষয় বিক্রয় হইয়া গেল। তাঁহার বাড়িটা কেহ কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া বহিল।

এর কয়েক মাস পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড ম্যাকলীন বলিযা একটি রাখাল ঐ বাডির পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পডিল, আব সে ঘবেব ভিতরে এল্যান ক্যামেরনের ছায়া দেখিতে পাইল । দেখিয়াই তো চক্ষুস্থির ! সেখানেই সে হাঁ কবিযা দাঁড়াইযা বহিল, তাহার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইযা উঠিল, ভযে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল।

শীঘ্রই তাহাব চৈতন্য হইল। ঐরকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহাবই বা জানাশুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে তো মার দৌড়! একেবারে মাস্টাবমহাশযেব বাডিতে । তাঁহাব কাছে সব কথা সে বলিল। মাস্টারমহাশয এ-সব মানেন না। তিনি তাহাকে প্রথমে ঠাট্টা কবিলেন, তারপরে বলিলেন, তাহাব মাথায কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিয়াছে। আবো অনেক কথা বলিলেন, বলিযা যথাসাধ্য বুঝাইযা দিতে চেষ্টা কবিলেন যে, ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত মূর্খামি।

ডনাল্ড কিছুই বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধিবিশিষ্ট অন্যান্য লোকেব কাছে তাহাব গল্পটি বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপেব সকলেই এই গল্প জানিতে পারিল। ঐ সব বিষয মীমাংসা করিতে বৃদ্ধবাই ওস্তাদ ; তাঁহাবা ভবিষ্যত সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাস্টাবমহাশযেব কাছেই খববেব কাগজ আসিত। মাসেব মধ্যে একবার করিয়া কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাস্টারমহাশযেব বাডিতে গিয়া নতুন খবর শুনিয়া আসিত। সেদিন তাহাদেব পক্ষে একটা খুব আনন্দেব দিন। বান্নাঘরে বড় আগুন কবিয়া দশ-বারোজন তাহার চারিদিকে সন্ধ্যার সময় বসিযা কাগজেব বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া অমুক কর্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের তদারক ও তর্কবির্তক করিত। শেষেব কথাগুলি সকলেরই এক প্রকার মুখস্থ হইয়াছিল, এবং পডা শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রায়ই সকলে একসঙ্গে একবার বলিত।

এই সকল সভায় রাখাল, কৃষক, গির্জার ছোট পাদরি প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন।

গ্রামের মুচি ররীও আসিত। ররী ভয়ানক নাছোড়বান্দা লোক, একটা কথা উঠিলে তাহাকে একবার আচ্ছা করিয়া না ঘাঁটিয়া সহজে ছাড়িবে না।

ডনাল্ড ম্যাকলীনের ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকলে এইরূপ সভা করিয়া বসিয়াছে, মাস্টারমহাশয় চেঁচাইয়া তর্জমা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল যে, এল্যান ক্যামেরনের ছায়া আবার দেখা গিয়াছে। এবারে একজন স্ত্রীলোক দেখিয়াছে। ঐ রাখাল যে স্থানে যে ভাবে উহাকে দেখিয়াছিল সেও ঠিক সেইরকম দেখিয়াছে।

এরপর আর পড়া চলে কি করিয়া! মাস্টারমহাশয় চটিয়া গেলেন এবং ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। ররী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিল। ররী কোন কথাই ঠিক মানে না; এবারেও মাস্টারমহাশয়ের কথাগুলি মানিতে পারিল না। প্রচণ্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতের কথা লইয়া সাধারণ ভাবে এবং ক্যামেরনের ভূতের বিষয় বিশেষভাবে প্রচার চলিতে লাগিল; আর সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ররীর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল; সে বলিল—'দেখ মাস্টারের পো, যতই কেন বলনা, আমি এক জোড়া নতুন বুট হাবব, তোমাব সাধ্যি নেই আজ দুপুর-রাতে ওখানে গিয়ে দেখে এস।'

সকলে করতালি দিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাইলেন, কিন্তু রবী ছাড়িবে কেন? সে সকলের উপর বিচারের ভার দিল। তাহারা এই মত দিল যে, মাস্টাবমহাশয় যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, সেস্থলে তাঁহার উচিত যে নিজের পক্ষে তিনি যা মানেন না তা প্রমাণ করিয়া দেওয়া।

মাস্টারমহাশয় দেখিলেন, অস্বীকার করিলে যশের হানি হয়। তিনি বলিলেন, 'যা বইকি। কিন্তু আমি গিযে ফিরে এলেও এর চাইতে তোমাদের আব জ্ঞান বাড়বে না।'

ররী বলিল 'আচ্ছা দেখা যাউক'।

মাস্টারমহাশয় বলিলেন, 'ভাল, ওখানে গিয়ে আমি কি করব?

ররী বলিল, 'ওখানে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার বলবে, এল্যান ক্যামেরন আছ গো? কোন জবাব না পাও ফিরে এস, আমি আর ভূত মানব না।'

মাস্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'এটা ঠিক জেনো যে, এল্যান সেখানে থাকলে আমার কথার উত্তর দিবেই। আমাদের বড় ভাব ছিল।'

একজন বলিল, 'তাকে যদি দেখতে পাও তাহলে মুচির কাছে ও যে টাকা পেত, সে কথাটা তুলো না।' এ কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল, বরী একটু অপ্রস্তুত হইল।

এইরূপে হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল, ক্রমে মাস্টারমহাশয়ের যাবার সময় হইয়া আসিল।

শেষে মুচি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল 'বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি, তুমি এখন গেলে ভালো হয়, তাহলেই ঠিক সময়মত পৌঁছতে পারবে'।

বেশ করিয়া কাপড়-চোপড় জড়াইয়া, মাস্টারমহাশয় যষ্টি-হস্তে সেই বাড়ির দিকে চলিলেন। মাস্টাব মহাশয়ের যাইবাব সময় দু-একজন খোঁচা দিয়া দিল এবং স্থির করিল

, ফলটা কি হয় দেখিয়া যাইবে।

রাত্রি অন্ধকার। এতক্ষণ বেশ জ্যোৎস্না ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালো কালো মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মাস্টার মহাশয়ের চলিয়া গেলে সকলে বলাবলি আরম্ভ করিল যে সমস্ত রাস্তাটা সাহস করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব কি না। ছোট পাদরি বলিল যে তিনি অর্ধেক পথ গিয়াই ফিরিয়' আসিয়া যাহা ইচ্ছা বলিবেন, তখন আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। ইহা শুনিয়া মুচির মনে ভয় হইল, জুতা জোড়াটা নেহাত ফাঁকি দিয়া নেয়, এটা তাহার ভাল লাগিল না। তখন একজন প্রস্তাব দিল যে, ররী যাইয়া দেখিয়া আসুক।

প্রথমে ররী ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু উহার বক্তৃতার পরে রাজী হইল। সকলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল যেন মাস্টাব মহাশয় তাহাকে দেখিতে না পায়, তারপর সে বাহির হইল। খুব চলিতে পারিত , এই গুণে শীঘ্রই সে মাস্টারকে দেখিতে পাইল. ররী একটু দূরে দূবে থাকিতে লাগিল— রাস্তাটা একটা জলা জায়গার মধ্য দিয়া গিয়াছে, একটিও গাছপালা নাই যে মাস্টাব ফিবিয়া চাহিলে তাহার আড়ালে থাকিযা বাঁচিবে।

পরে মাস্টারমহাশয় যখন ঐ বাড়িতে পৌঁছিলেন তখন ববী একটু বুদ্ধি খাটাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে আসিয়া সেখানে একটা নিচু বেডা ছিল, তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল।

সে অবস্থায় দূতেব কার্য করিতে যাইযা তাহার অন্তরটা গুব্ গুর্ করিতে লাগিল। মাস্টবমহাশয় ছিলেন বলিয়া, নহিলে সে এতক্ষণ চেঁচাইযা ফেলিত । কষ্টেসৃষ্টে কোনমতে প্রাণটা হাতে করিয়া দেখিতেছে কি হয। মনে কবিয়াছে মাস্টারমহাশয যেরূপ ব্যবহাব করেন তাহা দেখা হইয়া গেলেই সে বাহির হইবে।

গ্রামের গির্জার ঘড়িতে বাবোটা বাজিল । সে বেড়াব ছিদ্র দিযা চাহিয়া দেখিল যে মাস্টাবমহাশয নির্ভযে দরজাব সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইযাছেন।

মাস্টারমহাশয গলা পরিষ্কার করিলেন এবং একটু শুষ্ক স্বরে বলিলেন— 'এল্যান ক্যামেরন আছ গো?' — কোনো উত্তর নেই।

দু-এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবাব বলিলেন. 'এল্যান ক্যামেবন—আছ গো?'— কোনো উত্তর নেই!

তারপর বাড়িতে আসিবার রাস্তাটির মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিযা থতমত স্বরে অর্ধ-চিৎকাব অর্ধ-আহবানেব মত করিযা তৃতীয়বার বলিলেন, 'এল্যান ক্যামেবন— আছ —?' তারপব আর উত্তরের অপেক্ষা নাই --। সটান চম্পট ।

কী সর্বনাশ ! কোথায় মাস্টারেব সঙ্গে বাড়ি যাইবে, মাস্টাব এ কি করিয়া ফেলিলেন। মুচি বেচারীব আর আতঙ্কেব সীমা নাই। ওই বুঝি ভূত এল্যান ! আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তাহার মনে যে ভয হইয়াছিল সেই ভয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে কবিতে সে মাস্টাবেব পিছনে ছুটিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক চিৎকারের শব্দ মাস্টারমহাশয়ের কানে গেল। মুচি দৌড়াইতেছে আব ডাকিতেছে—'দাঁড়াও গো! মাস্টারমশাই ! দাঁড়াও!' মাস্টারমশাই শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে এক প্রকার ফিরিয়াও তাকাইলেন। আর কি ? ঐ এল্যান ক্যামেরন ! ভয়ে আরো দশগুণ দৌড়াইতে লাগিলেন। ররী বেচারী দেখিল বড বিপদ। মাস্টার বুঝি তাহাকে ফেলিয়াই গেল! কি করে , তাহারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাস্টারমহাশয় দেখিলেন পিছনের লোকটা আসিয়া তাহাকে প্রায় ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার গায়ের বল চলিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে মাস্টারমহাশয় যখন দেখিলেন যে আব রক্ষা নেই, তখন তিনি সাহসে ভর করিলেন এবং খুব শক্ত করিয়া লাঠি ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতের দিকে ফিবিলেন এবং আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া গায়ে যত জোর ছিল তত জোবে ভূতেব মস্তকে 'সপাৎ' করিয়া সাংঘাতিক এক ঘা বসাইয়া দিলেন। তারপব সেটাও যেন কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামের আলো না দেখা গেল ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামে প্রবেশ করিবাব পূর্বে সাবধানে ঘাম মুছিয়া ঠাণ্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভয় হইল তখন ঘরে গেলেন— যেন বিশেষ একটা কিছু হয নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি সবগুলিবই উত্তবে বলিলেন—'ঐ আমি যা বলেছিলাম ভূত -টুত কিছুই তো দেখতে পেলাম না।'

এরপব মুচিব জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাস্টারকে তাহারা বলিল যে , সে স্থানান্তবে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

আধ ঘন্টা হইয়া গেল তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওযা চাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল । ক্রমে একটা বাজিল। তারপর তাহাবা আর থাকিতে পাবিল না, মুচিব অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাস্টারমহাশয়কে বলিয়া ফেলিল। মাস্টাবমহাশয শুনিযা চিৎকার করিযা উঠিলেন। তিনি লাফাইয়া উঠিযা লণ্ঠন হাতে কবিয়া দৌড়াইযা বাহির হইলেন এবং সকলকে পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন।

সকলের বিশ্বাস হইল মাস্টারের বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈ-চৈ কাণ্ড । সকলেই জিজ্ঞাসা করে ব্যাপাবটা কি? তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিযা তাহাবা মাস্টাবকে দাঁড়াইতে বলিতে লাগিল। তাঁহাদের শব্দ শুনিযা কুকুবগুলি ঘেউ ঘেউ কবিয়া উঠিল। কুকুবেব গোলমালে গ্রামের লোক জাগিল । সকলেই জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল ব্যাপাবখানা কি?

এই সময়ে মাস্টারমহাশয় জলার মধ্য দিয়া দৌড়াইতেছে, আর মাথা ঘুরিযা যাইতেছে—কেবল পুলিশ—ম্যাজিস্ট্রেট —জুরী—ইত্যাদি ভযানক বিষয় মনে হইতেছে। তাহার লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।

সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইহার কাবণ জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল। মাস্টারমহাশযেব উত্তর দিবার পূর্বেই সেই মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং গোঙানিমিশ্রিত শব্দ শোনা যাইতে লাগিল । কিছুদূর গিয়া দেখা গেল একটা লোক জলার ধারে বসিযা

আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাস্টারের উদ্দেশ্যে গালাগাল দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত ঘটনা শুনিল।

শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ঐ বাড়ির জানালার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ আছে। তাহারই ছায়া চাঁদের আলোতে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই ছায়ার আকৃতি দেখিতে ঠিক ক্যামেরনের মুখের মত। সেদিন চাঁদের আলো ছিল না বলিয়াই মাস্টারমহাশয় ছায়া দেখিতে পান নাই।

সূদন ওঝা

সুকুমার রায়

সূদন ছিল ভারী গরীব, তার একমুঠো অন্নের সংস্থান নাই। রোজ রোজ জুয়া খেলে লোককে ঠকিয়ে যা পায়, তাই দিয়ে কোনরকমে তার চলে যায়। যেদিন যা উপায় করে, সেইদিনই তা খরচ করে ফেলে, একটি পয়সাও হাতে রাখে না। এই রকম কয়েক বছর কেটে গেল ; ক্রমে সূদনের জ্বালায় গ্রামের লোক অস্থির হয়ে পড়ল, পথে তাকে দেখলেই সকলে ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা দেয়। সে এমন পাকা খেলোযাড় যে কেউ তাব সঙ্গে বাজি রেখে খেলতে চায় না।

একদিন সূদন সকাল থেকে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, গ্রামময় ঘুরেও কাউকে দেখতে পেল না। ঘুরে ঘুরে নিরাশ হয়ে সূদন ভাবল — " শিব মন্দিরের পুরুতঠাকুর ত মন্দিরেই থাকে—যাই, তার সঙ্গেই আজ খেলব।" এই ভেবে সূদন সেই মন্দিরে চলল। দূর থেকে সূদনকে দেখেই পুরুত ঠাকুর ব্যাপার বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মন্দিরের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

মন্দিরের পুরুতকে না দেখতে পেয়ে সূদন একটু দমে গেল বটে, কিন্তু তখনই স্থির করল —'যাঃ—তবে আজ মহাদেবের সঙ্গেই খেলব।' তখন মূর্তিব সামনে গিয়ে বলল—

"ঠাকুর! সারাদিন ঘুরে ঘুরে এমন একজনকেও পেলাম না, যার সঙ্গে খেলি! রোজগারের আর কোন উপায়ও আমি জানি না, তাই এখন তোমার সঙ্গেই খেলব। আমি যদি হারি, তোমার মন্দিরের জন্য খুব ভালো একটি দাসী এনে দিব, আর তুমি যদি হার, তবে তুমি আমাকে একটি সুন্দরী মেয়ে দিবে—আমি তাকে বিয়ে করব" এই বলে সূদন মন্দিরের মধ্যে ঘুঁটি পেতে খেলতে বসে গেল। খেলার দান ন্যায়মত দুই পক্ষই সূদন দিচ্ছে — একবার নিজের হয়ে একবার দেবতার হয়ে খেলছে। অনেকক্ষণ খেলার পর শেষে সূদনেরই জিত হল। তখন সে বলল—"ঠাকুর। এখন ত আমি বাজি জিতেছি, এবার পণ দাও।" পাথরের মহাদেব কোনো উত্তর দিলেন না। একবোরে নির্বাক রইলেন। তা দেখে সূদনের হল রাগ। " বটে ! কথার উত্তর দাও না কেমন দেখে নেব"—এই বলেই সে করল কি, মহাদেবের সম্মুখে যে দেবীমূর্তি ছিল সেটি তুলে নিয়েই উঠে দৌড়।

সূদনের স্পর্ধা দেখে মহাদেব ত একেবারে অবাক! তখনি ডেকে বললেন " আরে, আরে, করিস কি? শীগগির দেবীকে রেখে যা। কাল ভোরবেলা যখন মন্দিরে কেউ থাকবে না, তখন আসিস, তোকে পণ দিব।" এ কথায় সূদন দেবীকে ঠিক জায়গা রেখে চলে গেল।

এখন হয়েছে কি, সেই রাতে একদল স্বর্গের অপ্সরা এল মন্দিরে পূজো করতে। পূজোর পর সকলে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলে, মহাদেব রম্ভা ছাড়া সকলকে যেতে বললেন, সকলেই চলে গেল, রইল শুধু রম্ভা। ক্রমে রাত্রি প্রভাত না হতে সূদন এসে হাজির। মহাদেব রম্ভাকে পণস্বরূপ দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

সূদনের আহ্লাদ দেখে কে! অপ্সরা স্ত্রীকে নিয়ে অহংকারে বুক ফুলিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। সূদনের বাড়ি ছিল একটা ভাঙাকুঁড়ে, অপ্সরা মায়াবলে আশ্চর্য সুন্দর এক বাড়ি তৈরী করল। সেই বাড়িতে তারা পরম সুখে থাকতে লাগল। এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল!

সপ্তাহে একদিন, রাত্রে অপ্সরাদের সকলকে ইন্দ্রের সভায় হাজির থাকতে হয়। সেই দিন উপস্থিত হলে, রম্ভা যখন ইন্দ্রের সভায় যেতে চাইল, তখন সূদন বললে—" আমাকে সঙ্গে না নিলে কিছুতেই যেতে দেব না। " মহা মুশকিল। ইন্দ্রের সভায় না গেলেও সর্বনাশ—দেবতাদের নাচ গান সব বন্ধ হয়ে যাবে— আবার সূদনও কিছুতেই ছাড়ছে না। তখন রম্ভা মায়াবলে সূদনকে একটা মালা বানিয়ে গলায় পরে নিয়ে ইন্দ্রের সভায় চলল। সভায় নিয়ে সূদনকে মানুষ করে দিলে পরে, সে সভার এক কোণে লুকিয়ে বসে সব দেখতে লাগল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলে, নাচগান সব থেমে গেল। রম্ভা সূদনকে আবার মালা বানিয়ে গলায় পরে চলল তার বাড়িতে। ক্রমে সূদনকে বাড়ির কাছে একটা নদীর কাছে এসে রম্ভা তাকে আবার মানুষ করে দিল, তখন সূদন বলল —" তুমি বাড়ি যাও, আমি এই নদীতে স্নান ও আহ্নিক করে পরে যাচ্ছি।

এই নদীর ধারে ছিল ত্রিভুবন তীর্থ। এখানে দেবতারা পর্যন্ত স্নান করতে আসতেন।

সেদিন সকালেও ছোটখাটো অনেক দেবতা নদীর ঘাটে স্নান করছিলেন। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখে সূদন চিনতে পারল— তাঁরা রাত্রে ইন্দ্রের সভায় রম্ভাকে খুব খ্যাতির করছিলেন। সূদন ভাবল —'আমাব স্ত্রীকে এরা এত সম্মান করে তাহলে আমাকে কেন করবে না?' এই ভেবে সে খুব গম্ভীর ভাবে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল—যেন সেও ভারি একজন দেবতা। কিন্তু দেবতারা তাকে দেখে অত্যন্ত অবজ্ঞা ক'রে তার দিকে ফিবেও চাইলেন না। —তাঁরা তাঁদের স্নান ও আহ্নিকেই মন দিলেন। এ তাচ্ছিল্য সূদনের সহ্য হল না। সে কবল কি, একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিযে দেবতাদেব বেদম প্রহার দিয়ে বলল—"এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমি বম্ভার স্বামী, আমাকে তোবা জানিস নে?" দেবতাবা মার খেয়ে ভাবলেন 'কি আশ্চর্য! রম্ভা কি তবে মানুষ বিয়ে করেছে?' তাঁবা তখনই স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে সব কথা বললেন।

এদিকে সূদন বাড়ি গিয়েই হাসতে হাসতে স্ত্রীর কাছে তার বাহাদুবিব কথা বলল। শুনে রম্ভার ত চক্ষুস্থিব, স্বামীর নির্বুদ্ধিতা দেখে লজ্জায সে মবে গেল, আব বলল—"তুমি সর্বনাশ কবেছ। এখনি আমাকে ইন্দ্রের সভায যেতে হবে।" দেবতারা ইন্দ্রেব কাছে গিয়ে নালিশ করলে পব ইন্দ্রের যা রাগ। এতবড় স্পর্দ্ধা! স্বর্গের অপ্সরা হযে রম্ভা পৃথিবীর মানুষ বিযে করেছে? ঠিক সময রম্ভাও গিযে সেখানে উপস্থিত! তাকে দেখেই ইন্দ্রের বাগ শতগুণ বেড়ে উঠল। আর তিনি তৎক্ষণাৎ শাপ দিলেন, "তুমি স্বর্গেব অপ্সরা হয়ে মানুষ বিয়ে কবেছ, আবার তাকে লুকিয়ে স্বর্গে এনে আমার সভায নাচ দেখিয়েছ এবং স্পর্দ্ধা কবে সেই লোক আবাব দেবতাদেব গায়ে হাত তুলেছে; অতএব, আমার শাপে তুমি আজ হতে দানবী হও। বাবাণসীতে বিশ্বেশ্বরেব যে সাতটি মন্দির আছে সেই মন্দির চুবমাব করে আবাব যতদিন কেউ নতুন কবে গডিযে না দেবে, ততদিন তোমাব শাপ দূব হবে না।

বম্ভা তখনি পৃথিবীতে এসে সূদনকে শাপেব কথা জানিযে বলল—"আমি এখন দানবী হয়ে বারাণসী যাব। সেখানে বারাণসীব বাজকুমারীব শবীরে ঢুকব, আর লোকে বলবে বাজকুমারীকে ভূতে-পেযেছে। বাজা নিশ্চযই যত ওঝা কবিবাজ ডেকে চিকিৎসা করাবেন, কিন্তু আমি তাকে ছাডব না, তাই কেউ রাজকুমাবীকে ভালো করতে পারবে না। এদিকে তুমি বাবাণসী গিয়ে বলবে যে, তুমি বাজকুমাবীকে আবাম কবতে পারো। তারপর তুমি বুদ্ধি করে ভূত ঝাডানোর চিকিৎসা আবম্ভ কবলে আমি একটু একটু করে রাজকুমাবীকে ছাডতে থাকবো। তাবপব তুমি বাজাকে বলবে যে, তিনি বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চূর্ণ কবে, আবার যদি নূতন করে গড়িয়ে দেন। তবেই রাজকুমারী সম্পূর্ণ আরাম হবেন। রাজা অবশ্য তাই করবেন আর তাহলেই আমার শাপ দূর হবে। তুমিও অগাধ টাকা পুবস্কার পেয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারবে।" এই কথা বলতে বলতেই রম্ভা হঠাৎ দানবী হযে, তখনই চক্ষের নিমেষে বারাণসী গিয়ে একেবারে রাজকুমারীকে আশ্রয ক'রে বসল।

রাজকুমারী একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে, বিড় বিড় ক'রে বকতে বকতে সেই যে ছুটে বেরুলেন, আর বাড়িতে ঢুকলেনই না। তিনি শহরের কাছেই একটা গুহার মধ্যে থাকেন, আর রাস্তা দিয়ে লোকজন যারা চলে তাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মারেন! রাজা কত ওঝা বদ্যি ডাকলেন, রাজকুমারীর কোন উপকারই হলো না। শেষে রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন,— "যে রাজকুমারীকে ভাল করতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিব—রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিব।"

রাজবাড়ীর দরজার সামনে ঘন্টা ঝুলান আছে, নতুন ওঝা এলেই ঘন্টায় ঘা দেয় , আর তাকে নিয়ে গিয়ে রাজকুমারীর চিকিৎসা করান হয়। সূদন রম্ভার উপদেশ মতো বারাণসী গিয়ে রাজকুমারীর পাগল হওয়ার কথা শুনে ঘন্টায় ঘা দিল। রাজা তাকে ডেকে বললেন— " ওঝার জ্বালায় অস্থির হয়েছি বাপু! তুমি যদি বাজকুমাবীকে ভাল করতে না পার, তবে কিন্তু তোমার মাথাটি কাটা যাবে।" এ কথায় সূদন রাজী হযে তখনই রাজকন্যাব চিকিৎসা আরম্ভ করে দিল।

ভূতের ওঝারা ভড়ংটা করে খুব বেশী , সূদনও সেসব করতে কসুর করল না। ঘি, চাল, ধুপ, ধূনা দিয়ে প্রকাণ্ড যজ্ঞ আবম্ভ কবে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড কবে হিজি বিজি মন্ত্র পডাও বাদ দিল না। যজ্ঞ শেষ করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেই পর্বতের গুহায় চলল, যেখানে রাজকন্যা থাকে। সেখানে গিয়েও বিড় বিড ক'রে খানিকক্ষণ মন্ত্র পড়ল— "ভূতেব বাপ— ভূতের মা—ভূতের ঝি,—ভূতের—ছা—দূর দুব দূর, পালিয়ে যা"। ক্রমে সকলে দেখল যে, ওঝার ওষুধে একটু একটু করে কাজ দিচ্ছে। কিন্তু ভূত বাজকুমাবীকে একেবাবে ছাড়ল না। তিনি তখনও গুহার ভিতবেই থাকেন, কিছুতেই বাইরে আসলেন না। যা হোক, রাজা সূদনকে খুব আদর যত্ন করলেন, আব, যাতে ভূত একেবারে ছেড়ে যায, সেরূপ ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। দুদিন পর্যন্ত সূদন আরো কত কিছু ভড়ং কবল। তৃতীয দিনে সে রাজাব কাছে এসে বলল— " মহাবাজ ! রাজ কুমারীব ভূত বড় সহজ ভূত নয়— এ হচ্ছে দৈবী ভূত। মহাবাজ যদি এক অসম্ভব কাজ করতে পাবেন—বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চুরমাব ক'রে, আবার নূতন ক'রে ঠিক আগেব মত গড়িয়ে দিতে পাবেন, —তবেই আমি রাজকন্যাকে আরাম করতে পারি।"

রাজা বললেন— "এ আর অসম্ভব কি?" রাজার হুকুমে তখনই হাজার হাজাব লোক লেগে গেল। দেখতে দেখতে মন্দিরগুলি চুরমার হয়ে গেল। তাবপর এক মাসের মধ্যে আবার সেই সাতটি মন্দির ঠিক যেমন ছিল তেমনটি করে, নতুন মন্দির গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীও সেরে উঠলেন, অপ্সরাও শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল। তারপর খুব ঘটা ক'রে সূদনের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হল আর রাজা বিয়েব যৌতুক দিলেন তাঁব অর্ধেক রাজত্ব।

বেঁশো ভূত

নজরুল ইসলাম

শিবনগর গ্রামে ভূতের উপদ্রব খুব বেড়েছে। বিশেষ করে গ্রাম থেকে ডোমকল যাওয়াব বাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে যে বড় বাঁশঝাড়টা আছে, সেখানে একদল বদখত ভূত-পেতনি আস্তানা গেড়েছে। আঁধার রাতে একা-একা কোনও পথচারীকে পেলে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। ছোট ছেলেমেয়ে পেলে তো তারা আরও মজা করে তাদের ঘাড় মটকাচ্ছে। ভূতের ভয়ে রাতেব বেলা একাকী ও-পথ দিয়ে হাঁটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে।

এদিকে গ্রাম থেকে ডোমকল যাওয়া-আসার ওই একটিমাত্র পথ। আশপাশের মধ্যে ডোমকলে একটিমাত্র বাজার। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গ্রামের লোককে বাজারে যেতেই হয়। অপ্রয়োজনে যাওয়া বন্ধ করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনে যাওয়া বন্ধ করবে কী করে? কারও বাজাব করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে, তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। কারও বাড়িতে রাত্রিতে হঠাৎ অসুখের বাড়াবাড়ি, তাকে ডাক্তার ডাকতে যেতেই হবে। কারও স্কুলে পুরস্কার বিতরণী. তাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। কারও যুক্তি করে বাজারে গিয়েও কী করে যেন বন্ধুব সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তাকেও একাকী বাড়ি ফিরতেই হবে। আর ভূত-পেতনিগুলো ঠিক তখনই ওদের ধরবে।

ধরার জন্য পেতনিগুলো দারুণ এক ফন্দি বের করেছে।

"কীরকম ফন্দি?" গ্রামের শিবমন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন।

সমবেত লোকদের মধ্যে সমর মণ্ডল বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। সকলের পক্ষ থেকে সে উত্তর দিল, "বাঁশঝাড়ের যে কয়েকটা বাঁশ রাস্তার ওপর হেলে আছে, পেতনিগুলো তার ওপর সাদা কাপড় পরে বসে থাকছে।"

"তে-তে-তে-তে-তে-তে-তেইখা-খা-খা-খা-খানে তো ফ-ফ-ফ-ফ-ফন্দি।"

ভট্টাচার্যমশাই হাসতে-হাসতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তা ফন্দিটা কী, সেটা তো বল!"

সমর রমেনকে নাড়া দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এই রমেন, একটু থাম না বাবা। আমি বুঝিয়ে বলছি। এই কয়েকটা বাঁশ তো রাস্তার ওপর নুয়ে আছে?"

"আছে!"

"রাস্তা দিয়ে আসতে হলে বাঁশটা উঁচু করে তুলে নীচে দিয়ে গলে আসতে হবে, নয় নীচের দিকে চেপে ধরে ডিঙিয়ে আসতে হবে।"

"হবে। এতে ফন্দির কী হল?"

"নিচু হয়ে গলে আসতে গেলে পেতনিগুলো বাঁশের ওপর চড়ে চেপে ধরছে। আবাব বাঁশের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে আসতে গেলে বাঁশ সমেত চ্যাংদোলা কবে তুলে ধপাস কবে ফেলে দিচ্ছে।"

"না, তা হলে তো ভারী বিপদের কথা!"

"না হলে আর আপনার কাছে এসেছি কেন? আপনি এই ভূতগুলো তাড়ানোব একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন!"

ভট্টাচার্যমশাই একটু ভেবেচিন্তে নিয়ে বললেন, "প্রেতাত্মা যখন কোথাও একবার ভব কবে তখন তাকে তাড়ানো ভারী শক্ত কাজ বাবা। তারপর সব শুনে যা মনে হচ্ছে, এ ব্রহ্মদৈত্য! হরেন ঘোষালের বউটা অপঘাতে ম'ল। তা ঘোষাল শ্রাদ্ধশান্তি তো ভালভাবে করল না! বেলগাছটা আশ্রয় করে ছিল। তা ঘোষাল বেলগাছটাও কেটে ফেলল। এখন মনে হচ্ছে আশ্রয়চ্যুত হয়ে ওটা ওই বাঁশঝাড়েই আশ্রয নিয়েছে। তা তোমবা সবাই মিলে ঘোষালকে বলো। ভালভাবে শ্রাদ্ধশান্তি করুক। তা হলেই বউটার আত্মা শান্তি পাবে। কুপ্রভাবও কেটে যাবে।"

।। দুই।।

সকলে মিলে হরেন ঘোষালেব বাড়ি গেল।

ঘোষাল তো শুনেই রেগে আগুন, "ইয়ার্কি মাবার জায়গা পাও না? আমাব বউ মরে পেতনি হয়েছে? তাও আবার বাঁশঝাড়ের আগ্‌লেতে। তাতে ক্ষান্ত হযনি! ভট্টাচার্যের কানে-কানে বলতে এসেছে? থাম, তোমাদেব সবক'টার চাব্‌কে ভূত ছাড়িয়ে দিচ্ছি!"

ভূত ছাড়ানোর জন্য অবশ্য কেউ অপেক্ষা করেনি। পালিয়ে চাবুকের হাত থেকে বেঁচেছিল। এখন হাঁপাতে-হাঁপাতে আবার রামকমল ভট্টাচার্যের কাছে গেল। ভট্টাচার্য বললেন, "ঘোষালটা চিরদিনই ওরকম রগচটা। ওই জন্যই বউটার অকালে প্রাণ গেল। এখন দেশসুদ্ধু লোকের ভোগান্তি।"

"সেটা তো বুঝলাম!" সমর বলল, "কিন্তু এখন এর বিহিত কী হবে?"

ভট্টাচার্যেব কোনও ভাবান্তর হল না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার নির্ণয় আমি জানিয়েছি। এখন ঘোষাল যদি না করে, তোমরা করো।"

কথাটা সকলেরই মনে ধরল। তারা চাঁদা তুলে ভট্টাচার্যের বিধানমতো ঘোষালের বউয়ের শ্রাদ্ধ করল। ব্রাহ্মণভোজন করানো হল। মন্ত্র পড়া হল। যাগযজ্ঞ হল। ধূপ-ধুনো জ্বলল। কিন্তু ভূতের উপদ্রব কমল না। পেতনিগুলোর উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। আগে শুধু আঁধাররাতে হত। এখন জ্যোৎস্নারাতেও হচ্ছে।

।। তিন ।।

পালেদের পটলা সেদিন বাজারে পুতুল বিক্রি করতে গিয়েছিল। পুতুল বিক্রি হতে রাত হয়। ব্যাগভর্তি বাজার করে ফিরছিল। বাজার ভর্তি ব্যাগ নিয়ে ডিঙিয়ে তো আসতে পারে না। যেই নিচু হয়ে বাঁশেব তলা দিয়ে গলে আসতে গেছে, অমনই পেতনিগুলো বাঁশের ওপর চড়ে চেপে ধবেছে। পটলা তো ভয়ে গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরলে দেখে, সাদা কাপড় পরে একটা মেয়ে বাঁশঝাড়েব দিকে জঙ্গলেব মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। রতন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পটলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বে পটলা, সত্যি কিনা বল না!"

"একদম সত্যি," পটলা শপথ কবে বলল, "পেতনিডার গায়ে ধলো কাপুড ছিল।"

"কী করা যায়?"

ওদিক থেকে তোতলা রমেন বলে উঠল, "ও-ও-ও-ও-ওঝা।"

পাশের গ্রাম কালুপুরের (কেউ কেউ বলে, আগে নাকি ওই গ্রামটার নাম ছিল কালীপুব) ফাঁকু ওঝার কথা রমেন আগেও কয়েকবাব তুলেছিল। কেউ গুরুত্ব দেয়নি। ভট্টাচার্যেব বিধান ব্যর্থ হওয়াব পর গুরুত্ব না দিয়ে আব কোনও উপায় ছিল না। সমরও সায় দিল, "দেখাই যাক না! রতন, তুই একবাব যা।"

রতন গিয়ে ফাঁকু ওঝাকে ধরে নিয়ে এল।

।। চাব ।।

ফাঁকু ওঝা তার পেল্লাই ভুঁড়ি, ইয়া বড়-বড় গোঁফ-দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর কাঁধে একটা ময়লামতো ঝুলি নিয়ে এসে বাঁশঝাড়ের পাশে বাস্তার ওপর বসে ঝুলিব মধ্যে থেকে এটা-ওটা বের করতে লাগল। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরে ভূত কেমন, জানতে চাইছিল। ফাঁকু ওঝা বলল, "ভূত-পেতনি বলে কিছু নেই বাবাসকল। উনারা সব পরী-হুরি। পৃথিবীতে আমাদের যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই ওঁদেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই বাঁশঝাড়ে দেখছি একদল ভূতের আসর পড়েছে।"

"তা হলে কী হবে?"

"আমি এমন দোয়া পড়ব, সবাই পালাবে।"

"কিন্তু আপনি চলে গেলেই তো আবার আসবে।"

"সে গুড়ে বালি। আমি সমগ্র গাঁয়ের সীমানা বন্ধন করে দিয়ে যাব।"

"কেমন করে?"

"দ্যাখোই না!"

"ফাঁকু ওঝা কিছু বাঁশের শুকনো পাতা এবং খড়কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালাল। ঝুলি থেকে একটা ঝাড়ুর মতো কী যেন বের করে দোলাতে থাকল। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করতে থাকল। ঝাড়ুর মতো ওটা দোলাতে-দোলাতে বাঁশঝাড়ের কাছে এসে আর একপ্রস্থ বিড়বিড় করে বলল, "আপদ দূর হয়েছে!"

রতন, সমররা খুব খুশি হয়ে ভূতের ওঝাকে বিদায় করল। কিন্তু ভূত-পেতনিগুলোকে বিদায় করতে পারল না। ওগুলোর উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। সাঁঝের বেলাতেই দাপাদাপি শুরু করে দিল।

।।পাঁচ।।

সাহাদের সনাতন মহাজনের ঘর থেকে ফিরছিল। সবে সন্ধে হয়েছে। গাঁয়ের সীমানা বন্ধ করা হয়েছে। আর সবে আঁধার হয়েছে। সনাতন একটু নিশ্চিন্ত মনেই আসছিল। যেই না বাঁশটা ডিঙনোর জন্য পা বাড়িয়েছে, ভূতগুলো বাঁশটাকে সড়াত জোরে তুলে দিয়েছে। ফচকে ফটিক রসিকতা করে বলল, "বাঁশের ঝাপটায় সনাতন যখন চিতপটাং ভূতগুলো তখন দড়বড়াং।" সমর সনাতনের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি করে বল তো, ঠিক কী হয়েছিল?"

"আমি তো পড়ে গেছি। খুব ভয় পেয়ে চিৎকারও করে উঠেছি। দেখি, একটা বড়-বড শিংওয়ালা ভূত এসে আমার বুকেব ওপর বসেছে, সাবা গাযে হাত বুলোচ্ছে! আমি ভযে আবার চিৎকার কবে উঠেছি। উঠে দেখি, কিছু নেই! আরও ভয় পেয়ে গেছি!"

ভয় পাওয়ার মতোই ব্যাপার। কিন্তু উপায় কী করা যায়?

পাশের গ্রামেব পলক দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে উঠল, "হাবু গোয়েন্দা, ডাবু গোয়েন্দাকে ডাকলে হয় না!"

"তারা আবার কে?"

"ভূত ধরার গোয়েন্দা।"

"ধুস, ভূত আবার ধরা যায় নাকি?"

"না সমরদা! পটলডাঙার রাজবাড়ির ভূত ধরার গল্প শোনোনি? সত্যি ধরেছিল কিন্তু!"

সমরের ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ছোঁড়াদুটোর খুব নাম ছড়িয়েছিল বটে! এমনই এমনই কি আর ছড়িয়েছিল? তা হলে ডাকা যেতে পারে। পলকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "পলকভাই তা হলে চলো একবার তাদের কাছেই যাই।"

পলক রাজি হয়ে গেল। সমরের সঙ্গে গিয়ে হাবু গোয়েন্দা, ডাবু গোয়েন্দাকে খুঁজে বের করল।

।। ছয় ।।

হাবু আর ডাবু এলে ছেলেমেয়েরা বলল, "কী করে ভূত ধরো দেখাতে হবে।"

হাবু জানাল, "আমাদের প্রথমে তদন্ত করে দেখতে হবে!"

"তদন্ত করে দেখতে হবে?" সমর ভ্রূ কোঁচকাল, "ভূতের আবার কী তদন্ত হবে?"

"দেখুন না!" ডাবু সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল, "আমরা তো কিছু গোপনে করছি না। আমাদের কাজ একদম 'খুললাম খুললা'। তবে এখন কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"তাহলে আমরা প্রথমে এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই, যারা ভূতের হাতে হেনস্তা হয়েছে। কেউ এখানে আছেন?"

"অনেকেই আছে।"

সমর প্রথমে পালেদের পটলাকে এগিয়ে দিল। পটলার কাছে সব শোনার পর হাবু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ধলো কাপড় পরা মেয়েটা তো জঙ্গলে ঢুকে গেল। আপনার ব্যাগভর্তি বাজারের কী হল? সেগুলো ছিল?"

সমর ভেবে পেল না, ভূতের সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক কী! কিন্তু কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

পটলা মনে করার চেষ্টা করল। ভূতের হাত থেকে যে প্রাণটা বেঁচেছে, তখন সেইটাই বড় কথা। বাজারেব কথা কে ভেবেছে? কিন্তু না, ছিল না। পটলা ভাল করে ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, "না, গোয়েন্দাবাবু! ছিল না।"

"তা হলে ছিল না? আর কেউ?"

সমর কিছু না বলে সাহাদের সনাতনকে এগিয়ে দিল। ডাবু তাব সব কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, "শিংওয়ালা ভূতটা গায়ে হাত বুলিয়ে চলে যাওযার পর আপনার পকেটে টাকাগুলো ছিল?"

"আর বলবেন না! ভূতের নাম করে আমি টাকাগুলো মেরে দিচ্ছি বলে দাদা কি অশান্তিটাই না করলেন!"

"কী করবে বলুন, দাদা জানেন, ভূতে শুধু ঘাড় মটকায়। তিনি তো জানেন না, ভূতে টাকাও নেয়। কিন্তু দেখছি, এখানকার ভূতপেতনিগুলো টাকা নেয়, বাজারের ব্যাগও নেয়!"

"আবার চকোলেটও খায়!" ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বছর দশেকের ছোট্ট মেয়ে বলে উঠল।

হাবু তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী করে জানলে বলো তো?"

"দাদু আনছিল তো! ভূতগুলো কেড়ে নিয়েছে!"

"তাই? আমরা যখন ধরব তুমি খুব করে বকে দিয়ো ভাই!"

।। সাত ।।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তারা বাঁশঝাড়ের কাছে গেল। নুয়ে-পড়া বাঁশগুলোকে পরীক্ষা করে দেখল। আশপাশের জঙ্গলে কী যেন খুঁজে বেড়াল। অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে সবাই জানাল, "না, কিছু বোঝা গেল না।"

হতাশায় সবাই এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

হাবু, ডাবু তাদের বিখ্যাত টর্চ নিয়ে রাত্রিবেলাতেও বাঁশঝাড়ের দিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। কয়েকদিন আর কেউ ভূতের হাতে পড়েনি। তা, সে তো কাছে অন্য লোক থাকলেও ভূত আসে না। হাবু, ডাবু আছে, তাই আসছে না। চলে গেলেই আবার আসবে। তা হলে আর সমাধান কী হল?

সত্যিই কিছু হল না। ক'দিন পরে এসে হাবু ডাবু জানিয়ে দিল, "আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের দ্বারা হবে না।"

সমর বলার চেষ্টা করল, "হবে না বললে তো হবে না! ভার নিয়েছ, কাজ তুলতেই হবে।"

পলক কাকুতি-মিনতি করল, "তোমরা অন্তত আর-একবার চেষ্টা করো!"

হাবু, ডাবু রাজি হল না। গাঁ ছেড়ে চলে গেল।

।। আট ।।

পরের রাতেই মণ্ডলদের নয়ন ভূতের হাতে নাকাল হল। তার পরের রাতে হইহই চিৎকারে প্রায় সবাই বাঁশঝাড়ের দিকে ছুটল।

গিয়ে দেখে, একটা শিংওয়ালা ভূতকে বাঁশের সঙ্গে হাবু দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আর ডাবুর বাঁ হাতের কবজি দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ডান হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

লোকজন জড়ো হতেই হাবু বলল, "এই হচ্ছে আপনাদের বাঁশঝাড়ের ভূত! সঙ্গে একটা পেতনিও ছিল। পালিয়ে গেছে। তবে একটা যখন ধরা পড়েছে, ওটাকেও পাওয়া যাবে।"

ডাবু গিয়ে একটানে তার মুখ থেকে মুখোশটা খুলে দিল।

সবাই দেখল, বেঁশো ভূত আর কেউ নয়— হটপাড়ার কালু-চোর। সবাই একসঙ্গে পাইকারি হারে এমন কিল-চড়-ঘুসি মারতে লাগল যে, কালু-চোরের এখন-তখন অবস্থা। সনাতনের রাগটা যেন আর সবার চেয়ে অনেক বেশি। এই ভূত-বেশী চোরের জন্যই তাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। সে একই সঙ্গে হাত এবং মুখ চালাতে লাগল, "বেটা চোর। চুরি করার নতুন ফন্দি বের করেছে। ভূত সেজেছে! তোমার ভূত আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি!"

হাবু এগিয়ে বলল, "দেখুন, এর পর আর মারধোর করলে ও সত্যিই পটল তুলবে। সেক্ষেত্রে অন্যজন কে ছিল, সেটা আর জানা যাবে না। অথচ সেটা জানা দরকার। তার চেয়ে পুলিশকে খবর দিন।"

পুলিশের নাম শুনে কালু কেঁপে উঠল।

তোতলা রতন বলল, "ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যাটাকে পু-পু-পু-পু-পুলিশিই দা-দা-দা-দা-দাও!"

সমর বাধা দিয়ে বলল, "না, ওকে গাঁয়ে নিয়ে চল। আগে হাতের সুখ করে আচ্ছা করে পেটাব। তারপর পুলিশে দেব।"

সবাই সমরের কথায় সায় দিল। কোমরে দড়ি-বাঁধা কালু-চোরকে গাঁয়ের দিকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। পলক এসে হাবু, ডাবুকে ধরল।

।। নয় ।।

"কী করে বুঝলে বলো তো, যে, বাঁশঝাড়ের ওগুলো আসলে ভূত নয়, মানুষ?"

হাবু উত্তর দিল, "মানুষ না হলে, বাজার, টাকা, চকোলেট আর কে নেবে?"

"তা হলে, 'পারব না' বলে তোমরা পালালে কেন?"

"পালাইনি তো!" ডাবু বলল, "আমরা শুধু পালানোব ভান করেছিলাম, যাতে চোররা জানে যে, আমরা চলে গেছি। না হলে কি এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ত!"

"তা সত্যি! কিন্তু আজ কী করে ধরলে বলো তো!"

"হ্যাঁ, ধরাটা একটু মুশকিল ছিল!" হাবু জানাল, "কারণ, কালুরা দু'জন ছিল। কিন্তু একজনের বেশি লোক থাকলে ধরছিল না। একজনে দু'জনের সঙ্গে মারামাবি করা যায়। কিন্তু দু'জনের একজনকে আটকে রাখা যায় না।"

"তা হলে আজ কী কবে রাখলে?"

"আমরাও দু'জন ছিলাম।"

"তোমরা যে বললে একা না থাকলে ধরে না!"

"হ্যাঁ!" ডাবু উত্তব দিল, "সামনে আমি একাই ছিলাম। দেখতে না পায় এবকম দূরত্বে হাবু অপেক্ষা করছিল।"

"ওকে খবব দিলে কী কবে?"

"কেন? আমাদেব কাছে যে ছোট ছোট 'ওয়্যারলেস সেট' আছে, তা জানো না? যেই ভূতে ধরেছে আমিও 'ভূত' বলে ভূতকে জড়িয়ে ধরেছি। ধবা পড়ে গেছে বুঝে পালাবাব জন্য ভূতটা আমাব হাতে ছুবি বসিযে দিয়েছে। অন্য ভূতটা ছুটে আসছিল। কিন্তু ততক্ষণে সাইকেল চডে হাবুও পৌঁছে গেছে। হাবু এসে হাত মটকে ছুরিটা কেড়ে নিয়েছে। অন্য ভূতটা বেগতিক দেখে বেপাত্তা হয়ে গেছে।"

।। দশ ।।

কী বুদ্ধি তোমাদের! আমাকে তোমাদের দলে নেবে?

"নেব। না হলে, তোমাকে এরকম একটা দল করে দেব। কিন্তু তার জন্য আমাদেব বেঁচে থাকতে হবে। এরকম রক্ত ঝরতে থাকলে বেশিক্ষণ বাঁচব না।"

পলকের খেয়াল হল, সত্যি তো, ডাবুর হাত দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে। সে হাসপাতালে নিযে যাওয়ার জন্য তাব হাত ধরল।

শিল্পী প্রমোদ রায়ের নাম অনেকের কাছে সুপরিচিত। আমি উদীয়মান চিত্রকর ও ভাস্কর প্রমোদ রায়ের কথা বলছি। ছবি আঁকায় এবং মূর্তি গড়ায় তাঁর সমান খ্যাতি।

সে বাস করত নিমচাঁদ মল্লিক স্ট্রীটের একখানা ভাড়া বাড়িতে। স্ত্রী ছাড়া তার পরিবারে আর কোন লোক নেই। বাড়িখানা ছোট হলেও তার কোন অসুবিধা হতো না। নীচের তলায় তার কারু-কক্ষ বা স্টুডিও।

তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল দিব্যি নির্ভাবনায়, কিন্তু হঠাৎ হলো এক মুস্কিল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এক নোটিশ এসে হাজির এ বাড়ি ছেড়ে তাকে উঠে যেতে হবে।

কলকাতায় তখন ভাড়াবাড়ির একান্ত অভাব। পাড়ায় পাড়ায় উদ্বাস্তুদের ভিড়। মোটা টাকা সেলামী এবং দ্বিগুণ চতুর্গুণ ভাড়া দিতে চাইলেও খালি বাড়ি পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ বাড়িওয়ালাই পুরোন ভাড়াটিয়া উঠে গেলে খুশি হয়, নতুন ভাড়াটিয়া বসিয়ে বেশি লাভ করবার লোভে।

প্রমোদ বাড়িওয়ালার দাবি সহজে মানতে রাজি হ'ল না। বাড়িওয়ালা নালিশ করল।

মামলা হ'ল এবং মামলায় হেরে গেল প্রমোদই। বাড়ি ছাড়বার জন্য সে সময় পেল মাত্র একমাস।

।। দুই।।

ইতিমধ্যে ঘটতে লাগল অদ্ভুত সব কাণ্ড।

প্রমোদের ঠিক পাশেব বাড়িতে থাকত নরহরি দাস। মফস্বলেব লোক, কলকাতায় বাস করত ব্যবসাসূত্রে। মাঝখানে একটা পাঁচিল টপ্‌কালে তাদের বাড়িব ছাদ থেকে অনায়াসে প্রমোদদেব বাড়ির ছাদের উপরে এসে পড়া যেত।

নরহরির চেহারাখানি ছিল আদর্শ গদীওযালাব মত— মোটাসোটা বেঁটেসেটে, কালো দেহ; চাঁদের মত গোলাকার মুখমণ্ডল; সাজগোজ তথৈবচ। সে পরম বৈষ্ণব, মাথায চৈতনচুটকি, কপালে ও নাসিকায় তিলকমাটির চিহ্ন এবং কণ্ঠদেশে তিনসার তুলসীর মালা।

অথচ তার অত্যন্ত দহরম-মহরম ছিল মহাশক্তি ভৈবব ভট্চার্যেব সঙ্গে। ভৈরবের চেহাবা ছিল লম্বায-চওড়ায দশাসই, হাস্য ছিল অট্টহাস্যেব মত এবং বাক্য ছিল হুঙ্কারের মত। তান্ত্রিক ক্রিযা ছিল তার পেশা। মদ্য আব মাংসই ছিল তার প্রধান পানীয ও খাদ্য।

কিন্তু চেহারায় ও চবিত্রে আকাশ-পাতাল তফাত থাকলেও ভৈবব ও নবহবি দুজনেরই নেশা ছিল এক এবং সেটা হচ্ছে দাবা খেলা।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় নরহরি তাম্বুল চর্বণ করতে কবতে এবং ভৈরব তামাকু টানতে টানতে দাবাবোডেব ছকেব সামনে বসে খেলায বিভোর হয়ে থাকত। সে সময়ে তাদের দেখলে লোকে বলাবলি কবত, "এও যখন সম্ভবপব, তখন বাঘে আব গরুতে মিলনই বা অসম্ভব হবে কেন?"

কিন্তু এমন মিলনেও বাগ্‌ড়া পডল। আচম্বিতে মেনিন্‌জাইটিস বোগে নবহবি হ'ল গতাসু এবং সে বাডি ছেডে দিযে দেশে চ'লে গেল তার পরিবাববর্গ। ভেঙে গেল সেখানকাব দাবাবোডেব সান্ধ্য আসব।

।। তিন।।

নবহবিব মহাপ্রস্থানে ভৈবব ভট্টাচার্য দুঃখ পেল বটে, কিন্তু পবম আনন্দলাভ করল তার বাড়িওযালা ক্ষেত্র বা ক্ষেতু মল্লিক।

নরহবি ভাডা দিত মাসিক পঞ্চাশ টাকা। ক্ষেতু মল্লিক এখন জো পেযে দাবি ক'রে বসল এককালীন একহাজাব টাকা সেলামী এবং মাসিক দেডশ' টাকা ভাড়া। দিনকাল যা বাড়েছে, তার দাবি নিশ্চয় অপূর্ণ থাকত না। এমন কি, হবু ভাডাটিযাবা আনাগোনাও শুরু ক'বে দিল।

কিন্তু সহসা সংঘটিত হ'ল এক রোমাঞ্চকব ও অভূতপূর্ব ঘটনা।

এক পূর্ণিমাব রাত্রে পথ দিয়ে চলতে চলতে নবহবিদেব পবিত্যক্ত, তালাবন্ধ, খালিবাড়ির বারান্দাব দিকে তাকিযে বদন চাটুয্যে দেখল এক বিসদৃশ দৃশ্য।

বারান্দাব একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মুখ সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢাকা এক সন্দেহজনক মূর্তি।

বদন চেঁচিয়ে বললে, "কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?"

কোন সাড়া নেই।

বদনের সঙ্গে ছি্ল টর্চ, সে টপ করে টর্চের চাবি টিপে আলো জ্বেলে যা দেখল, তা সম্ভবপরও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়।

সে মূর্তি হচ্ছে নরহরি দাসের।

তার পেটের পিলে চমকে গেলেও নিজের চোখের ভ্রম ভেবে বদন চাটুয্যে আরো ভালো কবে দেখবার চেষ্টা করল। উঁহু, মোটেই চোখের ভ্রম নয় ও মুখ অবিকল নবহবি দাসের। ভয়ে সাদা হয়ে গেল বদনের বদন, ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে "আঁ" ব'লে পাড়াকাঁপানো চীৎকার ক'রে সে ঘন্টায় বিশ মাইল বেগে দৌড় মাবল নিজেব বাড়িব দিকে।

।। চার ।।

বলা বাহুল্য, খবরটা পাড়ার ঘরে ঘরে র'টে যেতে দেরি লাগল না।

ক্ষেতু মল্লিক তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললে, "বদনা ব্যাটা ভাংচি দিতে চায। নবহবি ছিলেন পবম বৈষ্ণব মানুষ, তিনি এখন গোলকধামে ব'সে মনেব সুখে বিশ্রাম করছেন, কোন্ দুঃখে আবাব এই ছাই পৃথিবীতে ফিবে আসবেন?"

কিন্তু নবহবি যে এখনো সশরীবে বিবাজ কবছে তার ঐ ভাড়া-বাড়িতেই, পাড়াব আরো কেউ কেউ তাব অকাট্য চাক্ষুষ প্রমাণ পেল। তবে দিনেব বেলায তাকে দেখা যায না এবং দিনেব বেলায তাকে দেখবাব আশাও কেউ কবে না।

ফল দাঁড়াল এই, প্রথমতঃ নরহবির বাড়িব সুমুখ দিযে লোকে রাত্রে পথ-চলাই ছেড়ে দিল। দ্বিতীযতঃ, হবু-ভাড়াটিযাবা ক্ষেতু মল্লিককে একেবারেই বযকট কবল। বিনা ভাড়াতেও নবহরিব বাড়িতে বাস কববার মত লোকও আব পাওযা যাবে ব'লে মনে হয না।

অবস্থা যখন এইবকম, ঠিক সেই সমযে তান্ত্রিক ভট্টাচার্য এসে বাসনা প্রকাশ কবল, "ক্ষেতুবাবু, নরহবিদেব বাড়িখানা আমি ভাড়া নিতে চাই।"

নিজের কানকেও বিশ্বাস কবতে না পেবে ক্ষেতু মল্লিক বলল, "তাই নাকি?"

"—ক্ষেতুবাবু! আমি হচ্ছি তন্ত্রসিদ্ধ মানুষ, বৈষ্ণবেব প্রেতাত্মা আমাকে দেখলেই ভযে পিছটান দেবাব পথ পাবে না।"

ক্ষেতু মল্লিক তাড়াতাড়ি বলল, "ঠিক বলেছ ভট্টাচার্য'। তোমার সঙ্গে আমিও একমত।"

"—কিন্তু আমি হচ্ছি গবীব, মাসে ত্রিশ টাকাব বেশি ভাড়া দেবার শক্তি আমাব নেই।"

—"বেশ, তাই।"

।। পাঁচ ।।

নরহরির বাড়িতে এসে জাঁকিয়ে বসল ভৈরব ভট্টাচার্য। সত্য-সত্যই মনে মনে তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা কিছুতেই শাক্তের নিকটবর্তী হবার সাহস প্রকাশ করতে পারবে না।

যখন প্রথম দুই রাত্রির মধ্যে নরহরির চৈতন্যচুটকি পর্যন্ত দেখা গেল না। ভৈরব তখন পাড়ার বাড়িতে গিয়ে তন্ত্রের অপূর্ব মহিমা সম্বন্ধে জোরগলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

তারপরই এল অমাবস্যার রাত্রি।

দোতলার একটি ঘরে পূজার উপকরণ নিয়ে আসনাসীন হল ভৈরব ভট্টাচার্য। নবহরির ভয়ে পথ নির্জন, কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকাব বাত, ঘরের ভিতরে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের টিমটিমে আলো।

ভৈরব একমনে দুই চক্ষু বুজে মন্ত্র জপ করছিল।

আচমকা একটা বিকৃত, অনুনাসিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ভৈঁরঁব, এঁকচাঁল দাঁবাঁ খেঁলবেঁ ভঁয়াঁ?"

ভয়ঙ্কর চমকে গিয়ে ভৈরব চোখ খুলেই দেখে, ঘরের দরজার কাছে পা থেকে গলা পর্যন্ত ধবধবে সাদা কাপড়ে মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং নরহরি ছাড়া আব কেউ নয়। ভৈরবই সব চেয়ে বেশী চিনত নরহরিকে, তার চোখের ভ্রম হবার জো নেই।

তারপর আর কিছু নয়, বিরাট এক আর্তনাদ এবং ভৈববের ভূমিতলে পতন ও মূর্চ্ছা।

।। ছয় ।।

ক্ষেতু মল্লিক হতাশ ভাবে স্থিব করল, ঐ ভূতুড়ে বাড়িখানা ভেঙে ফেলে একেবারে নতুন বাড়ি তৈবি কববে।

কিন্তু হঠাৎ যখন শিল্পী প্রমোদ রায় এসে নরহরির বাড়িখানা ভাড়া নিতে চাইলে, তখন ক্ষেতু মল্লিকের চেয়ে বিস্মিত লোক পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না বোধ হয়।

প্রমোদ বলল, "কলকাতায় খালি বাড়ি দুর্লভ, অথচ বাড়িওয়ালার হুকুমে আব এক হপ্তাব মধ্যেই আমাকে উঠে যেতে হবে। সুতরাং আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন তো?"

ক্ষেতু মল্লিক বলল, "বেশ বাবা, আমি বেশি ভাড়াও চাই না, তুমি মাসে পঁচিশটি টাকা দিও।"

"তাহ'লে এই পঁচিশ টাকা অগ্রিম নিয়ে তিন বছরের কড়ারে আমাকে চুক্তিপত্র লিখে দিন।"

—"আচ্ছা।"

পাশের বাড়িতে উঠে যাবার জন্যে প্রমোদ নিজের 'ষ্টুডিয়ো'র ছবি ও প্রতিমূর্তিগুলোকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করেছে, এমন সময়ে তার স্ত্রী নমিতা এসে ভয়ে ভয়ে বললে, "ওগো নরহরিবাবুর বাড়িতে গিয়ে আমি থাকতে পারব না।"

"—কেন?"

—"কেন তা কি তুমি জানো না?"

প্রমোদ হাসিমুখে নমিতার হাত ধ'রে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একখানা সাদা চাদর একধারে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, একটা খড়ের কাঠামোর উপরে বসানো রয়েছে নরহরির রং-করা মাটি দিয়ে গড়া মুখমণ্ডল।

নমিতা হতভম্ব।

প্রমোদ বলল, "আমি হচ্ছি ভাস্কর, নরহরির মুখ আমি অনায়াসেই গড়তে পেরেছি। পাঁচিল টপকে পাশের বাড়িতে যাওয়াও আমার পক্ষে কঠিন হয় নি। আমাকে সাহায্য করেছে আবছা রাত মানুষের স্বাভাবিক ভয় আর কুসংস্কার।"

অদ্ভুত ভূতের গল্প

সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

ভূতের গল্প তোমবা অনেক পড়েছো, অনেক শুনেছো—এ ভূতেব গল্পটি মোটেই সেগুলিব মতো নয়। এ হলো একটি অদ্ভুত ভূতের গল্প। আমাব নিজের কানে শোনা।

গঙ্গার ধারে গ্রাম। গ্রামে বহু লোকেব বাস—গ্রামে সকলের বাড়ি বাগান পুকুব আছে যেমন, তেমনি আছে বনজঙ্গল, ঝোপঝাপ, শ্মশান, গঙ্গাযাত্রীব ঘব—তাছাড়া ইস্কুল পাঠশালাও আছে।

এই গ্রামে গঙ্গার ধারে দোতলা বাড়ি—বহুকাল পড়ে আছে—গ্রামের লোক বলে ভূতেব বাড়ি। এই গ্রামে বাস কবতো ঠাকুবদাস চক্রবর্তী। তার অনেক টাকা। সে ছিল দারুণ কৃপণ। গ্রামের কাবো সঙ্গে মিশতো না—পাছে কেউ টাকা ধাব চায়। কাবো বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতো না—পাছে তার নিজেব বাড়িতে কাকেও কোনো কাজে কোনো দিন নিমন্ত্রণ করতে হয়। গ্রামেব লোকে তাব নাম কবতো না—তাব ছায়া দেখলে সরে যেতো—মুখ দেখলে, কে জানে সেদিন কি বিপত্তি ঘটবে!

তার স্ত্রী ছিল ছেলেমেয়ে ছিল—তারা একরকম না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মবে গেল।

তার পরে ঠাকুরদাস মারা গেল—মারা গিয়ে ভূত হয়ে সে ঐ বাড়িতে বাস করছে। সে মারা যাবার পর তার একটি ছেলে দেবীদাস ছিল বেঁচে—কিন্তু বাবা-ভূতের দৌরাত্ম্যে সে-বেচারীও -বাড়িতে বাস করতে পারলো না, —কোথায় একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে—গ্রামের মানুষজন আজ বিশ বাইশ বছরেও তার কোনো পাত্তা পায়নি।

সেই থেকে ও-বাড়ি এমনি পড়ে আছে . . . বাড়িব দরজা-জানালা কপাট ভেঙ্গে খসে পড়ছে—বাগান যেন জঙ্গল . . . . . শুধু বাগানের মধ্যে যে পুকুর ছিল. . . জল শুকিয়ে পুকুরের এতবড় বুকখানা খাঁ খাঁ করছে! ও-বাড়িতে কত মানুষ তাবপর বাস করতে গেছে—পুরো একটা রাতও কেউ থাকতে পারেনি। নির্মেঘ আকাশ হঠাৎ বাড়িব মধ্যে ঝড়েব দমকা বেগ—প্যাঁচার ডাক, ছোট ছেলের ককানি কান্না—বন্ধ দবজা জানলা দুমদাম শব্দে খুলে যায়, আর সারা বাড়িতে গট গট খড়ম-পায়ে মানুষ চলার শব্দ' তাব উপরও যারা বাড়ি ছেড়ে যায়নি, —তাদের পা ধরে হিড় হিড় করে টানা-সিঁড়ির উপব থেকে দুম করে নীচেয় আছড়ে ফেলা . . . এমনি নানা দৌবাত্ম্য।

শেষে এমন ব্যাপার হলো ও বাড়িতে যাওয়া নয়, বাত ন'টাব পব ও বাড়ি আব বাগানেব ধার দিয়ে মানুষ জন রাত্রে চলতে পাবে না। ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়া বাদুড চামচিকে এসে নাকে মুখে ঝাঁপটা মেবে সবে যায়.... গাছের ডাল মডমড় শব্দে নীচে হেলে প'ড়ে পথ আটকায়—সে ডালের পাশ কাটিযে চলতে গিয়ে গাঁয়ের অমন জোযান মানুষ তিনকড়ি—ডাল থেকে দুটো ফ্যাকড়া বেবিয়ে চিমটের মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিযেছিল প্রায় বিশ হাত দূবে . সে আছাড়ে তিনকড়িব পা ভেঙ্গে দু'টি মাস তাকে বিছানায পড়ে থাকতে হযেছিল।

তারপব একবাব—বাগানের মধ্যে ছিল পথের দিকে বড জামরুল গাছ. পথে দাঁড়িয়ে আঁকশিব খোঁচা দিলে ঝরঝর করে পড়ে একবাশ জামরুল . . স্কুলের ছেলেবা একদিন শনিবাবে দেড়টাব সময ছুটি হলে দল বেঁধে এসে পথে দাঁড়িয়ে ঐ গাছেব ডালে আঁকশি লাগিয়ে ডাল নাড়া দিয়েছিল—যেমন ডালে নাড়া দেওযা, অমনি গাছেব দুটো ডাল দু'দিক থেকে নেমে ছেলেদেব পিঠে পটাপট তাবা যে কবে পালিয়ে এসেছিল, তা আব বলবাব নয়!

শুধু তাই? বাগানের ওধারে নদী একদিন বাত্রে বাগানেব গা ঘেঁষে নদীতে নৌকো নিয়ে আসছিল বনমালী মাঝি—ওপাব থেকে সওযাবি নিয়ে যেমন ঐ চক্রবর্তীব বাগানের গাযে নৌকো আসা হঠাৎ নৌকোব সামনে জলেব বুকে কি একটা ভবী পদার্থ পডলো সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ ওঠ' আব সেই ঢেউযেব দোলায় নৌকো উল্টে বনমালী পডলো জলে—সওয়ারি পড়লো ডাঙ্গায় ছিট্‌কে—পড়েই অজ্ঞান। বনমালীকে পাওযা গিযেছিল ও-জাযগা থেকে আট মাইল দূরে নদীর ঘাটে বেহুঁশ, অজ্ঞান। সকালে ঘাটে যাবা এসেছিল চান কবতে, তাবা দেখে বনমালীকে তোলে—তুলে সেবায পবিচর্যায তার জ্ঞান করায়। জ্ঞান

হতে বনমালীকে বলেছিল—বাপরে—চক্কোতি-খুড়ো আমাকে জলে ডুবিয়ে দিতে দিতে এ ঘাটে ফেলে দিয়ে যায়। সওয়ারির কোনো পাত্তা মেলেনি—নৌকোখানা পাওয়া গিযেছিল চক্রবর্তীর বাগানের নীচে...... ডাঙ্গায় উল্টানো অবস্থায়। ...

তারপর.. ..

ওপারে ছিল ভুলো আর কানু—দাগী সিঁধেল চোব। তাবা পুলিশকেই ভয় কবে না, তা ভূতকে করবে। সকলেব বিশ্বাস চক্রবর্তীর ছিল বহুৎ টাকা ... সে টাকা কোনো ব্যাঙ্কে সে কোনোদিন রাখেনি—বুকের হাড়-পাঁজরার মতোই সে টাকা কৃপণ চক্রবর্তী বুকে করে রাখতো.... . যে ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, সে যে একটি পয়সা পাযনি তা তাব দুর্দশা দেখে সকলেই বুঝেছিল। সেই ভুলো আর কানু ঠিক করলো—চক্রবর্তীব বাড়িতে হানা দিযে তাব সেই টাকা করবে আত্মসাৎ!

অতি নিঃশব্দে গোপনে তারা এসে ও-বাড়িতে একদিন রাত্রে আস্তানা নিযেছিল. .. তাদেব হাতে সিঁধ-কাঠি এবং আরো কি-কি সব যন্ত্র। গভীব বাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে তাবা দুটো ঘরেব মেঝে খুঁড়ে কিছু না পেয়ে দোতলার যে ঘরে চক্রবর্তী মারা গিযেছিল, সেই ঘবেব মেঝে খুঁডছিল—দু' পাঁচ মিনিট তারা শাবলের ঘা মেরেছে—ঘরেব দরজা বন্ধ . হঠাৎ ঘবেব দবজা গেল খুলে—হুড়কো আঁটা দরজা. দড়াম শব্দে সে দরজা গেল খুলে—দু'জনে পেছনে চেযে দেখে—চক্রবর্তী খুড়ো—গাযে মাষ নেই, শাঁস নেই, —মুখখানা শুধু আছে... কঙ্কালেব উপব চক্রবর্তীব মুণ্ডু বসানো।

কঙ্কাল এলো এগিযে . এসে কথা নয, বার্তা নয়—দু'টি হাডেব হাতে দু'জনেব টুঁটি টিপে—জানালা খুলে দু'জনকে দিলে ঝপ্ কবে নীচে বাগানে ফেলে। পবেব দিন সকালে কেষ্টব জ্ঞান হতে চোখ মেলে সে দেখে, বাগানে পড়ে আছে. পাশে ভোলা. সে তখনো অজ্ঞান-অচেতন!

উপায? কেষ্ট কোনো মতে বেবিয়ে এসে লোকজনকে এ খবব দেয—তাই তো গাঁযেব লোক জানতে পাবলো এ ব্যাপাব! সকলে এসে ভোলাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে দিযে আসে—দু'দিন পরে ভোলাব চেতনা হলো—কিন্তু সে পাগল হযে গেল। দু'চোখে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি . আর থেকে থেকে শুধু বলে চক্কোত্তি-মশাই।

তাদেব সিঁধ-কাঠি আর যন্তর-তন্তর—সে গুলোব কি হলো, কেউ জানে না। বাড়ির মধ্যে ঢুকে কেউ তাব সন্ধান নেবে—এমন পরোযা গাঁযে কাবো নেই। এমনি কত গল্প যে চলে আসছে ও-বাড়ির সম্বন্ধে— কত কাল ধরে, তার আর সংখ্যা হয় না। এখন বলি, সদ্য ঐ চক্রবর্তী মশাযের যে গল্প শুনেছি...

তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই সেই গাঁয়ের মাতব্বরেব দল ঠিক কবলেন ধুমধামে স্বাধীনতা-দিবস পালন কববেন। মস্ত উৎসব হবে—কোনো মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীকে এনে মহা ধূম বাধাবেন। গ্রামেব ছেলেবা কলকাতাব কলেজে পড়ে—তাবা বললে—নাট্যাভিনয়

কববে—তিন-তিন বাত্রি ধরে অভিনয—তিন রাত্রে তিনখানা নাটকেব অভিনয়! ফীমেল পার্টে নামাবার জন্য কলকাতা থেকে থেকে আনা হয়েছে দুটি বন্ধুকে— সাত্যকি আব অমব সিঙ্গীকে! তাবা নাকি খুব ভালো ফীমেল পার্ট কবে!

ঠিক হলো রিহার্শাল হবে ঐ চক্রবর্তীর পোড়ো বাড়িতে। মাতব্ববা মানা করলেন— ভয় দেখালেন। কিন্তু ছেলেব দলসে কথা গ্রাহ্য কবলো না—তারা বললে—ভূত! ভূত স্রেফ্ কুসংস্কার।

ভূতেব নাম শুনে অমর সিঙ্গী মেতে উঠলো যেন! সে বললে—ভূত যদি থাকে তাকে দেখতে চাই। ভূতেব গল্পই শুনে আসছি—চোখে কখনো দেখিনি। এখানে যদি সে সুযোগ পাই

মাতব্ববা মানা কবলেন—বললেন, একে একালেব ছেলে—তাব উপরে স্বাধীন দেশ— এবা মানুষকেই মানতে চায না তা ভূতকে মানবে! তবে সাবধান ..... আমবা নজব বাখবো।

চক্রবর্তীব বাড়ির বৈঠকখানা তারা সাফ কবিয়ে সেখানে পাতলো অমব সিঙ্গী আব সাত্যকি আস্তানা। তাবা অতিথি—তাদেব মান এবং মন বাখতে গাঁযের ছেলেবাও বললে— আমবাও ওখানে থাকবো—শুধু নাইতে-খেতে বাড়ি আসা। তারপব বাত্রে বিহার্শাল.

একখানা নয—তিন-তিনখানা নাটকেব বিহার্শাল। সব কখানাই জাতীয়তাব উদ্বোধক ঐতিহাসিক নাটক। সকলেই বীর্যশৌর্য দেখাতে চায—যাব গলা যত চড়ে—সেদিকে সকলেব প্রাণপণ সংগ্রাম—হ্যাঁ, বীতিমত সংগ্রাম চলেছে।

বিহার্শাল চলেছে—হঠাৎ সে ঘরের দবজায চক্রবর্তীব কঙ্কাল—কঙ্কালেব ঘাড়ে চক্রবর্তীব মুণ্ড সকলে দেখলো. দেখে অমব সিঙ্গী বললে—কে মশায—বহুরূপী সেজে দেখা দিলেন এসে! দু'চারজন গাঁযেব ছেলে বলে উঠলো—তুমিই কিপ্‌টে চক্রবর্তীর ভূত! বটে।

সাত্যকি বললে—সবে পড়ো আমাদেব রিহার্শালে বাধা দিযো না।

কঙ্কাল নিথব নিস্পন্দ। অমব সিঙ্গী বললে—যাও এখানে তোমাব কিছু হবে না।

সকলে জোব পেলো মনে—বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভাগো।

অমব সিঙ্গী বললে—তোমাব অনেক গল্প শুনেছি, বাপু—ওসব গল্প গাঁজা—এখানে তোমাব গাঁজা চলবে না। সবে পড়ো .

কঙ্কালেব দাঁতেব পাটি মুক্ত হলো—এবং মুখে খোনা ভাষায আওযাজ বেরুলো— আমি কাবো ঘেঁস সইতে পাবি না—কোনো কালে না—বেঁচে থেকে পাবিনি—মবে গিযেও পাবি না। তোমবা হৈ চৈ চিৎকাবে কেন আমার শান্তি ভঙ্গ কবচো?

অমব সিঙ্গী বললে—তার কারণ, যে মরে সাফ হয়ে গেছে, এ পৃথিবীব সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্ক থাকতে পাবে না। মবে গিযেও তুমি যদি এ বাড়ি আঁকড়ে থাকতে চাও, তাহলে তোমাব সে কাজ হবে বেআইনী—যাব নাম ট্রেসপাশ। অতএব এ বাড়িতে এখন তোমাব কোনো অধিকাব নেই থাকবাব—তুমি সবে পড়ো।

কঙ্কাল বললে—কিন্তু.....

বাধা দিয়ে সাত্যকি বলে উঠলো—কিন্তু-টিন্তু চলবে না। আমরা তোমাকে মানি না—তুমি যাও। নাহলে সেই মামুলি দাওযাই—আমরা কোরাসে রাম-নাম গান করবো। 'রঘুপতি-রাঘব রাজা রাম'.....

কঙ্কাল চুপ—হঠাৎ মনে হলো, যেন মোটরের টায়াব ফেটে হুশ কবে বাতাস বেরুলো—তেমনি শব্দ! অর্থাৎ কঙ্কাল নিঃশ্বাস ফেললো—নিরুপায়ের মত নিঃশ্বাস!

তারপর কঙ্কাল বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য! রাত দুটো পর্যন্ত চললো রিহার্শাল তারপর নিদ্রা.. নিশ্চিন্ত গাঢ় নিদ্রা।

পরের দিন সকালে এ কথা কিন্তু এরা কারো কাছে প্রকাশ করলো না—বাত্রি আসতে বিহার্শাল আবার...

জোর রিহার্শাল চলেছে.. তার মধ্যে হঠাৎ সেই কঙ্কালেব আবির্ভাব!

সকলে চেয়ে দেখলো! অমব সিঙ্গী বললে—আজ আবাব এসেছো জ্বালাতন কবতে! কালকেব ও দাওযাই-যে হলো না—এঁ্যা !

কঙ্কালের দাঁতেব পাটি নড়লো—কঙ্কাল বললে—বেশ হুঙ্কার দিয়েই বললে—কাল ভালো কথায বলেছিলুম—শুনলে না! দেখাবো নাকি মজা?

অমর সিঙ্গী তেড়ে গেল তার সামনে—তার হাতে বাজার তলোয়ার—সেই তলোযাব উঁচিয়ে বললে—শুধু তো ক'খানা হাড! এই তলোযাবেব চোট মেরে ও গুলো খশিযে টুকবো টুকবো কবে দেবো।

কঙ্কাল বললে—জানো, আমি ভূত।

সাত্যকি বললে—আমরা ভূত মানি না। তোমাদের নামে ভয পেয়ে অনেকের অনেক সর্বনাশ হয়েছে! তোমার ছেলে বাড়ি-ছাড়া—দেশছাড়া। জানো, তোমাদেব আমরা ভেল্কি নাচ নাচাতে পারি।

অমব বললে—যাও এখান থেকে। আমাদের ভয দেখিয়ে ফল পাবে না। আমবা এ বাডি ছাডবো না। জোর যার, মুলুক তার! চাও যদি তো ফাইট কবতে পারি—

সাত্যকি বলে উঠলো—এ্যাকটিংয়ের ভঙ্গীতে ঘুষি পাকিয়ে—

শোন্ রে বর্বর, চলে যা এখান থেকে—

নহিলে এ বজ্রমুষ্টি—ইহার আঘাতে

বফা কবে দেবো তোর দফা!.....

তার এ্যাক্টিং শেষ হলো না—কঙ্কাল হলো অদৃশ্য!

পবের বাত্রে বিহার্শালেব সময় আবার তার আর্বিভাব! এরা কিছু বলবার আগেই কঙ্কাল বললে—অত্যন্ত কাকুতি ভরা কণ্ঠে—(অবশ্য খোনা খোনা ভাষা)—দয়া কবে আমাকে মুক্তি দাও। আমি এ গোলমাল সযে থাকতে পারছি না।

অমর সিঙ্গী বললে—না পারো, পথ দ্যাখো। এ বাড়িতে আর থাকা চলবে না তোমার!..... আজ শেষ বারের মতো তোমাকে বলছি—ফের যদি এসে দেখা দাও—তা' হলে কঙ্কাল চূর্ণ করে পুড়িয়ে দেবো।—

তারপর থেকে এ বাড়িতে চক্রবর্তীর ভূতের আর দেখা নেই। গাঁয়ের সকলে শুনলেন এ কথা। তাঁবা পরখ করলেন এবং থিয়েটার চুকে গেলে তাঁরা নোটিশ ছাপিয়ে দিলেন—ঠাকুরদাস চক্রবর্তীব নিরুদ্দেশ ছেলে দেবীদাসের নামে—

দেবীদাস চক্রবর্তী--যেখানেই তুমি থাকো—এ বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্র গ্রামে ফিরিয়া তোমার পৈত্রিক ভিটা দখল করিবে। এ বাড়ি এখন ভূতলেশহীন—সম্পূর্ণ নিরাপদ জানিবে!

জানি না, এ বিজ্ঞাপন দেবীদাস চক্রবর্তীর নজরে পড়েছে কিনা এবং সে এ বাড়িতে ফিবে এসেছে কিনা! তবে খবব নিয়ে জেনেছি—সে বাড়িতে বা বাড়ির ত্রিসীমানায় ভূতের ছায়াও সেই থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আর দেখেনি!
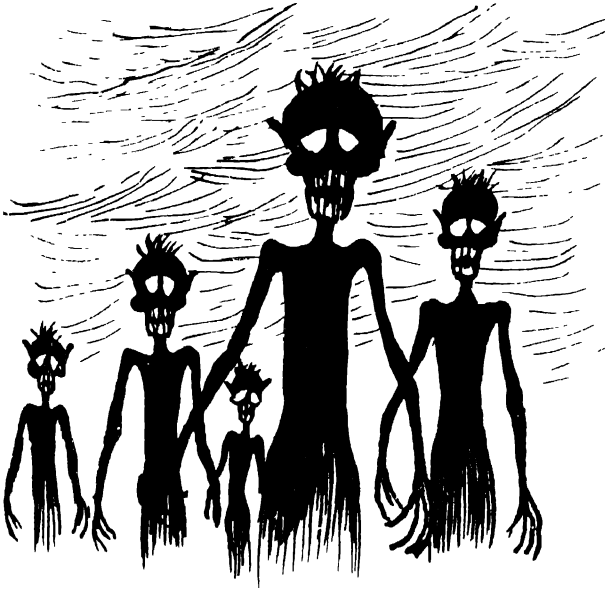
পোড়া ছায়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তখনো নীলা চেয়ে থাকে। ঝিলমিল ঝিলমিল করতে করতে দেয়ালে ছায়াটা তখন স্পষ্ট হয়েছে। আকৃতি বোঝা যায় মূর্তিতে যে বিকৃতি ঘটেছে তাও বোঝা যায়। ফোকাস মোটামুটি ঠিক হয়েছে ধরা চলে সেটা চোখের না ছায়াটার তা অবশ্য বলা কঠিন এ অবস্থায়।—রাত দুপুরে চোখের সামনে যখন একটা ভূত রূপ নিচ্ছে তখন ওসব হিসাব কেই বা করে।

এদিকে আধপোড়া জানলা ঘেঁসে ছায়াটা রূপ নিচ্ছিল—জানালা দিয়ে নিরাকার অবস্থায় ঘরে ঢুকে যেন আকার ধারণের চেষ্টা। ধীরে ধীরে দেয়াল বেয়ে ডাইনে সরতে থাকে। অথবা দেওয়ালটাই যেন তার গা বেয়ে ওদিকে সরে যায়। ওদিকে আর একটা আধপোড়া জানালা। দুটি জানালার মাঝামাঝি জায়গায় মূর্তিটা স্থির হয়। দেয়ালে লেপ্টেই আছে ছায়ার মত অথচ দেয়াল ছেড়ে বেরিয়েও আছে সামনের দিকটা জ্যান্ত মানুষ দেয়ালে পিঠ হয়ে দাঁড়ালে তার রক্ত মাংসের শরীরটা যেমন থাকে। আধপোড়া জামা কাপড়ের কালচেমার টুকরো গা থেকে ঝুলছে। সারা গায়ে পোড়ার দাগ ঝলসানোর থাগ থাগ ফোস্কা। মাথাটা হেট একটু ফাঁক হয়েছে। চাপ চাপ জমাট বাঁধা কালো রক্ত।

নীলা চেয়ে থাকে। ভূত দেখলে চোখের সামনে তিন চার হাত তফাতে সত্যি সত্যি

সত্যিকাবের ভূত দেখলে মানুষ চেঁচায় গোঁ গোঁ করে, মূর্ছা যায়—এসব স্রেফ্ মিছে কথা। ভয়টয় যা হবার তা হয় পরে। নড়ে না চড়ে না শব্দ করে না, অবশ্য আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই বলে অচেতন হয় না কিন্তু চেতনা থাকলে আর ভূত দেখবে কি করে? শরীরে ইলেক্‌ট্রিক কারেন্ট চালিয়ে দিলে যেমন হয়, বেশ টের পাওয়া যায় কি ঘটছে অথচ শরীরটা অবশ হয়ে থাকে, ভূত দেখলে ঠিক সেরকম হয়।

দুপাশে আধপোড়া জানলা, দেয়ালে নানারকম কালচে কালচে দাগ, ছায়ামূর্তিটা যেন তাব নকল করে মিশে গিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। জন্তু-জানোয়ার যেমনি বনে-জঙ্গলে রঙ ছায়া ফোঁটা ফুটকি লাইন দিয়ে গা সাজিয়ে গা-ঢাকা দেবাব চেষ্টা করে। ছায়াটা তাই ভূতের চেয়ে ভয়ংকর।

হঠাৎ ছাযাটা মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ নীলার তাই মনে হয়, সামনে ছিল, আচমকা দেখা গেল নেই! আসলে ভূত যারা দেখে ভূতের অন্তর্ধানটা তাদের কাছে এই রকম ঠেকে। ভূত আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলেও সেটা তারা টের পায় না। ভূত বা ভূতের আর্বিভাবের ভূতের শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে গেলে আরেকটা শক লাগে, তা হল ভূত দেখার শেষ। দুটো শকের মাঝামাঝি সময়টা হল ভূত দেখা পিরিয়ড।

গলা ফাটিয়ে প্রাণপণে একটা চিৎকার করার জন্য নীলা মুখে করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কানের কাছে পাশে আচমকা বিকট একটা আওয়াজ ওঠায় আঁতকে উঠে সে মূর্ছা গেল। এক পলকের ব্যাপার প্রফুল্লবাবুও আবিষ্ট হয়ে ছায়ামূর্তিটা দেখছিলেন, ছাযা মিলিয়ে যাবার পর তিনিও স্বভাবতই গলা ফাটিযে আর্তনাদ করেছেন। নীলার চেঁচিয়ে ওঠার সিকি সেকেন্ড আগে হাওযায তার উৎকণ্ঠ আওয়াজে চম্‌কে নীলা মূর্ছা গেছে। নীলা আগে চেঁচালে প্রফুল্ল বাবুও হযতো জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়তেন। ভূত দেখাব পব এবকম হয়।

নীলার মা ঘুমোচ্ছিলেন। নীলাব ছোট ভাই বলাই স্বপ্ন দেখছিল বন্যায ট্রেন আটকে আছে, গাড়ি প্রায ডুবডুবু, সে গাড়িব ছাদে বসে আছে। দুজনেই ঘুম ভেঙ্গে চেঁচামেচি সুরু কবে।

নীচের তলাব ভাড়াটেদের ছেলে অনন্ত লণ্ঠন হাতে খবর নিতে আসে। তাবাও প্রফুল্লবাবুদের সঙ্গেই আজ তিন দিন এ বাড়িতে ভাড়াটে এসেছে। বাড়ির দরজা জানালা যেমন সারানো হয়নি ইলেক্‌ট্রিক্ লাইনও ঠিক করা হয়নি। বাড়িওলা কথা দিয়েছে শীগ্‌গিব হবে। পুরোনো ভাঙ্গাচোরা লণ্ঠন আর মোমবাতি দিয়ে চালাতে হয়।

মাথায় জল দিতে না দিতে নীলার জ্ঞান হয়। ভূতের ভয়ে মূর্ছা যাওয়াটা ঠিক অজ্ঞান হওয়া নয় তফাৎ আছে। মূর্ছা গেলেও একটু জ্ঞান থেকে যায়। রাত দুপুরে চুল ভেজানোর অনিচ্ছা থেকে পুবো জ্ঞান ফিরে আসে চট্ করে।

ভূত? দু'জনেই দেখেছেন? দেয়ালে-—অনন্ত চিন্তিত ভাবে একটা ট্রাঙ্কে বসে, এবড়ো,-খেবড়ো দাগ ধবা দেযালটাব দিকে চেয়ে বলে, ভূত অবশ্য চোখের ভুল। যে যেখানে ভূত দেখেছে সেই চোখে ভুল দেখেছে। ভূত মানেই ভুল দেখা।

নীলা চটে যায়। আপনি বলতে চান আমরা কিছু দেখিনি! মিছে বলছি? আমরা বলে নিজের চোখে—

তাই বললাম আমি? অনন্ত তাড়াতাড়ি বলে ভূত আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন। নইলে চেঁচাবেন কেন? মূর্ছা যাবেন কেন? ভূত মানে কি আমি তাই বলছিলাম। মানে আছে বলা মানেই ভূত আছে বলা। যা নেই তার মানে থাকে?

নীলা ঢোক গেলে। প্রফুল্লবাবু একটু ভীত চোখে তাকান অনন্তর দিকে। ছেলেটার মাথায় ছোট ছোট কদম ছাঁট চুল আর এত রাত্রে চোখে রোদের ঝাঁঝ নিবারণী রঙীন কাঁচের চশমা আঁটা, এতক্ষণে যেন প্রথম নজরে পড়ে। গত তিন দিন অনেকবার অনন্তকে অবশ্য দেখেছেন, কয়েকবার ওপরে এসে ঘর গুছিয়ে বসতে এটা ওটা সাহায্যও তাদের করেছে, আজ বিকেলে চাও খেয়েছে তাদের সঙ্গে। তবু—এখন বাতদুপুর কিনা ছায়ামূর্তি দেখার ঠিক পরে কিনা।

—আমার একটা কথা বিশ্বাস করবেন?

নীলারা জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

এসব জিনিস, মানে ভূতটুত, অনন্ত মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, এক রাত্রে দুবার দেখা যায় না। কেউ কোনদিন একরাত্রে দুবার ভূতের ছায়াটুকু কখনো দেখেনি। আপনারা আজ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোন।

নীলা বলে, ভয় করবে।

ভয় করাটা আশ্চর্য নয়। দাঙ্গার সময় ও বাড়িতে হানা পড়েছিল, দু'জন খুন হয়েছিল, আধপোড়া বাড়িটা বহুদিন খালি পড়েছিল। দরজা জানালা দেয়ালে মেঝেতে কত চিহ্ন কত প্রমাণ আঁকা আছে। বাড়ি মেলে না, রাস্তায় থাকা যায় না, তাই তারা বাধ্য হয়ে মেরামত চুনকামের আগেই বাড়িটা দখল করেছে। অনন্ত একাই আছে একতলায়, দু'চার দিনের মধ্যে অন্য সকলে এসে পড়বে।

অনন্ত বাকী রাতটা এ ঘরে এসে শুতে পারে না? প্রস্তাব শোনা মাত্র রাজী হয়ে অনন্ত নীচে থেকে বিছানাপত্র নিয়ে আসে। একবাক্যে এমন আগ্রহের সঙ্গে সে রাজী হয়, হুড়মুড় করে নীচে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে আসে, যে বেশ একটু খট্‌কা লাগে সবার মনে। ভূত চোখের ভুল। ভূতের মানে আছে। অনন্ত তাই ভূত মানে। মানে বলেই বোধহয় নীচের তলায় একলা শুয়ে বাকী রাতটা কাটতে তার ভয়ও করে। তা হোক। সেটা দোষের নয়। ভূত না থাক, ভূতের ভয় কি তাহলে থাকবে না। মানুষের?

সকালে দিনের আলোয় মনে হ'ল বৈকি যে রাত্রে একটা বাড়াবাড়ি হয়েছিল। সম্ভবত ছায়াই দেখেছিল, ছায়ামূর্তি নয়। ভূতের ভয়ে না হোক, দিনের বেলাও গা ছম্‌ছম্ করে এ বাড়িতে। যে বীভৎস কান্ড হয়ে গেছে বাড়িতে, এক মুহূর্ত ভুলবার উপায় নেই। কে জানে দু'জন কোন্ ঘরে খুন হয়েছিল, একতলায় না দোতলায়। বাড়িটা তাড়াতাড়ি মেরামত করা দরকার।

প্রফুল্লবাবু বাড়িওলার কাছে দরবার করতে গেলেন। বাড়িওলা গম্ভীরমুখে বললে, হবে

মশায় হবে। বলেছি যখন, হবে। কি বাজার দেখেছেন তো? না মেলে সিমেন্ট—

—আমরা সারিয়ে নি। ভাড়া থেকে কাটা যাবে।

—হবে মশায়, হবে। আনাড়ি লোক, দশগুণ দামে মাল কিনে বাড়ি সারাবেন, ঘাড়ে তো চাপাবেন আমার। ওই তো ভাড়া দেবেন—

প্রফুল্লবাবুর চোখ কপালে উঠে যায়, ঠিক যেন ভূত দেখেছেন। সে কি মশাই। হাজার টাকা সেলামী নিলেন, আধপোড়া ভাঙা বাড়ি তার তিনশো টাকা ভাড়া তাতে মন ওঠেনি?

বাড়িওলা সবিনয় হাসল, কি বাজারটা দেখেছেন তো?

অনন্ত বলে, নালিশ ঠুকে দিলে হয় ব্যাটার নামে।

প্রফুল্লবাবু বলেন, কচু হবে। বড় কর্তাদের খাতিরের লোক, ও ব্যাটা কি আইনের ধাব ধাবে?

অনন্ত ভেবে চিন্তে ক'সেব চুন কিনে আনে, নিজেই নীলাদেব ঘরেব যে দেয়ালে বাত্রে ভূতের আর্বিভাব হয়েছিল সেটা চুনকাম করে দেয়। ফল যা হয দেখে গা আরও ছমছম্ করতে থাকে সকলের। জানালা পোড়া, তিন দিকের দেয়াল আর সিলিং এ ধোঁযার দাগ তার মধ্যে এক দিকেব দেয়ালটা বিলকুল সাদাটে মেবে গেছে। চুন কামে সব দাগ ঢেকে গেলেও রক্ষা ছিলো, ভেজাল বাজে চুন, তাতে নীল পড়েনি। দাগগুলি সব সাবছা আবছা হযে উঁকি মারছে।

অনন্ত জোর দিয়ে বলে তাতে কি। ছাযাটা এলে চেনা যাবে।

বাত্রে খাওযাদাওয়া সেরে তাবা ভূতেব জন্যে প্রতীক্ষা কবতে বসে। কাল কেউ ঘডি ধবে টাইম ঠিক করে বাখেনি, তবে আন্দাজ সাড়ে বারোটার সময় ছাযাব আবির্ভাব ঘটেছিলঃ এগারোটাব আগেই চাবিদিক বেশ নিঃঝুম হযে আসে। সবে কিছুদিন হল দাঙ্গাহাঙ্গামা থেমেছে, পাডাটা এখনো ধাতস্থ হয়নি। অনন্ত লণ্ঠন নিভিয়ে দিতে গেলে গোল বেধে যায়। কেউ আলো নেবাতে রাজী নয়।

অনন্ত বলে, আলোতে কী ছায়া আসে?

নীলা বলে, কাজ নেই এসে।

মিছে তবে বসে থেকে লাভ কী?

না থাক লাভ, ঘর অন্ধকার করলে চলবে না। তর্ক চলতে চলতেই আপনা থেকে তর্কেব মীমাংসা দেখা দেয়। একটু একটু করে কমতে থাকে আলো। আপনা থেকে লণ্ঠনটা নিভে আসতে থাকে।

বড বড চোখ করে সকলে তাকিযে থাকে। সর্বাঙ্গে কয়েকবার শিহরণ বয়ে যায়। কমতে কমতে প্রায নিভে আসে কাঁচেব ভেতরে পল্‌তেব শিখাটা, তাবপর বাব কয়েক দপ্ দপ্ কবে একেবাবে নিভে যায়। কাঠ হয়ে তাবা বসে থাকে, এবার আব চুনকাম করা দেয়াল থেকে দৃষ্টি সরানো যায় না। বাইবের আলোছায়াব প্রতিফলনে অস্পষ্ট ছাযাছবির আঁচ পড়েছে দেযালে। সেগুলি স্থিব পডে না।

নীলা বলে অস্ফুটস্বরে, আমার ভয় করছে বাবা।

প্রফুল্লবাবুর আরও সে গা-ঘেঁষে বসে। নীলার মা আর ছোট ভাইও ঘেঁষে এসে জড়াজড়ি করে বসেছে। একজন আরেকজনেব হাত চেপে ধরে থাকে। চেপে চেপে সবাই নিঃশ্বাস ফেলে। নইলে নিঃশ্বাসের শব্দ অনেক দূরে ঝড়েব আওযাজের মত শোনায়। টাইম পিসটা টিক্‌টিক করে চলেছে। সময গুণে যেন এগিয়ে আনছে সেটাকে । তাবপর ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা চাপা অস্পষ্ট ঘরঘর ঘষড়ানো দাপড়ানোর মত আওয়াজ শোনা যায়—অনেক দূরের মোটরগাড়ির থামা যেন এই ঘরের মধ্যে ঘটছে। আওয়াজ ঘরে—গাড়ি যেন দূরে। সেই সঙ্গে এসে গেছে দেয়ালে ছায়ার ঝিলমিল ঝিলমিল আর্বিভাব। বেড়ে-কমে, নড়ে চড়ে নেচে নেচে ছায়া রূপ নিচ্ছে। ঘরের মধ্যে আওয়াজ হয় অনেক দূবে গ্যারেজের দবজা খোলার ; গাড়ি ব্যাক করিয়ে গ্যারেজে ঢোকানো। ছায়া আরো বেশী ঝিলমিল করে। ধীরে ধীবে রূপ নিতে নিতে সরে সরে দেয়ালেব মাঝামাঝি এনে স্থির হবার আগে একটু কেঁপে ওঠে।

না। আজ একটা নয়। শুধু দেয়ালে নয়। আরও চারটি ছায়ামূর্তিব নিঃশব্দে আবির্ভাব ঘটেছে। সকলে মোহাবিষ্টের মত চেয়ে থাকে। ছাযাগুলি এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়ায। ট্রাঙ্কটা তুলে নিযে যায়। সুটকেশটা, হাতবাক্সটা ঘড়িটা তুলে নিয়ে যায়।....

হংসভূত

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মেটাজীর সঙ্গে আমার পরিতোষের আর কালীচরণের দেখা হল।

লোকটি দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া, ধপধপে ফরসা, পরনে ধুতি অথচ মাথায় পারশীদের মতন টুপি অথবা ডোঙার মতন একটা বস্তু। বোঁ বোঁ ক'রে বাংলা বলেন।

কিছু দূরে কল্যাণ স্টেশনের কাছে পুনার এক শেঠ গর্ভনমেন্টের কাছ থেকে একটা জঙ্গল কিনেছেন। খুব সুন্দর জঙ্গল--পাহাড়-ঝরনা ইত্যাদিও আছে। কল্যাণ থেকে পুনায় যেতে হলে যে সব জঙ্গল পাহাড় ভেদ ক'রে যেতে হয় তারই খানিকটা আর কি। এই জঙ্গল কেটে সাফ ক'রে তিনি এখানে চাষবাস করছেন। সামান্য খানিকটা জায়গা সাফ ক'রে আপাতত চাষবাস শুরু করেছেন, পরে আস্তে আস্তে বাড়াবেন। দুই-একজন লোক এই জমির খানিকটা ক'রে ভাড়া নিয়ে নিজেরাও চাষবাস করছে। যাইহোক, এখানে নানা কাজের জন্য বিস্তর লোক খাটছে, মেটাজী সেখানে কিছু কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, আমরা তো তখুনি রাজী হয়ে গেলুম। মেটাজী বললেন—আমি শীগ্‌গিরই সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য সব বন্দোবস্ত ক'রে আসব।

এরপর আমরা রোজই খোঁজ নিই, কিন্তু শুনি যে, মেটাজীর সেখানে যাবার সুবিধা হয়নি।

প্রায় দিন পনরো পরে একদিন বললেন কাল সকালে নিয়ে যাবেন।

সংবাদটি পেয়ে আমরা যে কিরকম আনন্দিত হয়েছিলুম তা বোধ হয় না বললেও চলবে। উৎসাহের আবেগে রাত্রে আমাদেব ভালো ক'রে ঘুমই হ'ল না। খুব ভোরে উঠে স্নান ক'রে চা খেয়ে এলুম। তারপবে আমাদের ছেঁড়া কাপড়েব পুঁটুলিগুলি বেঁধে উপস্থিত হলুম।

যথাসময়ে কল্যাণে নেমে কিছুক্ষণ হেঁটে সেই জঙ্গলে এসে পৌঁছানো গেল। সামনেব দিকটা অর্থাৎ যেদিকটা লোকালযের দিকে সেদিক থেকে আবম্ভ ক'রে ভেতরের প্রায় আধ-মাইলটাক লম্বা ও আধ-মাইলটাক প্রস্থ জমি পবিষ্কাব ক'বে আবাদ কবা হচ্ছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকে সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা ভেতরেব দিকে গিয়ে একখানা পাতা দিয়ে ছাওয়া ঘবের সামনে এসে দাঁড়ালুম।

মেটাজী উচ্চৈস্বরে কয়েকবাব কি একটা ব'লে চীৎকার কবতেই ঘবেব ভেতব থেকেই জবাব দিযে বেবিয়ে এল একজন বেঁটে-মতো বেশ গুণ্ডা-গোছেব লোক, হাঁটুর ওপরে মালকোঁচা-মাবা ধুতি পবা, গাযে একটা ফতুয়াগোছের হাতকাটা জামা। জামাটাব সামনেব দিকে একটা বড তাপ্পি পকেট।

লোকটা কাছে এসে 'একবার আমাদেব আপাদমস্তক দেখে তাবপব মেটাজীব সঙ্গে কথা বলতে আবম্ভ কবল।

কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন আব আমবা তিনজনে তাঁদেব পশ্চাদনুসরণ কবতে লাগলুম।

জঙ্গলেব মধ্যে কিছুদূব গিয়ে বিবাট একটা ফাঁকা জাযগায উপস্থিত হলুম। দেখলুম, একদিকে অনেকখানি জাযগা নিযে কলাব বাগান কবা হয়েছে। বেঁটে কলাগাছ তাতে কাঁদি-ভর্তি বড বড মোটা কলা গাছ থেকে ঝুলে প্রায মাটিতে ঠেকেছে। আবও খানিকটা এগিযে দেখা গেল সেখানে চিচিঙ্গেব ক্ষেত কবা হযেছে--তিন চাব হাত লম্বা হাজাব হাজার চিচিঙ্গে উঁচু মাচা থেকে মাটিব দিকে ঝুলছে। বড বড মানুষেব সমান উঁচু ঘাসেব জঙ্গল দু'হাতে সবিযে তাব মধ্যে বাস্তা ক'বে মেটাজী ও ভুলু সর্দাব আগে চলেছেন। তাঁদের পেছনে আমবা চলেছি। সম্মুখে পিছনে আশে-পাশে মোটা মোটা বড় বড গাছ-- সে-সব গাছেব চেহাবাও কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি। এইসব গাছে জাহাজের শিকল মতন মোটা ও শক্ত পাকানো পাকানো লতা ঝুলছে। কোনো কোনো জাযগাব জঙ্গল এত ঘন যে, গাছেব মাথায মাথায ঠোকাঠুকি হয়ে আছে। কতদিন যে সেখানকাব জমিতে সূর্যালোক স্পর্শ করেনি, তার ঠিকানা নেই। জাযগাটা একেবারে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। এক জায়গায় দেখলুম, অনেকখানি জমি পবিষ্কাব ক'বে লাঙল দিয়ে চষা হয়েছে। পঞ্চাশ ষাটজন স্ত্রী-পুরুষে মিলে সেই জমি থেকে আগাছা ও পাথব ইত্যাদি বেছে

জায়গায় জড়ো করছে।

আমরা আসতেই তারা দাঁড়িয়ে উঠে অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। পুরুষগুলির গায়ে কোনো জামা নেই, কোমরে একখণ্ড বস্ত্র জড়ানো, তাতে কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে মাত্র। মেয়েদেব দেহেব উপরার্ধ একরকম নগ্ন বললেই চলে। কোমরে একটু বস্ত্র জড়িয়ে বেখেছে। পুরুষ কিংবা স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত রোগা। পুষ্টিকর খাদ্য তো দূবের কথা, দেখে মনে হয—কোনো রকমের খাদ্য তাদের পেটে পড়ে কি না সন্দেহ। সকলেই অদ্ভুত একরকমের দৃষ্টিতে বিশেষ ক'বে আমাদের তিনজনকে দেখতে লাগল।

এইখানে মেটাজী পেছনে ফিরে দাঁড়িযে আমাদের বললেন—এই এদেব সঙ্গে তোমাদেব কাজ করতে হবে। কাজ এমন হাতি-ঘোড়া কিছুই নয়—একটা বাচ্চা ছেলেকে বললেও সে করতে পারে।

এই অবধি ব'লে আবার তাঁরা কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন। আমাদেব সামনে ও পেছনে বিস্তীর্ণ অবণ্য, দক্ষিণে ও বামে ছোট পাহাড়েব সারি। মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী জঙ্গলের দুদিকে উঁচু পাথবেব দেওযাল গেঁথে রেখেছেন। এক এক জাযগায জঙ্গল সংকীর্ণ হযেগেছে—দু'দিকেব পাহাড অনেক কাছাকাছি হয়েছে। দেখলুম প্রায় সর্বত্রই এই পাহাডেব গা বেযে নিবন্তব জল ঝবছে—তাবই ফলে পাহাডেব গায়ে শেওলা জন্মেছে। কিছুদূর এগিয়ে গিযে এক জায়গায দেখা গেল একখণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—তারই ওপব দিযে একটা শীর্ণ জলধাবা এসে নিচে একটা ডোবার মতন সৃষ্টি হযেছে। মেটাজী আমাদেব বললেন—এই দেখ কেমন সুন্দব ঝবনা। এরা এর জল খায়।

আবও কিছুদূব অগ্রসর হবাব পর মনে হ'ল যেন এতক্ষণে আমবা গভীর জঙ্গলেব মধ্যে এসে পড়েছি। ছোট-বড় গাছ ও লতায মাথাব ওপব চাঁদোয়ার মতন একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি হওযায জায়গাটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকাব ও নির্জন ব'লে মনে হতে লাগল। এখানকাব পথও পরিষ্কাব নয়, বেশ বুঝতে পাবা গেল যে, এদিকে লোকজন বড একটা কেউ আসে না।

এইদিকে খানিকটা এগিযে যাবাব পব দূবে একটা বাডি দেখতে পাওয়া গেল।

মেটাজী পেছন ফিরে আমাদেব বললেন—ঐ দেখ তোমাদের বাডি। এমন জাযগায এমন সুন্দব বাডিতে লাটসাহেবও থাকতে পায না।

একটু এগিয়েই আমবা বাডিব কাছে এসে উপস্থিত হলুম। আমাদেব অজ্ঞাতসাবে প্রায় দশ-বাবোজন নাবী ও পুরুষ শ্রমিক যে আমাদেব অনুসরণ কবছিল তা আমবা টেরই পাইনি। এইখানে এসে দাঁডাতেই তারা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমাদের ভালো ক'রে দেখতে লাগল, কিন্তু সর্দার রক্তচক্ষু বার ক'রে বিকট চীৎকার কবে তাদের ভাষায় কি সব বলায় সকলেই ধীরে ধীবে ফিরে চলে গেল। সর্দার মহাশযেব এই বিকট আওয়াজ শুনে তাঁব মেজাজের কিছু পবিচয় পাওয়া গেল, তিনি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে অর্থাৎ আমবা যাতে বুঝতে পারি—মেটাজীকে বললেন—শুয়ারেব বাচ্চারা অত্যন্ত পাজি শযতান এবং অসম্ভব বকমেব চালাক। আপনাব সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে ডাণ্ডাটা ফেলে এসেছি—হাতে

ডান্ডা নেই—বুঝতে পেরেছে যে, এখন আর মারতে পারবে না—অমনি আমাদের পেছু পেছু এসেছে মজা দেখতে। কাজে কোনো রকমে ফাঁকি দিতে পারলে হয়।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বাড়িখানা ভালো করে দেখলুম। বেশ বড় পাথরের বাড়ি, অনেকটা গির্জা-ধরনের। মাটি থেকে প্রায় আড়াই তলা উঁচু পাথরের গাঁথনি ক'রে সেখানে ঘর বানানো হয়েছে। ঘরের চারিদিকেদরজার মতো বড় বড় জানালা। মেটাজী ও সর্দার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।—

বলা বাহুল্য, আমরাও তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করলুম।

ওপরে গিয়ে দেখলুম প্রকাণ্ড একখানি ঘর—যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া—ঠিক গির্জা ঘরের মতন। ঘরের মেঝে ও দেওয়াল কাঠের। দেওয়ালে চমৎকার ওয়াল-পেপার মারা। ঘরখানাকে মাঝে পার্টিশান দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। ঘরের পাশেই আলাদা ভিতর পরে তৈরী ছোট্ট একখানি ঘর। বেশ বুঝতে পারা গেল, এক সময়ে এই ঘরে কমোড ইত্যাদি থাকত।

মেটাজী বললেন—এই ঘরে সাহেবদের পায়খানা ছিল, তোমরা এইখানেই রান্নাবান্না কোরো।

মেটাজী আরো বললেন—আজ থেকেই কাজে লেগে যাও—একটা দিনের 'রোজ' কেন আর মারা যায়।

সেই বিরাট ঘরের এক কোণে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলিগুলো রেখে তখুনি তৈরি হয়ে নিলুম। মেটাজী ব'লে দিলেন—দেখ, ভোর ছ'টার সময় কাজে লাগতে হবে। বেলা এগারোটায় ছুটি পাবে। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে খেয়ে দেয়ে আবার বেলা একটার সময় গিয়ে কাজে লাগবে আর ছুটি পাবে বিকেল ছ'টায়। দুপুরে, ছুটির সময় জল-টল তুলে রাখবে। কারণ, বিকেলে ঘরে এসেই সিঁড়ির দরজা ভালো করে বন্ধ করে দেবে। তারপরে আর নিচে নামা চলবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—কেন মশায়?

তিনি বললেন—এ জাগয়াতে আবার সন্ধ্যের পর জানোয়ার বেরোয় বলে শুনেছি।

কি জানোয়ার বেরোয় সে-কথা জিজ্ঞাসা করায় মেটাজী ধমকে উঠে বললেন—সে-কথায় তোমাদের দরকার কি? বারণ করলুম, দরজা খুলে রেখো না। ব্যস।

কথায় কথায় মেটাজী বললেন—মনে কোরো না যে, তোমরা এসে এখানে থাকবে ব'লে শেঠজী তোমাদের জন্য এই বাড়ি তৈরি ক'রে রেখেছেন।

মেটাজীর মুখে অনেকক্ষণ থেকে এইসব ক্যাটকেটে কথা শুনতে শুনতে আমার ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। বলে ফেললুম—তা যে হয়নি তা আমরা জানি। ভাগ্যদোষে আজ আমাদের এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে ব'লে মেটাজী ম'নে করবেন না, আপনার চাইতে আমাদের বুদ্ধি কম আছে।

আমার জবাব শুনে মেটাজীর মেজাজ একেবারে জল হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন

না না, রাগ করছ কেন? আমি ঠাট্টা করছি।

মেটাজী বলতে লাগলেন—এইখানে তিনজন ক্রীশ্চান পাদরী থাকতেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম বা আমেরিকা—এই রকম কোনো একটা জায়গায় ছিল তাঁদের বাড়ি। ঠিক কোন্ জায়গায় তাঁদের বাড়ি তা তিনি জানেন না, তবে তাঁরা ছিলেন একেবারে গোরা।

জিজ্ঞাসা করলুম—তাঁরা এখানে কী করতেন?

—তাঁরা এসেছিলেন এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে আলোক বিকিরণ করতে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতে পালাতে পথ পেলেন না।—ব'লেই মেটাজী উচ্চহাস্য করলেন।

কিন্তু মেটাজীর কথাটা শুনে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। জানোয়ারের কথা শুনে মনটা আগেই দমে ছিল—তার ওপর ক্রীশ্চান পাদরীদের পলায়নের কথা শুনে আরও দমে গেলুম। ভাবলুম ক্রীশ্চান পাদরী—যাঁরা আফ্রিকার সিংহসঙ্কুল গভীর অরণ্যে নরখাদক বন্যমনুষ্যদের মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে ভয় পান না, তাঁরা কিসের ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেলেন? আর আমরাই বা এমন কি তালেবর লোক যে, সে স্থানে আমাদের নিয়ে এসে রাখা হচ্ছে?

ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় মনে ক'রে মেটাজীকে জিজ্ঞাসাই ক'রে ফেলা গেল—হ্যাঁ মশাই, ক্রীশ্চান পাদরীরা এখান থেকে ভেগে গেলেন কিসের ভয়ে?

মেটাজী সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—যেতে দাও, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে—এবার কাজে চল।

মেটাজী ও সর্দারের পেছনে পেছনে চলতে লাগলুম। এক জায়গায় এসে তাঁরা দাঁড়াতেই আমরাও দাঁড়ালুম। সেখানে দেখলুম পথের দু'ধারে বড় বড় মানুষ-সমান ঘাস হয়ে রয়েছে। সর্দার বললেন—এই যে বড় বড় ঘাস দেখছ—এর নীচে করোগেটেড আবরণের মত জমিতে আলুর ক্ষেত আছে।

মেটাজী আবার ব'লে দিলেন—রাঙা আলুর ক্ষেত—লতানো গাছ চেনো তো? দেখো যেন ঘাস তুলতে আসল গাছ তুলে ফেলো না।

মেটাজী যাবার সময় বললেন—বেশ মন দিয়ে কাজকর্ম করবে। আমি সর্দারকে বলে গেলুম, সে কাল তোমাদের 'রোজ' দেবে, তাই দিয়ে বাজার ক'রে এনো।

মেটাজী বিদায় নিলেন আর আমরা 'জয় দুর্গা' বলে মনের আনন্দে আলুর ক্ষেতে ঘাস তুলতে লেগে গেলুম। আমাদের আশে পাশে যেসব নরনারী মজুরের কাজ করছিল তারা কিছুক্ষণ এই জামা-পরা মজুরদের দিকে অবাক হ'য়ে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বোধ হয় আমাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা ব'লে আবার যে যার কাজে লেগে গেল।

আমরা যে জায়গাটিতে ঘাস ছিঁড়ছিলুম সেখানে আরও গুটি দুই-তিন পুরুষ ও নারী কাজ করছিল। তারা আমাদের অনভ্যস্ত হাতের কাজ দেখে মাঝে মাঝে কি সব বলাবলি ও হাসাহাসি করতে লাগল। দুনিয়ার ঘাস-ছেঁড়ারও ভালোমন্দ আছে।

ভালোই হোক আর মন্দই হোক, কোনোরকমে বিকেল দু'টা অবধি কাজ করবার পর

সেদিনকার মতো কাজ শেষ হ'ল। আমরা তো একরকম ছুটতে ছুটতে এসে সেই ভাঙা পাত্রে জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে নিজেদের বাসস্থানে এসে ঢুকলুম।

প্রকাণ্ড দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি যে, সেটি বন্ধ করবার অসংখ্য হুড়কো, খিল ও ছিটকিনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পুরানো ও অনেকদিন অব্যবহারে প্রায় অকর্মণ্য হুড়কো প্রভৃতি যথাস্থানে সংযোজন করতে আমাদের তিনজনেব প্রায দম-বন্ধ হবার অবস্থা। কোনোরকমে সেগুলি লাগিয়ে আমরা পূর্বদিকের একটি প্রকাণ্ড জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়ালুম।

তখন সূর্য একেবারে অস্ত যায়নি। অস্তগামী তপনেব নিভন্ত আলো এসে পড়েছে গাছের চূড়ায়। আমাদের সম্মুখে দক্ষিণে বামে যতদুর দৃষ্টি যায় সুদুব প্রসারী বনশ্রেণী। গাছেব পব গাছ উঁচু নিচু সরু মোটা —সবলে ধরিত্রী মাতাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দূব দূব— আরো দূরে পাহাড়ের সারি স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে হতে মেঘলোকে মিলিয়ে সত্য ও কল্পনায় জড়াজড়ি হয়ে গিয়েছে । তারই মধ্যে শত-লক্ষ বিহঙ্গমেব কাকলীতে মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ। আমাদের চোখে সেই দৃশ্য ফুটে উঠছে—কানেব মধ্যে সেই বিবাট শব্দ এসে পৌঁচেছে বটে, কিন্তু মন শূন্য—চিত্তে এসবেব প্রতিক্রিয়া কিছুই হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অনুভব কবলুম এখন পাখীদেব কলরব থেকে গিয়েছে, বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

অরণ্যমাতাব কোলে আমাদের প্রথম সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তাডাতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিয়ে সেখান থেকে সরে এলুম। মোমবাতি অনেকদিন আগে থেকেই কেনা ছিল, তাই জ্বালিয়ে নিজেব ধুতি পেতে বিছানা করলুম। আমাদেব কাবো মুখে কোনো কথা নেই— সকলেবই মন ভারী। মনের কোন গহনে বিবাট বেদনা ও অভিযোগ জমা হচ্ছিল। কিসের বেদনা ও কার ওপবে অভিযোগ—তার স্পষ্ট ধারণা নেই। মন যেমন ভাবী সেই অনুপাতে উদর তেমনি হালকা। তার ওপবে সারাদিনেব সেই পবিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। শুয়ে শুয়ে এই তিনেব ভারসাম্য বক্ষা কবতে করতে ঘুমিয়ে পডলুম।

ভোর হতে তখনও অনেক দেবি, কিন্তু পাখীদেব বিপুল চীৎকাবে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল বটে, কিন্তু শবীব এত দুর্বল যে, পাশ ফিরতে পাবি না। আবও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বন্ধুদেব ডেকে তুলে মুখ ধুয়ে একটু বসতে না বসতে ভোব হয়ে গেল।

সেদিন বেলা তখন প্রায দু'টো হবে, আমবা খিদেব জ্বালা সহ্য কবতে না পেরে একরকম কাঁপতে কাঁপতে সর্দাবেব কাছে গিয়ে বললুম—হয আমাদেব কিছু খেতে দিন, আর না হয় পয়সা ও ছুটি দিন—বাজাবে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি।

সর্দার তখন ঘুমোচ্ছিল। আমাদেব চেঁচামেচি শুনে সুখশয্যা ছেড়ে এসে খিদেব কথা শুনে একবার 'ও' বলেন, গণ্ডা পয়সা একবাব দু'বার তিনবার গুণে আমার হাতে দিলে।

পযসা হাতে নিয়ে একেবারে হক্‌চকিয়ে গেলুম। অ্যাঁ! এই ফবেস্টডিপার্টমেন্টে কাজ ক'রে দৈনিক মাত্র ছ'পযসা! এতে সবাই খাবই বা কি? আর পরবোই বা কি?

কিন্তু ক্ষুধার তাডনায় তখন আর পরবাব কথা চিন্তা কববাব অবসব নেই। তখুনি সেই

লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলুম বাজারের দিকে। পথ চলেছি তো চলেইছি ; কিন্তু কোথায় বাজার ? সঙ্গের লোককে যত প্রশ্ন করি সে কিছুই জবাব দেয় না। অনেক সাধাসাধি করবার পর হয়তো যদি কিছু বলে, কিন্তু সে-ভাষা কিছুতেই বুঝতে পারি না। শেষকালে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পথ চলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলুম—শোনা গেল, সেটা নাকি বাজার।

বাজার বললে বটে, কিন্তু দোকানপত্র কোথায় ? দু'একখানা পাতাব ছাউনি ঘর—তারও দরজা অর্থাৎ ঝাঁপ বন্ধ। একটা এইরকম ঘবের সামনে নিয়ে গিয়ে লোকটা আমাদেব বললে—এই একটা দোকান।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চেঁচামেচি করার পর দোকানদার দরজা খুলতে আমাদের গাইড তাকে কি বললে। দেখা গেল, খরিদ্দাবের শুভাগমনে লোকটি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ভালো চাল আছে? সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বইল। বেশ বোঝা গেল যে 'চাল' শব্দটি তাব কর্ণকুহবে ইতিপূর্বে প্রবেশ কবেনি। আমবা খাদ্য, অন্ন, তণ্ডুল, ধান্য ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে তাকে বোঝাবাব চেষ্টা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে পিল পিল ক'রে চাবিদিকে থেকে লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াতে আবম্ভ করলো। আমাদের কথা শুনে তাবাও নিজেদেব বিদ্যে অনুসারে দোকানদাবকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সে কিছুতেই বুঝতে পাবলে না। শেষকালে চলে যাচ্ছি দেখে সে ঘরেব ভেতরথেকে একটা পুঁটলি নিয়ে এসে সেটা আমাদেব খুলে দেখাল। দেখলুম তার মধ্যে ধুলোব মতন কালো খানিকটা কী জিনিস পড়ে রয়েছে, তাতে আবার পোকা ধবেছে।

সেটি কী দ্রব্য জিজ্ঞাসা কবায় দোকানদাব ও আমাদেব চাবপাশেব যত নবনাবী দাঁড়িয়ে ছিল সবাই মিলে চীৎকার ক'বে সে দ্রব্যটির গুণাগুণ বোঝাবাব চেষ্টা কবতে লাগল। অনেক ধস্তাধস্তিব পব বোঝা গেল যে, সে বস্তুটি বাজরাব আটা—খুবই রুচিকব ও পুষ্টিকব খাদ্য। চাল যখন পাওয়া গেল না তখন আপাতত বাজরাব আটাই দিতে বললুম এক সেব। দোকানদাব আবাব বাড়িব ভেতব থেকে এক টুকবো পাথব নিয়ে এসে বাটখাবাব বদলে তাই দিয়ে সেই ধুলোরূপী পুষ্টিকর ও রুচিকর গুঁড়ো ওজন ক'রে দিলে। সেখান থেকে এক পয়সার নুন কিনে বেবোলুম অন্য দোকানেব সন্ধানে। পেছনে সেই ভিড়ও চলল আমাদেব সঙ্গে।

অনেক বলা-কওয়া ও জিজ্ঞাসাবাদেব পর তাবা এক কুমোব-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত কবলে। দেখলুম সেখানে নানারকম মাটির তৈবী জিনিস বয়েছে, কিন্তু হাঁড়ি নেই। অনেক চেষ্টা ক'বেও হাঁড়ি কী দ্রব্য তা বোঝাতে না পেবে শেষকালে আধা-কলসী ও আধা-হাঁড়ি গোছেব একটা জিনিস কিনে প্রায ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসে মুড়ি ছোলা ভাজা ইত্যাদি যা পাওয়া গেল একরকম পেটভবে খেযে নিয়ে দৌড়লুম ডেরার দিকে।

জঙ্গলে গিযে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে হয়ে এলেও একটু আলো ছিল। ওবি মধ্যে একবাশ শুকনো কাঠ যোগাড় কবে, নতুন পাত্রে জল ভরে, ঘরে উঠে দবজা বন্ধ ক'বে দিলুম। বাড়ি থেকে ফিরে আসবাব মুখে সন্ধ্যার আবহাওযায় কালীচরণ একটা চিচিঙ্গে

ড়ে এনেছিল। সে বললে—এই রুটি খাওযাব অভ্যেস তো কখনো নেই, এই চিচিঙ্গের কালিয়া দিয়ে রুটি মারা যাবে।

প্রায় তিনদিন একবকম নির্জলা উপবাসেব পর এই মহাভোজের আয়োজন দেখে মনটা খুশীই হয়ে উঠল। যাইহোক. তিনজনে মহা উৎসাহে আমাদের বান্নাঘব অর্থাৎ পাদরীদেব ভূতপূর্ব পায়খানা ঘরে তো ঢোকা গেল। তখনো ঘরেব মেঝেতে দুটো তিনটে কমোডের দাগ ঝকমক করছিল, কিন্তু জীবনে উন্নতি করতে গেলে ওসব ছোটখাট দাগকে গ্রাহ্যেব মধ্যে আনলে চলবে না।

আধখানা চিচিঙ্গে ছুবি দিযে কুচিযে মনে হ'ল রান্না হবে কিসে? পাত্র কোথায? বাঁধবাব একটা পাত্র কিনে আনা হযনি বলে আপসোস হতে লাগল। শেষকালে সর্দাবের দেওযা হাঁড়িব অংশ—যা এই দু'দিন আমাদের জলপাত্রের অভাব দূব কবেছে, তাইতে জল দিযে আগুনে চাপিযে দেওযা গেল। জল একটু সোঁ সোঁ কবতেই কুঁচোনো চিচিঙ্গে তাতে ছেড়ে দিযে আমরা আটা মাখবাব বন্দোবস্ত কবতে লাগলুম।

মাটিতে কেঁচোব খুঁট পেতে তাতে সেই ধুলোরূপী বাজবাব গুঁড়ো ঢেলে একটু একটু কবে জল দিযে মাখবাব চেষ্টা কবতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে কাঠি দিযে এক আধ টুকবো তবকাবি নামিয়ে দেখা হচ্ছে সিদ্ধ হযেছে কি না।

এমন সময ঢাই করে এক বিরাট আওযাজে চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই অর্থাৎ চমক ভাঙবাব আগেই একটি বজ্রনির্ঘোষ এবং তাবপবেই অগ্নিবৃষ্টি—মুহূর্তেব মধ্যে আমাদের মুখ হাত পিঠে গবম চিচিঙ্গে-চূর্ণ চড়চড়িযে উঠল।

—বাপরে—বলে ঘব থেকে ছুটে বেবিযে এসে চিচিঙ্গেব টুকবোগুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম। তাবপব ঘবেব মধ্যে ঢুকে দেখি—মেঝেতে তবকাবির টুকবোগুলো পড়ে বযেছে। সেই ভাঙা হাঁড়িব কানা আবর্জনা বহন ক'বে যাব শেষ জীবন কাটছিল— -অতিবিক্ত চাপ সহ্য কবতে না পেরে সে দেহবক্ষা কবেছে। ভাবতে লাগলুম—হাঁড়িভাঙা তো দেহবক্ষা কবলে কিন্তু আমাদেব এখন দেহরক্ষাব উপায কি! তখন সেই নিভন্ত আগুনে মযদার ডেলাগুলো পুড়িযে নিযে আব আধখানা চিচিঙ্গে যে ছিল তাই দিযে দু' দিন নিবম্বু উপবাসেব পব পরমানন্দে পাবণে প্রবৃত্ত হলুম।

যাইহোক, সে বাত্রে বান্না কবাব চেষ্টা ক'বে আমবা বুঝতে পাবলুম যে নিজে বান্না ক'রে খেয়ে এখানে কাজ কবা চলবে না। সকালবেলা সর্দাব আমাদেব কাজেব তদন্ত কবতে এলে তাকে কাল বাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললুম।

সেদিন বেলা চাবটেব সময় সর্দারেব কাছ থেকে পয়সা নিযে ইষ্টিশনে গিযে সেই তল্লাটে খুঁজে খুঁজে রুটি-গোস্ত-এর দোকানে বসে আহার কবা গেল। তিনজনে মিলে সেখানে দু-আনাব খেযে পবদিন দুপুববেলার খাবার জন্য এক আনাব রুটি কিনে নিযে ফিরে এলুম। আমাদেব থাকবাব জাযগায় এসে তখনো অনেকখানি বেলা বযেছে দেখে জঙ্গলেব মধ্যে ঢুকে দেখে বেড়াতে লাগলুম।

সেখানকার একটা দৃশ্য আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এক জায়গায় দেখা গেল একটা বিরাট গাছকে বেড়ে একটা লতা ওপরে উঠে নিজের ডালপালা দিয়ে গাছটার ডালপালাকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, আর সেই লতায় ফুটেছে ছোট ছোট সাদা ফুল। এত ফুল যে, গাছ আর লতা সে ফুলে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ওপর থেকে সেই ফুল ঝরে-ঝরে গাছটার চারিদিকের মাটিতে যেন ফুলের বিছানা পাতা হয়েছে, আর সেই ফুলের সৌরভে বন আকুল হয়ে উঠেছে। আমরা কাছে যাওয়ামাত্র মৌমাছির দল ভোঁ-ও-ও ক'রে আপত্তি জানাতেই পেছু ফিরে পালিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর সেই ফুল-সৌরভে মন-প্রাণ-দেহ ভরে নিয়ে নেশায় টলতে টলতে ডেরায় ফিরে এলুম।

ফুলের গন্ধে নেশা লেগেই হোক কিংবা কয়েকদিন অনশন ও অর্ধাশনের পরে শত শরতের পুরাতন বলদের মাংস পেটে পড়েই হোক, ঘরে এসে দোর-জানালা দিয়ে বসতে না বসতেই আমাদের কালীচরণের কিরকম ভাবদশা লেগে গেল। সে শুরু ক'রে দিলে কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া তো রবে না।

অনেক রাত্রি অর্থাৎ সন্ধ্যে থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা গল্প ক'রে আমরা শুয়ে পড়লুম।

ঘুমের মধ্যে বিরাট একটা শব্দ কানে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। আচমকা ওইরকম আওয়াজে আমি যেন জ্ঞানহারা হয়ে গেলুম। আমাদের পাশেই যে বন্ধুরা শুয়ে আছে সে-কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে ভয়ে দিলুম দৌড়, কিন্তু আছড়ে পড়ে মাথা ও মুখে বিষম আঘাত লেগে সম্বিৎ ফিরে পেলুম, ততক্ষণে কালী ও পরিতোষ উঠে মোম বাতি জ্বালিয়ে ফেললে।

সেই স্বল্পালোকেই দেখতে পেলুম ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে আর হাত কাঁপছে একটু একটু করে। আওয়াজ তখনো সমানভাবে চলছে। মনে হতে লাগল হাজার হাজার বাড়াহাঁস যেন একটা গলা দিয়ে চিৎকার করে চলেছে। পরিতোষ ও কালী আমাকে সেই রকম দেওয়ালের কাছে দেখে মনে করেছিল আমার সঙ্গে আওয়াজের কোন প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে আমি ওই রকম ভাবে ছুটে গিয়েছিলুম তখন তারা কথঞ্চিৎ শান্ত হ'ল।

কিন্তু শান্ত হবার জো কি! ওদের আওয়াজের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘরের পূর্বদিকে চারটে দরজায় বড় বড় সমান আকারের জানালা ছিল। মনে হতে লাগল যেন পালা করে এক-একবার এক-একটা জানালার কাছে আওয়াজ হচ্ছে আর তারই ধমকে জানালাগুলো থর-থর করে কাঁপছে।

আমরা আস্তে আস্তে ভূমিশয্যা ত্যাগ করে পা টিপে টিপে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেন যে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম তা ঠিক জানি না; দরজার কাছে যেতেই জানালার দিকের আওয়াজ কমে গেল। বেশ মনে হতে লাগল আওয়াজটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। একটুখানি প্রাণে ভরসাও এল। কিন্তু তখুনি আমাদের ভ্রম ছুটে গেল। বুঝতে পারলুম যে আওয়াজটা জানালা ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিতোষ অনেক গবেষণা করে বললে—এ মনে হচ্ছে হাঁসভূত। অতি দুঃখেও হাসি পেল। হাঁসভূতের কথা শোনা

শুনেছে কিন্তু হংসভূতের কথা তো কখনো শুনিনি বাবা। ওদিকে হংসভূতের গর্জনের ঠেলায় মনে হতে লাগল ঘরের মধ্যে যমদূত এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভয়ে আমাদের দেহে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ করলে। সন্ধ্যাবেলার রুটি গোস্ত ও কালরাত্রের কাঁচা চিচিঙ্গে ও কাঁচা ময়দার ঠুলি ভুর হয়ে দেহ বেয়ে ঝরতে লাগল। কতক্ষণ ধরে এই দুর্ভোগ আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল অধিক বলতে পারি না। আমাদের তো মনে হয়েছিল---এই গর্জন শুনতে -শুনতেই জীবন অবসান হবে।

হংসভূতের গর্জন থেমে যাওয়ার পর বুকের ধড়ফড়ানি থামতে-থামতে ভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা কাজে লাগবার খানিক পরে সর্দার যখন রোঁদে এল তখন তাকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বললুম। সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি এমন সময় দেখলুম, আমাদের চারপাশে অনেকগুলি লোক এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলুম, আমাদের কথা শুনে তাদের মধ্যে জন্তুর মতো চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। আস্তে কথা বলার রীতি তাদের মধ্যে নেই---তারা নিজেদের ভাষায় সশব্দে কি সব আলোচনা আরম্ভ করে দিলে। সর্দার একটা বিরাট ধমক ও তাড়া দেওয়ায় তারা যে যার কাজের দিকে চলে গেল। সর্দার আমাদের একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে---এসব কথা তোমরা ওদের বলেছ নাকি?

—না তো!

সর্দার বললে---খবরদার! ওদের কিছু বোলো না, তা হলে ওরা সব কাজে আসা বন্ধ করে দেবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম---ওটা কি জানোয়ার? সর্দার তার হাঁড়িমুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললে--- ও জানোয়ার না, ও হচ্ছে দেও। জঙ্গলে কত রকমের জিনিস আছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

মনে মনে বললুম--- এরকম জিনিসেই যা অবস্থা হয়েছে---

সর্দার বললে— তোমরা কিছুতেই দরজা কিংবা জানালা খুলো না। -- তাহলে বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।

সর্দার রোদ দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেই চারিদিকে মজুরের দল— যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা এসে আমাদের নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। এ কয়েক দিন তাদের কথা শুনে শুনে সে ভাষা বলতে না পারলেও কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছিলুম। আমাদের রাত্রের অভিজ্ঞতা শুনে তারা যা বললে তার তাৎপর্য হচ্ছে -- এ জঙ্গলে অনেকদিন থেকেই দেবতারা বাস করছেন। এ জায়গাটা পরিষ্কার করার ফলে তাঁরা এখন সদলে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে ওই বাড়িটাতে এসে কেউ হানা দিয়ে থাকেন। ওইখানে সায়েবরা থাকত। দেবতারা এসে চলে যেতে বলায় তারা বাড়ি ফেলে চলে গিয়েছে।

আমরা তখন একটা লাঙল-চষা জমিতে পাথর ও আগাছা বাছবার কাজে লিপ্ত ছিলুম। আমার কাছেই একটা অল্পবয়সী মেয়ে কাজ করছিল। তার বয়স বোধ হয় পনেরো-ষোলো

বছর হবে। অত্যন্ত রোগা কিন্তু বসন্তের বাতাস পেলে যেমন কোনো-কোনো শুকনো কাঁটা গাছেও ফুল ধরে, তেমনি তার দেহে যৌবনের আগমনীর সামান্য সুরের আমেজ লেগেছে মাত্র। কাজ করতে-করতে একবার দু'জনে খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় সে আমাকে কি যেন বললে। তার কথা ভালো করে বুঝতে না পারায় আমি আরও কাছে সরে যাওয়ায় সে আবার বললে — কাল রাতে কি হয়েছিল তোমাদের ?

বললুম — তুমি কি করে জানলে ?

সে বললে — সবাই বলছে কাল রা'্তে তোমাদের ঘরে নাকি দেও এসেছিল ?

বললুম — দেও কি তা জানি না, তবে — এসেছিল কেউ।

মেয়েটিকে কাল রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে তার মাকে ডাকলে। মা দূরে আমাদের ক্ষেত্রেই কাজ করছিল। মেয়ের ডাক শুনে একরকম ছুটে কাছে এল। মাযেব দেখাদেখি বাপ, একটি ছেলে ও মেয়ে যারা সকলেই কাছাকাছি কাজ করছিল -- ছুটে এগিয়ে এল। মেয়েটি সকলকে কি সব বলায় মা এগিয়ে এসে আমাদের বললে — ও বাড়িতে আর তোমরা থেকো না। দেও বড় সর্বনেশে জিনিস!

আমরা বললুম — কিন্তু সর্দার ব'লে দিয়েছে ঘরের দবজা বন্ধ থাকলে আব কোনো ভয নেই।—

কঙ্কালের টঙ্কার

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়রা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাষ্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না-ছেপে ফেরৎ দিতেন। কিন্তু বলে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ্ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, সে শুধু আমার ঐ কবিত্বশক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কবিতা আমার প্রাণরক্ষা করলে কেমন ক'রে ? সত্যি বলছি, সেদিন কারো সাধ্য ছিল না যে, মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে! ভাগ্যিস কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতা লক্ষ্মীকে বাল্যবয়সে বিদায় দিলে সেদিন আমার যে কি অবস্থা হতো, তা আমিই জানি।

গল্পটা তাহ'লে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইম-টেবল্ খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হলে রাত্রের গাড়িতেই সুবিধে। কিন্তু সে ট্রেন অনেক রাত্রে ছাড়ে — প্রায় দু'টো। একে জয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘমাসের শীত, তার উপর রাত্রি দুটো — এই ত্র্যহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি ? আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে বল্লুম — "কি উপায় করা যায়, বলুন দেখি ? এই দারুণ শীতে ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে

করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে।"

ষ্টেশন-মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন — আপনি কি ফার্ষ্টক্লাস প্যাসেঞ্জার ? তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল-কোম্পানী আধাভাড়ায় সর্বত্র-যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড়-মানুষি করেছিলুম। বুক ফুলিয়ে বল্লুম — 'হ্যাঁ, আমার ফার্ষ্ট-ক্লাসের টিকিট।" ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন — "প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভাল ব্যবস্থা আছে।"

আমি বল্লুম — "কি ?"

তিনি বল্লেন — "আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে ষ্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্ষ্ট-ক্লাস গাড়ি ঐ সাইডিঙে কেটে রেখে দেবো, আপনি তাতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাতেই আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেবো — আপনি দিব্যি ঘুমুতে ঘুমুতে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন।"

আমি বল্লুম — "বাঃ এ তো বেশ!"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন — হ্যাঁ শীতেব রাত্রে গাড়ি ধরবার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানী বড়লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।

আমি বল্লুম — "খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি আটটার মধ্যেই আসবো — আপনি গাড়ি ঠিক করে রাখবেন।" তিনি বল্লেন — "গাড়ী ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরী করবেন না। আটটাব পব আরট্রেন নেই ব'লে আমরা আটটার সময় ষ্টেশন বন্ধ কবে চলে যাই।"

আমি বল্লুম — "আটটার মধ্যেই আসবো।" বলে আমি চলে গেলুম।

তাবপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেবে পায়ে তিনজোড়া ডবলমোজা, গায়ে দুটো গবম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলেব কামিজ, তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো ভবা মেরজাই, তাব উপর ওয়েষ্ট কোট, কোট, ওভার-কোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোষ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে কান-চাপা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক আটটার সময় ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম।

আমার মস্ত-বড় লোহার তোরঙ্গটা দু'জন কুলি এসে ধবাধরি ক'বে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ ক'রে একটু হেসে ছেড়ে দিলে। আমি বল্লুম — "কেয়া হলো রে!"

সে বল্লে — "বাবুজির তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দু'-একঠো ধুতি উতি আছে, সেগুলি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটি আমাদের বখশিস্ ক'রে যান বাবু — আপনার কুলি-ভাড়া, রেল-মাশুল অনেক বেঁচে যাবে।"

আমি বল্লুম — " যা যা, তোম্‌কো আর ইয়ে কবতে হবে না।" বলেই আমি হন্ হন্ ক'রে ষ্টেশন-মাষ্টারেব ঘরের দিকে চলে গেলুম। ষ্টেশনমাষ্টার আমাকে দেখেই বল্লেন — " গুড় ইভিনিং বাবু। আপনাব ভাগ্য খুব ভালো আজ আর কোন প্যাসেঞ্জার নেই ; সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলাব। চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।" ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে প্লাটফর্ম পেবিয়ে, পাঁচ-ছযটা রেল লাইন টপ্‌কে অনেক দূব চলে চলে একটা

ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি একটা পড়ে রয়েছে — ঠিক যেন একটা কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! মাষ্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলে দিয়ে বল্লেন — "নিন্ — উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।" তাড়াতাড়ি তাঁর হাত-বাতিটা তুলে নিয়ে "গুড্-নাইট" — ব'লে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাঁকে আর দেখতে পেলুম না, রেল-লাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস্‌খস্ শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাঁৎ ক'রে আমার মনে হলো — তাই তো মাষ্টারবাবু অমন ক'রে পালালেন কেন ?

ইতিমধ্যে দেখি, কুলি-দুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বল্‌ছে — "বাবুজি পয়সা।" আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট্ দিলে ষ্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি? আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি দুটো কয়লা-মাখা কালো ভূত রেল লাইনের বাঁধের নীচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে ষ্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিল। তার পরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ। একেবারে অন্ধকার !

অমাবস্যাব রাত্রি — চারদিকে অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্ করছে। সেই অন্ধকারে একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চারিদিক্ দেখতে লাগলুম — আশে পাশে কেউ নেই ; দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। গায়েব ভিতরটা কেমন ছম্‌ছম্ কবতে লাগলো।

আমি আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকাবে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাৎড়ে বিজ্‌লিবাতির চাবি টিপলুম — খুট ক'রে শব্দ হ'লো, আলো হলো না। সর্বনাশ ! আলো নাই নাকি ? আলোর সুইচ্ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলাম, কোনই ফল হলো না, যেমন অন্ধকার তেমনই, পকেট খুঁজলুম, দিয়েশলাই নেই। কেমন ক'রেই বা থাকবে? তোরঙ্গের মধ্যে একটা দিয়েশলাই আছে। চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল, বালাপোষ, ওভার-কোট, কোট, ওয়েস্ট কোট, সোয়েটার গেঞ্জির গোলক-ধাঁধার মধ্যে কোথায় যে পৈতে গাছটা হারালো, কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে, বিপদে আপদে, বিদেশ বিভুঁয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়। সেটাও শেষে খোওয়ালুম!

সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগলো। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মত মানুষেব বুককে এমন ক'রে পিষতে থাকে এ আমি জানতুম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক ওদিক ক'রে ছট্‌ফট্ করতে লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস্ ফিস্ কথা এসে লাগতে লাগলো। কোথায় একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে দুটো পাথর তুলে ঠক্ ঠক্ ক'রে সজোরে ঠুক্‌তে লাগলুম — যদি একটু আলোর ফিন্‌কি পাই। কিন্তু হায় অদৃষ্ট, আলোর বদলে পাথরের কুচির ফিন্‌কি এসে আমার চোখ-দুটোকে ঝনঝনিয়ে দিলে !

আমি দু হাতে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ষ্টেশনের দিকে ছুট দিলুম, যেমন ক'রে পারি,

সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। ষ্টেশন মাষ্টারটা কি পাজি? এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিল না! বল্লে কি না, দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে যাবেন! পাজি কোথাকাব!

আমি ছুটতে ছুটতে একেবারে ষ্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালুম — প্লাটফর্মের কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সাম্‌নে। কিন্তু এ কি ? এই তো সেই খেজুর গাছ, এই তো এই তো রয়েছে। কিন্তু ষ্টেশন কোথায়? আমি এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম ষ্টেশন নেই । মনে হলো, কালো শ্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি ক'রে অন্ধকারের গা থেকে ষ্টেশনকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে।

আমার বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। আমি আর তিলমাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম — যে-পথে এসেছিলুম, সেই পথে আমার গাড়ির দিকে — টপাটপ্ পাঁচ-ছয়টা লাইন টপ্‌কে ছুটতে ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কি সর্বনাশ!

আবার ভালো ক'রে চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম — ষ্টেশনও নেই, গাড়িও কোথায়? করি কি! একবার মনে হলো, যাই, আর একবাব গিয়ে ভালো ক'রে ষ্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু ষ্টেশনের দিকটার সেই খাঁ-খাঁ মূর্তি মনে হয়ে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। ছেলেবেলায় গল্পে শুনতুম, দৈত্যদানবা রাতাবাতি বড়-বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেতো — একি তাই হলো নাকি? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই!

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হলো, এমন ক'রে রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয় — আচমকা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে! যেই এই কথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে গেলুম! কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন, সামনে পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, যে দিকে ছুটি, সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায ঘিবে ফেলেছে — পালাবার উপায় আব নেই! আমার এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা যেন হঠাৎ খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। আমি চম্‌কে উঠে থেমে দাঁড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর গড়াতে গড়াতে নীচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হলো প্রাণটা যেন বাঁচলো! ট্রেন-চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হ'তে লাগলো কতক্ষণে রাত্রিটা কাটবে। কিন্তু রাত্রির যেন আর শেষ নেই। বসে বসে দেখতে লাগলুম নিস্তব্ধরাত্রি ঝিম্-ঝিম্ করতে করতে আরো নিঝুম চিকের ডানার মতো একখানা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব জিনিস যেন মুছে আসছে। দেখতে-দেখতে আমি শুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতো-মোজা

পরা আমার লম্বা পা দুখানা একটু একটু ক'রে মুছে গেল। কালো ওভার কোট ও নীল ...াপোষ মোড়া-গা— তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেল্লুম। চোখ বুজে — মনে হতে লাগলো — আমি আছি কি নেই ? আছি কি নেই?

"আছে আছে — এইখানে আছে।" ব'লে কানের কাছে কে একজন চীৎকার ক'রে উঠলো। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ-মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু সরু লম্বা আঙ্গুল নেড়ে ইসারা ক'রে কাকে ডাকছে। দেখতে দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর একটা কঙ্কাল লাফাতে লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

তারপর আর একটা!

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে আমাকে দেখতে লাগলো। তার চোখের ওপর চোখ পড়তে দেখলুম — না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কট্‌কট্ করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে— "এই নাকি সে?"

প্রথম কঙ্কালটা বল্লে — "বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো, একেবারে চেনবার যো নেই।"

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এসে বল্লে — "কৈ, দেখি।" ব'লে তার হাড় বার-করা আঙ্গুলগুলো দিয়ে টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগলো!

"ও আর — দেখছিস কি । ও সে-ই! আমার চেখে কি ধুলো দেবার যো আছে — হাজারই লুকোক না।" ব'লে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হ্যাঁ করে বিরাট শব্দে হেসে উঠলো। মুখের ভিতর থেকে তার সেই সাদা সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরলো।

শেষ কঙ্কালটা বল্লে— "তবু একটু পরখ করতে হবে না ; ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়।" ব'লে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ভাবলুম ব্যস্ এইবার আমার শেষ!

দেখতে দেখতে বাকি-দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-দুখানা ধরলে, প্রথমটা মাথার দিকটা ধরলে ; তারপর তিনজনে মাটি থেকে চ্যাংদোলা ক'রে আমায় তুলে ফেল্লে। আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলুম— "কোথায় নিয়ে যান মশাই"।

তারা বল্লে— "বিয়ে দিতে"।

আমি চম্‌কে উঠে বল্লুম— "বিয়ে দিতে কি মশাই! এই বুড়ো বয়সে?"

একজন বল্লে— "বুড়ো বরই পছন্দ করি!"

আমি বল্লুম— "মশায় আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন।"

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—" তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।"

আমি বল্লুম— "আমি তো মশাই, পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে ; তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন!"

সে বল্লে— "আমরাও পুলিশ এনেছি ; ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো ব'লে!"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম— "কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না!"

"পারবে না কি? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কি তোমার গোঁ?" ব'লে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন ক'রে উঠলো।

আমি বল্লুম— "রাগ করেন কেন মশাই? আমি ছাড়া কি আর পাত্র নেই? কত ছেলে হয়তো খুশী হয়ে বিয়ে করবে"।

সে বল্লে— "এত রাত্রে এখন ভালো পাত্র পাই কোথায়? যার তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না, চল, লগ্ন বয়ে যায়।"

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লুম—"তাহলে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?"

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বল্লে— "দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা?"

আমি তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম— "ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমার পিতার নাম মধুসূদন চক্রবর্ত্তী।"

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বল্লে, "রাধে মাধব! রাধে মাধব!"

আমি বল্লুম— "সে কি মশাই?"

সে বল্লে— "এই এতরাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শিয়াল কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্ত্তী আছে? তুই এতই বোকা পেলি আমাদের?" আমি বল্লুম— "এই তো আমি রয়েছি।" সে বল্লে— "আরে ভাই, মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো?"

সে বল্লে— "আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্ত্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস?"

আমি বল্লুম— "এসব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তো মাধব চক্রবর্ত্তী গেল কোথা?"

সে বল্লে— "আরে ভাই বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে।"

আমি বল্লুম— " না মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল?" সে বল্লে— "মরেছে না তো কি?"

আমি বল্লুম— "মরেছে কি রকম! সে মরে গেল আর টের পেলে না?"

সে বল্লে— "মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে সে তা টের পায় না কি!"

কথাটা শুনে বোঁ ক'রে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম না কি অ্যাঁ? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব মুছে আসছে— সেই কি আমার মৃত্যু নাকি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। হয়তো এ আমি নই— এ আর কার আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে।

নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম? জ্যান্ত মানুষ কি কখনো তা পারে? কিন্তু মরে গেলুম কেমন ক'রে? আমার তো রোগ হয়নি। হয়তো ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে— আমি টের পাই নি।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গুলিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হ'তে লাগলো— না, আমি মাধব চক্রবর্ত্তী নই। এবং ঠিকই বলেছে— কাঙালীচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতো আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্ত্তীর জের বুঝি এখনো চলছে, কিন্তু কাঙালীচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালীচরণ হব, তবে আমি আমাকে চিন্‌তে পারছি না কেন? এরা তো চিন্‌তে পেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা ব'লে উঠলো— "কি হে ক্যাংলা, কি ভাবছো? বিয়ে করবার মতি স্থির হলো!" আমি বল্লুম— "আচ্ছা মশাই আমি কি সত্যি কাঙালীচরণ?"

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে বল্লে— "সে কিরে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস্ না?"

আমি বল্লুম— "না।"

সে বল্লে— "সর্বনাশ হয়েছে। তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?"

আমি বল্লুম— "একটুও না।"

সে বল্লে— "তোর মনে পড়ছে না— আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে-- বাগেশ্বরীর সঙ্গে?"

আমি বল্লুম— "কৈ, আমার তো কোন বিয়ের কথা হয়নি!" সে বল্লে— "সে কিরে! তোর গায়ে গোবর পর্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম— "গায়ে-গোবর কাকে বলে?"

সে বল্লে— "তুই অবাক করলি। তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে-গোবরের দিন ভোর রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তালগাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে বাগেশ্বরী বরপণের কড়ি বাচছিল, তুই বাগেশ্বরীকে দেখ্‌তে পাস্‌নি, সেও তোকে দেখতে পায়নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস, অমনি বাগেশ্বরীর পা দুটো দুলতে দুলতে তোর কপালে এসে ঠক্ ক'রে লেগে গেল। বাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত হাত জিভ কেটে, মাথায় ঘোমটা টেনে দৌড়। আর তুই বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বল্লি ও মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে, কেন কি হয়েছে। তুই বল্লি,— ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে। তাতে হয়েছে কি? তুই বল্লি— হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ব'লে তুই— কপাল চাপড়াতে লাগলি! এ সব তোর মনে পড়ছে না?"

আমি বল্লুম— "মনে পড়ছে, এই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হলো?"

সে বল্লে— "সর্বনাশ করলি। তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধান দিলেন যে, বাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই সাত—

একে— সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেঁৎলে দে, তা হ'লেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বল্লি, ওরে বাপরে ; বাগেশ্বরীর মাথায় লাথি মারা! সে আমি পারব না ;— ব'লে তুই ছুট্ দিলি।"

আমি বল্লুম— "তারপর ?"

সে বল্লে— "তারপর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এই শ্মশানঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্ত্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস্। হাঁরে, এই মাধব চক্রবর্ত্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায় ; তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি ?"

আমি বল্লুম— "মাধব চক্রবর্ত্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা ?

আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ?"

সে বল্লে— "তোর কিছুই মনে পড়ছে না ? তুই সত্যি বলছিস, না মস্করা করছিস ?"

আমি বল্লুম— "তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি"। সে বল্লে— "তবে সর্বনাশ হয়েছে— তোকে মানুষে পেয়েছে"।

আমি বল্লুম— "মানুষে পেয়েছে কি গো !"

সে বল্লে— "জানিস না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষও তেমনি আমাদের কারো কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব চক্রবর্ত্তীর দেহে সেঁধিয়েছিলি, তখন বোধ হয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।"

আমি বল্লুম— "তাতে কি হয় ?"

সে বল্লে— "মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিনতে পারে না, আপনার লোককে চিনতে পারে না, আবোল তাবোল বকে, কট্‌মট্ করে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেবও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস্।

— "নিজেকে চিনতে পারছিস্ না, আমাদেরও চিন্‌তে পারছিস্ না।"

"ওগো, তবে আমার কি হবে ?"

সে বল্লে— "যেমন বিয়ে করবনা বলে পালিয়ে এসেছিস্, তেমনি ঠিক জব্দ।"

আমি বল্লুম—"ওগো, আমি বাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো— আমাকে উদ্ধার করো।"

সে বল্লে— "যেমন বিয়ে করব না বলে পালিয়ে এসেছিস, তেমনি ঠিক জব্দ।"

আমি বল্লুম— "তবে বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।"

আমি বল্লুম— "বেরুব কি ক'রে গো ?"

সে বল্লে— "পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি ? মুশকিল করলি দেখছি! এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্ত্তীর ঐ কোঁচার খুঁটটা্ এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়— তাহলেই সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে আসতে পারবি।"

আমি আঁৎকে উঠে বল্লুম, "ওরে বাপরে— সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না।"

সে বল্লে— "ভয় কি! আমি তো কতবার ফাঁসি গেছি! তোর কোনো ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।"

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বল্লুম— "না গো, না— সে আমি পারব না। গলায় ফাঁসি

দিতে কিছুতেই পারব না।"

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্তের মত চোখ দুটোকে বন্ বন্ ক'রে ঘুরিয়ে বল্লে— "কী, তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে, এমন কথা বলিস্ যে ফাঁসি যেতে তোর ভয়— কুলাঙ্গার কোথাকার।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বল্লুম— "কি করব, আমার যে ভয় করছে!"

সে দাঁতের দু'পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠলো— "ফের ঐ কথা! এই বেলা ঝুলে পড়, নইলে তোর ভালো হবে না বলছি।"

আমি বল্লুম— "ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না— আমার ভয় করছে!"

সে আরো রেগে বল্লে— "হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ।" ব'লে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে— "রাগ করেন কেন খুড়ো মশাই। ও হয় তো ক্যাংলা নয়! নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?"

খুড়ো মশাই বল্লেন— "কী! ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বছর টিক্‌টিকি পুলিসে কাজ করেছি, কত বড় বড় ফেরার পাকড়াও করেছি— আমার ভুল হবে?" শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে— "যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি দাদামশাই?"

দাদামশাই বল্লেন— "আচ্ছা কেন, পরীক্ষা হোক্।" বলে আমার দিকে ফিরে বল্লেন— "কি হে, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী না কাঙালীচরণ!"

আমি বল্লুম— "আজ্ঞে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্ত্তী, কিন্তু তারপর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচরণ!" সে বল্লে— "কাঙালীচরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ ব'লে তোমায় ফাঁসি দেবো আমরা, এই শ্মশানে— এই গাছের ডালে!"

আমি বল্লুম— "আজ্ঞে আমি তবে মাধব চক্রবর্ত্তী" সে বল্লে— "বেশ, মাধব চক্রবর্ত্তী ব'লে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহলে তোমায় তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাবো।"

"আর যদি না পারি?"

"তা হ'লে এইখানে তোমার ঘাড় মট্‌কে রেখে চলে যাবো।"

"ঘাড় মট্‌কে দেবেন? সর্ব্বনাশ! এই বিদেশে বিভূঁয়ে — এই অচেনা জায়গায় এত রাত্রিতে নিজেকে কি করে প্রমাণ করবো মশাই?"

"না পার, ঘাড়টি মট্‌কে দেবো— শ্মশানের ভূত হয়ে থেকো।"

সত্যি বল্‌ছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেল্লুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে— "কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোনো চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্ত্তী?"

আমি বল্লুম— "আছে। এই দেখুন, আমার ডানহাতে একটা জড়ুলের দাগ।"

সে হেসে বল্লে— "ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোন ভিতরের প্রমাণ দিতে পার?"

আমি বল্লুম— "আমার ভিতর কি আছে না আছে, আমি তো জানি না মশাই। এই দেখুন না আমার ভিতরে কাঙালীচরণ আছে কি মাধব চক্রবর্ত্তী আছে, আমি তাই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।"

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীরস্বরে ব'লে উঠল— "আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্তী।"

সে বল্লে— "শীগগির প্রমাণ কর, নইলে ঘাড় মট্‌কালুম ব'লে।"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বলে— "অমন ঘেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এমন কোন গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্তী?"

আমি ব'লে উঠলুম— "হ্যাঁ, আছে বৈকি! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি।"

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বল্লে— "তুমি কবিতা লিখতে পার? নিজে লেখ? না পরের কবিতা নিজের ব'লে চালাও?"

আমি বল্লুম—"না মশাই, আমি সে-রকম কবি নই।" সে বল্লে— "তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয়?"

আমি বল্লুম—"না, সম্পাদকরা ভয়ে ছাপেন না।" সে বল্লে— "ভয়ে ছাপেন না কি রকম?"

আমি বল্লুম— "আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে কবিতা ছাপলে পাঠকরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।"

সে বল্লে— "আচ্ছা! কৈ দেখি, একটা কবিতা লেখ দিকিনি।"

আমি তখনই ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট বইখানা বার ক'রে বল্লুম— "আলো একটা চাই যে।"

সে বল্লে— "দিচ্ছি আলো।" ব'লে খানিকটা ধুলো বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে, আর অমনি আগুন জ্বেলে উঠলো। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগ্‌লুম।

খানিকটা লিখেছি, সে বল্লে— "কৈ, কি লিখলে পড়।" আমি বল্লুম— "এখনও যে শেষ হয়নি মশাই।" সে বল্লে— "কবিতার আবার শেষ আছে নাকি? যা লিখেছ পড়— ফাজল্যামি করতে হবে না।" আমি সুর ক'রে পড়লুম—

"পড়িয়ে বিপদে তারা,
হয়েছি মা দিশেহারা!
উদ্ধার এ-দুঃখ-কারা
পার হ'তে মা জননী।

শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির-ঢাকি,
খাবি খায় প্রাণ-পাখী,
শূন্য হেরি এ ধরণী।
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা, আমারে বাঁচা,
দিয়ে তোর পা-তরণী!"

এইটুকু শেষ হ'তেই সে বল্লে— "ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। এরকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা না, পুরোনো গান একটা মুখস্থ ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ।"

আমি বল্লুম— "না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাট্‌কা। এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরনের লেখা।"

সে বল্লে— "থাম, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি করে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ। তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ— আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার?" আমি বল্লুম— "খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে, ওষুধের নাম দিয়ে অনেক ভালো ভালো কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে প্রাইজ পেয়েছিলাম। আপনার নামটা কি বলুন, আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।"

সে বল্লে— "আমার নাম জাঁদরেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট করে। বুঝব কত বড় বাহাদুর তুমি।"

আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখতে শুরু করেছি মাত্র, সে বল্লে— "কি লিখলে, পড় হে! আমিও বড় কবিতা দু-চক্ষে দেখতে পারি না!"

আমি বল্লুম— "মশাই, আর একটু সময় দিন।" ব'লে আমি খসখস্ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম। একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বল্লে— "উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।" অগত্যা আমি পড়লুম—

"রেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কৎবেল ;
পাশ আসে, ফেল আছে,
আর আছে, শূল শেল,
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সরখেল ;
সব সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল জাঁদরেল!'

পড়া শেষ হ'তেই সে চীৎকার ক'রে উঠলো— "বা, বা, বেশ লিখেছ তো হে! আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো!"

আমি আর একবার চীৎকার করে পড়লুম— "রেল আছে, জেল আছে, ইত্যাদি।"

সে আবার বল্লে— "বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্ত্তী।"

আমি বল্লুম— "ঠিক বলেছেন মশাই, আমি কাঙালীচরণ নই?" সে বল্লে— "কাঙালীচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্ত্তী না হ'লে এমন কবিতা লেখে কে?" আমি বল্লুম— "মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন? এই খাতায় লেখা আছে— এই জয়পুরের সম্বন্ধে।" সে বল্লে— "কৈ, শোনাও তো দেখি।"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট বইয়ের খাতা হাত্‌ড়ে কবিতাটি বার ক'রে পড়তে শুরু করলুম—

"বস্তা-বস্তা পুঞ্জ পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম-মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড়?
লেপ-গদি বালাপোষ সর্ব বর্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়!
উর্ধ্ব-ফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে-কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিন-সমা
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় করিছে কোতল!
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোঁড়ে শার্পনেল— "

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো— "ওরে, ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে।"

আমি চম্‌কে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি আমার সামনের কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি "রাম! রাম!" বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম নামটা যে কেন মনে আসেনি, কে জানে!

আমি রেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দুটো কুলিব সঙ্গে দেখা। তারা বল্লে— "বাবু, আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?"

আমি আর কি বলবো?

বল্লুম— "আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কি না, তাই একটু দেখছিলুম।"

তারা বল্লে— "আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই"। ব'লে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

আমি গাড়িতে ওঠে বল্লুম— "হ্যারে, গাড়িতে আলো নেই কেন?"

সে বল্লে— "বিজলিবাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।"

আমি বল্লুম— "আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস?— বখশিশ্ দেবো।"

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট-বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

টম সাহেবের ভূতুড়ে বাড়ি

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

টম সাহেবের বাড়ি।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। একতলা, দোতলা তেতলা, কত যে কামরা তাহা বলিতে পাবি না। দেখিতে দেখিতে আমরা বৃহৎ একখানি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মেঝেতে নিবিড় ধূলা পড়িয়াছিল। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দেখিলাম ঠিক সম্মুখে একটি পায়ের দাগ পড়িল। শিশুর পদচিহ্ন। তাহাব আগে কি আশেপাশে আর দাগ নাই। কেবল সেই একটি দাগ মাত্র। অগ্রসর হইয়া সেই পদচিহ্নের উপর আমার নিজের পা রাখিলাম।

অমনি ঠিক সেই সময় আমার সম্মুখে আর একটি পায়ের দাগ পড়িল। আমি আমার সঙ্গীর গা টিপিলাম। সেও আমার গা টিপিল। এইরূপে যতই যাই আগে ধূলার উপর ততই একটি শিশুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকে। কেবল এক পায়ের চিহ্ন। দুই পায়ের দাগ পড়ে না। যখন ঘরের অপর প্রান্তে প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন আর দাগ পড়িল না।

সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে একখানি বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। কে যেন বাতি জ্বালাইয়া আমার

সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। দেখিলাম, সহসা ঘরের অন্য দিক হইতে একখানি চৌকি যেন হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিল।

আমি বলিয়া উঠিলাম বাঃ! একি!

ক্রমে দেখিলাম, সেই চৌকির উপর যেন কি বসিয়া রহিয়াছে। মানবের আকৃতি বটে, কিন্তু তাহার দেহ যেন অতি তরলধূম দ্বারা গঠিত। তখন সেই ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম।

আমার শয়নঘর এই তলায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু তখনও নিদ্রা যাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং এই তলার অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। একটি ক্ষুদ্র কামরার নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া আমার সঙ্গী ভৃত্য বলিল— একি হইল? এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? আমি এইমাত্র চাবি খুলিয়া কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।

বিস্ময়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি এমন সময়ে কি আশ্চর্য, দ্বার আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এক প্রকার অমানুষিক গন্ধে ঘর ক্রমে পরিপূরিত হইতে লাগিল। এক প্রকার ভৌতিক ত্রাসে হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। আশঙ্কা যে কি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। জীবনের প্রতিকূল কোন একটা ভীষণ পদার্থ যে সেই ঘরে আছে, এই রূপ আমাদের মনে হইল।

সর্বনাশ! সহসা ঘরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

সেই ঘরে আর অপর দ্বার কি জানালা ছিল না। প্রথমে দুইজনে দ্বার টানাটানি করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। আমার সঙ্গী বলিল, অতি পাতলা তক্তা দিয়া কপাট জোড়াটি গঠিত। দুই লাথিতে ভাঙিয়া ফেলিব। দেখি ভূতে কি করিয়া রক্ষা করে।

দুই লাথি নয়, হাজার লাথিতেও সে-কপাট ভাঙিল না। আমরা অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই ভঙ্গপ্রবণ কপাট ভাঙিতে পারিলাম না। শান্ত হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম।

হঠাৎ খল্‌খল্ করিয়া বিকট হাসির শব্দ হইল। দ্বারটি আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। সেই ভয়াবহ ঘর হইতে আমরা তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম।

সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা বারান্দায় দাঁড়াইলাম। এক পার্শ্বে মিটমিট করিয়া কেমন একটি চলমান নীলবর্ণের অলৌকিক আলো জ্বলিতেছিল। কি আলো, কোথায় যাইতেছে দেখিবার নিমিত্ত আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম।

সিঁড়ি দিয়া আমাদের আগে আগে আলোটি তেতলায় উঠিতে লাগিল। তেতলার উপরে উঠিয়া একটি সাধারণ শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। যে বৃদ্ধা এই বাড়িতে একাকী বসবাস করিত, এই ঘরটি তাহার ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিলাম। ঘরের ভিতর একটি দেরাজ ছিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর একখানি রেশমের রুমাল ও দুইখানি চিঠি রহিয়াছে। চিঠি দুইটি লইয়া দ্বিতলে আসিবার নিমিত্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম।

মনে হইল, আমাব পাশেপাশে চিঠি দুইখানি কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত কে যেন বারবার

চেষ্টা করিতেছে। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমি তাহার সে চেষ্টা বিফল করিলাম। আমার শয়নঘরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ঘড়ি ও পিস্তল টেবিলের উপর রাখিলাম। নিকটস্থ একটি ছোট ঘরে সঙ্গীকে শুইতে বলিলাম। মাঝের দ্বার খোলা। যে পত্র দুইখানি উপর হইতে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পড়িতে লাগিলাম।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চিঠি দুইখানি কোন একটি পুরুষ তাহার প্রিয়জনকে লিখিয়াছিল, কিন্তু নামধাম কাহারও ছিল না। তাহাতে কোন একটি বিভীষিকার আভাস ছিল। কে যেন কাহাকে খুন করিয়াছে, এই ভাবের কথা। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আমি চৌকির উপর বসিলাম। ঘরে দুইটি বড় বড় বাতি জ্বলিতেছিল।

শীতপ্রধান দেশ। ঘরের আগুন জ্বালিবার জায়গায় দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার ঘড়িটি শূন্য পথে চলিয়া যাইতে লাগিল। হাতে পিস্তল লইয়া তাড়াতাড়ি আমি ধরিতে দৌড়াইলাম। কিন্তু সোঁত করিয়া ঘড়ি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

আমার সেই সঙ্গী এই সময় সহসা তাহার ঘর হইতে দৌড়িয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ। যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে, মাথার চুলগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, মহাশয়, পলায়ন করুন, পলায়ন করুন! এই স্থানে আর তিলার্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন! বাপরে, ধরিল রে! এই রূপ চিৎকাব করিতে করিতে সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইলাম। কিন্তু ধরিতে না ধরিতে সে দরজা খুলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ শ্মশান সদৃশ অট্টালিকার ভিতর আমি এখন একা পড়িলাম। প্রাণে আমার অতিশয় ত্রাস হইল। একবার মনে ভাবিলাম, আমিও পলায়ন করি। কিন্তু একথা জানিলে বন্ধুবান্ধব সকলে হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি উপরে উঠিলাম।

আমার সম্মুখে তালগাছ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষের আকৃতি দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ছাদে ঠেকিল। সেই মস্তকে চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। সর্বশরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। পিস্তলটি হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। আমি তাহা লইবার নিমিত্ত হাত বাড়াইলাম। অসাড় ও অবশ হাত উঠিল না। আমি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। পা অসাড় ও অবশ। পা উঠিল না। চিৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। জ্ঞান হত হইবাব উপক্রম হইল।

কিন্তু তখনও একটা চিন্তাশক্তি আমার মনে ছিল। ভাবিলাম যদি ভয় করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণ হারাইব। এইরূপ মনে করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ধৈর্য ধরিয়া রহিলাম। বাতি নিবিল না, অগ্নিস্থানে অগ্নি নির্বাণ হইল না। তথাপি ঘর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, যেমন করিয়া হউক, ঘরে আলো রাখিতে হইবে। অন্ধকারে থাকিলে মারা পড়িব।

পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিলাম। এবার উঠিতে পারিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিলাম।

জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। অল্প অল্প চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোকে দেখিলাম যে তালবৃক্ষ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণের বিকট মূর্তি তখন সম্পূর্ণভাবে ঘরে নাই, কেবল তাহার ছায়াটি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুনরায় গিয়া চৌকিতে বসিলাম। পীত, হরিৎ, লোহিত নানা বর্ণের গোলাকার আলোক এক্ষণে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ও গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। যে চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম, তাহার নীচে হইতে ঠিক জীবন্ত মানুষের রক্তমাংসের হাতের ন্যায় একখানি স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাতখানি ধরিতে গেলাম। খপ করিয়া চিঠি দুইখানি লইয়া নিমেষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার ঘাড় ভাঙিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে হাতও আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া আমি বরাবর সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কি করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, তাহাই আশ্চর্য।

ভূতের রাজা

হেমেন্দ্র কুমার রায়

সরকারি কাজে বিদেশে থাকি। ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি। সাঁওতাল পরগণার যে জায়গায় আমার কর্মস্থল ছিল, সেখান থেকে রেল ষ্টেশনে যেতে হলে প্রায় ত্রিশ মাইলেরও উপর পথ পার হতে হবে। পাহাড়ি পথ, এক মাইল হচ্ছে দু-তিন মাইলের ধাক্কা। তার উপরে রাতের বেলার পথে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গেও আলাপ হওয়ার সম্ভবনা কম নয়। সকাল বেলায় বেরুলেও মাঝপথে সন্ধ্যা হবেই। তখন একটা আশ্রয়ের দরকার।

মাঝ-পথের কাছাকাছি স্থানীয় রাজার একটি শিকার কুঠি ছিল। রাজা বা তার বন্ধুরা শিকারে বেরুবে এই কুঠি হত তাঁদের প্রধান আস্তানা।

রাজার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল। তাকে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, শিকার-কুঠিতে একটা রাতের জন্য আমাকে মাথা গোঁজবার জায়গা দিতে হবে।

ম্যানেজার বললেন, "এখন শিকারের সময় নয়, কুঠি খালি পড়ে আছে। আপনি একরাত কেন, একমাস থাকতে পারেন। এখানকার পুলিস-সুপারিন্টেনডেন্ট টেলর সাহেবও আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম করবেন। কুঠিতে আরো ঘর আছে, আপনারও থাকবার অসুবিধা

হবে না। কিন্তু—

— "কিন্তু কি?

— কিন্তু আপনি সেখানে রাত কাটাতে পারবেন কি?

— "কেন পারব না?

— "লোকের মুখে শুনি, কুঠিতে নাকি অপদেবতার ভয় আছে?

— "অপদেবতা?

— "হ্যাঁ, অপদেবতা ছাড়া আর কি বলব? কুঠির পাশেই শালবনের ভেতরে সাঁওতালীদের এক ভুতুড়ে দেবতা আছে। সেই দেবতা নাকি ভূতের রাজা। তার ভয়ে সাঁওতালীরা পর্যন্ত সন্ধ্যার পর ওপাড়া মাড়ায় না। তারা বলে, তাদের দেবতা নাকি রাতের বেলায় কুঠির ভেতরে ঘুমোতে আসে।

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, "বেশ তো, মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে রাত্রিবাস করব, এটা তো মস্ত পুণ্যের কথা। আমি রাজী।

ম্যানেজার বললেন, "আমি অবশ্য ও সব ছেলেমানুষী কথায় ততটা বিশ্বাস করি না, তবু বলা তো যায় না।—

যথাসময়ে ডুলিতে চড়ে রওনা হয়ে, সন্ধ্যার কিছু আগেই শিকারকুঠিতে পৌঁছুলাম।

ডুলি বেয়ারারা বলে গেল, মাইল তিনেক তফাতে একটা গাঁয়ে গিয়ে তারা আজকে রাতটা কাটাবে; কাল সকালে আবার ডুলি নিয়ে আসবে।

কুঠি বারান্দার একখানা বেতের চেয়ারে বসে টেলর সাহেব তামাকে পাইপ টানছিলেন। সাহেবের সঙ্গে আমারও বেশ পরিচয় ছিল।

আমাকে দেখে সাহেব বললেন, এই যে গুপ্ত যে। তুমি কোথার যাচ্ছ?

— ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি।.....তুমি?

— আমি, হোমে যাচ্ছি। তুমি কি আজ এখানে থাকবে?

— হ্যাঁ, সাহেব।

— বেশ, বেশ দু'জনে একসঙ্গে রাত কাটানো যাবে, এ ভালোই হল।

— দু'জনে কেন সাহেব, তিনজন।

— তিনজন আবাব কে? তুমি আমার আর্দালীর কথা বলছ?

ও তাকে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না।

— না সাহেব তোমার আর্দালির কথা বলছি না।

— তবে কি কুঠির দ্বারবানের কথা ভাবচ? না সে রাত্রে এখানে থাকে না।

— না না আমি দ্বারবানের কথাও বলছি না।.....তুমি কি শোনোনি সায়েব সাঁওতালীদের :ক দেবতা রাত্রে আমাদের সঙ্গী হতে পারেন?

টেলর হেসে বললে ওহো শুনেছি বটে। তা সে রূপকথার একবর্ণও আমি বিশ্বাস করি

না...তুমি কর নাকি?

— করলে একলা এখানে রাত কাটাতে আসি? টেলর পাইনে তিন চারটে টান মেরে বললে দেখ গুপ্ত, সাঁওতালীদের এই দেবতাটিকে আমি দেখেছি। এমন বীভৎস দেবতা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে।

— পছন্দ হয়েছে?

— হ্যাঁ। তাই ঠিক করেছি কাল যাবার সময়ে তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ইংল্যাণ্ডে আমার বাড়ির বৈঠকখানায় তাকে সাজিয়ে রেখে দেব। আমার বন্ধুরা তাকে দেখলে খুব তারিফ করবেন।

আমি হেসে বললুম তাহলে বোঝা যাচ্ছে কাল থেকে দেবতা আর কুঠির ভেতরে শুতে আসবেন না। তবে এই বেলা তাঁকে একবার দর্শন করে আসি— তাঁর আড্ডা কোথায়?

টেলর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে ঐ যে ঔখানে। মিনিট খানেকের পথ।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। কুঠির পাশেই অনেকগুলো শালগাছ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই ছায়ায় একটা পাথুরে টিপির উপরে মানুষের মত উঁচু একটা মূর্তিকে দেখতে পেলুম।

মূর্তিটা রং করা কাঠের। তার দেহের মাপ মানুষের মতন বটে কিন্তু তার মুখ-দানবের মতন প্রকাণ্ড। আর সে মুখের ভাব কি ভয়ংকর। দেখলেই বুকের কাছটা ছাঁৎ ছাঁৎ করতে থাকে।

মাথার চুলগুলো সাপের মতন ঝুলছে। কান দুটো হাতীর মতন মুখখানা খানিক সিংহ আর খানিক ভাল্লুকের মতন, দু-দুটো গোল গোল কাঁচের চোখ আগুনের মত জ্বলছে। হাঁ করা বড় বড় দাঁতওয়ালা মুখের ভিতর থেকে রাঙা টক্ টকে লক্‌লকে জিভের আধখানা বাইরে বেরিয়ে পড়ে ঝুলছে। কাধ ও মুণ্ডের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয়, কে যেন একখানা লিক্‌লিকে সরু বাঁখারির উপরে মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে। হাত দু'খানা বাঘের থাবার মত। কোমরের কাছ থেকে পা পর্যন্ত দেহের কোনও অঙ্গ দেখা যাচ্ছে না। কাঠের কুঁদে আর কোন অঙ্গ গড়াই হয়নি। মূর্তির গায়ের রঙ আলকাতরার মতন কালো আর মুখের রঙ খানিক সাদা, খানিক তামাটে ও খানিক হলদে।

ভাবলুম, এ মূর্তি যদি সত্য সত্য রাত্রে কুঠির ভিতরে ঘুমোতে আসে, তা'হলে আমাদের ঘুম এ জীবনে আর ভাঙবে কি?

— ধীরে ধীরে কুঠিরের দিকে ফিরে এলুম। টেলর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল। আমাকে দেখে সে বললে, "গুপ্ত, খুব ঝড়-বৃষ্টি আসছে, ঐ দেখ।"

সত্য কথা। পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন কালো কস্টিপাথর হয়ে গেছে! ঝড় উঠতে আর দেরি নেই।

ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে করতে করতে

অনেকক্ষণ আগে 'ডিনার' খেয়েছি। এখন টেলর তার ঘরে শুয়ে হয়তো দিব্য আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। কিন্তু আম'র চোখে ঘুম নেই।

ভূত-টুত কিছু মানি না ; তবু কেন জানি মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে। রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালী দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত আনাগোনা করছে। যত তাদের ভুলবার চেষ্টা করি আজেবাজে নানান কথা ভেবে, তত তারা মনের উপরে চেপে বসে, নরম মাটির উপরে ভারী পায়ের দাগের মত।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝম ঝম রম ঝম মাঝে মাঝে ঝড়ো, দমকা হাওয়া হাহা হা হা করছে! যেন কোন আহত আত্মার কান্না! চারিদিকে থেকে বনের গাছপালাগুলো মর-মর-মর ক'রে যেন কোন শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে। তারই ভিতর থেকে একবার শুনলুম হায়েনার অট্টহাসি, একবার শুনলুম শৃগালদের মড়াকান্না, একবার শুনলুম বাঘের গর্জন ?....

হঠাৎ আমার ঘরের দরজার উপর দুম দুম করে আঘাত হল। ধর্‌মড় করে আমি বিছানার উপরে উঠে বসলুম,—সে কি আসছে?—সে কি আসছে?

দরজার উপর আর কোন আঘাত হ'ল না। ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় দরজা ন'ড়ে উঠেছে নিশ্চয়! নিজের কাপুরুষতার জন্য মনে মনে নিজেই লজ্জিত হয়ে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, এমন সময় বাহিরে থেকে ঝাঁঝালো গলায় গান শুনলুম—

"লোগোবুরু ধীরকো সিনিন্ ঘণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়"

এতো সাঁওতালী ভাষা। নিশ্চয়ই কোন সাঁওতালী গান গাইছে। কিন্তু এত রাত্রে এমন ঝড় বাদলে, এই হিংস্র জন্তু ভরা গভীর অরণ্যের মধ্যে কোন সাঁওতালী মনের আনন্দে সখ করে গান গাইতে আসবে?

আবার দরজার উপর ঘন ঘন আঘাত হল—এবারে আরো জোরে। ......আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল! এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয়, এ সত্য সত্যই কে দরজা ঠেলছে আর ঠেলছে! ... তবে কি সে এখানে ঘুমোতে এসেছে?

আবার গান শুনলুম। এবার আমার খুব কাছে, একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে। সেই তীব্র ঘন্‌ঘনে গলার গান।

"লোকোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়"

হঠাৎ উল্টো বিপদ! কুঠির ভিতর দিক্‌কার দরজায় ঘন ঘন আঘাত। ভিতরে বাহিরে বিপদ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছি, এমনি সময়ে শুনলাম—"গুপ্ত। গুপ্ত। ভগবানের দোহাই, দরজা খোলো—দরজা খোলো শীগ্‌গির।"

এ তো টেলরের গলা.....আঃ। বাঁচলুম। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম। টেলর হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল।—তার চোখ মুখ পাগলের মত, হাতে বন্দুক।

আমি তাকে দু হাতে চেপে ধরে বললুম, "মিঃ টেলর, হয়েছে কি? এত রাত্রে কি দরকাব তোমার?"

টেলর দেয়ালে ঠ্যালান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে,—গুপ্ত, আমার ঘরের দরজায় ক্রমাগত কে লাথি মারছে আর গান গাইছে। তুমিই কি আমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকছিলে?

আমি বললুম, 'না না। আমি আমার বিছানা ছেড়ে এক পা'ও নড়িনি। কিন্তু আমারও ঘরের দরজা যে কে নাড়ছে, আর গান গাইছে।..... ঐ শোনো।

দুম দুম করে আমার ঘরের দরজায় আবার দু বার প্রচণ্ড আঘাত হল,—সঙ্গে সঙ্গে সেই গান—

"লোগোবুরু ধীরকো সিনি্ন ঘণ্টাবাড়ি মা কাওয়াড়।"

—আচমকা আবার একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে দরজা জানালার উপরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খড়খড়ি দুম দাম করে খুলে গেল।

—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে স্পষ্টই দেখলুম, বারান্দার উপরে কার একটা জীবন্ত ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে ও? কে ও ? ও কি সেইই—যে প্রতি রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসে—আমার মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল।

টেলরের বন্দুক গুড়ম্ করে গর্জে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা সাঁৎ করে বারান্দার একপাশে আমাদের চোখের আড়ালে সরে গেল।

টেলর চেঁচিয়ে উঠল, "গুপ্ত। গুপ্ত। জানলা বন্ধ করে দাও —জানলা বন্ধ করে দাও।

পা চলতে চাইছিল না। কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালী কাপুরুষ, সেই ভয়ে নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে দমন করে আমি জানলার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলুম।

টেলর টলতে টলতে আমার বিছানার উপর বসে পড়ে বললে, 'গুপ্ত। কিছু মনে করো না আমি আজ তোমার বিছানাতেই তোমার সঙ্গেই রাত কাটাব।'

বাইরে আবার কে গান গাইলে—

"লোগোবুরু ধীর্‌কো সিনিন্ ঘান্টাবাড়ি মা কাওয়ার্ড।"

সকালবেলা। কিন্তু তখনো সমান ভাবে বৃষ্টি ঝরছে আর ঝরছেই।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সারা আকাশখানা যেন কালো মেঘের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা, সূর্য্যকে কেন আজ কোন অন্ধকার রাহু গ্রাস করে ফেলেছে। যতদূর নজর চলে খালি দেখা যায় অগণ্য শ্যামল তরুর বিরাট সভ্য আর শৈলমালার গর্বোন্নত শিখর এবং তারই ভিতর এসে পড়ছে তীরের চক্‌চকে ফলার মত বৃষ্টির অশ্রান্ত ধারাগুলো। কোথাও পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বা কোন জীবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—পথের উপর দিয়ে ক্রুদ্ধ জলস্রোত যেন কোন্ অদৃশ্য শত্রুকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে।

হঠাৎ বারান্দার এক কোণে চোখ গেল। কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একজন শুয়ে রয়েছে।

কাছে গিয়ে ডাকলুম এই। কে তুই? বার কয়েক ডাকা ডাকির পর কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা সাঁওতালী মুখ বেরুল।

—কে তুই?

—আমি ঠাকুরের পূজারী।

—ঠাকুর। কে ঠাকুর?

—যিনি ঐ শালবনে থাকেন।

—এখানে কি করছিস?

—ঠাকুর রোজ রাত্রে এখানে ঘুমোতে আসেন তাই আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসি।

—কাল রাত্রে তাহলে তুই দরজা ঠেলছিলি?

—আমিও ঠেল্‌ছিলুম ঠাকুরও ঠেলছিলেন।

—আর গান গাইছিল কে?

—আমি।

এমন সময় টেলরও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে সব কথা খুলে বললুম। টেলরতো শুনেই মহা ক্ষাপ্পা, ঘুষি পাকিয়ে পুরুতের দিকে ছুটে যাবামাত্র সে এক লাফে বারান্দার রেলিং টপ্‌কে বাইরে পড়ে বনের ভিতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

টেলর বললে রাস্কেলকে ধরতে পারলে একবার দেখিয়ে দিতুম। ওঃ সারারাত কি অশান্তিতেই কেটেছে।

আমি বললুম যাক যা হবার তা তো হয়ে গেছেই। এখন আমাদের কি উপায় হবে। কুঠির দ্বারবানও এল না, ডুলি বেয়ারাও এই দুর্যোগে বোধ হয় আসবে না। আমরা যাব কেমন করে?

টেলর বললে, "আমাকে যেমন করেই হোক আজ যেতে হবেই। বোম্বে যাবার টিকিট পর্যন্ত আমি কিনে ফেলেচি। উপায় থাকলে তোমাকেও আমি ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতুম। কিন্তু আমার 'টু-সিটার' গাড়ি—আমি, আমার আর্দালি, তুমি, তোমার চাকর আর তোমার মালপত্তর অতটুকু গাড়িতে তো ধরবে না, কাজেই তোমাকে এখানে ফেলে রেখেই আমাকে যেতে হবে—আর্দালী।"

টেলরের আর্দালি এসে সেলাম করলে।

টেলর বললে, "আমার মালপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে তোলো। তারপর শালবন থেকে সেই কাঠের পুতুলটা তুলে নিয়ে এস।"

আমি বললুম, "তুমি কি সত্যি-সত্যিই ঐ পুতুলটা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে চাও?"

টেলর বললে, "নিশ্চয়! আমার যে কথা সেই কাজ!"

এবার রাত এল। বৃষ্টি এখনো থামেনি, আমি এখনো কুঠিতে বন্দী হয়ে আছি।

টেলর চ'লে গেছে এবং যাবার সময়ে সাঁওতালীদের ভূতের রাজাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে। সে আর এই কুঠির ভিতর ঘুমোতে আসবে না।

চোখে ঘুম আসছিল না। একখানা ইংরেজী নভেল বার করে পড়তে বসলুম। ঘণ্টা দেড়েক পরে তন্দ্রার আবেশ এল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে শয়নের উপক্রম করছি, এমন সময়ে শুনলুম, বাইরের সিঁড়ির উপরে আওয়াজ হ'ল, ঠক, ঠক, ঠক!

ঠিক যেন কাঠের আওয়াজ! ঠক্ ঠক্ করতে করতে আওয়াজটা আমার ঘরের কাছ বরাবর এল তারপর দরজার উপরে শুনলুম ধাক্কার পর ধাক্কা।

কি আপদ। টেলর তো পুতুলটাকে নিয়ে কোন সকালে বিদায় হয়েছে, এ আবার কে জ্বালাতে এল।

নিশ্চয় সেই সাঁওতালী পুরুষ ব্যাটা। সে হতভাগা রোজ রাত্রে এইখানে আরাম ক'রে ঘুমোয় আর চারিদিকে রটিয়ে দেয়—কুঠির ভিতরে ভূতের রাজা শুতে আসেন।

ধাক্কার জোর ক্রমেই বেড়ে চলল—একবার ভাবলুম দরজা খুলে পুরুতটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দি। তারপর মনে হ'ল সে কাজ ঠিক হবে না। এই দুর্যোগে বিজন জঙ্গলের ভিতরে রাত্রে একলা আমি এখানে আছি, যদি কোন দুষ্টু লোক কুমতলবে এসে থাকে?

বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার এক জায়গায় একটা ছ্যাঁদা ছিল বন্দুকের নলটা সেইখানে রেখে চেঁচিয়ে বললুম, "কে আছ চ'লে যাও, নইলে এক্ষুনি আমি বন্দুক ছুঁড়ব!"

কোন জবাব নেই, দরজার উপর ধাক্কাও থামল না।

"এখনো আমার কথা শোনো, নইলে—"

বাইরে বিশ্রী গলায় কে হাসতে লাগল—হি হি হিঃ, হি হি হিঃ হিহিহিহি—

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম—সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপরে ধাক্কা ওথেমে গেল।

ঠক্ ঠক্ করে একটা আওয়াজ ঘরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল—তারপর কুঠির সিঁড়ির উপর শব্দ শুনলুম ঠক্ ঠক্ ঠক্।

খানিক পরে অনেক দূর থেকে আবার সেই বিশ্রী হাসি শোনা গেল, হি হি হিঃ হি হি হিঃ হিহিহিহি—

সে হাসি অমানুষিক—শরীরের রক্ত যেন জল করে দেয়।

শেষ রাতে জল ধ'রে গেল।

সকালে দরজা খুলতেই কাঁচা সোনার মত কচি রোদ এসে ঘরখানা যেন হাসিতে ভরিয়ে তুললে। রোদ দেখে মনটা খুসী হয়ে উঠল।

বারান্দায় বেরিয়েই দেখি, এক কোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে।

তেড়ে গিয়ে মারলুম তাকে এক ধাক্কা। ধড় মড় করে সে উঠে বসল। সেই সাঁওতালী পুরুতটা।

ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "কাল আবার কি করতে এখানে এসেছিলি, ভারী চালাকি পেয়েছিস্ না?"

লোকটার মুখের ভাব একটুও বদলালো না। শান্তস্বরে বললে, আমার ঠাকুর কাল এখানে ঘুমোতে এসেছিলেন আমিও তাই এসেছিলুম।"

—"তোর ঠাকুর কোথায়? সাহেবতো তাকে নিয়ে চ'লে গেছে।"

—"আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন সেইখানেই আছেন।"

—মিথ্যা কথা। আমি নিজের চোখে দেখেছি টেলর তাকে নিয়ে চলে গেছে।

আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন সেইখানেই আছেন।

কুঠি থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটে পাশের শালবনে গিয়ে হাজির হলুম।

সবিস্ময়ে দেখলুম ভূতের রাজা চোখ পাকিয়ে লকল্‌কে জিভ বার করে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

আর আর ও কি? মূর্তির পেটের উপরে একটা গর্ত—ঠিক যেন বন্দুকের গুলির দাগ। গর্তের চারপাশে রক্ত জমাট হয়ে আছে—মূর্তির আরো নানা জায়গাতেও রক্তের চিহ্ন।

তবে কি আমার বন্দুকের গুলিই—ভাবতে পারলুম না মূর্তির দিকে আর তাকাতে পারলুম না, কেমন একটা অজানা ভয়ে আমার শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

কলম-ভূত

রাধারমণ রায়

স্বনামধন্য সাহিত্যিক সুধন্য চৌধুরী লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছেন বছর চারেক হল। ওঁর ভাষায়, আমি রিটায়ার করেছি। এরপর এই চার বছরের মধ্যে ওঁকে দিয়ে কেউ চার লাইনও লেখাতে পারেনি। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা দিনের পর দিন ওঁর বাড়িতে ধর্না দিয়েও সুবিধে করতে পারেননি। উনি বলেন, লেখার শক্তিটাই তো নেই ; লিখব কী করে? বেশি পীড়াপীড়ি করলে বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠেন, অন্যদের কথা জানিনে। আমি লেখক হয়েছিলাম স্রেফ একটা কলমের জোরে। যদ্দিন কলমটা হাতে ছিল, তদ্দিন লেখক ছিলাম। এরপর যেদিন সেটা হারিয়ে গেল, সেদিন থেকে আমার লেখক-জীবনও শেষ হয়ে গেল। তারপর থেকে টানা অবসর। কলমটা হাতে আসার আগে যা ছিলাম, সেটা হারিয়ে যাওয়ার পর ঠিক তা-ই হয়ে গেলাম। অর্থাৎ বেকার। এখন শুধু আড্ডা। প্রথম জীবনে আড্ডা ছিল রাস্তার মোড়ে, এখন আড্ডা মারি নিজের বাড়িতে বৈঠকখানায়। আর জানতে চাও?

সুধন্যদার বাড়ির আড্ডায় আমারও যাতায়াত আছে। অফিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় পালটে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যের সময় চলে যাই, ওঁর বাড়িতে। এতে যাতায়াত খরচ নেই, পায়ে হেঁটেই চলে যাই ; কেননা আমি ওঁর প্রতিবেশী, একই পাড়ায় আমাদের বাড়ি। ওঁর

আর আমার বাড়ির দূরত্ব দু-শো মিটারও নয়।

এই আড্ডায় প্রকাশক সাহিত্যিক আর সম্পাদকদেরই সংখ্যা বেশি। আমি নিজেও একজন সাহিত্যিক যদিও নাম করতে পারিনি। সুধন্যদা আমাদের মধ্যমণি। মাঝে-মধ্যে বউদি অর্থাৎ সুধন্যদার স্ত্রীও আমাদের আড্ডায় এসে যোগ দেন। ওঁদের ছেলে নেই। দুই মেয়ে- দু-জনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড়ো মেয়ে আমেরিকায় থাকে, ছোটো মেয়ে মুম্বাইতে। কাজেই আড্ডা জমানোর পক্ষে খুবই উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ওঁদের বাড়িটা।

প্রতিবেশী হিসেবে আমি জানি, সুধন্যদা লিখতে শুরু করেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। তার আগে চিঠি আর ফর্দ ছাড়া আর কিছু লেখেননি। না, পোস্টারও না। কেন না উনি কখনও রাজনীতি করেননি। চাকরিও করেননি কাজেই অফিসের নোট লেখার প্রশ্নই ওঠে না। তখন ওঁর পেশা ছিল ছেলেমেয়েদের যোগ-ব্যায়াম শেখানো। নিজের বাড়িতেই একটা যোগ-ব্যায়ামের স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। প্রায় দেড়শো জন ছাত্রছাত্রী ছিল। মাথাপিছু মাইনে ছিল পাঁচটাকা।

পাড়ার বয়স্কদের কাছে শুনেছি, ছোটোবেলায় সুধন্যদা ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল ছিলেন না। পড়তেন পাড়ারই একটা অনামী স্কুলে। ওঁর সহপাঠী ছিলেন আমার এক জ্যাঠতুতো দাদা। তাঁর কাছ থেকে জেনেছি, উনি বাংলায় খুবই কাঁচা ছিলেন। স্কুল ফাইনালে বাংলার জন্য আর-একটু হলেই হড়কে যাচ্ছিলেন। কোনও রকমে দু-শোর মধ্যে বিরাশি পেয়েচৌকাঠ পেরিয়েছেন।

সেই সুধন্যদা পঁয়তাল্লিশ বছরে কলম ধরে অবিশ্বাস্যভাবে এগারো বছরের মধ্যে তেইশখানা উপন্যাস আর একশো ছত্রিশখানা গল্প লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। লেখা ছেড়ে দেওয়ার চার বছর পরেও ওঁর নাম থাকে বেস্টসেলার লিস্টে। রয়্যালটির মোটা টাকা আজও ওঁর পকেটে আসে।

পুরস্কারও উনি কম পাননি। রবীন্দ্রপুরস্কার থেকে শুরু করে একাডেমি আর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও উনি পেয়ে গিয়েছেন। এ-সব পুরস্কারের আর্থিক মূল্য কম না।

আরও ব্যাপার আছে। ওঁর বেশ কয়েকটা উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে বাংলা আর হিন্দিতে সিনেমা হয়েছে। টি. ভি সিরিয়ালও হয়েছে।

কাজেই একহাতে লিখে দু-হাতে টাকা কুড়িয়েছেন। লেখক হিসেবে নাম করেছেন বলেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আর সেই সুবাদে মেয়েদের ভাল বিয়ে দিয়েছেন। একতলা বাড়িটাকে তে-তলা করেছেন। আর একখানা দামি মোটরগাড়ি কিনেছেন। তা ছাড়া পাড়ার মাতব্বরি তো বাড়তি পাওনা। পুজো-কমিটির প্রেসিডেন্টের পোস্টে তো উনি পার্মানেন্ট হয়ে গিয়েছেন।

একদিন আড্ডায় সুধন্যদাকে চেপে ধরলাম। বললাম, "লোকে তো লিখতে লিখতে লেখক হয়। আপনি কেমন করে লেখক হলেন, আজ আপনাকে বলতেই হবে।"

সুধন্যদা চাপে চিপসে যাওয়ার পাত্র নন। হাসতে হাসতে বলেন, "এর উত্তর অনেকবারই

বলেছি। স্রেফ একটা কলমের জোরে।”

“সেই গল্পই আজ আমাদের শোনান। কলমটা কোথায় পেলেন, প্রথম গল্পটা কী ভাবে লিখলেন, গল্প লেখা ছেড়ে দিলেন কেন, আপনার লেখার কলমটা কোথায় গেল, সব আপনাকে বলতে হবে। কিচ্ছু বাদ দেওয়া চলবে না”। বলেই পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করে সুধন্যদার দিকে এগিয়ে ধরলাম।

সুধন্যদা একটিপ নস্যি নাকের ভেতর গুঁজে দিয়ে মিনিট দুয়েক গুম হয়ে বসে রইলেন। চোখদুটোও বুজে ফেললেন। তারপর চোখ খুলে উচ্চারণ করলেন, “বেশ, বলছি, কিন্তু বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ব্যাপার। তোমাদের যুক্তিবাদী মনে যদি দাগ না কাটতে পারি, আমাকে দোষ দিতে পারবে না।”

“আপনি কি আমাদের অলৌকিক গল্প শোনাতে চাইছেন?” আমি শুধোলাম।

“গল্পটা অলৌকিক হলেও লৌকিক। সত্যি ভূতের গল্প।”

“আপনি তো কখনও ভূতের গল্প লেখেননি।”

“তা ঠিক। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমি লেখার শক্তি পেয়েছিলাম একজন শ্রদ্ধেয় ভূতের কাছ থেকে। তিনিই তাঁর কলমের মাধ্যমে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন।”

এ-সময় আমার মনে অন্য একটা কথা এল। কিন্তু প্রকাশ করলাম না। সুধন্যদা কী বলেন, সেটাই আগে শোনা যাক।

এরপর উনি যা বললেন, তার সারবস্তু এরকম ঃ

লেখক-জীবন শুরু করার কয়েক দিন আগে সুধন্যদা ওঁর যোগ-স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন টাকীতে। ইছামতীর ধারে একটা পোড়ো বাড়িকে ওঁরা পিকনিক স্পট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে যখন রান্নাবান্না চলছিল, তখন সুধন্যদা একা নদীর পাড় ধরে উত্তরদিকে হাঁটছিলেন। একাই। পাড়ে ভাঙনের ছাপ ছিল। অনেকগুলো বাড়ির খানিকটা করে অংশ নদীর গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। প্রায় এক-কিলোমিটার যাওয়ার পর এরকম একটা আধভাঙ্গা পোড়ো বাড়িতে এসে উনি উপস্থিত হলেন। সেখানে উনি দেখলেন কিছু কাগজপত্র আর টুকিটাকি জিনিসপত্র কেউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গিয়েছে। বুঝলেন, কোনও চোরের কাজ। কোনও গৃহস্থবাড়ি থেকে হয়তো সে একটা বাক্স-টাক্স চুরি করে এনেছিল। তারপর এখানে এসে তা থেকে দামী জিনিসগুলো নিয়ে বাকিগুলো ফেলে দেয়। এরপর সেই বাক্সটাকে হয়তো সে নদীর জলে ছুঁড়ে দেয়।

পড়ে থাকা জিনিসগুলোর ওপর চোখ বুলোতেই সুধন্যদা আবিষ্কার করলেন বহুদিনের অব্যবহার্য পুরোনো মডেলের একটা ফাউন্টেন পেন। উনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে পিকনিক স্পটের দিকে ফিরে চললেন। কলমটার কথা কাউকে বললেন না। এমন কী বউদিকেও না।

পরে কলকাতায় ফিরে উনি গরম জলে কলমটাকে ধুয়ে সাফ করলেন। নিবটা ছিল সোনার। কাজেই সেটা বহুদিন অব্যবহার্য থাকা সত্ত্বেও অকেজো হয়নি। কলমটায় কালি

ভর্তি করে প্রথমে উনি এক-টুকরো সাদা কাগজে নিজের নাম লিখলেন। তারপর লিখলেন বউদির নাম। এরপর যে-দেবীর নাম কখনও চিঠিপত্রেও লেখেননি, সেই দেবীর নাম লিখলেন। ইনি হচ্ছেন দেবী সরস্বতী। কলম দিয়ে মুক্তোর মতন অক্ষর বেরোতে লাগল। অক্ষর দেখে সুধন্যদা তাজ্জব বনে গেলেন। এ কি ওঁর হাতের লেখা? না, ওঁর হাতের লেখা তো এ-রকম সুন্দর নয়। তা হলে? অথচ ওঁর হাত দিয়েই এ-সব অক্ষর বেরিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যের সময় সুধন্যদা ওঁর শ্বশুরমশাইকে একটা চিঠি লিখতে বসলেন। আগে বাঁধা গদে লিখতেন। 'শ্রীচরণেষু পরম পূজনীয় বাবা' বলে শুরু করে 'আপনার স্নেহধন্য সুধন্য' বলে শেষ করতেন। মাঝখানে থাকত 'আমরা একরকম আছি', 'আপনারা কেমন আছেন' ইত্যাদি গোটা আষ্টেক বাক্য অথবা বাক্যাংশ। অথচ আজ চিঠি লিখতে বসেই ওঁর কলম দিয়ে গদের বাইরের কথা বেরোতে লাগল। ওঁর কলম ছুটতে লাগল লাইন দেওয়া কালো রঙের পিঁপড়ের গতিতে। আজকের আরম্ভে ছিল 'সবিনয় নিবেদন'। প্রায় হাফ দিস্তা কাগজ শেষ করে উনি লিখলেন 'শুভেচ্ছাপ্রার্থী সুধন্য'।

বউদির চাপে পড়েই সুধন্যদা শ্বশুরমশাইকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সেই চিঠি নিজে পড়ে বউদি নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলতেন। এদিন চিঠি পড়তে গিয়ে উনি বারবার হোঁচট খেতে লাগলেন। মাঝে মাঝেই উনি বিভিন্ন শব্দের মানে জানতে লাগলেন। সে-সব শব্দের সবগুলোর মানে সুধন্যদাও জানেন না। অনুমানে বলে দিতে লাগলেন।

বাড়িতে দেবসাহিত্য কুটীরের একটা বাংলা অভিধান পোকার খোরাক হিসেবে পড়ে ছিল। সেটা খুলে উনি চিঠিতে ব্যবহার করা কিছু তৎসম শব্দের বানান মিলিয়ে নিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, সবগুলো বানানই শুদ্ধ লিখে ফেলেছেন! অথচ স্কুলের বানান পরীক্ষায় কখনও শতকরা কুড়িটা বানানও ঠিক লিখতে পারতেন না। ভুল শব্দের বানান লিখতেন 'ভূল' কৌতূহলকে লিখতেন 'কৌতুহল'। ভৌগোলিক শব্দের বানান 'ভৌগলিক' লেখার জন্য ভূগোল-স্যারের কাছে টেনে উঠেও চড় খেয়েছেন। সেই সুধন্যদা চিঠিতে ব্যবহার করা কঠিন বানানগুলো ঠিক ঠিক লিখে গিয়েছেন। এমন কী চিঠির শিরোনামায় 'শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়' পর্যন্ত ঠিক লিখেছেন। এর আগে 'দুর্গা'র বানান লিখতেন 'দূর্গা'। আজ খটকা লাগতে ডিকসনারি দেখে নিলেন। 'দুর্গা' বানানটাই ঠিক। 'দ্'-এর নিচে 'ঊ'-কার হবে না।

বউদি চিঠি পড়ে বললেন, "বাহ্! তুমি তো ইচ্ছে করলেই গল্প লিখতে পারো।"

গল্প লেখা! কথাটা তো মন্দ নয়। একবার চেষ্টা করে-দেখতে ক্ষতি কী, যে-লোক দশ লাইন চিঠি লিখতে গিয়ে একঘণ্টা সময় নিত আর পনেরো-বিশটা শব্দের বানান ভুল লিখত, সে যদি এই সময়ের মধ্যে পাঁচ-ছ পাতা ঝরঝরে ভাষায় চিঠি লিখতে পারে, সে-লোক চেষ্টা করলে হয়তো গল্পও লিখতে পারবে।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর সুধন্যদা কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। কী লিখবেন? চরিত্র, বিষয় আর ভাবের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান হবে ওঁর গল্পে? গল্পের বিষয়বস্তু কী হবে? তার নামকরণই বা কী হবে? অমনই ওঁর কলম দিয়ে প্রথম পাতার মাথার ওপর লেখা হয়ে

গেল 'পুরস্কার'। তারপর গড়গড় করে তিনঘণ্টার মধ্যে দশ পাতা লিখে ফেললেন। এরপরে কাউকে না জানিয়েই সেটা ডাকে একটা নামকরা পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পরের মাসে গল্পটা ছাপা হল। সম্পাদক আরও লেখা চাইলেন।

এরপর সুধন্যদাকে পায় কে? উনি নিয়ম করে রোজ একটা করে গল্প লিখে ডাকে এক-একটা পত্রপত্রিকার অফিসে পাঠাতে লাগলেন। সবগুলো লেখাই ছাপা হল। পাঠক-মহলে হৈহৈ পড়ে গেল। শুরু হল ওঁর জয়যাত্রা। নামী-দামি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা ওঁর কাছ থেকে লেখা চাইতে লাগলেন। গল্পের সঙ্গে উপন্যাসও লিখতে লাগলেন উনি। এত ভাল উপন্যাস এ-যুগের কেউ লিখতে পারেননি। তবে বিগত যুগের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রাসবিহারী মজুমদারও সাড়া জাগানো উপন্যাস লিখে অনেক নাম, পুরস্কার আর টাকা পেয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী আজও বেস্ট-সেলার। বইমেলায় আজও ক্রেতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়। তাঁকে ভাঙিয়ে প্রকাশক আজও পুষ্ট হয়ে রয়েছেন। সেই রাসবিহারী মজুমদারের উত্তরসূরী বলা হয় আধুনিক যুগের সুধন্য চৌধুরীকে।

এগারো বছর ধরে একটানা লিখে চললেন উনি। যোগ-ব্যায়ামের স্কুল তুলে দিলেন। এখন ওঁর বাড়িতে ব্যায়াম চর্চার পরিবর্তে সাহিত্য-চর্চা চলে। এই এগারো বছরে মোট তেইশটা উপন্যাস এক-শো ছত্রিশখানা গল্প লিখে উনি, এ-যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে শাহেনশাহ্ হয়ে গেলেন। চারদিকে ওঁর জয়জয়কার। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় আর ইংরেজিতে ওঁর বই অনুবাদ করে প্রকাশকরা প্রকাশ করতে লাগলেন। লেখা শুরু করার দু-বছরের মধ্যেই পেলেন রবীন্দ্র পুরস্কার। চার বছরের মাথায় পেলেন একাডেমি পুরস্কার। আর দশ বছরের শেষে পেলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। ওঁর 'দেশদ্রোহী' উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে সিনেমা করলেন বিশ্বদীপ গাঙ্গুলি। সেটা করেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হলেন। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে সেটি প্রথম পুরস্কার পেল। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেলেন বিশ্বদীপবাবু।

এরপর সুধন্যদার উপন্যাস নিয়ে বাংলায় একের পর এক সিনেমা হতে লাগল। হিন্দিতেও হল। সব বইতেই মারমার কাটকাট। সব-কটা সিনেমাই হিট। ওঁর গল্প নিয়ে টি.ভি. সিরিয়ালও হল। সেখানেও হৈহৈ।

নাম, পুরস্কার, প্রতিষ্ঠা, টাকা সবকিছুই পেয়ে গেলেন সুধন্যদা। ছাত্রজীবনে যিনি বাংলায় ফেল করতে করতে টিকে যেতেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে যিনি প্রথম গল্প লেখেন, তিনি মাত্র এগারো বছরের মধ্যে শাহেনশাহ্ সাহিত্যিক হবেন, এটা আমাদের ভাবনায় আসে না। সুধন্যদাও ভাবেননি।

এরপর সুধন্যদা মন্তব্য করলেন, "আমি যা করেছি, যা পেয়েছি, সবই কলম-শক্তির জোরে।"

আমি শুধোলাম, "সেই কলমটা কার ছিল?"

"তার উত্তরও পেয়েছি। দাও, আর-একটিপ নস্যি দাও। তারপর বলছি।" এই বলে

আমার কৌটো থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে নাকের ভেতর গুঁজে দিয়ে রুমাল দিয়ে নাক মুছে ফের শুরু করলেন। বললেন, "একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে ভাবছি, লেখার কলমটা কার হতে পারে? এমন সময় মাথায় আইডিয়া এসে গেল। লিখতে লাগলাম। কলম দিয়ে যা বেরোল, তা পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাসবিহারী মজুমদারের আদি বাড়ি ছিল টাকীতে। পরে কলকাতাতেও বাড়ি করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর কলকাতার বাড়ি সমেত রয়্যালটির যাবতীয় টাকা দান করেন কোন একটা সেবা-প্রতিষ্ঠানকে। তিনি বিয়ে করেননি। সংসারে আপনজন বলতে ছিল কেবল একজন ভৃত্য। তার নাম ছিল রামধন। শেষ-জীবনে রামধনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যান তাঁর গ্রামের বাড়িতে। সেখানে তাঁর কিছু বিষয়সম্পত্তি ছিল। সে-সব তিনি রামধনকে উইল করে দিয়ে যান।

"রামধনের দেশ ছিল বিহারে। সেখানে তার বউ ছিল, দুটো বাচ্চাও ছিল। রাসবিহারীর অনুমতি নিয়ে সে তার বউ-বাচ্চাদের দেশ থেকে টাকীতে নিয়ে আসে।

"রাসবিহারী শেষ-জীবনে বড়ো একটা লিখতেন না। দু-একটা যা লিখতেন, সেগুলো ছিল স্মৃতিকথা।

"১৯৫৭ সালের ২৬ জুন তারিখে দিক্‌পাল-সাহিত্যিক রাসবিহারী মজুমদার তাঁর টাকীর বাড়িতে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর উইল অনুসারে কলকাতার বাড়ি আর রয়্যালটির টাকা পেল একটা সেবা-প্রতিষ্ঠান আর টাকীর বিষয়সম্পত্তি পেল রামধন।

"রাসবিহারীর শেষ-জীবনের কয়েকটি লেখার পাণ্ডুলিপি আর কলমটা রামধন যত্ন করে একটা টিনের বাক্সে রেখে দিয়েছিল। পরে কলকাতার একটা নামী পত্রিকার সম্পাদক সেই পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে এসে প্রতি বছর পুজো সংখ্যায় একটা করে ছাপতে থাকেন। রাসবিহারীর কলমটা কিন্তু রামধন কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে টিনের বাক্সটার মধ্যে রেখেই দিয়েছিল।

"রাসবিহারীর মৃত্যুর ২০ বছর পরে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি টাকীতে পিকনিক করতে গিয়ে রাসবিহারীর কলমটা পাই।

"রাসবিহারীর আত্মা নিহিত ছিল সেই কলমটার মধ্যে। তার মানে কলমটা ছিল তাঁর ভূত। সেই কলম হাতে নিলেই আমি লেখার শক্তি পেতাম। আসলে রাসবিহারীই লিখতেন, আমি ছিলাম নিমিত্ত মাত্র।

"তাই আমার লেখার মধ্যে থাকত রাসবিহারীর ছাপ। লোকে আমাকে তাঁর উত্তরসূরী বলে। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? দাও, একটিপ নস্যি দাও।" আমার কাছ থেকে নস্যি নিয়ে উনি নাকের ভেতের গুঁজে দিলেন।

সাহিত্যিক ব্রজগোপাল বক্সী এই আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে শুধোলেন, "সেই কলম-ভূতটা গেল কোথায়?"

এমন সময় বউদি মুড়ি-তেলেভাজা আর চা নিয়ে এলেন। সুধন্যদা ওঁকে দেখিয়ে বললেন,

"তোমাদের এই বউদিকে জিগ্যেস করো।"

বউদি ঝাঁঝালো গলায় শুধোলেন, "আমি আবার কী করলাম?"

"আমার লেখার কলমটা নষ্ট করে ফেলোনি?"

"আমি, না তোমার মেম-নাতনি?"

"ওই একই কথা। তুমিও যা মেম-নাতনিও তাই। তোমরা দু-জনের কেউই গল্পের বই পড়তে পারো না। এ-সবের দামও বোঝো না। তুমি ভালোবাসো রান্না, আর মেম-নাতনি ভালবাসে খেতে।"

এই মেম-নাতনি হচ্ছে সুধন্যদার বড়ো মেয়ের মেয়ে। আমেরিকায় থাকে। সেবার বড়োদিনের ছুটিতে বাপ-মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল। তার বয়স তখন আট। আমেরিকায় থাকতে মায়ের মুখে সে শুনেছিল দাদু ভাল গল্প লেখেন। দুঃখের বিষয় সে বাংলা জানে না। অর্থাৎ বাংলা অক্ষর চেনে না। তাই দাদুর বই তার পক্ষে পড়া সম্ভব হয় না। এবার সে মনে মনে সংকল্প করেই এসেছিল, যে-কদিন কলকাতায় থাকবে, শুধু দাদুর কাছ থেকে গল্পই শুনে যাবে।

দাদু যখন লিখতে বসেন, তখন তাঁর কোনও দিকে জ্ঞান থাকে না। কোনও শব্দ, গন্ধ এমন কী ছোটোখাটো ধাক্কা ওঁর অনুভূতিতে আসে না। চা খাওয়ার কথা, বাজারে যাওয়ার কথা, দাড়ি কামানোর কথা, সবই উনি ভুলে যান। কাউকে লেখার সময় চোখের সামনে দেখেও দেখতে পান না। ফলে বিরক্ত হন বউদি। বাজার আনতে দেরি হলে রেগে আগুন হয়ে বলে ওঠেন, "তোমার কলমটাকে উনোনে পুড়িয়ে দেব।" সেবার আমেরিকার নাতনির সামনে বহুবার এ-কথা বলে ফেললেন।

বউদি সেকেলে গৃহবধূ। বাড়িতে গ্যাস-ফ্যাস ঢুকতে দেননি। ফ্রিজও না। রান্না হয় কয়লার উনোনে। বাজার হয় ডেইলি সকালে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমেরিকার নাতনি, যার নাম ইভা, দাদুর কাছে বায়না ধরল, "গল্প বলতে হবে. একটা ভূতের গল্প বলো।"

সুধন্যদা ইভার কথাগুলো শুনেও শুনতে পেলেন না। উনি লিখেই চললেন। ওঁর হাতে রয়েছে একটা জটিল সামাজিক উপন্যাস। আর শুনতে পেলেও উনি ভূতের গল্প বলতেন না। প্রথমত উনি তখনও ভূতে বিশ্বাস করতেন না। দ্বিতীয়ত জীবনে কখনও ভূতের গল্প লেখেননি। তৃতীয়ত লেখা থামিয়ে উনি গল্প করা পছন্দ করতেন না। কাজেই উনি লিখেই চললেন।

ইভা ভীষণ রেগে গেল। দিদার মেজাজটা পুরোপুরি পেয়ে গিয়েছে সে। দাদুকে মুখে বলে, ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে দু-হাতে ঠেলা মেরেও যখন সুবিধে করতে পারল না, তখন সে রাগের সঙ্গে বলে উঠলে, "তোমার কলমটা আজই আমি উনোনে পুড়িয়ে ফেলব।"

এ-কথাটাও সুধন্যদার কানে গেল না। বেলা দশটার সময় উনি লেখা থামিয়ে ফাইলটা আর কলমটা টেবিলের উপর রেখে বাথরুমে চান করতে ঢুকলেন। চান করতে ওঁর প্রায়

একঘণ্টা সময় লাগে।

এই ফাঁকে ইভা কাজটা সেরে ফেলেছে। বউদি যেই রান্নাঘর থেকে একটু বেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছেন, অমনই সে জ্বলন্ত উনোনের মধ্যে কলমটা ঢুকিয়ে দিয়ে ছাদে উঠে গেল। এই ভাবে কলম-ভূতের সদ্‌গতি হয়ে গেল।

আমি শুধোলাম, "সুধন্যদা, আপনি ব্যাপারটা জানতে পারলেন কখন?"

সুধন্যদা ম্লান মুখে বললেন, "সন্ধ্যের সময় লিখতে বসে। দেখি ফাইলটা আছে, কলমটা নেই।"

"তারপর?"

"অনেক খোঁজা-খুঁজি চেঁচামেচির পর আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তখন ইভা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে মিচকি মিচকি হাসতে লাগল। তারপর সত্যি ঘটনাটা প্রকাশ করল। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। তখন তোমাদের বউদি বললেন, পুরোনো কলমটা গিয়েছে তো কী হয়েছে? আমি তোমাকে একটা দামী নতুন কলম কিনে দেব। পরদিন উনি একটা কলম কিনে আনলেন বটে, কিন্তু সেটা দিয়ে একটি লাইনও লিখতে পারলাম না। মানে, লেখা এলো না। সেই থেকে আমি আর লেখক নই, শুধু গল্প-বলিয়ে।"

আমি বললাম, "এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! কলম-ভূতের কথা তো কখনও শুনিনি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।"

"বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার। আমি তোমাদের বলছি নে, বিশ্বাস করতেই হবে।" এই বলে সুধন্যদা আমার কৌটো থেকে আর-একটিপ নস্যি তুলে নিয়ে নাকে দিলেন।

বউদি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এখন উঠে দাঁড়িয়ে সুধন্যদার দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন, "যত সব ন্যাকামো।" বলেই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভীতু ভূত

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে

এক সময়ে এক নাপিত ও তার বৌ বাস করত। তাদের সংসারে সুখ ছিল না। বৌ কেবলই নালিশ শোনাত , পেট ভরে খেতে পাই না।

মশারির তলায় শুয়ে বেচারি নাপিতকে অনেক কথা শুনতে হত। বৌ প্রায়ই বলে, "বৌকে খাওয়াবার মুরোদ যখন নেই তখন আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন? যাদের মুরোদ নেই তাদের বৌ পোষার শখ কেন? যখন বাপের বাড়িতে ছিলাম তখন কত খাবার খেতাম, আর তোমার বাড়িতে তো বলতে গেলে উপোস করে মরছি । বিধবা উপোস করে জানি, আমি তো তুমি বেঁচে থাকতেই বিধবা হয়েছি।"

শুধু কথা শুনিয়েই তো সে শান্ত হয় না। একদিন তো ভয়ানক রেগে গিয়ে ঝাঁটা দিয়েই স্বামীকে পেটাল। লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরে নাপিত তার হাতিয়ার গুলো নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ধনী না হয়ে সে বাড়িতে ফিরবে না। বৌ-এর মুখও দেখবে না। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে সন্ধ্যা হলে এক বনের সীমানায় গিয়ে পৌঁছল। একটা গাছতলায় শুয়ে নিজের পোড়া কপালের জন্য দুঃখ করতে করতে অনেক রাত কাটিয়ে দিল।

এখন সেই গাছে বাস করত একটা ভূত । গাছতলায় একটা মানুষকে দেখে তার মনে হল লোকটাকে মেরে ফেলবে। সেই বাসনা নিয়েই ভূত গাছ থেকে নেমে দুই হাত বাড়িয়ে প্রচণ্ড একটা হাঁ করে নাপিতের সামনে লম্বা একটা তালগাছের মত দাঁড়াল। বলল, "এবার নাপিত আমি তোমাকে শেষ করব। কে তোমাকে রক্ষা করবে?"

ভয়ে নাপিত থরথর করে কাঁপতে লাগল , তার চুল খাড়া হয়ে উঠল, কিন্তু সে বুদ্ধি হারাল না। নাপিত জাতির স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চতুরতার সঙ্গে উত্তর দিল, " ওরে ভূত তুই আমাকে শেষ করবি ! একটু সবুর কর এখনই তোকে দেখাব আজ এক রাতেই কত ভূতকে ধরে আমি এই থলের মধ্যে ভরেছি। তোকে দেখে আমি আরও খুশি হয়েছি কারণ আরও একটা ভূতকে এখনই থলেয় ভরতে পারব।"

এই কথা বলে নাপিত থলের ভেতর থেকে একখানা ছোট আয়না বের করল। ভূতের মুখের সামনে আয়নাটা তুলে ধরে বলল, "এই দেখ একটা ভূত যাকে আমি থলেয় ভরেছি। বেচারিকে সঙ্গ দিতে এবার তোকেও থলেয় ভরব।"

আয়নায় নিজের মুখটা দেখেই ভূত অত্যন্ত ভয় পেয়ে নাপিতকে বলল , " ও নাপিত মশায়, তুমি যা আদেশ করবে আমি তাই করব। কেবল ঐ থলেয় আমাকে ভরো না। তুমি যা চাও তাই দেব।"

নাপিত বলল, " তোরা ভূতরা সকলেই বিশ্বাসঘাতক , তোদের বিশ্বাস নেই । তুইও কথা দিয়ে কথা রাখবি না।"

ভূত বলল, " ও মশায়, তুমি যা হুকুম করবে আমি তোমাকেই তাই এনে দেব। "

নাপিত বলল, " ভাল কথা, এখনই আমাকে এক হাজার সোনার মোহর এনে দে। আর কাল রাতের মধ্যেই আমার বাড়িতে একটা গোলা বানিয়ে ধান দিয়ে সেটা ভর্তি করে দিবি। যা, সোনার মোহরগুলো এখনই নিয়ে আয়। আমার আদেশ পালন করতে না পারলে তোকে অবশ্যই আমার থলেয় ভরব।"

ভূত খুশী হয়ে চলে গেল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজার মোহর ভর্তি একটা থলে নিয়ে ফিরে এল। নাপিতের তো আনন্দের সীমা নেই। ভূতকে বলল , কাল রাতের মধ্যেই যেন গোলাটা তৈরী করে ধান ভর্তি করে দেওয়া হয়।

পরদিন একটু বেলা হতেই একটা ভারী বোঝা নিয়ে নাপিত বাড়ির দরজায় টোকা দিল। যে বৌ একদিন রাগের মাথায় ঝাঁটা মেরেছিল সে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিল । স্বামী থলে থেকে ঝকঝকে সোনার মোহর ঢেলে স্তূপ করে ফেললে। বৌ তো একেবারে হাঁ।

থলের মধ্যে ভর্তি হবার ভয়ে ভূত বেচারি পরদিন রাতেই নাপিতের বাড়িতে একটা বড় গোলা বানিয়ে দিল এবং সারারাত পিঠে করে ধানের বোঝা এনে ভর্তি করে দিল। ভীতু ভূতের খুড়ো ভাইপোকে এ কাজ করতে দেখে ব্যাপার কি জানতে চাইল। ভূত সব কথা খুলে বলল ।

খুড়ো ভূত বলল, "আরে বোকা, ভেবেছ নাপিত তোমাকে থলেয় ভরবে ! নাপিত মহাধূর্ত। তোমাকে বোকা হাঁদা পেয়ে ঠকিয়েছে।"

ভাইপো ভূত বলল, " নাপিতের শক্তিকে তুমি সন্দেহ করছ? নিজেই দেখবে চল।"

এখন খুড়ো ভূত নাপিতের বাড়ি গিয়ে জানালায় উঁকি দিল। খোলা জানালা দিয়ে দমকা হাওয়া এসে গায়ে লাগায় নাপিত বুঝতে পারল যে জানালায় একটা ভূত এসেছে। তাই তার দিকে আয়নাটা ভাল করে ধরে বলে উঠল, " এবার আয়, তোকেও থলেয় ভরি।"

আয়নায় নিজের মুখ দেখে খুড়ো ভূত ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কথা দিল সেই রাতেই একটা গোলা বানিয়ে ভরে দেবে ধান দিয়ে নয়, চাল দিয়ে।

অতএব মাত্র দুই রাতেই নাপিত মহাধনী লোক হয়ে গেল আর বৌ ও ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

বিষের বাঁশী

আশা দেবী

নির্জন পাহাড়ের একটা হোটেলে বসে আছে সুজন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই একটা কিছু ঘটে গেছে যেন। সমস্ত মুখ তার শুকনো আর পাণ্ডুর হয়ে গেছে। চোখগুলো ঢুকে গেছে কোটরে; চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া।

জিজ্ঞেস করলাম : কী হল আপনার। রাতে কি ঘুমোননি নাকি?

সুজন ঠিক তখনই উত্তর দিতে পারলো না। খানিকটা চুপ করে থেকে বললো : ঘুম? হ্যাঁ, ঘুম তো চোখ থেকে অনেকদিন আগেই গেছে— এবার প্রাণটা যেত, হয়তো বা তাই রক্ষা পেল। কেন?—আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। —তবে শুনুন বলেই সুজন একবার খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো।

বাইরে তখন মরা জ্যোৎস্নায় সমস্ত পাহাড়টা ঝলমল করছে। চারিদিকে থরে থরে পাইনের গাছের সারি। —রাতের নিথর প্রকৃতি— একেবারে নিস্তব্ধ। বাইরে একটা প্রাণের সাড়া পর্যন্ত নেই। দূরে দূরে মিটমিট করছে আলোগুলো। আকাশে কালপুরুষের তরবারি যেন ঝলসে ঝলসে উঠছে। সুজন শুরু করলো। এই যে পাহাড় দেখছেন —

এর চারিদিকে ঘন অরণ্য। আমি এখানে এমনি আসিনি। আমার সঙ্গে আরো তিনজন বন্ধু আছে তারা বাইরে লনে বসে। আমরা অনেকদিন আগে খবর শুনি আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক একটা ম্যাপ পেয়েছে— তাতে অনেক গুঁপ্ত ধনের খবর আছে। বলেই সুজন চুপ করলো—একটু হাসলো। তারপর বললে : ভদ্রলোক ? ভদ্রলোক আমারই কাকা। তিনি বিয়ে টিয়ে করেননি, এই সব অসম্ভব জিনিস নিয়েই আছেন। একটা রাতে তিনি আমাকে ডেকে বললেন : সুজন আমার কাছে একটা জিনিস আছে। —এটা আমি তোমার কাছে দিয়ে গেলাম। কাল আমার দেহে আর প্রাণ থাকবে না। কাজেই আজই তোমাকে এটা দিয়ে যাচ্ছি। তোমার বিশ্বস্ত দু একজন বন্ধুকে নিয়ে আজ সকালেই সূর্য ওঠবার আগে তুমি এখান থেকে চলে যাবে নইলে তুমিও বাঁচবে না।

আমি তাঁর কথামত আমার তিনজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ; পথে পরের দিনের খবরের কাগজে দেখলাম : বিমান রায় নামে এক ভদ্রলোকের আশ্চর্যভাবে মৃত্যুর সংবাদ।

আমরা ম্যাপটা দেখে দেখে এই পাহাড়ী জায়গায় এসে পড়ি। তারপর একটা ছোট পাহাড়ের ওপরে একটা নির্জন হোটেল বেছে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি গুপ্তধনের সন্ধানে। বলেই সুজন খানিকটা দম নিল। আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম।

পরদিন ওই দূরে যে ভাঙা বৌদ্ধ মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন ওটার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পাহাড়ের মজাই হচ্ছে—পাহাড়কে সামনে থেকে যত কাছে আছে মনে হবে তাতে উঠতে গেলে দেখবে দূরত্ব অনেক বেশী বেড়ে গেছে। সুতরাং আমার তিন বন্ধু আর আমি সকাল বেলাতেই কিছু শুকনো প্যাকেটের খাবার নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম।

রওনা হয়েই বুঝলাম , যা ভেবেছি তা নয়। পাহাড়টাকে যত কাছে মনে হয়েছে ওটা তত কাছে তো নয়ই বরং দারুণ দূরে এবং পথ অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না আমার জেদ ভয়ানক বেশী। যদি কিছু আমি করবো ভাবি তবে করেই ছাড়বো। সুতরাং দূরত্ব দেখে ভয় পেলে চলবে না—আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম।

" আর—আর"—সুজনের মুখে চোখে যেন ভয়ের ছায়া পড়লো। সে মাঝে মাঝেই কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

পথটা সাংঘাতিক পেছল আর শেওলা ধরা, জায়গাটা দেখেই বোঝা যায় এ পথে এব আগে আর কেউ হাঁটে নি। আমরা হোঁচট খেয়ে—শীতের ঝোড়ো বাতাসে প্রায় জমে যেতে যেতে এগিয়ে চললাম। একটা কথা শুনুন—এটাই আশ্চর্য আমরা যখন চলতে শুরু করলাম সঙ্গে সঙ্গেই শিলাবৃষ্টি শুরু হলো । আমরা এক ভাঙ্গা নির্জন কুটিরে আশ্রয় নিলাম। এবং ঠিক করলাম আর যাব না ফিরে যাই এবং আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল।

তখন আমরা স্পষ্টই বুঝলাম এর সঙ্গে অন্য কিছুর একটা গভীর সম্পর্ক আছে যেটা কোন অলৌকিক ব্যাপার । সুতরাং এ রহস্য ভেদ করতেই হবে। আমরা আবার চলতে শুরু করলাম । ঝড় আর শিলাবৃষ্টিও চললো সঙ্গে সঙ্গে। দীর্ঘ তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায়

পথ চলতে চলতে আমরা সেই বৌদ্ধ মন্দিরে এসে পৌঁছলাম।

মন্দিরের ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার । কিছু কিছু প্রাচীন পুঁথি আছে। সাংঘাতিক মূর্তি যেন মৃত্যুর দেবী এবং তার সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। আমরা তারই আলোতে একটি অপূর্ব কারুকার্য খচিত বাক্স দেখতে পেলাম এবং ঘরে নেবার মত আর কিছু না দেখে ওটাই নিয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা কালোছায়া ঝড়ের বেগে গাছপালা ভেঙ্গে আমাদের পেছনে ছুটে আসতে লাগলো। আমরা প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। খানিকটা ছুটে পথের মাঝখানে একটা হঠাৎ মালবাহী ট্রাক পেয়ে তাতে করে হোটেলে ফিরে এলাম।

এসেই ওই বাক্সটা খুললাম । ওর পরতে পরতে বহুমূল্য কাপড়ে ঢাকা একটা বাঁশি।

তখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। চার দিকে ঘন অন্ধকার । আমি সেই বাঁশী তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে মনে হলো— একবার বাজিয়ে দেখিনা কেন।

বাঁশিটা যেই বাজালাম সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে থেকে একটা তীব্র কান্নার আওয়াজ বেরুলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-জঙ্গল-লোকালয় পেরিয়ে কে যেন ছুটে এসে ঘরের ভেতর আছড়ে পড়ে কি যেন খুঁজতে লাগলো।

আমি ভয় পেয়ে বাঁশিটা আবার বাক্সে পুরে ফেললাম। কিন্তু যে এলো সে ঘরেই রইলো বাঁশিটির পাহারায় এবং রাতে তেমনি করে পাগলের মত বাঁশিটি খুঁজে ফিরতে লাগলো। আমি বাক্সটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম।

দুদিন এমনি করে কাটলো। তিন দিনের দিন আমার ঘরে প্রলয় শুরু হয়ে গেল। আমার অন্য তিন বন্ধু পালিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। আর যে এলো— সে এক পিশাচ। কী ভয়ানক তার চেহারা! আমার এখনও বুকের মধ্যে কাঁপছে— সে বাক্সটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলো । কিন্তু আমাকে কায়দা করতে না পেরে অন্ধ রাগে ঘরের সব কিছু ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল।

পরদিন সকালে কোথা থেকে এক লামা এলো হোটেলে। সে বললে : আপনি বাঁশি বাজিয়ে পিশাচ কেন ডাকলেন। এখুনি ও বাক্স ঝরণার জলে ফেলে দিয়ে আসুন নইলে আজই আপনার শেষ রাত।

আমিও আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বন্ধুরা বললে—চল—ওটা ঝরণার জলেই ফেলে দিই নইলে আমাদের তোকে হারাতে হবে।

আমরা বাক্সটা নিয়ে চললাম, আর ঝড়ের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদেহ—ঝড়ের মেঘের মত কালো এক কঙ্কাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চললো।

আমি কিছু দূর যেতেই সামনেই যে ঝরণাটা পেলাম তাতেই বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে ওখানেই জ্ঞান হারালাম।

আজ পাঁচদিন পর আপনি আমাকে দেখছেন। পরে শুনেছি ওটা এক পিশাচ-সিদ্ধ তান্ত্রিক লামার সম্পত্তি। ও বাঁশি যার কাছে যাবে তারই সর্বনাশ হবে। আমার কাকা জানতেন না।

ওই পিশাচের হাতেই তাঁর প্রাণ গেছে, এবার আমি এটা নিশ্চিতভাবেই বুঝেছি। আমারও প্রাণ যেত। আপনি জানেন না কিরণবাবু ও বাঁশির মধ্যে যেন যাদু আছে। কিছুতেই ওকে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু না ছাড়লে আমার প্রাণ যাবে। তাই বাধ্য হয়েই ছাড়তে হলো!

আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। বললাম, আপনি চলে যাবেন?

সুজন বললে, হ্যাঁ, বন্ধুরা গাড়ী ডাকতে গেছে। গাড়ী এসে পড়লো বলে। আমি এখুনি চলে যাবো। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক জিনিস আছে কিরণবাবু যার হদিস এখনও আমরা জানি না এবং তাদের সব কিছু বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা মেলে না। আচ্ছা, আমি যাই। আমার গাড়ী এসে গেছে। টলতে টলতে সুজন ছায়ার মত ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী পথ দিয়ে নেমে চললো। আমি উঠে পড়লাম। আমার অন্য হোটেল। সেখানে রাত হবার আগেই আমাকে ফিরতে হবে।

বিরজা হোম ও তার বাধা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরব চক্রবর্তীর মুখে এই গল্পটি শোনা। অনেকদিন আগেকার কথা। রোয়ালে-কাঁদরপুর (খুলনা) হাই স্কুলে আমি তখন শিক্ষক। নতুন কলেজ থেকে বার হয়ে সেখানে গিয়েছি।

ভৈবব চক্রবর্তী ঐ গ্রামের একজন নিষ্ঠাবান সেকেলে ব্রাহ্মণ পন্ডিত। সকলেই শ্রদ্ধা করেতা, মানতো। এক প্রহব ধরে জপ আহ্নিক করতেন, শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের জল স্পর্শ কবতেন না, মাসে একবার বিবজা হোম করতেন, টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো দুপুরের পবে। স্বপাক ছাড়া কারো বাড়ি কখনো খেতেন না। শিষ্য করতে নারাজ ছিলেন, বলতেন, শিষ্যদের কাছে পয়সা নিয়ে খাওয়া খাঁটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ। আর একটা কথা, ভৈরব চক্রবর্তী ভাল সংস্কৃত জানতেন কিন্তু কোন স্কুলের পন্ডিতি করেন নি। টোল কবাও পছন্দ করতেন না। ওতে নাকি গর্ভমেন্টের দেয় বৃত্তির দিকে বড় মন চলে যায়। টোল ইন্সপেক্টরদের খোসামোদ করতে হয়। তবে দুটি ছাত্রকে নিজের বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে ব্যাকরণ শেখাতেন।

বর্ষা সেবার নামে নামে করেও নামছিলো না, দিনেরাতে গুমটের দরুন আমরা কেউ

ঘুমুতে পারছিলাম না। হঠাৎ সেদিন একটু মেঘ দেখা দিল পূর্ব-উত্তর কোণে। বেলা তিনটে। স্কুল খুলেছে গ্রীষ্মের ছুটির পর। কিন্তু এত দুর্দান্ত গরমে যে পুনরায় সকালে স্কুল করার জন্য ছেলেরা তদ্‌বির করছে, মাষ্টারদেরও উস্কানি তাতে ছিলো বারো আনা। হেড্‌মাষ্টার অফিস ঘরে বসে আছেন। গোপীবাবু ইতিহাসের মাস্টার , গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন— স্যার মেঘ করেছে

মুরলী মুখুজ্যে (এই নামেই তিনি ও-অঞ্চলের ছাত্রদলের মধ্যে কুখ্যাত) গম্ভীর স্বরে বললেন— কিসের মেঘ?

— আজ্ঞে, মেঘ যাকে বলে।

— কি হয়েছে তাতে?

— আজ্ঞে, বৃষ্টি হবে। স্কুলের ছুটি দিলে ভালো হোত। ছেলেরা অনেকদুর যাবে, ছাতি আনেনি অনেকে।

বৃষ্টি হবে না ও মেঘে।

খাস ইন্দ্রদেবের অফিসের হেড্ কেরাণীও এতটা আত্মপ্রত্যয়ের সুরে একথা বলতে দ্বিধা করতো বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানে মুরলী মুখুজ্যের পাণ্ডিত্যের সীমা-পরিসীমা নেই, আবহাওয়া তত্বটি তার নখদর্পণে। গোপীবাবু দমে গিয়ে বললেন— বৃষ্টি হবে না?

— না।

—কেন স্যার? বেশ মেঘ করে এসেছে তো?

— মেঘের আপনি কি বোঝেন? ওকে বলে তাতমেঘা। ও মেঘে বৃষ্টি হবে না।

আমিও পাশের শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ থেকে জানালা দিয়ে মেঘটা দেখছিলাম এবং আসন্ন সম্ভাবনাতে পুলকিত হয়েও উঠেছিলাম। মুরলী মুখুজ্যের নির্ঘাত রায় শুনে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বললাম— বৃষ্টি হবে বলে কিন্তু মনে হচ্ছে।

মুরলী মুখুজ্যে বললেন— তাতমেঘা। মেঘ হলেই বৃষ্টি হয় না।

— কোন মেঘে বৃষ্টি হয়?

— এখন বৃষ্টি হবে আলট্রো ষ্ট্রটোস মেঘে। যাকে বলে শিট ক্লাউড।

—ও!

তাছাড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। মন্‌সুনের আগে হাওয়া ঘুরে যাবে পুবে।

—ও!

আর কোন কথা বলতে আমাদের সাহস হোল না। কিন্তু ইন্দ্রদেব সেদিন বড়ই অপদস্ত করলেন আবহাওয়াতত্তবিদ মুরলী মুখুজ্যেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মেঘের চেহারা ঘন কালো হয়ে উঠলো , মেঘের চাদর ঢাকা পড়লো আরও ঘন আর একখানা মেঘের চাদরে । তারপর স্কুলের ছুটি হওয়ার সামান্য কিছু আগেই ঝম্ ঝম্ মুষলধারে বর্ষা নামলো। পুরো দুটি ঘন্টা ধরে খাল বিল নালা ডোবা ভাসিয়ে রামবৃষ্টি হওয়ার পরে বেলা সাড়ে পাঁচটার পরে আকাশ ধরে গেল। ছেলেরা তখনো স্কুলেই আটকে ছিল। কোথায়

আর যাবে। সবাই আটকে পড়েছিলাম।

গোপীবাবু জয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে মুরলী মুখুজ্যেকে গিয়ে বললেন দেখলেন স্যার, তখন বললাম বৃষ্টি আসবে, তখন ছুটিটা দিলে আর এমন হোত না।

মুরলী বললেন অমন হয়ে থাকে। ইতিহাস পড়ান, Higher Mathematic পড়ালে বুঝতেন। জগতে Space and time নিয়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এডওয়ার্ড গার্ণেটের প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন এ বছরের Mathematical Gazete -এ বুঝলেন?

সেটা কি?

এ্যালিস্ ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড পড়েছেন তো? অঙ্ক শাস্ত্রে এ্যালিস্থ্রুলুকিং গ্যাসের পরীক্ষা আর কি! পড়ে দেখুন। গোপীবাবু চলে গেলেন। অঙ্ক শাস্ত্রের কথা উঠলেই তিনি স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।

বৃষ্টি থেমেছে, স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি আর গোপীবাবু চলেছি। দুজনেই আমরা মনে মনে খুব খুশী। হেড্‌মাষ্টারকে আজ বড় জব্দ করা গিয়েছে। রোজ রোজ কেবল চালাকি।

এমন সময়ে ভৈরব চক্রবর্তীর বাড়ির দাওয়ায় দেখি ভৈরব চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। খুব খুশী মনে আমাকে দেখে ডেকে বললেন কেমন ননীবাবু, বৃষ্টি হোল তো?

এই যে চক্কত্তিমশায়, নমস্কার! তা হোল।

হবে না? আজ তিনদিন থেকে হোম করছি বৃষ্টির জন্য। ওর বাবাকে হতে হবে।

অবিশ্যি বৃষ্টির পিতৃদেব কে তা ভালো জানা ছিল না। বললাম বলেন কি? হোম করার ফল তাহলে ফলেছে বলতে হবে।

গোপীবাবু অর্ধস্ফুট স্বরে বলে বসলো লাগে তাক্ না লাগে তুক।

ভৈরব চক্রবর্তী কথাটা শুনতে পেয়ে বললে আসুন দুজনেই আমার বাড়ি মাষ্টার বাবুরা। দেখুন দেখাই!

গোপীবাবু ও আমি দুজনেই দাওয়ায় গিয়ে বসলাম, মনটা বেশ ভালো। দুঃসহ গরমের পর প্রচুর বৃষ্টি হয়ে দিনটি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আজ পনেরো দিন দারুণ গুমুটে রাত্রে ঘুমুই নি।

গোপীবাবু কেবল বলছিল, আজ খুব ঘুম হবে কি বলেন?

নিশ্চয়। তার আর ভুল আছে।

ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। সেখানে সত্যিই হোমের আগুনে কুন্ড—বালি বিছিয়ে তৈরী, বেলকাঠ ও জগ্‌গি ডুমুরের ডালের বাড়তি সমিধ (যজ্ঞের কাঠ) একপাশে গোছানো। পূর্ণপাত্রে সিধে সাজানো তামার টাটে নারায়ণ শিলা, সিঁদুর। বেলাপাতা তামার বড় থালায়। হোম হয়ে গিয়েছে, উপকরণের অবশেষ এদিক-ওদিক ছড়ানো। ভৈরব চক্কত্তি বললে—দেখলেন মাষ্টারবাবু? হোম করার ফল আছে কিনা দেখলেন?

গোপীবাবু বললেন—আপনি অলৌকিককে বিশ্বাস করেন?

—নিশ্চই। নিজের চোখে দেখা। অপদেবতাদের কান্ড দেখেছি যে কত! পঞ্চমুন্ডির

আসনে জপ করার সময়।

—বলুন না দু'একটা ঘটনা।

—না, সে সব বলবো না। থাকগে! কিন্তু আজ এক বছরও হয়নি একটা অলৌকিক কান্ড দেখেছিলাম আমার এক যজমান বাড়ি: সেইটাই বলি। একটু চা করতে বলি?

এমন সময় আবার কালো মেঘ করে বৃষ্টি শুরু হলো। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ঝড় উঠলো খুব ঠাণ্ডা হাওয়ার। ছড় ছড় করে পাকা জাম পড়তে লাগলো চক্কত্তি মশায়ের বাড়ির সামনের গাছটা থেকে। নতুন জলে ব্যাঙ ডাকতে লাগলো চারিদিকে।

চা এল। আমরা ছাতি নিয়ে বেরুই নি! এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে যাবার উপায় নেই। বেশ জাঁকিয়ে গল্প শুনবার জন্য ভৈরব চক্রবর্তীর মাটির দাওয়ায় মাদুরের ওপর বসে গেলাম। ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের চা দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এলেন। তারপর সুরু করলেন গল্প বলতেঃ—

আর বছর ভাদ্র মাসের কথা। এখনো বছর পেরোয়নি। আমার এক যজমান বাড়ি থেকে খবর পেলাম তার একটি মেয়ের বড় অসুখ। আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে বিরজা হোম করতে হবে মেয়েটির জন্য। বিরজা হোমে পূর্ণ আহুতি দিলে শক্ত রুগী ভালো হয়ে যায়। আমি এমন সারিয়েছি।

আমাকে তারা নৌকা করে নিয়ে গেল গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন থেকে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে। অজ পাড়াগাঁ। ঘর,কতক ব্রাহ্মণ ও বেশির ভাগ গোয়ালা ও বুনোদের বাস! যমুনার ধারেই গ্রাম। গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটেই স্নান করতে আসে।

—গ্রামের নাম কি?

—সাতবেড়ে। তারপর শুনুন। গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম বিকালে। খুব বন-জঙ্গল, গ্রামের মধ্যে একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে, সেকেলে ছোট ইঁটের তৈরী। মন্দিরের মাথায় বট অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। প্রকান্ড একটা শিবলিঙ্গ বসানো মন্দিরের মধ্যে চামচিকেব নাদিতে আকণ্ঠ ডোবা অবস্থায়। পূজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগেই।

এই সময়ে আমাদের জন্যে ভৈরব চক্রবর্তীর বড় মেয়ে শৈল চাল ভাজা ও ছোলা ভাজা নিয়ে এলো তেল-নুন মেখে। ভৈরব চক্রবর্তী বিপত্নীক , তাঁব মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে সবে ক'দিন হোল, চলে গেলে চক্রবর্তী মশায় নিজেই রান্না করে খান।

আমরা সবাই খাবার খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভৈরব চক্রবর্তীও সেই সঙ্গে। এখনো দিব্যি দাঁতের জোর, ওই বয়সে এমন চাল ছোলা ভাজা যে খেতে পারে , তার দাঁত বহুদিনেও নষ্ট হবে না।

তিনি খেতে খেতেই বলে চললেন- এই শিবমন্দিরটার কথা মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আমার গল্পের সম্পর্ক আছে। তারপর আমরা গিয়ে সে বাড়ি উঠে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হবার পর গৃহস্বামী একটি ঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। অসুস্থ মেয়েটি সেই ঘরে শুয়ে আছে। বয়েস তেরো চোদ্দ হবে, নিতান্ত রোগা নয়, বেশ মোটাসোটা ছিল বোঝা যায়—

গলায় একরাশ মাদুলি। মেয়েটি চোখ বুজে একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একবার সে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে আবার সে পাশ ফিরলে।

মেয়েটির গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর। তিনের কাছাকাছি হবে। চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণ সামান্য লাল। নাড়ি দেখলম, বেশ নাড়ি, শক্তই আছে। হঠাৎ কোন ভয়ের কারণ, আছে ব'লে মনে হোল না। তাছাড়া আমার ওপর মেয়ের চিকিৎসার ভার নেই, আমি এসেছি হোম করতে। গৃহস্বামী বললেন— আপনি আশীর্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন ওর মাথায়।

পায়েব ধুলো মাথায় দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ গৃহস্বামী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল খাটের পাশে। আমি চমকে উঠলাম। হাত নড়ে গেল। লোকজন দৌড়ে এল কি হয়েছে দেখতে। কিছু সেখানে নেই, না একটা কলার খোসা না কিছু। লোকটি পড়লো কি করে? পাযেব ধুলো দেবার কথা চাপা পড়ে গেল। গৃহস্বামীর মাথায় ও মুখে ওর বড় শালা ঠাণ্ডা জল দিতে লাগলো। মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে কাঁদতে লাগলো। সে এক হৈ চৈ ব্যাপার।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি তান্ত্রিক হোম কবি। কিছু কিছু দৈব ঘটনা বুঝি। লক্ষণ, প্রতিলক্ষণ, চিহ্ন আর ঈঙ্গিত এই নিয়ে দৈব। গোড়াতেই এব লক্ষণ খারাপ বলে যেন মনে হচ্ছে। তবে কি হোমে বসব না? সন্ধ্যার কিছু পব শিবমন্দিবেব সামনের রাস্তায় পাযচারি কবছি। বড্ড গরম। বাড়ির মধ্যে হাওয়া নেই। রাস্তায় তবু একটু হাওয়া বইছে। হঠাৎ আমার কানে গেল, কে যেন বলছে, শুনুন, শুনুন। দু'বাব কানে গেল কথাটা। এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পডলো শিবমন্দিরেব ঠিক দোবেব গোড়ায একটি কে মেয়েমানুষ দাঁডিযে।

বললাম— আমায় বলছেন?

— হ্যাঁ। ও খুকিব জন্যে বিরজা হোম কববেন না। ও বাঁচবে না।

— কে আপনি?

—আমি যেই হই। যদি ভালো চান, হোম করবেন না।

আমি বিস্মিত হলাম। নির্জন অন্ধকার ভাঙা মন্দিব। সেখানে এখন মেযেমানুষ আসবে কে? নির্জন আশ্চর্য কথাই বা বলে কেন? আমার খানিকটা বাগও হোল। আমার ইচ্ছার ওপব বাধা দেয় এমন লোক কে? মানুষ তো দূবের কথা অপদেবতাকেও কখনো গ্রাহ্য করিনি। মায়ের আর্শীবাদে সবই সম্ভব হয়। ভৈবব চক্রবর্তীকে ভয দেখানো সহজ কথা নয়।

আমার এই অদ্ভুত দর্শনের কথা বাড়ি ফিরে কাউকে বললাম না। রাত্রে বসে হোমের জিনিসপত্র ফর্দও করে দিলাম। তারপর রাত আটটা বাজল গৃহস্বামী আমাকে রান্নাবান্না করতে বললেন। এই বার আমরা গল্পের আসল অংশে আসবো। তার আগে ওদের বাড়িটার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

বাড়িটা খুব পুরনো কোঠা বাড়ি, কোন ছিরি সৌষ্ঠব নেই, কিন্তু দোতলা। পল্লীগ্রামে দোতলা বাড়ি বড় একটাদেখা যায় না। যমুনা নদীর ধারে ঠিক নয় বাড়িটা সামান্য দূরে। মধ্যে কেবলমাত্র একখানা বাড়ি। ঐ বাড়ির ছাদ আর এ-বাড়িব ছাদের মধ্যে দশ-বারো ফুট

চওড়া এক ফালি জমির ব্যবধান।

ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর । সেই ঘরে আমার বিছানা পাতা হয়েছে। পাশে খোলা ছাদে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুগের ডাল আতপ চাল বড়ি আলু আর ঘি। আমি একাই রাঁধছি, রান্নার সময় কেউ থাকে আমি পছন্দ করিনে। রান্নার আগে একবার চা করে খেলাম। পরের তৈরী চা খেয়ে তৃপ্তি পাইনে।

রান্না করতে রাত হয়ে গেল। রাত সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটু জিরিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে ভাত বেড়ে নিলাম হাঁড়ি থেকে আগুট কলার পাতে। তারপর খেতে বসলাম। খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল ছাদে আমি একলা নেই। এদিক-ওদিক চাইলাম ; কেউ কোথাও নেই। রাত অনেক হয়েছে বাড়ির লোকেও নিচের তলায় খেয়ে দেয়ে শুয়েছে, গ্রাম নিশুতি হয়ে গিয়েছে। কেবল যমুনা নদীতে জেলেদের আলোয় মাছ ধরার ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হচ্ছিল।

হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলাম। •

আমার সামনে ছাদের ধারে ওটা কি গাছ? কালো মত লম্বা তাল গাছের মত এতক্ষণ ছাদে বসে রান্না-বাড়া করছি কই অত বড় একটা গাছ নজরে পড়েনি তো এর আগে? ছিল নিশ্চই, নয়তো এখন দেখছি কি করে! কি গাছ ওটা? সত্যি যখন চা খেলাম তখন দুটো বাড়ির মধ্যেকার রাস্তাটা দিয়ে একখানা গরুগাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আমাকে ওদিকে তাকাতে হয়েছিল। তখন কই তো অতবড় একটা তালগাছ। উঁহু কই ! না দেখিনি।

কিন্তু তালগাছটা এমনভাবে— ও কি রকম তালগাছ। ওকি! ওকি!

আমি ততক্ষণ বিভীষিকা দেখে ভাত ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়িনি। তালগাছ না।

এখনো ভাবলে— এই দেখুন গায়ে কাঁটা দিয়েছে। যদিও আমার নাম ভৈরব চক্কত্তি তান্ত্রিক। পিছনের ছাদের কার্নিসের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিরাটকায় অসুর কিংবা দৈত্যের মত মূর্তি। তার ততো বড়ো হাত-পা— সেই মাপে। মাথা একটা ঢাকাই জালার মতো। চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত রাঙা, আগুন ঠিকরে পড়ছে। আমার দিকেই তাকিয়ে আছে অসুরটা। যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

বিরাট মূর্তি। তালাগাছের মতই লম্বা। অনেক উঁচুতে তার মাথাটা। নিচু চোখে সেটা আমার দিকে চেয়ে আছে।

ভালো করে চেয়ে দেখলাম। দু'দুবার চোখ রগড়ালাম। দুবার চা খেয়ে কি এমন হলো? না। ওই তো সেই বিরাট, তাল-শাল-নারকেল গাছের মত তে-ঢ্যাঙা বেখাপ্পা অপদেবতার মূর্তি বিরাজ করছে জমাট অন্ধকারের মতো। এবার ভালো করে দেখে মনে হোল পিছনের ছাদে সেটা দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও দাঁড়িয়েনেই— দুই বাড়ির মধ্যেকার ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে বলা যায়। কারণ ওই জীবের নাভিদেশ থেকে ওপর পর্যন্ত আমার সামনে। তার নিচেকার অংগপ্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টিরেখার নিচে।

এ বর্ণনা করতে যত সময় লাগলো, অতটা সময় লাগেনি আমার বার কয়েক দেখতে জীবটাকে। এক থেকে দশ গুণতে যত সময় লাগে, ব্যস। আমি বলতে পারি অন্য যে কেউ

ওই বিকট অপদেবতার মূর্তি অন্ধকারে নির্জন ছাদে গভীর রাতে দেখলে আর গোলার ধানের ভাত খেতো না পরদিন।

আমি অপদেবতা দেখেছি, পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলে জপের শেষের দিকে প্রায়ই ভয় দেখাতো। কিন্তু সে এ ধরনের বিকট ও বিরাট ব্যাপার নয়। ভয় পেয়ে গেলাম। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। চক্ষে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই আর কি? পড়লেই হয়ে যেতো। দুর্বল মানুষ মরে ওদের হাতে। মন সবল হলে ওরাই সামলায়।

নিজেকে তক্ষুনি সামলে নিলাম। তারপর মন্ত্র জপতে সুরু করলাম জোরে জোরে। সেই দিকে চেয়ে মন্ত্র জপ করতে ক্রমে মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মূর্তিটা আমার সামনে সবসুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল এক থেকে ত্রিশ গুণতে যতটা সময় নেয় ততটা! ওর খুব বেশী হবে না কখনো। সেটা মিলিয়ে যেতে আর একবার চোখ রগড়ালাম। কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন সংগে সংগেই নিচের তালা থেকে কান্নাকাটি উঠলো। রুগী মেয়েটি মারা গিয়েছে।

— তখুনি?

— তখুনি। এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা দিতে আমি রাজী নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনাদের কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।

ভুতুড়ে খাদ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক কোলিয়ারী থেকে আর এক কোলিয়ারীতে বদলি হয়ে এসেছি।

কয়লা-কুঠির ডাক্তার। ভারি ঝকমারি কাজ। খাদের কুলি-কামিন থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজার-সাহেব পর্যন্ত যে যেখানে আছে, সকলেরই জীবন মরণ যেন আমারই হাতে। আমি যেন তাদের বিধাতা। কারও পায়ে একটুখানি আচঁড় লেগেছে, ডাক্ ডাক্তারকে। কোথাও কোনও কুলি মরেছে, সকলের আগে আমাকেই সেখানে ছুটতে হবে। সে যাই হোক, চাকরি করতে এসে সে দুঃখ করে লাভ নেই।

বাসাটি মন্দ নয়। টালি দেওয়া খানচারেক ঘর। সুমুখে দাওয়া উঁচু ছোট একটুখানি রক্, রকের নিচেই উঠোন, রান্নার জায়গা।

চারিদিক ফাঁকা। ভাবলাম, ভালই হল। আগে যে কোলিয়ারিতে ছিলাম, প্রকাণ্ড কোলিয়ারি, ছোটখাট একটা শহর বললেই হয়; চারিদিকে ধোঁয়া আর বস্তি, দম যেন আটকে আসত। এখানে তা হলেও একটুখানি নিশ্বাস নিয়ে বাঁচব।

ম্যানেজারবাবু বাঙালী। বড় অমায়িক ভদ্রলোক। প্রথম এসেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা জমিয়ে রাখা ভাল। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সেদিন তার বাঙলোর দিকেই

যাচ্ছিলাম। কালো রঙের ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে এক ভদ্রলোক আমায় দেখে নমস্কার করে পথের মাঝে থমকে দাঁড়ালেন। গোঁফগুলি নিচের দিকে বেঁকে গেছে। মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই নতুন ডাক্তার না? আমি হেড ক্লার্ক।'

কী আর বলব, ঘাড় নেড়ে একটুখানি হেসে নমস্কার করে এগিয়ে যাচ্ছি, তিনি আমার পিছু নিলেন। বললেন, চলুন তবে ওইদিক দিয়েই যাই, আপনার সঙ্গে গল্প করাও হবে।

বলেই তিনি পরিচয় দিতে শুরু করলেন। এখানে চাকরি করলেন প্রায় দশ বছর, অথচ একটি দিনের জন্যও তিনি কামাই করেন নি। বাড়ি তাঁর বেশি দূরে নয়। এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই একটা গ্রামে। সন্ধ্যার আগেই রোজ তাঁকে বাড়ি পৌঁছিতে হয়।

কোনও কথাই তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, তবুও তিনি আমায় সাবধান করে দিলেন। বললেন, 'দেখুন, এখানকার নিয়মই হচ্ছে তাই। আপনিও যেন সন্ধ্যের পর আর বাসা থেকে বেরোবেন না। নতুন মানুষ, জানেন না তো, তাই সাবধান করে দিলাম।

বললাম, 'কেন?'

বলতেই তাঁর সেই কালো গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে পানে রাঙা লাল লাল কয়েকটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম তিনি একটুখানি হাসলেন।

বললেন, 'জিজ্ঞেস করবার কিছু নেই, বড় ভীষণ জায়গা মশাই। আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

বললাম, 'না'।

'এই মরেছে! চারিদিকে ভূত মশাই, কোলিয়ারিটা ভূতে ভূতে একেবারে ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যে হলে এ তল্লাটে আর জন-মনিষ্যি দেখতে পাবেন না। খাদের নিচে দিনের বেলাতেই লোকজন নামতে ভয় করে; রাত্রের কাজ তো একরকম উঠেই গেছে। অন্ধকাব রাত্রে কতদিন দেখবেন। কী ভীষণ ব্যাপার। ঘরে বসেই হয়ত শুনতে পাবেন ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, খাদ চলছে, ঘন্টা বাজছে, ট্রাম লাইনের উপর ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় করে কয়লার গাড়ি ঠেলার শব্দ পাচ্ছেন; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখুন -- সব চুপ। কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যেয় হয়তো দেখলেন, ডিপোয় কয়লার একটা গুঁড়ো পর্যন্ত নেই। সকালে গিয়ে দেখুন চার-পাঁচ ওয়াগন কয়লা গাদা হয়ে গেছে।

বললাম, 'তাহলে তো ভালই বলতে হবে। ভূতগুলো খুব উপকারী বলুন।'

ভদ্রলোক আবার তেমনি দাঁত বের করে একবার হাসলেন। বললেন, 'তা বললে হবে কি' খুন জখম যে লেগেই আছে। এমন মাস গেল না যে খাদের নিচে দু'চারটে খুন হচ্ছে। আগে মশাই যা কিছু হত- ওই খাদের নিচেই হত, গত দু-বছর ধরে ভূতগুলো দেখছি উপরেও উঠে এসেছে। এই ধরুন, আমার আপিসের খাতা পত্র। আজ ঠিক যেমনটি রেখে তালা বন্ধ করে দিয়ে এলাম, কাল এসে দেখবো- সব-ওলট-পালট হয়ে গেছে, এখানকার জিনিস ওখানে, ওখানকার জিনিস এখানে! একেবারে তছনছ কাণ্ডকারখানা। তবে, নষ্ট কিছু করে না এই যা। আজকাল আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে।

হেসে জিজ্ঞেস করলাম , তাই বুঝি বেলা থাকতে থাকতে আপনাকে বাড়ি পৌঁছতে হয় ?

ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোক জানালেন, 'নিশ্চয়, একদিন যে কাণ্ড ঘটেছিল মশাই শুনলে আপনার গা-হাত-পা শিউরে উঠবে। থাক, আজ আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর একদিন বলব। এখন চলি। নমস্কার। বলেই তিনি তাঁর হাত দুটি তুলে আমার আর একটি নমস্কার করে ডানদিকে রাস্তা ভাঙলেন।

ম্যানেজারবাবুব সঙ্গে সেদিন আমার অনেক কথাই হল। বললাম ''ভূতের কথা কি সব শুনছি, আপনার কোলিয়ারিতে—এ কি সত্য ?

ম্যানেজারবাবু হাসলেন। 'শুনেছেন এরই মধ্যে' ?

বললাম , শুনেছি, কিন্তু ভূত আবার কী ? আমার তো বিশ্বাস হয় না কোনদিন।

ঘাড় নেড়ে ম্যানেজারবাবু বললেন, কিছু নয়। তবে খাদের অবস্থা বড় খারাপ, চালগুলো অত্যন্ত নরম। খুব সাবধানে কাজ করতে হয় নইলে কয়লা কাটতে গিয়ে চাল থেকে পাথর খসে পড়ে, লোকজন প্রায়ই মারা যায়।

কিছুদিন আগে......... না, কিছুদিন আগে কেন, অনেকদিন আগে আমি তখন এখানে ছিলাম না। সিপারন নদীতে সে বছর ভয়ানক বান হয়। বানের জল এত বেশী বেড়ে ওঠে যে হঠাৎ একদিন দেখতে না দেখতে বান এসে পড়ে খাদের মুখে। 'চানকের' পথে হুড়হুড় করে জল ঢুকতে থাকে। তাকে আর রুখবে কে । দিনের বেলা। খাদের নিচে তখন কাজ চলছে। লোকগুলোকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দু-দিন ধরে ক্রমাগত জল ঢুকছে , তিন দিনের দিন বান যখন কমল, খাদ তখন ভর্তি হয়ে গেছে। পাম্প দিয়ে জল তুলে তুলে অনেক কষ্টে নিচে নেমে গিয়ে দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশ জন লোক খাদের যেখানে সেখানে মবে পড়ে আছে। ব্যস সেই থেকে লোকেব ধারণা হল যে, অতগুলি লোক একসঙ্গে যেখানে মারা যেতে পরে ,ভূত সেখানে আছেই। এই বলে তিনি খুব জোরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমিও হাসলাম বটে, কিন্তু কেবলই আমার মনে হতে লাগলো, আহা অতগুলো মানুষ কোনদিক থেকে কোনও সাহায্য না পেয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত হাহাকার করে জলে ডুবে মারা গেল, কারও হয়ত বুড়ো বাপ-মা আছে খাদের উপরে কুলি-ধাওড়ায়, কারও ছেলে, কারও মেয়ে, কারও স্ত্রী কারও স্বামী পুত্র— আহা ! চুপ করে ভাবতে গিয়ে মুখের হাসি আমার মুখেই মিলিয়ে গেল—সে করুণ দৃশ্য যেন আমি আমার চোখের সুমুখে দেখতে পেলাম।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হল। ম্যানেজারবাবুর চাকর আমাদের কাছে লণ্ঠন দিয়ে গেল। উঠতে যাচ্ছিলাম । তিনি বললেন, 'একটু চা খেয়ে যান।'

'চা খেয়ে যান।'

চা খেয়ে তাঁর কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম, রাত্রি তখন আটটা।

ম্যানেজারবাবু বললেন, ' আলো নিয়ে চাকরটা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

ভাবলাম, তিনি ভেবেছেন হয়ত ভূতের ভয়ে রাস্তায় যদি আমার আবার কিছু বিপদ আপদ হয়। হেসে বললাম , না, কিছু দরকার নেই, ভূতের ভয় আমি করি না।'

তিনিও হেসে আমায় নমস্কার করে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন।

ফটক পেরিয়ে বাইরে যখন পথে এসে দাঁড়ালাম, দেখি অন্ধকারে তখন চারিদিক থম্‌থম্ করছে, কোথাও জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই। মাথার উপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশটা যেন তারায় ঠাসা। তারই একটুখানি ঝাপসা আলোয় পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম।

বাসাটা আমার নেহাত কাছে নয়। পথের পাশে দু-তিনটে কুলিধাওড়া পেরিয়ে গিয়ে আম-কাঁঠালের একটি বাগান, তার পরেও খানিকটা কালো কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী ছোট একটি পথ, তারই কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতি একটা পোড়ো বাড়ির মত ভাঙ্গা বাড়ি; সেইখান থেকে ডানদিকে একটা নিম গাছের তলা দিয়ে মিনিট দুই হাঁটলেই আমার বাসার দরজায় গিয়ে পৌঁছব।

কি যেন ভাবতে ভাবতে আমি সেই বাগানের ভিতর সরু একফালি পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে চলেছি। মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে আমার পিছনের কুলি-ধাওড়ায় সেই যে একটা কুকুর চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, তার চিৎকার তখনও থামেনি। হঠাৎ দেখি কয়েকটা গাছের তলা দিয়ে শুকনো পাতার উপর খড়মড় শব্দ করতে করতে মস্ত লম্বা কালো রঙের একটা লোক আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালো। আচমকা অন্ধকারে সত্যিই আমি একটুখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, তার আগেই লোকটা আমার আরও একটুখানি কাছে সরে এসে বললে , 'ডাক্তারবাবু, তুই একবার আয় আমার সঙ্গে।'

লোকটা বোধহয় সাঁওতাল। বললাম, 'কেন'?

সে বললে, 'ছেলেটাকে আমার বাঁচাতে হবে ডাক্তার! তুই যদি না যাবি তো ছেলেটা মরে যাবেক্—তুই আয়।'

'কী হয়েছে তোর ছেলের?

বললে, 'তা তো জানিনা বাবু, তুই দেখবি চল, আবার তুকে আমি ঘরের কাছে দাঁড়াই দিয়ে যাব।' গলার আওয়াজ শুনে মনে হল লোকটা হয়ত এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। আমি আর না বলতে পারলাম না। বললাম চল্।

বাগান পেরিয়ে আমরা আর একটা রাস্তা ধরলাম। সে আমার আগে-আগে চলতে লাগল । জিজ্ঞাসা করলাম তোর নাম কী?

বললে , ' আমার নাম টুইলা মাঝি।'

বললাম, 'কতদূর যেতে হবে?

হাত বাড়িয়ে কাছেই কয়েকটা খোড়া ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওইখানে। চুপ করে পথ আর কত চলি, তার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলাম। ' খাদে বুঝি তুই কয়লা কাটিস?'

'হুঁ বাবু।'

'কটি ছেলে তোর?'

'ওই একটি।'

'ছেলেটি কত বড়?'

'তা অনেক বড় বটে।'

'তবু - ক বছরের?'

' কে জানে তা ? অতসব জানি না।'

এমনি সব নানান কথা কইতে কইতে পথ আমরা চলেছি তো চলেইছি। সামনে হাত বাড়িয়ে যে ঘরগুলো সে আমায় দেখিয়েছিল , যতই এগিয়ে যাই , মনে হয় সেগুলো আরও দূরে। বললাম, একি বে টুইলা, কাছে বলছিলি যে। টুইলা বললে, হুঁ বাবু কাছে লয় তো কী? কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না। ছেলেটার তোর কী হয়েছিল প্রথমে?

টুইলা চুপ করে রইলো।

প্রথমে হয়েছিল কী? হ্যাঁরে?

টুইলা যেন বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে। বললে, 'খাদে বান ঢুকে ছিল'।

'বান'! হঠাৎ আমার ম্যানেজারবাবুর সেই বানের কথাটা মনে পড়ল! বললাম, কখন বে? সে তো অনেকদিন—.

টুইলা বললে, 'হুঁ অনেক দিন'।

বললাম, তারপর?

তারপর—আমরা তখন অনেক লোক ছিলাম খাদের ভিতরে —কয়লা কাটছিলাম।

বললাম, সেখান থেকে কেউ তো বাঁচেনি শুনলাম তুই বাঁচলি কেমন করে?

টুইলা আর জবাব দেয় না।

এবাব আবার কেমন যেন মনে হল। বললাম হ্যাঁরে টুইলা শুনছি নাকি এখানে খুব ভূতের ভয়! সত্য নাকি?

হঠাৎ দেখি টুইলা নেই। অন্ধকারে , ভাবলাম, কালো মানুষ, হয়ত খানিকটা এগিয়ে গেছে তাই দেখতে পাচ্ছি না। ডাকলাম 'টুইলা!'

কোথায় টুইলা!

এদিক ওদিক আগে-পাছে তাকিয়ে দেখি, টুইলা কোথাও নেই। চারিদিকে দিকচিহ্নহীন অন্ধকার। আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। মাথার ভিতরটা চন্ চন্ করে উঠল। সমস্ত শরীরের রক্ত তখন আমার জল হয়ে গেছে।

পিছন ফিরে ছুটবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ছুটে আমি যাব কোথায়? চিৎকার করলেই বা কে শুনবে!.....ভাবলাম, মৃত্যু অনিবার্য। চলতে গিয়ে দেখি, পা দুটো আড়ষ্ট , গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে কতক্ষণ যে চলেছি কিছুই আমার মনে নেই রাত্রির

অন্ধকার কেটে গিয়ে চারিদিকে যখন ফর্সা হচ্ছে , দেখি তখনও আমি পথ চলছি। শরীরে তখন আমার শক্তি নেই, গায়ে জোর নেই, নিতান্ত কেমন যেন মরিনি বলেই বেঁচে আছি - এমনই আমার মনে হতে লাগল । দূরে কতকগুলো লোক আসছে দেখে সেইখানে সেই পথের ধারেই আমি বসে পড়লাম। কিন্তু কাউকে যে আর বিশ্বাস হয় না! এরাও ভূত নয় তো?

প্রভাতের আলোয় দেখলাম , কয়েকজন কুলি তাদের ঝোড়া গাঁইতি কাঁধে নিয়ে কুঠিতে বোধহয় কাজ করতে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁরে, ডোম্‌রনা কোন্ দিকে?'

একজন বললে, 'সে হেথা কোথা বাবু? উই যে চিমনি দেখছিস হেইখানে!'

সর্বনাশ ! উঠে দাঁড়ালাম। প্রায় তিন মাইল হেঁটে একেবারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আধ-মরা হয়ে বাসায় যখন ফিরলাম, দেখি বাড়িতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মেয়ে,ছেলে এমনকি চাকরটা পর্যন্ত সারারাত ঘুমোয়নি। অপরিচিত জায়গা, কাকেই বা কি বলব, ভগবানের উপর নির্ভর করে সবাই তখন হাঁ করে পথের পানে চেয়ে আছে।

পাছে ওরা ভয় পায় ভেবে কাউকেই কিছু বলিনি। বললাম মরণাপন্ন একটি রুগীর কাছে সারারাত আমায় জাগতে হয়েছে। ... . বলেই সেখান থেকে আমায় বদলি করবার জন্যে কোম্পানির হেড অফিসে দরখাস্ত করে জবাবের আশায় বসে আছি, এমন দিনে আবার আর এক দুর্ঘটনা।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। ম্যানেজারের কাছ থেকে ডাক এল খাদের নিচে লোক মরেছে, আমায় যেতে হবে।

বলে পাঠালাম, যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ম্যানেজারবাবুকে দয়া করে এখানে একবার আসতে বল, আলো হাতে দু-জন চাপারাশি সঙ্গে নিয়ে নিজেই এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ভূতের ভয় বুঝি? সেদিনের সেই টুইলার কথাটা আমি তাকে বলিনি। লজ্জায় বলতে পারিনি।

বললাম, না , তা নয়। খাদের নীচে রাত্রে তো এখানে কাজ কেউ করে না তবে মরল কেমন করে?

ম্যানেজার বললেন কিছু কয়লার দরকার ছিল তাই ডবল হাজিরা দিয়ে মদ খাইয়ে নামিয়েছিলাম, পুলিশে খবর পাঠিয়েছি তার আগে চলুন একবার দেখে আসতে হবে।

অনেকগুলো লোকজন সঙ্গে নিয়েও ভয়ে ভয়ে খাদে গিয়ে নামলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড! কয়লা কাটা হচ্ছিল— সাত নম্বর কার্থির মুখে। সেইখানে কয়লার চাবড়া মাথায় পড়ে লোকটা মরেছে। মরবার পর মৃতদেহ তার সেইখানেই ফেলে রেখে লোকজন উপরে উঠে এসেছিল। ফিরে এসে দেখা দেল মৃতদেহ সেখানে নেই। মাল-কাটার সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে, প্রচুর আলো এবং লোকজনের সঙ্গে আমরা মৃতদেহের সন্ধান করতে লাগলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল তার সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা গোফার মাঝখানে— সেখানে যাবার কোন সম্ভাবনাই তার নেই। মৃতদেহটাকে

সেখান থেকে টেনে এনে আবার সেই সাত নম্বর কাঁথির কাছেই রেখে দিয়ে আমরা তো উপরে উঠে এলাম। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমাদের তো উপরে তোলবার উপায় নেই অথচ প্রচুর পুরস্কারের লোভেও কেউ সেখানে মড়া আগলে থাকতে রাজি হল না।

ম্যানেজারবাবু নিজে আমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন, বললেন পুলিশ এলে আমাদের খাদে নামতে হবে।

রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। পুলিশ এসেছে। আবার আমরা খাদের নিচে নেমে গেলাম। এবার আমাদের সঙ্গে আর বেশি লোক গেল না। যেতে চাইলো না। ম্যানেজারবাবু হেসে বললেন, পুলিশ যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে, আর ভাবনা কী? ভূতের তো পুলিশের ভয় আছে!

ম্লান হাসি হেসে নেমে তো গেলাম। যা থাকে কপালে। একে রাত্রির অন্ধকার, তায় আবার কালো সেই পাতালপুরী। চারিদিক কালো। তবে আমাদের সঙ্গে আলোও ছিল প্রচুর প্রত্যেকের হাতেই একটি করে সেফটি ল্যাম্প। পুলিশের ইন্সপেক্টরের হাতে টর্চ।

আগে আগে যাচ্ছে মালকাটার সর্দার। কিন্তু গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড।

মৃতদেহ সেখানে নেই। খালি খানিকটা রক্তের দাগ কালো কয়লার উপর জমাট বেঁধে রয়েছে দেখলাম। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। চারিদিকে নিস্তব্ধ। খাদের চাল থেকে কোথাও খুট্-খুট্ করে ছোট কয়লার টুকরো খসে পড়ছে, কোথাও বা টুপ্ টুপ্ করে জল পড়ার শব্দ পাচ্ছি। কী করা যায়।

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'আসুন এদিক-ওদিক্ খোঁজ করে দেখি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিশ্বাস তাঁর না হবারই কথা। কিন্তু আমরা আর না বিশ্বাস করে যাই কোথায়। এর আগের বারেও তো এমনি হয়েছিল।

খোঁজাখুজি আরম্ভ করলাম। ইন্সপেক্টরবাবু বেশ সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে তিনিই সবার আগে চললেন। সবার পেছনে যেতে আমার ভয় করছিল। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে কৌশল করে কাউকে জানতে না দিয়ে ফস্ করে আমি এক সময় মাঝে গিয়ে ঢুকলাম।

খোঁজার আর অন্ত রইল না। কিন্তু লাশ আর পাওয়া যায় না।

খুব ছোট একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলছি, হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার। ভয়ানক একটা কিছু অপঘাত ঘটলে মরবার আগে মানুষ যেমন করে চেঁচিয়ে ওঠে,— এও যেন ঠিক তেমনি একটা গোঙানির শব্দ। একেবারে ইন্সপেক্টরবাবুর পায়ের কাছে। আমরা তো সব চমকে উঠে শিউরে খানিকটা পিছু হটতে গিয়ে এ-ওর গায়ে লাগালাম ধাক্কা! ভয়ে তো আমি ম্যানেজারবাবুকে তখন জড়িয়ে ধরেছি। সর্বাঙ্গ শিরশির করে পায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে! গেলাম আর কি! বাঁচবার আর কোন আশা নেই।

ইন্সপেক্টরবাবু তো অত সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলে যেমনি নিচের দিকে

তাকিয়েছেন — দেখেন, মৃতদেহের বুকের উপর পা দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে।

'বাপ্!' বলে তিনি লাফিয়ে একেবারে উল্‌টে এসে পড়লেন আমার ঘাড়ে। আমি পড়লাম ম্যানেজারের গায়ে, ম্যানেজার দিলেন একটা কনস্টেবলের পা মাড়িয়ে। এমনি করে সবাই মিলে আমরা হুটোপুটি করছি, এমন সময়— অবাক কাণ্ড! ইন্সপেক্টরের হাতের টর্চ গেল নিবে, অনেক টেপাটিপি করেও কিছুতেই আর জ্বালানো গেল না। তারপরেই একে-একে আমাদের প্রত্যেকের হাতের আলোগুলো নিভতে আরম্ভ করল।

প্রাণের আশা তখন একেবারে ছেড়ে দিলাম।

কাঠ হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পরামর্শ করলাম—যেমন করে হোক দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে সুড়ঙ্গের দেওয়াল ধরে চলুন ফিরে যাই এমন করে এখানে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।

সর্দার বললে, 'চল, আমি পথ চিনি। দে, একটো্ জ্বালা কাঠির বাস্‌কো দে আমার হাতে।

আমার পকেটে দেশলাই ছিল কাঁপতে কাঁপতে সেট্টা বের করে সর্দারের হাতে দিলাম।

কিন্তু ফস্ করে সর্দার যেই একটা কাঠি জ্বেলেছে তারই সেই সামান্য আলোকে দেখলাম, কিম্ভুত কিমাকার প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মত কালো কুচ্‌কুচে এক সাঁওতাল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদেব সুমুখে। লম্বা লম্বা হাত-দুটো বাড়িয়ে সে আমাদের সুড়ঙ্গের পথ আগলে বলে উঠল— 'যাবি কুথা? ছেলেকে আমার বাঁচা তা বাদে এগুতে যাবি।'

ইন্সপেক্টরের পকেটে ছিল রিভলবার, চট করে সেটা বের করে তিনি ধাঁ করে চালালেন এক গুলি। ভীষণ আওয়াজ, কানে আমাদের তালা লেগে গেল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলাম, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ইন্সপেক্টর চিৎকার করে উঠেছেন— 'গেলাম- গেলাম! ওরে বাবারে ছেড়ে দে বাবা, ছেড়ে দে।

ভূতে মানুষে মারামারি ইন্সপেক্টরের গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তাঁকে আমাদের কাছ থেকে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। ঝটপট্ করতে কবেত সব থেমে গেল। শুনলাম সাঁওতালটা বলছে, 'গুলি চালাবি আর? চালা দেখি কেমন মরদ।'

আমরা তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছি। আমাকে মেরেছিস বানে ডুবোই জলের ভিতর ঠিক ইদুঁর-মরা করে। ছেলেটা ছিল, আবার তাকে-ও মেরে দিলি। বলতে বলতে সাঁওতালটা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। কই তুদের ম্যানেজার কই?

ম্যানেজারবাবু কেঁদে ফেললেন, 'দোহাই বাবা, আমায় ছেড়ে দে বাবা, আমার কোন দোষ নেই।'

প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাশুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরও বেশী হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না ; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি— কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবী কোন দলিল- অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না,কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে

কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল— সময় জগতের আর-সর্বত্রই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিশের উপদ্রব ঘটে, এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহু দূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটির, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর-কোথাও কিছু নাই। পূর্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী শুকাইয়া গিয়াছে। সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইত লাগিল যে, অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থম্‌থমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না; অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেষ্টাতেও জ্বলিল না—যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, "ভাই রে, একছিলিম তামাকের জোগাড় থাকিলে বড়ো সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই।"

অন্য ব্যক্তি কহিল, "আমি চট্‌ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল, "মাইরি! আর, আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব।"

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘন্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পুষ্করিণী তীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল, যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল, যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল, গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে—অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানে সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদন— বস্ত্রটি পর্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল, তাহাতে স্ত্রী লোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশংকর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোন শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভালো ।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্বেই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কুটিরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না—কারণ, মৃতদেহ এমন-কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই—হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাস মত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, মনে হইল এটা সেই জায়গা নহে। একবার ডাকিল 'দিদি'—অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটি বেদনা—শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অগ্নিকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছে—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল— রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।' তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল— যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্ব গ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই সুমিষ্ট ভালোবাসার স্বরে কাকিমা বলিয়া

ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কিনা, বিধবার তাহাও মনে পড়ে না

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মুক্ত দ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মুহূর্তে তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল ; সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে পূণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল, সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, 'আমি তো বাঁচিয়া নাই,আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাত্মা।'

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্রে শারদাশংকরের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনও যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া গিয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়। শারদাশংকরের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহু দূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, 'আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি—আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণ-কারিণী ; আমি আমার প্রেতাত্মা।'

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভূতপূর্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা-ভয়-ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত , দেহ দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা এক-হাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিয়াছে তখন অদূরে লোকালয়ে বাঁশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাখির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত, জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন

রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে ; মৃত্যু নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রিজাগরণে পাগলের মতো হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পলাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল, "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ।"

কাদম্বিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল, "চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই—তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বলো।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি তো নাই— তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক-এক সময় রীতিমত ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে— কাদম্বিনী জানাইতে চাহে, ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল; যোগমায়া জানাইতে চাহে, কাদম্বিনী তাহার ভালোবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোনো সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে এক দণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, "নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল, "ওমা, আমার কী ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু, ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল; অবশেষে কহিল, "ভাই, শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।"

যোগমায়া কহিল, "ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি আমার সই, তুমি আমার—" ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল— মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরূপ সংকোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে, এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু, এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না— মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেশা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে— মনে করে, 'স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহু দূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ-মমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।'

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না— কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এইজন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে— যদি দুইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল; ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্‌দিককে ভয় করে— যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়, বাহিরে তার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-একদিন চীৎকার করিয়া উঠিত, এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌ছম্ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল, "দিদি, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়া যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, "হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক। একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুরঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কী বুঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে।"

বাস্তবিক, সাধারণ স্ত্রীজাতির' পরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে এবং সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায় অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্রস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

তিনি মনে করিতেন, 'নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি।' এই বলিয়া তিনি কোনোরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল না'ও হইতে পারে, অতএব রানীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এ দিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিল, "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভালো দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।"

কাদম্বিনী গম্ভীরভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী।"

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল, "তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধূকে কী বলিয়া আটক করিয়া রাখিব।"

কাদম্বিনী কহিল, "আমার শ্বশুরঘর কোথায়।"

যোগমায়া ভাবিল, 'আ মরণ! পোড়াকপালি বলে কী।'

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল, "আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ পৃথিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া। বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি— আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু, ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোনো স্থান গড়িয়া রাখেন নাই, তখন কাজে-কাজেই বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।"

এমনিভাবে চাহিয়া কথাগুলো বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কী বুঝিতে পারিল, কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইল।"

শ্রীপতি কহিলেন, "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার কবিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী শুনিলে, বলো।"

শ্রীপতি কহিলেন, "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনোই কবে না; যদি-বা করে কোনো সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন, "কিরকম শুনি।"

শ্রীপতি কহিলেন, "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।"

এমনতরো কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে— বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, "আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে— কী কথার শ্রী।"

শ্রীপতি বুঝাইলেন, এ স্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনোরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন, "ঐ শোনো। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ। কোথায়

যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শুনিতে কী শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"

নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয় পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দন্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারও মতভেদ ছিল না— কারণ, শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী—তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন, "ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম।"

আর-একজন দৃঢ়স্বরে বলেন, "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।"

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কাদম্বিনী কবে মরিল বলো দেখি।"

ভাবিলেন কাদম্বিনীর কোনো-একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্বের দিনেই পড়ে। শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল, "সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।"

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন : শ্রীপতির বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই— ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।" তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব।"

এই বলিয়া মূর্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার

স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রানীহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু, প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহে আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনোরূপ বাধা দিল না। এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশংকরের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কী ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে, কী হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল, রুগ্‌ণ শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল— তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পর মনে পড়িল, 'আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহার মা সঙ্গ ভালোবাসে, গল্প ভালোবাসে, খেলা ভালোবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোনো দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে।'

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, জল দে।" 'আ মরিয়া যাই! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনও ভুলিস নাই।' তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া, খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?"

কাকিমা কহিল, "হাঁ, খোকা।"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস! আর তুই মরে যাবি নে?"

ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই একটা গোল বাধিল—ঝি এক-বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মা গো' বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "কাকিমা, তুই যা।"

কাদম্বিনী অনেক দিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে, সে মরে নাই— সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে; খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকিমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।" •

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশংকরবাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি জোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন, "ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকিমা' 'কাকিমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও— আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।"

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না; তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

"তখন বলিল, এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।"

শারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন; খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল; দুই মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তখন কাদম্বিনী "ওগো আমি মরি নাই গো, মরি নাইগো, মরি নাই—" বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে, মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

একটি ভৌতিক কাহিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আমি বি. এ. পাশ করিয়া চাকরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েকমাস ধরিয়া বহু স্থানে আবেদন করিলাম কিন্তু কোনরূপ ফল হইল না। অবশেষে সিউড়ী জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহু লোকের খোশামোদ করিয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে সিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া দুই দিন পরে নতুন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন সেইরূপ একটি ছোটখাটো সস্তা বাড়ি খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম করি, এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে শহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ির সন্ধান পাইলাম। বাড়িটি বহুকাল পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন তথাপি

বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়িখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই যে বাড়িটিতে ভূত আছে। তখন আমি সদ্য কলেজের ছোকরা—ইয়ংবেঙ্গল—ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যা-মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অত-দূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে চোরডাকাতের ভয়ও ত আছে— তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন, তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক— নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি. এ. পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রি কালে সে বাড়িতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া আমাদিগকে খাঁওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্তী রবিবার প্রাতে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো-মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়িটি দ্বিতল নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দু'খানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অল্পদূরে একটি উৎকৃষ্ট দীঘিকা ছিল আমরা সেইখানে গিয়েই স্নান করিতাম। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপর খানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায় ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল সেই সঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন পদব্রজে সিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাঁধা থাকিত, হাতিশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপ-জপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন— "বাবা তুমি কোথা যাইতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম— "সিউড়ী স্কুলে আমার মাস্টারি চাকরী হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন— "বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরী, কামাই হওয়াটা বড়ো খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ও রূপ আজ্ঞা করিবেন না।

মজুমদার মহাশয় বলিলেন— "তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?"—"শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি ও আমাদের স্কুলের অন্য একজন মাস্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সিউড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈর্বত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মৃত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "কি রে। তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন,—তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়া ছিলেন এবং কবচ দিয়া বলিলেন— "মা তোমার ছেলে আজ প্রাতে সিউড়ী রওনা হইয়াছে পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোনরকম ভয় পায় তবে যেন তারকব্রহ্ম নাম জপ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।" সুতরাং আমি দীনু কৈবর্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিমাত্রে রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তি পূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা জানিবে।

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, "তুই আজ এইখানেই থাকবি ত? তোর খাবার যোগাড় করি।"

সে বলিল, "আজ্ঞে না মা ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা

পয়সা দিয়া বলিলাম— "এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।" তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দু'জনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিভিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালা পথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্প খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথায় সাদা ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দু'টা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বর্হিগত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিউরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্ত্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি আমার হস্তে রক্ষাকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্ত্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন— "কি মহাশয়?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিওন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানা রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে:

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমশুভাশীর্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি।

তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই তিনি সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনও বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি নিয়ত আশীর্বাদক
শ্রীরমাপ্রসন্ন মজুমদার

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারীবাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "আচ্ছা আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন— "তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি?"

—"তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

— "তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ তার তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম—"সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে?"

—"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোন বিপদ হবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়াছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারী পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফঃস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। একদিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম, শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথমে শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি— পরিষ্কার পথ পাইয়াছে— গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে দূরে কোথাও বা ঘন সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া উহাকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ গরু দুইটা থামিয়া গেল। একটা ঝাঁকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্ত্তি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোয়ালের উপর দুইটা জীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্মাবৃত কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ কারিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম, সে মূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

ঝাঁকানীতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবু এ কি? গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?" আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম— "হয়ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে?" গাড়োয়ান তখন গাড়ি থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গরুর গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম— "থাক আজ আর কাজ নাই, গরুকে

খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।"

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে— কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ততদিন ধারণ করিয়া থাকিব, আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্রদুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, ত দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরের লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দুবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষভূত এবং অবিকল সত্য।

ভূতপত্‌রীর দেশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মাসি পিসি বন্‌গাঁ বাসী বনের ধারে ঘর,
কখনো মাসি বল্লেন না যে খইমোয়াটা ধর।"

কিন্তু এবারে মাসি পিসি দুজনেই ডেকেছেন। আগে মাসিব বাড়ি এসেছি পাল্কি চড়ে। সেখানে মোয়া খেয়ে পেট ধামা করেছি। এখন পাল্কিতে শুয়ে পিসির বাড়ি চলেছি। মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন— পথে জল খেতে; হাতে একগাছা ভূতপত্‌রী লাঠি দিয়েছেন—ভূত তাড়াতে; এক লণ্ঠন দিয়েছেন— আলোয় আলোয় যেতে।

হুম্পাহুম্মা পাল্কি চলেছে বন্‌গাঁ পেরিয়ে; ধপড়ধাঁই পাল্কি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভূতপত্‌রীর মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে।

পিসির দেশে কখনো যাইনি। শুনেছি পিসি থাকেন তেপান্তর মাঠের ওপারে সুমুদ্দুরের ধারে বালির ঘরে। শুনেছি পিসি কাঁকড়া খেতে ভালবাসেন, কচি-কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল রেঁধে লোককে খাওয়াতেও ভালবাসেন। কিন্তু লোক তো পিসির বাড়ি যায় কত! যে

ভূতপত্‌রীর মাঠ! দেখেই ভয় হয়! এই মাঠ ভেঙে দুপুর রাতে পিসির বাড়ি চলেছি। চলেছি তো চলেইছি;—"হুঁইয়ো মারি খপরদ্দারি!" "বড়া ভারি খপরদারি!"

মাঠের মাঝে একটা শেওড়াগাছের ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেড়ালের মত গুঁড়িমেরে বসে আছে। তারি কাছে ঘোড়ার গোর, তার পরেই তেপান্তর মাঠ! হাটের বাট ওই শেওড়া-তলা পর্য্যন্ত; তার পরে আর হাটও নেই, বাটও নেই;— কেবল মাঠ ধূ ধূ করছে।

এই শেওড়া-তলায় পাল্কি এসেছে কি আর যত ঝিঁঝি-পোকা তারা বলে উঠেছে— "চল্লে বাঁচি, চল্লে বাঁচি!" কেন রে বাপু, একটু না হয় বসেছি, তাতে তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন? "চল্লে বাঁচি!" চলতে কি আর পারি রে বাপু? অমনি ঝিঁঝি-পোকার সদ্দার দুই লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নেড়ে বলছে—"ওই আসছে চিঁচিঁ ঘোড়া চিঁচিঁ।" ফিরে দেখি গোরের ভিতর থেকে ঘোড়া-ভূত মুখ বার করে পাল্কির দিকে কট্‌মট করে তাকাচ্চে! ওঠা রে পাল্কি, পালা রে পালা! আর পালা! ঘোড়া-ভূতে তাড়া করেছে— ঘাড় বেঁকিয়ে, নাক ফুলিয়ে আগুনের মত দুই চোখ পাকিয়ে।

ভয়ে তখন ভূতপত্‌রী লাঠির কথা ভুলে গেছি। কেবল ডাকছি— জগবন্ধু রক্ষে কর, মাসিকে বলে তোমায় খৈয়ের মোয়া ভোগ দেব। বলতেই আমার খুঁটে বাঁধা খৈগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাসির বাড়ির খৈ— জুঁইফুলের মত ফুটন্ত ধবধব্ করছে খৈ, —রাস্তা যেন আলো কোরে! ঘোড়া-ভূত কি সে লোভ সামলাতে পারে? খৈ খেতে অমনি দাঁড়িয়ে গেছে। বেচারা ঘোড়া-ভূত খই খেতে মুখটি নামিয়েছে কি, অমনি তার ভুতুড়ে নিশ্বাসে খৈগুলি উড়ে উড়ে পালাচ্ছে। যেমন খৈয়ের কাছে মুখ নেওয়া অমনি খই উড়ে পালালো। খৈও ধরা দেয়না,ঘোড়াও ছাড়তে চায় না। ঘোড়া-ভূত চায় খৈ খায়,—খৈ কিন্তু উড়ে উড়ে পালায়।

ঘোড়া চলেছে খৈয়ের পিছে, খৈ উড়েছে বাতাসের আগে, আমি চলেছি পাল্কিতে বসে ঘোড়া-ভূতের ঘোড়দৌড় দেখতে মুখ বাড়িয়ে। কখন যে মাঠে এসে পড়েছি মনেই নেই। সেখানটা বড় অন্ধকার; বড় হাওয়া— যেন ঝড় বইছে। মাসির দেওয়া একটি লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে আর ঘোড়াও দেখা যায় না, খৈও চেনা যায় না। বেহারাদের বলি— আলো জ্বাল; কিন্তু হাওয়ায় কথা উড়ে যায়;— কে শোনে কার কথা! এমন হাওয়া তো দেখিনি! আমার ভূতপত্‌রীর লাঠিটা পর্যন্ত উড়ে পালাবার জোগাড়। লণ্ঠনটি তো গেছে, শেষে লাঠিটিও যাবে? আচ্ছা করে লাঠি ধরে বসে আছি। বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়ছে।

সর্ব্বনাশ! এ যে দেখছি বীর-বাতাস! এ বাতাসের মুখে পড়লে তো রক্ষে থাকবে না;— পাল্কি সুদ্ধু আমি, আমার লাঠি, আমার ছাতা, ধুতি-চাদর, পোঁটলা-পুঁটলি, বিছানা-বালিস কাগজের টুকরোর মতন কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিকানা নেই। পথে জল খেতে দুমুঠো খই ছিল, তাতো ঘোড়া-ভূতের সঙ্গে কোথায় উড়ে গেছে। শেষে বীর-বাতাসে আমিও উড়ে যাব নাকি? শীতেও কাঁপছি, ভয়েও কাঁপছি। পাল্কি ধরে বীর-বাতাস একবার ঝাঁকানি

দিচ্ছে; আর হাঁক দিচ্ছি— সামাল, সামাল! ভয়ে জগবন্ধুর নাম ভুলে গেছি। পাল্কিখানা ছাতার মত বেহারাদের কাঁধ থেকে উড়ে আমাকে সুদ্ধু নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে। পিছনে ধর্ ধর্ করে পাল্কি-বেহারাগুলো ছুটে আসছে।

একটা বুড়ো মনসা গাছ, মাথায় তার হলদে চুল, বড় বড় কাঁটার বঁড়শী ফেলে বালির উপরে মাছ ধরছিল। মনসাবুড়োর ছিপে মাছ তো পড়ছিল কত! কেবল রাজ্যের খড়কুটো আর পাখীর পালক হাওয়ায় ভেসে এসে বুড়োর বঁড়শীতে আটকা পড়ছিল। এমন সময় আমার চাদরখানা গেল বঁড়শীতে গেঁথে। আর যাব কোথা? পাল্কিসুদ্ধু বালির উপর উল্টে পড়েছি। বেহারাগুলো একবার আমাকে ছাড়াবার জন্যে পাল্কির ডান্ডা ধরে আমার চাদরটা ধরে টানাটানি করলে কিন্তু বাতাসের চোটে কোথায় উড়ে গেল আমার সেই উড়ে বেহারা ছ'টা, তাদেব আর টিকিও দেখা গেল না।

মনসাবুড়োর হাসি দেখে কে! ভাবলে মস্ত মাছ পেয়েছি। কিন্তু আমার হাতে ভূতপত্‌রী লাঠি আছে তাতো বুড়ো জানেনা! লাঠি দিয়ে যেমন বুড়োর গায়ে খোঁচা দেওয়া অমনি ভয়ে বুড়োর রক্ত দুধ হয়ে গেছে;— সে তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। পাল্কিটা ঠেলে তুলে, বিছানা-পত্তর পোঁটলা-পুঁটলি যা যেখানে পড়েছিল গুছিয়ে নিয়ে চুপটি করে বসে আছি— কখন বেহারাগুলো ফিরে আসে! মনসাবুড়োর গা বেয়ে দর্‌দর্ করে সাদা দুধের মত রক্ত পড়ছে; সেও কোনো কথা বলছে না, আমিও সাদা রক্ত দেখে অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

বুড়ো খুব রেগেছে; তার গায়ের সব রোঁয়াগুলো কাঁটার মত সোজা হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ গোঁ হয়ে বসে থেকে মনসাবুড়ো আমার দিকে চেয়ে বলছে— দেখছ কি? বড় আমোদ হচ্ছে না? বুড়োমানুষের গায়ে খোঁচা দিয়ে রক্তপাত করে আবার বসে বসে তামাসা দেখছ, লজ্জা নেই! যাওনা, ছাড়া পেয়েছ তো নিজের কাছে যাওনা।

আমি বল্লেম— যেতে পারলে তো। পাল্কি-বেহারা নেই যে। তারা আসুক তবে যাব।

শুনে বুড়ো হো-হো করে হেসে বল্লে— কেন, পা নেই নাকি? হেঁটে যেতে পারনা? নবাব হয়েছ?

আমার ভারি রাগ হল। বুড়োর বঁড়শীর আঁচড়ে দুই পা ছিঁড়ে তখনও আমার ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়ছে। আমি রেগে বল্লেম—"পা দুটো কি আর রেখেছ! আঁচড়ের চোটে দফা শেষ করেছ যে।"

"লেগেছে নাকি!"— বলে বুড়ো খানিক চুপ করে বল্লে—"একটু দই দাও, সেরে যাবে।" আমি বল্লেম—"এই মাঠের মধ্যে দই? তামাসা করছ নাকি?"

"আচ্ছা তবে খানিক তেঁতুল-বাটা হলেও চলতে পারে।"

আমার হাসি পেল। নিশ্চয় বুড়োটা ঘুমের ঝোঁকে স্বপন দেখছে। "বলি, ও দাদা! এখানে তুমি ছাড়া তো গাছ দেখছিনে, আর-একবার লাঠির খোঁচা দিয়ে তোমার গা থেকে একটু দুধ বার করে নিয়ে দই পাতব নাকি?"—বলেই ভূতপত্‌রী লাঠিটা যেমন একটু

বাগিয়ে ধরেছি, অমনি বুড়ো বলছে—"রও রও, কর কি দাদা! বুড়োমানুষ কখন কি বলি, রাগ কোরোনা। আমরা মনসাদেবীর বরে চিরকাল নানা রকম স্বপন দেখি। এইখানটিতে কতকাল যে বসে আছি তার ঠিক নেই। ছিপ নিয়ে মাঝ ধরছিলুম জলের ধারে— আজ সে কত কালের কথা; সে নদী শুকিয়ে, জল সরে চড়া পড়ে গেছে কিন্তু এখনো ঝোঁক কাটেনি; মনে হচ্ছে নদীর ধারেই বসে মাছ ধরছি! আমার বেশ মনে পড়ছে এইখানেই একঘর গয়লা থাকত আর ঠিক তাদের ঘরের কোণে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল, এখন তবে সেগুলো গেছে?"

বলেই বুড়ো আবার ঝিমিয়ে পড়ে দেখে আমি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বল্লুম—"আচ্ছা দাদা, ওই যে ঘোড়া-ভূত আর ঝিঁঝিঁ পোকা দেখে এলুম, ওদের কথা তুমি কিছু জান কি?"

"জানি বইকি! ওরা তো সেদিনের ছেলে!" বলেই বুড়ো গল্প শুরু করলে ঃ

"দ্যাখো, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরি হয়েছে, আমাদের মত দুচারটি গাছ-ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই, —নদী নেই, পাহাড় নেই, এমন কি বাতাসে শব্দটি পর্যন্ত নেই; কেবল ধূ ধূ করছে— ঠিক জায়গাটার মত। আমার তখন সবেমাত্র কচি-কচি দুটি কাঁটা বেরিয়েছে— ছোট ছেলের কচি-কচি দুটি দাঁতের মত। সেই সময় তারা গান বড় ভালবাসে, তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মত, কিন্তু ফড়িংগুলোর মত তাদের ডানা আছে, পাখিগুলোর মত পা, ঝাঁক বেঁধে তারা আমাদের কাছে উড়ে এসে বস্‌ল আর গান গাইতে আরম্ভ করলে। আকাশ, বাতাস তাদের গানের সুরে যেন বেজে উঠল। সে কি চমৎকার তা তোমাকে আর কি বলব! আমরা তার আগে শব্দ শুনিনি, গানও শুনিনি,— আনন্দে যেন শিউরে উঠলুম। বালি ঠেলে যত গাছ, যত ঘাস মাথা তুলে কান পেতে সেই গান শুনতে বেরিয়ে এল, পৃথিবীর ভিতর থেকে পাহাড়গুলো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এল, পাহাড়ের ভিতর থেকে নদীগুলো ছুটে ছুটে বেরিয়ে এল। গান শুন্‌তে শুন্‌তে দেখতে দেখতে আমরা বড় হয়ে উঠলুম। কিন্তু যারা গান গাইতে এল, কি খেয়ে তারা বাঁচে? পৃথিবীতে তো তখন ফুলও ছিল না, ফলও ছিল না; ছিল কেবল আমাদের মত বড় বড় গাছ, কাঁটা লতা আর পাতা। নদীতে মাছও ছিল না; আকাশে পাখিও ছিল না যে তারা ধরে খায়। তবু তারা অনেকদিন বেঁচে ছিল কেবল গান গেয়ে। একদিন হঠাৎ শুনি সে গান বন্ধ হয়ে গেছে,— তারা সবাই মরে গেছে,—শুক্‌নো পাতার মত তাদের সোনার ডানা বাতাসে উড়ে এসে আমাদের গায়ে বিঁধতে লাগল কিন্তু তাদের গানের সুর আর শোনা গেল না। তারপর পৃথিবীতে অনেকদিন আর কোন সাড়া-শব্দ নেই; কেবল দেখছি, একদল কারা জানি না, দেখতে অনেকটা মানুষ আর ঘোড়ার মত, এদিকে ওদিকে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরই খুঁজে খুঁজে গান যারা গাইতে এসেছিল। ক্রমে দেখি তারাও মরে গেছে। পৃথিবীতে আর তখন কিছু চলে বেড়াচ্ছে না, গানও গাইছে না;— কেবল গাছের দল আমরা চুপ করে বসে আছি। আমাদের বয়েস ক্রমে বাড়ছে আর আমরা বুড়ো হচ্ছি। তখন জলে মাছ দুএকটি দেখা দিয়েছে; আমি কাঁটা আর বঁড়শী ফেলে এক রাত্তিরে মাছ ধরছি এমন সময়—"

বলেই মনসাবুড়ো ঝিমিয়ে পড়ল! আমি যত বলি—"এমন সময় কি হল দাদা! আবার বুঝি সেই ফড়িংদের মত মানুষগুলো ঝিঁঝিঁ পোকা হয়ে ফিরে এসে গান গাইছে দেখলে? দেখলে বুঝি সেই মানুষের মত ঘোড়াগুলো ভূত হয়ে অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদের গান শুনতে এল?" বুড়োর আর কথা নেই; কেবল একবার 'হুঁ' বলেই চুপ কল্লে।

আমি ভাবছি দিই আর-এক ঘা লাঠি বুড়োর মাথায় বসিয়ে, এমন সময় দেখি দূর থেকে একটা আলো আসছে,—যেন কে লণ্ঠন-হাতে আমার দিকে চলে আসছে। একবার ভাবছি বুঝি বেহারা ক'জন আলো নিয়ে আমাকে নিতে এল। আবার ভাবছি, কি জানি মাঠের মাঝে আলেয়া দেখা দেয়, তাও তো হতে পারে। কিন্তু দেখলুম আলোটা এসে পাল্কির খানিক দূরে থামল; আর চারটে জোয়ান উড়ে আমার পাল্কিটা কাঁধে নিলে। উড়েদের একেই একটু ভুতুড়ে চেহারা কাজেই ঠিক আন্দাজ করতে পারলুম না যে তারা ভূত কি মানুষ। একবার তাদের পায়ের দিকে চেয়ে দেখলুম, ভূতের মত তাদের পায়ের গোড়ালি উল্টো কি না। কিন্তু অন্ধকারে কিছু ঠিক বুঝতে পারা গেল না। মনসাবুড়োকে ডেকে বল্লুম—"দাদা তবে যাচ্ছি।"

দাদা তখন আবার ঝিমোচ্ছেন; চম্‌কে উঠে বল্লেন—"যাবে নাকি? গল্পটা তো শেষ হল না।"

পাল্কি তখন চলছে, আমি মুখ বাড়িয়ে বল্লুম—"দাদা, একরকম গল্পটা শেষই করেছিলে, কেবল তোমার মাথার হলুদে চুল আর তোমার সাদা রক্ত কেন, সেইটে বলতে বাকি রয়ে গেল।" মাষ্টারমশায়ের কাছে জেনে নিও—" বলেই দাদা আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। হু হু করে পাল্কি আবার মাঠের দিকে বেরিয়ে গেল।

একটু-ভয়-ভয় করছে, বেহারাগুলো মানুষ না ভূত বুঝতে পাচ্ছিনে। পাল্কির দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল— মানুষ-উড়ে পাল্কি কাঁধে নিলেই হুম্মাহুম্মা ডাক ছাড়ে; এরা তো হাঁক দিচ্ছে না! পড়েছি উড়ে ভূতের হাতেই, পড়েছি আর কোনো ভুল নেই। আচ্ছা দেখা যাক, ভূতপত্‌রী লাঠি তো আছে! তেমন তেমন দেখি তো দু-হাতে লাঠি চালাব।

ভূতপত্‌রী লাঠির কথা মনে করেছি কি অমনি ধপাস্‌ করে পাল্কিটা তারা মাটিতে ফেলেছে কোমরটা আমার খচ্‌ করে উঠেছে। "তবে রে ভূত-উড়ে আমাকে এই মাঠে একলা নামিয়ে দিয়ে পালাবে ভেবেছ! তোল্‌ পাল্কি, ওঠা সোয়ারী।"—বলেই লাঠি নিয়ে যেমন তেড়ে যাব কোমরটা আমার বেঁকে পড়ল, ভূতগুলো দেখেই খিল্‌খিল্‌ করে হেসে অন্ধকার মাঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। মহা বিপদ! এই রাত্তিরে মাঠের মাঝে ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, সাপের ভয়, তার উপর কোমর ভেঙে গেল। লাঠি ধরে যে গুড়িগুড়ি পালাব তারও জো নেই। মনসা-কাঁটায় পা ছিঁড়ে গেছে। "দূর কর আর ভাবতে পারিনে, যা হয় হবে।"—বলে পাল্কির ভিতরে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। ক্ষিধেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।

একলা থাকতে থাকতে ক্রমে ঘুম এসেছে। একটু চোখ বুজেছি কি না অমনি খস্‌ করে

একটা শব্দ হল। চোখ চেয়ে দেখি, বালির উপরে গোটাকতক তালগাছ উঠেছে, তাদের মাথা যেন আকাশে ঠেকেছে, আর একটা আলো ঘুরে ঘুরে সেই তালগাছে ঠেকেছে, আবার সড় সড় করে নেমে আসছে! আমি আর না-রাম না-গঙ্গা! কাঠ হয়ে পড়ে আছি, কেবল দুটি চোখ চাদরের একটি কোণ দিয়ে বের করে।

দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের উপর দিয়ে বোঁ-বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল! তালগাছের তলায় যে আলোটা টিপ্ টিপ্ করছিল সেটা জোনাকি-পোকার মত উড়ে গিয়ে সেই গোলাটার উপর বসল। বসেই গোলাটাকে আমার দিকে গড়িয়ে আনতে লাগল!

গেছি পাল্কিসুদ্ধু গোলাটার ভিতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভিতরে মাছের মত আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি,—বন্‌বন্ করে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেই ঘুরতে লেগেছে! কখনো মাঠের উপর দিয়ে, কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা সাদা খরগোসের মত লাফিয়ে গড়িয়ে, কখন জোরে, কখন আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলছে!

ভয়ে দুই হাতে চোখ-ঢেকে চলেছি। ক্যাঁ-কোঁ চরকা-কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ি সূতো কাটছে আর একটা খরগোস তার চরকা ঘুরোচ্ছে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি! যে চাঁদের ভিতরে বসে থাকে, আর ওই তার চরকা, ওই খরগোস! আঃ বাঁচা গেল, এটা তবে গোলাভূত নয়, ইনি আমাদের চাঁদামামা; আর বুড়ি তো আমাদের মামি। আর এ খরগোস তো আমাদের সেই খাঁচার খরগোসটি, বিলিতি-ইঁদুরের আর গিনি-পিগগুলির বড়মামা!

"বলি মামি, এমন করে কি ভয় দেখাতে হয়!"— বলেই আমি খরগোসটাকে খপ্ করে কোলে তুলে নিয়েছি। "ওরে ছাড় ছাড়, আমার চরকা-কাটা বন্ধ করিসনে; দেখচিস্‌নে এই চরকার জোরেই তোর চাঁদামামার সংসার চলছে!"

সত্যিই দেখি চরকা বন্ধ হতেই চাঁদামামা গড়াতে গড়াতে থেমে গিয়ে লাটিমটার মত মাটির উপরে কাৎ হয়ে পড়েছেন: আমি খরগোসটি মামির হাতে দিয়ে বল্লুম—"কই মামি, চালাও দেখি মামাকে!"

খরগোস চরকায় যেমন এক পাক দিয়েছে অমনি চাঁদামামা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘুরতে লেগেছেন। বুড়ি ডাকছে—"দে পাক্, দে পাক্!" খরগোস ততই পাক্ দিচ্ছে আর চাঁদমামাও তত ঘুরপাক্ দিয়ে ডিগ্বাজি খেয়ে রবারের বলের মত নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছেন। যত বলি—"মামি, আর পাক দিও না, মামাকে আমার অত ঘুরিও না, মামা হাঁপিয়ে দম আটকে কোন্ দিন মারা পড়বেন যে! একটু রয়ে-বসে চালাও, শেষে বুড়ো বয়সে মামার কি মাথাঘুরুনি রোগ ধরিয়ে দেবে?— জানি কি যে মামি আমার কালা! আমার একটি কথাও বুড়ির কান যায়নি। সে কেবল বলছে—"দে পাক্, দে পাক্।" আমি যত ইসেরা করে বলি—"আস্তে আস্তে।" —বুড়ি ভাবে জোরে চালাতে বলছি, ততই ডাকে—"দে পাক্, দে পাক্!"

মামা রেলের গাড়ীর মত হু হু করে ছুটে চলেছেন। "ওরে থামা থামা। মাথা ঘুরে গেল, আর যে পারিনে।"— বলেই লাঠি তুলেছি খরগোসটাকে মারতে। যেমন লাঠি তোলা অমনি খরগোসটা খাঁক করে তেড়ে এসেছে, ক্যাঁচ করে চরকাটা বন্ধ হয়ে গেছে আর পটাং করে মামির হাতের সুতো কেটে গেছে। যেমন সুতো কাটা আর ঝপাং করে চাঁদামামা গিয়ে একটা নদীর জলে পড়েছেন, পড়েই ফেটে চৌচির!

"কি করলে গো মামি!"— বলেই চমকে উঠে দেখি নদীর ওপারে পাল্কিসুদ্ধু আমি ঠিকরে পড়েছি! কোথায় বুড়ি, কোথায় চরকা, কোথায় বা সে খরগোস! নদীর জলে দেখি একরাশ কাচের টুকরোর মত চাঁদামামার ভাঙা আলো, খানিক চক্‌চক্ করেই নিভে গেল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই চাঁদামামার আধখানা কোথায় উড়ে গেছে।

ভাগ্যি নদীতে তেমন জল ছিল না, নইলে সবাই আজ ডুবেছিলুম আর কি! বড় তেষ্টা পেয়েছিল। নদী থেকে এক-ঘটি জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তবে বাঁচি।

নদীর ধারেই একটা গাঁ রয়েছে। দেখে সাহস হল; ভাবলুম—আজ রাত্তিরে ওই গাঁয়ে গিয়ে কারু গোয়াল-ঘরে শুয়ে থাকি; কাল সকালে এখানে থেকেই ফিরে পালাব, পিসির বাড়ি যাওয়া আর কাজ নেই বাবা! এই মনে করে গায়ের ভিতর গিয়েদেখি, সেখানে জনমানব নেই। ডাক্-হাঁক্ করে কারো সাড়াও পাইনে! যাই হোক, গাঁ ছেড়ে আর এক পাও নড়া নয়। চাদর মুড়ি দিয়ে একটা ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়লুম। যেমন শোয়া আর ঘুম,— অকাতরে ঘুম।

খানিক পরে জেগে দেখি, সেই মনসাতলায় লণ্ঠন-ভূতটা আর তার চার বন্ধু আলো নিয়ে আমার মুখের কাছে বসে আছে। "তবে রে!"—বলেই যেমন উঠতে যাব অমনি তারা বলে উঠেছে—"দেখ বাবু, যদি ফের লাঠি দেখাও, কি মারতে আস, তবে আবার আমরা তোমাকে ফেলে পালাব। আর যদি চুপ করে ভালো মানুষটি হয়ে পাল্কিতে বসে থাক তবে ওই-কি-বলে ও-কি-তলা পর্যন্ত তোমাকে আমরা পৌঁছে দেবো।" বুঝলুম, ভূতগুলো ভয়ে রাম নাম মুখে আন্‌তে পারছে না, তাই পিসির বাড়ি যেতে যে রামচন্ডীতলার কথা শুনেছি তাকে বলছে—কি-বলে-ও-কি-তলা।

ভূতগুলো ভয় পেয়েছে দেখে সাহস হলো; পাল্কিতে আবার উঠে বসলুম।

এবারে আর ভয় করছে না—ভোর হবার এখনো দেরী আছে কিন্তু এরি মধ্যে ভূতগুলো যেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে; মাঠে আর ঘন ঘন আলেয়া দেখা দিচ্ছে না, পথের ধারে তালগাছ তো দেখাই দিচ্ছে না, কোথাও মনসাগাছের ছায়াটি পর্যন্ত আর দেখা যায় না। পূবদিক থেকে ভোরের বাতাস একটু একটু আসছে; ভূতগুলো হাওয়া পেয়েই যেন জড়োসড়ো। আমি কিন্তু বেশ আরামে পাল্কিতে দরজা খুলে ঘুম দিতে দিতে চলেছি।

ভোর হয় দেখে ভূত-বেহারা চারটে ভয় পেয়েছে কিন্তু রামচণ্ডীতলায় আমাকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি এই ভেবে তাদের একটু আহলাদও হয়েছে। চার ভূতে চার সুরে চিঁচি, পিঁপি, খিট্‌খিট্, টিকটিক্ করে গান গাইতে গাইতে চলেছে,—ঠিক যেন কতদূর থেকে চিল ডাকছে, আর কোলা ব্যাং কট্‌কট্ করছে। ঘুমের ঘোরে শুনছি যেন "কুহু কেকার" ঠিক সেই পাল্কির গানটা!

কিন্তু কথা গুলো সব উল্টোপাল্টা আর সুরটাও বেখাপ্পা বেয়াড়া—বেজায় ভুতুড়ে। কেবল হাড় খট্‌খট্‌, দাঁত মিট্‌মিট্‌, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গায়ে জ্বর এলো। ঘুমিয়ে আছি কিন্তু তবু শুনছি—

চলে চলে
হুম্‌কিতালে
পংখী গালে
মাসিপিসি
বাঘ্‌বেরালে।
ভূত্‌পেরেতে
হন্‌হনিয়ে
চল্‌ছে রেতে
গাছ্‌ তলাতে
দুলছে কতক
তালপাতাতে।
দিনদুপুরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাতদুপুরে
হুতুম ঘুমোয়।
ভোঁদড় ভাম
বেঙ-বেঙাচি
টিকিটিকি আর
ভূত্‌ পেরেতে।
পাল্কি দোলে
উঠতি আলে
নাল্‌কি দোলে
নাম্‌তি খালে।
আলো আঁধারে
কালোয় সাদায়
শেওড়াগাছ
কানামাচি।
গঙ্গা ফড়িং
জোনাকপোকা
আরশোল্লা
ন্যাংটাখোকা।
ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাঁক্‌শেয়াল
শুকনো পাতা
গাছের ডাল।
বেরাল নাচ।

মরানদী
বালির ঘাট্‌
মন্‌সাতলায়
মাছের হাট্‌।
ভূতের জমি
ভূতের জমি
সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
ঘূর্ণি-হাওয়ায়
চলছে ঘুরে।
জগৎজুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুল্‌ছে কুলো!
ভূত্‌পেরেতের
নাইকো কমি।
উড়ছে কতক
ভন্‌ভনিয়ে
চলছে কতক
হঁন্‌হঁনিয়ে।
ঢুলছে কতক
ঢুলছে কতক
সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
আলো-আলেয়া
জ্বলছে দূরে
সব ভুতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুরতলায়
ইঁটের ঢেলা···

গানটা শুনছি একবার—"ছুঁচো, ইঁদুর, কানামাছি, ভোঁদড়, পেঁচা, টিকটিক, খেঁকশিয়াল।"-গানটা শুনছি দুবার—"গংগা ফড়িং, জোনাক পোকা, আরশোল্লা, বাদুড়—।" গানটা শুন্‌ছি তিনবার—"আলো আলেয়া, ঘুর্ণিহাওয়া, খেজুরগাছ, ইঁটের ঢেলা—।" একবার, দুবার, তিনবার—বারবার, তিনবার ইঁটের ঢেলা পড়ছে কি, আর পাল্কিসুদ্ধ আমাকে ভূতগুলো ঝপাং করে মাটিতে ফেলে খেজুরগাছের তলায় একটা মরা গরু পড়েছিল সেটাকে নিয়ে লুফতে লুফতে দৌড় মেরেছে! ওদিকে অমনি রামচণ্ডী থেকে রাত তিনটের আরতি বেজেছে—টংটং, টং-আ-টং, টংটং-আ-টং।

এই খেজুর তলা পর্যন্ত ভূত আসতে পারে, তার ওদিকে রামচণ্ডী তলা, সেখানে রামসীতা বসে আছেন, হনুমান, জাম্ববান পাহারা দিচ্ছে, ভূতের আর সেখানে এগোবার জো নেই। ভূতপত্‌রী লাঠিরও জোর সেখানে খাট্‌বে না। কাজেই পোঁটলাপুঁটলি লাঠি ছাতা সমস্ত পাল্কিতে রেখে, কোমর ধরে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বালি ভেঙে রামচণ্ডী তলায় রামসীতা দেখতে তিনটে রাতে অন্ধকার দিয়ে একলা চলেছি। সঙ্গে একটি আলো নেই, হাতে লাঠিটি পর্যন্ত নেবার জো নেই। কি জানি লাঠি দেখে যদি হনুমান মন্দিরে ঢুকতে না দেয়! তখন যাই কোথা!

"রাম রাম"—বলতে বলতে বালি ভেঙে চলেছি। বালি তো বালি একেবারে বালির পাহাড়! এক একবার পিছন ফিরে দেখছি ভূতগুলো আসছে কি না। যদিও এখানকার বালিতে পা দিলেই তাদের মাথার খুলি ফটাস করে ফেটে যাবে তবুও খেজুরগাছটার উপর থেকে তারা ভয় দেখাতে ছাড়ে না।—টুপ করে হয় তো একটা খেজুর-আঁটি এসে গায়ে, পড়ল নয় তো শুনছি খেজুরতলায় যেন একটি কচি ছেলে ওমা ওমা করে কাঁদছে, শুনে ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে দেখি,—বুঝি কাদের ছেলে পথ হারিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে; হয় তো আমার নাম ধরেই পিছন থেকে কে একবার ডাকলে, গলাটা যেন চেনা-চেনা, ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই! অন্ধকারে হয় তো দেখলুম মাঠের মাঝে একটা জায়গায় খানিকটা জ্বলন্ত বালি তুবড়ি-বাজির মত ফস করে জ্বলে উঠল, ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখি কিন্তু গেলেই বিপদ,—একেবারে ভূতে ধরে জরিমানা করে ছাড়বে, নয় তো মট্ করে ঘাড় মটকে দেবে।

আমি আর এদিক-ওদিক কোনোদিক না দেখে "সীতারাম সীতারাম" বলতে বলতে চলেছি। ওই দেখা যাচ্ছে বালির পাহাড়ের উপরে পঞ্চবটির বন, বনের মাথায় রামসীতা-মন্দিরের চূড়ো। মনে হচ্ছে এই কাছেই, আর-একটু গেলেই পৌঁছে যাব কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন সব দূরে চলে যাচ্ছে—আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমিও দৌড়েছি খোঁড়া পা নিয়ে, দৌড়েছি হাঁপাতে হাঁপাতে, দৌড়েছি উঠি-তো-পড়ি বালির উপর দিয়ে।

এইবার শুনতে পাচ্ছি মন্দিরে খোল্ কর্‌তাল বাজছে; দেখতে পাচ্ছি জাম্বুবানের দল আগুন জ্বালিয়ে গাছতলায় বসে আছে; হনুমানের ল্যাজ বটের ঝুরির মত পাতার ফাঁকা দিয়ে ঝুলে পড়েছে।

আর ভয় কি! বলে যেমন রামচণ্ডী-তলায় ছুটে যাব আর নাকটা গেল ঠুকে। একি। নাক ঠুক্‌লে কিসে? এই তো সামনে সোজা রাস্তা—গাছের তলা দিয়ে মন্দিরে উঠেছে; তবে নাক ঠোকে কিসে?

নাকে হাত দিয়ে দেখি নাকটা বিলিতি-বেগুনের মতো ফুলে উঠেছে। সাম্‌নে হাতড়ে দেখি, প্রকাণ্ড কাচ, তার ভিতর থেকে ফ্রেমে-বাঁধা ছবির মত রামচণ্ডীর মন্দির, পঞ্চবটীবন, হনুমানের ল্যাজ সবই দেখা যাচ্ছে; কেবল তার ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে না। ফড়িংগুলো যেমন লণ্ঠনের চারিদিকে মাথা ঠুকে মরে, আমিও তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি চারিদিকে কেবল নাক ঠুকে ঠুকে। নাকটা বেগুনের মতো গোল হয়ে ফুলে উঠেছিল কাচে লেগে লেগে ক্রমে চেপটা হয়ে গেল, তবু কিন্তু ভিতরে ঢোকবার রাস্তা পেলুম না।

হাঁপিয়ে গেছি বালির উপর বসে পড়েছি, হনুমানের গোটাকতক ছানা, দাঁত বের করে আমাকে দেখে হাসছে। ভারি রাগ হল, রাগে বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। "জয়রাম!" বলে দিইছি একলাফ সেই কাচের উপরে।

লাফ দিয়েই ভাবলুম—গেছি! হাত পা কেটে, সকল গায়ে কাচ ফুটে রক্তারক্তি হল দেখছি! কিন্তু আশ্চর্য! রামনামের গুণে জলের মত কাচ কেটে একেবারে ভিতরে গিয়ে

পড়েছি—হনুমানের জাম্বুবানের দলের মাঝখানে! আর অমনি চারিদিকে রব উঠেছে —, জয় রাম! জয় জয় রাম, সীতারাম! সমুদ্দুরের ডাক শুনেছি—জয় জয় রাম ; বাতাসে শব্দ শুনেছি—জয় রাম! চারিদিকে জয় রাম সীতারাম!

কেউ আমাকে একটি কথাও বল্লে না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! আমি মন্দিরে রামসীতা দর্শন করে একটা কাঁটাবন পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছি। সেখানে দেখি ছটা বেহারা আমার পাল্কি নিয়ে বসে আছে—দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে।

"কে হে বাপু তোমরা আমার পাল্কিটি নিয়ে?"

"বাবুজি, আমরা তোমার পিসির চাকর—কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে।"

"আচ্ছা বাপু, চল তো পিসির বাড়ি।"—বলেই আমি পাল্কি চেপে বসেছি।

এবার চলেছি আরামে, কোন ভয় নেই; পা ছড়িয়ে বসে, পাল্কির দরজা খুলে মনের আনন্দে চারিদিক দেখতে দেখতে চলেছি। কেমন তালে তালে এবার পাল্কি চলেছে—কালকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি! ঝাঁকুনি নেই, পাল্কি চলেছে—আম্‌কাসুন্দি. জাম্‌কাসুন্দি! —যেন জলের উপর দুলতে দুলতে নেচে চলেছে। পিসির পাল্কি চলেছে—ধর্‌ কাসুন্দে, চল বাসুন্দে, বড়া ঝালুন্দে খোঁড়া মালুন্দে।

পাল্কির এক দরজা ধরে চলেছে হারুন্দে, আর এক দরজা ধরে চলেছে উড়েদের সর্দ্দার—কালো কিচ্‌কিন্দে।

হারুন্দের মাথায় কালোচুলের উঁচু ঝুঁটি আর কিচ্‌কিন্দের মাথায় পাকাচুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচকিন্দে কালো মীস,—যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির উপরে মনসা গাছ—খাড়া খাড়া খোঁচা খোঁচা, আর কিচ্‌কিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের সাদা ঢেউ—হাওয়ায় লট্‌পট্‌ করছে। কিচ্‌কিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক সাদা, খানিক কালো—খানিক আলো, খানিক অন্ধকার, একদিকে ধপ্‌ ধপ্‌ করছে শুকনো বালি আর-একদিকে টল্‌মল্‌ করছে কালো জল—নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলেছি, না, সাদা-কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির উপর দিয়েই চলেছি!

আমার বাঁদিকে কেবল বালি—সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করছে বালি; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর —কালো, কাজলের মতো কালো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ্‌কিন্দে—জলের আদি অন্ত কইতে কইতে; আমি চলেছি পাল্কিতে শুয়ে মনে মনে দুজনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের উপরে কালো পেনসিল দিয়ে লিখে নিতে নিতে। কিচ্‌কিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে নিতেই ধুয়ে মুছে গেছে, একটুও আর পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেট কেটে বসে গেছে; ধুলেও ওঠে না, মুছলেও যায় না,—বেশ পষ্ট পষ্ট পড়া যাচ্ছে।

নিজাম কাঁদির বিল

জরাসন্ধ

কত আর বয়স তখন! ছ-সাত বছর হবে। তবুও চোখ বুজলে সব চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি।

মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। অনেক দূর, যশোরের সীমানা ছাড়িয়ে। শুকনোকালে আগাগোড়া হাঁটা পথ, বর্ষাকালে নৌকো। রাত থাকতে বেরোলে একটা গোটা দিন, গোটা রাত, তার পরেও বেলা দুপুর। আমি হবার পরে মার আর যাওয়া হয়নি। দিদিমা বারবার খবর পাঠাচ্ছেন। মা বললেন, "চল, দিদাকে দেখে আসবি। বয়স হয়েছে। কবে চলে যান।" আমি তো ভীষণ খুশী।

পূজার ঠিক পরে! খাল বিল নদী নালা ধানক্ষেত সব জলে ভরতি। আকাশ পরিষ্কার বেরোবার পক্ষে সব চেয়ে ভাল সময়। ঘরের নৌকো, মাঝি নটবর-সারা বছরের লোক, অন্য সময়ে ক্ষেত খামারে কাজ করে, বর্ষার দিনে নৌকো চালায়। সঙ্গে রইলেন সেজদা।

কোলকাতায় কলেজে পড়েন, লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছেন।

নটবর মানুষটা একটু নড়বড়ে। হুঁকো নিয়ে বসলে আর উঠতে চায় না। তার ওপর বয়স হয়েছে, চোখেও কম দেখে। বড়দা তাকে বারবার হুঁশিয়ার করে দিলেন, "হাত চালিয়ে যেও, নিজাম কাঁদির বিলটা যাতে সন্ধ্যের আগেই পার হয়ে যেতে পার।" নটবর ভরসা দিল, "আপনি ভাববেন না কত্তা। সন্ধ্যে হবে কেন? দুপুর নাগাদ বিল পাড়ি দিয়ে ফেলবো।"

নিজাম কাঁদির বিলের কথা আমি মার মুখে আগেই শুনেছি। ওখানে নাকি কী সব ভয় আছে। রাতের বেলায় পার হতে গেলে মাঝিদের দিক ভুল হয়ে যায় সারা রাত ঘুরে বেড়ায়, অনেক সময়ে ওপারে আর পৌঁছতে পারে না। শোনা যায়, এমনি করে কত লোক মারা গেছে! কী যে হয় তাদের কেউ বলতে পারে না। তবে সাহস করে কোনো নৌকোই সন্ধ্যার পর বিলের পথ ধরে না।

নটবরের আরেকটা গুণ আছে—বেশ খেতে পারে এবং একটু ভালো মন্দ খাবারের দিকে ভীষণ লোভ। একটা বড় খালের ভেতর দিয়ে নৌকো চলছিল। খানিকটা পর পর ভ্যাশাল। দুটো বিশাল লম্বা বাঁশ যেন পা ফাঁক করে পড়ে আছে জলের মধ্যে, তলায় জাল বাঁধা। বাঁশ দুটোর একদিকে একটার সঙ্গে আরেকটা গাঁথা। সেইখানে চাপ দিয়ে মাঝে মাঝে যখন জল থেকে টেনে তুলছে একজন জেলে, জালের ওপর ছটফট করছে মাছ—রায়েক, সরপুঁটি, পাবদা, শোল, পোনার বাচ্চা, আরো কত কী! দেখেদেখে নটবরের জিভে জল এসে গেল। রান্নার সরঞ্জাম সঙ্গেই আছে। দুপুরের দিকে কোথাও নৌকো বেঁধে তোলা উনুনে দুটো খিচুড়ি ফুটিয়ে নেবেন, এই ছিল মার প্লান। নটবর বলল, "কী রকম বড় বড় রায়েক দেখছেন 'মাঠাইরেন'?" মা বুঝলেন তার মনের কথা। হেসে বললেন, "মাছ কুটবার বঁটি যে আনিনি।" "তাতে কী হয়েছে। দা রয়েছে তো, আমি কুটে দেবো। আপনি ভাববেন না।"

এক আনায় এক হালি (চারটা) মোটা রায়েক। মা রাঁধেনও চমৎকার। নটবরের ভোজনটা শুধু গুরু নয়, একটু গুরুতর হয়ে গেল। তার পরেই বালুই-এর ওপর খানিকটা গড়িয়ে নেওয়া। অনেক ডাকাডাকির পর যখন উঠলো তখন বেলা আর বেশী নেই। নিজাম কাঁদির বিলে পড়বার আগেই সন্ধ্যা পেরিয়ে বেশ কিছুটা রাত হয়ে গেল।

যে খালটা এসে বিলে পড়েছে তার ঠিক মোহনার পাশেই একখানা বাড়ি। নৌকোর শব্দ পেয়ে সেখান থেকে একজন দরাজ গলায় হাঁক দিল, "নাও কোথায় যাবে?"

"শুকচর"—সাড়া দিল নটবর।

"শুকচর!"—গলা শুনে মনে হল লোকটি অবাক হয়ে গেছে। তামাক টানতে টানতে এগিয়ে এল, —"নাও ভিড়াও।"

শুকচরে কোন বাড়ি যাবে জিজ্ঞেস করতেই বেরিয়ে গেল এরা মামাদের খুব অনুগত লোক। আমাদের না নামিয়ে ছাড়বে না। তাছাড়া এই রাত্তিরে বিল পাড়ি দেবার তো কথাই ওঠে না। রাতটা তাদের 'কুঁড়ে ঘরে' কাটিয়ে যেতে হবে। জাতে তারা নমশূদ্র, আমরা

বামুন। রেঁধে তো আর খাওয়াতে পারবেন না। মাকে চাট্টি চাল ডাল ফুটিয়ে নিতে হবে। মেয়েরা সব ব্যবস্থা করে দেবে। কত্তা গিন্নী হাত জোড় করে ঘাটে এসে দাঁড়ালো। 'না' বললে তারা শুনবে না।

মা মুশকিলে পড়লেন। 'কুঁড়ে ঘরে' কথাটা তারা বাড়িয়ে বলেনি। ছোট্ট একখানা পাট-কাঠির বেড়া দেওয়া খড়ের দো-চালা। সামনে খোলা বারন্দা। আর ওদিকে একচালা গোয়াল। তার মধ্যে তিন চারটে গোরু। সামনে এক চিলতে উঠোন। এর মধ্যে কোথায় উঠবো আমরা! তবু মাকে নামতে হলো। বারন্দায় একটা খেজুরের চাটাই বিছিয়ে দিল তাঁকে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, ঘরের মধ্যে ফিসফিস করে বলছে বৌটি, "চাল যা আছে কুলোবে না। তাড়াতাড়ি কোন বাড়ি থেকে চাট্টিখানেক ধার করে আনো।"

লোকটি যখন একটা ছোট ধামা নিয়ে বেরিয়ে এল, মা বললেন, "শোনো, অবেলায় খেয়ে আমদের কারো খিদে নেই। তাছাড়া এত রাত্তিরে রান্না করা অনেক হ্যাঙ্গাম। আমাদের সঙ্গে চিঁড়ে মুড়ি খইটই আছে, তাতেই হয়ে যাবে।"

অনেক বলা কওয়ার পর তাতেই রাজি হল হারান মণ্ডল। কিন্তু শুধু চিঁড়ে মুড়ি খাওয়া যায় নাকি? গোয়ালে দুধেলা গাই ছিল। দুইবার কথা সকালে। কিন্তু মণ্ডলের বৌ তখনই দুইয়ে আনল খানিকটা। উঠোনের কোণে উনুনে মাকে সেটা ফুটিয়ে নিতে হল। কোন বাড়ি থেকে এক ছড়া মত্তমান কলাও জোগাড় করে ফেলল হারান। ফলারটা আমাদের বেশ ভালোই জমল। কিন্তু তারপর? সেজদা বললেন, "ওখানে থাকা অসম্ভব। ভীষণ মশা আর পচা গন্ধ বর্ষার জল নেমে গেছে। চারিদিকের দাম জঙ্গল পচতে শুরু করেছে। ঘন্টাখানেকই টেকা যাচ্ছে না। তার ওপরে সারারাত। তাছাডা শোয়া যাবে কোথায়? ওদের ঘরদোরের তো ঐ অবস্থা। তিনটি ছেলেপিলে নিয়ে ওদেরই কুলোয় না।"

কিন্তু ওদিকে যে আবার নিজাম কাঁদির বিল! সেজদা কোলকাতার কলেজে পড়া ছেলে। ওসব একেবারে হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, ভয়টা কিসের? এমন চমৎকার চাঁদনী রাত। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, ঠাণ্ডা বিল। রাত পোয়াবার আগেই আমরা পৌঁছে যাবো।

হারান আর তার বৌ বলতে লাগল, কাজটা ঠিক হবে না। কদিন আগেই নাকি একখানা বিদেশী নৌকো না জেনে ঢুকে পড়েছিল বিলের মধ্যে। অনেক রাত্রে তাদের চীৎকার শুনতে পেয়েছে ওরা। পথ হারিয়ে জানতে চাইছিল কোন্ দিকে যাবে। সেজদা বললেন, চেনে না বলেই জানতে চাইছিল। আমরা ঠিক চিনে যাবো।

মার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ছেলের জিদ দেখে চুপ করে গেলেন। নটবর সেজো কত্তাকে যমের মত ভয় করে। মনে মনে যতই আপত্তি থাক, বাইরে মুখ খুলল না। আমার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করতে লাগল। ওদিকে আবার কৌতূহলও কম নয়—দেখা যাক কিসের ভয়।

ছই-এর ভেতর মা আর আমি শুয়ে পড়লাম। বাইরে পাটাতনের ওপর সতরঞ্চি বিছিয়ে সেজদাও একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। গভীর বিল। লগি চলবে না। পেছনের

গলুইতে বৈঠা হাতে নটবর। যতদুর চোখ যায় জল আর জল। তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঢেউগুলো মৃদু তালে ঘা দিচ্ছে নৌকার তলায়। সেই ধক্ ধক্ শব্দে আপনিই চোখ জড়িয়ে আসে।

কত রাত জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সেজদার হাঁক ডাকে, ঘুমিয়ে নৌকা চালাচ্ছ! নটবর মিনমিন করে বলল, "আইজ্ঞা না কত্তা, এট্টু ঝিমুনি এয়েছিল।"

ঝিমুনি এসেছিল। চোখে জল দিয়ে নাও।

নটবর চোখে জল দিয়ে জোরে জোরে বৈঠা চালাল! সেজদা একবার এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী করছ!"

নটবর আকাশ থেকে পড়ল—"কেন, কী হল?"

"—নৌকা ঘুরে যায় নি তো?"

"কী যে বলেন কত্তা!" কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নটবর, ঘুরে আবার গেল কখন? আমি তো সোজা সামনের দিকে চলেছি।

"তা তো চলেছো বুঝলাম। কিন্তু আমরা যখন বেরোই চাঁদটা ছিল বাঁদিকে। এতক্ষণে ডানদিকে চলে যাবার কথা। বাঁদিকে রইল কী করে?"

"তা আমি কেমন করে বলবো? চাঁদ কোথায় যাবে না যাবে, আমি কী জানি?"

একটু পরেই ফর্সা হয়ে গেল। ভোরের আলো ফুটে উঠল পূর্ব দিকটায়। সেজদা উঠে ছই ধরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "যা বলেছি তাই। ঐ তো সেই বাড়িটা।"

"কোন্ বাড়ি?"

"ঐ যে কী মণ্ডল, যেখানে আমরা উঠেছিলাম সন্ধ্যের পর।"

মা ছই-এর ভেতর থেকে উঁকি মেরে বললেন—"ওমা, তাইতো।"

লোকজনের আওয়াজ পেয়ে হারান মণ্ডল বেরিয়ে পড়েছিল। নৌকো চিনতে পেরে ছুটে এল ঘাটের ধারে। সেজদার দিকে চেয়ে বলল, "খুব বেঁচে গ্যাছেন, কত্তা। বেরাম্মন বলে তেনারা কোন ক্ষতি করতে পারেন নি। তা না হলে—"

বাকিটা মনে করেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চোখ বুজে দু'হাত কপালে ঠেকাল।

চাঙড়ীপোতার চণ্ডীভূত

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

রাত তখন আটটা হবে—

আসরটা খুব জমাট। বৃষ্টিও ঝেঁকে এলো। শচীন হাত তুলে চেঁচিয়ে বল্‌লে—" এই সব। শোন আমার কথা। এটা সত্যিকারের ভূতের গল্প । ভূতটাকে একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—"

ফণী বল্‌লে—" তোর চোখে তো মাইনাস আট পাওয়ারের চশমা। তুই যতটা দেখিস তার চেয়ে দশগুণ করিস্ কল্পনা।"

পূর্ণ গল্প ভালবাসে, বললে— "আহা ! শোনই না। সবটাই কি আর মিছে কথা হবে?"

শচীনের মুখ লাল হয়ে উঠলো ; বললে—" মিছে কথা বলতে ওস্তাদ তুমি। ওতে যদি কোন প্রাইজ থাক্‌তো তাহলে তুমি পেতে প্রথম পুরস্কার ; এবং ঐ সঙ্গে একটা একস্‌ট্রা মেডেলও। আমি যা বল্‌ছি, এর শতকরা একশ' ভাগই সত্যি—"

বরদা বল্‌লে—"চট কেন? আমরা কেউ কিছু তো বলছি না। তবে ভূত-টুথ—!"

শচীন হাত নেড়ে বললে—" বলছি তো একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—"

—" ভূত?"

— "হাঁ। রিয়াল গোস্ট! আমাদের বাড়িতে সেই যে চাওড়ীপোতার চণ্ডী আসতো, দেখেছ তো? সেই যে কালো রোগা, ঢ্যাঙা, চোখ দুটো বড়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ডান পা-খানা একটু ছোট বলে নেঙচে চল্‌তো—"

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—" হাঁ— হাঁ— সেই— সেই— যে খুব কাঁঠাল খেতে পারতো?"

"—ধ্যেৎ! কাঁঠালের সময় সে কোনদিন আসেইনি। আস্‌তো পৌষমাসে—"

পূর্ণ খাটো গলায় বল্‌লে—"পিঠে খেতে।"

কিন্তু স্বর খাটো হলেও তার হুলটুকু গিয়ে বিঁধলো শচীনের মনে। সে কট্ মট্ করে পূর্ণর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে— "ও খুব মাছ ধরতে ভালবাসতো। গ্রীষ্মের পর একটু বর্ষা পড়লেই চারের পোঁটলা আর ছিপ হাতে চণ্ডী সেই কোথায় তিন ক্রোশ দূরে ষষ্টীডাঙার ঘোষেদের পুকুরে, সাত মাইল দূরে কুমীরখালীর জোড়াদিঘীতে, দু'ক্রোশ দক্ষিণে বাবুহাটির বিলে, তার এধারে শঙ্খপুরের ঝিলে—"

পূর্ণ বললে—" চাওড়ীপোতার ঝোপে, বারুইপুরের জঙ্গলে —"

শচীন তাতে কান না দিয়ে বলে উঠলো—" মাছ ধরতে যেতো। ওর সঙ্গে মাছের কেমন একটা যোগ ছিল। যেখানেই যাক, যে দিনই ধরুক, ওর হাতে মাছ উঠতই। আমরা যে পুকুরে চার দিয়ে দিয়ে ছিপ ফেলে তিন দিন বৃথা বসে থাকবো একটা মাছও বড়শি টানবে না, ও সেখানে মাত্র এক ঘন্টা বসেই হয়তো দশ সের এক রুই, কি পনেরো সের এক কাৎলা তুলে ফেলতো। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার!"

পূর্ণ বললে—" এই থেকে প্রমাণ করা যায়, ও গত জন্মে বেড়াল বা ভোঁদড় ছিল—"

নারান ডাক্তারী পড়ছে; সে জন্যে তার ধারণা প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। সে বললে—" সীল, শ্বেত-ভাল্লুকও হতে পারে। আবার কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়।"

পূর্ণ ও নারাণের দিকে শচীন একবার ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে,—" তা সেবারও গ্রীষ্মের পর রীতিমত বর্ষা এলো। জলাগুলো উঠলো জলে ভরে, মাঠে মাঠে ঘাস উঠলো গজিয়ে, ঝোপ-জঙ্গল ঘন হলো, গাছ-পালা হলো শ্যামল, সতেজ। আকাশে সারা দিনরাতই মেঘের মেলা। সেই সঙ্গে চণ্ডীটাও উঠলো ক্ষেপে। রাঙা পিঁপড়ের বাসা ভেঙ্গে, বোলতার চাক পেড়ে মেদি গুঁড়িয়ে সুজি ভেজে সে শিকারের আয়োজন করতে লাগলো। ঘরের চালের বাতায় ছিপ, কাঠের বাক্সে হুইল, সুতো আর ছটা বঁড়শি ছিল। সেসব পেড়ে বার করে ঘোষেদের একটা রাঁজহাসের পালক ছিঁড়ে তাই দিয়ে ফাৎনা তৈরী করে, চায়ের মোড়কের রাংতা গলিয়ে তার ভার লাগিয়ে তিন দিনে তৈরী হয়ে নিল। কিন্তু কোথা যে মাছ ধরতে যাবে তা কারুকে বললে না।"

"সেদিন ভরা অমাবস্যা। সকাল থেকেই আকাশভরা কালো মেঘ। মাঠের শেষে দূরে তাল-নারকোলের শ্রেণী। সেগুলোও কালো দেখাচ্ছে। মাঠখানাকেও লাগছে কালো মতো বাতাসও বইছে ভিজে, এলোমেলো। ভোরের দিকে তো এক পশ্‌লা বৃষ্টিই হয়ে গেল। চাণ্ডড়ীপোতায় আমার মামার বাড়ি। কলকাতা থেকে সেখানে আম খেতে গিয়ে দেখি, মামাদের বাগান ফাঁকা। আম তো ফলেই নি, যে ক'টা ফল ছিল সেগুলোও বাঁদরে খেয়ে গেছে তবুও সকালে উঠেই আঁকশি হাতে বেরিয়ে পড়লাম।"

"বাগানের পাশ দিয়ে মাঠে যাবার পথ। গাছের তলায় তলায় বৃথা ঘুরে, বাগান থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি চন্ডী। তার এক হাতে ছিপ, আর এক হাতে গামছার পোঁটলা করে বাঁধা চার, টোপ, বগলে বাঁশের বাঁটওয়ালা ছাতা, গায়ে আধময়লা লঙক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের কালো জুতো। আমাকে দেখেই সে একগাল হেসে বললে—' শচীদা! সকালে উঠেই গাছ ঠেঙাতে বেরিয়েছ'?"

"চন্ডীটা আমাকে বরাবরই বড় ভক্তি করতো। আমি ওর ঠিক আড়াই বছরের বড়।"

নারাণ বললে- "হাঁ। তার ঐ কথাগুলো ভক্তেরই উপযুক্ত বটে।"

পূর্ণ বললে—" এবার আমি কিন্তু কিছু বলিনি—"

বরদা বললে—" আহা-হা! বাধা দাও কেন? তারপর বল—"

শচীন বললে—" তার উত্তরে বললাম— আমি তো ভোরে উঠেই গাছ ঠেঙাচ্ছি, তুই-ই বা কেন এখনই ছিপ হাতে বেরিয়েছিস্? কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

"সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত তুলে বললে—' সেই পোড়ো দীঘিতে'।"

"কথাটা শুনেই চম্‌কে উঠলাম। বললাম— বলিস কিরে। সে যে ভূতের আড্ডা। ওখানে কত লোক যে অপঘাতে মরেছে তার হিসেব নেই! আজ পর্যন্ত ও পুকুরে কেউ— ফিরে যা, ফিরে যা—"

"চন্ডী হেসে বললে— 'ভূত বলে কিছু নেই শচীদা! একেবারেই কিছুই নেই। তুমি দেখো, আমি নির্বিঘ্নে ফিরে আসবো, খালি হাতে নয়,অন্ততঃ দশ সের ওজনের দু'টো রুই ঝুলিয়ে। এই ব'লে রাখছি, সকলের প্রথমেই যে মাছটা ধরবো, সেটা তোমার'।"

"বললাম— না রে চন্ডী, এমন কাজও করিস্ না। ওখানে কি মানুষ যায়?"

"চন্ডী অবশ্য শুনলে না; একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে গেল। আমি তার বিলীয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, ছোঁড়াটা পাগল হয়ে গেছে! 'পোড়ো দীঘিটার' এক ক্রোশের মধ্যে কোন মানুষ যেতে সাহস করে না। কোন গরুও সেদিকে ঘাস খেতে যায় না; এমন কি, রাতের বেলা শেয়াল-কুকুরও সেদিক থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে আসে। কেবল চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচারাই সেখানে রাত কাটায়। আর ও কিনা একা সেখানে মাছ ধরতে যাবে!"

ফণী বললে—"কেন?"

— "এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব? দীঘিটা যে কত কালের এর হিসেব ও অঞ্চলের কোন

জমিদারদেরই সেরেস্তায় নেই। কেউ বলে আলাউদ্দিন খিলজির সময়ের, কেউ বলে আকবর বাদশার আমলের, আবার কেউ বলে, ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ছিল তখনকার। ওখানে নাকি এক সাহেব থাকতো। কিন্তু আমার দাদামশায় বলেন, 'ওটার বয়স মাত্র একশ' দশ বছর। ওখানে রতনা ডাকাতের আড্ডা ছিল'!"

"রতনা ছিল, আবার তাঁর দাদামশায়ের স্যাঙাৎ। ডাকাতি করতো রতনা, কিন্তু তাতে ভাগ বসাতেন আমার দাদামশায়ের দাদামশায়। সে পয়সায় তিনি জমিদারী কিনেছিলেন। তবে সে জমিদারী, আর জমিদার-বাড়ি এখন নেই। কেবল দাদামশাইয়ের ঘরে একটা পেল্লাই কাঠের সিন্দুক, একখানা মরচে ধরা ভোজালী, আর একখানা পোকায় কাটা জামিয়ার পড়ে আছে। যাক— নিজেদের ঘরের কথা না বলাই ভাল।"

"রতনা পথিকদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের গলায় পাথর বেঁধে ঐ দীঘিটাতে ডুবিয়ে মারতো।"

দ্বিজেন বললে—" এত পাথর সে পেত কোথায়? চাঙড়ীপোতা তো পাথুরে জায়গা নয়।"

বরদা বললে—" আরে বাপু! গল্পটা শোনই না।"

শচীন বললে— " একবার এক বুড়ি আর তার ছেলেকে রতনা তো ধরে নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে ছিল, খান দুই সোনার গয়না, গোটা দশেক টাকা। বুড়ীর ছেলেটা ছিল বেশ ষণ্ডা গোছের। রতনার লোকের সঙ্গে তার বেশ একটু লাঠিবাজী হলো। ফলে, রতনার লোকটার নাকটা একদম মুখের ওপরে গেল বসে। রতনা এই অপমান আর ক্ষতির শোধ নেবার জন্যে বুড়ীর চোখের সামনে ছেলেটাকে দীঘিতে ডুবিয়ে মারলো।"

"বুড়ী তখন আকাশের দিকে হাত তুলে চীৎকার করে বললে —'রতনা; যদি ভগবান থাকে, তুই-ও একদিন দম আটকে মরবি। তোর সদগতি কোন কালেই হবে না-'!"

"দাদামশাই বলেন, তাঁর দাদামশাই নাকি বলেছিলেন, বুড়ীর শাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। রতনা একদিন ঐ দীঘির ধারে দালানটার মধ্যে দম আটকে মরে। কি করে, তা আর বলেননি। সেই থেকে নাকি রতনা ওখানে ভূত হয়ে আছে! চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচা ছাড়া রাতের বেলা যে ওদিকে যায়, রতনা তারই গলা টিপে মারে। বেঁচে থাকতে বেটার যে অভ্যাস ছিল, মরবার পরেও সে স্বভাব ঘুচলো না! ঐ যে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'— এ তারই ভৌতিক প্রমাণ। যাক্।"

"দাদামশাই তখন ছোট। একবার দীঘিটার ধারে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্যাঙাতের নাতি বলে রতনা তাঁকে কিছু বলেনি। তবে দাদামশাইকে স্বপ্ন দেখিয়ে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল—'ওদিকে আর কখনও মাড়াস নি!'

"সত্যি কথা বলতে কি দাদামশায়ের শেষের কাহিনী আমি বিশ্বাস করিনি। কেননা তিনি ডেলা ডেলা আফিং খান!"

"চন্ডীটার জন্যে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। কি যে করা যায়, ভাবতে ভাবতে

তার দাদার কাছে গিয়ে, খবরটা জানালাম। শুনেই তিনি জ্বলে উঠলেন, বললেন—'ভূতের কিল খেয়ে আজ ওর শিক্ষা হোক। আমরা তো কিছুতেই ওকে সায়েস্তা করতে পারলাম না'।"

"বললাম—ভূষন্ডীদা, শিক্ষা তো পরে ; তার আগে যে প্রাণহানীর—"

"ভূষণ্ডীদা জিভ দিয়ে তালুতে চক্ শব্দ্ করে বললেন—'চন্ডের প্রাণ নেবে ভূতে? এমন বাহাদুর ভূত আজও প্রেতলোকে জন্মায়নি—!"

"এর উপর আর কি বলবো? বাড়ি এসে চুপ করে বসলাম—" বলে শচীন থাম্‌লো ।

বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দূরে কোন্ অট্টালিকার মাথায় যেন বাজ পড়লো। বৃষ্টি ও বাতাস মেতে উঠেছে। শার্সিগুলোর গায়ে এসে দুটোতেই মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—"তারপর—তারপর?"

শচীন বললে—"চন্ডী তো চলেছে—"

পূর্ণ বললে—"তুমি কি করে জানলে?"

শচীন হাত নেড়ে ভ্রূ কুঁচকে বল্‌লে— "আরে , এটা তো আস্ত 'ইডিয়ট' দেখছি। চন্ডী যে তখন চলেছে , এ কথা কে না জানে?"

সকলে বলে উঠলো—"ঠিক ঠিক। বলে যাও, বলে যাও—"

"চন্ডী আলের ওপর দিয়ে চলছে। তার দুধারে শস্যশূন্য ভিজে ক্ষেত। চাষীরা কোন কোন ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছে। ক্ষেতের এখানে সেখানে একটি দুটি তালগাছ। বিশ্বনাথের মন্তরভরা মাদুলীর মতো তাদের মাথায় জটার মধ্যে একটি করে কলসী বাঁধা। ক্ষেতের শেষ প্রান্তে গ্রাম। কালো মেঘের গাঢ় ছায়ায় সেগুলো ঝাপসা হয়ে আকাশের তলে মিশে আছে। চাণ্ডড়ীপোতা থেকে 'পোড়া দিঘী' পুরো আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে, আর সেখান থেকে সয়লা গাঁয়ের নদীটি এক ক্রোশ দূরে। চন্ডী মাঠ ভেঙে দীঘিটার কাছে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন বেলা ন'টা হবে।"

"দীঘির চারধারে ঝোপ-ঝাড়। তার মাঝে মাঝে তাল, নারকোল আর কয়েকটা আম-কাঁঠালের গাছ। চন্ডী শুনেছিল, সেখানে একটা বাড়ি আছে। কিন্তু কৈ—কিছুই তো— ঐ যে একটা দালান! চন্ডী সেখানে থেকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। দালানটার ছাদ ভেঙে পড়েছে, একধারে দেওয়া ধসে খান কয়েক কড়িকাঠ বেরিয়ে আছে। ছাদের ভাঙা আলসেয় কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ, নিচে চারধারে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। তার মাঝ থেকে কি একটা লতা যেন ওপর দিকে উঠে দালানটার এক দিকে ঢেকে রেখেছে। দালানটার দিকে তাকিয়েই চন্ডীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। কিন্তু দিনের বেলায় কিসের ভয়?"

"সে জঙ্গল ঠেলে দীঘিটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। জঙ্গলের জলে যে তার কাপড়-জামা ভিজে গেছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। তার সামনে প্রকান্ড দীঘি। তার প্রায় অর্ধেকটা পদ্মবন, বাকীটুকু কলমী হেলঞ্চা ও পানায় ভরা। হঠাৎ একটা বড় মাছ ঘাই দিয়ে উঠলো।

সেই সময় চন্ডী দেখলে, দীঘিটার জলের রঙ একটু লাল। কিছু দূরে এক জোড়া বক বসেছিল। চন্ডীর সাড়া পেয়ে তারা মোটা গলায় বকর বকর ডেকে সেখান থেকে উড়ে গিয়ে ওপারে শেওড়াগাছটার মাথায় বসলো।

ফণী বলে উঠলো, "এই যে বললে, সেখানে যে যায় রতনা তারই গলা টিপে মারে?"

শচীন বললে—"তোর শরীরটা যেমন মোটা, বুদ্ধিটাও তেমনই ভোঁতা। কাক-চিল-বক অর্থাৎ কোন রকম খেচরকেই মারে এমন সাধ্য ভূতের বাপেরও নেই।"

ক্ষিতীশ রোগা মানুষ ; এতক্ষণ চুপ করে শুয়েছিল। পা দুখানা দোলাতে দোলাতে বললে—"এরোপ্লেনও খেচর। তাকেও—"

শচীন বললে—"চুপ কর্ উইচিংড়ি! তোকে আর চিড়িং চিড়িং করতে হবে না। বেশ, তোমাদের যদি শুনতে ইচ্ছে না হয়, আমি আর-"

সকলে বলে উঠলো—"বল—বল। চন্ডী তার পরে কি করলে?"

—"চন্ডী দীঘির ধারে একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে তার ছাতা, ছিপ আর পোঁটলাটা সেখানে রাখলো। তারপর পোঁটলাটার ভেতর থেকে ছোট কাটারিখানা বার করে খানিকটা জায়গার জঙ্গল কেটে জল থেকে কলমী, হেলঞ্চা ছিঁড়ে পরিষ্কার করে, চার ফেলে, টোপ গেঁথে বঁড়শীটা হাতে দুলিয়ে জলে ফেলবার সময় একবার বাড়িটার দিকে তাকালো। তার মনে হলো, ডান দিকের ঘরখানার মধ্যে কে যেন সাদা কাপড় পড়ে দাঁড়িয়ে আছে ; আর তার চোখ জোড়া আগুনের ফুলকীর মতো জ্বলছে। দেখে চন্ডীর বুকটা একটু কেঁপে উঠলো। তবুও সে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো—সত্যি সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। মিনিট খানেক পরে লক্ষ্য করে আর কিছুই দেখতে পেল না। ওটা মনের ভুল ভেবে চন্ডী ছিপ ফেলে খান কয়েক কচু আর ভাটপাঁতা বিছিয়ে তার ওপর বস্‌লো।"

"চন্ডী তো ছিপের বাঁটটা পা দিয়ে চেপে চুপ করে বসে আছে।"

"চার ধারে নিস্তব্ধ নির্জন। ভিজে মাটি, পচা ডালপালার গন্ধ নাকে লাগছে। কচুবনে মশার ঝাঁক করছে—'পোঁ, পোঁ'। দীঘির ওপারে একটা তালগাছের মাথায় বসে একটা দাঁড়কাক থেকে থেকে ডেকে উঠ্‌ছে—'আহা-কাহা ; আহা—কাহা'। মাঝ দীঘিতে একটা মাছ ঘাই দিয়ে উঠলো; পদ্মবনের আড়ালে একটা ভীড়ভীড়ে পাখি শিষ দিল টিটির্‌র্‌র—চিট্।"

"চন্ডীর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এমন নিস্তব্ধতা সে আগেও অনেক দিন অনুভব করেছে। কিন্তু আজকে স্তব্ধতাকে বোধ হতে লাগ্‌লো—যেন পাষাণের মতো বিষম ভারী। কিছুতেই এটা নাড়ানো বা সরানো যাবে না। ক্রমেই যেন তা তার বুকের ওপর চেপে বসছে। বাতাস স্থির ; আকাশে মেঘভার স্থির হয়ে আছে ; একটি ছোট পাতা পর্যন্ত নড়ছে না, জলও শান্ত। কেবল একটা মোটা খড়কের মতো হলদে ফড়িং আধডোবা ফাৎনাটার ওপর বার বার উড়ে বসছে।"

"চন্ডী আন্দাজে ঠিক করলে, বেলা তখন বারোটা। সে প্রায় তিন ঘন্টা ছিপ ফেলে বসে

আছে। অথচ একটা মাছও—মনের ভাবনাটা শেষ না হতেই সে জলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো।"

"জলের মাঝ থেকে পানা ঠেলে ভেসে উঠেছে ওটা কি ? জিনিসটার রঙ কালো; দেখতেকতকটা পোড়া কাঠের মতো। সেটা তার দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দেখে চণ্ডীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। সে এত কাল মাছ ধরছে, এমন তো কখন হয় নি। সে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়িয়ে জিনিসটাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো। কিন্তু সেটা একেবারে কূলের কাছে এলো না, মাত্র কিছুদূর এসে হঠাৎ পদ্মবনের দিকে ঘুরে গেল। ঐ যে পিঠের কাঁটা, ঐ যে লেজ, ও হাতীর কানের মতো কানকো নড়ছে। ওটা রুই মাছ! এত বড় রুই মাছ! চণ্ডী বিস্ময়ে আনন্দে দু'পা এগিয়ে যেতেই দেখলো তার ফাৎনা একটু নড়ে উঠলো। সে চট্ করে এগিয়ে যেতেই দেখলো, মাছটা কোথায় ? কিন্তু সেটাকে আর দেখতে পেল না, ভাবলে ঐ মাছটাই কি ঘুরে এসে তার বড়শি টানছে?"

"ফাৎনাটা ক্রমেই জোরে ডুবছে -ভাসছে। চণ্ডী সে দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে, ছিপটা দুহাতে শক্ত করে ধ'রে কাঠ হ'য়ে বসে আছে। তার বাঁ গালে, ডান কানে যে দুটো কালো রঙের মশা বসে রক্ত চুষতে চুষতে ফুলে উঠছে, দীঘিপাড়ে তালবনের মাথায় মেঘে মেঘে অন্ধকার করে এসেছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই—"

ক্ষিতিশ মুচকী হেসে বললে—"সে এক মনে ফাৎনা দোলা দেখছে—"

শচীন এতক্ষণ তার দিকে মুখ করে গল্প বলছিল ; এবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—"এটা দেখছি, পূর্ণর স্যাঙাৎ—"

পূর্ণও তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র একটি দংশন করলে ; মিহি গলায় বললে—"যেমন তোর দাদামশায়ের ছিল রতনা স্যাঙ্যাৎ—"

শচীনের সারা গা যেন জ্বালা করতে লাগলো। সে চোখ-মুখ রাঙা করে বললে — "তার মানে?"

বরদা বললে—"আহা! কি ছেলেমানুষী করছো? হাঁ-হাঁ খেয়ালই নেই চণ্ডীর বল—"

"এরকম করলে বলা অসম্ভব । যদি শুনতে চাও, কেউ একটি কথাও কইতে পাবে না।"

" বেশ এই আমরা মুখে চাবি দিলাম।"

তবুও শচীন একটু চুপ করে রইলো ; তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলে—"ফাৎনা তো ডুবছে-ভাসছে। শেষে যেই একবার তল হলো, চণ্ডীও মারলে সজোরে টান। সঙ্গে সঙ্গে 'কর্র্র্' শব্দে হুইলের সুতো খুলে নিয়ে মাঝ দিঘীতে মাছ ছুটে গেল। আর সেই মুহূর্তেই একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে তালবনের ওপর থেকে সোঁ সোঁ শব্দে বৃষ্টি এল ছুটে। দেখতে দেখতে বৃষ্টিধারায় সব মুছে গেল। ওদিকে মাছও ছুটছে।— একবার ডানধারে, একবার বাঁ ধারে, কখন-কখন সোজা মাঝ দিঘীতে। ছিপের মাথা বেঁকে বঁড়শীর মতো হয়ে গেছে। মাছটা থেকে থেকে পদ্মবনে সেঁধবার চেষ্টা করছে। চণ্ডীরও জেদ তাকে কূলের কাছে আন্‌বেই। এক একবার তার মনে হয়, বুঝি ছিপখানা ভেঙে গেল।"

"এই টানাটানিতে প্রায় ঘন্টা চারেক কেটে গেল। এর মধ্যে বৃষ্টি একবার থামেনি বরং ঝেঁকে এসেছে। চন্ডীর অবস্থা তখন—"

—"ভিজে বেড়ালের মতো—"

কিন্তু টিপ্পনীটা যে কে কাটলে, শচীন তা ধরতে পারলো না। সকলেরই মুখ গম্ভীর। তবুও তার সন্দেহ হতে লাগলো এ পূর্ণ কিংবা ক্ষীতিশের কাজ। যাই হোক, না থেমে সে বলে চললে, " একে মাছের সঙ্গে টানাটানি করে সে ক্লান্ত, তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি, আর সেই রকম ভুতুড়ে জায়গা। সে মাঝে মাঝে ম্রিয়মান হয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু মাছটার লেজ বা পিঠের কাঁটা যেই ভেসে উঠতে দেখে তৎক্ষণাৎ সে শরীরে বল, মনে স্ফূর্তি পায়। এমনই করে বেলা যখন যায় যায় তখন সে যা আশা করেছিল, মাছটা তার কিছুই না। একটা সাড়ে পনের সের ওজনের কাৎলা মাত্র। তার প্রকান্ড মাথা, মস্ত মুখ দেখে মনে হতে লাগলো, যেন একটা রাক্ষসের ছানা।—" বলে শচীন চুপ করলে। বাইরে তখনও ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়ছে।

তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলে—"ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। চন্ডী এতক্ষণ দেখেনি, ওপারে দীঘির ডান কোণে একটি সরু নালা ছিল। সেটা দিয়ে হু হু শব্দে মাঠের জল এসে দীঘিতে পড়ছে। তাতে দীঘিটা ভরে উঠছে। চন্ডী ছিপ গুটিয়ে বাকি টোপ আর চারগুলো দীঘিতে ফেলে. মাছটাকে গামছায় বেঁধে বহু কষ্টে দীঘির পাড়ে উঠেই দেখে, চারধারের মাঠ জলে ডুবে গেছে। কিছুদূরে যে জঙ্গলটা ছিল সেটাও আর দেখা যায় না। চন্ডীর বুক কেঁপে উঠলো। সর্বনাশ! সয়লা নদীতে বান এসেছে নাকি! ছেলেবেলায় আমি আর চন্ডী একবার সয়লা নদীর বান দেখেছিলাম। সেবার চাঙড়ীপোতার অবস্থা হয়েছিল একটা প্রবালদ্বীপের মতো। সেই স্মৃতি চন্ডীকে বিচলিত করলো। এই জলস্রোত ঠেলে আড়াই ক্রোশ যাওয়া একেবারে অসম্ভব। হয়ত পথের মাঝে মাঝে জল আরও বাড়বে। সেযে কি করবে ঠিক করতে পারলো না। সেই সময় একবার ভয়ঙ্কর শব্দ করে দূরে একটা তালগাছের মাথায় বাজ পড়লো।"

"শব্দ আর আলোর ঝোঁকটা কাটিয়ে সে একবার পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখলো, তার বারান্দার সামনে ঘরখানার দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রথমটা সে ভাবলে মনের ভুল। তারপর আবার সেদিকে তাকাতেই দেখলে, সত্যিই একটা লোক। ঐ যে হাতছানি দিতে দিতে ঘরের ভেতর দিকে চলে গেল। তবে কি এখানে লোক বাস করে ? ভূতের গল্পটা একদম বাজে? সম্ভবতঃ লোকটা তার দুর্দশা দেখে, তাকে আশ্রয় দিতে চাইছে। কিন্তু লোকটার স্বভাব ভাল তো? যদি ডাকাত হয়? অবশ্য ডাকাত হলেও তার তখন কিছু করবার ছিল না। তার কাছে মাছটি ছাড়া মূল্যবান আর কিছুই নেই। সে আর দেরী না করে বাঁ হাতে মাছ, ডান হাতে দা, বগলে ছিপ আর কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিয়ে ছাতাটা চেপে ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িটার দিকে এগোতে লাগলো।"

"জঙ্গল ঠেলে মিনিট পাঁচেক চলে ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে চন্ডী উঠোনে গিয়ে পড়লো সামনেই বারন্দা আর সেই ঘরখানা। কিন্তু কৈ কাউকে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে না। বারান্দায় উঠবার সিঁড়িগুলো ভেঙে পড়েছে। বারান্দায় জঙ্গল। এ রকম জায়গায় কি করে মানুষ থাকে? এবার তার মনে একটু ভয় হলো; ততক্ষণে আর একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি বাতাস যেন আরও মেতে উঠেছে। সে আর না এগিয়ে সেখান থেকে চীৎকার করে ডাকলো—' কে আছেন? ভেতরে আছেন কে'?"

"চন্ডীর মনে হয়, ভেতর থেকে যেন উত্তর এলো—'চলে আসুন'!"

"চন্ডী তৎক্ষণাৎ ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে ওপরে উঠে বারান্দা পার হয়ে ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বললে,—' আমি এসেছি'।"

—"চন্ডীর মনে হলো, তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা যেন এধার থেকে ওধারে সরে গেল আর ঘরের মধ্যে কে যেন কাকে ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে।"

"চন্ডী আবার বললে—কে আছেন মশায়? কে আছেন?"

"সামনে অন্ধকার ঘর, বাইরেও অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে সজল বাতাসের হাহাকার চন্ডীর মন যেন কেমন হয়ে গেল। যে ডাক্‌ছে সে তো কৈ এগিয়ে আসছে না; ভেতরে কোথাও একটু আলোও ত দেখা যায় না। সে আবার বললে—মশায়, বড় অন্ধকার একটা আলো।"

" ভেতর থেকে উত্তর হলো—এগিয়ে আসুন।"

"চন্ডী সাহসে ভর করে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের মধ্যে হাত কয়েক এগিয়ে যেতেই তার মনে হলো কারা যেন অন্ধকারের মধ্যে খিল খিল করে হেসে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে চন্ডীর পায়ের নীচে মেঝেটা একেবারে হাত পাঁচ-ছয় গেল বসে। চন্ডীও সেই সঙ্গে গর্তটার মধ্যে পড়ে গেল, এমন আচম্বিত দুর্ঘটনার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবুও তৎক্ষণাৎ উঠবার চেষ্টা করতেই সে দেখলো, একটা কঙ্কাল তাকে দুহাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরেছে। দেখেই সে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।"

ফণী বললে—"নিশ্চই 'মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল?"

শচীন বললে—"চন্ডীর মা নেই। ইয়ারকি রেখে শোন্। তারপর সন্ধ্যা হতেই আমরা তো ভেবে অস্থির। কিন্তু তখন চন্ডীর সন্ধানে সেই ভুতুড়ে বাড়ির দিকে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। জলটা আবার বাড়ছে। তবুও সকলে আশা করতে লাগলাম, চন্ডী এল বলে। কিন্তু ক্রমে রাত বেশি হতে লাগলো, তবুও চন্ডীর দেখা নেই! শেষ রাত যখন বারোটা, জলটা তখন একদম ধরে এলো, কিন্তু বাতাস শান্ত হলো না। সে চারধার থেকে বন্যার কল্লোল বয়ে পাগলের মতো গ্রামের শূন্য অন্ধকার পথ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমরা আর কি করবো? চন্ডীদের বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর বসে ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ক্রমে রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। আমরাও চন্ডীর খোঁজে বার হলাম,

সংখ্যায় সতেরো জন।

ক্ষিতীশ আস্তে জিজ্ঞেস করলে —"কিসে?"

শচীন বললে— "ডোঙায়—"

পূর্ণ বললে—"তালগাছ বুঝি কাটাই ছিল?"

শচীন বললে, "সকলেই তোর মতো মিছে কথা বলে না। চাঙড়ীপোতার ব্যাপার তুই কি জানবি? থাকিস তো বদ্যিবাটিতে। তোরা শোন্। চারধারে জল—যতদূর দেখা যায়—জল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তা'র ওপর দিয়ে টরপেডো-বোটের মতো আমাদের সতেরো খানা ডোঙা চলেছে। বল্‌লে বড়াই করা হবে, সেই সার্চপার্টির ক্যাপটেন ছিলাম আমিই।"

বরদা লাঠি খেলে ঃ বললে—"সাবাস!"

"আমি জানতাম. কোথায় চন্ডীর খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই সকলকে সেই দিঘীর দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম। স্রোত ঠেলে জল কেটে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু রোদ বেরিয়েছে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার, কিন্তু সেখানকার দৃশ্য দেখে আমার বুক দমে গেল। এর মধ্যে চন্ডীকে পাব কোথায়? মনের ভাব গোপন করে সকলকে বললাম— 'ঐ বাড়িটার ভেতর চন্ডীর খোঁজ করা যাক্ চল'—"

হরি চক্কোত্তিটা চিরকালের ফাজিল; বললে 'চন্ডে ওখানে এতক্ষণ বসে আছে! সে আর কোথাও গেছে! আপনার যেমন কথা।'

"বলা বাহুল্য তাকে তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে থামিয়ে সকলকে নিয়ে বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে পাঁচিলের কাছে গিয়ে হাঁক দিলাম—'চন্ডী আছ? চন্ডী'?"

"চন্ডীর দাদা ছিলেন, আমার পিছনে। বললেন—একটা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে—না? ঐ শোন- ঐ।"

"সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম। হ্যাঁ— ঐ যে মনে হচ্ছে সামনের ঘরখানার মধ্যে কে যেন গোঙাচ্ছে!"

"বললাম—দাদা, চলুন সকলে।"

"আমি রইলাম সকলের আগে। সকলের আগেই উঠোন পার হয়ে বারান্দার কাছে পৌঁছলাম। এবার শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। গোঙানির মাঝে মাঝে কে যেন কথা বললে—না?"

"চন্ডীর দাদা বললেন—'হ্যাঁ, তাই তো। চন্ডীর গলা মনে হচ্ছে। চন্ডে-চন্ডে—'। কিন্তু সে ডাকের কেউ সাড়া দিলে না, আওয়াজও থামলো না। এতে রহস্যটা আরও ঘোর বলে বোধ হতে লাগলো। আমারও জেদ চাপলো শেষ দেখতেই হবে!"

"আমি ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে, বারান্দাটার পার হয়ে ঘরখানার চৌকাঠের ধারে পৌঁছতেই কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠল —এস— এস—বড় অন্ধকার— ওঃ — ছেড়ে দাও—।"

"চীৎকার করে বললাম—'চন্ডীরে পাওয়া গেছে—ঐ যে কথা বলছে'।"

"আমার কথা শুনে সকলে পিছনে এসে দাঁড়ালো। আমি সোজা ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না, কয়েক পা গিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দেখি, গর্তের ভেতরে একটা লম্বা কঙ্কালের বুকের ওপর চন্ডী কাৎ হয়ে পড়ে ভুল বকছে, আর কঙ্কালটা, তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। সকলে ইতিমধ্যে এসে গর্তটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। কঙ্কালটার মস্ত মাথা, চক্ষুহীন কোটর, বত্রিশটি দাঁত, বড় চোয়াল—কিন্তু আর বলতে ইচ্ছা হয় না।"

সকলে বলে উঠলো—"বল, বল, থেম না— তারপর কি হলো?"

শচীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—"সেই কঙ্কালের বুক থেকে বহু কষ্টে চন্ডীকে উদ্ধার করে নিয়ে আমরা চাণ্ডড়ীপোতায় ফিরে এলাম।"

নারাণ জিজ্ঞাসা করলে—"সেই কাৎলা মাছটা?"

শচীন সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—"আমি সেইদিনই দুপুরে কলকাতায় চলে আসি। রাতের বেলায় তেতলার ঘরে দরজা ভেজিয়ে একা বসে চন্ডীর কথা ভাবছি। জানলার বাইরে নারকেল গাছটা বাতাসে সর্ সর্ করছে। হঠাৎ হুস্ করে দরজাটা খুলে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে চন্ডী। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড কাৎলা মাছ। মাছটা তখনও খাবি খাচ্ছে! বুঝলাম চন্ডী আব নেই! আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।" বলে শচীন চুপ করলে! নিস্তব্ধ ঘর; বাইরেও তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল। সকলে সে দিকে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠলো—" চন্ডী—চন্ডী এসেছে—চন্ডী!"

চন্ডী ঘরে ঢুকেই বললে—"শচীদা, তোমাকে খুঁজতে এখানে—"

শচীন ততক্ষণে স্প্রীংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ফরাস থেকে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। চন্ডীকে আর না এগোতে দিয়ে একজোড়া স্যানডাল্ কুড়িয়ে নিয়ে সে চন্ডীকে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে, "শীগগির বেরিয়ে আয়—"

ক্ষীতিশও তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠলো—"আরে ! আমার এক পাটি স্যানডাল্ নিয়ে গেল। এ যে দুটোই বাঁ পায়ের—"

পূর্ণ বললে—" ব্যস্ত হয়ো না , ও আবার আসবার পথ করে গেল।"

রাস্তা দিয়ে একখানা ছ্যাকরা গাড়ি যাচ্ছিল। সকলে শুনতে পেল শচীন চিৎকার করে বলছে—"এই রোখ। বাগবাজার—হাঁ—হাঁ—"

তারপরেই গাড়োয়ানের গলার ও চাকার আওয়াজ পাওয়া গেল—"টি—টি—গড়্—গড়্—গড়্!"

না। সে গরিব, ভয়ঙ্কর গরিব, সে বাচ্চার গায়ের অলঙ্কার দেখে লোভে পড়ে গেল। এই তালগাছের মাথা থেকে নতুন করে জীবন শুরুর স্বপ্ন দেখতে লাগল।

সেদিন তো কাঁদিগুলো গাছ থেকে নামিয়েই তরতর করে নেমে এসেছে জহর। আরও এক কাণ্ড করল, গাছ প্রদক্ষিণ করে গড় করল গাছটাকে। গাছে ওঠার সময় লোকে গাছকে প্রণাম করে, কিন্তু জহর নেমে এসে প্রণাম করছে দেখে সকলে একটু অবাক হল।

পুকুরপাড়ের তালগাছ, তেমন ঝোপ জঙ্গল না থাকলেও সাপখোপের আড্ডা। দিনের বেলা এক কথা, গভীর রাতের বেলা... তবে কোনওরকমে হাত দুই উঠে যেতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই।

না, চিন্তা আছে, শকুনের মা কি আর সহজে ছেড়ে দেবে! শকুনের কামড়! তার লম্বা ঠোঁট যদি একবার পেটে ঢুকিয়ে দেয়...!

তা সত্ত্বেও জহর গাছ বেয়ে উঠতে লাগল। ওপরে উঠে শকুনের মা'কে অবশ্য দেখতে পেল না, হিরে-সোনায় মোড়া বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। বাচ্চাকে গামছায় বেঁধে পিঠে নিয়ে গাছ বেয়ে নেমে এল তরতর করে।

এতটুকু বাচ্চা, দুই কি তিনদিন বয়স। তা হলে কোনও শক্ত অসুখ হয়েছিল, রাজবৈদ্য বুঝতে পারেননি, মৃত ভেবে শ্মশানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, মা-শকুন পায়ে করে তুলে এনেছে। নয়তো মৃত রানিমা'র পেট চিরেও হতে পারে! যাই হোক সে এসব কথা কাউকে বলবে না, মাকেও না।

জহর আজ দশ বছর ধরে এই গাছে ওঠার কাজ করে আসছে। আগে তার বাবা করতেন, বাবা মারা যাওয়ার পর সে এই পেশাকই বেছে নেয়। গাছে উঠতেও তার ভয় করে না, গাছের ওপরেও ভয় করে না, কতবার গাছের ওপরে উঠেছে আর তেড়ে বাতাস বইতে শুরু করল, সরু নারকেল গাছ, যেন এই ভেঙে পড়ে সেই ভেঙে পড়ে! ঝড়বৃষ্টিতে নীচের সবাই পালিয়েছে, অত ওপরে সে কেবল একা। কিন্তু ভয় পাওয়া দূরের কথা সে আরও মজা পায়, সে নিজেই গাছের ওপরে দাঁড়িয়ে দোলনায় দোলার মতো দুলতে থাকে। কতবার তার মাকে কেঁদে-কেঁদে এসে ছেলেকে গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। আসলে গাছের ওপরে উঠে এলেই তার নীচের কষ্ট বিশেষ মনে থাকে না, নিজেকে বড় ফুরফুরে লাগে, তখন নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কী মনে হয়, কত স্বপ্ন। সর্বোচ্চ তালগাছ বা নারকেল গাছের ডগায় বসে জহরের মনে হয় — চাঁদ এমন কী দূর, এ-রকম কয়েকশো তালগাছ, না হয় কয়েক হাজার...! জহর মনে-মনে বলে, 'আমি যদি চাঁদ পর্যন্ত তালগাছ পেয়ে যেতাম তো চাঁদে চলে যেতাম!'

জহর ছেলের গায়ের গয়নাগুলো খুলে তুলসীমঞ্চের দক্ষিণ কোণে পুঁতে রাখল। বাড়িতে বৃদ্ধা মা ছাড়া যদিও কেউ নেই, তবু মানুষ বৃদ্ধ হলে অনেক সময় তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, গয়নার খবর কোনওমতে জানাজানি হলে আর রক্ষে নেই।

জহর ভোরবেলা ঘরে এল, মাকে ডাকল। তার মায়ের খুবই পাতলা ঘুম, বাবার মৃত্যুর

পর থেকে ঘুমের জগৎটাই সরে গেছে তার দুনিয়া থেকে।

"কী বাবা, ফিরলি?"

জহর বিকেলবেলা বলে বেরিয়েছিল, আমি পুব গাঁয়ে যাচ্ছি, পিসিবাড়ি।"

জহর বলে, "দ্যাখো মা, তোমার কাছে কে এসেছে!"

মা ঘুমচোখ ছাড়িয়ে দেখেন জহরের কোলে দিব্যসুন্দর এক বাচ্চা।

"এ কে রে?"

"তোমার নাতি গো!"

"অ্যাঁ! কী যা-তা বলছিস! আমরা গরিব বলে কেউ মেয়েই দিতে রাজি হচ্ছে না, তোর বিয়েই দিতে পারলাম না!"

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "কী যে বলছিস, কিছুই বুঝতে পারছি না!"

জহর বানিয়ে বলে, "জানো মা, তোমাকে এতদিন বলিনি, আমি পুব গাঁ ছাড়িয়ে অটলপুরে বিয়ে করেছিলাম, সে আমাদের স্বজাত নয় এজন্য তুমি দুঃখ পাবে ভেবে... কিন্তু গিয়ে দেখলাম রাত্রি মারা গেছে কোলের শিশুকে রেখে, এই চার-পাঁচদিন হল। রাত্রির বাবা-মা ছেলেকে রাখতে চাইল না, কিন্তু আমার ছেলে আমি তো আর...।"

বৃদ্ধা দৌড়ে এলেন, "আমার নাতি, আমার সোনা-মানিক" বলে বুকে জড়িয়ে নিলেন বাচ্চাটিকে।

কিন্তু তাদের গরিবের সংসারে বাচ্চা মানুষ করা খুবই মুশকিল হয়ে উঠল। তাদের প্রকৃত অর্থে নুন জুটলে পান্তা থাকে না, পান্তা জুটলে নুন থাকে না, এক্ষেত্রে দুধের বাচ্চাকে তারা যে কী খাইয়ে রাখবে? দুধ আর কোথায় পাবে, শেষ পর্যন্ত ভাতের ফ্যান খাওয়াতে গিয়ে মা-ছেলের সে কী কান্না!

প্রতিবেশীর বাড়িতে দুধ চাইতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন জহরের মা। প্রতিবেশীর স্ত্রী বলল, "ছেলের বিয়ে দিলে একবার মুখের কথাও বললে না, আজ এসেছ নাতির জন্য দুধ চাইতে, লজ্জা করল না!"

লজ্জা তো করে, কিন্তু ফ্যান খাওয়াতে গেলেই যে হাত কাঁপে, তিনি যে কী করবেন! নাতিকে কোলে নিয়ে সেদিন সারারাত কেঁদেছেন জহরের মা, কাঁদেন আর ভগবানকে ডাকেন।

কিন্তু অবাক ব্যাপার, অতটুকু ছেলে সারাদিন কিছু খেতে না পেলেও একবারও কাঁদে না। আহা, ছেলে তো নয় যেন দেবশিশু! ওদের মা-ছেলে পারলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে ওই চাঁদপানা মুখের দিকে তাকিয়ে।

সেদিন ভোরবেলা, হঠাৎ মা ঠেলে-ঠেলে ডেকে তুলছেন জহরকে।

"ওঠ-ওঠ, দ্যাখ কাদের গোরু এসে আমাদের চাল টানছে! এমনিতে চালে খড় নেই, আমি তাড়াতে যেতে শিং নাড়ল।"

জহর বেরিয়ে দেখে শুধু গোরু নয়, সঙ্গে ফুটফুটে বাছুর, তার মানে একটি দুধেল গাই

বাছুর-সমেত তাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সে বেঁধে রাখল, যার গোরু সে এসে নিয়ে যাবে।

কিন্তু এমন দুধেল গোরুকেও কেউ নিতে এল না। একমাস-দু'মাস চারমাস কেটে গেল। জহরের মায়ের কুড়িয়ে পাওয়া নাতি এই গাভীর দুধ খেয়ে বড় হতে লাগল।

।। দুই ।।

জহরের একটা ধুতি, একটা গামছা, এই হলেই চলে যায়, তার মায়ের তো দশ জায়গায় তালি দেওয়া ছেঁড়া কাপড়। কিন্তু এই প্রখর শীতে বাচ্চার গায়ে কিচ্ছু নেই, ওকে বাঁচাব কী করে! জহরের মা নাতি কোলে কাঁদতে বসে যান। ভগবানকে ডেকে বলেন, "ভগবান, আমরা মা-ছেলে তোমার চরণে কী অপরাধ করেছি যে এই একফোঁটা বাচ্চার অঙ্গে একটা সুতোও জড়াতে পারছি না!"

জহর বলে, "মা, সে তো তোমারও কাপড় নেই!"

"তুই থাম তো, আমার কষ্ট সহ্য করা অভ্যেস আছে, কিন্তু এইটুকু বাচ্চার একবার ঠাণ্ডা লেগে গেলে কী হবে বল তো, আমাদের পয়সাকড়ি নেই যে ডাক্তার দেখাব।"

পরের দিনই এক কাপড় বিক্রেতা এল। জহর, জহরের মা কিছুতেই ধার-বাকিতে জামা-কাপড় রাখবে না, তারা কবে শোধ করতে পারবে তার ঠিক নেই! তবু সে একপ্রকার জোর করেই বাচ্চার জন্য দুটো গরম জামা, মায়ের জন্য থান ধুতি, চাদর, জহরের জন্য কাপড়-জামা, এমনকী শাল পর্যন্ত গছিয়ে দিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বিক্রেতা বলে গেল, "মাসিমা, এই শাল গায়ে দিয়ে নাতিকে কোলে নিয়ে বসবেন, নাতিরও একটু শীত করবে না, আপনারও একটু শীত করবে না!"

জহরের মা বললেন, "কিন্তু বাবা, আমার ছেলের রোজগার কম, আমরা খুবই গরিব, কবে যে তোমার ঋণ শোধ করতে পারব...!"

"ও নিয়ে ভাববেন না মাসিমা, যখন পারবেন দেবেন, আমি হাটের কারবারি, হাটে-হাটে ঘুরি, দু-চার টাকা করে জমিয়ে রাখুন, একদিন এসে নিয়ে যাব!"

এরপর দেখা গেল, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে তারা যখন যা চাইল, বাড়িতে তাই এসে গেল। জহরের মা ছেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বাবা, এ ছেলে সামান্য ছেলে নয়, আমাদের বাড়িতে সত্যি-সত্যি দেবশিশুর আবির্ভাব ঘটেছে! ওকে কোলে নিয়ে আমাদের কষ্টের কথা যখনই যা বলছি, তখনই...!"

জহরও জানে, সেও দু-চারটে জিনিস চেয়ে পেয়েছে, যেমন একদিন তার খুব গুড়-বাতাসা খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, সে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বলল, "বাবা, এখন আমার খুব গুড় বাতাসা খেতে ইচ্ছে করছে বাবা!" সঙ্গে-সঙ্গে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে কল্পপিসি, পিসির হাতে এক প্লেট গুড়-বাতাসা। পিসির বাড়িতে হরিপুজো ছিল, প্রসাদ দিয়ে গেলেন! আর একটা ঘটনা হল, ক'দিন ধরে ধুম জ্বর গেল জহরের, ইনফ্লুয়েঞ্জাই হবে, যেদিন জ্বর ছাড়ল, মা কপালে হাত দিয়ে বললেন, "আজ তোকে দুটি ভাত দেব, ভগবানের কৃপায় জ্বর

ছেড়েছে। দেখি তোর জন্য কোথাও একটু লাউডগা জোগাড় করতে পারি কি না!"

জহর ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে ছিল, আদর করে হাঁটু দোলাতে-দোলাতে বলল, "জানিস বাবা, একটু মাগুর মাছের ঝোল আর দুটো সাদা ভাত যদি পেতাম, আঃ, খেলে মুখটা ছেড়ে যেত!"

সে-সময়ই দুটো পাকা মাগুর যেন উড়ে এসে পড়ল তার মায়ের পায়ের কাছে, মা লাউডগা খুঁজতে বেরোচ্ছিলেন। বিষইপাড়ার নন্দাকাকি মাছ ধরে ফিরছিলেন, জহরের মাকে দেখে মাছদুটো ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "তোমার ছেলের অসুখ শুনলাম, পথ্য দিয়ো গো!"

আর ছেলেটি যে সাধারণ ছেলে নয়, দেবশিশু, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তালগাছে শকুনের বাসায় ছেলেটিকে পাওয়া। সমুদ্রের জলে পদ্মফুলের ওপর শুয়ে ভেসে-ভেসে যাচ্ছেন নারায়ণ, এ একেবারে সৃষ্টির আদিতে, তারপরই তো পৃথিবী সৃষ্টি হল। এও যেন সেইরকমই। জহর মনে-মনে ভাবে, আবার কোনও পৃথিবী সৃষ্টি হতে চলেছে কিনা কে জানে!

গোলমাল হল বাড়ি করার সময়, বাড়িটি জহরের মা চাইলেন, না চেয়ে উপায় ছিল না, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সারারাত ভিজছিলেন জহরের মা। পাতার ছাউনি, একটু অধিক বৃষ্টি হলে পাতা ফুঁড়ে চারদিকে জল পড়ে। জহরের মা কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, "হে ভগবান, একটা ছোট্ট টিনের চালার বাড়িও যদি থাকত, তা হলে এই দুধের শিশুকে নিয়ে এরকম ভিজতে হত না।"

পরের দিন বেলা ন'টার দিকে টিন-কাঠ বোঝাই এক টেম্পো এসে হাজির, সঙ্গে দু'জন মিস্ত্রি। জহরকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম জহরবাবু?"

জহর বলল, "হ্যাঁ!"

বড় মিস্ত্রি নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমাদের বড়বাবু পাঠিয়েছেন, আপনার বাড়ি উঠবে তাই!"

"বড়বাবু!" জহর বিস্মিত হল।

"বড়বাবুকে চিনলেন না, সর্বেশ্বরবাবু, স্কুলবাজারে ইট-কাঠ-লোহালক্কড়ের যাঁর অত বড় দোকান...!"

"ও!" চিনতে পারে জহর।

কাটারি কেনার জন্য দোকানে গিয়েছিল। সর্বেশ্বরবাবু বৃদ্ধ মানুষ, অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে তার গাছে-ওঠা পেশা নিয়ে। কিন্তু ওই সামান্য কথাবার্তায় এত টাকার জিনিস, আর জহর তো চায়ওনি, হয়তো অভাবের কথা বলেছিল কথায়-কথায়। না, এ অসম্ভব, ও নিশ্চয়ই দেবশিশুর কাণ্ড, তার মা নিশ্চয়ই তাকে কোলে নিয়ে টিনের বাড়ির কথা বলেছিলেন। সে চাইলে তো একেবারে দোতলা-তিনতলা বাড়িই চাইত।

কিন্তু এতেই গ্রামের লোকজন জড়ো হয়ে গেল ওদের বাড়ির সামনে। জহর খুশিতে

ডগমগ হয়ে মিস্ত্রিদের সঙ্গে কাজ করছিল, দৌড়ে গিয়ে টিন আনছে, কাঠ ধরে দিচ্ছে, হাতুড়ি ঠুকে পেরেক পুঁতছে। ছোটবেলা থেকে কোনওদিন 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, মুড়ি দেব মেপে' বলতে সাহস হয়নি, এবার বলবে, এবার যত বৃষ্টি হোক তাদের আর ভিজতে হবে না। গোরু রাখার জন্য ছোট্ট একটা গোয়ালও করে নিচ্ছে জহর।

গ্রামের লোকজনের মাঝখান থেকে সামন্তবাবু নির্দেশ দিলেন, "জহর, চালার ওপর থেকে নীচে নেমে আয়! মিস্ত্রি, তোমরা কাজ বন্ধ রাখো, আগে ফয়সালা হোক!"

জহর নেমে এসে প্রধানদের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ায়।

"এত টাকা কোথায় পেলি যে টিনের বাড়ি করছিস?"

"নিশ্চয়ই কোনও বড় গ্যাং-এর সঙ্গে ভিড়েছে!"

জহর কী উত্তর দেবে খুঁজে পায় না, হঠাৎ সে ঝপ করে বলে ফেলে, "সবই ভগবানের দয়া, তিনিই দিয়েছেন!"

গ্রামের প্রায় সবাই ভগবানে বিশ্বাস করে, এখন তাদের সবাই অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠল।

"এতদিন তোর ফল পেড়ে, পাতা কেটে কোনওরকমে সংসার চলত, বুড়োমাকেই দু'বেলা খেতে দিতে পারিসনি, তোকে এতদিন ভগবান দেখলেন না, আজ হঠাৎ...!"

"ওর ওই গোরুর ব্যাপারটাও আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, দূর গাঁয়ের কারও গোরু পথ ভুল করে চলে এসে ওর বাড়িতে থেকে গেছে। এখন তো দেখছি সব উলটো, সব চোরাই জিনিস!"

লালু চৌকিদারকে ডেকে এনে যখন জহরকে থানায় চালান দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তখন বড় মিস্ত্রি চালা থেকে নেমে এসে সকলকে থামিয়ে দেয়। " কী করছেন আপনারা, আমাদের বড়বাবু নিজে এসব পাঠিয়েছেন, এই দেখুন ক্যাশমেমো!"

কর অ্যাণ্ড সন্স। পনেরো বান্ডিল টিন, কাঠ, পেরেক সব লেখা।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জহর বুঝতে পারল যে, এখানে তারা আর থাকতে পারবে না, একটা ছাতা মাথায় দেওয়ার উপায় নেই, একজোড়া ভাল জুতো পরার উপায় নেই! গ্রামের লোকেদের তো আর বারবার সর্বেশ্বর করের নাম বলা যায় না। কিন্তু এতদিন ডিশের গ্লাসে চা খেয়েছে বলে চিরদিন খেয়ে যেতে হবে, আজ সে কাপ-প্লেট কিনবে, মা'র জন্য রুপোর চুড়ি কিনবে চারগাছি, মা'র হাতটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।

কিন্তু এত ইচ্ছে সত্ত্বেও জহর একটাও কিছু কিনতে পারছে না, আর কোনও জিনিস কিনলেও ব্যবহার করতে পারছে না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে, ব্যস্, গ্রামের লোক কি ছাড়বে! সামন্তবাবু কি ছাড়বেন! তাঁর তালগাছ থেকেই পাওয়া! আর পিসি আসছেন গাজনের সময়, এ ছেলে যে তার নয়, তিনি এলেই বলে দেবেন।

জহর আর একদিনও এখানে থাকতে চাইল না, মাকেও বোঝাল। তুলসীমঞ্চ থেকে গয়নাগুলো খুঁড়ে বের করে নিয়ে সেই রাতের অন্ধকারেই বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে

পড়ল। মাকে বলছে, "মা, তাড়াতাড়ি হাঁটো, তাড়াতাড়ি! সূর্য ওঠার আগে আমাদের অনেক দূরে চলে যেতে হবে!"

কিন্তু এত বয়স হয়েছে, তিনি পারবেন কেন ছেলের সঙ্গে ওভাবে দৌড়ে-দৌড়ে হাঁটতে! এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে পড়লেন মুখ থুবড়ে।

যাই হোক, ছেলেকে ধরে-ধরে বম্বে রোড পর্যন্ত কোনওরকমে এলেন। কিন্তু আর তো পা ওঠে না! হঠাৎ এ-সময়ই জহর বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে কেঁদে ওঠে, কাঁদতে-কাঁদতে বলে "ভগবান, এ-রাস্তায় তো কত ট্রাক চলে, একটা যদি পেয়ে যেতাম, তা হলে মাকে নিয়ে আমরা অনেক দূরে চলে যেতে পারতাম! মা হোঁচট খেয়ে পা থেঁতলে বসে আছে, আর দু'পা হাঁটারও ক্ষমতা নেই। এখন তো গাঁয়েও ফিরে যেতে পারব না, সকলে ছিঁড়ে খাবে! কী যে হবে?"

জহর যখন বাচ্চা কোলে কেঁদে-কেঁদে এইসব বলছে, তখনই একটা ঝকঝকে লরি এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। জহর দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভারকে বলল, "ড্রাইভারদা, আমাদের একটু নিয়ে যাবেন দাদা, মা হাঁটতে পারছে না, কোলে বাচ্চা?"

ড্রাইভার বলে, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, কোনও চিন্তা নেই, উঠে এসো!"

জহর জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কতদূর যাবে?"

"সে অনেক দূর! তোমরা যেখানে নামবে আমরা নামিয়ে দেব!"

জহর চারদিন লরিতে ছিল, তারপর একটা জায়গা পছন্দ হতে মা ও ছেলেকে নিয়ে সেখানে নেমে পড়ে।

।। তিন ।।

জহর ফাঁকা সুন্দর জঙ্গল দেখে তার পাশেই একটা সুন্দর বাড়ি করল। সে আর বাড়ি কববে কী করে, দেবশিশুকে কোলে নিয়ে বলল, "বাবা, আমাদের খুব সুন্দর একটি বাড়ি হোক!" ব্যস্, সুন্দর বাড়ি হয়ে গেল। বাড়ির পাশে শালুক ভর্তি পুকুর চাইল, ফুলে ভর্তি উঠোন, গোয়াল ভর্তি গোরু, গোলা ভর্তি ধান... জহর, জহরের মা ভীষণ খুশি। এখন তার জুতো-মোজা পরারও কোনও অসুবিধে নেই, মায়ের রুপোর চুড়ি পরারও কোনও অসুবিধে নেই। দেবশিশুব আদব-যত্নেরও কোনও ক্রটি বাখল না। এখানে বেশ শান্তিতেই দিন কাটাতে লাগল তারা।

কিন্তু এই শান্তি বেশিদিন থাকল না। অচিরেই তাদের বাড়িটি ডাকাতের বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। এখানে কোনওদিন কোনও বাড়িঘর ছিল না, রাতারাতি এইসব বাড়িঘর-গোয়াল-পুকুর দেখে কাঠুরেদের সন্দেহ হল, তারাই পুলিশে খবর দিল। পুলিশ এল জিপ নিয়ে।

পুলিশ অফিসার জহর ও জহরের মাকে ডেকে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু তাদের তো এক উত্তর, "সবই ভগবানের দয়া!"

মা বললেন, "আমার ছেলে একটা কপর্দকও চুরি করেনি বাবা, বিশ্বাস করো!"

পুলিশ অফিসার হেসে বললেন, "তা ভগবান বেছে-বেছে শুধু তোমাদেরই দিলেন, আমাদেরও কিছু দিতে বলো!"

জহর বলে, "আজ্ঞে, তিনি আপনাকেও দিয়েছেন, পুলিশসাহেব হয়েছেন, কত মাইনে, কত সম্মান!"

"চুপ করো, আর চালাকি করতে হবে না! চলো, থানায় চলো!"

থানায় নিয়ে গিয়ে জহরকে প্রচণ্ড মারধোর করা হল,যত সে ভগবানের নাম বলল তত তার ওপর জুলুম হল! কিন্তু কিছুতেই সে ঐ ছেলের কথা বলতে পারল না। অন্য কোনও কারণে নয়, ছেলের অলৌকিক ক্ষমতার কথা একবার জানলে সকলে মিলে টানা-হ্যাঁচড়া করে ওকে মেরে ফেলবে! প্রত্যেকের লোভ পূরণ করতে হবে, নইলে... পুলিশ অফিসারের ধূর্ত ভয়ঙ্কর চোখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে জহর। তাই মারের চোটে যখন সে অজ্ঞান হয়ে গেল, সে অবস্থাতেই বলে গেল, "সবই ভগবানের দয়া, আর আমাদের কেউ নেই, যা দিয়েছেন, তিনিই দিয়েছেন!"

জহর সেই রাতেই ঘরবাড়ি, বাগান-পুকুর সবকিছু ফেলে আবার রাতের অন্ধকারে মা ও দেবশিশুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কোথায় যাবে, যেখানেই যাবে সেখানেই তো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! দেবশিশু থাকলে লোভ বাড়বে, আর লোভবশত এটা-ওটা চাইতেই থাকবে! দেবশিশুকে না ছাড়লে...!

যেতে-যেতে মাকে বলল, "মা, এই দেবশিশুকে নিয়ে সংসারে বাস করা যাবে না মা!"

মা বললেন. "ও আর দেবশিশু নয় রে এখন থেকে ও আমার নাতি, শুধু আমার নাতি! বড় হয়ে ও-ও তোর মতো গাছে উঠে ফল পাড়বে, পাতা কাটবে... আমার এই ভাল!"

জহর হঠাৎ বলে, " না মা, আমি ওকে মানুষ করব, নিজের পায়ে দাঁড় করাব, ওকে যেন আমাদেব মতো কোনও দেবশিশুর স্বপ্ন দেখতে না হয়!"

যেতে-যেতে জহরের আর একবার মনে হল, মাকে জিজ্ঞেস করে, "মা, তুমি কি দেবশিশুকে বুকে নিয়ে তাকে বলে দিয়েছ 'আর আমাদের তোমার ওই দৈবীশক্তির দরকার নেই?' তার যে বড় সাধ ছিল, সে অনেক, অনেক লম্বা তালগাছে উঠবে, একেবারে চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে বসে-বসে আকাশ দেখবে, পৃথিবী দেখবে!

জহর ঠিক করল, 'গাঁয়ের পুরনো ভিটেয় ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে হাঁটু দোলাতে-দোলাতে আকাশ দেখার জন্য অতি দীর্ঘ লম্বা একটা তালগাছ চাইব।'

ডাইনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কে কবে নামকরণ করিয়াছিলেন সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু নামটি আজ পূর্ণগৌরবে বর্তমান ; ––ছাতি-ফাটার মাঠে জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাইলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মতো মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন কেমন উদাস হয়ে উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় ; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে! তখন যেন ছাতি ফাটার মাঠ নাম-গৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন-ধূমা-চ্ছন্নতার মতো ধূলায় একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে ; অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের সীমারেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সেরূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর? শূন্য-লোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম

ধূলরাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এতবড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতগুলি খৈরী ও খেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম? কোনো বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না ; কোথাও জল নাই, —গোটা কয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু তাহাতে জল থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম ; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে কোন অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রবিণী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চারমান পতঙ্গপক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা পাতার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের ঘাসের মধ্যে।

সেই নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি ফাটার মাঠ। তাহারই ভাগ্যদোষে ঐ বিষজর্জরতার উপরে আর এক ক্রুর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে, মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা, অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরণা জাতীয় জলটার উপরেই বামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী নিষ্ঠুর ক্রুর একটা বৃদ্ধ ডাকিনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে, তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে দেখিয়া তাহার প্রতিটি ভঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর ; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে ছাওয়া বারান্দা—সেই বারান্দায় স্তম্ভ হইয়া বসিয়া নিমেষহীত দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যেও সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি নিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটি বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে সেরখানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক বিক্রি করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ি ফিরিয়া আর একবার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই-চারিটি শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্ত দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে তিন-চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার মাঠের নির্জনরূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে। নির্জনতাই উহারা ভালবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়া উঠে। সর্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মতো

সকলকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া ওঠে। না হইলে সেও তো মানুষ।

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে। বহুকালের পুরানো একখানি আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মতো একটা ঝকমকে ধার। জরা কুঞ্চিত মুখ, শনের মতো সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানির চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রং, আর কি পালিশই না ছিল, আর তারপরে কাচখানা ছিল রোদচকচকে পুকুরের জলের মতো। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত। ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে ; কপালের নিচেই টিকোল নাক ; চোখ দুইটি ছোটই ছিল—চোখের তারা দুইটিও খয়েরা রঙেরই ছিল—লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত। কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিত, ছোট চোখ দুইটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকালেই মনে হইত, আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া চোখ দেখা যায়। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরু দিয়া চেরা, ছুরির মতো চোখে, বিড়ালীর মতো এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না ; তবে হইয়া যায়।

প্রথম দিনের কথা তার মনে পড়িয়া যায়। বুড়া শিবতলায় সম্মুখেও দুর্গাসায়াবের বাঁধাঘাটের ভাঙা রানার উপর সে দাঁড়াইয়া ছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জলস্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মতো দশ এগার বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুনবাড়ির হারু সরকার আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া শান বাঁধানো সিঁড়ির উপর আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর এখনও শুনিতে পায়—হারামজাদী ডাইনী তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এতবড় বাড়? খুন করে ফেলবো হারামজাদীকে।

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল—ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল, তবে সে কথা বললি না কেন হারামজাদী?

হ্যাঁ লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট বেদনায় ছটফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়—কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়। কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে সে হারু

সরকারের বাড়ি গিয়া আঝোরে কাঁদিয়াছিল, আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভাল করে দাও , ওকে ভাল করে দাও। কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি এই লইলাম! আশ্চর্যের কথা কিছুক্ষণ পরেই বার দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার পিসি একটা ঝাঁটা তুলিয়া নিল বলিয়াছিল ছাই দেব হারামজাদীর মুখে। মা-বাপ মরা অনাথ মেয়ে বলে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিনই আমি ওকে খেতে দি। আর ও কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়। আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে বারবার আমার সন্দেহ ছিল, কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিই নি। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি আর কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি দৃষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল। সেদিন রাত্রে সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ির দাওয়ায় শুইতে পারে নাই ; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়োশিবতলায়। অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর আমার দৃষ্টিকে ভাল করে দাও না হয় আমাকে কানা করে দাও।

গভীব একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্তির মতো নিস্পন্দ শ্রদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষীণ একটি চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কি আর সাধ্যই বা কি? বেশ মনে আছে গৃহস্থের বাড়িতে সে আর ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির-দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাইত না কোন মতে বহু কষ্টে বলিত দুটি ভিক্ষে পাই মা। হরিবোল! কে বে? তুই বুঝি? খবরদার ঘবে ঢুকবি নে।

খবরদার! না না ঘরে ঢুকব না মা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনেব মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত এখনও উঠে? কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ আহা—হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খানা বোধ হয়।

এই-এই হারামজাদী বেহায়া! উঁকি মারছে দেখ! সাপের মতো।

ছি ছি ছি! সত্যিই সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালায় সমস্ত আয়োজন তাহার নরুণ-চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে। মুখের ভিতর জিবের তলা হইতে ঝরণার মতো জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ-বিবর্ণ মাটিব মূর্তি যেন কোথায় একটা পাইয়া দুলিয়া উঠিল ; ফাট-ধরা শিথিল গ্রন্থি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খ অসমগতিতে বিহীন চঞ্চল হইয়া পড়িল ; অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবারে নড়িয়া-চড়িয়া বসিল—বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওযার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয় কেমন করিয়া এমন হয সে কথা সারা জীবন ধরিয়াও বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত

পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়।

কিন্তু সে তার কি করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে তার কি করিবে কি করিতে পারে। প্রহৃত হইয়া পশু যেমন করিয়া অকস্মাৎ আঁ আঁ গর্জন করিয়া উঠে ঠিক তেমনই ই-ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া শনের মতো চুলগুলোকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া হইয়া বসিল! ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি হানিয়া চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুণ চেরা চোখে চিলের মতো হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ-ভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মত কি একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে । একটা ফুৎকার যদি সে দেয় তবে মাঠের ধুলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে। ঐ ধোঁয়ার মধ্যে জমাট সাদার মতো ওটা কি, নড়িতেছে যেন! মানুষ হ্যাঁ মানুষই তো! মনের ভিতরটা তাঁহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া? হি-হি-হি করিয়া পাগলের মতো হাসিয়া একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতে মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না-না-না। ছাতি ফাটার মাঠে মানুষটা ধুলোর গরমে শ্বাসরোধ ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

না ওদিকে আর সে চাইবেই না। তাহার-চেয়ে বরং উঠনটায় আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙ্গিয়া পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো করা পাতাগুলো ফৎ-ফৎ করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া আনা ধূলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়ীকেই যেন জড়াইয়া ধরিতে ছিল, মুখ চোখে ধূলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্তিত পাতাগুলো যেন সর্বাঙ্গে প্রহার করিতেছিল। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জারীর মতো ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি কবিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটাগাছটা আস্ফলন করিয়া বলিয়া উঠিল— বেরো বেরো বেরো।

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্তটাকে আঘাত কবিতে চেষ্টা করিল। আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধূলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধূলা একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে। শুধু কি একটা। এখানে ওখানে ছোট বড় কত ঘুরণ পাক উঠিয়া পড়িয়াছে— মাঠটা যেন নাচিতেছে। একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে। একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মতো অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে নুব্জা দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাশুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল! কিছুক্ষণের মধ্যে সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাইতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও

তাহার ছিল না! ছোট শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে?

কে রইছ গো ঘরে? ওগো।

জলে পচা নরম মরা-ডালের মতো বৃদ্ধা বাঁকিয়া চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়া ছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া শুনতে কোনমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল; কে?

ধূলিধূসর দেহে শুষ্ক-পাণ্ডুর একটি যুবতী মেয়ে বুকের ভিতর কোন একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াই ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধহয় ছাতি ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে বলিল, একটুকুন জল।

মাটির ওপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। মেয়েটি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা-হা বারে আয়, আয়,। বোস।

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার একপাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল, একটুকুন জল দাও গো। মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুকরো পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুড়িয়া বলিল, আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্ষুসী মাঠে কি বলে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তু এসে পড়লাম, একেবারে মধ্যিখানে। জলের ঘটিও পাটালির টুকরোটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল— মেয়েটির পাশে একটি শিশু। গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল দে, দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে। মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল দিয়া সর্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে ছেলেটির দিকে তাকাইয়া রহিল। স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধহয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ— কচি লালডগার মত নরম সরম। দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, নরম গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে।

এঃ, ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। তবে কি— কিন্তু সে তাহার কি করিবে? কেন তাহার সামনে আসিল? ঐ কোমল নধর দেহ শিশু ময়দার মত ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল-বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া—। জীর্ণ জ্বর-জর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! এ ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসস্বাদ! যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম— ছেলেটাকে খেয়ে ফেললামরে। পালা পালা তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘট তুলিয়া ঢকঢক করিয়া জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এটা তবে রামনগর? তুমি সেই—? সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিনীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কি করবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়! ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন মুখে? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না, সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কি করিয়া, ছেলেমেয়েরা এমনিতেই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়া উঠে, আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধহয়, আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে! ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাতে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে তো অনেকটা ডাগর হইয়াছে, তাহারই বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি।

ঠিক এমনি ভাবেই, ঠিক আজিকার মতই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল, ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া নরম ময়দার তালের মত ঠাসিয়া, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত, এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল, বলি ওলো, আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে ভাবী সাবীর সঙ্গে মস্কারা জুড়েছিস। আমার বাছার যদি কিছু হয় তবে তোকে বুঝাব আমি হ্যাঁ।

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, বেরো। হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি।

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্বল শরীরে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল, বার বার সে মনে মনে বলিয়াছিল ছি ছি সে নাকি সে ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া কী সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি? ভগবানকে ডাইনী বলিয়া ছিল তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে, দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিও, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালবাসি।

কিন্তু অপরাহ্নে বেলা হইতেই না হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টি-ক্ষুধার কলঙ্ক

অতি নির্ভরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমনভাবে কাতরাইতেছে যে ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের শ্মশানে জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। বার বার মুখের থু থু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়ছিল কোথায় রক্ত। গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। সেই দিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাতে—সে দিন বোধ হয় চতুর্দ্দশীই ছিল, হাঁ চতুর্দ্দশীই তো—বাকুলের তারাদেবীতলা পূজার ঢাক বাজিতেছিল, জাগ্রত মা তারাদেবী ; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দ্দশীতে মায়ের পূজা হয়, কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কত বার সে মানত করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন দুঃখে হতশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র বুড়ির মত শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাঙ্গিয়া কোন নিরুদ্দেশ লোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারার অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল, সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ছাতিফাটার মাঠ ধূলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ ; ধূসর ধূলায় গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে, সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার ? ঐ সর্ব্বনাশী, মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে, কেন গেলাম গো—আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম গো। আমি কি করলাম গো।

লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু কামনা করিল একবার, জন কয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝরণাটার কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মত ফুসিয়া উঠল— সে তাহার কি করিবে? সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরল লাবণ্য কোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মত চিৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই চিৎকার শুনিয়া পালাইয়া গেল। কিন্তু এখনও সে ক্রুদ্ধা অজগরের মত ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদগার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চীৎকারে ঐ ছাতিফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছে হইতেছে বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। এঃ, সে একটা গোটা শিশুর রক্ত অদৃশ্য শোষণে পান করিয়াছে।

ডাইনী

ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল, শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাসের মত পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখী অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গেল। চোখ গেল। আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছন ঝরণার ধারে দুইটি লোক যেন মৃদু গুঞ্জনে কথা কহিতেছে। আবার সেই ছেলেগুলো তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা—ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না তাহারা নয়। এ বাউরীদের সেই স্বামী পরিত্যক্তা উচ্ছুল। মেয়েটা আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউরী ছেলেটা।

মেয়েটা বলিতেছে, না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব।

ছেলেটা বলিল, হেঁ। এখানে আসছে লোকে। দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

তো হোক। তোর বাবা যখন আমার সাথে সাঙা দেবে না তখন তোর এখানে কেন থাকব আমি?

ছি ছি ছি। কি লজ্জা গো। কোথায় যাইবে সে। যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে, তবে মরিতে এখানে কেন? তাহার এই বাড়িতে আসিল না কেন? তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কি? কি বলিতেছে মেয়েটা? বাবা মা বিয়ে না দেয় তোতে আমাতে ভিন গাঁয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। তোকে না লইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটার পছন্দর। ঐ কুপোর মত মেয়েটাকে উহার এত ভাল লাগিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ের ছবি। একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখ দুইটি ছোট, তারা দুইটি খয়রা রঙের। কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বই কি। আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতে ছিল। তখন আয়না তো ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোন দিন দেখে নাই। আরে তুই আবার কে রে? কোথা থেকে এলি? লম্বা চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছিল। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই চতুর্দ্দশীর রাত্রেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢঙটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে তোমার কি?

আমার কি? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস কিল? ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটির দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মত নিটোল শরীর। জীভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোন উত্তর না দিয়া তীব্র তির্যক ভঙ্গীতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদিকে চুনে হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মত নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল, বোলপুরের একেবারে শেষে রেল-লাইনের ধারে বড় পুকুরটার

বাঁধা ঘাটে বাসয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ঐ চাঁদের দিকে চাইয়াছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই। ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছে। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই চমকাইয়া উঠিয়াছিল। সেই লোকটা হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোপ খাইয়াছিল—হাসিলে তাহার গালে টোপ খাইত—সে বলিয়াছিল—কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে চলে এলি যে?

সে বলিয়াছিল, এই দেখ তুমি যাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাব।

চেঁচাবি? দেখছিস পুকুরের পাঁক, টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দেব ঐ পাঁকে।

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল, ধেৎ!

সে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল ধরা হাতের মুঠিতে খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল. লোকটার হি হি করিয়া সে কি হাসি। সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল, দূর হো রো ফ্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথকার। ভাগ্।

তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল, তুমি মারবা নাকি।

না না, মারব কেন? তোকে শুধলাম—কোথায় বাড়ি তোর তুই একেবারে খ্যাঁক করে উঠলি, তাতেই বলি—

বলিয়া আবার হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমার বাড়ী অনেক দূর, পাথরঘাটা।

কি নাম বটে তোর? কি জাত?

নাম বটে আমার 'সোরধনি', লোকে বলে 'সরা'।

আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল, আমরাও ডোম। তা ঘর থেকে পালিয়ে এলে কেন?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া ভাবিতে ছিল কি বলিবে?

রাগ করে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

না।

তবে?

আমার মা বাবা কেউ নাইকো কিনা? কে খেতে পরতে দেবে?

তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাতে। বিয়ে করিস না কেন—বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

তাহাকে—তাহার মত ডাইনীকে কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধ আজও অকারণে নতশীরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধূল কাঁকড় জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে—মালা গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সূচটা পড়িয়া গেল।

আঃ, কি মশা। মৌমাছির চাক ভাঙিলে যেমন মাছিগুলো মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই সর্বাঙ্গে, ছাঁকিয়া ধরিয়াছে? কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্তা তো আর শোনা যায় না। চলিয়া গিয়াছে? সন্তপর্ণে ঘরের দেওয়াল ধরিয়া বৃদ্ধ আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল, কাল আবার উহারা নিচ্ছয় আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মত আর নিরিবিলি জায়গা কোথায়। এ জায়গায় কেউ আসিতে সাহস করিবে না। তবে উহারা ঠিক আসিবে। ভালবাসার কি ভয় আছে।

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল। আচ্ছা ঐ ছোঁড়টাকে সে খাইবে। শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর।

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল —না, না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে আপন মনে দুলিতে আরম্ভ করিল তাহার পর উঠিয়া উঠোনে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে।

আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো ঘুমাইবার তাহার উপায় নাই ইচ্ছা হয় এই ছাতি ফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায় লোকে বলে সে গাছ চালাইতে জানে জানিলে কিন্তু ভাল হইত। গাছের উপর বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলো শোনা হইত না। উহারা ঠিক কাল আসিবে।

হি হি হি, ঠিক আসিয়াছে। ছোড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে । ঘনঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে। আসিবেরে সে আসিবে।

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যেবেলায় সে জোয়ানটি ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল, তাহার আগেই আসিয়া বসিয়াছিল। পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতে ছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

এসেছিস? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি। বৃদ্ধা চমকাইয়া উঠিল ঠিক একই কথা—সে তাহাকে এই কথাটিই বলিয়াছিল। ওঃ ঐ ছোড়াটাও ঠিক সেই কথাই বলিতেছে। মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিশ্চয়ই সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সে দিন একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল কাল তো মুড়ি পড়ে গিয়েছিল লে।

সে কিন্তু হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বুকে দুর্দান্ত লোভ—পাপে মত্ত তাহার ডাইনী মনটা বেদের বাঁশী শুনিয়া যেন কেবল দুলিয়া নাচিয়াছিল —ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তারপর সে কি করিয়াছিল? হ্যাঁ মনে আছে। সে কি আর ইহারা জানে, না পারে? ও মাগো! ঠিক তাই। এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজে হাতে কি তুলিয়া দিতেছে। বুড়ী দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল, সহসা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে বিয়ে করবি পরা?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতেও পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, হাত পা ঘামিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল এই দেখ আমি কলে কাজ করি— রোজগার করি অনেক। তা জাতে পণ্ডিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?

ঝরণার ধারে প্রণয়ী যুবতী বলিল, এই গাঁয়ে সবাই হাঁ হাঁ করবে—আমার জাতগুষ্টিতেও করবে, তোর জাতিগুষ্টিতেও করবে। তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই। সেই খানে দুজনায় সাঙা করে বেশ থাকবো।

মৃদুস্বরে কথাগুলি এই নির্জন স্থানটির মধ্যে যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহারা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল—মাড়োয়ারী বাবুর কলের ধারেই একখানা ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল, বয়লা না কি বলে—সেই প্রকাণ্ড পিপের মত কলটা—সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরী ছিল সকলের চেয়ে বেশী।

ঝরণার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উঃ হবে না। আগে আমার খুঁটে দশটি টাকা ত বেঁধে দে, তবে আমি যাব। নইলে বিদেশে পয়সা অভাবে খেতে পাব না। তা হবে না। ছি, ছি, মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়, এত বড় লোকটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার নাকি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনদিন। মরণ তোমার। রূপার চুড়ি কি, একদিন সোনার শাঁখাবাধা উঠিবে তোমার হাতে ছি।

ছেলেটি কথার জবাব দিল না, মেয়েটি আবার বলিল, কি রা কড়িশু না যি? কি বলছিস্ বল্? আমি আর দাঁড়াতে পারব না কিন্তু।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কি বলব বল? টাকা থাকলে আমি তোকে দিতাম, রূপার চুড়িও দিতাম, বলতে হত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল, তবে আমি চললাম।

যা।

আর যেন ডাকিস না।

বেশ।

অল্প একটু দূরে যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে মিশাইয়া গেল, ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরণার ধারে বসিয়া রহিল, আহা। ছেলেটার যেমন কপাল। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা যে কি করিবে— কে জানে। হয়তো বৈরাগী হইয়া চলিয়া যাইবে, নয়তো গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে, বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল, ইহার চেয়ে তাহার রূপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে তো তাহার এক কুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা, না না হয় পাঁচটা সে দিতে পারে। তাহাতে হইবে। মেয়েটা আর বোধহয় আপত্তি করবে না। আহা। জোয়ান বয়েস সুখের সময়, শখের সময়— আহা ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপার চুড়ি ও টাকা সে দিবে আর উহার সঙ্গে নাতি ঠাকুরমার সম্বন্ধ পাতাইব। গোটাকতক চোখা ঠাট্টা সে যা করিব।

মাটিতে হাতের ভর দিয়া কুঁজির মত সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই, হাসিয়া সে ডাকিল বলি, ওহে পাগল শুনছ?

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে বৃদ্ধার অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল ; ক্রুদ্ধা মার্জারীর মত ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল, মর মর—তুই মর। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল পরমুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় বিছানা নিল ঝরণার ধারে। মানুষের হেরস্ লোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনীর মত জানিতে পারিয়া নিশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতি তীক্ষ্ণ একখানা বাণ মন্ত্রপুত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। আনিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কি রক্তপাত। তাহার পরই প্রবল জ্বর আর কে কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে।

কিসে তাহার কি করিবে।

মধুপুরের হানাকুঠি

হিমানীশ গোস্বামী

এটি ঠিক গল্প নয়, একেবারে সত্যি কাহিনী, কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। এটা ঠিক, আমরা যারা একটু-আধটু গল্প লিখে থাকি, অনেক সময়েই বানিয়ে-বানিয়ে এমন সব কথা লিখি যার প্রায় সবটাই মিথ্যে। আজকের এই যে গল্পটি আমি শোনাব, তার প্রায় সবটাই সত্যি। এবারে সর্তক পাঠক প্রশ্ন করবেন, প্রথমেই আমি যে লিখেছি একেবারে সত্যি কাহিনী, সেটা তাহলে কেন বললাম। এর সহজ একটা কারণ হল, এই কাহিনী সম্পূর্ণ সত্যি হলেও (যতটুকু আমার মনে আছে) এই গল্পের চরিত্রের নাম এবং স্থান আর কাল বদলে দিয়েছি ইচ্ছে করেই। আগেই বলে রাখি গল্পটি ভূতের। অধিকাংশ ভূতই লেখাপড়ার ধার ধারে না, এমন অশিক্ষিত দুনিয়ায় আর নেই, তবে আজকাল নাকি নুতন এক ধরনের ভূত দেখা যাচ্ছে যারা কেবল শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিত।

অনেক মানুষ ওঝা আর তান্ত্রিকের সাহায্যে এইসব ভূতকে অভিভূত করে তাদের দিয়ে অনেক লেখাপড়ার কাজ করিয়ে নিচ্ছে। কোনও কোনও ভূত অন্যের হয়ে গল্প,

কবিতাও লিখে দেয় এও শুনেছি। তা ছাড়া এই ভূতেরা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলেও গিয়ে সামান্য দু-পাঁচ কেজি শুঁকটি মাছের জন্য ডক্টরাল থিসিস পর্যন্ত লিখে দিচ্ছি। সব শিক্ষিত ভূতই যে এইরকম হীন কাজ করে তা নয়। অনেক ভূত নীতি ন্যায় এসব মেনে চলে। এরা অমাবস্যা ছাড়া কোনও মানুষের ঘাড় মটকায় না। আরও নিয়ম-মানা ভূত আছে, যারা শুধু অমাবস্যা নয়, অমবস্যাটি শনিবারে পড়া চাই, নইলে তারা ঘাড় মটকাবে না কিছুতেই। তবে এরকম ভূতের সংখ্যা কম। যাই হোক, এতসব কথা বলে ফেললাম কেবল ঝোঁকের মাথায়। আসল কাহিনীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আজ আমি যে কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি, সেটি অনেককাল আগে ঘটেছিল, ঠিক কতকাল আগে সেটা বলব না, তবে এখন থেকে কুড়ি-ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন আমার খুব অসুখ হত। মাসে একবার অন্তত জ্বরে আক্রান্ত হতাম। ওষুধ-টষুধ খেয়ে কোনওমতে সেরে উঠতাম, কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়—ফের জ্বর আসত।

আমাদের পারিবারিক ডাক্তার পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি বললেন, এটা শহুরে অ্যালার্জি হতে পারে। কোনও গ্রামে গিয়ে মাস দু'য়েক থাকলে হয়তো এই বারে-বারে অসুখে পড়া বন্ধ হতে পারে। তিনি বললেন, "হরিহর, পারো তো গ্রামের কোথাও চলে যাও। কলকাতা থেকে সে জায়গাটা যত দূরে হবে ততই ভাল। কাছাকাছি একটা নদী থাকলে সেখানে সকালে-বিকেলে বেড়াবে। যা ইচ্ছে করবে খাবে, তবে খুব বেশি পরিমাণে কখনওই নয়। দুধ খাবে, আর প্রচুর দই খাবে। দিন-রাতে দু-তিন ঘণ্টার বেশি পড়বে না। একেবারেই লিখবে না। তবে চিঠি লিখতে পারো পোস্টকার্ডে, আর যদি গল্প লিখতেই হয় তাহলে দিনে এক পাতার বেশি কখনও নয়। কোনও ওষুধ খাবে না। আস্তে আস্তে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। অসুখের চেয়ে ওষুধই অনেক সময় মানুষের বেশি ক্ষতি করে।"

ডাক্তার তো বললেন কোনও দূরের গ্রামে গিয়ে থাকতে। কিন্তু যাই কোথায়। সঙ্গেই বা কে যাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাবার বন্ধু সুধাংশুকাকা বললেন, ওঁদের একটি বাড়ি আছে মধুপুরে, সেখানে বছরে দু-একবার বেড়াতে যান শীতকালটা বাদ দিয়ে, কেননা ওখানে শীতে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। "তা তুমি যদি যেতে চাও তো কোনও আপত্তি নেই। ওখানে রামহরি থাকে, খুব বিশ্বাসী লোক, বললে রুটি-তরকারি বানিয়ে দেবে। ডিম, মাছ এসবও সে রান্না করতে পারে। ওখানকার দুধ খুব ভাল, হাওয়াও খুব ভাল, স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য তো কত লোকই সেখানে যায়।"

আমি যাওয়ার আগে বুঝে নিলাম কীভাবে যেতে হয়। একদিন ভোরবেলায় মধুপুরে নিরাপদেই পৌঁছে গেলাম, আর হাস্‌নুহানা কুঠিটিও খুঁজতে খুব অসুবিধে হল না। বললাম, বটে হাস্‌নুহানা কুঠি, কিন্তু বাড়ির নামের প্রথম তিন অক্ষর কেউ বোধ হয় দুষ্টুমি করে ভেঙে দিয়েছে। এখন কেবল লেখা আছে হানা কুঠি। নামটা দেখেই মনটা শিউরে উঠল। হানাকুঠি নামটা মনে খুব যে একটা আমোদের সঞ্চার করে, তা নয়। তখনই মনে পড়ল সুধাংশুকাকা কী যেন বলতে গিয়েও বললেন না। যাইহোক অনেক ডাকাডাকির পর রামহরি

এসে গেটটা খুলে দিল। আমি একটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম সুধাংশুকাকার। সেটি না পড়েই সে আমাকে খুব খাতির করে একতলার একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিল। দেখলাম ঘরে রাশিকৃত ধুলো। টেবিলে, আলমারিতে, খাটে কোথায় নয়। রামহরি তাতে লজ্জিত হল একটু। আগে জানলে সব ঠিক করে রাখত, এ-কথাটা সে কতবার যে বলল তার ঠিক নেই। সে আমাকে বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে কোথা থেকে দুজন লোককে এনে ঘর পরিষ্কার করাতে লাগল। মেঝে ধুয়ে দিল পরিপাটি করে। জানলার কাচ ঝকঝকে তকতকে করে দিল আর বাথরুমটায় কয়েক বালতি জলও এনে দিল। এরই মধ্যে দেখলাম বড়-বড় সাইজের আটটা লুচি, সঙ্গে আলুভাজা আর পাটালিগুড়, এনে সামনে রাখল একজন ঘোমটা-পরা মহিলা। বুঝলাম, ও হল গিয়ে রামহরির স্ত্রী। অত বড় লুচি একসঙ্গে অত আমি জীবনে খাইনি। গোটাচারেক খাওয়ার পর থালা সরিয়ে রাখলাম। আধ গেলাস জল খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বুঝলাম চায়ের ব্যাপারে রামহরিদের রুচি আছে। চমৎকার চা।

ঘরে ঢুকে সত্যি মোহিত হয়ে গেলাম। বিছানাটাও চমৎকার। পায়ের কাছে ভাঁজকরা কম্বল। সাদা ধবধবে বিছানার চাদর। বেডকভারটা ভাঁজ করে রাখা পাশেই। রামহরি ঠিকই ভেবেছিল যে, আমি যখন সারারাত ধরে এসেছি তখন একটু গড়িয়ে নেব বিছানায়। দেখলাম ঘরের কোণে একটা বইয়ের বড় তাক, তাতে বাংলা-ইংরেজী কত বই!

আমিও কিছু বই এনেছিলাম, সেগুলি বের করে টেবিলে রাখলাম। সঙ্গে ছিল একটা পঞ্জিকাও। এটি আমার মায়ের কীর্তি। আমার মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন প্রতিদিন পঞ্জিকা দেখে সেইমত কাজ করতে। যেমন, যেদিন উত্তরে যাত্রা নিষেধ সেদিন যেন কোনমতেই উত্তরদিকে না যাই। যেদিন বেগুন খাওয়া নিষেধ, সেদিন যেন আমি একটুকরো বেগুনও না খাই। মা জানতেন, আমি বেগুনপোড়া আর ভাজা খুব ভালবাসি! তা সেই পঞ্জিকাটা তুলে টেবিলের ওপর রাখলাম। ওই পর্যন্তই! কে আর ওইসব আজেবাজে সংস্কারে আজকাল বিশ্বাস করে।

আমি ঘরের তাকের কাছে গিয়ে বইগুলো এক ঝলক মোটামুটি দেখে নিলাম। আমার পড়ার মতো অনেক বই আছে সেখানে। তা ছাড়া আছে পুরনো দিনের বাঁধানো 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি'। একখণ্ড বাঁধানো শনিবারের চিঠি নিয়ে বিছানায় শুয়ে কয়েক পাতা ওলটাতেই ঘুম বেশ জোর চেপে এল। শনিবারের চিঠি পাশে রেখে দিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সেই বেলা একটায়। তাও ঘুম নিজে-নিজে ভাঙেনি। রামহরি ঘরে এসে আমাকে তাড়াতাড়ি উঠতে বলছিল চান করার জন্য, কারণ, সে জানাল দুপুরের খাদ্য প্রস্তুত। গরম জল দেওয়া ছিল বাথরুমে, চান করে নিলাম তাড়াতাড়ি। খাওয়াদাওয়া ভালই হল। আলু-কপির তরকারি, ছোলার ডাল আর সরু আতপ চালের ভাত, আর একটা কাচের বাটি-ভর্তি দই এবং প্লেট-ভর্তি কালাকাঁদ।

খেয়েদেয়ে ফের ঘুম। ফের রাতের খাওয়া আর সঙ্গে-সঙ্গে আবার ঘুম! রাত্রে অবশ্য ঘরে কী একটা আওয়াজ পেয়েছিলাম। খসখস করা আওয়াজ একটা, ঘুম ঠিক ভেঙে

যায়নি, তবে মনে হচ্ছিল ঘরে একটা কিছু যেন আছে। বড় ইঁদুর কিংবা হয়তো-বা চামচিকে কিংবা বেড়াল বা বাদুড়ও হতে পারে। একবার মনে হয়েছিল, উঠে পড়ি, কিন্তু ইচ্ছের সঙ্গে শরীরের যোগ ছিল না। শরীর এতই ক্লান্ত ছিল যে, ফের গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম। সকাল আটটার আগে ঘুম ভাঙল না। সকালের মিষ্টি রোদ্দুরটা বেশ লাগল। রাত্রের আওয়াজের কথা তখন মনেই পড়ল না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রামহরি খাবার দিয়ে গেল, বড়-বড় লুচির সঙ্গে আলু আর বেগুনভাজা। চা সহযোগে খেতে-খেতে মনে পড়ল মায়ের কথা। আজ পঞ্জিকাতে কী লেখা আছে কে জানে! বেগুন ভক্ষণ যদি নিষিদ্ধ থাকে, তা হলেই তো ঝামেলার ব্যাপার। ইচ্ছে করেই আর পঞ্জিকা দেখলাম না। ওইসব পঞ্জিকার কথামতো চলেই তো এ-দেশের এই হাল হয়েছে। খাওয়ার পর বেরোলাম ঠিক যাকে বলে যেদিকে দু'চোখ যায়। সবই তো আমার কাছে নতুন, সবই তো দেখার জিনিস। একটা ব্যাপার দেখে আমার ভাল লাগল, মাত্র একদিনেই আমার গায়ে যেন বেশ জোর বেড়ে গেছে। কলকাতায় আগে দু-তিন স্টপ যেতেই ট্রামে চড়ে বসতাম, এখন দু'কিলোমিটার গিয়েও মনে হল, আরও যাই আরও যাই।

রাস্তা বেশ ফাঁকা। লোকজন কমই মনে হল। শীতও খুব। রাস্তায় যেতে-যেতে দেখি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে আসছেন। আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাব ভাবছি, উনি বললেন, "এদিকে নতুন বুঝি?"

আমি তো অবাক। একজনকে দেখে কেমন করে বোঝা যায় সে নতুন লোক, আমি ভেবে পেলাম না। যাইহোক, বললাম, "হ্যাঁ কালই সকালে এসেছি।"

"কোথায় উঠেছেন?"

আমি বললাম, "হাস্‌নুহানা কুঠিতে।"

ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বললেন, "ও, ওই হানাকুঠিতে? রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল তো?'

আমি তো ভারী অবাক।

বললাম, "হ্যাঁ চমৎকার ঘুম হয়েছিল!"

ভদ্রলোক বললেন, "সুধাংশুর বাবা সীতাংশু আমার বন্ধু ছিলেন। বড় ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। সুধাংশু তোমার কেউ হয় নাকি?"

আমি বললাম, "সুধাংশুকাকা আমার বাবার বন্ধু। আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, তাই ডাক্তার আমাকে শহর ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে বলেছিলেন। চেনা কারও সন্ধানে বাড়ি ছিল না, তা সুধাংশুকাকার এখানে একটা বাড়ি আছে শুনে তাঁকে বলায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন থাকতে দিতে। বললেন, শীতকালটায় ওদিকে বড় শীত বলে এদিকে বেশি লোক আসে না।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম জ্যোতিপ্রসাদ কর। আমি এককালে ডাক্তার ছিলাম চন্দননগরে। এখন আর ডাক্তারি করি না। এখানেই থাকি। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে।

এই কাছেই, চলে এসো মাঝে-মাঝে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এখানে আসার আগে সুধাংশু তোমাকে কিছু বলেনি? মানে ওর ওই হানাকুঠি নিয়ে?"

আমি বললাম, "না তো। কী বলবেন আবার?"

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন, "বলা উচিত ছিল। সুধাংশু ভাল লোক, কিন্তু দায়িত্বেরও অভাব আছে। আরে বাবা, ওই বাড়িতে একটু ইয়ে আছে তো। সেটা সবাই জানে।"

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "ইয়ে আছে মানে?"

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন, "ইয়ে আছে মানে শুনতে হলে একটু সময় লাগবে। তুমি আমার বাড়িতে চলো, সব বলব।"

কাছেই বাড়ি, আমরা হাঁটতে হাঁটতে তিন মিনিটেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। জ্যোতিপ্রসাদবাবু বাড়িতে ঢুকতেই একটা বাঘা কুকুর আমাদের লেজ আর জিভ নেড়ে অভ্যর্থনা করল। ঘেউ-ঘেউ করে বলল, নমস্কার!

জ্যোতিপ্রসাদবাবু একটু চেঁচিয়ে বললেন, "রাধা আমাদের জন্য একপট চা আর কিছু বিস্কুট পাঠিয়ে দাও তো, কলকাতার বন্ধু এসেছে আমার। কী যেন তোমার নাম?"

আমি বললাম, "আমার নাম হরিহর গাঙ্গুলি।"

উনি চেঁচিয়ে বললেন, "এর নাম হরিহর গাঙ্গুলি, সুধাংশুর বন্ধুর ছেলে, শরীর সারাতে হানাকুঠিতে এসেছে!"

"ওমা, সে কী গো!" বলে একজন বয়স্কা মহিলা প্রায় ছুটেই এলেন। বয়স অনেক হলেও শরীর বেশ মজবুতই আছে। তিনি বললেন, "কী সর্বনাশ! এই বাড়িতে শরীর সারাতে কেউ আসে? ওখানে সুধাংশুর বাবা, আহা বড় ভাল লোক ছিলেন। কী হয়েছিল ওকে বলেছ? তোমার নাম যেন কী ভুলে গেলাম।" আমি আমার নাম বলাতে উনি বললেন, "নামটা মোটামুটি ঠিক আছে। নামটা ওদের বিতৃষ্ণা এনে দিতে পারে। তবে নামের সঙ্গে একটা রাম থাকলে ভাল হত। ওই জগতের ওরা রাম নামটাকে ভারী ভয় পায়। রাম নাম যার তাকে তারা এড়িয়েই চলে।"

আমার তখনই কেমন গা-ছমছম করতে লাগল। একটা চেয়ারে বসে রইলাম, আর কুকুরটা দূর থেকে আমাকে দেখতে লাগল। আবার ফস করে একবার ছুটে এসে আমার সারা গা শুঁকে চলে গেল। একজন পরিচারিকা চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। আমি বললাম, "দাদু, আমার ভয় করছে যে!"

জ্যোতিপ্রসাদবাবু হা হা করে হেসে বললেন, "ভয় একটু পাওয়া তোমার দরকার। সুধাংশুর বলা উচিত ছিল যে, ওই বাড়িতে ওর বাবার কী ভয়াবহভাবে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় সাত বছর আগে। সীতাংশু লোক ভাল ছিল। খুব সাত্ত্বিক ধরনের লোক। একেবারে ভেজিটারিয়ান ছিল। ডিম পর্যন্ত খেত না। তা সংক্ষেপে বলি, ওর কাছে তখন ছিল বেশ কিছু টাকা। সীতাংশুর এক ভাই এই অঞ্চলে একটা বাড়ি কিনবেন বলে হাজার পঞ্চাশ টাকা অ্যাডভান্স দেওয়ার জন্য টাকাটা সীতাংশুর কাছে রেখে গিয়েছিল। শেষে কী এক কারণে বাড়িটা আর কেনা হয়নি। তাই টাকাটা সীতাংশুর কাছেই ছিল। এরই মধ্যে খবর

পেয়ে একদল ডাকাত ওই বাড়িতে হানা দিয়ে সীতাংশুবাবুকে খুন করে টাকা নিয়ে পালায়। গত সাত বছর ধরে সীতাংশুর আত্মা ওই বাড়িতেই আছে।"

"কী সাঙ্ঘাতিক!" আমি বললাম, "আত্মা আছে? ওই হানাকুঠি, মানে হাস্না কুঠিতে? সুধাংশুকাকার বাবার আত্মা?"

"জ্বালাতন করেছে, গত সাত বছর ধরে।"

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন, "লোকটি খুব একটা বিপজ্জনক নয়, লোক মানে সীতাংশুর আত্মার কথা বলছি। প্রেতাত্মা হলেও সতাত্মা! এক হিসেবে মহাত্মাও বলা যায়।"

"তবে যে বললেন, তাঁর আত্মা লোকদের জ্বালাতন করেন?"

"ওটা কিছু না। কোনও লোক ওঁর ঘরে ঘুমোলে উনি খেপে যান। উনি করেন কী, আস্তে করে মশারি তুলে লোকটিকে ধরে নিয়ে হয়তো এক কিলোমিটার দূরে একটা বটগাছের ওপর শুইয়ে দেন। লোকেরা জেগে উঠে হাউমাউ করে ওঠে, আর সীতাংশুর আত্মা তখন ধেই-ধেই করে নাচতে থাকে। কোনও সময় হয়তো খাট থেকে তুলে নিয়ে একেবারে স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় আলতোভাবে শুইয়ে দেন। একবার একজন বেপরোয়া ইংরেজ সায়েবকে কোথায় রেখে এসেছিলেন জানো? সে ভারী আমোদের ব্যাপার, একেবারে সেই সায়েবের বাড়ি ইংল্যাণ্ডে!"

কথাটা শুনে আমার মোটেই আমোদের বলে মনে হল না। আমি বললাম, "এ তো খুব অন্যায় কথা। মানে আমি আসার আগে সুধাংশুকাকার এইসব কথা বলে দেওয়া উচিত ছিল!"

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন, "ওর কিছু একটা ভুল হয়েছে নিশ্চয়, কেননা ও যাদের-যাদের এখানে, মানে হানাকুঠিতে পাঠিয়েছে, প্রত্যেককে সে সব কথা খুলে তো বলেইছে এমনকী পইপই করে সাবধানও করে দিয়েছে। কিন্তু কথায় আছে না সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়? এমন সব লোক এই দুনিয়ায় আছে যারা ইচ্ছে করে এই সব বিপজ্জনক জায়গায় যায় বাহাদুরি নিতে। উদ্দেশ্য লোকে তাদের দেখে বলুক, বাবা কী সাহসী সব লোক, কী মনের জোর। এর আগে যারা এসে বিপদে পড়েছিল তাদের প্রত্যেককেই সুধাংশু যে সাবধান করে দিয়েছিল সেটা আমি জানি। কেবল তোমার বেলায় কেন সাবধান করল না সেটাই ভাবছি।" একটু থামলেন জ্যোতিপ্রসাদ। তারপর বললেন, "আরও একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি যে, সীতাংশুর আত্মা তোমাকে একটুও বিরক্ত করল না কেন? এটা তো ওর চরিত্রের সঙ্গে মেলে না।"

আমি বললাম, "রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমি কিছু আওয়াজ পেয়েছি। বইয়ের পাতা ওল্টানোর মতো একটা খসখসে আওয়াজ। আমি ভাবলাম বুঝি বাদুড় কি চামচিকে হবে। এখন ভাবছি সাপটাপও হতে পারে।"

"তা হতে পারে বটে।" জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, "এই অঞ্চলে তাঁদের সংখ্যা কম নয়, তবে শীতকালে তাঁরা বিশেষ নড়চড়া করেন না, ওঁরা নিদ্রিত থাকেন। সাপের ভয় এই সময় নেই। আর একটা কথা বলা দরকার, ওই বাড়িতে সীতাংশুর বা সুধাংশুর কোনও আত্মীয়কে

সীতাংশুর আত্মা কখনও বিরক্ত করেননি।"

আমি বললাম "আমি তো ওঁদের কারও আত্মীয় নই। আমাকে ছেড়ে দিল কেন বুঝছি না। তা ছাড়া রামহরিও তো আমাকে কিছু বলল না।"

জ্যোতিপ্রসাদ অবাক হলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "এ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!" কাপটা সরিয়ে রেখে বললেন, "রামহরি লোকটা তোমাকে বললে তো তার পয়সা রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যেত না। তোমাকে সাবধান করে দিলে তুমি কি আর ওই হানাকুঠিতে থাকতে? তা হলে তোমার খাওয়াদাওয়া কাপড় কাচা এসবের জন্য কিছু ছেড়ে দেবে? ভাল কথা, ওই হানাকুঠিতে একটাও হাসনুহানা গাছ দেখেছ?"

আমি বললাম, "না তো! বাড়ির সবটা অবশ্য ঘুরে দেখিনি, তবে হাস্‌নুহানার ঝোপঝাড় থাকলে নিশ্চয় চোখে পড়ত। রাত্রে গন্ধও পাইনি।"

"গন্ধও পাওনি? সেটাও নতুন কথা শোনালে। আগে ওই বাড়ি ভর্তি হাস্‌নুহানা গাছ ছিল। সন্ধেবেলা চমৎকার গন্ধ বেরোত। তা সীতাংশুর খুব প্রিয় ওই গাছগুলির কী হল জানো? সীতাংশু মারা যাওয়ার কয়েকদিন পর থেকে হাস্‌নুহানা গাছগুলিতে যেন মড়ক লাগল। এক মাসের মধ্যে গাছগুলো সব মরে গেল, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল। রামহরি ওই গাছগুলো কেটে একদিন আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল। তার জায়গায় কিছু মরসুমি ফুলের চাষ করল। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। রোজ সন্ধেয় হাস্‌নুহানার গন্ধ পাওয়া যেতে লাগল ওই বাড়িতে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গাছ নেই ফুল নেই। অথচ গন্ধ আছে।"

আমার বোধ হয় শরীর কাঁপছিল। আমি বললাম, "দাদু, আমার শরীর খুব খারাপ। কয়েক বছর ধরে ভুগছি। আমার ওজন ছিল প্রায় পঁচাত্তর কেজি, এখন দাঁড়িয়েছে ষাটে। মাসে কয়েকদিন বিনা কারণে জ্বর আসে। রক্তে কিছু জীবাণু পাওয়া যায় না। আমি ডাক্তারের পরামর্শে এখানে থাকতে এলাম শরীর সারাব বলে, কিন্তু এখানে থাকলে যদি ভয়েই মারা যাই, তা হলে কী হবে?" আমি প্রায় ভেঙে পড়লাম।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু আমাকে বললেন, "তোমার ও বাড়িতে না থাকাই ভাল বলে মনে করি। কাল রাতে কিছু হয়নি ঠিকই, হয়তো সীতাংশুর আত্মা অন্য কোথাও ছিল। যা হোক, খুব বাঁচা বেঁচে গেছ। অবশ্য সীতাংশু কাউকে মেরে ফেলেনি, তবে ওর স্বভাবে ইয়ার্কির ভাবটা আছে বটে। মরেও ইয়ার্কি ছাড়েনি। কেউ মরেনি ঠিকই, কিন্তু মরতেও তো পারত! না, তুমিও হানাকুঠি ছেড়ে দাও। যদি কিছু মনে না করো তুমি আমার বাড়িতেই থাকো। তুমি আমাকে দাদু বলে ডেকেছ, তুমি দাদুর বাড়িতে থাকবে। আমরা বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী থাকি। এখানেই আমার সারাটা জীবন কাটল। আর ডাক্তারি করি না। এখানে ভাল ডাক্তার অনেক আছেন। আমার অবশ্য একেবারে ডাক্তারি ছাড়ার উপায় নেই। পুরনো সব লোক আমাকে ডাকেন। সেসব ক্ষেত্রে আমিও যাই, তবে টাকা নিই না আর। তুমি এখানে থাকলে বোধ হয় ভালই হবে। তোমার শরীরের সমস্যাটা একটু বুঝতে পারব! কী, রাজি?"

আমি দেখলাম ভদ্রলোক ভারী সরল আর আন্তরিক মানুষ। মনে কোনও অভিসন্ধি নেই। আমি তো বেজায় খুশি হলাম, বলাই বাহুল্য। আমি একটু পরে একটা সাইকেল রিক্শা নিয়ে হানাকুঠিতে গিয়ে রামহরিকে বললাম, "আমার দাদু ডাক্তার জ্যোতিপ্রসাদের বাড়িতে যাচ্ছি। এখানে আর থাকব না।" রামহরি কোনও কথা বলল না। তবে মনে হল ও একটু দুঃখিতই হয়েছে।

আমি আমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিলাম। বেশি গোছানোর ছিল না অবশ্য। মিনিট দশেকের মধ্যেই গোছানো শেষ করার পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার আনা পঞ্জিকাটা টেবিলে নেই। আমি রামহরিকে বললাম, পঞ্জিকার কথা। রামহরি তার মাথা চুলকে কাঁচুমাচুভাবে বলল পঞ্জিকার কথা সে জানে না। আমি সকালে বেরিয়ে যাওয়ার পর সে ঘর গুছিয়েছে বটে তবে টেবিলে সে পঞ্জিকাটিকে দেখেনি মোটেই। ওর কথায় অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। রামহরি খামোখা তিন টাকা দামের পঞ্জিকা সরিয়ে ফেলবে সেটাও সম্ভব বলে মনে হল না। তবু আমি ঘরটা ভাল করে একবার দেখে নিলাম। না, কোথাও নেই।

দুপুরে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর ওখানেই খাদ্যগ্রহণ করা গেল। তারপর ওঁর আর ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথাটথা বলে ওঁদের বাড়ির সবচেয়ে ভাল ঘরে গিয়ে দেখলাম, চমৎকার সাজানো ঘর সেটি। কাচের বড়-বড় জানলা। জানলা দিয়ে বাড়ির পেছনের বাগান চোখে পড়ে। কতকরকমের যে ফুল ফুটে আছে, গাঁদা, হরেকরকমের গোলাপ। বেশ কয়েকটা ঘুঘু ডাকছে। বেশ নির্জন জায়গা। মাঝে-মাঝে একটু দূরের রাস্তা দিয়ে সাইকেল রিকশা চলার কেমন সরসর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা টেবিল থেকে নিয়ে এক পাতা পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সত্যি, শরীরটা আমার সত্যিই দুর্বল হয়ে গেছে। এত ক্লান্ত মনে হয়! দেখা যাক, এখানে দু'মাস থাকলে কী হয়। আবার সম্পূর্ণ অচেনা লোকের বাড়িতে এতদিন থাকাটাও কেমন যেন লাগছে। এঁরা আমার কাছ থেকে টাকা পয়সাও কিছু নেবেন না।

সেই বিকেলে ঘুম ভাঙল। বড় ঠাণ্ডা এদিকে। উঠে ঘর থেকে বেরোতেই জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, "হ্যালো ইয়ংম্যান, কেমন লাগছে এখন?"

আমি বললাম, "ভাল, বেশ ভাল।"

উনি বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বললেন, "কাগজ এক্ষুনি এল। কলকাতার কাগজ পেতে-পেতে সন্ধে হয়ে যায়।" বলে কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। এরপর চা আর বাড়িতে তৈরি কেক খেলাম। সঙ্গে কিছু কাজুবাদাম।

দেখলাম এঁরা রাত্রের খাবার সত্যি-সত্যি রাত্তির হওয়ার আগেই সেরে ফেলেন। সাড়ে আটটার মধ্যেই রাত্রের খাওয়া শেষ। জ্যোতিপ্রসাদ বললেন, "এ-বাড়িতে অনেক বই আছে, কাল সেগুলো থেকে বেছে নিয়ো তোমার যা পছন্দ। পড়তে পারো, তবে কী জানো, বেশি রাত জাগা ঠিক নয়। আর্লি টু বেড অ্যাণ্ড আর্লি টু রাইজ। আমি তো ভোর পাঁচটায় উঠি, তারপর একটু হাঁটতে বেরোই। কাল তোমাকেও ডেকে নেব, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভারী ভাল এই

হাঁটা। আর মনটাও ভাল থাকে।"

সর্বনাশ! উনি বলেন কি? সকাল পাঁচটায় ঘুম ভাঙাবেন আমার? কিন্তু আপত্তি আর করা গেল না। চুপ করেই রইলাম।

রাত্রে ঘুমটা ভালই হল। তবে অনেক স্বপ্নও দেখলাম। স্বপ্নগুলিও অদ্ভুত। খুব যেন একটা ঠাণ্ডা দেশে চলে গেছি। ঠাণ্ডায় কষ্ট হচ্ছে, এদিকে আমার খালি গা, জুতোও নেই। চারদিকে আবার হাস্নুহানার গন্ধ! এক্‌বার মনে হল, আমি একটা বিমানে উঠে কোথায় চলেছি। বিমানের এঞ্জিনটা খারাপ হয়ে গেছে। বিমানেও পাচ্ছি হাস্নুহানার গন্ধ।

সকালের রোদ্দুর এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। হাতে ঘড়ি ছিল, সেটা দেখলাম, সকাল কোথায় আটটা বেজে কুড়ি মিনিট! কই জ্যোতিপ্রসাদ তো ডাকলেন না? ভুলে গেলেন নাকি? চট করে উঠে পড়লাম। এ আবার কী? আমি কোথায়? জ্যোতিপ্রসাদ করের বাড়ি তো নয় এটা? এটা তো সেই বাড়ি হানাকুঠি। সেই ঘর! এই ঘর ছেড়েই তো কাল চলে গিয়েছিলাম, এখানে ফের কেমন করে এলাম? আমার মাথা ঘুরছিল। আর কিছু ভাবতে পারলাম না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হল তখন আবার অন্য দৃশ্য। একটা ছোট ঘর। নার্সিং হোমের কেবিন। আমি একটু নড়ে উঠতেই একজন নার্স এসে বললেন, "কেমন বোধ করছেন?"

আমি কোনওমতে উত্তর দিলাম, "ভাল। আমি কোথায়?"

নার্স বললেন, "এটা একটা নার্সিং হোম।"

জিজ্ঞেস করলাম, "জায়গাটার নাম কী?"

নার্স বললেন, "মধুপুর। আপনি তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। কাল রাতে জ্ঞান ফিরেছে। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, আপনি এখনও দুর্বল। এক কাপ গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাকুন।"

সুস্থ হয়ে উঠতে আরও দু' সপ্তাহ লেগেছিল। রোজই জ্যোতিপ্রসাদবাবু দু'বার এসে দেখে যেতেন। তৃতীয় সপ্তাহে ফের জ্যোতিপ্রসাদের বাড়িতেই নিয়ে গেলেন জোর করে তিনি বললেন, "কী কাণ্ড, উঃ, সমস্ত মধুপুরে বিরাট চাঞ্চল্য। সব তোমাকে নিয়ে। লোকজন হতভম্ব, পুলিশ হতভম্ব। হ্যাঁ, তোমার বাবা-মা এসেছিলেন, দু'দিন থেকে চলে গেছেন। এখানে ভুতো বলে একজন ওঝা আছে, সে এক মিডিয়ামের সাহায্যে সীতাংশুর সঙ্গে কথা বলেছে। সীতাংশু নাকি আমার ওপর ভারী চটে গেছে! সে বলেছে, আমি নাকি তার অতিথিকে নিয়ে এসেছি, সেটা আমার ভারী অন্যায় হয়েছে। সেজন্য সে সেদিন রাতের বেলায় আমার বাড়ি থেকে তোমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তবে এই নিয়ে এত হইচই হওয়ায় সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, সে বলছে সে আর কিছু করবে না। তুমি ইচ্ছে করলে ফের হানাকুঠিতে যেতে পারো। তাতে সে খুশিই হবে। আর হ্যাঁ, পঞ্জিকাটি সীতাংশু নিয়েছিল দেখবার জন্য। কবে কখন অমাবস্যা হয়, সেটা জানা খুব দরকার। ওতে নাকি ওর চেনা অনেক আত্মার ভারী সুবিধে হয়েছে।"

হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বলতে হবে, অবশ্য না বললেও চলত যে, আমি আর হানাকুঠিতে যাইনি। জ্যোতিপ্রসাদের বাড়ি থেকেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম।

আকস্মিক

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কথা হচ্ছিল আমাদের এক বন্ধু বিভূতিকে নিয়েই।

প্রায় দশ-বার দিন আমাদের আড্ডায় সে অনুপস্থিত। কোন খবর পর্যন্ত নেই। অথচ দলের মধ্যে সে-ই বেশী আড্ডাবাজ। রোজকার মত আমরা আমাদের ক্লাব-ঘরে এসে সেদিনও সন্ধ্যায় জমায়েত হয়েছি এবং কখন যে আকাশ ভেঙে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে টেরও পাইনি। খেয়াল হলো রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ। এবারে বাড়ি ফেরা দরকার, কিন্তু দরজা খুলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজাটা তখুনি বন্ধ করে দিতে হলো।

ঝম্ ঝম্ করে তখনও বৃষ্টি ঝরছে এবং বৃষ্টিছাটের ঘন কুয়াশায় চার-দিক একাকার। সমস্ত গলিটা জলে ডুবে গিয়েছে, ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত জল থৈ থৈ করছে। সঙ্গে কারো একটা ছাতা বা ওয়াটারপ্রুফ কিছুই নেই অথচ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে স্নান করে যেতে হবে।

তাই সকলে আবার জাঁকিয়ে বসলাম।

মহীন বললে, — বেরুনোই যখন যাবে না তখন ভূতের গল্প শোনা যাক। সরোজ, বল একটা জমাটি ভূতের গল্প।

আমাদের মধ্যে বন্ধু সরোজই সাহিত্যিক। শুধু সে সাহিত্যিকই নয়, চমৎকার গল্প বলবারও তার একটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু মহীনের প্রস্তাবে বাধা দিলে দিব্যেন্দু, বললে— না, শচীনের নতুন কোন ম্যাজিক দেখা যাক।

আমি প্রস্তাবে এবারে সায় দিলাম—হ্যাঁ, সেই ভাল। শচীন শুরু কর।

আমাদের দলের মধ্যে শচীন এ্যামেচার ম্যাজিসিয়ান না হলেও ম্যাজিকে সত্যিই তার বাহাদুরি ছিল। আশ্চর্য রকমের ম্যাজিক এক-এক সময় আমাদের দেখিয়ে সে কতদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে শচীন আপনমনে একটা সিগ্রেট টানছিল, আমার প্রস্তাবে সে বললে,—ম্যাজিক যে দেখাবো তা জিনিসপত্র কোথায়?

ঠাট্টা করে সরোজ বললে,—জিনিসপত্র না হলে ম্যাজিক দেখাতে পারবি না-তবে কিসের ছাই তোর ম্যাজিক!

—ঠিক আছে। শুধু হাতেই দেখাবো।

সকলে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

—ঘরের আলোটা নিবিয়ে দে—শচীন বললে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে একটা ক্যাণ্ডেল জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখ।

শচীনের কথামত তাই করা হলো। একটা মাত্র ক্যাণ্ডেলের আঁলো ঘরের মধ্যে অদ্ভুত আলোছায়া সৃষ্টি করেছে। আলোর শিখার একটা ছায়া সেই আধো-আলো, আধো-আঁধারে দেওয়ালের গায়ে কাঁপছে। বাইরে সমানে পড়ছে বৃষ্টি। শচীন তার পূর্বের আসনেই বসা। আমরা বার'জন ঘরের একদিকে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছি।

—কি রে, কই, শুরু কর তোর ম্যাজিক— সরোজ বললে।

—চুপ কর। কথা বলিস না।— ভারি গলায় বললে শচীন।

তারপর সবাই চুপচাপ। এক মিনিট, দু'মিনিট করে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

এমন সময় সরোজ আবার প্রশ্ন করলে, —কি রে শচে, ঘুমালি নাকি বাবা?

—চুপ— দরজাটা খুলে দে, কে এসেছে দেখ— শচীন বললে।

সত্যিই! জলের ছপ্ ছপ্ একটা শব্দ সকলেই আমরা শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এসে বন্ধ দরজার কাছেই থামলো।

তারপর দরজার গায়ে শব্দ উঠলো—টুক্ টুক্।

—কে?

আবার শব্দ টুক্ টুক্। আমিই উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে একবার বিদ্যুৎ চমকালো। সেই ক্ষণিক আলোর দীপ্তিতে দেখলাম কে যেন একজন ঠিক দোরগোড়াতেই

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত।

—কে?

কিন্তু আগন্তুক আমার প্রশ্নের কোন সাড়া দিল না, খানিকটা জমাট কুয়াশার মতই যেন পাশ কাটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমি দরজাটা যেমন বন্ধ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ায় ঘরের একটি মাত্র ক্যাণ্ডেলের আলোটি নির্বাপিত হলো। মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করলো। এবারে শচীন প্রশ্ন করলো,—তুমি কে?

—আমি বিভূতি। চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত স্বাভাবিক গলায় সাড়া এলো।

—বিভূতি? কে বিভূতি?

—বিভূতি চক্রবর্তী।

হাত বাড়িয়ে দরজাটার ঠিক কাছেই দেয়ালে আলোর সুইচ্‌টা টিপলাম। খট্‌ করে একটা শব্দ হলো মাত্র, কিন্তু ঘরের আলো জ্বললো না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হলো, কে যেন ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। নিজের অজ্ঞাতেই দু-পা পিছিয়ে একেবারে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালাম। ভয়ে তখন আমার গলা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠেছে। হঠাৎ এমন সময় মনে পড়লো বিভূতি, বিভূতি চক্রবর্তী আমাদের বন্ধু। তবে।—সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়টা কেটে গেল।

সোৎসাহে বললাম,—বিভূতি—তুই—

—হ্যাঁ। সেই পূর্বের.মত চাপা কণ্ঠস্বর। মনে হলো বড় যেন কষ্ট হচ্ছে তার কথা বলতে। আরো মনে পড়লো বিভূতি তো থাকে সেই ভবানীপুরে। প্রায় দশ-বার দিন আমাদের আড্ডায় আসে না। সে এই প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাতে সেই ভবানীপুর থেকে এসেছে!

একটু বিস্ময়ই লাগে। আমি এবারে প্রশ্ন করলাম,—এই ঝড়-জলের মধ্যে এত রাত্রে তুই—ব্যাপার কি বিভূতি?

বিভূতি আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শচীনকে সম্বোধন করে বললে,—শচীন, আমাকে তুই ডাকছিলি কেন?

প্রশ্ন করলো এবার সরোজ,—এই জলের মধ্যে তুই এলি কি করে রে বিভূ?

—জল!

—হ্যাঁ। বাইরে ত' ভীষণ বৃষ্টি!

— তা হবে।

—তা হবে কি রে— চারিদ্দিকে জল থৈ-থৈ করছে না? আগেই বুঝি বের হয়েছিলি?— বললে সরোজ।

—না ত'! শচীন ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ত এলাম।

—ভিজে গেছিস ত একেবারে!

—না!

বলে কি বিভূতি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

হঠাৎ আবার বিভূতি বললে,—আমি যাই ভাই!

—যাবি! কোথায় যাবি এই বৃষ্টির মধ্যে! মাথা খারাপ হলো নাকি তোর!

—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রে, আমি আর ঘরের মধ্যে থাকতে পারছি না। আমি চললাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা যেন খুলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলোটা দপ করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু কোথায় বিভূতি! আমরা ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি।

—বিভূতি! বিভূতি! আমি ছুটে দরজার বাইরে গেলাম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে। গলির মধ্যে জল অনেকটা কমে এসেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কাউকে দেখতে পেলাম না। কেবল জলের মধ্যে দিয়ে কারো হেঁটে যাবার ছপ্ ছপ্ শব্দ কানে ভেসে এলো।

পরের দিন দুটো সংবাদ আমরা জানতে পারলাম। একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল— গত রাত্রে প্রচণ্ড তিন ঘণ্টাব্যাপী বৃষ্টির মধ্যে শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ মিনিট কুড়ির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাত্রি ন'টা পঁয়তাল্লিশ থেকে দশটা পাঁচ পর্যন্ত।

আর একটা— গত রাত্রে দিনকয়েক ভোগবার পর টাইফয়েডে আমাদের বন্ধু বিভূতি চক্রবর্তী রাত সাড়ে ন'টায় মারা গিয়েছে।

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা আজও অস্পষ্ট হয়ে আছে। তবে স্বীকার করতে পারিনি তেমন ব্যাপারটার মধ্যে শচীনের কোন ম্যাজিকের কেরামতি আছে, যেমনি এও স্বীকার করে নিতে মন চায়নি যে, ব্যাপারটার মধ্যে কোন কিছু ভৌতিক ব্যাপার আছে। তবে যা ঘটেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।
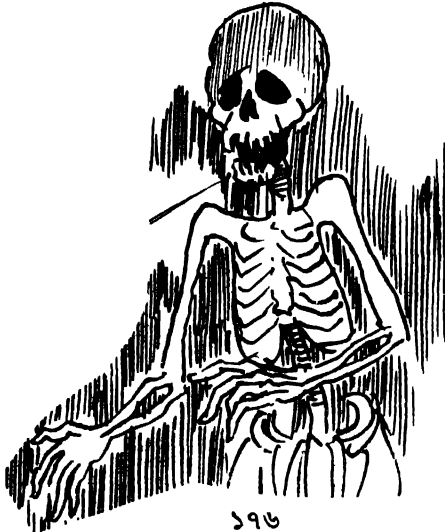
মন্টির মা

নরেন্দ্র দেব

মন্টির বয়স যখন চার পাঁচ বছর সেই সময় মন্টির মা মারা গেলেন। মাকে হারিয়ে মন্টি বড়ই কাতর হ'য়ে পড়ল। তাকে সবাই বোঝাতে লাগল, যে তার মা মামার বাড়ী বেড়াতে গেছে শীগ্‌গীরই ফিরে আসবে। মন্টি কিন্তু কারুর কথাই শোনে না, কেবলই মার জন্য কাঁদে ; কেবলই বলে, মার কাছে যাবো ; মা কোথা গেল ? আমার মাকে এনে দাও ?

মন্টির বাবা মন্টিকে নিয়ে বড়ই ব্রিবত হয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন তাঁর আর কোন কাজকর্ম নেই, কেবল ছেলেকে নিয়ে থাকতে হয়। রোজ বিকেলে তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হয়। কোন দিন বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন বা মিউজিয়াম ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। এমনি করে দিনগুলো একে একে কাটতে লাগল বটে, কিন্তু রাত্রি আর কাট্‌তে চায় না।

রাত্রে বাপের কোলের কাছটিতে ঘেঁসে শুয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে মন্টি যতক্ষণ না

ঘুমোবে ততক্ষণ কেবলই তার মায়ের কথা কয়। হ্যাঁ বাবা, মা কবে মামার বাড়ি থেকে আসবে? চলনা বাবা, তুমি আমি দু'জনে মামার বাড়ীতে গিয়ে মাকে নিয়ে আসি। মার জন্যে যে আমার বড় মন কেমন ক'রছে! এমনি ক'রে প্রতিদিন মন্টি যখন তার মার কথা তার বাবাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতো, মন্টির মার জন্যে মন্টির বাবারও প্রাণটা কেঁদে উঠতো। চুপি চুপি পাশ ফিরে কোঁচার কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলে মন্টির বাবা বলতেন, "তুমি এখন ঘুমোও, কাল তোমাতে আমাতে গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে আসবো।"

এমনি ক'রে আর ক'দিন চলে! মন্টি ক্রমেই মার জন্যে হেদিয়ে উঠ্‌তে লাগল, কিছু খেতে চায় না; কোথাও যেতে চায় না, খেলাধুলো করাও ছেড়ে দিলে। দিনরাত মুখ শুকিয়ে বেড়ায়। আর তেমন ক'রে হাসে না, দিন দিন সে রোগা হ'য়ে যেতে লাগল।

মন্টির অবস্থা দেখে তার বাবার বড় ভাবনা হ'লো—তাইতো ছেলেটার জন্যে কি করা যায়। শেষে তিনি একদিন চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে দিয়ে মন্টির এক মাসীমাকে নিয়ে এলেন। মন্টির মাসিমা এসে আদরযত্নে মন্টিকে অনেকটা ঠাণ্ডা ক'রে ফেললেন। মাসীমাকে পেয়ে মণ্টি আস্তে আস্তে তার মার কথা ভুলে যেতে লাগল, ক্রমে মাসীমাই মন্টির কাছে সর্বস্ব হয়ে উঠল।

সে সব স্নেহের দাবী দাওযা অত্যাচার সে তার মার উপর কর'তো, তার সেই সব আব্দার এখন মাসীমাকেই শুনতে হয়। মন্টির বাবা যখন দেখলেন যে, ছেলে তার মাসীকে পেয়ে মায়ের অভাব তো ভুলেছেই, এমন কি বাপকে শুদ্ধ আর চায় না, তখন তিনি আবার নিজের কাজকর্মে মন দিলেন। এমনি করে আরও তিন চার মাস কেটে গেল।

কিন্তু, মাসী তো তাঁর বাড়ী ছেড়ে চিরকাল মন্টিদের ওখানে থাকতে পারবেন না—তাকে এইবার চলে যেতে হবে। তিনি মন্টির বাবাকে ডেকে ব'ললেন, "দেখ, আমার ত আর থাকবার সময় নেই ; অনেকদিন হলো এসেছি, এইবাব আমায় ফিরতেই হবে, কিন্তু মন্টির সম্বন্ধে কি করা যায় বলো তো? ও তো আমায় একদণ্ডও ছাড়তে চায় না, তা আমি কি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো?" মন্টির বাবা ব'ললেন, " তা হ'লে আমি আর এ বাড়ীতে একদণ্ডও থাকতে পারবো না। মন্টি চলে গেলে আমি বাঁচবো না।"

মন্টির মাসী হেসে ব'ললেন, "তা হ'লে ছেলেকে একটি তার মনের মতন 'মা' এনে দাও, তা হ'লেই সে বেশ থাক্‌বে।"

মন্টির বাবা ব'ললেন, "সে এখন আমি কোথায় পাবো? তার চেয়ে মন্টির দিদিমাকে দেশ থেকে আনতে পাঠাই না কেন? তিনি তো একলাটি সেই পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পড়ে আছেন। তাঁকে নিয়ে আসি, এখানে থাকবেন আর তাঁর নাতীকে দেখবেন শুনবেন।"

মন্টির মাসী ঘাড় নেড়ে ব'ললেন, "তিনি আর এ বাড়ীতে ঢুকবেন না। যে বাড়ীতে তাঁর মেয়ে মারা গেছে, সে বাড়ী তিনি আর মাড়াবেন না, তা ছাড়া দেশের বাড়ীতে তাঁর আর কেউ নেই যে সন্ধ্যের সময় তুলসী তলায় এক্‌টা প্রদীপ জ্বেলে দেবে। তিনি সে ভিটে ছেড়ে আর কোথাও ন'ড়বেন না।"

মন্টির বাবা বললেন, "তবেই ত মুস্কিল! তা হ'লে এখন উপায় কি?"

মন্টির মাসী ব'ললেন, "একমাত্র এর সহজ উপায় হ'চ্ছে যে, তুমি আবার একটি বিয়ে ক'রে নতুন বউ নিয়ে এসো, সে এসে, মন্টির মা হবে!"

মন্টির বাবা বললেন, "তুমি আর কিছুদিন থাকো, আমি ভেবে দেখি।"

মন্টির বাবা যেদিন আবার একটি বিয়ে ক'রে নিয়ে এলেন, মন্টির মাসী তার কাছে মন্টিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বউ, এই তোমার ছেলে, একে মানুষ করবার ভার এখন তোমাকেই নিতে হবে।" মন্টিকে ব'ললেন, "মণ্টি এই তোমার নতুন মা খুব লক্ষ্মীছেলের মতন এঁর কাছে থাকবে। ইনি তোমায় খুব আদরযত্ন করবেন, খুব ভালোবাসবেন।"

মন্টি তার নতুন মার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। নতুন মা হেসে হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকলেন। মন্টির এই নতুন মা'টিকে বেশ পছন্দ হলো, সে ছুটে গিয়ে একবারে তার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আমার মা?" নতুন মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললেন, "হ্যাঁ!" মন্টির মাসী এদের দু'জনের এই সদ্ভাব দেখে বেশ খুশী হ'য়ে নিজের বাড়ী ফিরে গেলেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই, মন্টির নতুন মা মন্টিকে বড় অযত্ন ক'রতে আরম্ভ করলেন! মন্টি একটু কিছু দুষ্টুমি ক'রলেই তিনি মন্টিকে ধরে খুব মারধোর ক'রতেন। মন্টির বাবা কাজকর্ম থেকে ফিরে এলেই মন্টি তাঁর কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে দিত। মন্টির বাবা প্রথম প্রথম মন্টির দিকে হ'য়ে তার নতুন মাকে খুব ব'কতেন এবং মারধোর ক'রতে বারণ করতেন। এতে কিন্তু আরও উল্টো ফল হতো। মন্টির বাবা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই, মন্টির নতুন মা তাকে আরও বেশী ক'রে শাসন ক'রতেন। পেট ভরে তাকে খেতে দিতেন না, কথায় কথায় উঠতে বসতে দাঁত খিচুঁতেন। খুব মেরে ধরে ঘরের ভিতর সমস্ত দিন চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিতেন। মন্টি বেচারী কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়তো।

একদিন সে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখলে যে, তার পুরোনো মা যেন এসে তাকে বলছেন, "মন্টি, আয় আমার সঙ্গে তোর মামার বাড়ী গিয়ে থাকবি! এখানে আর থাকিস নি।" মন্টি ঘুম ভেঙে উঠে তাড়াতাড়ি 'মা মা' বলে ডেকে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে দে'খলে, ঘরের দোর বাইরে থেকে বন্ধ করা রয়েছে। সে তখন ভয়ানক চেঁচামেচি করতে লাগল, দরজায় লাথি মারতে লাগল! তার নতুন মা তার এই কাণ্ড দেখে ভয়ানক রেগে এসে দরজা খুলে তাকে টেনে বার করে মারতে মারতে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মন্টি বাড়ীর সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল দেখে তিনি সদর বন্ধ করে দিয়ে উপরে চলে গেলেন। মন্টি দোরের ধারে চৌকাঠের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, " ও মা! দোর খুলে দাও! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি দুষ্টুমি ক'রবো না।"

কিন্তু কেউ তাকে দরজা খুলে দিলে না। তখন ঠিক দুপুরবেলা, রাস্তায় লোকজন কেউ চলছিল না। বেচারী একলাটি সেইখানে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার ধারেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মন্টির যখন ঘুম ভেঙে গেল, সে জেগে উঠে দেখলে যে, তার সেই পুরোনো মায়ের

কোলে সে শুয়ে রয়েছে। আহলাদে গদগদ হয়ে সে তার মার গলা জড়িয়ে বললে, "মা তুমি এসেছো! এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি আমার লক্ষ্মী মা। নতুন মা বড় দুষ্টু। আমি তোমার কাছে থাকবো।"

মন্টির মা বললেন, "সেইজন্যেই তো তোমাকে আজ নিতে এসেছি। চল—তুমি আমার সঙ্গে চল।" মন্টি আনন্দে নাচতে নাচতে তার মার হাত ধরে এগিয়ে চলল।

মার সঙ্গে গিয়ে মন্টি ট্রামে উঠল। ট্রাম হ্যারিসন রোড দিয়ে বরাবর হাওড়ার দিকে চলল। হাওড়ার পোলের সামনে ট্রাম থেকে নেমে সে তার হাত ধ'রে হাওড়ার পোল পার হয়ে গেল। মন্টি এর আগে কখনো হাওড়ারপোল দেখেনি। পায়ের নীচে গঙ্গার অগাধ জল। তার উপর এই প্রকাণ্ড পোল ভাসছে। পোলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে মন্টির খুব আহলাদ হচ্ছিল, আবার ভয়ও হ'তে লাগল, যদি পা ফস্কে জলে পড়ে যায়, তা হলে নিশ্চয় ডুবে যাবে! সে মার খুব কাছে ঘেঁসে তাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে চলল। পোল পার হয়ে তারা হাওড়ার স্টেশনে এসে রেলগাড়ী চড়লে। রেলগাড়ী চ'ড়ে মন্টির কি ফূর্তি! রেলে চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেল! মন্টির মা মন্টিকে কত কি খাবার দাবার কিনে খাওয়ালেন। খেয়ে দেয়ে সে মার কোলটিতে মাথা রেখে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোররাত্রে যখন মন্টির ঘুম ভাঙল মা'য়ে পোয়ে তারা গরুর গাড়ী করে শুকপুর গ্রামের পথ দিয়ে চলেছে। মন্টি জিজ্ঞাসা করলে, "মা, এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?"তার মা ব'ললে, "তোমার মামার বাড়ীতে, এ জায়গাটার নাম শুকপুর। তোমাকে আমি তোমার দিদিমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" মন্টির একথা শুনে ভারি আনন্দ হ'ল। অনেকদিন সে দিদিমাকে দেখেনি। দিদিমা তাকে কত আদরযত্ন করবেন, কত ভালোবাসবেন। শুকপুরে সে নিশ্চয় সুখে থাকবে। সকালবেলা সূর্য ওঠবার আগেই তাদের গরুরগাড়ী একখানি সুন্দর পরিষ্কার কুটীরের সামনে এসে দাঁড়াল। মন্টির মা মন্টির হাত ধ'রে তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে তাকে বিদেয় ক'রে দিলেন। তারপর মন্টিকে সেই কুটীরের বন্ধদ্বারের কাছে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তোর দিদিমাকে ডাক, দরজা খুলে দেবেন। আমি ততক্ষণ ঐ পুকুর ঘাটে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে আসি।"

খোকার ডাকে তার দিদিমা এসে দরজা খুলে দিয়ে খোকাকে দেখে অবাক! "একি! মন্টি! তুই এমন সময় একলাটি এখানে কার সঙ্গে এলি?" মন্টি বললে, "কেন, আমি তো মার সঙ্গে এলুম!"

মন্টির কথা শুনে দিদিমা চমকে উঠলেন—সে কি? খোকা এ কি বলছে? তার মা যে আজ একবৎসর হতে চলল মারা গেছে। তবে ও কার সঙ্গে এলো? বোধ হয় ওর বাবা আবার বিয়ে ক'রেছে সেই বউয়ের সঙ্গে এসেছে। তিনি মন্টিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন, "ওঃ তাই বুঝি তোর নতুন মার সঙ্গে এসেছিস? কই সে মেয়ে কোথা গেল?" মন্টি সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে, "না গো না—নতুন মা নয় দিদিমা, আমার মা!

আমার নতুন মা বড় দুষ্টু, সে আমাকে আসতে দিতো না। আমার পুরোনো মা আমাকে নিয়ে এসেছে। মা আমাকে দরজা ঠেলে তোমাকে ডাকতে ব'লে ওই সামনের পুকুরে হাতমুখ ধুতে গেছেন।" মন্টির দিদিমা কথাটা শুনে আশ্চর্য হ'য়ে বললেন, "কই কোন্ পুকুরে গেল চল তো দেখি।" মন্টি মহা উৎসাহে তার দিদিমাকে নিয়ে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না। তখন তার দিদিমা মনে করলেন, ছেলেমানুষ! মাকে হয় তো ঠিক চিনতে পারে নি, গ্রামের অন্য কোনও বউ-ঝিয়ের সঙ্গে এসেছে হয় তো! তাই বলছে, তার সঙ্গে এসেছি। তিনি বললেন, "আচ্ছা চল্ ঘরে চল্, সে এখুনি আসবে বোধ হয়।"

দিদিমার শোবার ঘরে ঢুকে মন্টি দেখলে দেওয়ালে তার মার একখানি বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝুলছে। মন্টি বললে, "ঐ যে আমার মার ছবি রয়েছে, ওই মাই তো আমায় নিয়ে এল?" মন্টির দিদিমা তার কথা শুনে অবাক! শেষে সমস্ত শুনে তিনি বললেন, "আহা! মেয়েটা মরেও ছেলের মায়া ভুলতে পারে নি! ছেলেটার সেখানে বড়ই কষ্ট হচ্ছে দেখে নিজে সঙ্গে করে এনে আমার কাছে দিয়ে গেল।"

এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে একটা খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। কেউ কেউ বললে, ওঠা আগাগোড়াই মিছে কথা। মন্টির মা আজ প্রায় পনেরো মাস হলো মারা গেছেন, তিনি ওকে নিয়ে আসবেন কি ক'রে? কিন্তু মন্টির দিদিমা ব্যাপারটা ঠিক অবিশ্বাস করতে না পেরে, মন্টির বাবাকে খবর দেওয়া উচিত ভেবে তাকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তার জবাব এলো যে সত্যিই সেদিন মন্টিকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে বাড়ীর দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় নি। তারপর আজ তিনদিন হ'ল তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনার চিঠি পেয়ে খোকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু মন্টির মার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সেটা কি ঠিক? দিদিমা লিখলেন তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়, সত্যিই মন্টির মার প্রেতাত্মা তোমাদের কাছে ছেলের কষ্ট দেখতে না পেরে নিজে আবার পূর্বরূপ ধারণ করে তাকে ওখান থেকে এখানে এনে দিয়ে গেছে!

মন্টির বাবা এ চিঠি পেয়ে মন্টির নতুন মাকে বললে, "এ সব বাজে কথা! মানুষ, মরে গেলে আর ফিরে আসে না। এ সব ঐ বুড়ির চালাকি!"

মড়া কাটার ভয়ে

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ডাক্তারী কলেজে পড়তে পড়তে কেন যে আমি হঠাৎ ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিলুম তার আসল কারণটা কেউই জানে না। কাউকেও আমি বলিনি। তখন বলবার আমার কোনো উপায় ছিল না, বললেও হয়তো কেউ বিশ্বাস করতেন না।

গুরুজনেরা জানেন মড়া কাটার ভয়ে ডাক্তারী পড়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। পাড়াপড়শীদের ধারণা হয়েছিলো—আমি অকমর্ণ্য, ফাঁকিবাজ, সেইটেই আসলে কারণ। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কোনো কারণই খুঁজে পেতেন না, কেন ডাক্তার হবার এমন একটা সুযোগ আমি অবহেলায় নষ্ট করলুম। আসলে মড়া কাটবার ভয়েই আমি ডাক্তারী পড়া ছেড়েছিলুম। কিন্তু আত্মীয়েরা যেমনভাবে ভেবেছিলেন তেমনভাবে নয়। ব্যাপারটা তাহলে গোড়ার থেকেই বলি।

ডাক্তারী কলেজের প্রথম বছরের শেষের দিকটাই আমাদের অস্থিবিদ্যার পাঠ শুরু হলো। এক বাক্স মরা মানুষের হাড় কিনে আমার খাটের পিছনে আলমারির মাথায় রেখে দিলুম। বাড়ির বুড়ি ঝি— যে ছেলেবেলা থেকে আমাদের সকলকে মানুষ করেছে, সে রোজ রাত্রে

আমার ঘরের দরজার কাছে মাদুর পেতে শুতো। যেদিন থেকে জানতে পারলো ঘরে আলমারির মাথায় মরা মানুষের হাড় রয়েছে, সেদিন থেকে আমার ঘরের মেঝেতে শোওয়া ছেড়ে দিলো সে।

আমি বললুম—কি হলো রে বুড়ি?

বুড়ি বললে—না বাপু, রাত্রে ভয় করে।

—কই, আগে তো করতো না। আমি বললুম—কিসের ভয়?

—তা জানিনে, বাপু। ঐ বাক্সের মধ্যে খড় খড় শব্দ করে, শুনতে পাও না?

আমি বললুম—ইঁদুর-টিঁদুর হবে হয়তো। তাতে আর ভয় কি?

বুড়ি ফোঁস করে বললো—এ ঘরে আবার ইঁদুর আসবে কোথা থেকে? বেড়াল ঘুরে বেড়ায় দেখতে পাও না? বেড়ালকে কি মাছ ভাত খাওয়াই না?

আমি বললুম—বুড়ি, তোমার কোনো ভয় নেই। এই তো আমি ঘুমোই, আমার তো কিছু হয় না।

বুড়ি বললো—তোমাদের বুকের পাটা আলাদা, বাপু! তোমরা বড়ো বড়ো ডাক্তার হবে, তোমাদের কথা আলাদা। আমি আর ও-ঘরে শুতে পারবো না।

সেই থেকে বুড়ি অন্য ঘরে শুতো।

অস্থিবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে মিলিয়ে আমাকে হাড়গুলোর চর্চা করতে হতো। বুড়ি যখন উঁকি মেরে দেখে যেতো, একখানা মড়ার হাড় পরম যত্নে কোলে রেখে আমি তার উপর পেন্সিলের দাগ মারছি, তখন সে আমাকে নব্য ডাক্তার না ভেবে কাপালিক টাপালিক কিছু একটা ভাবতো নিশ্চয়।

যাই হোক এমনি অস্থিচর্চা করতে করতে শেষে আমাদের শবদেহের চর্চার সময় উপস্থিত হলো। ক্লাসের ছেলেদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে প্রত্যেক দু'জন ছাত্রের জন্য একটি করে মৃতদেহ দেওয়া হলো। ছেলেরা শানানো ছুরি আর সন্না হাতে বসে গেলো তাদের চিরে দেখতে।

কেন জানি না সে বছর যথেষ্ট শব পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই আমি আর আমার বন্ধু অজিত প্রথমটা কোনো মড়াই পাইনি। একটার পর একটা মড়া এসে শব-ব্যবস্থা গৃহের এক কোণ অবধি জমা হয়ে উঠতে লাগলো—অজিত আর আমি তখনো কিন্তু খালি হাতে বসে।

অজিত ছেলেটিকে আমি ডাক্তারী কলেজে ভর্তি হবার আগে চিনতুম না। কিন্তু এখানে ভর্তি হয়ে অবধি তার সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব হয়েছে। বলতে কি, ডাক্তারী কলেজে সে-ই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলো। অজিতের সঙ্গে আলাপ হবার কিছুদিন পরেই আমি একদিন তাদের বাড়ি গিয়েছিলুম। অজিতের দুই দিদি সুনীতি আর প্রকৃতি তখন তাঁদের আসন্ন এম. এ. পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত। অজিতের চেয়ে তাঁরা তিন-চার বছরের বড়ো। দুই বোনের বয়সের তফাত বছরখানেক হবে, কিন্তু দু'জনে বরাবর স্কুলে ও কলেজে একই ক্লাসে পড়ে এসেছেন, তাই এম.এ. পরীক্ষাও দিচ্ছেন একই সঙ্গে।

এরকম সুন্দরী মেয়ে আমার খুব কমই চোখে পড়েছে, হয়তো দেখিইনি কখনো। আমাদের বাড়িতে এবং আত্মীয়াদের মধ্যে যাঁরা বেশ নামকরা সুন্দরী, তারাও এই দুই বোনের তুলনায় কিছুই নন। বিশেষ করে অজিতের ছোটদি প্রকৃতির তুলনা মেলা ভার। আমি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, অচেনা বাড়িতে প্রথম দিন এসেই মেয়েদের মুখের দিকে যে বোকার মতো তাকাতে নেই সেটা মনে ছিলো না। মনে পড়তেই হঠাৎ এমন লজ্জা পেয়ে গেলুম যে আমার মাথা নীচু হয়ে গেলো, আর উঠতেই চায় না। শেষে অজিতের দিদিরা যখন গরম লুচি বেগুন ভাজা আর মিষ্টি নিয়ে আমাদের দু'জনকে খাওয়াতে এলেন এবং তাঁদের মিষ্টি স্বভাবের গুণে মুহূর্তে আমাকে আপন করে নিলেন তখন সত্যিই মনে হলো, সুনীতি আর প্রকৃতি এঁরা আমারই দুই দিদি কতোকাল যেন এঁদেরই সঙ্গে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি।

আমার নিজের চার দিদি—কিন্তু কারুর সঙ্গেই আমার ভাব নেই। দিদিরা কতো সময় কতো জিনিস আমায় দিয়েছেন, ভাইফোঁটার সময় কতো কী রেঁধে খাইয়েছেন—কিন্তু কোনোদিন আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করিনি। সেজদি আর ছোটদিকে তো ছেলেবেলায় কতো ঠেঙিয়েছি। বড়দি মেজদির বয়সটা একটু বেশী হওয়ার তাঁদের নাগাল পাইনি, নইলে বোধহয় তাঁদেরও পিট্টি দিতুম। এই নিয়ে কতো ঝগড়া, কতো কান্নাকাটি হয়েছে। মারামারি ঝগড়ার জন্য কোনোদিন আমার ক্ষোভ হয়নি। সেদিন কিন্তু সেই লুচি আর বেগুন ভাজার থালা গ্রহণ করে আমার মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো। সেদিন থেকে আমি অজিতদের বাড়ির এক ছেলে হয়ে গেলুম।

বাড়িতে এসে দিদিদের বললুম—আমার নতুন দিদিদের কথা। তারা তো হিংসেয় জ্বলে মরলো। সেজদি বললো—হ্যাঁ, রেখে দে তোর প্রকৃতিদি। ছোট পিসীমার চোখে সে সুন্দরী নাকি? ঐতো দেখেছি তোর অজিতকে। ওরই তো বোন, কতো আর হবে?

জানতুম দিদিদের মনে অসীম আগ্রহ জাগবে। অজিতের দিদিদের দেখবার জন্য সবাই ছটফটে করে উঠবে। আমিও তাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাঁদের গুণ বর্ণনা করলুম। শেষে ঠিক হলো সুনীতিদির আর প্রকৃতিদির পরীক্ষা হয়ে গেলেই একদিন তাঁদেরকে আর অজিতকে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হবে। আমি গিয়ে বলে এলুম। সুনীতিদি আর প্রকৃতিদি তখনই রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু ঐ রাজী হওয়া পর্যন্তই হলো ; আমাদের বাড়িতে আসা বা দিদিদের সঙ্গে আলাপ হওয়া, কিছুই হয়ে উঠলো না।

সুনীতিদিদের পরীক্ষা শেষ হবার আগে থেকেই জরুরী তাগিদ আসছিলো তাঁদের মীরাটবাসী মাসীর কাছ থেকে, যাতে পরীক্ষা দিয়েই তারা মীরাটে আসে। মাসী উত্তর ভারত প্রদক্ষিণ করবার জন্য দিনস্থির করে বসে আছেন, বোনঝিরা এলেই তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। সুতরাং সুনীতিদি প্রকৃতিদির পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো, সেইদিনই রাত্রের ট্রেনে দুই বোন চলে গেলেন মীরাটে। কথা দিয়ে গেলেন, ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে

যাবেন।

তারপর ঘটলো সেই ভয়ানক দুর্ঘটনা। উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে এক অন্ধকার রাতে নির্জন এক নদীর ধারে তাঁদের ছুটন্ত ট্রেন লাইন ফস্কে জলের উপর উল্টে পড়লো। ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে কতোজন যে মারা পড়লো তার সঠিক কোনো হিসেব পাওয়া গেলো না। প্রকৃতিদির আর মাসীমার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। শুধু সুনীতিদি দিন-পনেরো হাসপাতালে ভুগে মাথায় পট্টি বেঁধে কলকাতায় ফিরে এলেন! পট্টি যখন খোলা হলো তখন দেখা গেলো, তাঁর একটি চোখ আর তাছাড়া সুন্দরী বলে তাঁকে আর চেনা যায় না। কোনোদিন যাবেও না। সুনীতিদির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো— ওদের সঙ্গে আমিও তো চলে গেলে পারতুম।

এর পরে সুনীতিদির বা প্রকৃতিদির আমাদের বাড়িতে আসার আর প্রশ্নই উঠলো না।

অজিত ছেলেটি ছিলো খুব সংযত, খুব চাপা। তার মনের মধ্যেকার তোলপাড় সে চাপা দিয়ে কলেজে আবার যখন নতুন অস্থিবিদ্যার চর্চা হচ্ছে তাতেই মনোযোগ দিলো। কলেজের প্রায় কেউই তার পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা জানতে পারলো না। আমাকেও বলে দিলো, এ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা না করতে।

অজিতের সঙ্গে আমার ক'দিনেরই বা আলাপ, তারই মধ্যে এতোগুলো ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমার মনে হতো যেন কতো বছরের আলাপ অজিতের সঙ্গে। কেমন করে জানি না, এই সবের পরে অজিতের উপর আমার একটা মস্ত টান গিয়ে পড়লো। মনে হলো, অজিতের মতো এমন প্রিয় বন্ধু আমার আর নেই। অজিতের সঙ্গে তাই প্রাণভরে মিশতুম, লেখাপড়াও করতুম প্রায় একই সঙ্গে।

দু'জনে মিলে অস্থিবিদ্যার চর্চা করতুম এক জায়গায় বসে। অজিত আমার মুখস্থ ধরতো, আমি ধরতুম অজিতের। আমাদের লেখাপড়া বেশ ভালোই চলছিলো। কতোদিনে একটি শব পাবো যার ত্বক পেশী ও শিরা-উপশিরাগুলিকে আলাদা করে ছাড়িয়ে দেখবো। দেখবো আমাদের বই-পড়া বিদ্যে মুখস্থ বিদ্যের সঙ্গে মিলছে কিনা। এই নিয়ে অজিতের সঙ্গে প্রায়ই আমার আলোচনা হতো। আমরা মড়া না পেয়ে সত্যিই একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলুম। অন্য ছাত্রদের শবচ্ছেদ মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতুম বটে, কিন্তু তাতে মন উঠতো না।

সে-বছরের কোর্স অনুযায়ী আমাদের ব্যবচ্ছেদ করবার কথা একখানি করে হাত। অজিতকে আমি বলতুম— ওরে, পুরো মানুষ না পাওয়া যাক, একখানা ছেঁড়া হাতও জোটে না ভাগ্যে!

অজিত বলতো— অতো যদি তোর তড়িঘড়ি, কাট্ তবে আমারই একখানা হাত— কাট্!

এইভাবেই চলছিলো। একদিন দুই ক্লাসের ফাঁকে অজিতের সঙ্গে বসে গল্প করছি এমন সময় হঠাৎ একটি ছেলে এসে খবর দিয়ে গেলো, আমাদের জন্য একটা মড়া এসেছে। আমি লাফিয়ে উঠলুম। এতোদিন অপেক্ষা করার পরেও এ তো মড়া নয়, হাতে যেন

আকাশের চাঁদ পেলুম। আমরা দৌড়ে গিয়ে আমাদের মড়াটা দেখে এলুম। ভিজে কাপড়ে চাপা শুকনো এক মৃতদেহ ঘরের এক কোণে এক টেবিলে শোয়ানো রয়েছে। এখনো অক্ষত, ঘরের অন্যান্য শবের মতো ছিন্ন-ভিন্ন নয়। আমি বললুম— আজই লেগে যাবো। আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারি না, কি বলিস?

অজিত আমার মতো অতোটা উৎসাহ দেখালো না। সেদিন তার শরীরটা তেমন ভালো ছিলো না। আগে থেকেই বাড়ি যাবো-যাবো করছিলো। তাকে আমতা-আমতা করতে দেখে আমি বললুম-- অজিত, তুই বরং আজ বাড়ি যা, তোর শরীর খারাপ। ভালো করে ঘুম দে গে। আমি আজ ক্লাসের পর মড়াটাকে তৈরী করে রাখবো, একটু আধটু আঁচড়ও পারি তো দেবো। তারপর কাল থেকে দু'জনে শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে লাশটার ওপর।

সেদিন শেষ ক্লাসের পর অজিত বাড়ি চলে গেলো, আর আমি একটু হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে তৈরী হয়ে নিতে লাগলুম শব-ব্যবচ্ছেদের প্রথম অভিযানের জন্য।

বেশ পেট ভরে চা, বিস্কুট আর রুটি খেলুম, যেন কোনো উৎসবে যাচ্ছি। তারপর কাটা-কুটির যন্ত্রের বাক্সটা বগলদাবা করে চললুম মড়ার ঘরের দিকে।

বিকেল হয়ে গিয়েছিলো। সন্ধ্যার খুব দেরী নেই। অন্য ছাত্ররা দিনের বেলাতেই নিজেদের কাজ সেরে নিয়েছিলো। মড়ার ঘরে কেউই ছিলো না— ঘর খালি। শুধু দেখলুম আমাদের মড়ার টেবিলের কাছে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমটা মনে হলো, হাসপাতালের কোনো নার্স অথবা উঁচু ক্লাসের কোনো ছাত্রী-টাত্রী হবেন। কিন্তু যেরকমভাবে নীচু হয়ে তিনি একমনে আমার মড়াটাকে পরীক্ষা করছিলেন তাতে কেমন যেন একটু আশ্চর্য লাগলো। এমনভাবে মড়াটার মধ্যে দেখবার কি আছে? আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলুম। মহিলাটি আমায় দেখতে পাননি। যখন খুব কাছে এসেছি তখন হঠাৎ আমার উপস্থিতি অনুভব করে একটু চমকে উঠে সরে গেলেন। আমি দেখলুম, তাঁর মুখে যেন একটা অপরিসীম ক্লান্তি এবং দুঃখের ছায়া। এ-রকম একটা মুখ দেখবো বলে আশা করিনি— হঠাৎ তাই কিছু বলতে পারলুম না।

আমি কথা বলবার আগেই মহিলাটি মুখ খুললেন। বললেন— আপনারই লট-এ বুঝি এ শবটি পড়েছে?

আমি বললুম— হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

তিনি বললেন— আপনাকে একটি অনুরোধ করছি। এ মড়া আপনি কাটবেন না। কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে। এটা বেওয়ারিশ লাশ নয়। এ আমারই এক আত্মীয়ের দেহ। কি করে এখানে এলো বুঝতে পারছি না। আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে এ লাশ এখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করবো। তার আগে আপনাকে অনুরোধ, এর গায়ে হাত দেবেন না। এই বলেই মহিলা ব্যস্ত হয়ে দ্রুতপদে ঘর পার হয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, বোধহয় কর্তৃপক্ষেরই উদ্দেশে।

যন্ত্রের বাক্স হাতে স্তব্ধ হয়ে আমি খানিকক্ষণ বসে রইলুম। তারপর হতাশ মনে ঘর

থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে দেখি শীতের আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে, একটা ভিজে হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

প্রথমেই চললুম আমি অজিতকে খবর দিতে। হাতে লাশ পেয়ে এমনভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে, এরকম নিরাশ জীবনে আমি কখনো হইনি। অজিতের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বৃষ্টি এসে গেলো। দৌড়ে গিয়ে যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকলুম, তখন জামা-কাপড় ভিজে গেছে। অজিতের মা আমায় শুকনো কাপড় দিলেন এবং বললেন, অজিত এখনো বাড়ি ফেরেনি।

অজিত একটু পরেই ফিরলো, ভিজতে ভিজতে। তার এই অদূরদর্শিতার জন্য আমার কাছে বকুনি খেলো, অজিতের মা-ও বকলেন।

অজিত বললো— বাড়ি এলেই তো বন্দী। তাই আড্ডা-টাড্ডা মেরে ফিরলুম, এইবার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বো আর কি?

বিছানায় ঢলে পড়তেই অজিতের তেড়ে জ্বর এলো। আমি তাকে সংক্ষেপে সেদিনের ঘটনাটার উল্লেখ করে বললুম আবার কতোদিনে একটা বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া যায় দেখ।

অজিত বললো— দুঃখ করিসনে। জ্যান্ত মানুষ হাতছাড়া হয়ে যায়, এ তো একটা মড়া।

অজিতকে আর না বকিয়ে সেদিন আমি বাড়ি ফিরে গেলুম। মন বড়ো চঞ্চল হয়েছিলো, আমার ন্যায্য অধিকারে কে যেন হাত দিয়েছে, তাই যেমন বিরক্ত বোধ করছিলুম তেমনি আবার সেই মহিলাটির দুঃখ-ক্লান্ত মুখের কথা মনে করে মায়াও লাগছিলো। আহা বেচারার আত্মীয়ার দেহ— তার সদ্‌গতি না হলে তিনিই বা শান্তি পাবেন কোথা থেকে? আচ্ছা, কেমন করে তিনি দেহটার সন্ধান পেলেন? সেইটেই আশ্চর্য! নিশ্চয় অনেকদিন ধরে ওৎ পেতে ছিলেন— যেমনি টেবিলে লাশ আসা, অমনি এসে ছোঁ মেরে পড়েছেন। কিন্তু এই কেশহীন বর্ণহীন শুষ্ক কঠিন মৃতদেহ, একে শনাক্ত করলেন কি করে? বাহাদুরি আছে বলতে হবে!

নানা চিন্তায় রাত্রে ভালো ঘুম হলো না। সকালে একটু বেলা করে উঠে মুখে ভাত গুঁজে কলেজে গেলুম। প্রথমেই খোঁজ নিলুম আমার মড়া সরানো হয়েছে কিনা— কেউ সে লাশ দাবী করেছে কিনা।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম, শুনলুম কেউই লাশ দাবী করতে আসেনি। শুনলুম, এতোদিন পরে ও লাশ দাবী করবার কারুরই নাকি অধিকার নেই। দাবী করবার সময়ের সীমা বহুদিন হলো পেরিয়ে গেছে। মৃতদেহ এতো বিকৃত হয়ে গেছে যে, তাকে এখন শনাক্ত করা অসম্ভব। করলেও কর্তৃপক্ষ তা মানবেন না। শুনে আমার খারাপ লাগলো। মহিলার জন্য দুঃখ হলো। মড়াটা শুনলুম পাওয়া গিয়েছিলো বিহারের কোনো এক অঞ্চলে। পুলিশের কাছে বহুদিন পড়ে থাকার পর লাশটাকে বে-ওয়ারিশ বলে ঘোষণা করে স্থানীয় ডাক্তারী কলেজে দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে লাশের প্রয়োজন না থাকায় কলকাতায় চালান দেওয়া হয়েছে।

অন্য ছাত্ররা শব-ব্যবচ্ছেদ-গৃহে গেলো যে-যার মড়ার কাছে। পাশে মহিলা এসে পড়েন এই ভেবে আমি গেলুম না। কিন্তু সারাদিন মহিলার কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। আমি তখন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলুম যে, তিনি বোধহয় নিরাশ হয়ে তাঁর দাবী ত্যাগ করেছেন। ক্লাসের শেষে আরো একবার খোঁজ নিলুম তিনি এসেছিলেন কিনা। শুনলুম, আসেননি। মড়াটা কাটতে পারি কিনা জিগ্যেস করাতে উত্তর পেলুম, আলবাৎ পারি— ও দেহের সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের কলেজের শব-ব্যবচ্ছদাগারের, আর কারুর নয়।

এই শুনে আমার আবার মড়া কাটবার উৎসাহ ফিরে এলো। গোড়ায় ভেবেছিলুম, অজিতের জ্বর সেরে গেলে দু'জনে এক সঙ্গে কাজ আরম্ভ করবো কিন্তু হাত নিশ-পিশ করে উঠলো ; মনে হলো, অন্তত দু-একটা আঁচড় মেরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া যাক।

এই ভেবে মড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। সেদিনও ছাত্ররা যে-যার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছিলো। ঘর খালি। মড়ার ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ নাকে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলুম, কী আশ্চর্য, আজও সেই মহিলা আমার মড়ার কাছে একটা উঁচু টুলের উপর বসে রয়েছেন।

আমাকে ঘরে ঢুকতে তিনি দেখেছিলেন। মনে হলো, আমারই জন্য যেন অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই বললেন— দেখুন, এ দেহ আপনি কাটতে পারেন, কিন্তু অজিত যেন না ছোঁয়।

আমি অবাক হয়ে বললুম— আপনি অজিতকে চেনেন নাকি?

মহিলা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটু থেমে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন— এ দেহ অজিতের দিদির, প্রকৃতির।

সে কি!

কিসের যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলুম। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেলো— বসবার টুলটা শক্ত করে চেপে ধরলুম। দেখি, মহিলা দ্রুত পদে ঘর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। আমি চেঁচিয়ে বললুম— আপনি কে?

মহিলা এক মুহূর্তে থমকে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসলেন, তারপর দ্রুততর গতিতে দরজা পার হয়ে চলেগেলেন।

এইবার আমি চিনলুম। কোনোদিন চাক্ষুষ দেখিনি, কিন্তু অজিতের মাকে তো দেখেছি— সেই কপাল, সেই চোখ। অজিতের মীরাটের মাসী, যিনি ট্রেন-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন— তিনি ছাড়া আর কেউ নন।

একা আমি শব-ব্যবচ্ছেদ-গৃহের মধ্যে— আমার সামনে পড়ে আছে যার বিকৃত গলিত দেহ, এই কিছুদিন আগেও তাঁকে দেখে ভেবেছিলুম, তাঁর মতো সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। সেই শীতের সন্ধ্যায় কপালের ঘামটা মুছে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

কী করা যায় এখন। যা দেখলুম যা শুনলুম তা কি বিশ্বাস করবো, না ভুয়ো বলে উড়িয়ে দেবো? ভুয়োই হোক আর সত্যই হোক অজিতকে কিন্তু ও-মড়া ছুঁতে দেওয়া

হবে না। আমিও যে ছোঁবো না তাও একরকম প্রায় স্থির।

চললুম সোজা অজিতদের বাড়ি। অজিতের মা'র সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন— অজিতের জ্বরটা আজ বেড়েছে। ঘুমোচ্ছে বোধহয়। সুনীতি ঘরে আছে। যাও বাবা, তুমি দেখে এসো।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর। বারান্দা দিয়ে পা টিপে টিপে ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম। শীতের আকাশের কালো মেঘে বারান্দাটাও আবছা আঁধারে ঢাকা। সেখানে দাঁড়িয়ে একটু থমকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারলুম। অজিত ঘুমোচ্ছে। বুকের উপর একখানা হাত নিশ্বাসের সঙ্গে উঠছে আর নামছে। কিন্তু তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ও কে? সুনীতিদি তো নয়— ও যে প্রকৃতিদি। স্পষ্ট, হুবহু ঠিক আগের দিনের মতো, অজিতের সেই ছোটদি যে আমায় গরম লুচি আর বেগুন ভাজা খাইয়েছিলো।

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো। চোখ মুছতে মুছতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকলুম। যখন অজিতের মাথার কাছে এলুম তখন দেখলুম সুনীতিদিই দাঁড়িয়ে নীরবে তাকে বাতাস করে চলেছেন।

আমি ফিস্ ফিস্ করে বললুম— অজিত এখন ঘুমোচ্ছে, আমি যাই। কাল আবার আসবো।

সুনীতিদি কিছু বললেন না, শুধু একটু ঘাড় নাড়লেন।

কামিনী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনে ট্রেন থামিতেই হ্যাট-কোট পরা সুরনাথবাবু নামিয়া পড়িলেন। স্টেশন ছোট, তাহার সংলগ্ন জনপদটিও বিস্তীর্ণ নয় ; ট্রেন দু'মিনিট থামিয়া চলিয়া গেল।

সুরনাথ ঘোষ একজন পোস্টাল ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি এদিকটার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নূতন পোস্ট অফিস খুলিযাছে, সুরনাথবাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এদিকে কখনো আসেন নাই।

ছোট সুট্‌কেসটি হাতে লইয়া তিনি স্টেশন হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে অন্য কোন লটবহর নাই। সুট্‌কেসের মধ্যে আছে এক সেট্ প্যান্টুলুন ধুতি গামছা সাবান, দাঁত মাজিবার বুরুশ ইত্যাদি।

স্থানীয় পোস্ট অফিসটি স্টেশনের কাছেই। ডাক এবং তার দুই-ই আছে, কিন্তু সবই শহরের অনুপাতে ; একজন পোস্টমাস্টার, একটি কেরানী ও দু'জন পিওন। পোস্ট অফিসের পশ্চাদ্ভাগে পোস্টমাস্টার সপরিবারে বাস করেন।

কামিনী

বেলা আন্দাজ এগারটার সময় সুরনাথবাবু পোষ্ট অফিসে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, পোষ্টমাস্টার খাতির করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরে আহারাদির ব্যবস্থা পোষ্টমাস্টার বাবুর বাসাতেই হইল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সুরনাথবাবু ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার ধড়াচূড়া পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর লইয়াছেন, যে তিনটি পোষ্ট অফিস পরিদর্শনে তিনি যাইবেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে যেটি নিকটবর্তী সেটি বারো মাইল দূরে। কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। সুরনাথ 'তার' পিওনের সাইকেলটি ধার লইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার সময় উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছিবেন, কাল সকালে সেখানকার পোষ্টঅফিস তদারক করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিবেন, তারপর আবার অন্য পোষ্ট অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন।

সাইকেলের পশ্চাদ্ভাগে ছোট সুটকেসটি বাঁধিয়া সুরনাথ তাহাতে আরোহণের উদ্যোগ করিলে পোষ্টমাস্টার বলিলেন, 'এখান থেকে মাইল পাঁচ ছয় দূরে রাস্তা দু ফাঁক হয়ে গেছে। ডান হাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু আপনি ওই রাস্তা দিয়েই যাবেন।'

সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, বাঁ-হাতি রাস্তায় কি দোষ করেছে?'

পোষ্টমাস্টার বলিলেন, 'ও রাস্তাটা ভাল নয়।'

সাইকেলে আরোহণ করিয়া সুরনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি শহরের এলাকা পার,হইলেন। তারপর অবারিত মুক্ত দেশ।

দেশটা বর্ণসংকর। অবিমিশ্র পলিমাটি নয়, আবার নির্জন মরুকান্তারও নয়। স্থানে স্থানে ঘন বন আছে, কোথাও নিস্তরুপাদপ। শিলাভূমি, কোথাও নরম মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুক্ষ পাথরের ঢিবি মাথা তুলিয়াছে। এই বিচিত্র ভূমির উপর দিয়া নির্জন পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে।

আকাশে পৌষ মাসের স্নিগ্ধ সূর্য, বাতাসে আতপ্ত আরাম। সুরনাথ প্রফুল্ল মনে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। মাত্র বারো চৌদ্দ মাইল পথ সাইকেলে যাইতে কতই বা সময় লাগিবে।

সুরনাথের বয়স চল্লিশ বছর। মধ্যমাকৃতি দৃঢ় শরীর, মুখশ্রী মোটের উপর সুদর্শন। তিনি বিপত্নীক, বছর তিনেক আগে স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন, কিন্তু বিপত্নীকত্বের ফলে যে ক্ষণিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহা বিসর্জন দিতেও মন চাহিতেছে না।

তিনি যখন ছয় মাইল দূরস্থ পথের দ্বিভুজে পৌঁছাইলেন তখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে দুইটি পথ ক্রমশ পৃথক হইতে হইতে ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে; মাঝখানে উঁচু জমি তাহার উপর তাল খেজুরের গাছ মাথা তুলিয়া আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল, চারিদিকে অস্পষ্ট ছায়াছন্ন হইয়া গেল। সুরনাথ পথের সন্ধিস্থলে সাইকেল হইতে নামিলেন।

আশে পাশে নিকটে দূরে জনমানব নাই। আকাশ নির্মল, কেবল সূর্যের মুখের উপর

একটুকরা মেঘ লাগিয়া আছে, যেন সূর্য মুখোশ পরিয়াছে, সুরনাথ একটু চিন্তা করিলেন। এখনো ছয়-সাত মাইল পথ বাকি, আধঘন্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাইবে ; অন্ধকার হইবার পূর্বে যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে না পারেন, দিকভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

পোষ্টমাস্টার বলিয়াছেন বাঁ-হাতি রাস্তা ভাল নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। সুতরাং বাঁ হাতি রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভালো।

সুরনাথ সাইকেলে বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিলেন। পোষ্টমাস্টার মিথ্যে বলেন নাই, পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ, কিন্তু সাবধানে চলিলে আছাড় খাইবার ভয় নাই। সুরনাথ সাবধানে অথচ দ্রুত সাইকেল চালাইলেন।

সূর্যের মুখ হইতে মেঘ কিন্তু নড়িল না। মনে হইল মুখে মুখোশ আঁটিয়াই সূর্যদেব অস্ত যাইবেন।

মিনিট কুড়ি সাইকেল চালাইবার পর সুরনাথ সামনে একটি দৃশ্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। অস্পষ্ট আলোতে মনে হইল যেন রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কুটির দেখা যাইতেছে, দু'একটা আবছায়া মূর্তিও যেন ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আরো কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া সুরনাথ ব্রেক্ কষিলেন। একটি ছোট মাটির কুটির যেন মন্ত্রবলে রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশে পাশে অন্য কোন কুটির দেখা যায় না; এই কুটিরটি যেন গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

সুরনাথ রাস্তার ধারে যেখানে সাইকেল হইতে নামিলেন সেখান হইতে তিন গজ দূরে কুটিরের দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একটি যুবতী বসিয়া আছে। সুরনাথের চোখের সহিত তাহার চোখ চুম্বকের মত আবদ্ধ হইয়া চাষার মেয়ে! গায়ের রং মাজা পিতলের মত পীতাভ, দেহ যৌবনের প্রাচুর্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখের ডৌল দৃঢ়, তাহাতে প্রগলভতার সমাবেশ। মাথার অযত্নবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে একটু পিঙ্গলতার আভাস, চোখের তারা বড় বড়। পরিধানে কেবল একটি কস্তাপাড় শাড়ি, অলঙ্কার নাই। সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না। তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আগুন রাঙা চুল্লীর দিকে চাহিয়া আছি।

"হ্যাঁগো, তুমি কোথায় যাবে?" যুবতী প্রশ্ন করিল। দাঁতগুলি কুন্দশুভ্র, গলার স্বর গভীর ও ভরাট; কিন্তু বলিবার ভঙ্গী গ্রাম্য।

সুরনাথের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত একটা অন্ধ আবেগের স্বাদ তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি লঘুচেতা লোক নন, সবলে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন—, 'রতনপুর'।

যুবতী দাওয়ার কিনারায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়াও এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ুশিরায় আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। শেষে হাসি থামাইয়া সে বলিল, 'রতনপুর যে অনেক দূর, যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে,

পৌঁছতে পারবা না।'

সুরনাথ রাস্তার দিকে চাহিলেন। দূর হইতে যে গ্রামের আভাস পাইয়াছিলেন সন্ধ্যার ছায়ায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্বেগ স্বরে বলিলেন, 'তাহলে গ্রামে কি কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

'এখানেই থাকো না!'

সুরনাথ চকিত চক্ষে যুবতীর দিকে চাহিলেন। যুবতীর দৃষ্টিতে দুরন্ত আহ্বান, আরো কত রহস্যময় ইঙ্গিত। সুরনাথের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি শরীর শক্ত করিয়া নিজেকে সংবরণ করিলেন, একটু স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'বাড়ির পুরুষেরা কোথায়?

যুবতী দূরের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, 'তারা মাঠে গেছে, সারারাত ধান পাহারা দেবে। মাঠে ধান পেকেছে, পাহারা না দিলে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে।'

সুরনাথ কণ্ঠের মধ্যে একটা সংকোচন অনুভব করিলেন, বলিলেন, 'তা — যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই থাকব।'

যুবতী দর্শনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাসিল, প্রায়ান্ধকারে তাহার হাসিটা তড়িদ্দীপালির মত ঝলকিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমার গাড়ি দাওয়ায় তুলে রাখো। আমি আসছি।'

যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল, একটি মাদুর আনিয়া দাওয়ার একপাশে পাতিয়া দিল। এক ঘটি জল ও গামছা খুঁটির পাশে রাখিয়া বলিল, 'হাত মুখ ধোও। চা খাবে তো? আমি এখনই তৈরী করে আনছি।'

যুবতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরনাথ হাত মুখ ধুইয়া মাদুরে বসিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আলোর পীতবর্ণ ধারা দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল।

বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। চরাচর গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সুরনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মানসিক অবস্থার বর্ণনা অনাবশ্যক। ব্যাধ শরাহত মৃগ, বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মানসিক অবস্থা কে কবে বিবৃত করিয়াছে!

'এই নাও, চা এনেছি।' চা দিতে গিয়ে আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইল— 'আমি রান্না চড়াইতে চললুম।'

সুরনাথ ক্ষীণস্বরে আপত্তি তুলিলেন, 'আমার জন্যে আবার রান্না কেন? ঘরে মুড়ি মুড়কি যদি কিছু থাকে, তাই খেয়ে শুয়ে থাকব।'

'ওমা, মুড়ি মুড়কি খেয়ে কি শীতের রাত কাটে! রাত-উপোসী হাতী টলে। তোমার অত লজ্জায় কাজ নেই, এক ঘন্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।'

যুবতী চলিয়া গেল। সুরনাথ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। পিতলের বাটিতে গুড়ের চা, কিন্তু খুব গরম। তাহাই ছোট ছোট চুমুক দিয়া পান করিতে করিতে তাঁহার শরীর বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কুটিরের মধ্যে দুটি ঘর— একটি রান্না ঘর, অপরটি বোধ

হয় শয়ন কক্ষ। তিনি অনুমান করিলেন দাওয়ায় মাদুরের উপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইবে। সেই ভাল হইবে। কোম মতে রাত কাটাইয়া ভোর হইতে না হইতে তিনি চলিয়া যাইবেন।

ঘন্টাখানেক পরে যুবতী দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'ভাত বেড়েছি, খাবে এস।'

সুরনাথ উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরটি বেশ আতপ্ত। পিঁড়ের সামনে ভাতের থালা, প্রদীপটি কাছে রাখা হইয়াছে। আয়োজন সামান্যই, ভাত ডাল এবং একটা চচ্চড়ি জাতীয় তরকারী।

সুরনাথ আহারে বসিলেন। যুবতী অতি সাধারণ গৃহস্থালির কথা বলিতে বলিতে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরনাথ লক্ষ্য করিলেন, রান্না করিতে করিতে যুবতী কখন পায়ে আলতা পরিয়াছে!

যুবতী সুরনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতেছে, অথচ তিনি হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলিতেছেন না। বিপদের সময় যে ডাকিয়া ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, খাইতে দিয়াছে, তাহার সহিত অন্তত একটু মিষ্টালাপ করিবার প্রয়োজন আছে। তিনি শামুকের মত খোলার ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার নাম কি?'

এক ঝলক হাসিয়া যুবতী বলিল, 'কামিনী'।

নামটা তপ্ত লোহার মত সুরনাথের গায়ে ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। তিনি শামুকের মত আবার খোলার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহারান্তে সুরনাথ হাত মুখ ধুইলে কামিনী বলিল, 'পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি; শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরনাথের বুক ধ্বড়াস করিয়া উঠিল। তিনি তোতলা হইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি—আমি বাইরে মাদুরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা বাইরে শোবে কি! শীতে কালিয়ে যাবে যে! যাও বিছানায় শোও গিয়ে।'

সুরনাথ কথা কাটাকাটি করিলেন না, কামিনী রাত্রে কোথায় শুইবে প্রশ্ন করিলেন না, দণ্ডাজ্ঞাবাহী আসামীর মত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর খড় পাতিয়া তাহার উপর তোশক বিছাইয়া শয্যা। সুরনাথ সুটকেস আনিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলেন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া শয়ন করিলেন।

চোখ বুজিয়া তিনি পাশের ঘরে খুট-খাট ঠুন-ঠান বাসন-কোসনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার মনের উত্তাপ একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল।

চোখ বুজিয়া অনেক ক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন কামিনী নিঃশব্দে কখন তাঁহার

বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে; তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্র মধুর হাসি।

তিনদিন পর্যন্তও সুরনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন পোষ্টমাস্টারবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন! কেবল সুরনাথবাবুর জন্যে নয়, সেই সঙ্গে পোষ্টঅফিসের সম্পত্তি সাইকেলটিও গিয়াছে। পোষ্টমাস্টার পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ খোঁজ লইল। সুরনাথের যে তিনটি পোষ্ট অফিসে যাইবার কথা সেখানে তিনি যান নাই। পুলিশ তখন রীতিমত তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাতদিন পরে সুরনাথকে পাওয়া গেল। বাঁ হাতি রাস্তায় একটিও কুটির নাই, সেই রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সাইকেলটা অনতিদূরে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহার পশ্চাতে সুরনাথের সুট্‌কেশ রহিয়াছে, সুট্‌কেসের মধ্যে কাপড় চোপড় সাবান মাজন বুরুশ সমস্তই মজুত আছে! কিছু খোয়া যায় নাই।

সুরনাথের দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন নাঁই। কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীয় 'মমি'র মত শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।

পুলিশ হাসপাতালে লাশ চালান দিল। পোষ্টমাস্টার যখন সুরনাথের মৃত্যু বিবরণ শুনিলেন তখন তিনি আক্ষেপে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা! ডাইনীর হাতে পড়েছিলেন। কামিনী ডাইনী এখনো তল্লাটে আছে, মায়া বিস্তার করে বেচারিকে টেনে নিয়েছিল। আমি ইন্সপেক্টরবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাঁ হাতি রাস্তা ভাল নয়। কিন্তু উনি তা শুনলেন না।'

বর্ষাকাল, সুতরাং বৃষ্টি তো হবেই। কিন্তু সারাদিন সমানে জল পড়বার পর রাত্তিরেও তার এমন বিরাম হবে না জানলে আমরা বোধ হয় সেই কলকাতা ছেড়ে এই পাড়াগাঁয়ে ফুটবল খেলার লোভে আসতাম না!

জায়গাটা যে এমন পাণ্ডববর্জিত দেশ তাই বা কে জানত? খবরের কাগজে নসীপুরে 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ডের' নাম দেখে ভবেশ একটা এণ্ট্রি করে দিয়েছিল। ভবেশ আমাদের 'দি আন্‌বীটন ইলেভ্‌ন'—এর অত্যন্ত উৎসাহী কর্মঠ সেক্রেটারী। খেলাটা ফুটবল এবং এণ্ট্রি-ফি আট আনার নিচে থাকলে সে চোখ বুজে একটা চিঠি ছেড়ে দেবেই—তা সে খেলা যেখানেই হোক না কেন। 'আন্‌বীটন ইলেভ্‌ন' ছ-মাসের পরমায়ুতে এ পর্যন্ত কাউকে পরাস্ত করতে পারেনি, সেদিক দিয়ে আমাদের রেকর্ড আন্‌বীটন সত্যিই। চাঁদা দেওয়া ও একবার করে মাঠে নামাই সার। কিন্তু ভবেশের উৎসাহ তাতে কমবার নয়।

গোড়ার দিকে কলকাতার একটু আধটু নামকরা 'শীল্ড' বা কাপেই নামতে গিয়ে আমাদের

একটু অসুবিধা হয়েছে এ-কথা স্বীকার করা ভালো। দর্শকেরা আমাদের খেলায় উৎসাহিত হয়ে এমন হাততালি দিতে শুরু করেছে যে খেলা শেষ হয়ে গেলেও থামেনি, অনেকে হাততালি দিতে দিতে আমাদের পেছনে বাড়ি পর্যন্ত এসেছে, এ আমার নিজের চোখে দেখা। আমরা হেরে গেলেও খুব খারাপ খেলি না। কিন্তু ভালো খেলেও এতটা আমাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলাম না! শেষের দিকে তাই কলকাতা ছাড়িয়ে মফঃস্বলের শহর এবং মফঃস্বলের শহর ছাড়িয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে আমাদের ঝোঁক একটু বেশী হয়েছে।

কিন্তু পাড়াগাঁয়ের একটা সীমা আছে—নসীপুর তার বাইরে। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড'-এর কর্মকর্তারা আমাদের চাঁদা পেয়ে খুশী হয়ে জানিয়েছিলেন যে, স্টেশন থেকে এক পা গেলেই তাঁদের ক্লাব ও খেলার মাঠ। আমাদের কোন কষ্ট হবে না। ষ্টেশনে তাঁরা লোকও রাখবেন। লোক বলতে ষ্টেশন মাষ্টার ও এক পা বলতে 'ঘটোৎকচের পা' সেটুকু তাঁরা উহ্য রেখেছিলেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভিতর তিনটে নাগাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গিয়ে যখন নসীপুর নামলাম, তখন প্রথমে তো মনে হোল গাড়ি বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে মাঠের মাঝে থামতে আমরা ভুল করে নেমে পড়েছি। এ আবার ষ্টেশন নাকি? প্ল্যাটফর্ম না থাক, মাটিতে খানিক লাল কাঁকরও তো বিছানো থাকে। হুড়মুড় করে আবার ট্রেনে উঠে পড়তে যাচ্ছি এমন সময় উদয় খুব পর্যবেক্ষণ করে বললে,—না রে, ষ্টেশনই বটে, দেখছিস না, দু' একটা কাঁকর পড়ে রয়েছে। বাকি সব জলে ধুঁয়ে গেছে।

কাঁকর দেখে আশ্বস্ত হয়ে সামনে চাইলাম। দৃষ্টির ভিতর দূরে যেন একটা ভাঙ্গা গাছ দেখা গেল। গাছ নয়, সেটা ষ্টেশনের নামলেখা সাইন পোষ্ট। বৃষ্টিতে নিচের মাটি আলগা হয়ে একটু হেলে পড়েছে। সাইন পোষ্টের পরে দূরে একটা ঘর এবং তাঁর ভিতর একজন স্টেশন-মাস্টার টিকিট কালেক্টরকেও পাওয়া গেল! তাঁর হাতে রিটার্ন টিকিটের অর্ধেক দিয়ে রাস্তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি একটা কাটা খাল দেখিয়ে দিলেন। ওটা যে খাল মশাই, যাব কি করে নৌকো না হলে? ষ্টেশন-মাষ্টার বুঝিয়ে দিলেন খাল নয়, ওটাই রাস্তা, বৃষ্টিতে ওই অবস্থা হয়েছে। শুনলাম, সেই রাস্তায় সাঁতরে কাদা ঠেলে ক্রোশ-দুই এগুলে নসীপুর গ্রাম পাওয়া যাবে, যদি বন্যায় সেটা ভেসে না গিয়ে থাকে।

দলের অধিকাংশ লোক তৎক্ষণাৎ সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু ভবেশ ছাড়বার পাত্র নয়। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ডটা না নিয়ে যেন সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে না। কোনমতেই সকলকে বোঝাতে না পেরে সে চরম যুক্তি প্রয়োগ করলে। বাড়িতে ফিরবে কিন্তু যাবে কি হেঁটে? সত্যিই তো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাত্তির আটটার আগে কোন ট্রেন এই মাঠে আর থামছে না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমাদের ভবেশের কথাতেই রাজী হতে হোল।

নসীপুর কেমন করে পৌঁছলাম ও সেখানে জলে জলময় মাঠে ওয়াটার পোলো ও রাগবির মাঝামাঝি কি ধরনের ফুটবল খেলা হোল তার আর বর্ণনায় কাজ নেই। নসীপুর আগমনের এই ভূমিকাটুকু সেরে আসল কথায় এবার নামা যাক।

এগারো জন মিলে খেলতে এসেছিলাম। খেলা-ধুলোর নয়, খেলা-কাদার পর নসীপুর গ্রামের অবস্থা ও শীল্ডের কর্মকর্তাদের আতিথেয়তার নমুনা দেখে ছ'জন কিছুতেই আর থাকতে রাজী হোল না। বৃষ্টির ভেতর খাল বা রাস্তা সাঁতরেই তারা স্টেশন ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ও খেলায় কয়েকটি গোল খেয়ে আমরা একটু বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এর পর বসন্তর আবার একটু জ্বর-ভাবওদেখা দিয়েছে। জ্বর হওয়াটা আশ্চর্য নয়। কারণ ধাক্কাটা তার উপর দিয়েই একটু বেশী গেছে। সে-ই ছিল গোলকীপার। জ্বর-অবস্থায় বসন্তকে এই জলের ভেতর তো যেতে দেওয়া যায় না। বসন্তর সঙ্গে ভবেশ, আমি, উদয় ও সুরেন রাতটার মত নসীপুরেই কাটিয়ে দেবো ঠিক করলাম।

ঠিক তো করলাম, কিন্তু থাকব কোথায়? 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড'- এর কর্তা নগেনবাবু স্বয়ং আমাদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলেন। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল'- এর কর্তা স্বয়ং শুনে একটু অবাক হলেন সন্দেহ নেই। আমবাও হয়েছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নগেনবাবু নিজের নামটা বেঁচে থাকতে থাকতেই স্মরণীয় করে রেখে যেতে চান। পরে কে কি করবে বলা তো যায় না। শীল্ড তৈরির খরচ যখন তিনিই দিয়েছেন তখন মেমোরিয়ালটা দু'দিন আগে থাকতে হলে কার কি বলবার আছে? যাইহোক, নগেনবাবু আমাদের নিয়ে একটু-আধটু ঘোরাফেরা করেও সুবিধেমত একটি থাকবার জায়গা খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন আসায় স্থানাভাব। পাড়ার বাড়িতে আতিথেয়তার আদর্শ একটু নিচু বলেই মনে হোল। নসীপুরে আরও একটি পাড়া আছে, কিন্তু তাদের ওখানে শুনলাম, 'ব্রজমোহন কাপ' বলে আরও একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়। 'নগেন্দ্র মেমোবিয়াল'- এর সঙ্গে তাদের আদা এবং কাঁচকলাব মত মধুব সম্পর্ক। এখানকাব খেলুড়েদের তারা স্থান কিছুতেই দেবে না।

আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, এমন সময়ে বুদ্ধিতে একটি সুরাহা হয়ে গেল। গ্রামের একটি মাত্র চলনসই রাস্তায় বাবকয়েক আসা যাওয়া করতে গিয়ে একটি মাত্র পাকা দোতলা বাড়ি সকলেরই চোখে পড়েছে। একটু ভগ্নদশা। কিন্তু আমাদের দশা তো তার চেয়েও খারাপ।

উদয় হঠাৎ বলে ফেলে,—এ বাড়িটিব খোঁজ তো করেননি মশাই! ওদেবও একটা শীল্ড বা কাপ আছে নাকি?

নগেনবাবু হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—না না মশাই, ও বাড়ির দিকে তাকাবেন না।

তাঁকে একরকম জোর করে থামিয়ে বলল, কেন মশাই, দোষটা কিসের? একজন বিদেশী

লোক জ্বরে পড়েছে শুনলেও এই বৃষ্টি বাদলার রাতে আশ্রয় দেবে না—এমন চামার কেউ আছে নাকি?

নগেনবাবু একটু রেগেই বললেন, আরে না মশাই! 'গ্রেট বেঙ্গল স্পোর্টিং' বারো গোল খেয়েছিল তাদেরই ওখানে থাকতে দিইনি, আপনারা তো মোটে আট গোল।

সামান্য চারটে গোলের তফাতের দরুণ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে হবে এ বড় অন্যায় কথা। সুরেন একটু ক্ষুন্নস্বরে বললে, —একটু চেষ্টা করলে আর চারটে গোল কি আমরাই খেতে পারতাম না?

আরে না মশাই, সে কথা নয়! চলুন চলুন!

কিন্তু আমরা অমন বাড়ির লোভ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই কিছুতেই। একবার জিজ্ঞেস করলে দোষ কি, এই আমাদের বক্তব্য।

নগেনবাবু চটে বললেন, —কাকে জিজ্ঞেস করবেন মশাই? ও বাড়িতে কেউ থাবে ?

থাকে না? তাহলে তো আরো ভালো । একটা দরজা খোলা পেলেই হবে। নেহাত তালা ভাঙতেই হয় তো দামটা না হয় দিয়েই দেবো।

নগেনবাবু আমাদের বিমূঢ় করে বললেন,—তালা নেই মশাই দরজা সব খোলা।

খোলা, বাড়িতে কেউ নেই, তবু এই বৃষ্টির ভেতরে আমাদের ঘুরিয়ে মারছেন?

ঘুরিয়ে মারছি না আপনাদের, মারবার ইচ্ছে নেই বলেই তো ঘোরাচ্ছি।

উদয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে একটু চট্ করে খোলে, সে-ই প্রথম ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললে,—ভুতুড়ে বাড়ি নাকি মশাই?

নগেনবাবু মুখে কিছু না বলে শুধু একটু শিউরে উঠলেন।

ভবেশ হেসে উঠে বলল, এতক্ষণ বলতে হয়। ভূত পেলে কি এ দেশে আশ্রয় খুঁজি?

নগেনবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন, ও বাড়িতে থাকা হাসির কথা নয় মশাই!

আমি বললাম,—বাড়ির বাইরে থাকাও বিশেষ হাসির ব্যাপার মনে হচ্ছে না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমরা ওখানেই চললাম। শুধু একটা হ্যারিকেন, ক'টা মাদুর ও একজোড়া তাস যদি যোগাড় করে দিতে পারেন।

নগেনবাবু তার পরেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। অগত্যা অত্যন্ত হতাশ ও করুণভাবে আমাদের শেষ বিদায় দিয়ে ভবেশকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এ ভুতুড়ে বাড়িতে রাত্তির বেলা জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে আসতেও তিনি নারাজ।

বসন্তকে চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে আমরা ভুতুড়ে বাড়ির দেউড়ির নিচে ভবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগালাম। ঝুপঝুপ করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাড়াগাঁয়ের পথে একটা আলোর রেখা দূরে থাক, একটা জোনাকিরও দেখা নেই। অনেকদিন বিনা ব্যবহারে পড়ে থাকার দরুন বাড়িটা থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ দেউড়ির তলাতেই পাচ্ছিলাম। গাঁয়ের লোক বাড়িটা দেখে যে ভয় পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বাড়িটা

একেবারে গ্রামের একধারে। ধারে কাছে একটা বসতি নেই। দিনের বেলা বাড়ির যা চেহারা দেখে গেছি, তা একটু অদ্ভুত। দোতলার একদিকে ঘরের জন্যে দেওয়াল তোলার পর ছাদ আর সম্পূর্ণ হয়নি। ছাদহীন দেওয়ালগুলো দরজা জানালার শূন্য ফোকর নিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বাড়িটার চেহারা সত্যিই কেমন যেন বদলে গেছে। বৃষ্টিতে অন্ধকারে বাড়িটাকে এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কেমন একটা চাপা অস্বস্তির আবহাওয়া টের পাচ্ছিলাম। ভবেশ একটা চাকরের মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে খানিকবাদে এসে হাজির হতে সত্যিই খুশী হলাম। চাকরটা আমাদের জিনিসপত্র দেউড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েই যেভাবে পড়ি কি মরি করে দৌড় দিল তা একটা দেখবার জিনিস।

নিজেরাই বিছানাপত্র ও লণ্ঠন নিয়ে এবার ভেতরের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার একদিকে গুটি কয়েক ঘর ঠিক আছে। সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটিই বেশ বড়।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভবেশ অদ্ভুত সুর করে বললে,—কই বাপু ভূত, অতিথি-সজ্জন এল, একটু সাড়া দাও।

আমরা সকলে তার কথার সুরে শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ব্যাপারেও হেসে উঠলাম। ভবেশের কথা শেষ হতে না হতেই ওধারের কোন ঘর থেকে লম্বা টানা ক্যাঁ-চ্ করে একটা শব্দ হোল। ভাঙা পুরনো জানালার পাল্লা বাতাসে নড়ার শব্দ নিশ্চয়ই, তবু শব্দটা ঠিক জুতসই ও যথাসময়ে হয়ে গেল বলতে হবে।

ভবেশ হেসে বললে, বেশ বেশ, এই তো ভদ্রতা। নসীপুর গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূত ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সমর্থন করবার জন্যেই যেন পাশের ঘরে ঘড় ঘড় ঝন-ঝন করে একটা আওয়াজ হোল। একটু চমকে উঠলেও সবাই আবার হেসে ফেললাম! শুধু বসন্ত জ্বরের রুগী বলেই বোধ হয় একটু অপ্রসন্নভাবে বললে,—ঠাট্টা তামাসা আর ভালো লাগছে না বাপু! বিছানা-টিছানা একটা করতে হয় তো করো।

সুরেন ও উদয়কে বিছানা পাতবার ভার দিয়ে আমি ও ভবেশ একবার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা কি।

ভবেশ বললে,—সাড়া-টাড়া দিচ্ছেন যখন, সশরীরে একবার দেখা দেন কিনা দেখাই যাক না!

পাশের ঘরটা আকারে ছোট। দেয়াল থেকে নোনা-ধরা চুন-বালি খসে পড়ে ও পুরনো কাঠকাঠরার ভগ্নাংশ থাকার দরুন অত্যন্ত নোংরা। ঘরে ঢুকে দু'জনেই অমন চমকে উঠব ভাবিনি।

বাতিটা ছিল ভবেশের হাতে পেছনে। দরজার গোড়ায় পা দিতে না দিতেই অন্ধকারে কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলার মত ফ্যাঁস করে একটা আওয়াজ শুনে সত্যি শিউরে উঠলাম নিজের অনিচ্ছায়। পেছন থেকে ভবেশও সেটা শুনতে পেয়েছিল, বাতিটা নিয়ে এগিয়ে

এসে বললে,—শুধু তোমার বাণী নয় বন্ধু একটু দর্শনও দিও! কই তিনি?

এবার তাঁকে দেখা গেল চাক্ষুষ। দেখে ভয় পাবারই কথা। অতবড় এবং অমন মিশকালো বেড়াল বাংলা মুলুকে জন্মায় বলে জানা ছিল না! তিনি তার বহুদিনের দখলী-স্বত্বের ওপর আমাদের চড়াও হওয়াটা অন্যায় উপদ্রব মনে করে জ্বলজ্বলে চোখে গায়ের লোম ফুলিয়ে এমন দন্তবিকাশ করছিলেন।

ভবেশ বাতিটা নামিয়ে হতাশার ভঙ্গিতে বললে, —এটা কি ভালো হোল প্রভু। এত আশ্বাস দিয়ে শেষকালে বেড়াল রূপ ধারণ করলেন। আপনার নিজমূর্তি কই?

বেড়ালটা আর একবার ফোঁস করে উঠল উত্তরে, ও আমরা হেসে ফেললাম। পেছনের ঘর থেকে বসন্তর বিরক্ত গলা শোনা গেল, —আবার বাতিটা নিয়ে গেলি কোথায়—অন্ধকারেই থাকব নাকি?

সে ঘরে ফিরে ভবেশ হেসে বললে, —তোর কি ভয় করছে নাকি! না, জ্বরের লক্ষণ?

বসন্ত আরো যেন বিরক্ত হয়ে বলল, —ভয় টয় জানি না বাপু আমার ভালো লাগছে না। খুঁজে খুঁজে আচ্ছা থাকবার জায়গা বার করেছ।

আমরা সবাই মিলে তাকে অবশ্য ঠাট্টায় নাকাল করে তুললাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল, অস্বস্তি একা বসন্তরই হয়নি।

সামনে দীর্ঘ রাত। খাবার-দাবার নগেনবাবু চাকরের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন, তার সৎকার করে বসন্তকে একটা বিছানায় শুতে বলে আমরা আর একটায় তাস খেলতে বসলাম। কেন বলা যায় না, সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে ও ফুটবল খেলে ক্লান্ত হলেও ঘুমোবার জন্যে শুতে ব্যাকুল নয় দেখা গেল।

তাস খেলা তার মাঝেতে কিছুতেই জমল না। এক সময় সবাই তাস ফেলে দিলাম। সুরেন বললে, —এবার শুয়ে পড়লে হয়। আমরা সবাই সায় দিলাম, কিন্তু কারুর ওঠবার নাম নেই।

হঠাৎ ভবেশ বলল, —সাধারণ লোক কেন ভয় পায় বুঝেছ তো! কি রকম আওয়াজটা হচ্ছে শুনছ? কে বলবে যে ও-ঘরে একটা কাঠের পা ঠকঠকিয়ে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে না?

আওয়াজটা আমরা সবাই শুনেছিলাম, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলিনি।

ভবেশ আবার বললে, —এসব থেকেই মানুষ ভূত তৈরি করে।

ভবেশের কথা শেষ না হতেই উদয় বললে, তা না হয় হোল কিন্তু অমন আওয়াজটাই বা কিসের, ও তো আর জানালা নাড়ার শব্দ নয়।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম একবার। সকলেই একটু যেন হতভম্ব। হঠাৎ সুরেন লণ্ঠনটা নিয়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। কই কোথাও কিছু নেই তো।

ভবেশ হেসে উঠল, —আমাদের ভয় ধরল নাকি। তার হাসিটা খুব আন্তরিক শোনাল

না।

উদয় হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, —কিন্তু ওটা কি!

আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন সেদিকে পড়েছে। আমি গিয়ে সেটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম, —একটা কালোরঙের খানিকটা ছেঁড়া কাপড়।

হেসে বললাম, রজ্জুকে সর্প-ভ্রম হচ্ছে নাকি?

এবার ভবেশই বললে, —কিন্তু বেড়ালটা কোথায় গেল? ওইখানেই দেখছিলাম না?

তাও তো ঠিক! বেড়ালটাকে তো এইখানেই দেখা গেছল। এই কাপড়টিকে ভুল করে কি...... না, তাও সম্ভব নয়? স্পষ্ট তাকে দেখেছি, রাগেরফোঁস ফোঁসানি শুনেছি নিজের কানে। তবু হেসে বললাম—বেড়ালটা কি তোমাদের জন্যে এতক্ষণ বসে আছে? সে কখন সরে পড়েছে।

কিন্তু কোথা দিয়ে। এ-ঘরের একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ। ওধারের দরজায় খিল দেওয়া তো দেখতেই পাচ্ছ।

বললাম আমাদের ঘর দিয়ে কোন বেড়ালের পক্ষে আমাদের অজান্তে যাওয়া সম্ভব তো নয়। একেবারে দরজার সামনেই আমরা তাসের আসর পেতে বসেছিলাম, একটা ধুমসো মিশকালো বেড়াল পেরিয়ে গেলে জানতে পারব না, এমন বেহুঁশ আমরা ছিলাম কি?

ভবেশ বললে, —থাকগে, বেড়ালের অন্তর্ধান তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে আর—

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আমাদের সকলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফ-গলানো জলের স্রোত নেমে গেল বিদ্যুদ্বেগে।

ওধারে বসন্তর সে কী আতঙ্কের চিৎকার. উত্তেজনার মুখে আমরা সবাই তাকে অন্ধকারে একলা ফেলে এসেছি।

ছুটে সবাই ঐ ঘরে এলাম। বসন্ত ছাই-এর মত মুখ করে উঠে বসেছে। তার কপাল মুখ অসম্ভব রকম ঘেমে উঠেছে।

হয়েছে কি? কি হোল?

বসন্ত হাঁপাবে না কথা বলবে! অনেক কষ্টে থেমে যা বললে তার মর্ম তার মাথার কাছে বসে কে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা নিশ্বাস তার মুখে ফেলছিল। আমরা সবাই হেসে উঠলাম জোর করে, —জ্বরের ঘোরে তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।

বসন্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বললে, না-না আমি জেগে স্পষ্ট সে নিঃশ্বাস শুনেছি, মুখের ওপর টের পেয়েছি অনেকক্ষণ। তারপর চিৎকার করেছি! তোরা ও-রকম করে চলে যাসনি।

ভবেশ হাসবার চেষ্টা করে বললে, —আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। এমন ভয়কাতুরে ছেলেও দেখিনি! আমরা এখানেই শুচ্ছি এবার।

উদয় একটু ইতস্তত করে বললে, —এক্ষুনি শুয়ে কি দরকার? জেগে একটু গল্প করা যাক না।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কারুর সে-কথায় আপত্তি দেখা গেল না, ভবেশের না।

বেশ তো! ভবেশ বললে, —কিসের গল্প হবে? বল সুরেন, একটা ভূতের গল্পই বল, এ বাড়িতে বেশ লাগবে।

বসন্ত তাড়াতাড়ি বললে, —না না।

যাঃ, তুই একেবারে ভীতুর এক শেষ। বল সুরেন।

সুরেন ম্লানভাবে একটু হেসে বললে তাহলে? শোন। 'আনবীট্‌ন ইলেভন বলে এক টীম গেছল নসীপুর...

আমরা সবাই একটু হাসলাম। ভবেশ বললে, —আহা, বলতে দাও ওকে।

সুরেন বলতে শুরু করলে—আমাদের নসীপুর আসা ও তার পরের ঘটনার যা বর্ণনা দিলে, তাতে অন্য সময় হলে হাসি আসত নিশ্চয়, কিন্তু ঘরে এখন সাড়া-শব্দ বিশেষ নেই। গল্প-শেষে ভুতুড়ে বাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছল। সেখানকার ঘটনাগুলো একে একে শেষ করে সুরেন বললে, —ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ, আরো নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ। ঘরে লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় একজন গল্প বলছে ভূতের গল্প। কেউ সে গল্প বিশ্বাস করে না গল্প যে বলছে সে হঠাৎ একটা তাস নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, অশরীরী কেউ এখানে থাকে তো এ তাস বাতাসে মিলিয়ে যাক।

হাসতে গিয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

উদয বললে, আরে তাসটা পড়ল কোথায়? সুরেন সত্যিসত্যিই গল্পের সঙ্গে একটা তাস ছুঁড়েছিল।

ভবেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলবার চেষ্টা করলে, পড়েছে কোথাও ওদিকে।

ওদিকে কোথায়! উদয়ের গলার স্বর তীক্ষ্ণ ওদিকে তো খালি মেঝে। এ ঘরে জিনিস লুকিযে থাকবার মতো জায়গা নেই!

আমি তবু উঠে বসন্তর বিছানার আশপাশ সমস্ত ভালো করে খুঁজলাম। অন্য সবাইও তন্ন- তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল।

আশ্চর্য! আমাদের সকলের মুখ গম্ভীর। শুধু বসন্তর নয়, আমাদের কপালেও ঘাম দেখা দিয়েছে।

ভবেশ হঠাৎ অকারণে অত্যন্ত হেসে উঠে বলে, কি তোমরা যা তা করছ! পাগল হলে নাকি সবাই! নাও সুরেন, গল্প বলো।

শুকনো পাংশু-মুখে আমরা যন্ত্রচালিতের মত আবার এসে বসলাম! সুরেনের মুখে যেন রক্ত নেই! সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার একটা তাস তুলে নিলে, তারপর বললে,

—আগের তাসটা উড়ে গেল.....

ভবেশ শুধু বললে—হুঁ।

আবার একটা তাস নিয়ে গল্পের কথক বললে, —উড়ে যাওয়া প্রমাণ নয়। সুরেনের স্বর অত্যন্ত অস্ফুট, এবার তাস থেকে একটা মস্ত কালো বেড়াল বেরিয়ে.. ....

বসন্তর চিৎকার সকলের ওপরে শোনা গেল। তার বিছানার ঠিক পায়ের কাছে....

না, সে বার অক্ষত দেহেই তার পরের দিন কলকাতায় ফিরেছিলাম। শুধু বসন্তর জ্বরটা বিকারে দাঁড়িয়েছিল কলকাতায় এসে, — বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেক দিন।

কেষ্টবাবু ভূতের গল্প শুনলেন

রবিদাস সাহারায়

কেষ্টবাবু গিয়েছিলেন মিতপুর গ্রামে বন্ধুর বাড়িতে। রেল স্টেশন থেকে বন্ধুর বাড়ি পাক্কা এক ঘণ্টার পথ। ফেরার দিন সেই দীর্ঘপথ হেঁটে তাঁকে স্টেশনে পৌছতে হল। কথা ছিল দুপুর দুটোর মধ্যেই খেয়ে দেয়ে রওনা হবেন। কিন্তু মধ্যাহ্নের ভুরি ভোজন এত ভারী হয়েছিল যে ঘুম ভাঙতেই বেজে গেল সাড়ে তিনটে। তারপর রওনা হয়ে স্টেশনে পৌঁছতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। শীতের বেলা। রোদের তাপও কমে এসেছে। গাড়ি ছাড়বে সোয়া পাঁচটায়। এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। কাজেই নিশ্চিন্ত মনেই টিকিট কেটে স্টেশন-ঘরে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

এদিকে সোয়া পাঁচটা বেজে গেল। বেজে গেল ছ'টা। কিন্তু গাড়ির দেখা নেই। কলকাতার

দিক থেকে দুটো আপট্রেন চলে গেল। কিন্তু ডাউন ট্রেনের পাত্তা নেই। কখন আসবে কে জানে?

গ্রামের স্টেশন। যাত্রী বেশি নেই। কাজেই কোন কোলাহলও নেই স্টেশনে। শীতকালে সন্ধ্যায় অন্ধকার ততক্ষণে ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সাড়ে ছ'টার ট্রেনের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। শোনা গেল আগেকার জংসন স্টেশনের লাইনে জরুরী মেরামতের জন্য গাড়ি আসতে দেরি হচ্ছে।

ধীরে ধীরে স্টেশন ফাঁকা হয়ে গেল। কেষ্টবাবু ভাবলেন, এই সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে মিতপুরের দিকে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। একটু দেরি হলেও পরের ট্রেনেই যাওয়া যাবে। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছতে পারলে রাত বেশি হলেও কোন অসুবিধা হবে না।

স্টেশনে যে দু'চারজন লোক ছিল তারাও চলে গেল। কেষ্টবাবু একা। বুঝতে পারলেন কপালে আজ দুর্ভোগ আছে। ট্রেন কখন আসবে তার ঠিক কি? এখন আর মিতপুরে বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ারও উপায় নেই। বেঞ্চির ওপর বসে বসে ছাড়পোকার কামড় খেতেখেতে নানা কথাই ভাবতে লাগলেন কেষ্টবাবু। এদিকে শেষ ট্রেনের সময়ও পেরিয়ে গেল। কেষ্টবাবু ওয়েটিং রুমের দিকে চলে গেলেন। ট্রেন না এলে ওয়েটিং রুমেই রাত কাটাতে হবে।

কেষ্টবাবু মনে করেছিলেন, ওয়েটিং রুম ফাঁকাই রয়েছে। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, ইতিমধ্যেই এক যাত্রী আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়ে এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে ঘরের এক পাশে।

কেষ্টবাবু ভাবলেন, নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ আগে লোকটি এখানে এসে ঘমিয়ে পড়েছে। তার হয়ত গন্তব্য স্থানে যাবার কোন ট্রেনই নেই।

যা হোক এ ঘরেই রাত কাটাতে হবে। কেষ্টবাবুর সঙ্গে কোন বিছানাপত্র নেই। তবে একটা খবরের কাগজ রয়েছে। কলকাতা থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। ঝোলার মধ্যেই সেটা রয়েছে। সেটাই পেতে কোনরকমে ঝোলাটা মাথায় দিয়ে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম আর এল না। মনে কি রকম যেন ভয় ও অস্বস্তি। যে লোকটা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে, সে কি রকম লোক তা তার জানা নেই। তাঁর ঘুমের সুযোগ নিয়ে কিছু চুরি করে পালাতেও পারে। তাই শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলেন কেষ্টবাবু।

কিছুক্ষণ পর ঘরের এক পাশে ঘুমিয়ে থাকা সেই লোকটার কাশি শুরু হল। কাশতে কাশতে উঠে বসল লোকটা। উঠে বসেও কাশতে লাগল। কিন্তু তার মুখ ভালভাবে দেখার উপায় নেই। গায়ের চাদরটা মাথায় মুড়ে মুখটাকে প্রায় ঘোমটার মত ঢেকেই রেখেছে। কাজেই লোকটার চেহারা এবং বয়স কিছুই বোঝার উপায় নেই।

কাশতে কাশতে একটু থেমে ধুঁকতে লাগল তারপর লোকটা কেষ্টবাবুকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করল, মশাইর যাওয়া হবে কুথা?

কেষ্টবাবু জবাব দিলেন, কলকাতায়।

—[illegible] টেরেন পান নি বুঝি?

— না। আপনি কোথায় যাবেন?

— আমার কুথাও যাবার ঠাঁই ঠিকানা নেই; এখানেই থাকি।

কেষ্টবাবু কথাটা শুনে একটু ধোঁকায় পড়লেন। এ কেমন মানুষ? কোন ভিখিরি-টিকিরি নাকি? তবু জিজ্ঞেস করলেন, কি কাজ করেন?

— কিছু না। এই ইস্টিশানে এসে ঘুমিয়ে থাকি। লোকের সঙ্গে গল্প সল্প করে সময় কাটাই। অন্যদিন ইস্টিশানে কিছু পেসিনজার থাকে। আজ কেউ নেই। শুধু আপনিই আছেন। আপনার কাছে ঘড়ি আছে? এখন কটা বাজে বলুন তো?

কেষ্টবাবু বলতে চাইলেন, ঘড়ি নেই। কারণ ঘড়িটা যদি ছিনতাই করে নেয় লোকটা? কিন্তু গোপন করতেও পারলেন না। হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। কিন্তু ওয়েটিংরুমের মিটমিটে আলোতে কিছু বুঝবার উপায় নেই। অতি কষ্টে অনুমান করে বললেন, রাত এগারোটা।

লোকটা বলল, কোন টেরেন আর নেই এখন। কাল সকাল সাতটায় একটা ডাউন টেরেন আছে। তাও আসবে কিনা ঠিক কি! তবে রাত বারোটায় একটা মালগাড়ি যাবে আপ লাইন দিয়ে। তাতে আপনার লাভ কি? কোন পেসিনজারও তাতে থাকে না।

কেষ্টবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ট্রেনটা আসে কোত্থেকে? লোকটা কাশতে কাশতে একটু থামল, তারপর বুকে হাত চাপা দিয়ে বলল, কলকাতার দিক থেকেই আসে। এই কর্ড লাইনে তো বেশি গাড়ির যাতায়াত নেই। দুমতারায় একটা রেলের মেরামতির কারখানা আছে, সেখানেই কি-সব মালপত্তর যায়। এখন ক'টা বেজেছে বললেন, এগারোটা? আরো তো একঘন্টা বাকি আছে টেরেন আসার। কি করে যে সময়টা কাটবে।

কেষ্টবাবু অবাক হলেন লোকটার কথা শুনে। রাত বারোটায় মালগাড়ি আসবার সঙ্গে লোকটার কি সম্পর্ক? এবার জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, সেই মালগাড়ি আসবার সঙ্গে আপনার— কিন্তু কিছুটা বলেই চেপে গেলেন। ভাবলেন, লোকটা হয়তো ওয়াগন-ব্রেকার দলের লোক। কাছাকাছি আরও লোক হয়তো আছে। গাড়ি এলেই ছুটে আসবে। কাছাকাছি কোন জায়গায় সংকেত দেখিয়ে থামিয়ে দেবে ট্রেন।

মনে মনে একটু শঙ্কিতই হলেন কেষ্টবাবু। কিন্তু এখন কি আর কবার আছে? চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় কি?

মনে মনে ইস্টনাম জপ করতে লাগলেন কেষ্টবাবু। কিছুক্ষণ পর লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, স্টেশন মাস্টার রাত্রে স্টেশনে থাকেন না?

লোকটা জবাব দিল, না, তিনি থাকবেন কেন? শেষ টেরেন চলে গেলেই তিনি কোয়ার্টারে চলে যান। একটু দূরেই ওনার কোয়ার্টার।

—অন্য কোন লোক স্টেশনে থাকে না।

—ওয়াচম্যান থাকে। সেও হয়তো কোথায় চলে গেছে। আজকে মাসের প্রথম মঙ্গলবার তো? এই দিনটায় সে রাত্তিরে কখনো থাকে না। কারণ আর তো টেরেন আসার ঝামেলা নেই। মালগাড়িটা এখানে থামে না।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ লোকটাই বলল, মশাই একটা গল্প বলুন না, সময়টা তবু কাটানো যাবে।

কেষ্টবাবু বললেন, আমার তো গল্প বলার কোন অভ্যাস নেই। আপনি যদি বলেন তবে শুনতে পারি।

লোকটা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, বলতে পারি কিন্তু শুনে ভয় পাবেন না তো? আমি একটা গল্পই জানি। সেটা ভূতের গল্প।

—ভূতের গল্প? কেষ্টবাবু চমকে উঠলেন। একটু থেমে থেমে বললেন, এই গভীর রাতে ভূতের গল্প বলবেন? আপনার ভয় করবে না?

লোকটা বলল, ভয় আমার নেই মশাই। ভয় থাকলে কি রাতবিরেতে এমনভাবে বাইরে থাকতে পারি? আমিই তো আগে এই ইস্টিশানের ওয়াচম্যান ছিলাম। এখন অন্য লোক এসেছে।

—আপনি সেই কাজ ছাড়লেন কেন?

—সে অনেক ব্যাপার মশাই। শুনলে আপনারও ভয় হবে। এই তো বেশ আছি। কোন দায়দায়িত্ব নেই। যাক্, ভূতের গল্প যদি শুনতে চান তা হলে শুনুন।

সর্বনাশ! তা হলে কি লোকটা ভূতের গল্প না শুনিয়েই ছাড়বে না?

কিন্তু নিজের ভয়ের কথা গোপন করে কেষ্টবাবু একটু মেকী কৌতুহল প্রকাশ করলেন। বললেন, কি আপনার গল্প?

লোকটা বলল, এই ইস্টিশানে একজন ওয়াচম্যান ছিল, তার নাম চুনিলাল। বাসা ছিল ইস্টিশানের মাস্টার বাবুর কোয়ার্টারের পাশেই। সেখানে তার বউ আর একটা ছোট ছেলে থাকত। ছেলেটার নাম চাঁদু। ছেলেটা বাবার খুব নেওটা ছিল। দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় চুনিলাল বাড়ি এলে বাবাকে সে ছাড়তে চাইত না। অনেক কষ্টে ছেলেকে ভুলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসত চুনিলাল। ছেলেটা বাবার কাছ ছাড়া কিছুতেই হতে চাইত না।

অথচ চুনিলালের দিনে বা রাতে কখনও বাড়িতে থাকার উপায় নেই। তার চাকরিটাও এমন। তখন সে ঠিক করল, রাত্রে খেয়ে দেয়ে ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। ঘুমোবে স্টেশন মাস্টারের ঘরেই। বউ থাকবে কোয়ার্টারে।

কথা বলতে বলতে লোকটা ভয়ানক ভাবে কাশতে লাগল। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল তার। কিন্তু মাথায় ঢাকা চাদরটা খুলল না সে। ওয়েটিং রুমের টিমটিম আলোয় তার চেহারা বুঝবার উপায় ছিল না।

কাশতে কাশতে লোকটা ক্লান্ত হয়ে নির্জীবের মত শুয়ে পড়ল। কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। কেষ্টবাবুর মনে ভয় আর কৌতুহল দুই-ই দোলা দিতে লাগল। লোকটা বলেছিল ভূতের গল্প বলবে। কিন্তু ভূতের ছোঁয়াই ঐ গল্পের মধ্যে নেই। তবে এটা কী গল্প?

অনেকক্ষণ পর লোকটা আবার উঠে বসল। বলতে লাগল, শুনুন মশাই, একদিন রাতের সব ট্রেনেই চলে গেছে। শুধু রয়েছে মালগাড়ি। তখন দুমতারা রেলের কারখানা জমজমাট ছিল। প্রত্যেক মঙ্গলবার রাত্রে আসতো কারখানার মালপত্র। শুধু ইংরেজী মাসের প্রথম

মঙ্গলবার আসতো কারখানার লোকদের জন্য চাল চিনি গম।

লোকটা হঠাৎ গল্প বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আজ ইংরেজী মাসের প্রথম মঙ্গলবার না?

কেষ্টবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

লোকটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল যেন। বলল, ঠিক এমন রাতেই দুমতারা কারখানার লোকদের জন্য চাল চিনি গম নিয়ে গাড়ি আসতো। আজকেও আসবে। কিন্তু ঐ সব খাবার জিনিস হয়তো আসবে না।

কেষ্টবাবুর মনে সন্দেহ জাগল যেন। তিনি জিগ্যেস করলেন, কেন, এই দিনে কোন গোলমাল হয় নাকি?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, হয়েছিল। ওয়াগন-ব্রেকাররা মালগাড়ি আটক করল। ওয়াগন ভেঙে লুঠ করে নিতে লাগল মালপত্র। চুনিলাল বাধা দিতে গেল। কিন্তু ওয়াগন-ব্রেকাররা মালগাড়ি আটক করল। ওয়াগন ভেঙে লুঠ করে নিতে লাগল মালপত্র। চুনিলাল বাধা দিতে গেল। কিন্তু ওয়াগন ব্রেকাররা ছিল গুণ্ডা, ডাকাত। হাতে তাদের অস্ত্র ছিল। চুনিলাল কেমন করে তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে? গুণ্ডারা ওকে মেরেই ফেলল। কুপিয়ে বিতিকিচ্ছে করে দিল মুখ। তার ছোট ছেলেটা তখনও স্টেশন ঘরের বিছানায় ঘুমুচ্ছে।

পরদিন সকালে ঘটনাটা বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। ইস্টেশন মাস্টার এলেন। চুনিলালের বউও কোয়ার্টার থেকে ছুটে এল। চুনিলালের লাশটা তখনও রেল লাইনের পাশে পড়ে ছিল। ওর বউ লুটিয়ে পড়ল মরা স্বামীর লাশটার ওপর।

ওয়াগন ব্রেকাররা ধরা পড়ে নি। রেল ইঞ্জিনের চালক ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পুলিস নিজেদের বাহাদুরি জাহির করার জন্য মামলা দায়ের করল চুনিলালকে জড়িয়ে। চুনিলালকেও একজন ওয়াগনব্রেকার বলে রেলের চালক সাক্ষ্য দিল। কিন্তু মরা মানুষের শাস্তি আর কি হবে? চুনিলালের বউকে কোয়ার্টার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আহা বেচারি! রেল কোম্পানির কাছ থেকে স্বামীর পাওনা কোন টাকাই চুনিলালের বউ পায়নি। কী দুর্ভোগ!

চুনির বউ কোয়ার্টারের লোকদের বাড়িতে কাজ করে কোন রকমে দিন চালাত। শুয়ে থাকত কোন বাড়ির খোলা বারান্দায়। স্বামীর ওয়াগন ভাঙার কথা কোনদিন বিশ্বাস করেনি তার বউ। সেকথা ভাবতে ভাবতে তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরের মাসের প্রথম মঙ্গলবার রাত বারোটায় টেরেনের শব্দ শুনে সে এসে হাজির হয়েছিল এই ইস্টিশানে।

—এ্যাঁ, তাই নাকি? পরের মাসে ঐ দিনে স্টেশনে এল কেন রাত্রিবেলা? কৌতুহল দমন করতে না পেরে কেষ্টবাবু প্রশ্ন করে বসলেন।

লোকটা বলল, আহা, বলতে দিন। তারপরেই তো ঘটল ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওয়াগন সেদিন আসেনি। গাড়িও থামে নি। চুনিলালের বউ চলন্ত টেরেনের সামনে ছেলেটাকে কোলে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বউ ছেলে দু'জনেই মরে গেল গাড়ির চাপায়। কিন্তু চুনিলাল রেহাই দেয়নি গাড়ির চালককে। সে ইঞ্জিনঘরে ঢুকে গলা টিপে মেরে ফেলল মিথ্যেবাদী ড্রাইভারকে।

চুনির প্রেতাত্মার বিতিকিচ্ছে মুখ দেখে চমকে উঠেছিল ড্রাইভার। কিন্তু প্রাণে বাঁচে নি। সেখানেই থেমে গিয়েছিল গাড়িটা।

পরের দিন স্টেশনমাস্টার এসে পুলিসে খবর দিয়ে সব লাশ সরিয়ে ফেলল। কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা হল না। শেষ হল আমার গল্প।

গল্প শুনে শিউরে উঠলেন কেষ্টবাবু। তাঁর ভয়ও করছিল। কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এসব খবর জানলে কেমন করে?

লোকটার মুখের কাপড়টা হঠাৎ একটু সরে গেল। স্টেশন ঘরের মিটমিটে আলোতেও তার মুখটা দেখে চমকে উঠলেন কেষ্টবাবু। কী বিভৎস মুখ!

কেষ্টবাবুর শরীরটা যেন আড়ষ্ট হয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণ বসে ছিলেন, শুয়ে পড়লেন এবার।

কতক্ষণ এভাবে ছিলেন তা কেষ্টবাবুর জানা নেই। হঠাৎ লোকটি জোরে জোরে ডাকতে লাগল, ও মশাই ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? ভয় পেয়েছেন বুঝি আপনি? এদিকে টেরেনটা যে এসে পড়েছে। আমি চলে যাচ্ছি।

কেষ্টবাবুর চেতনা ফিরে এল একটু। তাকিয়ে দেখলেন লোকটা উঠে বাইরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তিনিও কোন কিছু না বুঝেই ছুটে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন ট্রেনটা চলে যাচ্ছে স্টেশনের ঠিক সামনে দিয়ে। একটি বউ ছেলে কোলে নিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঞ্জিনের সামনে। শোনা গেল শুধু একটা চিৎকার।

তারপর সব চুপচাপ। ট্রেন চলে গেল। কিন্তু কোথায় সেই ছেলে কোলে বউটি? লোকটাই বা গেল কোথায়? ঘরে তার বিছানাপত্রও নেই।

কেষ্টবাবু ভয়ে ভয়ে কোনরকমে বাকি রাতটা কাটালেন। পরের দিন খুব ভোরবেলাতেই এলেন স্টেশন মাস্টার। তাঁর কাছে কেষ্টবাবু ঘটনাটা বললেন। স্টেশন মাস্টার প্রথমে কথাটায় গুরুত্বই দেননি। কিন্তু সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি আপনি এসব ঘটনা দেখেছেন?

কেষ্টবাবু বললেন, আমি কি মিথ্যে কথা বলবো?

স্টেশন মাস্টার বললেন, সত্যি বড় আশ্চর্যের কথা। তবু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এই স্টেশনেরই ওয়াচম্যাম ছিল লোকটি। তার পর একটু অন্যমনস্কতার ভাব দেখিয়ে বললেন, কাল ইংরেজী মাসের প্রথম মঙ্গলবার ছিল তো? তাই না?

কেষ্টবাবু বললেন, হ্যাঁ।

স্টেশন মাস্টার বললেন, গত বছর এমন রাতেই এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল এই স্টেশনে। প্রথম মঙ্গলবারে মরেছিল চুনিলাল। তার পরের মাসের প্রথম মঙ্গলবারে মরেছিল তার বউ।

স্টেশন মাস্টার মনে ব্যথাও পেলেন পুরনো কথা ভেবে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারটা তা হলে লোকে যা বলে তা সত্যি নয়? অথচ বিনা দোষেই শাস্তি পেয়ে গেল চুনিলালের বউ। এখন যে আর কিছুই করার উপায় নেই।

চেতলার কাছে

লীলা মজুমদার

চেতলা , কালীঘাট, আদিগঙ্গা ইত্যাদি যতই পবিত্র স্থান হোক না কেন, ওসব জায়গা মোটে ভাল না। আর লোকের মুখে মুখে কী সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায়, তার লেখা-জোখা নেই, তাছাড়া মশা মাছি তো আছেই। চিল্‌তে চিল্‌তে সব গলি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরি ঝুরঝুরে সব বাড়ি। তায় আবার সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। একফালি উঠোনের মধ্যে এই বড় বড় সব গাছ,—তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ, তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে যে কোন বাড়ি থেকে যে কোন বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হ'ল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা। পুরনো সব ঝগড়াও আছে, তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্তা বন্ধ। মুখ দেখা আর কী করে বন্ধ, নড়বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই, সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই চোর-ছ্যাঁচড় খুনে জানতে পারবে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, দুষ্কৃতিকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কী আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই

জানে। নেইও অবিশ্যি কারো কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরেদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড় কাকা ওখানকার থানার মেজ দারোগা। তাছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইব জন্মায়নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে মিসার হতাশা। শুনে বড় কাকা খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতিকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেল, তাহলে ওর হেড আপিসে উন্নতি হয় কী ক'রে? অবশ্যি ও সব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং আরও ভয়ের জিনিস আছে, ঐ তিনটে পাড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধ্যে হতে যার ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপর হাতে একগোছা সঙ্কট তারিণী মাদুলী বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা ক'রেন। কারণ পুলিসে আর কী-ই বা করতে পারে।

বটুদের উঠানের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিন দিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনিনি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে।

কী বড় বড় সবুজ রঙের চিংড়ী মাছ নিয়ে একটা লোক বিক্রি করতে এল। চিলে-কোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট ঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, "না বাছা, এস্থানে ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ।"

বটু তো চটে কাঁই! কী ভালো ভালো চিংডী মাছ! ছোট ঠাকুমা নেমে এসে বললেন, "ব্যস্ মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল। আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অত বড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে দাম পরে নেবে।"

বটু বললে, "আহা, বলল যে বিক্রি না হলে পচে যাবে।" কাষ্ঠ হেসে ছোট ঠাকুমা বললেন, "তুইও যেমন। তাছাড়া ওগুলো মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে।" এই বলে ছোট ঠাকুমা জল খেতে বসলেন।

বটু বলল, "তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন মিচ্‌কে মতো দেখলি না?"

আমি বললাম, "যাঃ! ভূতের হাঁটু উল্টোদিকে থাকে আর ওদের ছায়া পড়ে না।"

ছোট ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, "ইদিকে এখনো রোদ আসেনি বাবা, ছায়া দেখবে কী করে? সে যাই হোক আদিগঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাসনি। জায়গাটা ভালো নয়।"

গিজগিজ সব বাড়ি, বটগাছ তলায় যেতে হলে সারকাস করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলায় লটঘটে বারান্দায় দু'জনে গল্প করছি। ছপ করে কী একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কী সুগন্ধ ভুরভুর করতে লাগল! তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড় চিংড়ি মাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, সেই মিচ্‌কে লোকটা মিট মিট করে হাসছে। মোটা মোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলার বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, " কে? কে ওখানে?" সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোথাও নেই।

খেয়ে ফেললাম দু'জনে মিলে সব ক'টা চিংড়ি মাছ। যদি ওগুলো চিংড়ি মাছ নাও হয়, তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকে উঠানে আমগাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ। ছোট ঠাকুমা সাদা রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড় বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে, ভক্তি ভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, "ব্রহ্মদত্যিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে।"

আরও কী বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, "অমন অছেদ্দা করিস্‌নে বাছা। উনি আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বোনাশ করবেন, খুশী রাখলে আমাদের জন্য না পারেন এমন জিনিস নেই। ঐ বিদ্যে-বুদ্ধি নিয়ে বছরে বছরে পাস করে যাচ্ছিস্ সেটা কী করে সম্ভব সে-কথা কখনো ভেবেছিস ? হুঁঃ।" এই বলে ছোট ঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "তোরা বিশ্বাস না করতে পারিস কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন, আর তার বদলে একটি পয়সা আশীর্বাদী"—

আর বলা হ'ল না, কারণ সেই সময় বড় কাকা বাড়ি এলেন।

বড় কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে বললেন, "এক্ষুণি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় আর টেঁকা যাচ্ছে না। গোলাবাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।" তাই শুনে বড় কাকী এমনি চমকে গেলেন যে, হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে ফ্যাকাশে মুখে বললেন, " কিন্তু—কিন্তু—"

বড় কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, "কিছু কিন্তু নয়। এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছ'টা ষণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে। হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। নাকি ওটা চোরাচালানকারীদের গুহ্য আড়ত, মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়ী গঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে আইনী জিনিস বস্তা বস্তা পাচার করা খুব শক্ত নয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায় কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুত ঠাকুর সেজে ; এটা ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন ? দিয়েছে নালিশ করে। বড় কাকা বলেছিলেন, "লোকটাকে ধরা যায় না। ফুসফাস করে এখান দিয়ে ওখান দিয়ে গলে পালায়। কোন দোকানদারের সঙ্গে ষড়ও থাকতে পারে। শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কী রকম—মিচ্‌কে মতো, মোটা মোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল।"

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম। বটা কনুয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোক নিয়ে বড় কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট ঠাকুমা তাঁর গলায় হলদে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যাস আর ভয় নেই।

সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাসনে যেন। দুগ্‌গা দুগ্‌গা"। বড় কাকা চলে গেলে বললেন, "কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঁ!"

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়ী গঙ্গায় জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম। বটু বলল, "ঐ গোলাবাড়িটা আমার ঠাকুরদার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল, লেখাপড়া শেখেনি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছ ধরার বাই ছিল আর চীনে ব্যবসাদারদের কাছে থেকে চায়েরনেশা করেছিল। দুদিনে বাড়ির সব ঝাড়বাতি, আসবাবপত্র, রূপোর বাসন বেচেবুচে সাফ করে দিল। ওর বুড়ী মা নাকি খুচরা পয়সাকড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজেছিলেন যে, ব্যাটা সে সব খুঁজেই পায়নি। এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড় কাকা তদন্ত করতে। খুচরো টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ! সে ব্যাটা তো বিয়েই করেনি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল সুঁটকো, কালো বড় বড় কান, চাকর-চাকর চেহারা। গেঞ্জিগায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়ী গঙ্গায় মাছ ধরতো—কে! ওখানে?"

খচমচ করে তালগাছ থেকে আমগাছ, আমগাছ থেকে নড়বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচ্‌কে লোকটা হাসি-হাসি মুখ করে উঠে এসে নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "চা চা গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে।"

সত্যিই ছিল চা। দোকানের কেতলি্তে একটু চা আর একটা মাটির ভাঁড় বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে নামতেও হয়নি, ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল রোজকার মতো।

চা পেয়ে লোকটা আহলাদে আটখানা, মিচকে মুখ যেন সাত ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম, "পেঁয়াজী খাবে নাকি?"

জিব কেটে বলল, "অ্যাঁ, ছি ছি, ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজগার মতো' খেয়েই এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর, মেওয়া—"

বটু আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না। খাক না বেচারী।

মিচকে লোকটি বলল, "বড়কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে, টিকতে না পেরে ওনার এখানে গা ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্যি রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।"

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "কেন চলে যাবে? এখানে বুঝি খেতে পাও না?"

ফিক করে হেসে মিচ্‌কে লোকটা বলল, "দুবেলা নৈবিদ্যি পাই, আবার কষ্ট কিসের? ঐ এল বলে। আমি উঠি।" বলেই হাওয়া।

নীচে বড় কাকাদের রাগ রাগ গলার হাঁক-ডাক শোনা গেল। নিশ্চয় কিছু দুষ্কৃতিকারীটারি ধরতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে আদ্যিকালের তালগাছটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। পোকা ধরা, পুরানো গুঁড়ি ভেঙেচুরে একাকার। তারমধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের

হাতবাক্স, পুরানো টাকাকড়িতে তার অর্ধেক ভর্তি। আর চাঁচা-পোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা, তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড় কাকার রাগ ঠাণ্ডা।

পরদিন বড় কাকা বললেন, "আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার স্পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ী ঠাকরুণ তাহলে বাউণ্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।"

ছোট ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, "কত বাঁচিয়েছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।" ফোঁত ফোঁত করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড় কাকা তো অবাক।
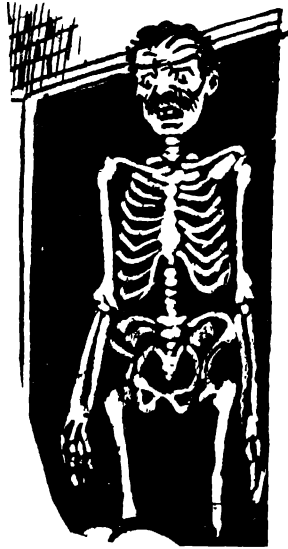
অকৃতজ্ঞ

অচিন্ত্যকুমার সেনগু

ছোট, পাড়াগেঁয়ে শহর। ঢালা মাঠ, অনেকটা দূরে-দূরে কয়েকখানা টিনের ঘর। ঘরগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে আঁকাবাঁকা মাটির রাস্তা। বিকেল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। পথে লোক-জন নেই, একটা গরুর গাড়িও চলছে না। সবে সন্ধ্যে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত।

পৃথিবী যেন ভয়ে চোখ বুজে আছে, এমনি অন্ধকার। চলেছে একটানা ধারাবাহিক বৃষ্টি— শূন্যময় শোনাচ্ছে একটা কাতর গোঙানির মত; তাতে শরীরে ঘুম না এসে আসে একটা ক্লান্তিকর বিভীষিকা। বৃষ্টির একঘেয়ে কাতরতা ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই— না বইছে জোলো হাওয়া, না ডাকছে একটা ঝিঁ-ঝিঁ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকালে বোধহয় অন্ধকারকে এমন ভয়ঙ্কর লাগত না। একটা বাজ ডাকলেও যেন কেউ কোথাও আছে বলে একটা আশ্রয় পেত। সব কিছুকে এমন একা, এমন দূর মনে হচ্ছে।

মাঠের শেষ সীমানাতেই কেশব মজুমদারের বাড়ি। তেজারতি কারবার করে কেশবের বিস্তর পয়সা। কিন্তু হলে কী হবে মনে তার সুখ নেই। তার মুখের চেহারা আজকের এই আকাশের চেয়েও ঘোরালো। তার সমস্ত বাড়িতে আজকের এই বিবর্ণ অন্ধকার যেন নিশ্বাস

বন্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক-দিন থেকেই এ-অঞ্চলটায় ডাকাতি হচ্ছিল ; উড়ো খবর এসেছে কেশবের বাড়িতেও শিগ্‌গিরই ডাকাতের পদধুলি পড়বে। কেশব দিনে-রাতে তটস্থ, যেন শুয়ে আছে সে কাঁটার বিছানায়। লাঠি-সোঁটা হাতিয়ার বন্দুক সব সে হাতের কাছে জোগাড় করে রেখেছে বটে, কিন্তু মনে তার তবু স্বস্তি নেই। চোখে একটু একটু ঘুম জড়িয়ে এলে মনে হয় গায়ে তার কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, চোখ খুলে রেখে জেগে থাকলে হয় পেছনের দেয়ালে কার যেন এই ছায়া পড়ল। তারপর আজ যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে এই যেন কারা এল, এই যেন শোনা গেল কাদের চাপা গলায় ফিস্‌ফিসানি।

বৃষ্টির আর বিরাম নেই, জলে-কাদায় রাত উঠেছে ঘোলা হয়ে।

কেশবের স্ত্রী এল তাকে অভয় দিতে, বললে, এবার শুয়ে পড়। ডাকাতদের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, জলের মধ্যে তারা বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরুবে।

কেশব বললে, হ্যাঁ, এইবার শুয়ে পড়তে হয় বৈকি কিন্তু বাইরে কে দরজাটায় ধাক্কা দিচ্ছে না?

কেশবের স্ত্রী খেঁকিয়ে উঠল, দরজায় তো নয়, তোমার মাথায় ধাক্কা দিচ্ছে!

না, না শোন কান পেতে। কে ডাকছে ?

ডাকাতরা তোমার নাম ধরে আদর করে ডাকতে যাবে, না ?

কেশব চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। ভীত, অসহিষ্ণু গলায় বললে, —আওয়াজটা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আশ্চর্য তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

স্ত্রী ধারালো গলায় কাকে ধমকে উঠল ঃ কী বুদ্ধি তোমার। ডাকাতরা তোমাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে সকাতরে অমন সাধবে কিনা। তারা হুড়-মুড় করে খিল-কপাট ভেঙে চলে আসতে পারে না? হাওয়া, ওটা হাওয়া শব্দ।

না, না, স্পষ্ট মানুষের গলা। লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে কেশব বন্দুকটা বাগিয়ে ধরল। বললে, কে?

কোন সাড়া নেই।

স্ত্রী হেসে উঠল, ডাকাতরা তাদের নাম-ধাম তোমাকে বলবে কিনা— কী বুদ্ধি।

কেশব আবার হাঁক দিল- কে?

দরজার ওপার থেকে ভিজে, মসৃণ গলায় কে বললে, আমি।

ভয়ে সমস্ত ঘরটা যেন ছোট হয়ে এল। লণ্ঠনের আলো যেন গেল কমে, দেয়ালগুলো হেঁটে কেশবের চারপাশে এল সরে, দাঁড়াল ঘন হয়ে, প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে কেশব বললে, কে— আমি কে?

আমি মণীন্দ্র।

মণীন্দ্র। কোন্ মণীন্দ্র। কেশবের গলা চিরে আওয়াজ বেরুল। ওপার থেকে রাত্রির অন্ধকার যেন কথা কয়ে উঠল—-মণীন্দ্র-মণি আপনার ভাইপো। ব্যাণ্ডেলে যে কাজ করত,

যাকে আপনি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন। দরজাটা খুলুন বাইরে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

কে, মণি? এতদিন পরে —

উৎসাহিত হয়ে কেশব দরজা খুলতে যাচ্ছিল, স্ত্রী তাকে বাধা দিল। গলা নামিয়ে বললে, কে না কে মণির নাম ভাঁড়িয়ে এসেছে। খবরদার, দরজা খুলো না বলছি, নইলে তিন-চার বছর 'যে এদিক মাড়ায়নি' সে বলা-কওয়া নেই হঠাৎ এসে দরজায় ঘা মারবে? তা এ দুর্যোগের রাতে। কী বুদ্ধি তোমার?

পাশের জানালাটার ছিটকিনি লাগানো ছিল না, মণি হঠাৎ ভিতর দিয়ে তার একখানি হাত বাড়িয়ে দিল। রোগা লিক্‌লিকে, সরু একখানি হাত। বললে, আলোটা নিয়ে আসুন, দেখুন সেই যে ছেলেবেলায় কব্জির কাছটায় কেটে গিয়েছিল সেই দাগ স্পষ্ট, অটুট আছে। খুলে দিন দরজা, জলে আর কতক্ষণ দাঁড়াব বলুন ?

আর সন্দেহ নেই। কেশব একহাতে দরজা খুললে, আরেক হাতে বন্দুকটা সে বাগিয়ে ধরেছে। বিস্ময়ে বন্দুকটা হাত থেকে খসে পড়ে আর-কি।

সত্যি-সত্যিই সামনে মণি দাঁড়িয়ে। মণি হাসিমুখে বললে, আমাকে সম্বর্ধনা করবার এই অদ্ভুত আয়োজন দেখছি যে।

লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে কেশব বললে মনে কিছু করিস নে। এদিকে আজকাল বড্ড ডাকাত পড়ছে, তাই সব সময় এমনি সাবধান হয়েই থাকি। কখন কী হয় বলা যায় না তো।

মণি বললে, তা আমি জানি। তা জেনেই তো আমি এলাম। কেশব অবাক হয়ে বললে, কোত্থেকে এলি? এত রাতে ট্রেন?

আমাদের কী, মণি তার শরীরটা বিস্তারিত করে বললে , আমরা সোজা হেঁটে চলে আসতে পারি!

মণি খিক-খিক করে হেসে উঠল ঃ সে চাকরিটা গেছে। কদিন এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করলুম। শুনলুম আপনাদের এখানে বড় বিপদ, তাই ভাবলুম একবার দেখা করে আসি।

তা বেশ করেছিস, 'স্ত্রীকে সম্বোধন করে কেশব পরে বললে, ওর কিছু খাবার যোগাড় কর চট্‌ করে?

মণি ব্যস্ত হয়ে বললে, না আমার খিদে নেই। শোবার জন্যে এখন একটা বিছানা পেলেই আমি খুশি। আপনারাও আর মিছি মিছি কেন জেগে আছেন? ঘুমোতে যান এবার। ডাকাত এলে আসবে, ভয় কী? আমি তো আছি। আমি তবে এত পথ ভেঙে এলুম কী করতে?

মণির খুড়িমা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, চাকরি খুইয়ে এখন থেকে এইখানেই তবে শেকড় গাঁথিয়ে বসবে নাকি? কাকার ভাত খুব সস্তা পেয়েছ, না?

না। মণি গম্ভীর মুখে বললে, কাল ভোরেই আবার আমি চলে যাব। ভয় নেই।

তবে একরাত থেকে তুমি কী এমন সাহসের ভোজবাজি দেখাবে শুনি ? খুড়িমা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। ডাকাতরা তো আর তোমার ফরমাস-মত আসবে না।

তবু তো একটা রাত আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারবেন, সেইটেই বা কী কম কথা? মণি কি-রকম অদ্ভুত করে হাসল। বলল, ঘুমে আমার চোখ ঢলে আসছে, শিগ্‌গীর বিছানা করে দিন। এই বাইরের ঘরটাই বা মন্দ কী। আমার কিছুতেই আর ভয় নেই।

খুড়িমা বিছানা পাততে লাগল।

কেশব মণির দিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে এত জলের মধ্যে দিয়ে এলি, তবু একফোঁটা ভিজলি না, মণি?

সঙ্গে আমার এক বন্ধু আসছিল যে, সেই-ই তো তার ছাতায় আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। মণি একলাফে বিছানায় শুয়ে পড়ল, আগাগোড়া একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে বললে, আপনারাও আর কেন মিছি মিছি জেগে আছেন? নরম ঠাণ্ডা রাত, এবার চমৎকার ঘুম আসবে। বাইরের ঘরে আমিই তো রইলাম পাহারায় — তবে কিসের ভয়?

আহা, যা ঢিঙঢিঙে চেহারা, তার বীরত্বের বহর দেখো একবার ? খুড়িমা ঠাট্টায় কণ্ঠস্বর বিকৃত করে বললেন, খাটের নীচে দুয়েকটা ইঁদুরের গর্ত আগে খুঁজে রেখো। নইলে চাকরি গেছে, প্রাণটাও যাবে আর-কি।

কাঁথার তলা থেকে মণি বোবা, বিকৃত গলায় হেসে উঠল।

বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ এসেছে মরা মুখের হাসির মত ফ্যাকাসে হয়ে।

কেশবরা তাদের ঘরে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কেমন একটা আতঙ্কিত স্তব্ধতা।

স্ত্রী বললে, ঐ লোকটাকে যে তুমি পরিপাটি করে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলে, সত্যি ও তোমার ভাইপো তো?

কেশব ভীত অথচ অবাক বিস্ময়ে বললে, বা মণিকে তুমি চেন না?

চিনি তো। কিন্তু এতদিন বাদে খুড়ো খুড়ির সঙ্গে দেখা, কাউকে প্রণাম পর্যন্ত করলে না। চেহারা, গলার স্বর অবধি কেমন হয়ে গেছে। হাত পায়ের শিরা উঠে এসেছে, খাড়া-খাড়া চুল, গালে গলায় হাড় ঠেলে— ভাল করে লোকটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলে তো?

কেশবের শিরদাঁড়াটা ভয়ে কনকন করে উঠল। অথচ মুখে সাহস এনে বললে, কী যে তুমি। চাকরি বাকরি নেই, তাই চেহারা এমন দুর্ভাবনায় খারাপ হয়ে গেছে। দেখছ না, ডাকাতের ভয়ে আমিই কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি। ও কিছু নয়।

কেশবের স্ত্রী খাটো গলায় বললে, কিন্তু এসেই একেবারে লম্বা দিল কেন? তাও মুখ চোখ ঢেকে,—এমন কী একেবারে শীত পড়েছে জিজ্ঞেস করি। তোমাকে বলছি ও মণি নয়? পাছে মণি নয় বলে চিনতে পারি তাই অমনি ঝুপ করে কাঁথার তলায় লুকিয়ে পড়ল। চল এখন ও হয়ত ঘুমিয়েছে, কাঁথার ঢাকনাটা আস্তে আস্তে তুলে চেহারাটা ওর একবার দেখে আসি।

কেশবের গা-হাত-পা শিরশির করে উঠল, বোজা গলায় বললে, আজ আর নয়, কাল ভোরে।

কাল ভোরে তো ও চলেই যাবে। যা ঘটবার তা তো আজ রাতেই—

কেশব অস্ফুট গলায় চিৎকার করে উঠল ঃ এত কথা আগে তবে বলনি কেন?

কেশবের স্ত্রী কণ্ঠস্বরকে ঝাপসা করে আনল। বললে, ও যে-ই হোক, আমার মনে হচ্ছে ও-ই ডাকাত।

'বল কী। বল কী।' অন্ধকারে শূন্য চোখ মেলে কেশব বললে ডাকাত গদিতে শুয়ে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে কেন?

ও আগে থেকে এখানে রয়েছে দলের লোকদের দরজা খুলে দিতে। তুমি দেখো আমার কথা ঠিক হয় কিনা। নইলে দেখলে না, কথায় বার্তায় একখানা ভাব দেখালো যেন আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে ডাকাতি হবে বলেই ও এসেছে, কী করে জানল ও এত কথা? আর কী বড়ফট্টাই, আমাদের উনি বাঁচাবেন। সবংশে শেষ করে দেবার মতলব।

কেশব যেন বন্দী, অসহায় একটা পশুর মত গরজে উঠল ঃ এখন কী করা যায়?

কেশবের স্ত্রী ঝামটা মেরে উঠল ঃ ঘুমুনো ছাড়া কী আর করা যাবে? সারা জীবন তো কেবল নাকে তেল দিয়েই ঘুমুলে।

কেশব দেয়ালের দিকে আরো একটু ঘন হয়ে সরে বসল। বললে তুমি বলতে চাও মণি আমার ও সর্বনাশ করবে? আমি যাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করলাম—।

মণি কি না তাই বা কে জানে। আরো কাটুক না খানিকটা রাত।

আরো খানিকটা রাত কাটল। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। বাইরের ঘরটা ঘুমে একেবারে মুছে গেছে। একটি নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে থাকতে কেশবের হালকা একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ তুমুল একটা গোলমালে তার হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে গেল। গোলমালটা যে কিসের, স্পষ্ট সে কিছু ধারণা করতে পারল না। স্তম্ভিত হয়ে একতাল মাংসের মত বসে রইল। মনে হল মরবার আগের মুহূর্তে মানুষ বুঝি এমনি স্তব্ধ হয়ে যায়।

তার গায়ে একটা ধাক্কা মেরে তার স্ত্রী বললে, শুনতে পাচ্ছ না, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

কেশব মূর্চ্ছাহতের মত বললে, কোথায়?

গোলমালটা ঠিক আক্রমণের জয়োল্লাস নয়, যেন পলাযমান কতকগুলি লোকের ভীত, কাতর আর্তনাদ। গোলমালটা বাড়ীর মধ্যে না এসে ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে। ব্যাপার কী।

কেশব সাহস পেয়ে বলে উঠল ঃ বন্দুক, আমার বন্দুক।

বন্দুকের দরকার ছিল না, চিৎকারটা তখন রাস্তা ছেড়ে মাঠে পড়েছে।

বাইরের ঘরে কেশব জানালা খুললে। বৃষ্টির পর আকাশে তখন ঘোলাটে একটু জ্যোৎস্না ফুটেছে। সেই আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল একদল লোক উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ঝোড়ো হাওয়ার চেয়েও দুর্দান্ত বেগে। একেকবার তারা পেছনে ফিরে তাকায় — কী দেখে তারা কে জানে — আবার মাঠের উপর দিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে থাকে।

ঐ এল, ঐ এল, ধরতে — সবার মুখে সেই ভয়ার্ত চিৎকার।

কেশবের স্ত্রী বললে, এত গোলমাল, রাস্তায় লোকজন জমে গেল আর তোমার বীর ভাইপোর এখনো ঘুম ভাঙল না। উনি এসেছিলেন আমাদের ধনে প্রাণে রক্ষা করতে।

কেশব খাটের কাছে এগিয়ে এসে হুঙ্কার দিলে ঃ মণি।

কাঁথাটার কোথাও এতটুকু কুঁচকালো না পর্যন্ত।

মণি।

কে কাকে ডাকছে।

কেশব এক হেঁচকা টানে কাঁথাটা তুলে ফেলল। কোথায় মণি। সমস্ত বিছানাটি তেমনি সাদা, তেমনি পরিপাটি। কোথাও একটা রেখা পর্যন্ত নেই।

কী ব্যাপার।

বাইরে এসে দেখা গেল, ডাকাত সত্যি এসেছিল। অনেক কিছুর চিহ্ন তারা ফেলে গেছে — ছোরা, শাবল, মুখোস, লোহার ছোট ছোট ডান্ডা। এমনকি একপাটি জুতো। পালাবার তাড়ায় কারুরই কোন দিশে ছিল না। কিন্তু মণি গেল কোথায়?

কেশবের স্ত্রী বললে, এই সামান্য ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না? বীটের পুলিশ কোথাও এদিকে টহল দিচ্ছিল হয়ত, তাই দেখে ডাকাতরা চোঁচা ছুটে পালিয়েছে। আর উনি তোমার মণি হচ্ছেন ডাকাতের দলের সর্দার — কী করে আর শুয়ে থাকেন বল ওদের সঙ্গে উনিও দিলেন দৌড়।

কেশব হতভম্ব হয়ে বললে, তাই হবে।

'তাই যদি না হবে তবে ও ফিরে আসত না? ডাকাত তাড়িয়ে দেবারই যদি ওর মুরোদ থাকত তবে নিজে ও সেই সঙ্গে পালিয়ে যাবে কেন।

ঠিক বলছ, নইলে ওই বা সেই সঙ্গে পালিয়ে যাবে কেন? কেশবের এতক্ষণে বুদ্ধি খেলল। পরে ঢোক গিলে বললে, কিন্তু কিছু নেবার চেষ্টা না করে দল-কে দল পগার পার হয়ে গেল, এও একটা রহস্য বটে।

রহস্য না হাতি! কেশবের স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে বলল, না পালালে দেখতে কখন তোমার ভাইপোই তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিত। দেখ না আসুক না পুলিশ, দলের সর্দারকে যখন চিনতে পেরেছি তখন আর ভাবনা নেই।

সকাল বেলা যথাসময়ে পুলিশ এল।

কেশব মণীন্দ্রের নাম ধাম জ্ঞাতি গোষ্ঠির সব পরিচয় দিয়ে হঠাৎ বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এ 'কী দারুণ অকৃতজ্ঞ ভাবুন। আমিই তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিলুম, আর সে এসেছিল আমার বুকে ছুরি বসাতে। তাকে দিলুম আশ্রয়, আর তার কিনা এই মতলব ছিল —

কেশবের স্ত্রী ঘর থেকে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল— আমি তো তখনই বলেছিলুম! ডাকাতের সর্দার! ওর দশটি বছর জেল চাই, দারোগাবাবু! হাড়ে-হাড়ে শয়তান, নইলে

কোনদিন কেউ খুড়োর বুকে ছুরি তুলতে পারে? হ্যাঁ, এ ছুরি প্রায় বুকে বসাচ্ছিল আর-কী, আর এক ইঞ্চি নামলেই সাবাড় — ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কী করলেন?

কেশব লাফিয়ে উঠল ঃ বন্দুক, আমার বন্দুক হাতে না? খপ্ করে তাই উঁচিয়ে ধরলুম? ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, মুখ থেকে মুখোস গেল খসে। স্পষ্ট দেখলুম, মণীন্দ্র। ব্যান্ডেলে সে কাজ করে আমার আপন ভাইপো। রাতে যে ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখি! তাকে চিনতে দেরি হবে কেন?

তারপর?

ছুট দিল লম্বা! যা ছিল যন্ত্রপাতি, সব গেল ফেলে। কেশব গর্বে টগ বগ্ করে উঠল ঃ বন্দুকের সঙ্গে পারবে কেন? ঘোড়াটা টিপতে গেলুম দারোগাবাবু, পারলুম না। শত হলেও তো নিজের বংশের রক্তপাত —

কেশবের স্ত্রী ঘর থেকে খেঁকিয়ে উঠল? বাবু, আমিই তো বারণ করলুম — বন্দুক ছুঁড়তে?

হ্যাঁ, কেশব মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, বলার ত আর অপেক্ষা রাখে না। ওঁর পরামর্শ শুনেই আমাকে কাজ করতে হয়।

দারোগাবাবু বললেন, কিছু নিতে পারেনি তো।

নেবে? কেশব বুক চিতিয়ে দাঁড়াল ঃ নিক না ? দেখি না কতখানি বুকের পাটা।

দারোগাবাবু যন্ত্রপাতি সব কুড়িয়ে নিলেন থানায় জমা দিতে বললেন, ওদের সহজেই ধরে ফেলতে পারব। অনেক কিছুই ক্লু পেয়ে গেলাম — এর আগে কোথাও একটা পায়ের দাগ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ বন্দুক সব বাড়িতেই তো ছিল।'

কেশব অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বললে, বন্দুক থাকলেই তো চলে না, তাকে বাগিয়ে ধরবার কায়দা জানা চাই।

দারোগাবাবু যাবার আগে বললেন, 'এ গ্যাঙ ধরাতে পারলে দেশের একটা খুব স্থায়ী উপকার করা হবে কেশববাবু। আপনার সাহস ও কৌশলকে পুরস্কৃত করতে পারলে আমরা খুশি হব। আপনার ভাইপোর খোঁজে আজই আমরা ব্যান্ডেলে লোক পাঠাচ্ছি। আর এই যে একপাটি জুতো দেখছেন তা থেকে এর মালিককে খুঁজে পেতে আমাদের দেরি হবে না।

আবার রাত এল ঘনিয়ে। আজকে আর বৃষ্টি নয়, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। দিয়েছে এলোমেলো হাওয়া।

লণ্ঠন নিবিয়ে কেশব বাইরের ঘরে তার মশারির মধ্যে এসে ঢুকল। চারিদিক ভাল করে গুঁজে সে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত। তেমনি রোগা, শিটে, লিকলিকে। আঙুলগুলি সাপের মত পিছল, আঁকাবাঁকা। আঙুলগুলি তার গলার উপর আলগোছে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

প্রাণপণে চোখ বুজে সমস্ত শরীর কঠিন করে কেশব চেঁচিয়ে উঠল ঃ কে?

মশারির বাইরে থেকে স্পষ্ট উত্তর এল ঃ আমি। চিনতে পাচ্ছেন না। এই দেখুন কব্জির দাগ।

কেশব ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল। মশারির বাইরে কারু কোন অস্তিত্বের ভাব নেই।

বন্দুক, আমার বন্দুক? কেশব ধড়মড় করে উঠে বসল। নামতে গেল খাট থেকে। মশারি তুলতে যাবে, অমনি আবার তার বুকের উপর সেই হাতটা লোলুপ হয়ে উঠল। কে বললে, আমিই আপনাকে খুন করতে এসেছিলাম? আমি খুবই অকৃতজ্ঞ না ?

স্পষ্ট, পরিচিত, রাত্রির কণ্ঠস্বর।

কিন্তু কেশব চেয়ে দেখল, ঘরে-বাইরে ঝিম ঝিম করছে শূন্যতা।

বন্দুক, আমার বন্দুক নিয়ে এস শিগগির। কেশব স্খলিত পায়ে নিচে এল, ছুটে গেল দরজার দিকে। পা দুটো নিমেষে পাথর হয়ে গেল— দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে মণি এলিয়ে বসে আছে।

একি, মণি যে। তুমি কোত্থেকে। কেশব একেবারে বসে পড়ল।

মণি নির্লিপ্ত গলায় বললে, কাল যেখান থেকে এসেছিলাম।

কী মনে করে এসেছ জিজ্ঞেস করতে পারি?

ধরা দিতে এসেছি। আপনি থাকতে পুলিশ কেন আর কষ্ট করে বলুন? পুরস্কারটা আপনারই হোক।

আহাহা, সে কী কথা? তুমি আমার ভাইপো। তোমাকে ধরিয়ে দেব কী? বস, তোমার খুড়িমাকে ডেকে আনি। কেশব ভিতরে চলে যাচ্ছিল, বন্দুক আনতে যাচ্ছেন? মণি হেসে উঠল, তার দরকার নেই। বন্দুকে আমার কিছু করতে পারবে না। বসুন, একটা কথা বলি।

কেশব কাঁপতে কাঁপতে বললে, কী?

কাল আমিই ডাকাতদের তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। আপনি আমাকে মানুষ করেছিলেন সেই কথা আমি ভুলি নি।

কিন্তু কী করে তাড়ালে? কেশব ভয়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে।

আমি ম্যাজিক জানি। মণি তেমনি অনর্গল হেসে উঠল।

ফাঁসিগাছ

প্রমথনাথ বিশী

আমাদের গ্রাম থেকে রেল ষ্টেশনে পৌঁছুবার পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটি একটি বনস্পতি, যেমন বিশাল, তেমনি প্রাচীন; আর সেটা যে কি গাছ তার পবিচয় কেউ জানতো না। এদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে তার গোত্রের মিল ছিল না। চারিদিকের বৃক্ষরাশির মধ্যে সেই বলিষ্ঠ, সমুন্নত, অজ্ঞাতকুলশীল বৃক্ষটি পাণ্ডব-সৈন্যসমাবেশের মধ্যে যেন ঘটোৎকচ। স্বভাবতই বৃক্ষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো, কিন্তু তার আরও কারণ ছিল, সেটি ছিল একটি ফাঁসি-গাছ। লোকে বলতো নবাবী আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফাঁসি দেবার জন্য গাছটি ব্যবহৃত হত। কাছেই একটি গ্রামে থাকতো নবাবের ফৌজদার ; প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা ছিল তার ; কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হলে জবাবে লোকটাকে ঝুলিয়ে দিতো গাছটির একটি ডালে। মানুষ-ঝুলিয়ে দেবার মতো ডালগুলোই বটে। গাছটির গুঁড়ি থেকে পঁচিশ ত্রিশ হাতের মধ্যে কোন ডালপালা নেই, একবারে পরিষ্কার গা, মসৃণ, তার উপরে ডাল বেরিয়ে ; এক-একটা ডাল কি লম্বা, একেবারে গ্রামান্তরে গিয়ে যেন

পৌঁছয়, এমনি থাকে থাকে সুবিন্যস্ত ডাল উঠে গিয়েছে ; যত উঁচুতে উঠেছে ততই ডালের দৈর্ঘ্য কম ; সবসুদ্ধ মিলে গাছটির উপরের দিকে ছুঁচালো—মন্দিরের আকৃতি। গাঁয়ে গোপাল বলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান কৃষাণ ছিল, সে বল্‌তো তার ঠাকুর্দা নাকি ঐ গাছে ফাঁসি দিতে দেখেছে, সেটাই ছিল নাকি ঐ গাছে শেষ ফাঁসি লটকানো। গোপালের বয়স তখন ছিল বিরানব্বই ; গোপালের কথা সত্যি হ'লে তার ঠাকুরর্দার সময় নবাবী আমলের শেষ পড়ে বটে ; আর তার মুখে এ গল্পটাও শুনেছি আমার বাল্যকালে ; কাজেই গোপালের বিরানব্বই-এর সঙ্গে আমার বয়েসের মোটা একটা অঙ্ক জুড়ে নেওয়া উচিত্।

যাইহোক শেষ ফাঁসির বর্ণনা সত্য হোক আর নাই হোক গাছটা যে ফাঁসি-গাছ ছিল তা নিঃসন্দেহ। জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে ফৌজদার-অধ্যুষিত ঐ গ্রামটির উল্লেখ আছে, আরও উল্লেখ আছে যে কাছাকাছির গাছগুলোতে ফাঁসি দেওয়া হত। তা যদি হয় এমন যোগ্য গাছটির ব্যবহার না হবার কথা নয়।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস যাক্। যা বলতে বসেছি তা হচ্ছে ঐ ইতিহাসের স্মৃতি। সেদিনের বিষাক্ত স্মৃতি আজও গাছটিকে ভয়াবহ করে রেখেছিল। কেউ পারতপক্ষে রাতের বেলায় গাছটির কাছে যেত না একা তো নয়ই। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে না গিয়েও উপায় ছিল না রেল ষ্টেশনে যাবার সড়কের ঠিক পাশেই তার অবস্থান। কত নিঃসঙ্গ পথিক যে রাতের বেলায় ওখানে এসে ভয়ে মূর্ছা গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের প্রশ্ন করলে বলতো—কি দেখলাম ? তা কি এখন মনে আছে। তবে মনে হল গাছের ডালে সারি সারি যেন মৃতদেহ ঝুলছে।

আবার কেউ বা বলতো মুমূর্ষুর অন্তিম আর্তনাদ স্পষ্ট শুনেছে। একজন বলেছিল, সে লোকটা বিদেশী—গাছের ইতিহাস জানতো না ঐ গাছতলায় পৌঁছুবামাত্র হঠাৎ একটা মৃতদেহ ধপ্ করে তার পায়ের কাছে পড়ল ; সে চমকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে যে গাছের ডালে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। প্রশ্নের খোঁচা খেয়ে সে বলল যে সেটা ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি তার ভুল করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে এসব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সত্য হতে পারে না। কেন না ফাঁসি হত বহুকাল আগে। তার সেদিনের স্মৃতি যদি কোন অলৌকিক সুড়ঙ্গ পথে আজ মূর্তি ধরে দেখা দেয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা ; যুক্তি দিয়ে প্রমাণ অপ্রমাণ করার পথ বন্ধ।

কিন্তু যুক্তি এক আর বিশ্বাস আর এক। লোকের মনের ব্যাপক বিশ্বাসই এমন তথ্যের স্থান গ্রহণ করেছিল আর তাই ছিল যথেষ্ট। ফলে ঐ গাছটা যাতায়াতের পথের পাশে ভীতিমিশ্রিত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

তারপর বয়েস বাড়লে কোলকাতায় গেলাম কলেজ পড়তে। আমাদের মেসে একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকতেন তাঁর থিওজফি চর্চার বাতিক ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসি গাছটির বিবরণ শুনিয়ে ছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন

এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে যেখানে কোন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে থাকে সেখানে পরবর্তীকালে সেই মৃত্যুদৃশ্যের ঠিক পুনরাভিনয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কেন হয় তিনি জানেন না। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মৃত্যুর সময় মানুষগুলো যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিল সেই নিদারুণ তাড়নাতেই ওখানে ঐ রকম অলৌকিক ছায়াছবি উদ্ভূত হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন।

বলা বাহুল্য এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হল না কিন্তু ও নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করিনি।

তারপরে কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম এবং চাকুরি উপলক্ষ্যে নিজের গ্রাম থেকে এক প্রকার নির্বাসিত হলাম। বহুকাল জীবনের দুটি দশক কাটলো দেশে এবং দেশান্তরে। এই সময়ের মধ্যে স্বগ্রামে যাওয়ার সুবিধে হয়ে ওঠেনি। কালক্রমে গ্রামের ছবি মনে ঝাপসা হয়ে এল। রেল ষ্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে যে সব দৃশ্য বাড়িঘর গাছপালা এমনকি মানুষের যে মুখগুলো যাতায়াতের পথের পাশে দেখতে পেতাম ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলাম, সেই সঙ্গে ফাঁসি গাছটার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

প্রায় কুড়ি বছর পরে গ্রামে চলেছি। সন্ধ্যাবেলায় নামলাম ষ্টেশনে, একখানা টমটম গাড়ি ভাড়া করলাম বারো মাইল পথ পৌঁছতে এক প্রহর রাত হবে। পথে চলতে চলতে পুরাতন ছবিগুলো জন্মান্তরের স্মৃতির মতো একে একে মনে পড়তে লাগল মনে হল, যেন ধীরে ধীরে নিজের অতীত কালের মধ্যে প্রবেশ করছি; রাত তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছি এমন সময়ে সেই ফাঁসি গাছটার কথা মনে পড়লো। ভয় হল তা সঙ্গে তো গাড়ির গাড়োয়ান আছে কৌতূহল খুব। অভিনব কিছু দেখা যায় কিনা ভেবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে নিয়ে স্থির হয়ে বসলাম। এবারে বোধকরি ফাঁসি গাছের কাছে এসে পড়েছি, রাস্তার বাঁ দিকে গাছটা। ঐ তো গাছটা! কি বিরাট! অন্ধকারের আলখাল্লা পরে যেন এক গৈরী অতিকায় পুরুষ। লোকে যে ভয় পাবে তা আর আশ্চর্য কি। আমারই সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠলো। নির্বিপাকে গাছগুলো অতিক্রম করে গেলাম। কিছুদূরে এসে গাড়োয়ান বলল, বাবু, এখান দিয়ে আগে রাতের বেলায় যাওয়া বড় কঠিন ছিল

—কেন?

—ফাঁসি-গাছটার ভয়ে।

কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠলাম, শুধোলাম—এখন বুঝি সাহস বেড়েছে?

—সাহস বাড়তে যাবে কেন? ভয়ের ব্যাপার তো আর নেই।

—গাছটার ভূত ছেড়ে গিয়েছে বুঝি?

—গাছটাই যে গিয়েছে।

—কোথায় যাবে?

—আপনি বুঝি এ পথে অনেকদিন আসেন নি। তাই জানেন না।

—কি ব্যাপার বলতো!

সে আরম্ভ করলো—বছর পাঁচেক আগে একবার বৈশাখী ঝড়ের সময়ে গাছটার মাথায়

বাজ পড়ে আগাগোড়া পুড়ে গেল। একটা বাজে যে অতবড় একটা গাছকে পুড়িয়ে আঙার করে দিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

—তারপর?

—তারপর সেই আঙার ঝড়ে-জলে ভেঙে পড়লো, ঝড়-ঝাপটায় কোথায় ছড়িয়ে গেল।

—এখন?

—এখন ও জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার—যেমন দেখলেন।

যেমন দেখলাম।

নিজের মনে মনে বললাম—আমি তো বাপু গোটা গাছটাকেই দেখেছি? অথচ তার কথাও বিশ্বাস না করা শক্ত। লোকটা মিথ্যা বলতে যাবে কেন? এ মিথ্যা বলে তার লাভ কি? এখুনি তো অপরের মুখে প্রতিবাদ হবে।

যেমন দেখলাম! কি দেখলাম! কিন্তু নিজের জাগ্রত দৃষ্টিকেই বা অবিশ্বাস করি কিভাবে? নিশ্চয় দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই। ভাবলাম, একবার ফিরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা পথ এসেছে, তাছাড়া লোকটাই বা কি ভাববে?

তবে—কি দেখলাম? ছায়া না মায়া, না কি! কিন্তু কিছু যে তা নিশ্চয়। তখন মেসের সেই থিওজফিস্ট ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। ভাবলাম, গাছের ডালে মৃত্যুদৃশ্যের পুনরাভিনয় যদি সম্ভব হয়, তবে মৃত গাছটির পুনরাভিনয়ই বা কেন অসম্ভব? তা-ই কি? আমার অভিজ্ঞতা কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু নিজে অবিশ্বাস করি কেমন করে?

অশরীরী

সুমথনাথ ঘোষ

কৌতূহল আজো যায়নি! ভূতপ্রেত, অশরীরী আত্মা বলে জগতে কিছু সত্যি সত্যি আছে কি না, অনেকের মত আমারও জানতে প্রবল ইচ্ছা জাগে মনে। তাই কোথাও কোন অলৌকিক কিছুর গন্ধ পেলেই, আগে ছুটে যাই। তবে প্রকৃত কথা বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছি। বক্তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রঙ চড়িয়ে, যে-সব কাহিনীকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বা বাস্তব ঘটনা বলে, রোমাঞ্চিত দেহ ও বিস্মিত দৃষ্টি শ্রোতাদের সামনে উল্লেখ করে বাহাদুরি নেন তার সাড়ে পনেরো আনাই দেখেছি, অপরের মুখে শোনা, নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটাও তাতে নেই।

আমি ছাড়বার পাত্র নই। সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরি, আচ্ছা এটা কি সত্যি ঘটনা?

নিশ্চয়। একেবারে নির্জলা সত্যি যাকে বলে।

আপনার জীবনে ঘটেছিল? আবার প্রশ্ন করি।

বক্তা একটু থেমে এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেন, মানে, হ্যাঁ, আমার

নিজের জীবনে না ঘটলেও, আমার শাশুড়ীর কাছে শোনা। তার মামার বাড়ি কানপুর, সেখানে যখন ঘটনাটা ঘটে, তিনি সশরীরে ছিলেন।

কেউ কেউ আবার আমার মুখে অবিশ্বাসের রেখা ফুটে উঠতে দেখে বিরক্ত হয়ে জবাব দেন, নিজের চোখে না দেখলে বুঝি সত্যি হতে নেই? অবিশ্বাস করতে হয়— এ ধারণা কোথা থেকে জন্মালো আপনার মনে?— বলে ভ্রূকুঞ্চিত করে আমায় প্রশ্ন করেন। কাল পাইকপাড়া রোডে, একটা বাড়ির বারান্দা ভেঙে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আপনি তো চোখে দেখেননি বলে ঘটনাটা সত্যি নয় বলে উড়িয়ে দেবেন?

তর্ক না করে চুপ করে যাই। মোট কথা, আমার মন ভরে না ওসব যুক্তিতে। একেবারে সোজাসুজি, যার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে ভূতপ্রেত সম্বন্ধে, এমন লোকের মুখ থেকেই শুনতে চাই। যাতে অন্ততঃ বুঝতে পারি যে সত্যি ভূতপ্রেত, অশরীরী আত্মা বলে কিছু জগতে আছে এবং মন থেকে অবিশ্বাস ও সন্দেহটা একেবারে মুছে ফেলতে পারি। দু'-চারজন এমন লোকের সাক্ষাৎ যে পাইনি, তা নয়। তবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তার মূলে আছে মানসিক বিকৃতি বা দৃষ্টির বিভ্রম বা আত্মসম্মোহন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হয়তো আরো অনেক কিছু তার নামকরণ করা যেতে পারে।

যাক গে, ওসব বাজে কথা এখন থাক। যে কথাটা আসলে আমি বলতে চাই, তা হচ্ছে, একদিন কিন্তু হঠাৎ ট্রেনে এক ভদ্রলোকের মুখে এমন এক কাহিনী শুনেছিলুম যা আমার চিন্তাজগতে সত্যি একটা বিপ্লব এনে দিয়েছিল। কিন্তু সেই এক এবং অদ্বিতীয়। ও ছাড়া তেমন আর কিছু আজো শুনিনি, তাই এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন ধারণা এখনো মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারিনি। প্রহেলিকার মধ্যে যেন রয়েছি।

ঘটনাটা এই রকম।

সে-বার বোম্বাই যাচ্ছিলুম। নাগপুর থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠলেন কামরায়। ছোট্ট ফার্স্ট ক্লাশ সেই কামরায়, আমরা শুধু দু'টি প্রাণী। কথায় কথায় আলাপ জমে উঠলো। ভদ্রলোক প্রায় চল্লিশ বছর বাংলাদেশ ছাড়া। একজন বাঙালীকে এভাবে একাকী নিজের কাছে পেয়ে নিমেষে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। বেশ হাসিখুশী মজার মানুষটি। মাথাজোড়া টাক। এককালে খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন। বয়স সত্তর পেরিয়েছে এই জানুয়ারীতে। না বললে, এখনো মুখচোখ দেখলে মনে হয় পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বড়জোর হবে। ভদ্রলোকের একটি বদ্ অভ্যাস মুহুর্মুহু চুরুট খান।

প্রথমে খুচরো মামুলী আলাপ শুরু হ'লো। যেমন—দেশ, জন্মস্থান, চাকরিবাকরি, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, নেহরু-গভর্নমেন্টের কেচ্ছা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ক্রুশ্চেভ, আইসেনহাওয়ার থেকে বাঙালীর কি ছিল আর আজ কি হয়েছে ইত্যাদি। বিলাপ ও সংলাপের পর যখন চুরুটটায় আবার অগ্নিসংযোগ করার জন্যে চুপ করলেন, আমি প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার জন্যে বললুম, আচ্ছা, আপনি যখন এখানে দীর্ঘদিন আছেন এবং ব্যবস্য-বাণিজ্য, বাড়িঘর, জমিজমা অনেক কিছু করেছেন তখন একটা খবর নিশ্চয় আমাকে বলতে পারবেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি সাগ্রহে বলে উঠলেন, বলুন, কি খবর?

আমি বললুম, আচ্ছা, একবার কিছুদিন আগে কাগজে খবর বেরিয়েছিল, আপনাদের এই নাগপুরে একটা বাড়িতে ভূতের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে— তিনটে লোককে নাকি মেরে ফেলেছে। ব্যাপাররটা কতদূর সত্যি, জানেন কিছু?

ভদ্রলোকের কপালের কয়েকটা রেখা একসঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন— কই, মনে পড়ছে না তো তেমন কিছু! তারপর চুরুটের ধোঁয়া একমুখ ছেড়ে বললেন, কি জানি! নাগপুর তো ছোট জায়গা নয়। হতে পারে অনেক কিছুই, কে আর খবর রাখে বলুন।

আমি বললুম, আচ্ছা, আপনার কি ধারণা ভূত-প্রেত বলে কিছু আছে— আপনি বিশ্বাস করেন?

চুরুটটা মুখ থেকে টেনে নিয়ে ভদ্রলোক আমার চোখের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মুহূর্তকয়েক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, সত্যি কথা বলতে কি, একদিন ছিল যখন একেবারেই বিশ্বাস করতুম না। তবে, একটা ঘটনা আমার জীবনে যা ঘটেছে, তারপর আর 'না' বলতে সাহস পাই না।

কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠলো। বললুম, কি রকম?

সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী মশাই, শুনলে আপনিও হয়তো ঠাট্টা করবেন, লোকটার মাথা খারাপ নাকি? কিন্তু সত্যি আমার জীবনে যা ঘটেছিল যাকে প্রত্যক্ষ করেছি, কেমন করে 'কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিই, বলুন তো?

প্রত্যক্ষ করেছেন?

হ্যাঁ। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়লো। রাত তখন অনেক। বোধহয় বারোটার কাছাকাছি। গাড়ি ছুটছে উন্মত্ত বেগে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, শুধু জমাট গাঢ় অন্ধকার, আর দু'পাশে— পাহাড় বনজঙ্গলের ঠেসাঠেসি। ঠিক মনে নেই, সেদিনটা বোধহয় অমাবস্যা ছিল।

যা হোক, ভদ্রলোককে চিন্তামগ্ন দেখে বললুম, আপনার জীবনে ঘটেছিল, বলেন কি?

হ্যাঁ। বলেই তিনি এমনভাবে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন, যেন কথাটা আমার কাছে বলা উচিত হবে কিনা তাই ভাবছেন আতঙ্কে।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাঁর কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম, এই নাগপুরেই কি ঘটেছিল?

না।—বলেই তিনি যেন ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেন। কি একটা মর্মান্তিক কথা যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

চোখ দুটো আস্তে আস্তে আমার চোখের ওপর রেখে তিনি বললেন, যাদুকর নরপতির নাম শুনেছেন?

আরে বাপ! তিনি তো মস্ত বড় ম্যাজিসিয়ান ছিলেন। একবার সরস্বতী পুজোর সময় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে তাঁর খেলা দেখতে গিয়েছিলুম। দুটি ছোকরা আমার সামনে অজ্ঞান হয়ে গেল, যখন তিনি একটা মেয়েকে স্টেজের ওপর কেটে দু'ভাগ করে আবার জুড়ে দিলেন।

অশরীরী

ভদ্রলোক বললেন, শেষদিকে নরপতি ভূতের খেলায় খুব নাম করেছিলেন। শুনেছি, বিলেত-আমেরিকায় নাকি বহু লোক তাঁর এই খেলা দেখতে দেখতে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে সীট থেকে পড়ে গেছে। এমন দিন ছিল না, যেদিন অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়নি।— বলে সহসা নীরব হয়ে যেন কি ভাবতে লাগলেন। নিঃশব্দে চুরুটটা যে তাঁর আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে, সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

বোম্বাই মেল্ ছুটছিল। হঠাৎ একটা বড় জংশন ষ্টেশনের মুখে ঢোকবার আগে ঝনঝন করে লাইনে কি একটা শব্দ হতেই তাঁর চমক ভাঙলো। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি শুরু করলেন, এই নরপতি ছিল আমার একেবারে বাল্যবন্ধু, যাকে বলে ল্যাংটো বেলার ইয়ার। গ্রামের পাঠশালে, স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলুম; তারপর কার্যোপলক্ষে দু'জনের জীবন দু'পথে বেঁকে গেলেও, অন্ততঃ বছরে একবার ৺বিজয়াদশমীর প্রীতি-আলিঙ্গন জানিয়ে চিঠি দিতে কখনো তার ভুল হ'তো না। তা যেখানেই থাকুক— বিলেত, আমেরিকা বা কলকাতায়। এত টাকা, এত নামযশ, এত বড়লোক হয়েছিল, কিন্তু তা বলে বাল্যবন্ধুকে কোনদিন ভোলেনি বা কৃপার চোখেও দেখেনি।

একবার নাগপুরে খেলা দেখাতে এসেছিল। গভর্নমেন্ট-আতিথ্য গ্রহণ না করে, সোজা আমার বাড়িতে এসে উঠলো। ওঃ, তা নিয়ে শহরে কী চাঞ্চল্য। ওই যা, ভুলে গেছি।

হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলুম।—বলে, ভদ্রলোক আবার ফিরে এলেন পূর্বের আলোচনায়। সে-বার ৺বিজয়ার পরদিন আপিসে বসে কাজ করছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। ট্রাঙ্ককল্ ফ্রম বোম্বে।

হ্যাল্লো!— বলে তাড়াতাড়ি ফোনটা কানে তুলতেই উত্তর এলো ঃ জগদীশ, তুই? আমি যাদুকর নরপতি বলছি।

হ্যাঁ, কি খবর? হঠাৎ ট্রাঙ্ককল্ যে!

খবর সব ভাল। আর একটু পরেই আমার জাহাজ ছাড়বে বোম্বে থেকে। এবার খেলা দেখাতে যাচ্ছি জাভায়। তাই ৺বিজয়ার প্রীতিভালবাসা ও আলিঙ্গন জানাচ্ছি। বলে, একটু থেমে কেমন অদ্ভুত কণ্ঠে যেন আবার সে বললে, ভাই, বোধ হয় এই শেষ বিজয়া আমার জীবনে, তাই চিঠিতে না জানিয়ে নিজে মুখে জানিয়ে যাচ্ছি।

কি যা-তা অমঙ্গলের কথা বলছিস— বিদেশযাত্রার আগে! যত বুড়ো হচ্ছিস, তোর যেন ছেলেমানুষি বাড়ছে! বলে, মৃদু তিরস্কার করে সেই সঙ্গে আমিও তাকে ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানালুম।

সে বললে, সত্যি বলছি ভাই, এবার মনে কেমন যেন ভয় হচ্ছে। হয়তো আর ফিরবো না। জানিস, তারা আমাকে মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছে।

কারা? চমকে উঠলুম। যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'লো আমার সামনে।

যাদুকরের গলাটা নিমেষে আর একটু কেঁপে উঠলো। বললে, যে-সব অশরীরী আত্মাদের নিয়ে খেলা দেখাই, তাদের দলপতি। তুই হয়তো ভাবছিস ঠাট্টা করছি, ষ্টেজের ওপর কৃত্রিম সিয়াস্ বসিয়ে কল্পিত ভূত-প্রেত আমদানি করে লোক ঠকিয়ে যে এতদিন খাচ্ছে,

আজ তার মুখে এ কি কথা!

হ্যাঁ, আজ সেই কথাটাই তোকে বলে যেতে চাই, যা আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী জানে না। হয়তো আর জানবেও না। বলে, সে শুরু করলে, জানিস ইদানিং ভূতের খেলা দেখাতে দেখাতে মনে হ'তো যেন সত্যিকারের কতকগুলি বিকট ছায়ামূর্তি আমার আশেপাশে ঘুরছে। গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু একদিন অন্ধকার ষ্টেজের ওপর থেকে দেখি এক বিকটাকৃতি ছায়ামূর্তি উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আতঙ্কে ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠলুম। দর্শকরা কিন্তু তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে আমায় সংবর্ধনা জানালো। সবাই ধন্যি ধন্যি করতে লাগল সেদিনের খেলার। আমি একেবারে চুপ। ভেতরে ঠকঠক করে কাঁপছি। কাউকে কিছু বল্লুনি।

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, কে যেন আমায় বলছে, সাবধান, ভূত-প্রেত নিয়ে রঙ্গরস করে, লোকের সামনে অশরীরী আত্মাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মজা একদিন টের পাইয়ে দেবো। এখনো যদি ভাল চাও তো ও আত্মঘাতী খেলা বন্ধ কর। নইলে তোমার জীবন-সঙ্কট ঘটবে বলে দিচ্ছি।

পরের দিন কিন্তু আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। ষ্টেজের ওপর ভুয়ো 'মিডিয়ম্' নিয়ে কৃত্রিম 'সিয়াস্' যেমন প্রতিদিন বসাই, সেদিনও তেমনি বসিয়েছি, এমন সময় দেখি আমার সেই মিডিয়ম ছোকরাটি সত্যি অচৈতন্য হয়ে পড়েছে অথচ তার হাত লিখে চলেছে টেবিলের ওপর সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে সহসা তার হাতটা থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ খুলে চাইলে। আমি তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কি? সে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠেছে, এমনিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কিছু নয় তো। আমি কাগজখানা নিয়ে তখন পকেটে পুরে রাখলুম। নিজের ঘরে এসে দেখি— লেখা, সাবধান, আবার বলছি, এখনো সাবধান। বন্ধ করে দে এ খেলা! ইতি—তারানাথ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।

সবে এই কথাটা উচ্চারণ করেছে নরপতি, অমনি যেন কে জোর করে টেলিফোনটা কেটে দিলে। হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, বলে অনেক ডাকাডাকি করেও আর কোন সাড়া পেলুম না।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক কেমন এক রহস্যভরা দৃষ্টিতে আমার মুখের ওপর তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম, তারানাথ তান্ত্রিক? ও লোকটা একেবারে বাজে 'বোগাস্' ছিল। পিশাচসিদ্ধ না হাতি! যখন জীবিত ছিল একবার আমি বিভূতি বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে গিয়েছিলুম তাকে দেখতে। ওঃ, সে কি এখানে! হাওড়া জেলার কোন এক অজ-পল্লীগ্রামে মার্টিন কোম্পানীর রেল থেকে নেমে ডাহা আড়াই ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বললে বিশ্বাস করবেন না, এত কষ্ট সব জলে গেল। ওখানকার লোকেরা দেখলুম ভয় করে, পিশাচ-সিদ্ধ তান্ত্রিকের নম উল্লেখ করতে গেলেই আগে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। আমাদের কিন্তু মনে হ'লো লোকটা একেবারে বাজে 'বোগাস্'।

'বোগাস্' কথাটা বলা শেষ হয়নি তখনো, অমনি দপ করে গাড়ির আলোটা নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো, এ কি! আলো নেভালো কে?

আমি হেসে জবাব দিলুম, কে আবার নেভাবে? 'ফিউজ' হয়ে গেল। পরের ষ্টেশনে

গাড়ি থামলে গার্ডকে বলে ঠিক করিয়ে নেবো। বলেই আবার ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলুম, হ্যাঁ, তারপর কি হ'লো?

কি আর হবে! মাস তিনেক আর কোন খবর নেই। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটা সংবাদ বেরিয়েছে— "জাভার বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শনকালে যাদুকর নরপতি অকস্মাৎ ষ্টেজের ওপর থেকে অজ্ঞান হয়ে নীচে পড়ে যান। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, খেলা দেখাবার সময় সত্যিকারের প্রেতাত্মা তাঁকে এইভাবে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এই সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং একাধিক্রমে দু'মাস ধ'রে একই রঙ্গ-মঞ্চে 'ফুল হাউস' চলে।"

আমি একটু হেসে বললুম, ওকে বলে 'বিজনেস স্টান্ট'— ব্যবসা জমাবার ফন্দি। কী চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধি দেখেছেন যাদুকরের!

ভদ্রলোক এবার চটে উঠলেন, চুপ করুন মশায়। আগে সব শুনুন, তারপর লাফাবেন। পরদিন তাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার জীবন তিনি রক্ষা করেছেন।

এর ঠিক পনরো দিন পরে নরপতির এক চিঠি পেলুম, সেদিন আমার কথা শুনে ঠাট্টা মনে করেছিলি, কিন্তু খুব জোর বেঁচে গেছি। তারানাথ তান্ত্রিক পিশাচসিদ্ধ, সাংঘাতিক শত্রুতা শুরু করেছে। জানি না, কপালে কি আছে। হয়তো এই শেষ চিঠি আমার তোকে।

একটু থেমে ভদ্রলোক এবার চুরুটটা জ্বেলে নিলেন। নিভে গিয়েছিল। তারপর বারকতক টান দিয়ে আবার বললেন, এর কিছুদিন পরে, বেশ মনে আছে সে-দিনটা ছিল কিসের ছুটি, আপিস-আদালত সব বন্ধ। আমি একাই আপিসঘরে বসে কাজ করছি। জরুরী কাজ। পরদিন ইন্‌কামট্যাক্সের হিসাবনিকাশ দাখিল করতে হবে। হঠাৎ দারোয়ান এসে খবর দিলে, এক ছোক্‌রী আব্‌সে ভেট্ করনে মাঙ্গতা।

মুখটা কাগজ থেকে না তুলেই জবাব দিলুম, আজ নেহি হোগা, কাল আনে বলো।

একটু বাদে ঘুরে এসে দারোয়ান আমার হাতে একটা ছোট্ট কাগজের স্লিপ দিলে, তাতে লেখা—শ্রী লীনা চ্যাটার্জী—ফ্রম্ তারানাথ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।

আরে, তারানাথ তান্ত্রিক তো মরে ভূত হয়ে গেছে কবে! তার কাছ থেকে আসছে? ব্যাপার কি! কৌতূহল হ'লো। দারোয়ানকে বললুম তাকে পাঠিয়ে দিতে।

একটু পরেই সেই মেয়েটি এসে ঢুকলো ঘরে। ধবধবে রঙ কিন্তু ফর্সা বলা চলে না, যেন বিবর্ণ। বয়েস চৌদ্দও হতে পারে আবার চব্বিশও অসম্ভব নয়। ক্ষয়া, ঘষা, অপুষ্ট চেহারা, মুখ, চোখ, নাক সবই আছে, অথচ কোনটাই ঠিক-ঠিকমত নয়। মাথার চুলগুলো কটা, অস্বাভাবিক রকমের লাল্‌চে। কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বসলো আমার সামনে, মুখোমুখি টেবিলের ওপরে। বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে তার আপাদমস্তক একবার বুলিয়ে নিয়ে বললুম, আপনার নাম লীনা চ্যাটার্জী?

মেয়েটি জবাব দিলে, হ্যাঁ। তার গলার স্বরটা মোটেই মেয়েদের মত নরম নয়। কেমন

যেন ভারী-ভারী, মোটা কর্কশ। বললুম, কি দরকার আমার সঙ্গে?

মেয়েটি ছোট্ট একটা খামেমোড়া চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, তারানাথ তান্ত্রিক এই চিঠিটা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি বললুম, তিনি তো মারা গেছেন অনকেদিন। এ চিঠি আপনার কাছে কি করে এলো?

মেয়েটি বললে, আমি তাঁর মিডিয়ম্—তাঁর আত্মা আমার দেহটা অধিকার করে নিয়ে আমার হাত দিয়ে তাঁর যা বক্তব্য লেখায়। যন্ত্রস্বরূপ আমার হাতটা শুধু তিনি ব্যবহার করেন মাত্র। কি লিখি, কেন লিখি, কিছুই আমি জানি না। স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু আমার হাত কাজ করে যায়।

চিঠিটা হাতে করে আমি বললুম, আচ্ছা, আমার নাম-ঠিকানা এসব তিনি পেলেন কোথায়?

মেয়েটি অদ্ভুত এক ধরনের হাসি হেসে উঠলো। তিনি পিশাচসিদ্ধ, পৃথিবীর যেখানে যে মানুষ থাকুক, তার নাম-ঠিকানা জানতে তাঁর কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে মাত্র। আচ্ছা, নমস্কার। বলেই মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যেতে আমি খামটা ছিঁড়ে চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলুম। ছোট্ট চিঠি, মাত্র তিনটি লাইন, পেন্সিলে লেখাঃ তোমার বন্ধু ভেবেছে কি? জগতের সামনে আমাদের নিয়ে এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কত করবে? সেদিন একটা আছাড় মেরেছিলুম। তাতেও শিক্ষা হয়নি। আজ থেকে সাতদিন সময় দিলুম, যদি এই খেলা বন্ধ না করে তা হলে আর আমি ঠেকাতে পারবো না তার মৃত্যুকে। সবাই ক্ষেপে উঠেছে।

ইতি— তারানাথ তান্ত্রিক।

ভদ্রলোক এই বলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হু হু করে ছুটে চলেছে ট্রেন। বাইরে যেমন অন্ধকার গাড়ির ভেতরটায় যেন তার চেয়েও বেশি।

আমি তখন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিলুম না। বললুম, তারপর কি হ'লো?

ভদ্রলোক বললেন, তারপর আর কি! কোন্ দেশে,কোথায় নরপতি খেলা দেখাচ্ছে জানি না, তবু একখানা চিঠি ও একটা তার দিলুম ভৌতিক খেলা দেখাতে নিষেধ করে। জানি না সে চিঠি ওর কাছে পৌঁছেছিল কি না। কারণ, ঠিক তার সাতদিন পরে কাগজে যাদুকর নরপতির মৃত্যুসংবাদ দেখে একেবারে আঁতকে উঠেছিলুম। সংবাদ বেরিয়েছে, ভৌতিক-ক্রীড়া প্রদর্শনকালে অকস্মাৎ হার্টফেল করায় যাদুকরের মৃত্যু হয় ষ্টেজের ওপর।

আমি বললুম, বলেন কি!

ভদ্রলোক বিষণ্নসুরে বললেন, এর পরেও আপনি বিশ্বাস করতে বলেন অশরীরী আত্মা বলে কিছু নেই, ভূত-প্রেত সব মিথ্যা?

ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করেছিলুম কি না জোর করে বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ-না কোন উত্তর না দিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে যে তাকিয়েছিলুম, তা বেশ মনে আছে।

দিন-দুপুরে

বুদ্ধদেব বসু

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্রাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড়্ চড়্ করে ফুটছে আলপিনের মতো। ঐ এতোক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আস্তে আস্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্রামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হয়ে ছোট একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'আপনি কি ডাক্তার?'

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?'

খুব অবাক হলুম, একটু যেন খুশীও—'কী করে বুঝলে?'

'ঐ যে আপনার পকেটে বুক দেখার যন্ত্র। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন?'

মেয়েটি এমন ভাবে কথাটা বললো যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কি অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দারুণ রোদ্দুরে আবার হয়তো পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা গলায় কাতর ভাবে আবার বললো, 'চলুন না, যাবেন?'

ও সব কথায় কান না দিয়ে ট্রামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলাম না। ট্রামটা মোড় ঘুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটর ঘটর করতে করতে বেরিয়ে গেল।

'কোথায় তোমার বাড়ি?'

'চেতলায়—এই কাছেই।'

'কী হয়েছে তোমার মা-র?'

'কী হয়েছে, জানি না তো। বড় অসুখ।'

'কদ্দিন অসুখ?'

'অনেক দিন। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন তো?'

মেয়েটির ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হলো। ভাবলুম যাই না, দেখে আসি ব্যাপারটা।

'ডাক্তারবাবু, আপনাকে তো টাকা দিতে পারবো না'—মেয়েটি আরো কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেল।

'আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্য ভেবো না', আমি তাড়াতাড়ি বললুম।

নতুন পাশ করে বেরিয়েছি, আত্মীয় বন্ধুমহলে ডাক-খোঁজ পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশ টাকা যে মাসে পাই, সেই মাসেই খুব খুশী। এই তো বন্ধুর ছেলের নিরানব্বুই বুঝি জ্বর হয়েছে. ট্রামের পয়সা খরচ করে এসে তার প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে এতক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরছিলুম। তবু এই মেয়েটি যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনলো।

হেঁটে চললুম মেয়েটির সঙ্গে কালীঘাট পুলের দিকে । জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার মাকে আর কোন ডাক্তার দেখেননি?'

'ডাক্তার? না। মা বলেন, ডাক্তার দিয়ে কি হবে, এমনিই আমি ভালো হয়ে যাবো। টাকা পাবো কোথায়—'

'তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে? আর কেউ নেই তোমার বাড়িতে?'

'নাঃ, কে আর থাকবে? এক দাদা ছিল আমার, সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেলে কাটা পড়লো। সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা—এর মধ্যেকেন অসুখ করলো মা-র ? ডাক্তারবাবু মা কদ্দিনে ভালো হবেন?'

আমি ডাক্তারি ধরনে হেসে বললুম, 'সে এখন কি করে বলি?'

'ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হয়ে আছেন—একবার চোখ মেলে তাকান না। দেখুন বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এতদূরে এসেছি, যদি কোন

ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার ওপর কোন ডাক্তার দয়া করেন। ঐ তো সব ঔষুধের দোকান, ভেতরে পাতলুন পরা ডাক্তাররা বসে—আমার তো সাহস হয় না ভেতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক ওদিক কেবলই ঘুরছি, এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হল আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ি। কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা—ছি,ছি, এটা কী বললুম, আপনারা কেন গরীবের বাড়িতে খেতে আসবেন? ডাক্তারবাবু, আপনার দয়া আমি কোনদিন ভুলবো না।'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'কিছু না। চলো।'

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালীঘাট পুল পর্যন্ত আসতে আসতেই মনে হতে লাগলো এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কতো গরীব দুঃখী আছে। বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে, না খেয়ে তাদের সবার উপকার করতে গেলে নিজেরই—

পুল থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলুম, 'আর কতদূর?'

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মেয়েটি বললে, 'এই তো—আর একটুখানি। আমার পয়সা নেই, তা হলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ি করে নিতুম। ওঃ, কত কষ্ট হল আপনার।'

'বাঃ এইটুকু হাঁটতে পারবো না?'

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনদিন আর আসিনি। সত্য বলতে, জায়গাটা ঠিক কলকাতাই নয়। একেবারেই পাড়া গাঁ, পুকুর, বন-জঙ্গল, কিছু পাকা বাড়ি, কিছু বা খড়ের ঘর। একটা অতি জীর্ণ শ্যাওলা ধরা, চুন বালি খসে পড়া একতলা পাকা বাড়ির সামনে মেয়েটি এসে বললো, 'এই।'

ভিতরে ঢুকে দেখি, মেঝের উপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছে। চোখ তার আধো বোজা। খানিক পর-পর নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলে, 'মা মা।'

কোন জবাব এলো না।

'মা মা, তোমার জন্য ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে দেখো। মা, এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভালো করবেন।'

চোখ দুটো একবার পলকের জন্য খুলেই আবার বুজে এলো, একখানা হাত বুঝি একটু ওঠাবার চেষ্টা করলো, অস্ফুট একটু আওয়াজ হয়তো বেরুলো গলা দিয়ে।

মেয়েটি বললো, 'ডাক্তারবাবু, ভালো করে দেখুন, মাকে আজই ভালো করে দিন।'

কিছু দেখবার ছিল না। আর একটু পরেই নাভিশ্বাস শুরু হবে। তবু আমরা সব সময় একবার শেষ চেষ্টা করে থাকি।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি।'

মেয়েটি বললো, 'ডাক্তারবাবু, আপনি আবার আসবেন তো? আমার মা ভালো হবেন

তো?'

'এক্ষুণি আসছি ওষুধ নিয়ে,' বলে আমি বেরিয়ে গেলুম।

ফেরবার সময় রাস্তাটা বোধ হয় একটু গোলমাল হয়েছিল। একটু ঘুর পথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। রোদ্দুরে ছুটোছুটি করে তখন আমি কানে পি পি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাক্তারের নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার তখন সময় নয়। ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিল না, কে জানে গিয়ে কি দেখবো। দরজাটা খোলা দেখে ঢুকলুম, কিন্তু ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম? না, ঐ তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, ঐ সুপারি গাছ। দেড় ঘন্টা আগে এই ঘরটাতেই তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু মেয়েটি কোথায় তার মুমূর্ষু মা-ই বা কোথায় গেল? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য খুব কমই ছিল, কিন্তু যে ক'টা ছিল , সে ক'টাই বা কোথায়?

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই মারা গেল, আর ওর মাকে নিয়ে চলে গেল কেওড়াতলাতে? এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে হতে পারে? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য কমই ছিল, একটা লণ্ঠন, দু'একটা থালা-বাটি, সেগুলো...?

আস্তে আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল...মনের ভুল? এই রোদ্দুরে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেলো? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে, আমার পকেটে ইনজেকশন, সব ঠিক আছে—নাকি আমি ভুল করে অন্য বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। মাথার উপরে যে আগুন ঝরছে সে খেয়ালও নেই। চারদিকে ছবির মত সব চুপচাপ। হঠাৎ দেখি টাকপড়া একটি আধ-বয়সী লোক আমার পাশে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। কোনখানে কেউ ছিল না, হঠাৎ কি লোকটা মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো? তার দিকে তাকাতেই সে, বললো, 'কি মশাই বাড়িখানা কিনবেন নাকি?'

'আপনার বাড়ি বুঝি?'

লোকটা ঠোঁট উলটিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, আইনত আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে? কোথাকার এক বিধবা পিসী, জন্মে দুবার চোখে দেখিনি মশাই—সংসারে কেউ কোনখানে নেই। আইনের প্যাঁচে ঘুরতে ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়ল আমারই ঘাড়ে, আর বলেন কেন,এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ। পিসে টেঁসলেন তিরিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেলে কাটা পড়লো। পিসী যখন স্বগ্গে গেলেন, ভাবলুম ভালই হলো। একটা মেয়ে ছিল—' হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম সুরে লোকটা বললো, ' ওসব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।'

আমি কথা বলার জন্য হাঁ করলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার আগেই লোকটা বলে চললো, 'ঐ তো এক ফোঁটা বারো বছরের মেয়ে, তা মা-টা যেদিন অক্কা পেল, পরদিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়লো। একখানাই শাড়ি ছিল পরনে, সেটা

দিয়ে কর্ম সারলো। কী ডেঁপো মেয়ে মশাই! থাকলে আমরা একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দিতুম। বাড়িখানা ছিল তিন পুরুষের, এক রকম চলে যেতো। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা মশাই—হ্যাঁ, ভূত না হাতি! আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন, এসব কথায় কি কান দিতে আছে? নিতে চান তো বাড়িটা খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা। আচ্ছা, হরে দরে চারশোই দেবেন, যান। জলের দরে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইল, আপনি ইচ্ছে মতো বাড়ি তৈরী করে নেবেন।'

অতি ক্ষীণস্বরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ক'দিনের কথা এটা?'

'কোন্‌টা? এই পিসীর ... তা দু'বছর হবে। পিসীর জন্য কোন ভাবনা ছিল না মশাই, মেয়েটার জন্য বাড়িটার এমন বদনাম হয়েছে যে, পাঁচ টাকাতেও কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো গুণতে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারি নে, উগরাতেও পারি নে। আমি গরীব মানুষ। আমার ওপরে এ জুলুম কেন? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়। রোজ রোজ এসে যে তদ্বির করবো তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে। আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন... বলুন না।'

ডাক্তারের সাহস

প্রবোধ কুমার সান্যাল

বরাহনগর জায়গাটার নাম সকলেই জানে। কলকাতার উত্তরে মাইল দুয়েক গেলেই বরাহনগর। আজকাল শ্যামবাজার থেকে মোটর-বাসে যাওয়া যায়—আগে যেতে হোত হেঁটে কিংবা 'শেয়ারের' গাড়িতে। শেয়ারের গাড়ী ছাড়ত কোম্পানীর বাগানের মোড় থেকে, এক-একজনের চার আনা ভাড়া। কলকাতায় যাতায়াত করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বরাহনগরের বড় রাস্তার দুধারে তখন কল-কারখানা, মুটে-মজুর, দোকান-বাজার, পাট আর ভূষিমালের আড়ৎ—এই সব ভীড় ছিল বেশী। এদের ধারে ধারে শ্রমিকদের বস্তিগুলো দেখা যেত! দিনের বেলায় পথে শোরগোল, হৈ চৈ, গরুর গাড়ীর দল, জন-মজুরের হল্লা, মালগাড়ীর আমদানি-রপ্তানি, এমন কি মারামারি পর্যন্ত লেগেই থাকত। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই তাদের আর চিহ্ন পর্যন্ত থাকত না। পথ হয়ে যেত নির্জন মরুভূমি, রাতের বেলা সে পথে হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না; মাঝে মাঝে এক-আধটা কুকুর কেবল ডাকতে ডাকতে চ'লে যেত। অনেক অসতর্ক পথিক নাকি অনেকদিন রাতে এই পথে গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত

হয়েছে।

ভদ্রলাক কয়েকজন যে পাড়ায় থাকতেন, সে পাড়াটা গঙ্গার কাছাকাছি। তাঁরা স্টীমারে কলকাতায় আনাগোনা করতেন। সকালের দিকে বেরোতেন,আবার ফিরে আসতেন দিনের আলো থাকতে। তার একটা কারণ ছিল। যে পথটা দিয়ে তাঁরা পাঁড়ার ভিতরে ঢুকতেন, সেই পথের দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরানো বাড়ি অনেকদিন পড়েছিল এবং বাড়ীর ধার দিয়ে সন্ধ্যার পরে হেঁটে যাওয়া তাঁরা উচিত মনে করতেন না। বাড়ীটা এখানকার পূর্বকালের জমিদার বংশের। এখন সে জমিদারও নেই, তাদের আগেকার ঐশ্চর্যও নেই—কেউ মরে গেছে, কেউ গেছে ছেড়ে। কিন্তু এই অট্টালিকা এখনো তার ভগ্ন দেহ নিয়ে অতীতকালের স্থবির প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ীটা জনহীন, নানা আগাছায় পরিপূর্ণ বাদুড় আর চামচিকের বাসা, শেয়াল আর সাপের অবাধ লীলাভূমি। শুধু তাই নয়, লোকের বিশ্বাস এ বাড়ীতে নাকি কোনো কোনো গভীর রাত্রে মানুষের কান্না শোনা যায়। আগেকার সেই জমিদারের দুইটি মেয়ে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ এ বাড়ীর অন্দর-মহলে ভূত আছে।

ভূতের কথা শুনলে আর রক্ষা নেই। ভগবানের চেয়ে ভূতকে ও-পাড়ার লোক বেশী মানে আর ভয় করে। সুতরাং অন্ধকার হ'লে ও-পথ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

কিন্তু চাটুয্যেদের জামাই এ-সব আজগুবি কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি নতুন ডাক্তারি পাশ করেছেন। কুস্তী-করা দেহ, বিশাল তাঁর বুকের ছাতি, শিলং পাহাড় থেকে সেদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার করে এনেছেন। তাঁর ভয়ানক সাহস। ভূতটুত তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বড়দিন উপলক্ষে তিনি শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে এসেছেন। এ-পাড়ার সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, সবাই তাকে ডাক্তার বলে ডাকে।

ছেলে -ছোক্‌রাদের দলে তাঁর নাম ডাক খুব। ক'দিন ভূতের বাড়ীর আলোচনায় তিনি উৎসাহভরে বললেন—যদি একটা রাত আমি ও-বাড়ীতে কাটিয়ে আসতে পারি, তা'হলে তোমরা আমাকে কি খাওয়াবে?

ছেলেরা অবাক হ'য়ে বললে,—একটা রাত? আপনি বলেন কি ডাক্তারবাবু? দু'ঘন্টার বেশী যদি আপনি থাকতে পারেন, তবে কি বলেছি।

ডাক্তাব প্রথমটা হেসেই অস্থির। তারপর বললেন—কত বাজি ধরবে বলো।

ছেলেরা বললে—বাজি? আপনি যা চাইবেন ফিরে এলে পাবেন।

—আচ্ছা সেই ভালো।

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হোল না। পাড়ার বিজ্ঞ লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বললেন—অল্প বয়সে আমরা জল চিবিয়ে খেয়েছি কিন্তু ভূতকে মেনেছি চিরকাল। তুমি ও-বাড়ীতে যেয়ো না বাবা। একটা ভালো মন্দ ঘট্‌লে তখন—

ডাক্তার হেসে বললেন—আমাদের জাতের অবনতির একটা কারণ আমাদের ভূতেব

ভয়।

—আমাদের কথা তবে শুনবে না?

—আজ্ঞে না।

শ্বশুরবাড়ীর সকলে কান্নাকাটি ক'রে অস্থির। এমন সর্বনেশে ডাকাত-জামাই তাদের না হোলেই ভালো ছিল। ডাক্তার বললেন—আমাকে যদি আপনারা বাধা দেন, তা'হলে ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

শাশুড়ী বললে—বাঁচলে তো সম্পর্ক! সম্পর্ক যাক্ বাবা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকো।

ডাক্তার কোনো কথা শুনলেন না। তাঁর বন্দুক আছে, কুকুর আছে, দেহে অপরিসীম শক্তি আছে—তাঁর ভয় কী? সকলের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

সে-দিন ছিল অমাবস্যা। ডাক্তার কোটপ্যান্ট প'রে বন্দুক লাঠিসোটা হাতে নিয়ে টর্চটা পরীক্ষা ক'রে হেসে বললেন— রেডি।

রাত তখন দশটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিসোটা হাতে নিয়ে শোরগোল ক'রে একবার সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার ভিতরে তন্ন তন্ন করে দেখে এল। শীতের দিন, সুতরাং বিছানা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দিয়ে আসা হোলো। বড় একটা ঘড়ি রইল টেবিলের ওপর; একটা জলের কুঁজো আর কাচের গেলাস, একটা গেলাস, একটা লাঠি। এবং বলা বাহুল্য, কারবাইডের একটা উজ্জ্বল আলো। টমী—চিরবিশ্বস্ত টমী ছিল সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা প্রকাণ্ড, বাঘ শিকার করতে সাহায্য করে।

দশটার পরে একসঙ্গে সবাই বিদায় নিলে। তারা তখন এই বাড়ীর ভয়ানক অন্ধকার গহ্বর থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কেউ আর কোনদিকে তাকাতে সাহস করলে না—পাছে কিছু বিভীষিকা চোখে পড়ে যায়. ডাক্তার যে একা এই জনহীন অন্ধকার প্রাসাদের মধ্যে নির্বাসিত হ'য়ে রইলেন। এবং তাঁর ভাগ্যে যে কিছু একটা ঘট্‌বেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে সবাই যে যার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল।

ঘরের দরজা-জানালা ডাক্তার একে একে সব বন্ধ ক'রে দিলেন। কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই, বাইরে বাতাস জোরে বইলেও আর কোথাও শব্দ হবে না। চারদিক নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ। এই বিশাল অট্টালিকার বাইরে যে রাস্তা-ঘাট আছে, লোকালয় ও মানুষ আছে, কর্ম-কোলাহলময় জগৎ আছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এখানে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটলেও কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না। অমাবস্যার অন্ধকার যেন এই প্রেতপুরীকে উদরসাৎ করেছে।

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। এগারোটা বাজল। নিজের নিঃশ্বাসটা যে ইতিমধ্যে কখন ভারী হ'য়ে উঠেছে ডাক্তার বুঝতে পারেননি। পাঁচজনে আগে থাকতে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, তাই এই দুর্বলতা। মনে হোল, ঘড়িটায় আরো একটু আস্তে শব্দ হলে ভালো হয়। ওটা ভয়ানক জীবন্ত, অবাধ্য। বিছানার ওপর ব'সে ডাক্তার একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। দেওয়ালগুলো জীর্ণ, তার গায়ে নানারকম আঁজিবুঁজি কাটা —অনেকটা যেন মানুষের কঙ্কালের

মতো।

খুট্ খুট্—

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকালেন। না, কেউ নয়, —বাতাসের শব্দ। না, বাতাসের নয়—বোধহয় কোনো পোঁকামাকড়ের আওয়াজ। কিন্তু কোন্ দিকে? জানালায় না দরজায়?

খুট্ খুট্—

কে ধাক্কা দিল দরজায়? টমী মুখ তুলে তাকালে। একবার সে একটু গোঁ গোঁ ক'রে উঠল, সে যেন বাঘের সন্ধান পেয়েছে। না, কেউ নয়—বাতাস। পুরনো দরজা, বাতাসে একটু নড়ে বৈকি। টমী তার প্রভুর কোলের কাছে আবার মুখ নিচু করে পড়ে রইল। ডাক্তার হাত বুলিয়ে দেখলেন, তাঁর বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা। নিজের হাতটা যেন সহজে আর নড়তে চাইছে না। কেমন যেন মনে হতে লাগল, নিজের ওপর কর্তৃত্ব তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তবু অনেক চেষ্টায় তিনি গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেও কিন্তু পলক পড়ছে না, চোখের তারা যেন স্থির হ'য়ে গেছে, পাথরের মতো প্রাণহীন। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে। ওটা যেন জীবন্ত মানুষের মাথা, যেন ওর চোখ কান নাক আছে, ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসছে। প্রেতের মতো হাসি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ও কী? দেওয়ালের সেই আঁজিবুঁজি, সেই মানুষের কঙ্কালটা নড়ছে কেন? ডাক্তারের বুকের ভিতরকার রক্ত জমাট বেঁধে এল। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগছে একটু একটু করে। হাত, পা, বুক, মাথা, মুখ। উজ্জ্বল আলোয় সেই কঙ্কাল বিরাট দানবের চেহারা নিয়ে দেওয়ালে উঠে দাঁড়াল। এবার হাত বাড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

হাত বাড়িয়ে ডাক্তার বন্দুকটা ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাত উঠল না। কই, বন্দুকটা ত তার কাছে নেই? কে নিলে? ডাক্তারের গলাটা কে টিপে ধরেছে! স্বর নেই, চীৎকার নেই, নিঃশ্বাস নেই। তিনি নড়বার চেষ্টা করলেন কিন্তু সম্ভব হ'লো না, খাটের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে দিয়েছে।

ডাক্তার জ্ঞান হারাননি, খুব সাহসী লোক তিনি। চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য, জলের কুঁজোটা ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, কাঁচের গেলাস দুটো ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ছে। হ্যাঁ, এইবার ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছেন। ভয়ে তাঁর রোমকূপগুলো আর্তনাদ ক'রে উঠল।

খট্ খট্ খট্—

কিসের শব্দ? কই টমী ত আর গোঁ গোঁ ক'রে উঠল না? ডাক্তার প্রাণপণে টমীর গায়ে একটা চিমটি কাটলেন; এত জোরে যে টমীর গায়ের মাংস তাঁর আঙ্গুলে ছিঁড়ে উঠে এল। কিন্তু কই টমী ত জাগলো না? তবে? তবে? বেঁচে আছে তো? টমী বেঁচে নেই, তার সর্বশরীরে একবিন্দু প্রাণ নেই—মরে সে কাঠের মতো প'ড়ে রয়েছে। এ-পাশে বন্দুক নেই, ও-পাশে টমী নেই।

ঘড়িটায় আর টিক্‌টিক্ শব্দ হচ্ছে না, সেটা থেমে গেছে। কে দিলে থামিয়ে? টেবিল্‌টা এইবার ন'ড়ে উঠল, পায়া চারটে ছড়িয়ে নাচতে লাগল। টমী, টমী? টমী বেঁচে নেই—বাঁ-হাতের কাছে তার মৃতদেহ অসাড়, অচেতন। জলের কুঁজোটা ঘুরছে, কাচের গেলাসটা উড়ছে, টেবিল্‌টা নাচছে। আর—আর সেই দানবটা হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা-জানলাগুলো খুলে গেল। ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কারা ঢুকছে ঘরে? বড় বড় মাথা, ঝাঁকড়া চুল,—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো। মানুষ নয়, দানব নয়—এরা যেন আরো বিচিত্র। গভীর রাত্রির অন্ধকারে এরা এসেছে কঙ্কালটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে।

আলো কই, আলো? কারবাইডের আলোটা যেন পাগলের মতো ঘরের চারদিকে ছুটছে। কে তাকে তাড়া করেছে, কিন্তু পালাতে পারছেন না, যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। যারা ঘরে ঢুকেছে তারা নিশ্বাস ফেলছে, দ্রুত নিশ্বাস, ঝড়ের মতো তার শব্দ।

ডাক্তারের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। তিনি কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলেও পারলেন না। গলা তাঁর বন্ধ, হাত পা বন্দী, চোখ দুটো অচেতন। দেখতে দেখতে সেই দানবের হাতখানা তার মাথার দিকে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে মাথাটা ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, মাথার সব চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঃ আঃ—খাটখানা কে নাড়ছে! ডাক্তার আবার চীৎকার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই হিংস্র প্রেতের দল তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে—তাঁকে নিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল। ডাক্তারের মাথাটা ঘুরছে! টমী, টমী? টমী মরে গেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, টমীর মুখটাও দানবের মতো বদলে গেছে, টমী নখর বিস্তার করে তাঁর দিকে মুখব্যাদন করে এগিয়ে আসছে।

বিশ্বাসঘাতক! তোমার এই কাজ?

টমী-দানব হেসে উঠল। ধারালো দাঁত দিয়ে ডাক্তারের পাঁজর কামড়ে ধরল।

খাটখানা শূন্যে উঠছে! মহাশূন্যের ঘন অন্ধকার দেশে। আরো-আরো উঁচুতে দানবের দেশে তাঁকে নিয়ে যাবে, ভূত-প্রেতের রহস্য রাজ্যে উর্ধ্বদেশে খাটখানা উড়ে যাচ্ছে, দূরে,— ওই যা, তাদের হাত থেকে খাট খ'সে গেল! ডাক্তার বেগে নীচের দিক পড়ে যাচ্ছেন, হয়তো কোনো মহাসমুদ্রের জলে তিনি আছাড় খেয়ে প'ড়ে তলিয়ে যাবেন। গেল, গেল,—

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু?

দরজায় ধাক্কা পড়তেই ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। বুকটা ধড়ফড় করছে! চোখ চেয়ে দেখলেন, সকালের আলো জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে! সর্বশরীর তার তখনো কাঁপছে। ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। সেই আলো, ঘড়ি, টেবিল, কুঁজো ও গেলাস, তাঁর বন্দুক আর টমী। গলার আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন—যাই হে, দাঁড়াও।

মনোজ বসু

অনেক দিনের কথা। খুলনা অবধি নতুন রেললাইন বসেছে। একটা স্টেশন ঝিকরগাছি। শ্রাবণ মাস। সারাদিন ঝুপঝুপে বৃষ্টি। সন্ধ্যা থেকে একটুখানি ধরেছে। রাত্রি সাড়ে আটটায় কলকাতার ট্রেন ঝিকরগাছি এসে থামল। দুর্যোগে মোটে ভিড় নেই। জন তিন-চার গাড়িতে উঠল। নামল একটিমাত্র যুবাপুরুষ। নাম বিনোদ। কাছাকাছি সাদিপুর গাঁয়ের মাখনলাল করের জামাই। তাঁর ছোট মেয়ে চঞ্চলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বছর দুই আগে।

পুনায় থাকে বিনোদ, মিলিটারিতে চাকরি করে। সম্প্রতি বাসা পেয়েছে। বউকে নতুন বাসায় নিয়ে যাবে। এক হপ্তার ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। এর পর ভাদ্র মাস পড়ে যাবে। শ্বশুর-শাশুড়ি তখন মেয়ে পাঠাবেন না। সেইজন্যে তাড়াতাড়ি।

স্টেশনে নেমে বিনোদ গেট পেরিয়ে বেরুল। গেটে লোক নেই, কেউ টিকিট চাইল না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কোন দিকে জনমানব দেখা যায় না। আরও দু-বার সে শ্বশুরবাড়ি এসে গেছে, পথ মোটামুটি জানা। তবু ভাল করে একবার স্টেশনমাস্টারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ

করে নেবে। ...

অফিসঘরের দরজা ঝাঁকাচ্ছেঃ মাস্টারমশায়, মাস্টারমশায়—

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আলো জ্বলছে। স্টেশনমাস্টার আছেন অফিসে। সাড়া দিচ্ছেন না। শুনুন একবারটি মাস্টারমশায়—

পয়েন্টস্‌ম্যান এল হঠাৎ কোন্ দিক থেকে। গায়ে নীল কোট; তার উপর মোটা কম্বল জড়ানো। তা সত্ত্বেও হিহি করে কাঁপছে। বলে, ডাকেন কেন বাবু? মাস্টারমশায় জ্বরে বেহুঁশ। গাড়ির ছাড় গার্ডসাহেব আজ আমার কাছ থেকে নিয়ে নিল। উনি উঠতে পাববেন না, আমায় বলুন কি দরকার।

সাদিপুর থেকে আমার জন্য পালকি আসার কথা। দেখতে পাচ্ছিনে তো।

ভ্রূভঙ্গি করে পয়েন্টস্‌ম্যান বলে, পালকি চাচ্ছেন বাবু, বলি পালকিটা বইবে কারা? বেয়ারা জুটবে কোথা? ম্যালেরিয়ার নতুন আমদানি— ঘরে ঘরে মেয়েমর্দ সকলের জ্বর। একবাটি বার্লি রেঁধে দেবার মানুষ জোটে না, আপনার মাথায় পালকির শখ চাপল এখন।

হাঁসফাস করছিল লোকটা— বিনোদেব সামনে সেইখানে মেঝের উপর বসে পড়ল। বলে, আগের লোকটা মারা গেল জ্বরে। পরশুদিন আমায় এই স্টেশনে পাঠাল। আমাকেও জ্বরে ধরেছে। কপালে কী আছে জানিনে।

দু-মাসের মধ্যে বিনোদ-শ্বশুরবাড়ির কোন চিঠিপত্র পায়নি। মন বড় উতলা। স্টেশনমাস্টার পুরনো লোক, তিনি হয়তো খবরাখবর কিছু বলতে পারতেন। এ লোক একেবারে নূতন, একে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই।

সারাদিন খাওয়া হয়নি বিনোদের। বড় ক্লান্ত। একবার ভাবল, রাত্রিটা স্টেশনে কাটিয়ে সকালবেলা বেরুবে। কিন্তু সামান্য পথ, মাইল তিনেকের বেশী নয়। মশা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে— যা গতিক, রাতের মধ্যে চোখ বুজতে দেবে না। তার চেয়ে কোন রকমে পথটুকু কাটিয়ে শ্বশুববাড়ির খাটের উপর গদিয়ান হয়ে পড়া ভাল।

পথে নেমে পড়ল বিনোদ। হনহন করে চলেছে। হাতঘড়িতে ন'টা। সন্ধ্যারাত্রি বলা যায়। এরই মধ্যে চারিদিক একেবারে নিশুতি। রাস্তার জল কলকল করে নালায় পড়ছে। ব্যাং ডাকছে গ্যাঙর-গ্যাং। বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছে মাথার উপরে।

চাঁদ দেখা দিল আকাশে। মেঘ-ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্না। অদূরে কেয়াঝাড়। ছত্রাকার কেয়া-পাতার নীচে মানুষ যেন। মানুষটা কাঁটাবনের মধ্যে মোটা কেয়া গুঁড়ির উপর আরামে পা ছড়িয়ে বসে আছে, স্টেশন থেকে বেরিয়ে এতক্ষণের মধ্যে প্রথম এই মানুষ।

বিনোদ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, সাদিপুরে মাখনলাল করের বাড়ি যাব! যাচ্ছি তো ঠিক?

উঁহু—। শঙ্খের মতন আওয়াজে মানুষটা জবাব দেয়ঃ সাদিপুর যাবে তো এই দিকে চলে এস। ডাকছি, আসছ না কেন?

পথ কোথা গহিন জঙ্গলের মধ্যে। পাগল নিশ্চয়— নয় তো রাত্রিবেলা ঘরবাড়ি ছেড়ে

এমন জায়গায় কেন? মিলিটারি মানুষ বিনোদ— সে কিছু গ্রাহ্য করে না। নিরুত্তরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আরও জোরে গটমট করে চলল।

দীর্ঘ একটা খেজুরগাছ ঝড়ে বেঁকে গেছে। কাত হয়ে আছে সেটা রাস্তার উপর। গাছটা আগেও দেখেছে, বিনোদের মনে পড়ল। ঠিক-পথেই যাচ্ছে তবে, পথ হারায়নি। যেই মাত্র গাছের নীচে আসা, গাছটা নুয়ে এসে বিষম জোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আবার আগেকার অবস্থায়— তেমনি কাত হয়ে আছে রাস্তার উপর। আর যেন খলখল হাসি শুনতে পায় বাতাসে। বিনোদ ছুটে বেরুল, তাই রক্ষা। নইলে গাছ ঠিক মাথার উপরে পড়ত. মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

খুব খানিকটা গিয়ে পিছনে তাকায়। খেজুরগাছ যেমন তেমনি আছে, পাতা ঝিলমিল করেছে জ্যোৎস্নায়। সাহসী মানুষ বিনোদ— প্যারেড করে, বন্দুক চালায়। ভাবছে চোখের ভুল। বম্বে মেল আজ বড্ড লেট ছিল— হাওড়া স্টেশনে নেমেই শিয়ালদা মুখো ছুটতে হল। খাওয়াদাওয়া হয়নি সমস্তটা দিন। খিদে তেষ্টায় অবসন্ন হয়ে মাথা ঘুরছে, আর এই সমস্ত জিনিস দেখছে। আসলে কিছুই নয়।

শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে গেল। অবস্থা ভাল এঁদের, পাকা কোঠাবাড়ি। বৈঠকখানা অন্ধকার। শীতকালে বড়দিনের সময় বিনোদ এসেছিল, দিনরাত লোক গিজগিজ করত তখন। রাত দুপুর অবধি পাশা খেলার হুল্লোড়। আজ কেউ নেই। সেটা হয় তো ঐ পয়েন্টস্‌ম্যানের মুখে যা শোনা গেল— জ্বরজারির মধ্যে আড্ডা দেওয়ার পুলক নেই মানুষের। বাড়ির কর্তারাও হয় তো জ্বরের তাড়সে ভিতর-বাড়ির বিছানায় পড়ে কোঁ কোঁ করছেন।

ভিতর-বাড়ির দরজাটা হা হা করছে। জামাই ঢুকে গেল ভিতরে। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে শব্দসাড়া করে। কাশছে। একজন কেউ বেরিয়ে আসুক। কী আশ্চর্য, গেলেন কোথা সব?

এই রকম ভাবছে। কোন্ দিক থেকে ঘোমটা-দেওয়া এক বউ এসে সামনের উপর দাঁড়াল। বিনোদ হকচকিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি পরিচয় দিল, এ বাড়ির ছোট জামাই আমি— বিনোদ।

খিলখিল খিলখিল উচ্ছ্বলিত হাসি। হাসতে হাসতে ঘোমটা খুলে ফেলে চঞ্চলা। বিনোদের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

চঞ্চলা আগে আগে চলেছে। মস্ত বড় বাড়ি। আরও কত বারান্দা কত সিঁড়ি উঠান পার হয়ে চলল। একসময়ে বিনোদ সেই আগের প্রশ্ন করে, মানুষ দেখিনে— গেলেন কোথা এঁরা সব?

চঞ্চলা বলে, ঝিকরগাছি আমার এক পিসীর বাড়ী। পিসীর মেয়ের বিয়ে আজ। বাড়িসুদ্ধ সেখানে চলে গেছেন।

একবার ঢোক গিলে বলে, আমারও যাবার কথা। কিন্তু জ্বর থেকে উঠে সবে কাল অন্নপথ্য করেছি কিনা—

ঘরের মধ্যে এসে গেছে দু-জনা। কুলুঙ্গিতে প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় বিনোদ চঞ্চলার

দিকে ভাল করে তাকাল। অসুখ করেছিল, চেহারায় তা বোঝা যায় না। আগে যেমন দেখে গেছে, তেমনি। চঞ্চলার চেহারা ও স্বাস্থ্য চমৎকার।

বিনোদ বলে, এত বড় বাড়ির মধ্যে একলা একটি প্রাণী ভয় হচ্ছে না তোমার?

একলা কেন হব? বুড়ো দারোয়ান আর গোবিন্দ চাকর রয়েছে। তারা বৈঠকখানায়? সৌদামিনী ঝি-ও আছে। শরীর খারাপ বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে, ডাক দিলে এসে পড়বে।

পালঙ্কের বিছানায় চেপে বসে বিনোদ অভিমান ভরে বলে, আজ এসে পৌঁছব, স্টেশনে পালকি রাখবার জন্য চিঠি দিয়েছিলাম। পালকি না জুটুক, স্টেশনে অন্তত বুড়ো দারোয়ানকে পাঠালে পারতে।

চঞ্চলা ঘাড় নাড়লঃ চিঠি পৌঁছয়নি, পৌঁছবার উপায়ও নেই। পোস্টমাস্টার-পিওন দুটোই মারা গেছে। যে রানার ডাক বয়ে আনত, সে-ও নাকি নেই।

সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া। জ্বরজারি কাকে বলে এ অঞ্চলের লোক আগে জানত না। পাথরে-কোঁদা নিরেট দেহ যেন মানুষের। রেললাইন হয়ে অবধি এই কান্ড। গাঙ খালের মুখ বন্ধ করে রাস্তা বেঁধেছে। খানাডোবা চারিদিকে। বর্ষার জল পড়তে না পড়তে নরক গুলজার! মানুষজন উজাড় হয়ে গেল।

কথাবার্তার মধ্যে এক সময় বিনোদ বলে, তোমার কাছে বলতে কি— সারাদিন ভাত জোটেনি, বিষম ক্ষিধে পেয়েছে। ক্ষিধের চোটে মুখে আমার কথা সরছে না। তাড়াতাড়ি চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দিতে পার তো দেখ।

চঞ্চলা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লঃ ছি ছি, আগে বলতে হয়! চালে-ডালে খিঁচুড়ি চাপিয়ে দিইগে, তাড়াতাড়ি হবে। তরকারির হাঙ্গামায় যাব না। শুয়ে থাক তুমি, বিশ্রাম কর। এসে ডাকব তোমায়।

চলে গেল চঞ্চলা। যেন উড়ে বেরিয়ে গেল পাখির মতন।

এই ঘরটায় বিনোদ আগেও থেকে গেছে। পেছনে খিড়কির বাগান। কদম-ফুল ফুটেছে, খোলা জানালায় মিষ্টি গন্ধ আসছে। কুলুঙ্গির প্রদীপটা হঠাৎ দপ্‌দপ্ করে। আলো নাচে দেয়ালে দেয়ালে। চমক লাগে— অনেক লোকের আনাগোনা যেন বাইরে ফিসফিস কথাবার্তা।

কে রে, গোবিন্দ নাকি ওখানে?

জবাব নেই। একা গোবিন্দ কিংবা দু-জন চার জন মানুষ নয়। অনেক, অনেক। বাড়ির সকলে নিমন্ত্রণে গিয়েছে। এত লোক তবে কোথা থেকে আসে?

উঁকি দিয়ে দেখল জানলার বাইরে। জ্যোৎ-স্না উজ্জ্বল হয়েছে এখন। না, কিছুই নয়। কিন্তু যেই মাত্র ভিতর দিকে সরে আসে, আবার সেই পাতার খসখসানি। চাপা গলায় শলাপরামর্শ।

উঠে গিয়ে বিনোদ দড়াম করে জানালার কপাট বন্ধ করল। একলা ঘরে গা ছমছম করছে। চঞ্চলার কাছে একথা বলা যাবে না। হাসবে। ঠাট্টা করবেঃ এই বীরপুরুষ তুমি; এই

সাহস নিয়ে লড়াই-এর পাঁয়তারা কষে বেড়াও!

তার চেয়ে কোথায় চঞ্চলা রান্নাঘরে খিঁচুড়ি চাপিয়েছে— চলে যাওয়া যাক সেখানে। রান্না চলবে আর গল্প হবে দু-জনায়।

পা টিপে টিপে নিঃসাড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঢুকে পড়ে চঞ্চলাকে চমকে দেবে।

কিন্তু— ওরে বাবা, কী সর্বনেশে কান্ড গো। রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে বিনোদ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। রান্না করছে চঞ্চলা— উনুন জ্বালাবার কাঠকুটো নেই বুঝি, সেইজন্য নিজের পা দু-খানা ঢুকিয়ে দিয়েছে উনুনের ভিতর, দাউদাউ করে পা জ্বলছে। উনুনের উপর কড়াইতে খিঁচুড়ি ফুটছে টগবগ করে। চঞ্চলা আঙুল দিয়ে একবার তুলে টিপে দেখছে সিদ্ধ হল কিনা। গরম খিঁচুড়ির মধ্যে ইচ্ছামত আঙুল ডুবিয়ে দিচ্ছে, পা জ্বলছে ওদিকে উনুনের ভিতরে।

মসলা বাটবে। কোণের দিকে শিল-নোড়া। চঞ্চলার উঠবার জো নেই— পা তুললেই তো নিভে যাবে উনুন। হাত বাড়াল শিল-নোঁড়া আনবার জন্য। হাত ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। লম্বা হয়ে শিল-নোড়া ধরল। তারপর ছোট হচ্ছে। হতে হতে আবার স্বাভাবিক আকারে এল। কাছে এনে শিল পেতেছে। হাত লম্বা করে তখন তাকের উপরের মসলার ডালা নামিয়ে আনল। এক জায়গায় বসে সমস্ত হচ্ছে। ঘটরঘটর করে চঞ্চলা বাটনা বাটে এবার।

বিনোদ রুদ্ধনিশ্বাসে দেখে সব তাকিয়ে। পা দুটো খুঁটির মতন অনড় হয়ে গেছে। দেখছে একদৃষ্টিতে।

খিঁচুড়ি নামিয়ে চঞ্চলা থালায় ঢালে। পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করল, জলের গেলাস দিল পাশে। পাতিলেবুর কথা মনে হল বুঝি এই সময়। জানলার গরাদ দিয়ে হাত বের করে দেয়। লম্বা হচ্ছে হাত— আরও, আরও। হাত পঞ্চাশ তো হবেই। পাঁচিলের প্রান্তে পাতিলেবুর গাছ— বিনোদের দেখা আছে! ডান হাত সেই অবধি বাড়িয়ে পটপট করে গোটা চারেক লেবু ছিঁড়ে হাত আবার গুটিয়ে আনে। বঁটি পেতে লেবু কাটছে।

হঠাৎ বিনোদ যেন সংবিৎ পেয়ে যায়। উঠি-কি-পড়ি ছুটছে। শ্বশুর বাড়ির বাইরে, একেবারে রাস্তার উপর। রাস্তা ধরে ছুটছে। মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু চারিদিক থেকে কলরব। বহুকণ্ঠে ডাকাডাকি করছেঃ পালাস কোথা? দাঁড়া। ভালর তরে বলছি, দাঁড়িয়ে যা খলখল করে হাসি।

বাঁশতলার অন্ধকার। ছুটতে ছুটতে অন্ধকার কাটিয়ে বিনোদ ফাঁকায় এল। কী আশ্চর্য, তার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে চারটে বউ। সে যত ছোটে, বউগুলোও ছোটে ততই। ছায়াকে যেমন ছেড়ে পালানো যায় না, তেমনি এরা।

সামনের বউটা এক সময় থমকে দাঁড়ায়। গায়ের উপরে বিনোদ হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, কোন রকমে সামলে নিল। রক্ষা নেই, এইবারে ধরল। তাকিয়ে দেখে, অন্য তিন বউও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে।

সামনের বউটা ঘুরে দাঁড়ায় বিনোদের দিকে। এতক্ষণে মুখের ঘোমটা তুলল। তারই স্ত্রী চঞ্চলা— রান্না করছিল যে বসে বসে। ডাইনে বায়ে ও পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে, তারও সব

ঘোমটা খুলেছে। চঞ্চলা সবাই। এক চঞ্চলা চারজন হয়ে গেছে। পালাবার পথ নেই কোন দিকে। বিনোদের গায়ে ঘাম দেখা দিয়েছে। চারজনের আটখানা হাত অক্টোপাসের মত টুঁটি চেপে ধরে বুঝি এইবার। হাতগুলো সত্যি লম্বা হচ্ছে একটু একটু করে; তার দিকে এগিয়ে আসছে। ফাঁকার মধ্যে বেঘোরে প্রাণটা গেল— হায় ভগবান!

চেতনা হারিয়ে বিনোদ পড়ে যায় আর কি পথের উপর! কিন্তু, না— হাতের মুঠিতে গলা চেপে ধরে না, হাতের আঙুলের কোমল স্পর্শ তার দেহে। সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

চঞ্চলার চোখে জল। চারজনের একসঙ্গে জল এসে গেছে চোখে। বলে দেখ, একজন আমি চারজন হয়ে চারদিক থেকে ঠেকিয়ে নিয়ে এলাম। নয় তো রক্ষা ছিল না। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দিত না ওরা।

বিনোদ বলে, ওরা কারা?

চঞ্চলা বলে, আমি মরে গেছি। আমার ভাই-বোন বাপ-মা সবাই। মহামারিতে এত বড় গাঁয়ের মধ্যে একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। বেঁচে থাকতে এখানকার মানুষ গাঁয়ের মধ্যে চোর-ডাকাত ঢুকতে দিত না। মরার পরে তেমনি এখন জ্যান্ত মানুষ ঢুকতে দেয় না! ঢুকে পড়লে গলা টিপে মেরে দলের মধ্যে নিয়ে নেবে। তোমায় যে পারেনি, সে কেবল আমার জন্যে। তুমি বেঁচে থাকো শতেক পরমায়ু হোক। এই কম বয়সে কেন তুমি মরতে যাবে?

হাঁপাচ্ছিল চঞ্চলা ছুটোছুটির ক্লান্তিতে। খানিক দম নিয়ে বলে, গোড়ায় পিছু পিছু আসছিলাম। কিন্তু ভরসা হল না। সামনের দিক দিয়ে কিংবা ডাইনে বাঁয়ে কেউ এসে টপ করে যদি ধরে নেয়। একজন চারজন হয়ে চতুর্দিক ঘিরে নিয়ে এসেছি। সে যে কী কষ্ট! আর ভয় নেই, সাদিপুরের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছি। একটুখানি গিয়েই স্টেশন।

চার বউ চার পাশ থেকে মাথা নুইয়ে চারখানা ডান হাত বের করে বিনোদের পায়ের ধুলো নিল। পলকের মধ্যে দেখে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে একলা সে দাঁড়িয়ে। কোন দিকে কেউ নেই।

কেউ কি এসেছিলেন

বিমল কর

রামতনুর বৈঠকখানায় বসেই গল্পগুজব হচ্ছিল। আমরা তিন-চারজন বুড়ো প্রায় রোজই সন্ধ্যেবেলায় রামতনুর বৈঠকখানায় হাজির থাকি। নানান রকম কথাবার্তা হয়। সংসারের কথা, সুখদুঃখের কথা, এখনকার দিনকালের কথা। চা চুরুট, পান খেতে খেতে গল্পও হয় হরেকরকম।

সেদিন তারকবাবু কথায়-কথায় বললেন, "খবরের কাগজে একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছে, আমরা খেয়াল করে দেখেছি কী?" বলেই উনি সেই খবরের বর্ণনা শুরু করলেন।

খুব একটা অবাক হওয়ার মতন খবর কিন্তু সেটা নয়। কলকাতায় শোভাবাজারে আদ্যিকালের ভাঙাচোরা একটা বিরাট বাড়ি হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার পর—সেই ইট কাঠের স্তূপ যখন পরিষ্কার হচ্ছিল তখন একটা জুড়িগাড়ির দুই ভাঙা চাকা পাওয়া যায় আবর্জনার মধ্যে। চাকা নিয়ে কেউ তখন মাথা ঘামায়নি। ঘামাবার কথাও নয়। কিন্তু দিন দুই পর থেকে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে লাগল। দিন মজুরের দল যারা মাটি খুঁড়ছিল, ইট

কাঠ আলাদা করে সরিয়ে রাখছিল—তারা অবাক হয়ে দেখল, সরিয়ে রাখা ভাঙা চাকা দুটো আবার যথারীতি আবর্জনার মধ্যে কেউ ফেলে দিয়েছে। কে ফেলেছে, কেন ফেলেছে—সে রহস্যের আর কিনারা করা যাচ্ছে না। পাড়ার লোকের ধারণা, এককালে এই বসাকবাড়ির ছোটবাবু ছিলেন—কলকাতার সেরা জুড়িদার। তাঁর চার জোড়া বাহারি জুড়িগাড়ি আর গুটি পাঁচ-ছয় পয়লা নম্বরের ঘোড়া ছিল। ছোটবাবুর নেসা বলতে ওই গাড়ি আর ঘোড়া। মারাও যান গাড়ি হাঁকাবার সময়, জুড়ি উলটে।

তারকবাবুর বর্ণনা শুনতে-শুনতে সদানন্দ বললেন, "তুমি কি বলতে চাও, চাকা দুটো ভুতুড়ে? না, বসাকবাড়ির ছোটবাবু এখনও ভূত হয়ে সে-বাড়িতে অধিষ্ঠান করছেন?"

সদানন্দর বলার ভঙ্গিটা ছিল ঠাট্টার।

তারকবাবু বললেন, "তা আমি জানি না। কাগজে যা ছেপেছে, বললাম।"

কাগজের খবরটা নিয়ে আমরা হালকাভাবে কথাবার্তা শুরু করলাম। কথায় কথা বাড়ে। হালকা কথাও গম্ভীর হয়ে যায় অনেকসময়। আমরাও বোধ হয় খানিকটা গম্ভীর হয়ে উঠলাম।

রামতনু বরাবরই কথা কম বলে, আমাদের কথা শোনে আর ছোট-ছোট মন্তব্য করে। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর স্বভাব জানি। কথা কম বললেও বাজে কথা বলে না। আবার হাসিতামাশা করলেও কাউকে লজ্জায় ফেলে না।

সেই রামতনু বলল, "সদানন্দবাবু, জগৎটা বেশ বড়, আর সে-তুলনায় আমরা অতি ছোট। জগতে কত কী হয়, তার সব খবর কি আমরা রাখি! না, রাখতে পারি! খবরের কাগজে মাঝে মাঝেই কত বিচিত্র খবর বেরোয়। আপনি, আমি তা বিশ্বাস করলেই বা কী, না করলেই বা কী! বসাকবাড়ির ছোটবাবু, ঘোড়ার গাড়ির চাকার কথা এখন বাদ দিন; আমার জীবনে আমি একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছি— যার কোনও মানে আমি বুঝিনি, কারণও খুঁজে পাইনি। যদি শুনতে চান— বলতে পারি।"

শোনার আগ্রহ সকলেরই।

গল্প শোনার পক্ষে সময়টাও এখন ভাল। কার্তিক মাসের শেষ। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। এ সময় সচরাচর মেঘ-বাদলার আবহাওয়া হয় দু-চারদিনের জন্যে। বাদলা না হোক— দিন দুই মেঘলা ভাব চলছিল। বাইরে অন্ধকার। বাতাসের দমকাও ছিল। দেওয়াল ঘড়িটাতে সবে সাতটা বাজল।

আমি বললাম, "সে কী, তোমার জীবনে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল। আর আমি জানি না! বলছ কী?"

রামতনু বলল, "না, জানো না। আমি কাউকেই বলিনি। কেননা, আমি নিজেই বুঝতে পারি না, সত্যি ঘটনাটা ঘটেছিল, না, পুরোটাই আমার মনের ভুল! আজও আমি বলতে পারব না, ঘটনাটা সত্যি , না, মিথ্যে?"

"ঠিক আছে। ঘটনাটা বলো—!"

রামতনু সামান্য অপেক্ষা করে বলল, "আমার জীবনটা তো রেলে চাকরি করেই কেটে গিয়েছে, তোমরা সবাই জানো। বড় কিছু হওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। হতেও পারিনি।"

রামতনুর কথার মধ্যে অসত্য বিশেষ ছিল না, তবে বিনয়ও ছিল। সে যে কিছুই হয়নি, তাও নয়। কম বয়েসে সে রেলের চাকরিতে ঢুকেছিল সামান্য এ. এস. এম. হয়ে। কিন্তু ও যখন চাকরি থেকে অবসর নিল তখন আর সামান্য এ. এস. এম. নয়, বড় স্টেশনের মাস্টারমশাই।

রামতনু বলল, "যখনকার কথা বলছি তখন আমি ছোকরা। বেণুডিহি বলে একটা ছোট্ট স্টেশনে পোস্টিং নিয়ে এসেছি সদ্য। মাস দুই-তিন কেটেছে বড়জোর। বেণুডিহি হল ব্রাঞ্চ লাইনের একটা নিরিবিলি স্টেশন। স্টাফ বলতে আমরা ক'জন মাত্র। আমি, টিকিটবাবু সত্যদা, কেবিনের প্রসাদ আর পোর্টার জনা দুই। স্টেশনের গায়েই আমাদের রেল-কোয়ার্টার। একটা কুয়ো, রাজ্যের আকন্দ ঝোপ আর একজোড়া কাঠচাঁপাব গাছ আমাদের কোয়ার্টারের শোভা বাড়ায়।

"বেণুডিহি স্টেশনটা না থাকলেও চলত। কিন্তু কাঠ-চালানের জন্যেই বোধ হয় ওটা রাখতে হয়েছে। জঙ্গলের ইজারাদাররা যত রাজ্যের গাছ কাটে, সেগুলো এনে স্টেশনের কাছে জমায়। সময়মতন চালানও দেয় খোলা মালগাড়িতে। তবে হ্যাঁ, দু-চারটে ছোটখাটো গাঁ-গ্রামও যে বেণুডিহির ধারেকাছে ছিল তাও ঠিক। এমনিতে জায়গাটা ভাল। পাহাড়তলি বলে কথা! মন্দর মধ্যে হল ওখানকার ম্যালেরিয়া। সে এক আজব ব্যাপার। মাসের মধ্যে বার দুই অন্তত তোমায় কাবু করে ফেলবে। জ্বর আসবে আচমকা হু হু করে, শীতে কাঁপবে ঠকঠক করে, কিন্তু জ্বরের মাত্রাটা বেশিরভাগ সময় একশো দুই আড়াইয়ের বেশি হবে না। একটা দিন ভুগিয়েই আবার জ্বর পালাবে।

"যেদিনের কথা বলছি সেই দিনটির তারিখ বা মাস আমার সঠিক মনে নেই। শুধু মনে আছে, তখন শীতের শেষ। শেষ হলেও গায়ে গরম জামাকাপড়, গলায় মাফলার রাখতেই হয়।

"এইরকম একদিনে স্টেশনে আমি একলা আর পোর্টার শিউরাম। আমাদের সত্যদা জ্বরের ঘোরে বাড়িতে পড়ে আছে। রাত তখন আটটা। সওয়া আটটা নাগাদ একটা প্যাসেঞ্জার আসবে। সেটাই শেষ গাড়ি, মানে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। গাড়িটা চলে যাওয়ার পর আমার একরকম ছুটি।

"একটা কথা বলে রাখি। আজকের মত তখন ইলেকট্রিক ছিল না রেল স্টেশনে। ছোটখাটো স্টেশনে তো নয়ই। ভুসিও কেরোসিন ল্যাম্প আর লণ্ঠন দিয়ে আমাদের কাজ সারতে হয়। রেলের এঞ্জিন ছিল কয়লার, যাকে বলা যায় কোল এঞ্জিন।

"আমার অফিস ঘরে একটা দেওয়ালঘড়ি ছিল। রেল কোম্পানির ঘড়ি। ঘাড়তে যখন আটটা পাঁচ-টাচ হবে, তখন আমি দু-একটা অফিসের কাজ সেরে হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম, শরীরটা খারাপ লাগছে। শীত-শীত করছিল, চোখ জ্বালা করছে। জ্বর আসবে নাকি? ...

আর খানিকটা সময় কাটাতে পারলেই বেঁচে যাই।

"দেখতে-দেখতে সওয়া আটটার গাড়ি এসে পড়ল। আমার বাকি কাজ সেরে ফেলতে একবার বাইরে এলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। এমনিতেই এ-সময় গাড়ি থেকে লোকজন বড় নামে না। সেদিন কাউকেই চোখে পড়ল না। হয়তো অন্ধকারের জন্যে আগাগোড়া প্ল্যাটফর্ম দেখতেও পাইনি।

"নিজের অফিসে ফিরে এসে গোছগাছ সেরে নিচ্ছি এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক মাঝবয়েসি। গায়ে কোট, পরনে প্যান্ট। গলায় মাফলার। হাতে একটা চামড়ার গ্ল্যাডস্টোন ধরনের ব্যাগ। ভদ্রলোককে দেখে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। কোট প্যান্ট পরার চলন তখন খুব কম। বিশেষ করে এখানে কে আর সাহেব সেজে আসবে? আর কেনই বা!

"ওঁকে কিছু বলার আগেই উনি নিজেই বললেন, ভদ্রলোক একজন ডাক্তার। এখানে এসেছেন কালী রক্ষিতদের বাড়ি থেকে ডাক পেয়ে। কালী রক্ষিতের বাড়াবাড়ি অসুখ। রোগী দেখে কাল সকালে উনি ফিরে যাবেন।

"কালী রক্ষিতকে আমি চিনতাম। বেণুডিহি থেকে মাইলটাক দূরে তাঁর বাড়ি। বাড়ি মানে পুরনো আমলের কাছারিবাড়ি। সেই ভাঙাচোরা দুর্গ বললেও ভুল হয় না। কালী রক্ষিত এদিককার অনেক জমিজমার মালিক। আজকাল আবার কাঠের কারবার শুরু করেছেন।

"ভদ্রলোক বললেন, রক্ষিতদের বাড়ির লোক জানে— তিনি এই ট্রেনে আসবেন। ও-বাড়ি থেকে লোক আসবে তাঁকে নিয়ে যেতে। সেই রকমই কথা আছে। উনি আপাতত আমার স্টেশনের অফিসঘরে কিছুক্ষণ বসে থাকতে চান। রক্ষিতবাড়ির লোক এলেই ... যাবেন। আমার যদি আপত্তি থাকে তবে অবশ্য উনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারেন।

"আমি বললাম, বাইরে আর কোথায় গিয়ে বসবেন! তার ওপর এই ঠাণ্ডা। আপনি বরং এখানেই বসুন। কী অসুখ রক্ষিতবাবুর?

"উনি বললেন, 'জানি না। গিয়ে দেখতে হবে। শুনলাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন।

"ভদ্রলোক—মানে ডাক্তারবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। আমিও উঠতে পারলাম না। ভাবলাম, লোক তো এসে পড়বে এখুনি; ভদ্রলোক চলে গেলে অফিসে শিউরামকে রেখে আমি কোয়ার্টারে চলে যাব। শরীর ভাল লাগছে না। তা ছাড়া খিদেও পাচ্ছিল।

"দেখতে-দেখতে সাড়ে আটটা বাজল, তারপর পৌনে ন'টা। আমি অফিস ছেড়ে উঠতে পারছি না। এক ভদ্রলোককে এভাবে বসিয়ে চলে যাই কেমন করে? অথচ বেশ কষ্ট হচ্ছিল বসে থাকতে। মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। আমি উসখুস করছি। ভদ্রলোককে বোঝাবার চেষ্টা করছি, এভাবে আর কতক্ষণ তিনি অপেক্ষা করবেন, আমিই বা বসে থাকব কেমন করে! ভদ্রলোক বড় অদ্ভুত ধরনের। কথাবার্তা প্রায় বলছেনই না, আমার কথার জবাবে দু-একটা হ্যাঁ, হুঁ কিংবা না। উনি আমাকে লক্ষ্য করছিলেন না বিশেষ, ঘাড় মুখ তুলে ছাদের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন।

"ন'টা বেজে যাওয়ার পর আমি বাধ্য হয়ে উঠে পড়লাম। বললাম, 'রক্ষিতবাড়ি থেকে কেউ এখনও এল না। আপনার আসার কথা কি ওরা জানে? ভুল হয়নি তো আপনার?'... আমার কথার জবাবে উনি মাথা নাড়লেন, 'না, ভুল হয়নি।'

"আমি এবার উঠে পড়লাম। বললাম, 'আপনি তা হলে বসুন, আমি কোয়ার্টারে যাচ্ছি। শরীরটা ভল নয় আমার। এখানে শিউরাম থাকল— পোর্টার, আপনি চলে যাওয়ার পর সে অফিসঘরে এসে শুয়ে থাকবে।'

"আমি শিউরামকে খুঁজতে আসছি যখন— তখন প্ল্যাটফর্মে একজনের সঙ্গে দেখা। চাদরে মাথা-কান মোড়া, গায়ে একটা মোটা কম্বল গোছের গরম চাদর, পরনে ধুতি। হাতে লণ্ঠন। ...লোকটাকে আমি চিনি না। তবু মনে হল রক্ষিতবাড়ি থেকে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি রক্ষিতবাড়ি থেকে আসছ?' লোকটা মাথা হেলাল। বললাম, 'যাও ডাক্তারবাবু আমার অফিসঘরে বসে আছেন অনেকক্ষণ হল।' ... লোকটা এগিয়ে গেল, আমিও কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়ালাম।

"একটা কথা বলে রাখি। বেণ্ডিহিতে রাত্রে কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না। প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসত না; গুড্স ট্রেন যা আসত দু-একটা, তাও থামত না। সোজা চলে যেত। কেবিনম্যান থাকত কেবিনে। যদি কখনও দরকার পড়ত— অফিস থেকে শিউরামরা এসে খবর দিত কোয়ার্টারে, আমি ঘুমচোখে ছুটে যেতাম।

"সেদিন নিজের কোয়ার্টারে এসে কোনওরকমে একটু কিছু মুখে গুঁজে একেবারে বিছানায়। ততক্ষণে বেশ জ্বর এসে গিয়েছে। ওখানকার সেই বিচিত্র ম্যালেরিয়াই হবে। আমার আর হুঁশ ছিল না।

"পরের দিন আর জ্বর নেই। মুখটা শুধু তেতো হয়ে রয়েছে। তা দিনের বেলায় রোদ জল পেয়ে শরীরটা তাজা হয়ে উঠল। নিজের হাতে রান্নাবান্না। একটা কুকার ছিল। একবার করে স্টেশনে যাই, আবার কোয়ার্টারে ফিরে আসি। রক্ষিতবাবুর কথা মনে পড়ল। কিন্তু এমন কাউকে দেখলাম না— যার কাছে খবর নিতে পারি।

"যথারীতি সন্ধ্যে হল। তারপর রাত। আটটা বাজল। সেদিনের গাড়িও এল সওয়া আটটার। প্যাসেঞ্জার গাড়িটা দাঁড়াল মিনিট পাঁচ-সাত। ছেড়েও গেল। ...আমি কাজকর্ম সেরে ফেলছিলাম আমার, এমন সময় দেখি কালকের সেই ভদ্রলোক—ডাক্তারবাবু, অফিসঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"আমি অবাক। ভদ্রলোকের সেই একই রকম পোশাক, হাতে কালকের মতনই গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। আসলে ওটা তখনকার দিনের ডাক্তারবাবুদের ব্যাগ। কিছুই বুঝলাম না। বললাম, 'আপনি?'

"উনি বললেন, কালী রক্ষিতকে দেখতে এসেছেন, পেশায় উনি ডাক্তার। রক্ষিতবাড়ি থেকে খবর গিয়েছিল, কালীবাবুর বাড়াবাড়ি অসুখ। ওঁর আসার কথা এই সময়, রক্ষিতরা জানে। লোক আসবে ও-বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে যেতে। উনি ততক্ষণ আমার অফিসঘরে

বসে অপেক্ষা করতে চান। আমার কি আপত্তি আছে!

"আমি হতবাক! ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। একটা লোক গতকাল যে-সময়ে এসেছিলেন, আজও সেই সময়ে এসেছেন। একই রকম দেখতে, একই রকম পোশাক। আর আসার কারণও সেই কালী রক্ষিত, রক্ষিতবাবুর বাড়াবাড়ি অসুখ বলে ওঁকে দেখতে এসেছেন।

"আমি বললাম, 'আপনি তো কালও এসেছিলেন।'

"উনি মাথা নাড়লেন। বললেন, 'না।'

"আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী মশাই! কাল আপনি এই সময়ে আমার ঘরে এলেন। বললেন,কালীবাবুকে দেখতে এসেছেন। আমার এখানে ওই চেয়ারে আপনি রাত ন'টা পর্যন্ত বসে ছিলেন। আমি যখন বাড়ি চলে যাচ্ছি— তখন প্ল্যাটফর্মে একটা লোককে দেখলাম। আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছে। ...এর পরও আপনি বলবেন, আপনি কাল আসেননি! আশ্চর্য!'

"ভদ্রলোক একটু হাসলেন যেন। বললেন, 'আপনি ভুল করছেন। আমি কখনও দু'বার আসি না। একবারই আসি।' ...বলেই উনি পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আচ্ছা আমি আসি, ও-বাড়ির লোক এসে গিয়েছে।' ...বলতে না বলতে তিনি অফিসঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমি হতভম্ব।

"তারপর কী হল জানেন সদানন্দবাবু! শুনলে অবাক হবেন। আমি বোকার মতন খানিকক্ষণ বসে যখন অফিসঘর ছেড়ে ফিরে আসছি তখন রক্ষিতবাড়ির এক কর্মচারী বৈকুণ্ঠর সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে আসছে। বলল, 'বাবুজি, কালীবাবু মারা গিয়েছেন। ঘণ্টাখানেক আগে। আমি লোকজন ডাকতে এসেছি। রাত শেষ হওয়ার আগে তাঁকে দাহ করতে হবে।'

"আমি চমকে উঠে বসলাম, 'সে কী! কাল না এক ডাক্তারবাবু এলেন দেখতে!'

"লোকটা মাথা নাড়ল। বলল, 'আসার কথা ছিল বটে একজনের। কেউ আসেনি।'

"আমি কেমন বোবা বোকা বিমূঢ় হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বুঝতে পারলাম না— কেমন করে তাকে বোঝাব যে, আমি নিজের চোখে পর পর দু'দিন একজনকে আসতে দেখেছি এখানে। তাঁরা ডাক্তার কিনা জানি না, কিন্তু এসেছিলেন যে তা ঠিকই।"

গল্প শেষ করে রামতনু বলল, "আমি কাকে দেখেছিলাম জানি না। ভুল দেখেছিলাম কিনা তাও জানি না। তবে কালী রক্ষিতের অসুখের কথা আমি আগে জানতাম না। জানতাম না, তাঁকে দেখতে আসার জন্যে কোনও ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছিল! তা হলে ওঁরা দু'জন কে? কেনই-বা এসেছিলেন?"

দশনম্বর বাড়ির রহস্য

শিবরাম চক্রবর্তী

দিব্যি একটা খালি বাড়ি পেয়ে গেলাম আলিপুরে! হার্ট ট্রাবলের জন্য ডাক্তার বলে দিল হাওয়া বদলাতে, বলে দিল— 'কলকাতা ছেড়ে ঘুরে এসো গে কোথাও দিনকতক— বাঁচতে চাও যদি। তবে যদি না বাঁচতে চাও সেকথা আলাদা।'

বাঁচতে কে না চায়? কাজেই ছাড়তে হলো কলকাতা। চলে এলাম আলিপুরে।

হ্যাঁ, হাওয়া বদলাতে চাও তো আলিপুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাওয়া বদল হচ্ছে সেখানে। এমনকি মিনিটে মিনিটেও বলা যায়। আর তার রেকর্ড থেকে যাচ্ছে রীতিমত, আবহাওয়া আপিসটা সেখানেই কিনা!

উঠেছি এসে এখানে— আজ সকালেই। বিনি আর আমি। আমার উপর হাওয়া বদলের দায়, আর বিনির দায় খাওয়া বদলের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে আমাকে খাওয়াবে— পুষ্টিকর আর তুষ্টিকর যতো রকমের খাবার আছে। খাওয়াবার ভার তার ওপর, সে ভার বইবে ও। আর খাদ্যের ভার যা কিছু আছে সব বোঝা সইতে হবে আমায়— হয়তো একটু কষ্ট করেই,

এই রকমের বোঝাপড়া।

তা কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না— এখানে অবশ্যি কেষ্টকে না পাবার জন্যেই এই কষ্ট করা। কেষ্টপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টির জন্যেই না এই খাদ্য-বৃষ্টি ? তা হোক্, যতই কষ্টদায়ক হোক্— কেষ্ট আর খাদ্যের মধ্যে বাছবিচার করতে হলে খাদ্যকেই আমি বেছে নেব অম্লান বদনে, এমনকি শ্রীমতী বিনির রান্না হলেও।

এক ঘণ্টাও হয়নি আমার। ইতিমধ্যে আসরে খাদ্য এসে হাজির। এক বাটি দুধ আর একখানা খাম বিনি আমার টেবিলে এনে রাখলে।

—তোমার চিঠি দাদা— দুধটা খেয়ে ফেলো দেখি।

আমি আগে চিঠিখানা দেখি, এখনো তো কাউকে এখানকার ঠিকানা জানাইনি। আসতে-না-আসতেই তবে চিঠি আসে কি করে? কিন্তু না, সত্যিই। এই ঠিকানারই চিঠি বটে। ওই তো লেখাই রয়েছে লেফাফার উপরেই ১০ নং আলিপুর টেরেস। কিন্তু এর মধ্যেই আলিপুরে আমাদের ট্রেস পেলো কি ক'রে আমাদের শত্রু-মিত্ররা? খাম খুলতে খুলতে কেমন একটা চকচকে আওয়াজ পেলাম। খামটা চকচকে বটে, কিন্তু তা বলে যতই চাকচিক্য থাক, তার থেকে চক চক শব্দ কেউ আশা করে না। তা বরদাস্তও করা যায় না কখনোই। খাম-টামের অতো অহঙ্কার থাকা ভালো নয়।

'শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু—'

যুতসই ভণিতা দেখেই চট করে চিঠির শেষে চোখ বুলোতে গেলাম— কোন্ মহাত্মনের লেখা দেখা যাক। না, নাম-ধাম নেই কারো। বিলকুল একখানা চিঠি।

প্রতিবেশীর প্রতি বেশী রকম ভালবাসা থাকে না সকলের, থাকবার কথাও নয় তা মানি, কিন্তু তা বলে, সে আসতে-না-আসতেই তার প্রতি এইরূপ বেনামা চিঠি ছুঁড়ে মারা, এই বা কি রকমের ভদ্রতা ? অ্যাঁ?

...শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু, সবিনয় নিবেদন মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী...

জানি মহাশয়, জানি— কিন্তু দুঃসংবাদ অমন বার বার বেশী বেশী করে মনে করিয়ে দেবার মানে কি বলুন তো? আসতে-না আসতেই চান কি যে এখান থেকে আমরা উঠে যাই?

চিঠিখানা রেখে দুধ খেতে যাই। দেখি বাটি ফাঁকা। অজান্তে কখন খেয়ে বসে আছি। যাক, বাঁচা গেল। দুধের মতো একটা অখাদ্য যে অন্য জনে খেতে পেরেছে সেটা আমার সৌভাগ্যই।

কিন্তু যার বোন আছে, বিনির মতো বোন আছে, তার সৌভাগ্য বলে কিছু নেই। তার হচ্ছে বনবাস। আরেক বাটি দুধ হাতে সে হাজির, আবার সাথে এক প্লেট হালুয়া।

—আরে এই তো খেলাম রে, আবার এখুনিই? আমি আপত্তি করি। এই ঘন ঘন পথ্যি করলে কি মানুষ বাঁচে? বিশেষ হার্ট যাদের খুব উইক? তাতে ট্রাবলস সারে যদিও তার, শেষটায় হয়তো পেটের ট্রাবলেই সে মারা যায়।

—কিন্তু ডাক্তার বলেছে না ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে?

—তোর এর মধ্যে এক ঘণ্টা হয়ে গেল?

তাক লাগে আমার। আলিপুরে আবহাওয়া মিনিটে মিনিটে বদলায় বলে শুনেছি বটে। কিন্তু তা বলে ঘণ্টারা কিছু আবহাওয়ার মতই বদলাতে পারে না। তাদের বদলাতে পাক্কা ষাট মিনিট লাগে, যেমন লাগতো কলকাতায়? অবশ্যি সময়তত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই, ঘড়িদর্শনেও পোক্ত নই তেমন, তা ঠিক, কিন্তু তাহলেও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির যদ্দুর ধারণা, এক একজামিনেশনের হল্ ছাড়া আর কোথাও পনরো মিনিটে ঘণ্টা কাবার কখনো হয় না।

তবে কিনা, এখানেও তো আমি একটা পরীক্ষার সম্মুখীন। জীবন-মরণই পরীক্ষা। আর সেই জন্যেই যদি—। সেজন্যেই কিনা বিনির কাছে আমি জানতে চাই। বিনির জবাবে যা পাওয়া গেল, তা হচ্ছে এই— ডাক্তারের উপদেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়, তাহলে দিনে-রাতে চব্বিশবার খাওয়াতে হয় আমায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো ঘণ্টাই নাকি আমি নাক ডাকাই। আর নাক থেকে হলে— 'নাক থেকে নয়, ঘুম থেকে'— আমি আবার ভুল শুধরে দিই— যাক সেই নাকামো থেকে তুলে আমাকে কিছু গেলানোর মতো দুঃসাধ্য কাজ আর দুটি নেই। আর তা নাকি ওর কম্মো নয়। তা ছাড়া রাত-বিরেতে সেও নাকি একটু ঘুমোতে চায়। ঘুম পেলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। সে-ও। আর আমার মতো অতোটা না হলেও, ঘুমোতে একটু ভালোই বাসে। তার ঘুমোনোর সময়ে আমাকে তুলেই বা কে, আর খাওয়ায় বা কে? তাকে তুলে খাওয়ানোর জন্যেই, মানে, তাকে নয়— আমাকে খাওয়ানোর জন্যেই।

এই সব ভেবেচিন্তে সে ঠিক করেছে যতোক্ষণ আমি জেগে থাকি তার মধ্যেই উঠে প'ড়ে যেমন করে হোক বার-চব্বিশেক আমাকে খাইয়ে দেবে। এবং সেই মহাচেষ্টাতেই এই...

'খাওয়াও'। হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বলি— 'খাইয়ে যাও।' পড়েছি মোঘলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। দুধের বাটিটা রেখে হালুয়ার প্লেটটা হাতে নিই। চামচেয় করে মুখে তুলে এক-একটু চাখি। চাখতে চাখতে আবার শুনি সেই চকচকানো ধ্বনি। আমার খারাপ লাগে এবার। এই কালো ভূতের মতন হালুয়া, কোনোই চাকচিক্য নেই এর কোনোখানেই। মুখে তুলতে-না-তুলতেই এও যদি চকচকে আওয়াজ ছাড়ে তো গা জ্বালা না ক'রে পারে না। এমন বিচ্ছিরি হালুয়ার মুখে এমন চোখা চোখা বুলি— বড্ডোই বাড়াবাড়ি, নিতান্তই আদিখ্যেতা।

কিন্তু না, প্লেটে নয়— দুধের বাটিতেই। সেই চক্কার টেবিলের ওপরে শুধু সেই বাটিটা, তার সীমানায় কেউ নেই। এক সীমান্তে কেবল আমি। আর সেই বাটির সম্মুখেই অদ্ভুত উক্ত আওয়াজ চক্‌চক্ করে যেন দুগ্ধ পান করছে। হক্‌চকানো ব্যাপার। বেশ করে রগড়ে খালি চোখে তাকালাম ভাল করে— টেবিলে শুধু সেই দুধের বাটিটা, কেউ নেই কিছু নেই তার কাছাকাছি— খালি সেই বাটিটা। দেখতে-না-দেখতে বাটিটা খালি হয়ে গেল।

অবাক কাণ্ড। বুক জ্বর-জ্বর করতে লাগল। হার্ট ট্রাবল বাড়তে লাগলো নিজের থেকেই।

অ্যাঁ— এ আবার কি গো, এক চকরবরতির সামনে এ আবার কোন চকরবর্তী? কোন চক্রান্তকর্তা? তখনই মনে পড়লো ব্যাপারটা খুব অশ্রুতপূর্ব না, একটু আগেই এমনি চক্চক্কার যেন আরেকবার শুনেছি। আগের বাটিটাও তাহলে... এমনি নিজগুণেই? তবে কি আমি নিজে ফাঁক করিনি সেটাকে?

বিনি! বিনি! বিনি—। আমার আর্তনাদ ফোটে। আমার চীৎকারে সে ছুটে আসে— কি হয়েছে, কি হয়েছে দাদা?

কী আবার হবে ঐ দ্যাখ। আমি দেখাই। অদৃশ্য কিন্তু অশ্রুত মনকে দেখাতেই যাই। দেখাতে গিয়ে অন্য দৃশ্য দেয় এবার। ঘরের কোণে কতকগুলি অগ্নি শলাকা ছুটোছুটি করেছে দেখতে পাই।

ওমা একি...। বিনি গালে হাত দেয়। সে অবাক। আর আমি। আমি ত হতবাক তার আগেই। খানিক বাদে ওর কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজের গোঙানি আমার কানে আসে।

ভুতুড়ে বাড়ি নাকি দাদা!

—কে জানে দিদি। বলতে গেছি একথাটাই। কিন্তু সমস্ত বাক্যটা আপ্লুতস্বর হয়ে বেরিয়ে আসে এক কথায় গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ... আমি বলতে থাকি। আপ্লুত হয়ে।

তোমার গোঁয়ারতুমি থামাও তো। বলে বিনি এক জালা ঠাণ্ডা জল এনে আমার মাথার উপর ঢেলে দ্যায়। এই সব কাণ্ডেই ভড়কে গিয়েই কিনা কে জানে! জ্বলন্ত ফলকগুলি ঘরময় হুটো পাটি লাগিয়ে দেয়। ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

—বোন বলতে কি বহ্নি বলতে আমাদের বাড়িতে তুই-ই ছিলি এক মাত্র, এক মাত্রই বলব আর এক মাত্রায় বল... আমি বলি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এ বাড়ীতে তোর প্রতিদ্বন্দ্বিনী আছে। অনেক আছে। মানে এটা ভুতুড়ে বাড়ী নয়। ঐ বহ্নি শিখারা ভূত নয় কখনোই পেত্নী।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেত্নী বলা হচ্ছে আমায়? বটে? বুঝতে পারছি এখনও তোমার জ্ঞান সঞ্চার হয়নি ঠিক মতন। দাঁড়াও! বলে সে আরেক বালতি জল আনতে যায় — ভাল করে আমার চৈতন্য সম্পাদনের মতলবেই।

যাবার মুখেই অযাচিত কার ল্যাজে যেন পা পড়ে যায় ওর আর সে (বিনি নয়। সেই অদৃশ্য লাঙ্গুলধারী) ম্যাও-ও বলে চেঁচিয়ে ওঠে। মাগো বলে একলাফে চার পা পিছিয়ে আসে।

আর চতুর্থ বারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে!

জীবটি অদৃশ্য হলে কি হবে তার আওয়াজ বেশ সুশ্রাব্য— সুখ শ্রাব্যই। আর বিনির পায়ে তার আঁচড়ানি একেবারেই অদৃশ্য নয়। সুদৃশ্যই বলতে হয়। তারপর আইডিন লাগাবার পর সেই পায়ের বাহার যা খোলে।

দেখবার মতোই।

—বেড়ালের ভূত। — বিনি বলে।

— উঁহু। ভুতুড়ে বেড়াল। আমি তার ভ্রম সংশোধন করি। মাগো বেড়াল মরে ভূত হয়

জানতুম না সাত জন্মে। আঁচড়িত আইডিন-চর্চিত শ্রীচরণে সে হাত বুলোয়। — আবার ম'রে ভূত হবার পরেও এমন বেঁচে জলজ্যান্ত থাকে তা কে জানতো।

বেড়ালের ভূত মানুষের কোন ক্ষতি করে না। করতে পারে না। বরং ভেবে দেখলে— আমি ভেবে দেখি মানুষের উপকারেই লাগে। মনে কর তুই যেমন ঘন্টায় চার বার করে আমায় দুধ গেলাবার জন্য কোমর বেঁধেছিস, তাতে ঐ ভুতুড়ে বেড়ালটা এখানে না থাকলে আমার কি দশা হতো? আমি কি বাঁচতাম? ওর সাহায্য না পেলে কি ?

— তোমার আদরের বেড়াল নিয়ে তুমি থাকো। আমার বোনার কাজ ফেলে এসেছি— বলে আমার আদুরে বিনি ব্যাজার মুখে চলে যায়।

এবার আমি চিঠিখানা নিয়ে পড়ি —

মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী। ঐ দশ নম্বর বাড়ীর রহস্য হয়ত আপনার জানা নাই। সেই জন্যই আপনাকে সমস্ত জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি।

হ্যাঁ খুলেই বলি সব — যে বাড়ীতে আপনারা এসে উঠেছেন, বছর দুই আগে আমবাই সেখানে থাকতাম। কিন্তু যে কারণে ঐ বাড়ী — অমন চমৎকার বাডী—আমাদের ছাড়তে হোল সেই কথাই বলছি ।

মাঝের যে ঘরটায় এখন আপনি এসে আছেন, ওইটায় আমার শোবার ঘর আর তাঁর ল্যাবরেটারী। আমার কাকা একজন পাস করা বৈজ্ঞানিক! নাম করলেই টের পাবেন বলে এর বেশী আর জানালাম না। ঐ ল্যাবরেটারীতে বসে তিনি নানা রকমের গবেষণা করতেন। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতো তার ঐখানেই। এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন তিনি অদৃশ্য হওয়ার উপায় আবিষ্কার করে বসলেন। পরীক্ষায় লাগানোর কাজে কতগুলো বিলাতী ইঁদুর তিনি আনিয়েছিলেন।

ইঁদুরগুলো সাহেবদেরই মতো সাদা! সেই শ্বেতকায়দের নিয়েই তাঁর যতো পরীক্ষা চলতো। সেদিনের কথা এখনো আমার স্মরণে আছে। "হাঁকাহাঁকি করে তিনি ডাকতে লাগলেন সবাইকে। সবাই আমরা ছুটে গেলাম— তার গবেষণা ঘরে। তিনি বল্লেন— দ্যাখ। কি হয়েছে দ্যাখ।"

সবাই আমরা চোখ প্যাট প্যাট করে তাকালাম। না, দেখবার কিছু নেই কোথাও—কিছু নেই।

দেখছিস না খাঁচাটা ? চেয়ে দ্যাখ্ ভালো করে। বলে তার সাহেবী ইঁদুরের খাঁচাটা দেখালেন। দেখলাম, যে খাঁচাটায় তার ইঁদুর সাহেবরা থাকত সেটা বিলকুল ফাঁকা, কোথায় গেল ইঁদুরগুলো? জিগ্যেস করলাম আমরা।

— আছে রে। ওইখানেই আছে। ওরই মধ্যে রয়েছে। — গর্বের হাসি হাসলেন কাকা — অদৃশ্য হয়ে রয়েছে সবাই।

আমার কাকা ভারি চালাক লোক। অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আছে ভগবানের মতোই তাদের অস্তিত্বে কেউ অবিশ্বাস করে সেই জন্যে আগের থেকেই তাদের গায়ে জ্বলজ্বলে কোন জিনিস লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলুম সত্যিই তো। কতকগুলো

উজ্জ্বল আলোকবিন্দু খাঁচার ভিতর ঝলমল করছে। জাজ্জ্বল্যমান একপাল তিড়িং তিড়িং।

সবাই আমরা খাঁচার চারধারে ঘিরে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে সেই আলোর কণাগুলি এমন লাফঝাফ লাগালো যে বলবার ন: । সেই উত্তেজনার মুহূর্তে একজন আমাদের খাঁচার দরজা খুলে দিলো একবার — কী মজা হয় দেখবার জন্যে, তারপর আর দেখতে হলো না। দেখতে না দেখতে জ্বলন্ত ফোঁটাগুলি বেরিয়ে পড়লো খাঁচা থেকে — ছিটকে পড়লো। ছিটকে পড়লো চারধারে — ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল ঘরময়।

কাকা তখনি আমাদের তাঁর ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল এঁটে দিলেন। তিনি খুব চটে গিয়েছিলেন আমাদের এই কান্ডে— এই অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে, তা বলাই বাহুল্য। তারপর কি হলো শুনুন, তার দিনকতক বাদে। যখন সেই অদৃশ্য ইঁদুরের কথা আমরা ভুলে গেছি। কাকার আবিষ্কার কাহিনী আর আমাদের মনে নেই, খেতে বসেছি আমরা সবাই গোল ঘরটায়। কাকীমা পরিবেশন করছেন। এমন সময়ে কাকীমার আদরের মেনি বেড়ালটা ফিরলো বাহির থেকে। এসে জমলো আমাদের পাতের গোড়ায়। বসে খালি সে মুখ মুছতে লাগলো নিজের। মুখের ভাব ভারী হাসি খুশী। কোথা থেকে তিনি যে বেশ কিছু সাঁটিয়ে এসেছেন তা বুঝতে পারা শক্ত নয়।

তারপর কি বলবো মশাই — বসেছিলো বেড়ালটা আমাদের সবার চোখের সামনেই। চোখের ওপরেই সেটা কেমন ছায়ার মত ঘোলাটে হয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই ছায়া মূর্তি ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল একেবারে। দেবতারা যেমন অন্তর্হিত হন ঠিক সেই মতন।

আমরা খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম।

কাকাবাবু খেয়ে দেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন তাঁর বেতের চেয়ারে। আমরা ছুটে গিয়ে ঘটনাটা তাঁকে জানালাম — তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে। কিন্তু বিশদ করে সব বোঝাবার আগেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন, তার সযত্ন সমুজ্জ্বল লাঙ্গুলের কতোখানি কোন অদৃশ্য জীবের তাড়নায় তাঁর কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো আচমকা। তিনি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ালেন একলাফে। কাকীমার বেজায় আদরের ছিল বেড়ালটা, তার অন্তর্ধানে তার প্রাণে কিরকম ব্যথা লেগেছিল অনুমান করতে পারবেন। নামজাদা বিজ্ঞানীর বৌ হলে কী হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যাকে বলে তা তার আদপেই ছিল না। বেড়ালের তিরোধানে মর্মাহত হয়ে কাকাবাবুকেই তার জন্য দায়ী করে তার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না বলেই কাকীমার বুদ্ধি ছিল একটু বেশী। একদিন তিনি করলেন কি একটা বড় জামবাটিতে দুধ ভর্তি করে রেখে দিলেন ঘরের মেঝেয়, আর আমাদের সবাইকে বলে দিলেন ম্যাও ম্যাও করে বেশ মৌজ করে গলা সাধতে।

আমরা সাধ্যমত সুর করছি। আমাদের সাধাসাধিতেই কিনা বলা যায় না। দেখলাম বাটির দুধ কমে আসছে — কমতে শুরু করেছে ক্রমেই। আমাদের সুরধুনি নামতেই না, বেড়ালটা তাঁর অদৃশ্য গোঁফ ডুবিয়েছে দুধ পাথারে। দুধের সেই কমতির মুখে, কাকীমা করলেন কি — সুকৌশলে তার পুষিকে পাকড়ে ফেললেন। তাকে ধরে না তার গলায়

একটি লাল রঙের রুমাল বেঁধে দিলেন কায়দা করে।

তারপর থেকেই যতো অদ্ভুত কান্ড আরম্ভ হোল আমাদের বাড়ী, নিত্য নতুন মজা। কোথাও কিছু নেই। বাড়ীময় একটা লাল রুমাল ঘুর ঘুর করছে — লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে চারধারে। কখনো বা দেখা যেত কতগুলি অগ্নিবিন্দু হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে আর তাদের পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে উদ্যত এক লাল ঝান্ডা। যাক্‌, দেখতে দেখতে সব আমাদের গা সওয়া হয়েগেল।

তারপর এলো আরেক উৎপাত— তার কিছুদিন পরেই। মনে হোল অগ্নিপুচ্ছদের সংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে চলেছে — এদিকে পুষির বংশবৃদ্ধির ও খবর পেলাম আমরা। প্রচুর কচিগলায় মিশানো মিঠে আওয়াজেই তা জানা গেল। চারধার থেকেই অদৃশ্য কণ্ঠের অবিশ্রান্ত মিউমিউ শুনে আর অফুরন্ত আলোর ঝিলমিল দেখে সবাই আমরা কেমন মিইয়ে গেলাম— এমন কি আমাদের বৈজ্ঞানিক কাকাবাবুও। কুরুবংশ আর পান্ডুবংশ —দুই পক্ষেই বাড়তে লাগল মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদে। আর সেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে বাস করা আমাদের নিতান্তই কঠিন হয়ে উঠল। আমরা পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হলাম তারপর।

সেই থেকে ও বাড়ী খালি পড়ে ছিলো অ্যাদ্দিন। এখন আপনারা এসেছেন। যাই হোক আপনারা যেন ঘাবড়াবেন না যদি আপনার আনাচে কানাচে অগ্নিশিখাদের নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখেন, যদি কখনো বা হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখতে পান বা কোন অলক্ষিত নখরের লক্ষ্য হন জানবেন সেটা বিজ্ঞানের জয়স্তম্ভ। আমাদের কাকাবাবুর দান। তার সৃষ্টির আনন্দ— বৈজ্ঞানিক খুশি। আর কাকীমার পুষির বংশ বিস্তার। তার জন্য ভয় পাবেন না যেন। অদ্ভুত হলেও ভূত নয় ওসব। বেড়ালের ভূতটুত না — শুধু সেই একটি বেড়ালই বেড়ে বেড়ে এখন প্রভূত হয়েছে।

প্রীতি নমস্কার নিন।

ইতি আপনাদেরই এক অদূর প্রতিবেশী।

পুনশ্চ : —মাছ আর দুধের পাত্র সব সময়েই ঢাকা দিয়ে রাখতে যেন ভুলবেন না।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বিনির ঘরে যাই। এ বাড়ীর ওখানকার বাড়াবাড়ির সব রস সমস্ত রহস্য আবিষ্কার করতে চাই তার কাছে। গিয়ে দেখি বিনি দেবী বেতের চেয়ারে বসে বেতসের মতই কাঁপছেন— তার দুচোখ ভয়ে বিস্ফারিত। আর তার আধ-বোনা ব্লাউজখানা পড়ে আছে এক ধারে একান্ত অবহেলায়। এবং তার উলের গুলতি নিয়ে —

গুলতি নিয়ে সাত দিক থেকে সাতটি অদৃশ্য খেলোয়াড় ফুটবল খেলতে লেগেছে দেখলাম। তারপর আর রহস্য বিস্তার করেও কোন ফল হল না। বিজ্ঞানের মহিমা ফলাও করেও নয় — বিনি সেইদিনই সেইদন্ডেই — আমাকে নিয়ে চলে এলো সেখান থেকে। চলে এলাম আমাদের পুরানো বাড়ীতে — আমার পুরানো হাট ট্রাবলে। সে বললে, শুধু একটা কথায় বললে, হ্যাঁ মানি এটা বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তা বিজ্ঞানের সব দান আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে, এমন কি তা অ্যাটম বোমা হলেও একথা আমি মানতে রাজী নই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা খুব ভালো, কিন্তু তার কাছাকাছি বাস করতে নেই।

নিশির ডাক

স্বপন বুড়ো

ঝন্টা যখন একেবারে কোলের ছেলে — তখন তার মায়ের শক্ত অসুখ করে। সেই জন্যে সে আহ্লাদী পিসির কোলে মানুষ হয়। আহ্লাদী পিসি ঝন্টার বাবার দূর সম্পর্কের এক বোন, মাথায় একটু ছিট আছে বলে শ্বশুরঘর ক রতে পারেনি। আবার কারণে অকারণে এলোমেলো আহ্লাদীর মতো কথা বলে তার নাম হয়েছে আহ্লাদী। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সে তাই আহ্লাদী পিসি। মায়ের অসুখ থেকে সেই যে ঝন্টাকে সে কোলে তুলে নিলো, তার পরেই ছেলেটা ওর এমন ন্যাওটা হয়ে গেল যে, মায়ের অসুখ ভাল হলেও আহ্লাদী পিসি আর ওকে কোল থেকে নামাতে চায় নি। ঝন্টাও আহ্লাদী পিসি বলতে একেবারে অজ্ঞান! আহ্লাদী পিসি স্নান করিয়ে দেবে! পিসিকে না হলে ঝন্টার এক মুহূর্ত চলে না। ঝন্টার মা-ও সাত ঝামেলায় দিবা-রাত্রি জড়িয়ে থাকেন, তাই আহ্লাদী পিসির কোলে ছেলে দিয়ে তাঁরও সকল রকমে নিশ্চিন্তি।

আহ্লাদী পিসি মাছ খেতে বড় ভালবাসে। বিশেষ করে শোল মাছ। ঝন্টা যখন একটু বড় হলো সে পিসির জন্যে নানা রকম মাছ ধরে নিয়ে আসে। পিসি এক গাল হেসে, বলে

'ভাগ্যিস আমার ঝন্টা ছিল, তাই দুটো মাছ-ভাত খেয়ে বাঁচি।'

বর্ষায় যখন দেশের নদী-নালা ভরাট হয়ে আসে— নিজেদের পুকুরে জল পড়ে, ঝন্টা গভীর রাত্রে গিয়ে নানা ধরনের মাছ ধরে নিয়ে আসে— বিশেষ করে আহ্লাদী পিসির জন্যে শোল মাছ যদি পায় তবে তার মুখে হাসি ধরে না।

এক কথায় ঝন্টা পিসির জন্য সব করতে পারে। আবার ঝন্টাই পিসির সব। আহ্লাদী পিসি মরলে যে ঝন্টাই তার গলায় পিন্ডি দেবে — এই কথাই সে সগর্বে সবাইকে বলে বেড়ায়!

'আহ্লাদী পিসি হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা গেলো।

দিব্যি শক্ত-সমর্থ আহ্লাদী পিসি — দেহে রোগ বালাই নেই — অমনভাবে যে হঠাৎ মারা যাবে তা বাড়ির কেউ ধারণাই করতে পারে নি। দুর্দান্ত দস্যি ছেলে ঝন্টা — আহ্লাদী পিসির মৃত্যুর পর কে যেন তার মুখে বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। কারো সঙ্গেই কথা কয় না, খায় না উদাস চোখে একদিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলে যেন দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো।

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে ঝন্টা ধড়মড় করে উঠে বসে।

মা শুধোন, 'হ্যাঁরে ঝন্টা, বিছানার উপর উঠে বসলি কেন? এখন তো অনেক রাত। ঘুমিয়ে পড়।'

ঝন্টা ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিকে তাকিয়ে, তারপর ফিসফিস্ করে মাকে সে বলে, 'আহ্লাদী পিসিমা, আমায় ডাকলো যে।'

শুনে মা শিউরে ওঠেন। ঝন্টার গায়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। মুখে বলেন, 'রাম রাম।'

পাড়ার পাঁচজন বৌ-ঝি বলে, অ, 'ঝন্টার মা, ওর দিকে বেশ কড়া নজর রেখো। পোড়ারমুখী আহ্লাদী মরেনি। তাই বুঝি এখনো আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে!'

ঝন্টাদের বাড়ির নীচে পুকুরপাড়ে একটা শ্যাওড়া গাছ; গাঁয়ের লোকেরা হাট থেকে সওদা করেফেরবার মুখে এই শ্যাওড়া গাছের ডালে কাকে যেন বসে থাকতে দেখেছে।

বৃন্দাবন গাঙ্গুলি একদিন নাকি, একেবারে সামনা-সামনি পড়ে গিয়েছিলেন। বললেন 'ভাগ্যিস আমি বুদ্ধি করে পৈতেটা হাতে জড়িয়ে ধরে গায়ত্রী জপ করতে শুরু করলাম। নইলে ঝন্টাদের পুকুরের পাড়ে আমার ঘাড় মটকে রাখতো।' এই ভাবে সারা গাঁয়ে একটা চাপা ফিস ফিস আলোচনা। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়।

তখন আষাঢ় মাস। আশেপাশের নদী নালা বর্ষার জলে ভরাট হয়ে গেছে। ঘোলা জল পাক খেতে খেতে ধানের জমি ভরিয়ে মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে, উচুঁ নিচু গাঁয়ের পথগুলিকে পিছল করে ঝন্টাদের বাড়ির পুকুরের খালে ঢুকছে।

তখন বোধ করি দুপুর রাত। এমন একটা আবছা জোছনা ফুটেছে যে, আশে-পাশে দূরে সব কিছু নজরে পড়ে, কিন্তু ভালো করে ঠাহর করা যায় না। মনে হয়, যেন একটা পাতলা কুয়াসা জোছনার সঙ্গে মিশে গোটা গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছে।

মায়ের পাশে শুয়ে ঝন্টা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বাড়ির পিছন দিক দিয়ে একটা কালো বেড়াল বিকটভাবে ডেকে গেলো! কোথায় একটি ভুতুম পাখি একটানা ডেকে ডেকে বিরক্তি জাগিয়ে তুলছে। একটা থমথমে ঝিম্ ঝিমে ভাব...

এমনি সময় ঝন্টার হঠাৎ মনে হলো — ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আহ্লাদী পিসি ওকে ডাকছে। বলছে, 'ওরে ঝন্টা শীগগির আয় — তোদের পুকুরে নতুন জল এসেছে। কতো মাছ উঠছে— দেখবি আয় । তোর পোলোটা নিয়ে আসতে ভুলিসনি যেন!'

আচমকা ঝন্টার ঘুম ভেঙ্গে গেল! সে বিছানার ওপর উঠে বসলো। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো, সবাই অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার মায়ের ডান হাতটি ওব গায়ের ওপর ছিলো। আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে রাখলো।

কে যেন কানের কাছে বললো, দরজাটা ভেজিয়ে দে ঝন্টা, নইলে ওরা জেগে উঠবে। ঝন্টা বিনা প্রতিবাদে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হনহন করে পুকুরের ধারে চলে গেলো।

নিশুতি রাত, কেউ কোথাও জেগে নেই। কল কল করে বর্ষার জল ঢুকছে খালে— ঝণ্টা ছপ্ ছপ্ করে পোলো ফেলছে আর রাশি রাশি মাছ ধরছে। এত শোল মাছ কোত্থেকে এলো—ঝণ্টা ভেবে কুলকিনারা পায় না। ও যে খালৈ সঙ্গে এনেছিল, সেটা মাছে ভর্তি হয়ে গেল। কিসের যেন একটা পোড়া গন্ধ ক্রমাগত তার নাকে আসছিলো। তার আকর্ষণে ঝণ্টা সেই মাছ ভর্তি খালৈ নিয়ে এগিয়ে চললো—একি এ যে সেই শ্যাওড়া গাছ।

— আমায় শোল মাছ পোড়া খাওয়াবি ঝণ্টা?

ঝণ্টা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে কে যেন বসে আছে, আহ্লাদি পিসি না? দেখতে ঠিক সেই রকম।

এতক্ষণে ঝণ্টার যেন জ্ঞান ফিরে এলো! আহ্লাদী পিসি তো মরে গেছে। ও তা হলে কার ডাকে এই নিশুতি রাতে মাছ ধরতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে? ভয়ে ওর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠলো। সে প্রাণপণ চেষ্টা করলো পালিয়ে যেতে কিন্তু পা দুটো কিছুতেই উঠছে না। শেষকালে মনে জোর এনে ঝণ্টা মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করে দিল। পেছন থেকে আহ্লাদী পিসির কান্না শোনা গেল, ওঁরে ঝণ্টা, শোঁল মাঁছগুলো আমায় দিঁয়ে যাঁ আমি আর কিঁছু চাঁইনে—'

আহ্লাদী পিসির কথা যত কানে আসে, ঝণ্টা ততো ছোটে। হঠাৎ সে দেখলো একটা বিরাট লম্বা শ্যাওড়া গাছের ডাল ওদিক থেকে এসে তার হাতের মাছের খালৈ ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

একটা আর্তনাদ করে ঝণ্টা সেইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল! তার চীৎকার শুনে বাড়ি থেকে লোকজন এসে যখন পৌঁছলো, ওর মুখ দিয়ে তখন গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।

অবশেষে মায়ের বুকভরা কান্নায় তিনদিন পর ঝণ্টা তাকালো। কিন্তু কি হয়েছিল কোনো কথাই সে মনে করতে পারে না, শুধু বোকার মতো ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকে।

গাঁয়ের সবই বললো, দেখো ঝণ্টার মা, এখন থেকে ঝণ্টাকে একেবারে চোখে চোখে

রাখতে হবে। পেত্নীরা ওই রকম করে নিশির ডাকে ভুলিয়ে জলার ধারে ঘাড় মটকে রাখে।

শুনে ঝণ্টার মার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। সারারাত ধরে ছেলের শিয়রে জেগে থাকে। ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। ভাবে আমার শান্তির সংসারে এ কী হলো। কি কুক্ষণেই পরের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম।

এদিকে হঠাৎ বাড়ির লোকে লক্ষ্য করলো যে কেমন যেন পাগলা চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে ঝণ্টা।

হঠাৎ সে বলে বসলো, 'আমি পোড়া শোল মাছ খাবো।'

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা পোড়া শোল মাছ ঘরের মাঝখানে এসে পড়লো। ভয়ে আঁৎকে উঠলো সবাই।

ক্রমে ব্যাপারটা সহজ হয়ে এলো। দেখা গেল যে, ঝণ্টা যখন যা চায় কে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাই এনে হাজির করে।

সেদিন দুপুরে গরমে আই ঢাই করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠে ঝণ্টা বললো, 'মা এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও না।'

মুখের কথা খসাতে যতটুকু সময়। দেখা গেল, সুন্দর একটি গেলাসে টলটলে পরিষ্কার জল। ঝণ্টা সেই জল খেতে যাচ্ছিল কিন্তু ওর মা হাত দিয়ে সবটুকুন মেঝেতে ফেলে দিয়ে বললেন, 'কক্ষণো মুখে দিসনে ঝণ্টা..... ওসব পেত্নীতে যোগাচ্ছে!'

সন্ধ্যের পর পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে আসতো ঝণ্টাকে দেখতে। কথায় কথায় গাঙ্গুলী-গিন্নী বললেন, 'আমার জর্দা ফুরিয়ে গেছে। কাশীর জর্দা না হলে আমার মুখে রোচে না।'

আপন মনে ঝণ্টা বললো, 'তুমি জর্দা খাবে ঠানদি?' সঙ্গে সঙ্গে ঠন্ করে মেঝেতে পড়লো একটি কৌটো।

গাঙ্গুলী-গিন্নী অবাক হয়ে বললেন, 'এই তো কাশীর জর্দা? একেবারে নতুন কৌটো। কোত্থেকে এল ঝণ্টার মা।'

আর যারা আশে পাশে ছিল—ব্যাপারটা জানতো তারা খুলে বললো।

জর্দার কৌটোটা গাঙ্গুলী-গিন্নী হাতে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যেই আহ্লাদী পেত্নীর কথা শুনলেন, অমনি 'রাম রাম' করতে করতে একেবারে নিজেদের বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

যতদিন ব্যাপারটা তামাসা থাকে লোকে ভিড় জমায়। কৌতূহলী হয়ে বসে থাকে পেত্নীর কাণ্ড দেখতে। কিন্তু কত রাত্তির লোকে এইভাবে না ঘুমিয়ে জাগতে পারে?

কাজেই আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে আসতে লাগল। গমগমে বাড়ি আবার মানুষ জনশূন্য থমথমে হয়ে এল।

কিসের যেন দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝ রাত্তিরে ঝণ্টার মায়ের ঘুম ভেঙে যায়। মা ছেলেকে বুকের কাছে প্রাণপনে টেনে নেন। বাঁশঝাড়ের পেছন দিকে যেখানে একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে

চলে, সেখানে কার যেন কান্নার রেশ শুনতে পাওয়া যায়।

মা চমকে উঠে বসেন। ছেলের মাথায় হাত রেখে সারারাত ধরে দুর্গা নাম জপ করতে থাকেন। কেবলি মনে হয়, তাঁর কোলের ছেলেকে কে যেন ছিনিয়ে নিয়ে আসছে।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। দূর বনে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকছে—মনে হচ্ছে যেন ওরাও খুব ভয় পেয়েছে। পাখি পাখালিরা কখন যে গিয়ে বাসায় সেঁধিয়েছে—কেউ খবর রাখে না, গেরস্ত বাড়ির গোয়ালগুলোতে গরুগুলো এমনভাবে হামলাচ্ছে যে, মনে হয় তারা অশুভ কোনো ইঙ্গিত পেয়েছে। মাঝে মাঝে কালো-প্যাঁচার চ্যাঁচানি কানেভেসে আসছে।

শ্মশানের দিক থেকে একটা শোঁ শোঁ হাওয়া বুক চিরে উত্তর অঞ্চলের জলাভূমির ওপর দিয়ে বইছে। মনে হচ্ছে, কোনো পেত্নী বুঝি নিঃশ্বাস ফেলছে। গাঁয়ের পথে আজ একটিও লোক নেই। কোনো বাড়িতে একটি ছেলেও কেঁদে উঠছে না। মনে হচ্ছে, রুদ্ধ আতঙ্কে সবাই প্রহর গুণছে।

ঝণ্টাদের বাড়িতে আজ সবাইকে কি কাল-ঘুমে পেয়েছে কে জানে। সন্ধ্যেবেলা উনুনে আগুন পড়েনি। বামুনদিদি ঘুঁটে আর কয়লা সাজাতে গিয়ে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের ঘরে বাড়ির কর্তারা সন্ধ্যে থেকেই দাবা পাশা খেলতে বসেন, তাদের চীৎকারে আশেপাশের দশটা লোক ঘুমতে পারে না। আজ আঁধার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দাবার ছক্ একপাশে সরিয়ে রেখে সবাই ফরাসের উপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলছে তারই সঙ্গে তাল বজায় রেখে খানা ডোবার ব্যাঙেরা আসর জমিয়ে তুলছে! আকাশের সমস্ত তারা মেঘে ঢাকা পড়েছে। মাথার ওপর কালপুরুষ—একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে বলে বুঝি দম বন্ধ করে প্রহর গুণছে। ঝড়ের গর্জনে বিপদের ইঙ্গিত।

মায়ের পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে ঝণ্টা। এমন ঘুম যে, দেখে মনে হয়—ওর দেহে বুঝি প্রাণ নেই।

আকাশের বৃষ্টি, ঝোড়ো হওয়া, ঝিঁ ঝিঁর ডাক, ব্যাঙের শব্দ, প্যাঁচার চ্যাঁচানি আর কালপুরুষের নীরব ইঙ্গিত ওকে যেন এমনভাবে ঘুম পাড়িয়েছে যে সে ঘুম আর ভাঙবে না।

কিন্তু হঠাৎ বেড়ার পাশে কার ফিসফিসেনী কথা শোনা গেল : 'ঝণ্টা, উঠে আয়, জলের ধারে আজ মাছ থই থই করছে।'

ঝণ্টা এক মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠে।

আবার সেই ফিসফিসেনী আহ্বান ভেসে এল।

উদাসদৃষ্টিতে ঝণ্টা উঠে বসলো। কার ডাক—কোথায় যেতে হবে—কিছু জানে না—তবু সে উঠে দাঁড়ালো পাগলের মতো।

আবার সেই বাঁশবনের কানাকানির মতো কার আহ্বান।

'আজ আর পোলো নিসনে ঝণ্টা, খাপলা জালটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বেরিয়ে আয়—' এই প্রহেলিকাময় নিশির ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই।

ঝণ্টা খাপ্‌লা জালটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে দরজার হুড়কোটা খুলে উঠোনে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লাগানো মেঘের গর্জন—আর বাদুরের ডানার ঝটপটি।

কিন্তু মেঘের ডাকেও কারো ঘুম ভাঙল না।

ছায়ামূর্তির হাতছানিতে ঝণ্টা জলের দিকে এগিয়ে যায়।

পথে অন্ধকার এত জমাট বেঁধে আছে... তবু ওর পথ চলতে কোনো অসুবিধে হয় না।

'ওই যে ওইখানে। কত মাছ ঘাই মারছে....। তুই দেখতে পারছিস নে ঝণ্টা? এগিয়ে যা, ছুঁড়ে দে খ্যাপলা জাল—'

অশরীরীর নির্দেশ শুনে ঝণ্টা একেবারে জলার মধ্যে পা চালিয়ে দিল। তারপর কচুরিপানার মধ্যে তার দেহটা যে কোথায় তলিয়ে গেল সারা গাঁয়ের কেউ জানতেও পারল না। শুধু ঝণ্টাদের বাড়ির কালো বেড়ালটা ওর মায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল। মায়ের কাল-ঘুম তবু ভাঙল না।

পরদিন জেলেরা যখন ঝণ্টার মৃতদেহটা জালে টেনে তুলল, সারা গাঁয়ের মানুষজন একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

গাঁয়ের একজন বর্ষীয়সী মহিলা কপাল চাপড়ে বললেন, 'আহ্লাদী পোড়ারমুখী পেত্নী হয়েও ওকে ভুলতে পারেনি তাইতো রাহু হয়ে ঝণ্টাকে কোলে টেনে নিলে—'

বহু বছর কেটে গেছে, এখনও গাঁয়ের লোকেরা একটু বেশী রাত্তিরে জলার ধার দিয়ে যেতে ভয় পায়। মনে হয়, কে যেন ওখানে, কেঁদে কেঁদে এলোচুল উড়িয়ে, বুক চাপড়িয়ে ছোটাছুটি করে।

একরাত্রির অতিথি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বুড়ো মাঝিটাকে তাড়া লাগানো বৃথা জেনেই অনিমেষ বহুক্ষণ আগেই চুপ করে ছিল। তার ফলে মাঝি আর আরোহী দুজনেই হাল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে। মাঝির বকাটাই রোগ। —এমনি কি ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল ঐটেই পেশা, ওর বউ কতদিন মরেছে, ছেলের বিয়ে দিযে কী ভুল করেছে, জামাই কেন মেয়েকে নেয় না, ছোট জামাইটা জুয়ারী, ছেলেটা নেশা করতে পেলে আর কিছু চায় না—খুব ছেলে বয়সে একবার ও কলকাতায় গিয়েছিল কিন্তু হট্টগোলে মাথা ঠিক থাকে না বলে পালিয়ে আসতে পথ পায়নি—আবার একবার যাবে মা কালীকে দর্শন করতে, ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করবার ফাঁকে ফাঁকে শুধু মাত্র দম নেবার প্রয়োজনে যখন থামে তখনই শুধু দাঁড় বাইবার কথা মনে পড়ে ওর। সুতরাং শহরে যাবার বাস যে পাবে না তা অনিমেষ আগেই ভেবেছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় যে পড়বে তা কল্পনা করেনি। বাসতো নেই ই, আশে পাশে কোথাও মানব বসতির চিহ্নও যেন চোখে পড়ে না।

নৌকো এসে যেখানে ভেড়ে সেখানে বাঁশের মাচা মত একটা আছে, জাহাজাঘাটা হলে অনায়াসে জেটি বলা যেত,সেই মাচাতে নেমে অসহায়ভাবে অনিমেষ একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলে! নীচের ময়ুরাক্ষীর কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। তার স্রোতের গতি থাকলেও তবু একটা প্রাণ স্পন্দন বোঝা যেত—এত মন্থর তারস্রোত, এত নিস্তরঙ্গ মনে হচ্ছে সমস্ত জলটা যেন জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে গেছে—আর তার সেই অতল কালো বুকে কত কী রহস্যময় জীব স্পন্দনহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে—

ওপারে ভগীরথপুর গ্রাম, বেশ সম্পন্ন গ্রাম তা সে জানে, বহু লোকের বাস, অনেক পাকা বাড়ী ইস্কুল ডাকঘর আছে কিন্তু এখান থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। ঘাট থেকে উঠে যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গিয়েছে তার সাদা বালির আভাস নিবিড় বনের অন্ধকারে মিশে গেছে একটুখানি গিয়েই। দু'দিকে বড় বড় গাছ—কী গাছ তা বোঝা যায় না কিন্তু তারই অসংখ্য শাখা-পল্লব সমস্ত গ্রামটাকে যেন চোখের আড়াল করে রেখেছে। আলোর রেখা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

ও পারেই যদি হয় ত এপারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এ পারে যেদিন সে এসেছিল সেদিন দিনের বেলা কোনও গ্রাম ওর চোখে পড়েনি। বাসটা এসে একেবারে এই ঘাটের ধারে দাঁড়ায়, যাত্রীরা সবই ভগীরথপুরের সেদিনও দুদিকে আম গাছের ঘন বন কাটিয়ে এসেছিল—বেশ মনে আছে। হয়ত ছিল কোথাও ঘরবাড়ী কিন্তু তা ওর চোখে পড়েনি।

পারাপারের জন্য একটা খেয়া নৌকা আছে, চওড়া ভেলার মত প্রকাণ্ড বপু কিন্তু শেষ বাস চলে যাবার পর আর ওপার থেকে কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই জেনে সে ইজারাদারও বহুক্ষণ বাডী চলে গেছে নৌকোটা ওপারে বেঁধে রেখে।

"বাবু ভাড়াটা ?"—তাড়া লাগায় মাঝি।

বিহ্বলতা কাটে কিন্তু যেন আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে অনিমেষ।

" ভাড়াটা কিরে! এই অন্ধকার রাত্রিতে আমি এখানে কোথায় থাকব। তুই তো একঘণ্টার রাস্তা সাতঘণ্টায় এসে আমাকে এই বিপদে ফেললি। এখন নিদেন ওপারে পৌঁছে দে। দেখি কোথায় একটা আশ্রয় পাই কি না, এপারে এই জঙ্গলে শেষে কি বাঘের পেটে প্রাণ দেবো, চল, ওপারে নিয়ে চল্"—

" উটি লারলম্ আজ্ঞা।"

"সেকি! কেনরে? কী হয়েছে?"

তার উত্তরে মাঝি যা বললে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ওপারে অন্য নৌকো গেলে খেয়ার ইজারদার বড্ড বকাবকি করে, পুলিশে ধরিয়ে দেয় সুতরাং ওপারে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ তাকে অনেক করে বোঝালো। ওপারে তোকে ধরবার জন্য ইজারাদার যদি বসে থাকত ত অনিমেষ তাকেই ডাকত। শুধু ইজারাদার কেন জনমানবের চিহ্ন থাকলেও সে মাঝিকে এ অনুরোধ করত না। কোন মতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে যাক, "তাতে যদি

কেউ তাকে ধরেও অনিমেষ তার দায়ী” ইত্যাদি সব কথার উত্তরে তার সেই একই উত্তর—“উটি লারলম্ আজ্ঞা?”

অনিমেষ তখন রাগ করে বললে, “তবে তুইও থাক আমি তোর নৌকাতেই রাত কাটাই।”

“আজ্ঞা উটিও লারল্ম।” শুধু তাই নয়, দাঁড়ের একটা ধাক্কা দিয়ে নৌকাটা খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

“টাকাটা ছুঁড়ে দ্যান্ কেনে—বাড়ী চলে যাই।”

“তবে টাকাও পাবি না যা!” রাগ করে বলে অনিমেষ, কিন্তু যখন দেখে বুড়োটা সত্যি সত্যিই একটা নিশ্বাস ফেলে ঘর-মুখো হচ্ছে তখন সে একখানা একটাকার নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়েই দেয়।

“যা বেটা যা পথে ডুবে মরিস তো ঠিক হয়!” মনে মনে বলে অনিমেষ।

ব্যস্। এরপর সব পরিষ্কার। ওপারে ঘন বনের নিবিড় অন্ধকার' সামনে অতল শান্ত জলে তারই রহস্য আছে জমাট বেঁধে—আর এপারে তার চার পাশে ঘিরেও দৈত্যের মতো কতকগুলি গাছপালা ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তার করে সমস্ত সভ্যতার চিহ্ন এমন কি আকাশকেও যেন আড়াল করে রেখেছে। বাস এসে দাঁড়ায় এবং ঘোরে যেখানটায় সেখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে বটে কিন্তু সে যেন আরও ভয়ঙ্কর।

স্যুটকেশটা মাথার উপরে পেতে সেখানেই জেঁকে বসল অনিমেষ। বাঘ ভাল্লুক যদি সত্যিই আসে তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে—এখানেই খানিকটা তবু নিরাপদ।

খর খর ঝটপট শব্দ করে কী একটা পাখী উড়ে বসলো মাথার উপরে। ভয় পেয়ে চমকে উঠলো অনিমেষ। কাছেই কোথায় শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কি একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয়। সামান্য শব্দ তবু বেশ স্পষ্ট। জলের মধ্যে হঠাৎ একটা মাছ ডিগবাজী খায়। ঐটুকু আওয়াজ কিন্তু অনিমেষের মনে হল যেন বন্দুকের শব্দ হল কোথায়।

বিশ্রী লাগছে। নক্ষত্রের আলোতে যতদূর দৃষ্টি চলে বহুক্ষণ ধরে হাত ঘড়িটা দেখলে রাত ন-টা। কলকাতায় সবে সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। এখনও দীর্ঘ সময় তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কখন ভোর হবে, তারপর কখন ইজারাদারের ঘুম ভাঙবে তবে সে একটু লোকালয়ের মুখ দেখতে পাবে। বাস একটা আসে এখানে সকাল আটটা নাগাদ—সন্ধ্যাতে যেটা এসেছে সেটা কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, সাতটা নাগাদ এখানে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টা এখনও।

আচ্ছা, হাঁটলে কেমন হয়? বাসের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকলে কি আর একটা গ্রাম পাওয়া যায় না কাছাকাছির মধ্যে?

কিন্তু যদি তাকে আশ্রয় দিতে কেউ না চায়? ডাকাত বলে মনে করে? তাছাড়া দুদিকে যে ঘন বন, যদি বাঘ আসে? মুর্শিদাবাদ জেলায় এ সব অঞ্চলে প্রায় বাঘ বেরোয়।

দরকার নেই। দশ এগারো ঘণ্টা সময়—এক রকম কেটেই যাবে।

“মশাই শুনছেন? বাস মিস করেছেন বুঝি? কোথাও আশ্রয় পান নি?”

অস্ফুট একটা শব্দ করে চমকে ওঠে অনিমেষ, বরং আঁতকে ওঠে বলাই ঠিক। কখন নিঃশব্দে কে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত, যেন একটা কথা শেষ হবার আগেই আর একটা শুরু হয়েছে—এইভাবে পর পর তিনটি প্রশ্ন করে আগন্তুকটিও চুপ করে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

অবশেষে মরিয়া হয়েই অনিমেষ ফিরে তাকায়।

রোগা কালো গোছের একটা মানুষ খুব বেঁটে নয়—তাই বলে ঢ্যাঙ্গাও বলা চলে না। উসকো খুস্‌কো এক মাথা চুল ও ঘন দাড়ি কিন্তু আবক্ষ বিস্তৃত নয়। মধ্যে মধ্যে কামানো বা ছাঁটা নয়—এমনি দাড়ি, খোঁচা খোঁচা। একখানা খাটো আধ ময়লা কাপড় পরনে—কোঁচার খুট গায়ে জড়ানো। মোটা ভুরুর আড়ালে কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিঃশব্দে শুধু মাত্র চাউনিব দ্বারাই যেন অনিমেষের সমস্ত ইতিহাস পূর্বাপর আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছিল।

"বলছিলুম যে আপনি বোধ হয় কোথাও আশ্রয় পাচ্ছেন না—না? তা হ'লে বরং চলুন না হয় আমার কুটিরেই—কোন মতে রাতটা কাটিয়ে দেবেন।"

হায়রে আগুলফ লম্বিত—কুন্তলা বনমালা শোভিতা কপালকুণ্ডলারা শুধু উপন্যাসেই দেখা দেয়।

যাক্ গে, নবকুমারের অদৃষ্ট তার নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই বলে কি ওর চেয়ে ভদ্র চেহারার কেউ জুটতে নেই। এ লোকটাকে দেখেই পাগল বলে মনে হয়—শেষ পর্যন্ত এর আশ্রয়ে গিয়ে কি আরও বিপদে পড়বো!

"কী বলেন? যাবেন নাকি?"

"আ— আপনি এখানে—মানে" আমতা আমতা করে অনিমেষ।

"আমার এখানেই একটা ঘর আছে, এই যে।" লোকটা আঙ্গুল তুলে দেখায়।

সত্যিই ত, এই তো, বলতে গেলে তার সামনেই পাড়ের ওপর একখানা খড়ের ঘর... অঞ্চলে যেমন হয় তেমনি। আশ্চর্য্য, এতক্ষণ তার চোখে কি হয়েছিল?

লোকটি বোধ হয় তার মনের ভাব বুঝেই হেসে বললে, "ঘরে আলো ছিল না কিনা, তাই অন্ধকারে টের পাননি। আমিও বাড়ী ছিলুম না, নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। অন্ধকারে একা একা বেড়াতে আমার বেশ লাগে।"

"এখানে বাঘের ভয় নেই?"

"আছে বৈকি। তবে আমার অত ভয় নেই! ..... মরবার ভয় করি না। করেই লাভই বা কি বলুন, মরতে তো একদিন হবেই।"

না, লোকটাকে ঠিক পাগল বলে তো মনে হয় না!

"চলুন চলুন, ঘরে বসেই কথাবার্ত্তা হবে এখন।" লোকটা তাড়া লাগায়।

"চলুন" বলে স্যুটকেসটা তুলে নেয় অনিমেষ।

একখানা নয়—দুখানা পাশাপাশি ছোট ঘর, সামনে একফালি দাওয়া। ভেতর দিকে আরও কি আছে তা ওর নজরে পড়ল না। বেশ ঝকঝকে করে নিকানো, পরিচ্ছন্ন দাওয়া।

লোকটা আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে "দাঁড়ান আলো জ্বালি" বলে ওকে দাওয়াতেই দাঁড় করিয়ে রেখে দোর খুলে ভেতরে ঢুকলো। তালা চাবির বালাই নেই, দোর শুধু ভেজানোই ছিল ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আশ্চর্যরকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা আলো জ্বেলে লোকটি বললে "আসুন—ভেতরে আসুন।"

ঘরে আসবাবপত্র বেশী ছিল না। একটি তক্তপোষের ওপর একটা মাদুর বিছানো, শয্যা বলতে এই, একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। একপাশে একটা দড়িতে টাঙানো খান দুই কাপড়, তার মধ্যে একটা লাল—মেঝেতে জলের মেটে কলসী, একটি ঘটি, এবং পিতলের পিলসুজে একটা মাটির প্রদীপ। এছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

"বসুন বসুন। ঐ চৌকিটির ওপরেই বসুন।" তারপর খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিজের দুই হাত ঘষে কেমন একরকমের বিচিত্র হাসি হেসে বললে, "ভালো বিছানা আমার নেই। ঐ স্যুটকেসটা মাথায় দিয়েই শুতে হবে...... আর খাবারও তো কিছু দিতে পারব না। আমার ঘরে কিছুই নেই..... আপনি মদ খান?"

যেন একটা আকস্মিক উগ্রতা দেখা দেয় ওর প্রশ্ন করবার ভঙ্গীতে।

"না না। রক্ষে করুন। কিছু ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে। আশ্রয় পেয়েছি এই ঢের"।

"ঐ আশ্রয়টুকুই যা। বাঘ ভাল্লুকের হাত থেকে তো বাঁচলেন অন্ততঃ—তা আশ্রয় ভালোই। ঘরখানা মন্দ নয়, কী বলেন?"

বলতে বলতে হেসে ওঠে সে। সাদা ঝকঝকে দাঁত কালো দাড়ির ফাঁকে চক্‌চক করে।

অনিমেষের যেন ভালো লাগে না ওর ভাবভঙ্গী। আবারও সেই সন্দেহটা মনে জাগে—পাগলের পাল্লায় এসে পড়ল নাকি?

"আপনি এখানে কি করেন?"

"আপাতত কিছুই না। আচ্ছা বসুন, আমি আসি, মুখ হাত ধোবেন নাকি?"

ধুতে পারলে ভালোই হ'ত কিন্তু অনিমেষের তখন নড়তে ইচ্ছে করছে না, সে বলল, —"না—দরকার নেই!"

লোকটি বেরিয়ে গেল, অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে বসেই রইল। ভালো বোধ হচ্ছে না ওর। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী করে লোকটা এখানে, এমন একাই বা থাকে কেন? ঘরে কোনরকম কিছু খাবার নেই তো ও নিজে খায় কি? চোর ডাকাত নয় তো? লোকজন ভুলিয়ে এনে শেষে—

ঈশ্বর বাঁচিয়েছে—ব্যাগে ওর খানকতক কাপড় জামা ছাড়া আর কিছুই নেই। পকেটেও মাত্র টাকা ছয়েক আছে, কিন্তু একটু পরেই সমস্ত দেহ হিম হয়ে ওর মনে পড়ে... এই সব উদ্দেশ্যে যারা নিয়ে আসে ভুলিয়ে টাকা না পেলে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মেরে ফেলেও দেখবে কী আছে। ওদের দেশে একবার খুব ডাকাতের উপদ্রব হয়েছিল, তারা একটি লোককে খুন করার পর পেয়েছিল মাত্র একটি আধলা।

কখন গৃহস্বামী আবার নিঃশব্দে ওর কাছে দাঁড়িয়েছে অনিমেষ টেরও পায় নি, যদিও

খোলা দরজার দিকে চেয়েই বসেছিল সে, আশ্চর্য!

লোকটি বললে, "এখনই শুয়ে পড়বেন নাকি? যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো স্বতন্ত্র কথা। নইলে একটু বসি, কতদিন লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাইনি। বলেন তো দুটো কথা কয়ে বাঁচি। —এখানে লোকজন তো নেই, আসেও না কেউ—"

অনিমেষ আবারও পূর্ব প্রশ্নের জের টানলে, "তা এমন জায়গায় আপনি থাকেনই বা কেন?"

সেই হাসি গৃহস্বামীর মুখে, তেমনি নিঃশব্দ হাসি, দাড়ির ফাঁকে শুভ্র দন্তে সেই বিজলী প্রকাশ।

"ভয় নেই, আমি চোর-ডাকাতও নই, পাগলও নই। ঘরে কিছু নেই মানে আমার কিছুর দরকার নেই, থাকারও দরকার হয় না আমার, কেন জানেন?"

তারপর—যেন কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলে ওঠে, "আমি সাধক। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।"

"সন্ন্যাসী?" অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চায় অনিমেষ।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলে, "না— সন্ন্যাসী মানে ঠিক অভিষিক্ত সন্ন্যাসী নই—তবে সাধক বটে।"

উবু হয়ে ঘরের মেঝেতে বসল লোকটা, কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে বললে, "তাহলে আপনাকে বলেই ফেলি সেটা। কাউকে কখনও বলিনি, বলবার সুযোগও পাইনি বিশেষ। এই অঞ্চলের লোক আমি। বুঝলেন? ছেলে-বেলা থেকেই নানা বইতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত সব ক্ষমতার কথা পড়ে ঐ দিকে মনটা ঝোঁকে। মনে হত আমিও ঐসব সাধনা ক'রে সিদ্ধ হবো, তারপর প্রাণ ভরে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য ভোগ করব—আর আমায় পায় কে।"

"হায়রে, তখন কি জানতুম যে ভোগের উদ্দেশে সাধনা করতে এলে সিদ্ধি তো দূরের কথা সমস্তই খোয়াতে হয় একে একে।"

এই পর্যন্ত বলে লোকটি চুপ করল। এতক্ষণে অনিমেষও অনেকটা সহজ হয়েছে। লোকটির ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তায় সত্য কথা বলছে বলেই মনে হয়। দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল ওর।

"বাড়ী আমার এ অঞ্চলে নয়। বাড়ী সেই পাঁচফুপির কাছে, এখানে কেন এলুম? বলছি দাঁড়ান। বলেছি আপনাকে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দিকে ঝোঁক গিয়েছিল, ইস্কুলের পড়া [illegible]ল না, তার বদলে যত সব ঐ ধরনের বই পড়তে লাগলুম। পড়তে পড়তে বিশ্বাসটা খুব [illegible]কা হয়ে গেল। কিন্তু গুরু কৈ? দু একটা সন্ন্যাসী যা' হাতের কাছে পেলুম দেখলুম সব [illegible]—কেউ কিছু জানে না। অথচ পথ দেখাবে এমন লোক না পেলে এগোবে কি করে? মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবার চিন্তা ছিল না। মাথার উপর বাবা, বড় ভাই ছিল, জমিজমা তারাই দেখাশুনো করত। অবশ্য আমিও বকুনি খেয়েছি ঢের, কাজকর্ম কিচ্ছু করি না বলে, কিন্তু সে সব গায়ে মাখিনি।

"তবে যত দিন যেতে লাগল মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। শেষ-মেষ আমার তেইশ-চব্বিশ

বছর বয়সের সময়ে বাড়ী থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ বুঝেছিলুম ঘরে বসে আর কিছু হবে না। .... এ তীর্থ ও তীর্থ ক'রে অনেক দেশেই ঘুরলুম। ভালো চাকরি বা বিয়ে করার অনেক সুযোগও পেয়েছিলুম, সংসার মশাই মায়ার ফাঁদ পেতে রেখে দেয় সারা জগতে—যাই হোক সেদিকে মন ছিল না বলে কেউ বাঁধতে পারলে না, এমনি ভাবে ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছি, তখন একদিন— বাড়ী ফেরার পথে বলতে গেলে বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ একজনকে পেয়ে গেলুম। বক্রেশ্বরের শ্মশানে এক সাধু থাকেন শুনেছি, উলঙ্গ থাকেন শ্মশানে শুয়ে, কেউ খেতে দিলে খান নইলে এমনি থাকেন। কাঁচামাংস পাতা লতা এমন কি বিষ্টা খেতেও তাঁর আপত্তি নেই বোধ হয়—এমন নিস্পৃহ তিনি।

"খোঁজ করে গেলুম। প্রথম তো দেখাই পাওয়া যায় না। তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে দর্শন পেলুম। বিপুল দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাগলের মত ভাবভঙ্গী—কিন্তু পাগল নন্। একদিন আমার চোখের সামনে শিয়ালের দেহ ধরে বনের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলেন, কেউ আর খুঁজেই পেলো না। বুঝলুম যে এতদিন ধরে যাকে খুঁজেছিলুম এতদিন পরে তাকে পেয়েছি।"

অনিমেষের মনেও ততক্ষণে গল্প জমে উঠেছে। লোকটি থামতেই সে বললে, "তারপর?"

"লোক তো পেলুম—তাকে ধরি কী করে?—কিছুতেই ধরা দেয় না। কিছু বলতে গেলে শ্মশানের পোড়া কাঠ তুলে তেড়ে আসে। একদিন খুব কান্নাকাটি করতে সব শুনলে মন দিয়ে, কিন্তু তারপর যা বকুনিটা দিলে, বললে, 'ভালো চাস তো এসব মতলব ছাড়। সাধনা করবি তুই ঐ দেড় ছটাক কাঁপা নিয়ে? তোর কাজ নয়— বুঝলি, মরবি একেবারে। তা ছাড়া ভোগ করবার জন্য এসব কাজ যে করতে আসে তার একূল ওকূল যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের গল্প পড়িসনি? মাকে বলেছিল মা অষ্ট সিদ্ধিই দে—হৃদে বলছে চাইতে। মা বললেন, কাল সকালে এর উত্তর পাবি। পরের দিন সকালে দোর খুলতেই নজরে পড়ল একটি মেয়েছেলে ঐদিকে ফিরে শৌচ করতে বসেছে—পরমহংস অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এসে ভাগ্নেকে এই মারে তো সেই মারে। বুঝলি—এমনি তুচ্ছ শুধু নয় ছোট জিনিস ওসব। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা—বিয়ে থা কর ভগবানকে ডাক, নয় তো কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিস্!' অনেক কাকুতি মিনতি করলুম বাবার আর দয়া হ'ল না। আমি কিন্তু মশাই হাল ছাড়লুম না।..... ঐখানেই পড়ে রইলুম, বলতে গেলে না খেয়ে না দেয়ে আর গোপনে ওর দিকে নজর রাখলুম। যদি আসল প্রক্রিয়ার কিছু হদিশ পাই বুঝলেন না? এতদিন কি আর বৃথাই এ লাইনে ঘুরেছি। আসল মানুষ না পাই, ওদের ভেতরের কথা কিছু কিছু জেনেছি বৈকি! তারপর হ'ল কি মশাই, আরও দু-একজন সাধক ভৈরবী ওখানে এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। গোপনেই এল কিন্তু আমি তো ঐখানেই পড়ে থাকি, আমাকে এভাবে কি করে?..... ওঁদের পর পর কদিন চক্র বসল। তাও দেখলুম—মনে হ'ল আর কি, সব শিখে গেছি.... ওখান থেকে রওনা হয়ে আর বাড়ী ফিরলুম না, নির্জন স্থান অথচ শ্মশান, লোকালয় কাছে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়লুম। পথে নলহাটিতে একজন তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষাও নিয়ে এলুম।

"ও মশাই,এলুম তো এখানে, কিন্তু সাধনা আর হয় না। প্রথম দিন থেকে বিঘ্ন। উপকরণ পাই তো দিন পাই না, দিন পাই তো উপকরণই নেই—শেষে অনেক কৌশল ক'রে অনেক নীচে নেমে যদিও বা সব যোগাড় করলুম, মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত পেয়ে যেমন আসন ক'রে বসেছি—কি বিঘ্ন, ধ্যানে মন দেব কি, কিছুতেই মন স্থির করতে পারি না.... এখন এটা বাসের রাস্তা হয়ে শ্মশান এখান থেকে সরে গেছে, আগে এখানটাতেই শ্মশান ছিল, এখন সেখানে ঘর দেখছেন, এই যেখানে আমরা বসে আছি, এইখানেই সেদিন আসন করে বসেছিলুম—

নিজের অজ্ঞাতেই অনিমেষ যেন একটু করে সরে বসে। তারপর বলে, "আচ্ছা বিঘ্ন কি রকমের? ভয় পেলেন? শুনেছি তো এ রকম সাধনায় বসলে প্রথম প্রথম নানা রকমের ভয় দেখায়—কিন্তু সেটা শুধু পরীক্ষা করার জন্যে। আপনিও তো সে রকম শুনেছিলেন নিশ্চয় তবে ভয় পেলেন কেন?"

হাসলেন লোকটা আবারও। কাউকে ছেলেমানুষী করতে দেখলে বিজ্ঞ মানুষরা যেমন হাসে কতকটা তেমনি হাসি। বললে, "জানে তো সবাই কিন্তু শোনা এক জিনিস আর অভিজ্ঞতাটা আর এক। তেমন অভিজ্ঞতা হ'লে বুঝতেন!... শুনবেন কেমন? মড়ার বুকের ওপর বসেছি আসন করে, মড়ার খুলিতে ক'রে মদ খাচ্ছি—মনে ভয় ডর কিছুই নেই, এই বিশ্বাস হয়েছিল। কিন্তু সেই লোকেরই বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল সেই সব শুনে। না, না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়, প্রথম শুরু হ'ল শুধু ফিস্ ফিস্ কথায় শব্দ, খিল খিল হাসি, চাপা হাসিই। ক্রমে সেটাই বাড়তে লাগল। মনে হ'ল দশজন, একশজন—হাজার হাজার। আপনার চারপাশে যদি লক্ষ লোকের ফিস্ ফিস কথারই শব্দ হতে থাকে তো কেমন মনে হয়? আর তার সঙ্গে চাপা এক ধরনের না। যদিও কাজে মন দিতে পারলুম না, এটাও ঠিক। তারপর মশাই স্পষ্ট দেখতে লাগলুম শ্মশানের মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেন মড়াগুলো উঠছে। কতকাল থেকে মরেছে সব—কত হাজার বছর ধরে। এক এক জনের বীভৎস চেহারা, রোগে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। কেউ বা খুন হয়েছিল, কেউ বা ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে প্রাণ দিয়েছে, কেউ বা গলায় দড়ির মড়া। ঠিক সেই অবস্থায় উঠেছে— তেমনি কন্দকাটা বা হাড়গোড় ভাঙ্গা অবস্থায়। সকলেরই মুখে রাগ চোখের দৃষ্টিতে আগুন! তারা সবাই আঙুল তুলে শাসাতে লাগলো, পাপিষ্ঠ তুই এখানে কেন? শ্মশান অপবিত্র করতে এসেছিস। চলে যা, দূর হয়ে যা। জানিস না এখানে আমরা পাহারা দিচ্ছি? মনে পাপ নিয়ে তুই এসেছিস শ্মশান জাগাতে? চলে যা— তার মধ্যে এক জনের আবার শুধু কঙ্কাল, বোধ হয় তাকে পুঁতে রেখেছিল কোথাও মেরে— তারপর তাকে তুলে পোড়াতে হয়েছে। সেটাই সব চেয়ে কাছাকাছি এল, মুখে সেই একই শব্দ, দূর হ! দূর হ! ভয় পেলুম খুব, তবু জানি একবার ভয় পেলেই গেল— চিরকালের মত। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম, যাবো না। উঠবো না আমি। ব্যস— আর যায় কোথা সেই কঙ্কালটা আরো এগিয়ে এসে তার সেই অস্থিময় আঙ্গুল কটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরলো। ওঃ সে কী চাপ, যেন মোটা লোহার সাঁড়াশী। কত চেষ্টা করলুম মুক্ত

হবার কিন্তু সে বজ্রকঠিন মুষ্টি খোলে কার সাধ্য। দম বন্ধ হয়ে গেল, বুকে সে এক অসহ্য যন্ত্রণা— মনে হ'ল যেন দেহের প্রতিটি শিরা ফেটে যাচ্ছে। আকুলি বিকুলি করতে লাগলুম এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে— সে হাওয়া চারিদিকেই রয়েছে, তবু এক বিন্দু বুকের মধ্যে নিতে পারলুম না, বরং আরো চেপে বসতে লাগলো সেই সাঁড়াশীর মতো আঙ্গুলগুলো।...

"তারপর?" রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করে অনিমেষ। 'তারপর?'

আবার সেই হাসি, "তারপর আর কি, মুক্তি, সেই থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানেই, কাজ নেই কামাইও নেই। জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারছি না। সব চেয়ে বেশি কষ্ট হয় কথা কইবার লোক নেই বলেই—"

—"কি — কিন্তু" কথা কইতে গিয়েও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অনিমেষের যেন গলা কেঁপে যায়, "আপনি মুক্তি পেলেন কি করে?"

"তা আমি জানি না। এক সময় দেখলুম যে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমারই ভূতপূর্ব আশ্রয় অর্থাৎ দেহটার পাশে। যারা এসেছিল তাদেরও তো কাজ শেষ, তারাও সব যে যার মিলিয়ে গেছে। এক সময় সব কিছুর শান্তি।"

তবু বুঝতে কয়েক মিনিট দেরী লাগে অনিমেষের, কথা কইতে গিয়েও গলার স্বর হয়ে যায়, 'তার— তার মানে কি? আপনি কি বলতে চান যে আপনি তখন মারা গেলেন? আ-আপনি কি মড়া?'

প্রশ্নের শেষ অংশটা আকস্মিক আর্তনাদের মত চিৎকারে পরিসমাপ্ত হয়, কিন্তু সে প্রশ্ন করছে কাকে? কেউ তো নেই। শুধু সে একা বসে আছে ঘরে, বাকী জিনিসগুলো ঠিক আছে, পিদিমটা তেমনি জ্বলছে। শুধু উঁচু হয়ে বসে যে লোকটা কথা বলছিল সে আর নেই—

কোথা দিয়ে গেল লোকটা, কখন উঠে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে।

বার বার এই ব্যাকুল প্রশ্ন ওর মনে উঠতে লাগলো কিন্তু উত্তর দেবে কে! খানিক পরে আসল প্রশ্নটা আবার প্রবল হয়ে উঠলো, তাহলে কি লোকটা যা বলে গেল তাই সত্যি, ও লোকটা মানুষ নয়— অশরীরী, বিদেহী আত্মা! খাবার কিছু লাগে না ওর— বলেছিল বটে। মরবার ভয় নেই।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অনিমেষের কিন্তু সে শিক্ষিত ছেলে, বিজ্ঞানপড়া ছেলে। এ সব মিথ্যা— কল্পনা, আত্মসম্মোহন বলেই জানে। সে বিশ্বাস করত না এ কথা, যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসে সে ভূত দেখেছে।

আচ্ছা, ছায়া পড়েছিল কি ওর? মনে করবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

সত্যই কি — ? না, লোকটা তার সঙ্গে তামাসা করছিল? আগে যা ভেবেছিল তাই— ডাকাত বা ঠ্যাঙ্গাড়ে জাতীয়— ভয় দেখিয়ে গেল এরপর কাজ হাসিল করা সোজা হবে ভেবে?

মনকে প্রবোধ দেয় সে, এইটে হওয়াই সম্ভব। ভূত হলে আলোয় থাকবে কি করে?—

বদমাইস। আরও বেশী ভয় দেখাবার জন্যে ম্যাজিকওয়ালাদের মত চোখের নিমেষে সরে গেছে?

—দোরটা বন্ধ করে দেবে না কি?

—দেওয়াই উচিত।

—পালাবে?

—কোথায় যাবে এই অন্ধকারে। আরও তো ওদের কবলে গিয়ে পড়তে হবে! সে দেখতে পাবে না ওদের, ওরা দেখবে। তার চেয়ে দোর বন্ধ করে বসে থাকা মন্দ নয়— যা হবার হবে, আলো তো থাকবে এখানে লোকগুলোকে চোখে দেখা যাবে।

অনিমেষ অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। হাতে পায়ে যেন জোর নেই। কোনমতে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে দোরটা বন্ধ করে দিলে। ভাগ্যিস ভিতরে খিল আছে। বেশ মজবুত খিল। দেখে শুনে ভাল করে বন্ধ করে দিলে। যাক নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এ কী?

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল যে! মুহূর্তের মধ্যে কোনরকম নোটিশ না দিয়েই ঘরটা, তার চার পাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল। তেল ছিল না? কিন্তু তা হলে তো একটু একটু করে ম্লান হয়ে আসবে।

তবে— ভয়ে ওর গা-টা হিম হয়ে গেল - তবে কি ঘরের মধ্যে কেউ ছিল? এখন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে? সেই লোকটাই কি? হয়ত তক্তপোশের নীচে ঢুকে গিয়েছিল তখন, সেইখানেই লুকিয়েছিল, তাই সে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করে নি। নিশ্চয় তাই।

কী সর্বনাশ! এ যে হিতে বিপরীত হ'ল। ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে একেবারে ওদের মুঠোয় মধ্যেই এসে পড়ল। পকেটে দেশলাই পর্যন্ত নেই। ব্যাগটাই বা কোথায়? চৌকিটা যে ঠিক কোন্ দিকে। তার মনে পড়ছে না।

উঃ কী বদমাইস্ লোকটা!

ক্রুদ্ধস্বরে, হয়ত বা একটু ভীত কণ্ঠেই অনিমেষ ব'লো উঠলো, "কে? কে ওখানে? আলো জ্বালা বলছি শিগগির, নইলে ভালো হবে না, দেখিয়ে দেব মজা। কে? জ্বাললে না?"

নিস্তব্ধ চারিদিকে! কোথাও একটা জনপ্রাণী আছে বলে মনে পড়ে না। রহস্যময় সুগম্ভীর স্তব্ধতা।

ঘরে কি জানালা ছিল? তাও তো মনে পড়ছে না ছাই।

জানলা খুলে দিলে তবু একটু নক্ষত্রের আলো আসে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকেও জানলা কোন্ দিকে মনে পড়ল না। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গেলেই তো দেওয়াল, হাতড়িয়ে দেখতে দোষ কি!

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে! আচ্ছা বোকা তো সে, দরজা রয়েছে খুলে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়। ঘরের অন্ধকারের চেয়ে বরং বাইরের অন্ধকার ভালো, নক্ষত্রের আলো আছে? ব্যাগটা? থাকগে, প্রাণ তো বাঁচুক।

যেদিকে দোর দিয়েছে এইমাত্র, সেই দিকেই হাত বাড়ালো। কৈ সে দরজা? ও তো দরজা সবে বন্ধ ক'রে এ পাশ ফিরেছে আর আলো নিভেছে।

তবে কি দিক্ ভুল করেছে? এদিকে দরজা ছিল না?

আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে যায় সে। এইটুকু ত' ঘর, দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে ঘুরলেই দরজা পাবে। শুধু ভয় হচ্ছে, ও লোকটা না এই সুযোগে পেছন থেকে মেরে বসে। কিন্তু উপায়ই বা কি? এদের কবলে যখন এসে পড়েইছি।

মরিয়া হয়েই এগোয় অনিমেষ। এক পা এক পা করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোয়। ...এক দুই...একি, এ যে কুড়ি পা হয়ে গেল ঘরটা যতদূর আন্দাজ হয় দশ-বারো ফুটের বেশী হবে না লম্বায়। নেহাৎই ছোট ঘর। অথচ কুড়ি পা মানে অন্তত পনের ফুট।

আরও দুপা...আরও দশ— আরও কুড়ি।

একি সে মাঠে চলেছে না কি?

কী রকম হ'ল! চল্লিশ পা চলার মত ঘর তো নয়। কোণাকুণি হাঁটছে। তাতেই বা এতদূর হবে কেমন করে? তবু আরও কয়েক পা যায় সে। হয়ত চলতে চলতে কখন গতি বেঁকে গিয়েছে। সোজা হয়ে হাঁটে আরও খানিকটা।

না, তবু দেওয়াল নেই। রহস্যময় অন্ধকার, অনন্ত শূন্যতা বাইরের মুক্ত শূন্যতা নয়, চার দেওয়াল চাপা— তবু তা অনন্ত।

এইবার কপালে ঘাম দেখা দেয় অনিমেষের। এতক্ষণ ডাকাতের ভয়ে যা হয়নি এইবার তাই হ'ল, পা দুটো কাঁপতে লাগল সর সর করে। ...একেবারে যেন ভেঙ্গে এল। অসহায় ভাবে সেইখানেই বসে পড়ল।

এ তার কী হল! কী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল সে?

তবে কি সে লোকটা অশরীরী— সত্যি-সত্যিই? সে কি তাহলে কোনও প্রেতযোনির মায়াতে এসে পড়েছে?

বিহ্বল হয়ে ভাবে অনিমেষ কি করবে কিন্তু কোন পথ দেখতে পায় না।

ঐ যে কারা আসছে না? হ্যাঁ, ঐ তো কত লোকের পায়ের আওয়াজ। অন্তত আট-দশ জনের কম নয়। কিংবা আরো বেশী। এই বাড়ীর কাছেই আসছে, ঐ দাওয়ায় উঠল।

"ও মশাই শুনছেন? ও মশাই—"

গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। টাক্‌রা শুকিয়ে গিয়েছে। গলা কাঠ।

কিন্তু ওরাই যদি ডাকাতের দল হয়, তা হোক্ তবু তো তারা মানুষ। ভয় হয় একটু অনিমেষের তাহলে অন্তত এটা প্রেতের নয়। আঃ— বাঁচা গেল।

হ্যাঁ, ডাকাতই।

নইলে ওরা অমন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে কেন? বহু লোক যেন পরস্পরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে? আরও, লোক বাড়ছে। আরও পায়ের শব্দ, বহু ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার আওয়াজ—

একি— ওরা কি ঘরে ঢুকেছে না কি? কেমন করে ঢুকলো?

ওর চারিদিকে শব্দগুলো এগিয়ে আসছে। ওর চার পাশে, খুব কাছে। খিল খিল করে চাপা হাসির শব্দ— অনেকে হাসছে তবু শব্দটা খুব জোর নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরফ নেমে যায় দেহের মধ্যে। হাতে পায়ে আর কোন সাড় থাকে না। আতঙ্ক যে এমন জিনিস তা আগে অনিমেষ কল্পনাও করে নি। মস্তিষ্ক সুদ্ধ যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে।

চীৎকার করবে? সাধ্য নেই। পালাবে? পথ কৈ? কিন্তু কিছুতো একটা করা উচিত।

লোকগুলো যেন ওকে ঘিরে ধরেছে। তাদের নিঃশ্বাস, দূষিত তীব্র, উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর সর্বাঙ্গে......

মনে পড়ে গেল লোকটার বর্ণনা। সেও তো এমনি ফিস ফিস্ শব্দ শুনেছিল, এমনি হাসি। তারপর? সেই মৃতের পুনরুত্থান, সেই কঙ্কালের অভিযান।

তারও অদৃষ্টে কি তাই হবে? সে তো কোন দোষ করেনি। সে তো সাধনা করতে আসেনি শবের বুকের ওপর চড়ে?

অকস্মাৎ কে একজন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল তারই আশেপাশে কোথাও। তীক্ষ্ণ চড়া গলায় সে হাসি মনে হল যেন তার চারপাশের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, আবার চারিদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তারই চারিদিকে। বহুক্ষণ ধরে যেন সেই হাসির শব্দ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তাকে ঘিরে। বিশ্রী, তীক্ষ্ণ একটা উপহাসের হাসি— সে হাসির জাল যেন তাকে চারদিক থেকে বেড়ে ধরেছে, আর নিস্তার নেই।

প্রাণপণ চেষ্টায় চীৎকার করে উঠল একবার অনিমেষ— "হে ভগবান, এ কী করলে!"

সত্যিই তো! ভগবানের কথা তো তার মনে ছিল না। তাঁকে তো সে ডাকে নি।

"হে ভগবান, হে হরি বাঁচাও— হে রামচন্দ্র!?" আর কিছু মনে এল না তার। গায়ত্রী মনে আছে কি? হ্যাঁ আছে। পৈতেটা কোথায়?

সুগভীর ক্লান্তি আর অসম্ভব তন্দ্রায় সমস্ত চৈতন্য শিথিল হয়ে আসে ওর।

বিদেহী

সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামায়ার লীলাখেলার বৈচিত্র্যের তল আজও খুঁজে পাইনি, কোনদিন পাব কিনা সন্দেহ। এককালে রাতবিরেতে শ্মশানে-মশানে যাওয়া আমায় নেশার মতন পেয়ে বসেছিল। মধ্য যামিনীর পর মনে হতো যেন শ্মশান জেগে উঠেছে। —শবদাহ হোক আর না হোক! কোত্থেকে যে একপাল কালো ধুম্‌সো কুকুর উড়ে এসে জুড়ে বসতো! প্রথম প্রথম ভয় পেতাম। ক্রমশঃ ওদের আবির্ভাব আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ওদের ভাষাও বুঝতে শিখলাম। ওরা যেন সারমেয় জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার কাছে আর্তি জানাতো। কী করুণ তাদের চোখের ভাষা। বিষাদে আমার মন কেঁদে উঠতো। আমি জপতপ ভুলে একমনে মায়ের কাছে ওদের জন্যে প্রার্থনা করতাম। ওরা যেন তা বুঝতে পারতো। আমায় ঘিরে বসে থাকতো যতক্ষণ না আসন ত্যাগ করতাম। আসন ছেড়ে উঠে পড়বার পরও বেশ কিছুক্ষণ অনুসরণ করে তারপর তারা কোথায় যেন মিলিয়ে যেত!

চাকুরী করি। সংসার ফেঁদেছি, না করেই বা উপায় কি! বিধাতা যে কপালে কর্মের টীকা

দেগে দিয়েছেন। কর্মস্থলও মা লক্ষ্মীর মতনই সদা চঞ্চল। স্থান পরিবর্তন জোঁকের মতন আমার পেছনে লেগে থাকতো। সেবার বেলঘরিয়ায় বদলি হলাম। এই বদলি আমার জীবনে এক পরম পাওয়া। জীবাত্মার যে মৃত্যুর পরও খেদ থাকে তা জানবার সুযোগ যেন মহামায়াই করে দিলেন।

নতুন কর্মস্থলে একজন কর্মীর অস্বাভাবিক আচরণ আমায় বিচলিত করেছিল। কাজে অনীহা, ইচ্ছামতো আসা যাওয়া, চুল দাড়ি কামাবার বালাই নেই; একটা আঁকাবাঁকা নাতিদীর্ঘ যষ্ঠি নিয়ে অন্যমনস্ক চলাফেরা। কপালে আবার সিঁদুরের ত্রিপুণ্ড্রক। অথচ কেউ ওর বিরুদ্ধে নালিশ করে না। উল্টে মনে হলো সবাই যেন ওকে প্রশ্রয় দেয়। আড়াল করতে চায়। অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে একদিন ওকে চেম্বারে ডেকে পাঠালাম। কৌতূহল বেড়ে গেল যখন শুনলাম ও তন্ত্রসাধক— শ্মশানে-মশানে যাওয়া আসা ওর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার! যাচাই করার ইচ্ছে প্রবল হলো। রহস্যচ্ছলে ভীতিমিশ্রিত স্বরে বললাম, আপনার তো খুব সাহস। শ্মশানে-মশানে যাতায়াত করেন। আমার তো ওখানে যাওয়ার প্রশ্ন দূরে থাক শবানুগমনেও প্রচণ্ড ভয়। ভূতপ্রেতের পাল্লায় যদি পড়ে যাই। আপনার কথা শুনে এখন শ্মশান সম্বন্ধে কৌতূহল হচ্ছে। সাহসটাও যেন ফিরে পাচ্ছি। আমায় একবার নিয়ে যাবেন? দিনে নয়। কে আবার দেখে ফেলবে। কি সব ভাববে। মাঝরাতে হলেই ভাল হয়। কেউ জানতে পারবে না।

লোকলজ্জা এবং ভীতির অভিনয় ভালই করেছি মনে হলো। এতক্ষণ যুবকের চোখে মুখে একটা শঙ্কার ছায়া ছিল। হয়তো বড় সাহেবের হঠাৎ তলবে ভয় পেয়েছিল, যদি কাজের কৈফিয়ৎ চায়। কিন্তু আমার চতুর অভিনয়ে শঙ্কার ছায়া নিমেষে মিলিয়ে গেল। এমন কি হাসতেও পারলো। আত্মগরিমার হাসি। বস্‌কে টেক্কা দেওয়ার হাসি। তারপর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললে, আপনি এত ভীতু তা তো জানতাম না। শ্মশানে ভয়ের কি আছে? কিস্যু নেই। ভূতফুত সব কল্পনা। আপনার যাবার ইচ্ছে হয়েছে, বেশ তো চলুন না আসছে শনিবার। অমাবস্যা আছে। জমবে ভাল। কাছেই আড়িয়াদহ শ্মশান, পঞ্চমুণ্ডির আসনও আছে, কত সাধক ওখানে বসে সাধনা করে গেছেন। এটা সেটা ভূত ভেবে আবার ভয় পাবেন না। ভীতু হলে না যাওয়াই ভাল। বিশেষ করে রাত্রিবেলা। অবশ্য আমি সঙ্গে থাকব। তবুও ভেবে চিন্তে মনস্থির কববেন। কথাবার্তাগুলো কিছুটা খাপছাড়া মনে হলো। সত্যিই কি ও ভয়কে জয় করেছে! সত্যি মিথ্যে যাচাই করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই কৌতূহল নিরসনের জন্যে রাজী হয়ে গেলাম।

শনিবার এল। ঘোর অমাবস্যা। তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দিনেই রাতের আভাস। ঠাণ্ডাটাও পড়েছে ভাল। যুবকটি দুপুরে একবার দেখা করলো।

—স্যার আজ যাবেন তো?

—নিশ্চয়।

—একটু ভাল করে ভেবে দেখবেন। স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর করেন। যদি কিছু হয়ে যায় আমি

সারা জীবনের জন্য দোষের ভাগী হয়ে থাকবো।

—কেন? আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?

—না, না, তা নয়। তবে কিনা...

হতাশা ওর বাচনে সুস্পষ্ট। ওর মৃত্যুভীতি জয় করা সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল তারও নিরসন হলো। কিন্তু ভণ্ডামি, অন্ততঃ তন্ত্রসাধকের ছদ্মবেশ কোনদিনও সইতে পারিনি—কখনও সইতে পারব কিনা তাও সন্দেহ আছে। ক্ষোভে দুঃখে গা রিরি করে উঠল। কিন্তু সংযত হলাম। দেখাই যাক না। এই রকম মনোভাব নিয়ে যুবকটিকে আশ্বাস দিলাম— এত উতলা হচ্ছেন কেন! আপনার মতন এত বড় সাধকের সংস্পর্শে এসেছি আমার আবার ভয় কি! আজ না হয় কালতো যেতেই হবে। তাই পথটা চিনে রাখলে ভালই হবে। পথ ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে না। শববাহকদের অসুবিধে হলে চিনিয়ে দিতে পারব। কি বলেন?

আমার রসিকতাও যে তার মনে কোন রকম সাড়া জাগালো তা কিন্তু মনে হলো না। অন্যমনস্কভাবেই অস্ফুট স্বরে বললো— বেশ তাহলে চলুন। রাত ঠিক বারটায় আমি আসব। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।

ওর বিরস বদন দেখে ভেবেছিলাম ও আসবে না। দিনটা কেটে গেল অফিসের নানা ঝামেলায়। বাড়িতে ফোনে খবর দিলাম রাতে ডিউটি পড়েছে, পরদিন সকালে ফিরব। সিকিউরিটি গার্ডকে ছেলেটি ফিরলে খবর দেবার আদেশ দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। টেবিলের ওপর ফাইল নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল সিকিউরিটি গার্ড-এর ডাকে। রাত তখন বারটা বেজে দশ মিনিট। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে কার্ডিগানটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এলাম। গার্ডের পেছনে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ধুতি আর রক্তবর্ণ পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে গেছে। আলোয়ান দিয়ে মাথা, মুখ এবং শরীরের অনেকটাই ঢাকা। বুঝলাম শীতের প্রকোপ যথেষ্ট।

আড়িয়াদহ শ্মশান প্রায় মাইলটাক পথ। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। আর্দ্র আবহাওয়ায় কাছাকাছি কোথাও বর্ষণের আভাস। কুয়াশার দাপট স্মোক নুইসেন্সের কৃপায় আরও নির্মম। দু হাত দূরেও সব ঝাপসা। কানা গরুর ঝোলা পথ দিয়ে চলার মতন আমরা চলেছি। পথের আলোগুলো নিস্তেজ। দুপাশের ঝুপড়ি, দালানগুলো যেন ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। এ যেন এক মৃত্যুপরীর মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। হাঠাৎ নেড়ি কুকুরগুলো আমাদের পদশব্দে বিশ্রামে ব্যাঘাত হওয়ার দরুন সরোষে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে অনুসরণ করল। নির্দিষ্ট এলাকা পার করে দিয়ে তারা শান্ত হলো। অশান্ত দুনিয়ায় শান্তির ব্যাঘাত কুকুরগুলোও সইতে পারল না। গঙ্গার পারে এসে পথ শেষ হলো। পাশেই শ্মশান। পারের ওপর নদীর ঢেউগুলি আছড়ে পড়ে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করছে। মায়ের কত রূপ!

গঙ্গাস্তব করে খানিকটা জল মাথায় ছিটিয়ে শ্মশানে প্রবেশ করলাম। কোনো লোকজন দেখতে পেলাম না। অশ্বত্থ গাছের ভেতর থেকে শকুনের বাচ্চার সোচ্চার প্রতিবাদ ভেসে

এল অনেকটা শিশুর কান্নার মতন।

বটগাছের কোটর থেকে একজোড়া চোখ যেন বলছে, "সাবধান!" কোনো চিতা জ্বলছে না। সারাদিন জ্বলেছে কিনা সন্দেহ। শ্মশানের কৌলিন্যে যথেষ্ট ঘা দিয়েছে। যুবকটি বাহুতে স্পর্শ করলো আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। তারপর তর্জনী দিয়ে অনতিদূরে অবস্থিত পঞ্চমুণ্ডির আসনটা দেখিয়ে আঙুলে একটা কামড় বসালো। মৃদু প্রতিবাদ করলাম— এত কুসংস্কার কেন? আর কোনো কথা না কয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়ে বসলাম। পাশে কম্বল বিছিয়ে বসল যুবকটি। ইশারায় ওকে কথা কইতে বারণ করে জপে মন দিলাম।

রাত তখন অনেক হবে। তন্ময়তা ভাঙল বহু মানুষের হরিধ্বনিতে। বুঝলাম শ্মশানে শব এসেছে। চোখ খুললাম। অনতিদূরেই শববাহকদের কয়েকজন চিতা সাজাতে ব্যস্ত। পাশেই খাটের ওপর আচ্ছাদিত শব। নারী কি পুরুষ বোঝবার জো নেই। একে অমাবস্যা, মেঘে ঢাকা আকাশ, কুয়াশার দাপট, তায় আবার বৈদ্যুতিক আলোর স্বল্পতা। দু-চারটে নিয়ন বাতি জ্বলছে। বাকি সবই হয়তো চোরের প্রকোপে পড়েছে।

হঠাৎ কানে ভেসে এল কার যেন আক্ষেপ— আমার চিকিচ্ছে হয়নি। আবাগীর বেটারা বিনা চিকিচ্ছেয় আমাকে মেরে ফেললে গা। ভেবেছে আমার অঢেল পয়সা লুটেপুটে খাবে। তা কখনো হতে দেব না।

খটকা লাগল কে আবার এই অসময়ে এই পরিবেশে আক্ষেপ করে চলেছে! এদিক ওদিক চাইলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। পাশের যুবকটির দিকে তাকিয়ে তো চক্ষুস্থির। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকির অন্ত নেই। আমল দিলাম না। শুধু হাঁটুতে চাপড় মেরে ওকে স্থির হতে বললাম। এবার সন্দেহ বশে চিতার দিকে মুখ ঘোরালাম। শবদেহ থেকে একখণ্ড জমাট কুয়াশা আমার দিকে ভেসে এসে স্থির হয়ে রইলো। ক্রমশ স্বচ্ছ হলো। সাদা থান পরা এক বৃদ্ধা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় স্বল্প ঘোমটা। ঈষৎ ন্যুব্জ। চোখ দুটো বিষাদে করুণ। বুঝলাম শবের জীবাত্মার আক্ষেপই আমায় উতলা করেছিল। করুণাঘন চোখে চাইতেই শুনলাম— ওরা অন্যায় করেছে। একেবারে নির্ব্বংশ হয়ে যাবে। ভেবে পাই না। আমার খেয়ে আমার পরে কি করে এতবড় অন্যায়টা করলে। সেবা তো দূরের কথা, চিকিচ্ছেটুকু পর্যন্ত করলে না, ওদের কিছুতেই ক্ষমা করবো না, এই তিন সত্যি কাটছি। আপনি ওদের জানিয়ে দিন।

ক্রমশ বৃদ্ধা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। রাগে শরীর থরথর করে কাঁপছে। জীবিত থাকলে হয়তো ভয় পেতাম প্রাণ না হারায়। চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। যেন আগুনের শিখা। ভেবে পাই না— মৃত্যুর পরও কি করে এত ক্ষোভ, আক্রোশ বিদেহীর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। সাধকদের সান্নিধ্যে এই ধারণাই মনের মধ্যে গেঁথেছিল আত্মা অজর অমর। একমাত্র জীবাত্মা আপন অতৃপ্ত-বাসনা তৃপ্ত করার জন্যে উপযুক্ত আধার খুঁজে বেড়ায়, পেলে পুনর্জ্জন্ম নেয়। এখানে তার ব্যতিক্রম আমার বিশ্বাসে ঘা দিল। মহামায়ার সংসারে কত রহস্য যে লুকিয়ে আছে! মানুষ সংস্কার-আবদ্ধ জীব! মৃত্যুর পরও তার থেকে মুক্তি

পাওয়া কত যে কঠিন। ব্যথাতুর হৃদয়ে বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিলাম— নিশ্চয়ই ওদের সাবধান করব। আপনি শান্ত হোন।

এই সময়ে পায়ের ওপর একটা চাপ অনুভব করে মনটা বিক্ষিপ্ত হলো। বাঁ হাঁটুতে চেপে বসে আছে দুটো হাত। কাঁপুনির অন্ত নেই। যুবকের অবস্থা সঙ্গীন। রাগে গা রি রি করে উঠল। প্রচণ্ড ধমক দিলাম, এই সাহস নিয়ে শ্মশানে এসেছ! আবার আমায় ভরসা দিয়েছ! লজ্জা করে না? তন্ত্রশাস্ত্রে ক্রোধ মহারিপু। অহংয়ের প্রভাব বিস্তার করে। মনের কোণে ক্রোধ উঁকি দেওয়া মাত্রই নিজেকে সংযত করলাম। যুবককে আশ্বাস দিলাম— ভয় কি? আমি তো সঙ্গে আছি। আরও কত লোক এই শ্মশানে উপস্থিত। এত ভয় কিসের। এবার একটা উপকার কর তো বাপু। মৃতের নিকটতম আত্মীয়কে একবার আমার কাছে এখনই আসতে বলে তো! বলবে অত্যন্ত প্রয়োজন। নইলে বিপদ ঘটবে। বৃদ্ধারও বোধ হয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। তাই জুড়ে দিল— যা না মিন্‌সে আমার নাতিদের পাঠিয়ে দে।

যুবক কিছুক্ষণ আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপরই শ্মশানযাত্রীদের দিকে ছুটে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই দুজন ভদ্রলোক গুটি গুটি পায়ে আমার কাছে এল। কিন্তু যুবক গা ঢাকা দিল। মন্দের ভাল। ওরা আসতেই সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়লাম— বৃদ্ধার চিকিৎসা হয়নি কেন? অথচ ওঁর পয়সাতেই নবাবী করছেন? আচমকা এমন প্রশ্নে ওরা প্রথমে হকচকিয়ে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় পর্যবেক্ষণ করল। পোশাক-আশাকে সাধুসন্তের কোনো নিদর্শন না পেয়ে তেড়ে উঠল। ওটাই স্বাভাবিক। অন্যায়বোধ মানুষকে কুরে কুরে খায়। কিন্তু তা নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা কেউই সইতে পারে না। একচোট গালাগাল দিয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে কৈফিয়ৎ চাইল— আপনি কে মশাই? আমাদের দিদিমাকে আমাদের যা ইচ্ছে তাই করব। যেমন ইচ্ছে তেমন চিকিৎসে করব। তাতে আপনার নাক গলাবার কি অধিকার আছে?

ওদের মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে বৃদ্ধা খর খর করে উঠল— কি কথার ছিরি! কাকে কি বলতে হয় তাও শেখেনি লা! তাহলে শোন বাবা। হারামজাদা নাতি দুটো বাচ্চা বয়সেই বাবাকে খায়। যে কদিন ঠাকুর্দা ঠাক্‌মা বেঁচেছিল সে কদিন আচ্ছয় পায়। কিন্তু এমনই অভাগা, ওঁরা টিকতে পারলেন না। জ্ঞাতগুষ্টি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। আমি সেদিন আচ্ছয় না দিলে কোথায় যে ভেসে যেত। লজ্জায় ঘেন্নায় মেয়েটা আমার অসুখ বাধালে। শত চেষ্টায়ও ওকে বাঁচাতে পারলে না। বৃদ্ধার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। মুখে কাপড় দিয়ে খানিকটা ফুঁপিয়ে নিয়ে আবার শুরু করে— এই এতটুকুন বয়স থেকে ওদের কোলে পিঠে করে বড় করলাম। কী বেইমানের গুষ্টি! যে কদিন কর্তা বেঁচেছিল একেবারে ভেজা বেড়ালের মতন ছিল। ওঁর যাওয়ার পর দুটো দিন যেতে না যেতেই সাপের পাঁচ পা দেখলে গা। আমায় তো থোড়াই কেয়ার। কর্তা বেঁচে থাকতে থাকতেই ওদের বে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতেই

কাটাব। ও হরি! তখন কি জানি লুকিয়ে লুকিয়ে নেশাভাঙ করে! এদিকে নাতবৌরাও কিছু জানায় না; উল্টো কিছু জানতে চাইলে আমার ওপরই হম্বি-তম্বি করে। যেন যত দোষ আমার। কর্তার অবর্তমানে কী দিন যে গেছে! নাতিরা হরদম টাকা চায়, না দিলে কথায় কথায় শাসায়, গলা টিপে মেরে ফেলবে। সারাটা দিন বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা, দুপুরে নাকে মুখে কিছু গোঁজা, আর নেশাভাঙ করে রাতদুপুরে ফেরা। সব দেখতে পাই, সব বুঝতে পারি; কিন্তু মুখে রা-টি কাড়ি না। কী বেইমান! কী বেইমান!

বৃদ্ধা একনাগাড়ে বকে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলে। ওঁর আক্ষেপ শুনে মন কাঁদে। মনের ভার খানিকটা লাঘব করার জন্য নাতিদের দিকে মুখ ঘোরালাম। দেখি ওরা দুজনেই ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে আছে, হয়তো অবাক হয়েছে এতগুলো গালাগালি বেমালুম আমায় হজম করতে দেখে। নিরুত্তাপ স্বরে ওদের একে একে দিদিমার আক্ষেপগুলো জানালাম। তারপর কণ্ঠস্বর একেবারে নামিয়ে বললাম— দিদিমার আত্মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁর কাছেই সব শুনলাম। এবার বলুন তো কেন ওঁর চিকিৎসা হয়নি?

ভয়ে ওদের মুখ ছাইবর্ণ দেখাল। চোখ বড় বড় করে চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে আমার দু পা জড়িয়ে ধরে একেবারে ভেঙে পড়ল। রুদ্ধস্বরে বড় ছেলেটি বার বার মার্জনা চাইল। তারপর দুজনেই ডুকরে উঠে আকুতি জানাল— আপনি আমাদের বাঁচান। দিদিমার সব কথা সত্যি। কুপথে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছি। ছোটবেলায় অত আস্কারা না দিলে হয়তো এমনটা হতো না। রোজগারপাতি করি না। এদিকে বিয়ে করেছি, ছেলেপুলেও হয়েছে। অবশ্য খাওয়া পরার কিছু অভাব ছিল না। দিদিমাই সামলাতেন। কিন্তু আমরা পয়সা চাইলে তেড়ে মারতে আসতেন। গালাগালির চোটে কাকচিলও বসতে পারতো না। আচ্ছা, আপনিই বলুন দোষটা কি কেবল আমাদের! উনি তো ইচ্ছে করলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে— ধীরে সুস্থে হাতভারি হলেও তো পারতেন। তা না, আমাদের মানইজ্জত ঢিলে করে একসা করেছেন যখনই হাত পেতেছি, হাজার তোষামোদেও মন গলাতে পারিনি।

এমনই চলছিল। হঠাৎ দিদিমা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুদিনেও যখন জ্বর ছাড়ে না— তখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। তিনি দেখে শুনে বিশেষ আমল দিলেন না। স্তোক দিলেন, দু এক দাগ মিক্সচার খেলেই ভাল হয়ে যাবেন। কিন্তু ধাক্কা খেলাম যখন মোটা ফি চাইলেন। দিদিমার কাছে হাত পাতলাম। উনি মুখ বিকৃত করে পাশ ফিরে শুলেন। কি কষ্টে যে টাকাটা যোগাড় করেছি।

বৃদ্ধা আবার উষ্মা প্রকাশ করলেন— কী বললি হারামজাদারা! একশ টাকা চেয়েছিলি কেন, শুনি?

আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বৃদ্ধার অনুকরণেই চেঁচিয়ে উঠলাম— ফের মিথ্যে কথা? একশ টাকা চেয়েছিলেন কেন? নাঃ, আপনাদের তুলনা পাওয়া ভার। দিদিমা দেহ রেখেছেন। এখনও চিতায় ওঠেননি। তবুও একনাগাড়ে মিথ্যে কথা বলে চলেছেন। ওঁর

আত্মাকে কষ্ট দিতে একটু লজ্জাও করছে না। ও সব ধানাই পানাই না করে সাফ বলুন তো কেন ওর চিকিৎসা হয়নি— বলে কট্মট্ করে ওদের দিকে চাইতেই ওরা যেন ফুটো ফানুসের মতন একেবারে চুপসে গেল। তারপর বাচ্চা ছেলের মতন ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। বড় ছেলেটি কোনরকমে বলল— সত্যি অন্যায় করে ফেলেছি। কিন্তু দুম করে যে মরে যাবে তাও ভাবিনি ; আমাদের ওপর অভিমান না করে যদি একটু মুখ ফুটে বলতেন ভাল করে চিকিৎসা করতে, তাহলে কি আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারতাম। সবই অদৃষ্ট, উনিও আমাদের ওপর অভিমান করে রইলেন, আমরাও বিপথে গিয়ে ওঁকে ভুল বুঝলাম। তা বলে এটা তো সত্যি নয় আমরা ওঁকে ভালবাসতাম না! আর দিদিমারও স্নেহের মধ্যে কার্পণ্য ছিল। আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন। হলপ করছি, নেশাভাঙ সব ছেড়ে দেব আর উনি যা শাস্তি দিতে চান তা মাথা পেতে নেব। এখন আদেশ করুন ওঁর আত্মার শান্তির জন্য কি কি করতে হবে।

ওদের কান্না যেন শেষ হয় না। এদিকে বৃদ্ধাও ডুকরে উঠল— হ্যাঁ বাবা— ওদের কাঁদতে বারণ কর। আমার কষ্ট হয়। কত আদরের নাতি আমার, বেঁচে থাকতে আমার দুঃখ একটুও বুঝল না! কর্তা যাওয়ার পর দুটো ভালমন্দ খেতেও দেয়নি। মাছ ছাড়া খেতে পারতাম না। কিন্তু ঐ নচ্ছার বউগুলোর জন্যে ভয়ে মুখ ফুটে কোনোদিনও চাইতে পারিনি। ওরা রাতারাতি সবাই নীতিবাগীশ হয়ে উঠল। কাচ্চাবাচ্চাগুলো কি ভালই না আমায় বাসতো। বড় মেয়েটা একদিন চুরি করে মাছ খাইয়েছিল। ডিমভরা কই। এখনও মুখে স্বাদ লেগে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বড় বৌটা হাতে নাতে ধরে ফেললে। কি মারটাই না দিল ঐ কচি মেয়েটাকে। আহারে! ভেবেছিলাম নাতি বৌটাকে শাসন করবে! কিন্তু তা তো করা দূরে থাক উল্টে আমায় কি হ্যানস্থাটাই না করলে। হ্যাঁ বাবা, মাছ খেয়ে কি আমি পাপ করেছি? তবে শাস্তর যে বলে বাহাত্তর বছর পার হয়ে গেলে বৈধব্য থাকে না। তাছাড়া মেম সাহেবরাও তো ওসব মানে না। ওরাও তো মেয়েমানুষ।

বৃদ্ধা ডুকরে ডুকরে কথা শেষ করতেই আমি বেশ গলা চড়িয়ে নাতিদের শুনিয়ে শুনিয়ে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিলাম— আপনি মাছ খেয়ে কোন পাপ করেননি। বরং যারা আপনাকে এ নিয়ে অপমান করেছে তাদের পাপের শেষ নেই।

এ কথায় বৃদ্ধার সে কি ফোকলা দাঁতে খল খল করে হাসি। চোখের কোণের পিঁচুটি দিয়ে জল পড়ে দুগাল ভাসিয়ে দিল। তারপরই কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে বলল, হ্যাঁ বাবা, আমার তো যা হবার হয়ে গেছে, ওদের একটা বিধান টিধান দিয়ে দাও যাতে ওরা পাপমুক্ত হয়। না বুঝে, না জেনে ভুল করেছে তাতে ওদের আর দোষ কি বলো। আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই। ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করুক।

বৃদ্ধা মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে আবার শবাধারের দিকে এগিয়ে গেল। আমায় সে আরও বিব্রত করল! চোখে জল এল। কত বড় এক মহৎ জীবাত্মার দর্শন পেলাম। মৃত্যুর পরও যে এত অভিমান, এত ভালবাসা জীবাত্মায় নিহিত থাকে তা আমি কোনোদিনও

কল্পনা করতে পারিনি।

ভদ্রলোকদের বৃদ্ধার কথাগুলো জানাতে, ওদের আচরণে বেশ বোঝা গেল ওরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুতপ্ত। বিশেষ করে বলে দিলাম শ্রাদ্ধের দিন ভাত্‌সরায় যেন ভাল ভাল মাছ সুন্দর করে দেওয়া হয়। যদি ভয় না পায় তাহলে আমার সঙ্গে সরা নিয়ে গঙ্গার পাড়ে যেতে পারে। ওদের দিদিমা ঠিক কোনো রূপে এসে পরিপাটি করে খেয়ে যাবে। তাহলে বুঝবে ওর জীবাত্মার আর কোনো খেদ নেই।

খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হলো। একটা আনন্দসায়রে অবগাহন করতে করতে তা আমি উপভোগ করলাম। ভাতসরাও দেখবার মতন হয়েছিল। নাতবৌরা কোমর কষে, চোখের জল মুছতে মুছতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে নানা রকম মাছ রান্না করেছিল। পোনা, ডিমভরা কই, পাবদা, ইলিশ, মৌরলা মাছের টক। তাছাড়া নানা রকম ব্যঞ্জন, ভাজা— ভুজি, সাদা পোলাও আর মিষ্টান্ন।

রাত প্রায় আটটার সময় দুই নাতি ভাতসরা নিয়ে গঙ্গার ধারে গেল। ওরা সারাদিন উপবাসী। ওদের কৌতূহলের অন্ত নেই। দিদিমার আত্মা নিশ্চয়ই কোনো রূপে আসবে এ বিষয়ে যেমন নিঃসন্দেহ আবার ভয়ও আছে। যদি না আসে, যদি পেট পুরে না খায় তাহলে তো সমূহ বিপদ। ধরে নিতে হবে ওঁর আত্মা অতৃপ্ত।

ভাতসরা গঙ্গার ধারে রেখে ঘাটের ওপর এসে আমরা বসলাম। শীত উপেক্ষা করে একমনে জপ করে চলেছি। নাতিরা দুপাশে আমার হাঁটুতে হাত রেখে একদৃষ্টিতে ভাতসরার দিকে তাকিয়ে আছে। গঙ্গাও যেন আনন্দের আবেগে নাচতে নাচতে মোহনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রহর গড়িয়ে গেল। রাত তখন প্রায় একটা। দশমীর চাঁদ পাতলা মেঘের চাদরের ভেতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। প্রকৃতি আলোয় ঝলমল। নাতিদের হাতের চাপে তন্ময়তা ভাঙল। একটা সাদা শেয়াল ভাতসরার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে জ্বল-জ্বল করে তাকাচ্ছে। হয়তো অনুমতি চেয়ে নিল। তারপর খাওয়াতে মনোনিবেশ করল। যখন চলে গেল, তখন নাতিদের নিয়ে সরার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কি সুন্দর কাঁটা-টাটা বেছে চেটেপুটে সব খেয়ে ফেলেছে। বড় নাতি ভীতি-মিশ্রিত স্বরে ফিসফিস করে বলল, দিদিমা ঠিক এমনি করে মাছের কাঁটা বেছে খেত! থালায় এক কণাও ভাত পড়ে থাকত না।

সরাটা গঙ্গায় ভাসিয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে বৃদ্ধার আত্মার পরম তৃপ্তিলাভের কল্পনায় এক অনির্বচনীয় আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে বাড়িতে ফিরলাম।

সহচর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গী ভদ্রলোক হঠাৎ আবিষ্কার করলেন সামনের একখানা ছয়বার্থের সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করেছেন তাঁরই পরিচিত একদল এবং তাদের বার্থ খালি যাচ্ছে একখানা। খবরটা সংগ্রহ হতে-না-হতে হৈ-হৈ করে তিনি মালপত্র টেনে নামালেন। যাওয়ার সময় এক গাল হেসে বলে গেলেন, "ভালোই হ'ল মশাই আপনার। এখন আপনি একচ্ছত্র। বেশ সম্রাটের মতো ঘুমিয়ে যেতে পারবেন।"

'সম্রাট', 'একচ্ছত্র'— এ-সব ভালো কথা শোনবার আগেই আমি অনুমান করেছিলুম, বাইরের কার্ডে যার নাম ছিল, তিনি এ কালের একজন দিক্‌পাল সাহিত্যিক। আমি তাঁকে অবশ্য কখনও দেখিনি; কিন্তু তাঁর ছবির সঙ্গে এ ভদ্রলোকের চেহারারও সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট। তাই একখানা 'কুপে'তে ওপরের বার্থে এমন একজন ভয়ঙ্কর বিখ্যাত সঙ্গীকে নিয়ে ট্রেন যাত্রার কল্পনায় রীতিমতো শঙ্কিত ছিলুম আমি।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিক— দুটোকেই আমি নিদারুণ ভয় করি। আমি কাজ করি

স্ট্যাটিসটিক্‌সে এবং এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই সংখ্যাতত্ত্বের কাছে রসতত্ত্বের স্বাদ অত্যন্ত জোলো বলে মনে হয় আমার কাছে। সারা ভারতবর্ষে বছরে কোন্ ভাষার কত বই ছাপা হয় তার হিসেব মোটামুটি একটা দিতে পারি, কিন্তু উর্ধ্ব লোকবিহারী সাহিত্যিক মহারথিটি যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কী কী বই আমি পড়েছি—তা'হলেই গেছি। মানসাঙ্কে ফেল করা ছাত্রের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া নান্যোব গতিরন্যথাঃ।

কাজেই তিনি নেমে যেতে বেশ খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলুম— সন্দেহ কী! বেশ নিজের মতো বিছানা পেতে নিলুম— গুছিয়ে নিলুম জিনিসপত্র। তারপর আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে মুখাগ্নি করলুম সিগারেটে।

হাওড়া থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ল— সেই স্বস্তির আমেজে তখনও ভরপুর হয়ে আছি। পর পর উল্কাবেগে যখন কয়েকটা স্টেশন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল, তখনও। কিন্তু আলো নিভিয়ে শোওয়ার উপক্রম করতেই কি রকম একটা অদ্ভুত অশান্তি আমাকে পেয়ে বসল।

হঠাৎ মনে হতে লাগল, আমি একা। শুধু এই ছোট কামরাটুকুর ভেতরেই নয়— এই বিবাট ট্রেনটাতে আমি একা ছাড়া আর কোথাও কোন যাত্রীই নেই। একটা অতিকায় ভুতুড়ে গাড়ি আমাকে নিয়ে একরাশ অজানা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে আমি জানি না, হয়তো গাড়িটারও সে-কথা জানা নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি উঠে বসলুম, আলো জ্বেলে দিলুম। আর তীক্ষ্ণ তীব্র আলোর একটা ঝাপটা চোখে এসে লাগবার সঙ্গে-সঙ্গেই অস্বস্তির ঘোরটা কেটে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে, হাসিই পেল আমার। সাহিত্যিকের সঙ্গগুণ আছে বটে। ভদ্রলোক আমাব সহযাত্রী না হতেই তাঁর ব্যাধি এসে আমাকে ছুঁয়েছে— সঙ্গে থাকলে আর রক্ষা ছিল না দেখা যাচ্ছে। কী করে যে এসব উদ্ভট কল্পনা মাথায় এল— আশ্চর্য!

একগ্লাস জল খেয়ে, একটা আলো জ্বেলে রেখে শুয়ে পড়লুম আবার।

কিন্তু চোখের কাছে আলো জ্বললে আমার কিছুতেই ঘুম আসে না। বিরক্ত হয়ে আমি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। অথচ আলো নিবিয়ে দিতেও সাহস হচ্ছে না— পাছে আবার ওই সমস্ত এলোমেলো ভুতুড়ে ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। চোখের পাতা দুটোকে যথাসাধ্য চেপে ধরে প্রাণপণে ঘুমের সাধনা শুরু করলুম।

সেও মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। তার পরেই একটা নতুন ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। বড় বেশী জোরে যাচ্ছে নাকি গাড়িটা— বড় বেশী অস্বাভাবিক স্পীডে? যতগুলো রেলওয়ে অ্যাক্‌সিডেন্টের খবর জানি একটার পর একটা মনে পড়ে যেতে লাগল সেসব। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অন্ধের মতো ছুটছে ট্রেনটা— পার হয়ে যাচ্ছে ঘুমন্ত গ্রাম, শূন্য প্রান্তর, কালো জঙ্গল, নদীর পুল। এই নির্জন নিশীথ যাত্রা যেন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কে বলতে পারে কোথায় আলগা হয়ে আছে একটা ফিস প্লেট, কোথায় ব্রীজের পিলারে ধরছে ফাটল! মুহূর্তের ভেতরে লাইন থেকে ছিটকে পড়ে যেতে পারে ট্রেনটা, তারপর—

আবার আমি নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। কী আশ্চর্য— কেন এ সমস্ত অবান্তর অর্থহীন ভাবনা আমার! প্রতিদিন, প্রতিরাত এমনি অসংখ্য ট্রেন সারা ভারতবর্ষময় ছুটে বেড়াচ্ছে, তাদের ক'খানাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়? দুর্ঘটনা ঘটার ভয় আমার যত বেশী, তার চাইতেও বেশী রেল কোম্পানীর— যারা এই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের। কম করেও তিন-চারশো মানুষের প্রাণের দায়িত্ব যাদের হাতে, এ সব ভাবনা আমার চাইতে ঢের বেশীই ভাবছে তারা।

আমি আবার উঠে পড়লুম। 'টয়লেটে' ঢুকে মাথায় চোখে ঠাণ্ডা জল দিলুম খানিকটা। একা গাড়িতে এভাবে চলবার অভিজ্ঞতা জীবনে আমার প্রথম নয়— যার জন্যে এই সমস্ত ছেলেমানুষী দুশ্চিন্তা আমাকে পেয়ে বসবে! কোনো কারণে মাথা গরম হয়ে গেছে, তাই এই কাণ্ড।

দুটো পাখারই রেগুলেটার পুরো ঠেলে দিয়ে গাড়ি অন্ধকার করে আবার শুয়ে পড়লুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই অদ্ভুত ভয়টা যেন বুকের ওপরে এসে চেপে বসতে লাগল। মনে হতে লাগল, কোথায় কী যেন ঘটতে চলেছে— কী একটা নিশ্চয় ঘটবে। আজ হোক কাল হোক— এই গাড়িতে হোক আর পরে হোক। আরো মনে হতে লাগল, এই গাড়িতে এখন আর আমি একা নেই, আমার সঙ্গে আর কেউ— অথবা আর কিছু একটা চলেছে। আমার এই বার্থটার নীচেই সে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। একবার মাথা নামিয়ে নীচের দিকে তাকালেই আরো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আমি দেখতে পাবো।

কিন্তু এই বারে আমি নিজের ওপরে চটে উঠলুম। পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি আমি! কোন কারণ নেই— কোন অর্থ নেই, তবু পৃথিবীর যত অবাস্তব উদ্ভট কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছে! হালে কতকগুলি বিলিতী ভূতের গল্প পড়েছিলুম, হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া এ সব।

এই অদ্ভুত অস্বস্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে এবার আমি মনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলুম দস্তুরমতো। প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলুম সংখ্যা-তত্ত্বের কতকগুলি জটিল সমস্যা— যা ভেড়া গোনবার চাইতেও কার্যকরী। তারপর প্রায় আরো এক ঘণ্টা পরে— গাড়ি খড়গপুর ছাড়িয়ে গেল, আমার চোখে ঘুম নেমে এল।

কিন্তু কে জানত— জেগে থাকার চাইতেও আরও বীভৎস হয়ে উঠবে ঘুমটা! মনের সমস্ত সরীসৃপ ভাবনা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে ঘুমের ভেতরে! আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।

অদ্ভুত কুৎসিতে সে স্বপ্ন। পরিষ্কার দেখলুম একটা ন্যাড়া নগ্ন পাহাড় আমার সামনে। তার কোথাও একটা গাছপালা নেই— এক গুচ্ছ ঘাস পর্যন্তও নয়। কলকাতার চিড়িয়াখানার অতিকায় কচ্ছপগুলোর মতো বড়ো বড়ো পাথরে ছেয়ে আছে তার সর্বাঙ্গ। চারিদিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। শুধু পাহাড়টার মাথার ওপর পড়ন্ত বেলার খানিক রক্ত-রৌদ্র কারো নিষ্ঠুর ভ্রূকুটির মতো জ্বলছে। আর সেখানে— সেই অশুভ রাঙা আলোয় ডানা মুড়ে বসে আছে একটি মাত্র শকুন, যেন অপেক্ষা করে আছে কালপুরুষের মতো।

কিন্তু ওইখানেই শেষ নয়। আরো ছিল তারপর। আমি দেখলুম, সেই পড়ন্ত আলোয়, সেই

ভয়ঙ্কর নগ্নতার ভেতরে— শকুনের সেই ক্ষুধার্ত চোখের নীচে চারজন মানুষ একটা মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে জানি না— তাদের চারজনের চোখে-মুখেই একটা বিবর্ণ ক্লান্তি। আর— আর সেই শববাহকদের মধ্যে আমি একজন।

চীৎকার করে আমি জেগে উঠলুম। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম পড়ছে। চলন্ত ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠছে আমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ।

আলো জ্বেলে দিয়ে উঠে বসলুম এবার। না— আর ঘুমোব না। যে কোনো কারণেই হোক— আমার মধ্যে কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম— রাত প্রায় তিনটের কাছাকাছি। ঐ সময়টুকু না হয় আলো জ্বেলে বসেই থাকব।

এতক্ষণে আমার মনে অনুতাপ হতে লাগল। সাহিত্যিক ভদ্রলোককে ধরেই রাখা উচিত ছিল আমার গাড়িতে।

এই দুঃস্বপ্নের চাইতে সাহিত্যচর্চাও নেহাৎ মন্দ ছিল না।

হেলান দিয়ে বসে বসে আবার সংখ্যাতত্ত্ব ভাবতে শুরু করলুম। কিন্তু এতক্ষণে সত্যিই ঘুম আমাকে পেয়ে বসেছে। বসে থাকতে থাকতে আবার আমার চোখ জড়িয়ে এল।

এবং—

এবং একটু পরেই সেই কুৎসিত স্বপ্নটার পুনরাবৃত্তি। সেই পাহাড় সেই পড়ন্ত রোদ— সেই শকুন। আর তেমনি একটা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আমরা চারজন শবযাত্রী!

এবার চীৎকার নয়— আর্তনাদ করে সোজা হয়ে বসলুম আমি। আর পাশের জানলার ভিতর দিয়ে যদি ভোরের ফিকে আভাস দেখা না যেত— তা হলে হয়তো চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দিতুম, নয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তুম দরজা দিয়ে।

উঠে সমস্ত জানলাগুলো খুলে দিলুম। সূর্য ওঠেনি এখনো— বাইরের গাছপালা, মাঠ আর পাহাড়ের ওপরে শুভ্র ধূসর ব্রাহ্মমুহূর্ত। একরাশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে শরীরে— আমি গ্রাহ্য করলুম না। বিদেশী কবির ভাষায় শুধু আমার প্রাণভরে বলতে ইচ্ছে করছে ঃ

"Hail Holy light—"

বেলা আটটার সময় পৌঁছলুম গন্তব্য স্টেশনে। ভুতুড়ে গাড়িটা থেকে নেমে যেন মুক্তিস্নান হ'ল।

স্টেশনে এক্কা ছিল— মামাই পাঠিয়েছেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই আট মাইল রাস্তা পার হয়ে গেলুম।

মামা ব্যাচেলার মানুষ। একটু পাগলাটে ধরনের। প্রথম জীবনে সন্ন্যাসী হয়ে কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন, তারপর এখানে এসে ডাক্তারী শুরু করেছেন। একেবারে পাণ্ডববর্জিত গ্রাম-অঞ্চল। কয়েক বাক্‌স হোমিওপ্যাথি ওষুধের জোরেই এখানে ধন্বন্তরি হয়ে বসেছেন তিনি।

পাহাড়, শালবন, একটি ছোট নদী আর কয়েক ঘর দেহাতী মানুষের ভেতরে মামার

লাল টালির ছোট্ট বাড়িটি অত্যন্ত মনোরম। জায়গাটার কাব্যসৌন্দর্য আমি ঠিক বর্ণনা করতে পারব না— সেই সাহিত্যিক ভদ্রলোক থাকলে তিনিই সেটা ভালভাবে করতে পারতেন। মোটের ওপর আমার ধারণা— কলকাতা থেকে যারা কিছুদিনের জন্য পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায় এবং সেই অজ্ঞাতবাসের সময়ে শহরের কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা না হলেই যারা স্বস্তি বোধ করে, এ জায়গা তাদের পক্ষে আদর্শ।

অনেকটা আগে বাড়িয়েই মামা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর রগের দু'পাশে দু' গোছা পাকা চুল ঝকঝক করছিল সকালের রোদে।

কিন্তু তার চাইতেও ঝকঝকে হাসি হাসলেন মামা, 'আয়—আয়! পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'অসুবিধে!' আমি ম্লান হাসলুম উত্তরে। সারারাত ট্রেনের সেই দুঃস্বপ্নটা আবার আমার নতুন করে মনে পড়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করে জ্বালা-ধরা চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল সব, তখন চামচেতে মুরগীর ডিমের পোচ তুলতে তুলতে আমি মামাকে স্বপ্নটা বললুম। শুনে মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

"আসবার আগে মাংস-টাংস খেয়েছিলি বোধ হয়?"

"তা খেয়েছিলুম। একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল।"

"তাই এই কাণ্ড। পেট গরম হলেই লোকে ওসব খেয়াল দেখে। রান্নার তো দেরি আছে— ব্রেকফাস্টটা ভালো করে সেরে নিয়ে ঘণ্টা তিনেক নিশ্চিন্তে ঘুমো। আমি ততক্ষণে গ্রাম থেকে একটা রোগী দেখাবার পাট সেরে আসি।"

ব্রেকফাস্ট চুকে যাওয়ার পরে মামার ডাক্তারী ব্যাখ্যাটাকে হৃদয়ঙ্গম করে সমস্ত মনটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর ক্যাম্বিসের খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিতেই আবার ঘুমের পালা। এবার নিঃস্বপ্ন এবং নিশ্ছিদ্র।

ঘুম ভাঙল চাকরটার বিকট কান্নায়।

ছুটে বেরিয়ে এলুম বারান্দায়। মামাকে একদল মানুষ বয়ে আনছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। তাদের চোখে-মুখে শোক আর বেদনার ছাপ। হাউ হাউ করে কাঁদছে চাকরটা।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে?" বুকফাটা জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিলুম আমি।

কিন্তু উত্তরের দরকার ছিল না— আমার মন তা আগেই টের পেয়ে গেছে। তবু কে জানত মামার হার্টের অবস্থা এত খারাপ ছিল! মাইল চারেক দূরে পাহাড়ী রাস্তায় ওঠবার সময় ঘোড়া থেকে তিনি পড়ে যান। যারা কাছে ছিল, তারা বললে, ঘোড়া থেকে পড়ে তিনি মারা যাননি— পড়বার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাঁদবার মত শক্তি আমার ছিল না।

এসে যখন পড়েছি, তখন শোকে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা আমার চলে না। আট মাইল দূরের পোস্ট অফিসে দরকারী টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে— সব ঠিক করে, যখন মড়া নিয়ে

বেরুলুম— তখন বেলা নেমে এসেছে।

আড়ষ্ট ক্লান্ত পায়ে চলেছি। প্রায় মাইল দেড়েক দূরে শ্মশান।

কিন্তু একি— একি! এখানে সেই ন্যাড়া পাহাড়টা এল কোত্থেকে? কোথা থেকে তার ধারালো চুড়োটার ওপরে অমন করে পড়েছে শেষ বেলার হিংস্র আরক্তিম আলো— কোথা থেকে একটা শকুন এসে সেখানে ডানা মেলে বসেছে কালপুরুষের মতো?

সব এক— সেই স্বপ্নের সঙ্গে সব এক। আমার চারিদিকে সেই অবিশ্বাস্য শূন্যতার সেই প্রেতপাণ্ডুর বিস্তৃতি।

অমানুষিক ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম— কে যেন আমার পা দুটোকে টানতে লাগল পাথুরে মাটির তলায়। সারারাত ট্রেনে আমাকে অমন করে ভয় দেখালে কে? আমার বার্থের তলায় গুঁড়ি মেরে যে বসেছিল— কে সে?

সে কি মৃত্যু ? আমার সঙ্গে— আমারই সহচর হয়ে এসেছে সে?

অদ্ভুতুড়ে ভুতুড়ে সভা

কুমারেশ ঘোষ

সেদিন অমাবস্যা রাত।

চারধারে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। এক হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না।

গাঁয়ের শ্মশানটার চারপাশের বট, অশত্থ, শ্যাওড়া গাছগুলো এক পায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে অন্ধকার যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মাঝে মাঝে শেয়াল শকুনদের পিলে চমকানো আওয়াজ, অনেকটা মড়া-কান্নার মতই।

আজ এখানে ভূত পেত্নী শাকচুন্নীদের সভা। গেছো ভূত, মামদো ভূত, গোভূতেরাও এসেছে। কেউ তাল গাছ থেকে সড় সড় করে নেমে, কেউ বা কবরের মাটি ফুঁড়ে এসেছে।

সব ভূতেরা মিছিল করে এখানে এই শ্মশানে জমায়েত হয়েছে। মিছিলে ভূত পেত্নীরা তাদের কঙ্কাল হাত মুঠি করে শ্লোগান ছাড়ছে, অবশ্যই নাকি সুরে। আঁমাদের দাঁবি মাঁনতে হঁবে। নঁইলে ঘাঁড় মঁটকে খাঁব। গোভূতরা সামনে শিং নেড়েছে আর মামদো ভূতরা দাড়ি নেড়েছে। অনেকের হাতেই ছিল কালো-পতাকা। অনেকে শিঙে ফুকিয়েছেও। অনেক

পেত্নী আর শাকচুন্নীরা পটল ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাবার সময় পটপট করে অনেক পটল তুলে নিজেদের কোঁচড়ে ভরেছে। বাড়িতে গিয়ে পটল ভাজা, পটল চচ্চড়ি করে খাবে।

সব ভূত-পেত্নীরা শ্মশানে সভায় এসে বসবার পরই একটা বিরাট খট্ খট্-খটাং করে আওয়াজ হলো। এই অদ্ভুত আওয়াজে সব ভূত পেত্নীরা তটস্থ হয়ে উঠলো।

শ্মশানের পাশেই বড় শ্যাওড়া গাছটা থেকে খড়ম পায়ে খটাং করে নামলো ব্রহ্মদত্যি। কালো কংকালের গলায় সাদা পৈতেটা ধব ধব করছে। মাথায় চকচকে টাক, চোখ দুটো যেন চার ব্যাটারীর টর্চ, জ্বল জ্বল করছে। সভাটা ঝলসে উঠলো।

শ্মশানের চিতার আধপোড়া কাঠ দিয়ে সভাপতি ব্রহ্মদত্যির জন্যে বেদী সাজানোই ছিল। সামনে রাখা আছে একটা মড়ার খুলি, ফুলদানী। তাতে সাজানো ছোট ছোট ঝাউ গাছের ডাল।

ব্রহ্মদত্যি বেদীতে পায়ের উপর পা রেখে বসলো।

শ্মশানে এদিক ওদিক অনেক শুকনো মালা পড়েছিল, একটা ক্ষুদে পেত্নী তা তুলে নিয়ে ব্রহ্মদত্যির গলায় পরিয়ে দিলো। সভাপতি বরণ হলো। ভূত পেত্নীবা সব হাড়-হাতে হাততালি দিল।

সভাপতি ব্রহ্মদত্যি বললো, হে ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, প্রথম সারির পাঁচজন আপনাদের অভিযোগ পেশ করুন। পাঁচজনে বললেই যথেষ্ট। কারণ পাঁচজনে যা বলে, তাই সত্যি বলে মেনে নেওয়াই নিয়ম।

(এখানে বলে রাখি, কথাগুলিতে চন্দ্রবিন্দু যোগ করে নাকি সুরেই বললো সভাপতি এবং অভিযোগ জানানো হলো নাকি সুরেই। ছাপার অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু টাইপ কম পড়তে পারে, তাই বাদ দেওয়া হলো।)

মামদো ভূত দাড়ি নেড়ে বললো, আর কবরের জন্যে জমি পাওয়া যাচ্ছে না। জমির দাম খুব বেড়ে গেছে। তাই কবরখানা পর্যন্ত বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। এর বিহিত করুন।

গেছো ভূত বললো, সব গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে শহর করবার জন্যে। থাকি কোথায়?

মেছোতে বললো, আমাদের কোল্ড-স্টোরেজে রাখা হচ্ছে, শীতে হাড় কাঁপুনি-কাঁপতে হয়। একবার মরেও আবার মরে যাবার জোগাড়।

গোভূত বললো, আমাদের হাড় চামড়া শিং দিয়ে নানা জিনিস তৈরী করছে, বেঁচে থাকতে দুধটুকু নিংড়ে বার করেছে, জল মিশিয়ে লাভ করেছে। অথচ যত্ন করে না, বরং বদনাম করে, দুধ দিই না কেবল খাই।

পেত্নী উঠে বললো, গৃহবধূদের হত্যা বন্ধ করতে হবে। হত্যার শোধ নিতে হবে স্বামী শাশুড়ীর ঘাড় মটকাতে দিতে হবে।

পেত্নী বলতেই একটা শাকচুন্নী উঠে দাঁড়ালো। সভাপতি সংগে সংগে নির্দেশ দিলো — আর নয়। পাঁচজন হয়ে গেছে।

শাকচুন্নী বললো, তা হোক। আমার অভিযোগও শুনতে হবে। ঐ মুখপুড়ি পেত্নীটার

কথা শুনলেন যখন আমার কথাও শুনতে হবে। আমি বিধবা মানুষ মাছ খাইনে, শাক ভাত খাই। কিন্তু শাকের ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া পুঁতে রাখা হয়। সেটা দেখলেই ভয় করে। ভূতের চাইতেও দেখতে বিশ্রী। কাকতাড়ুয়া হটাতে হবে।

শাকচুন্নী বসতেই পেছন থেকে লাফিয়ে উঠলো পেঁচোভূত। হাত উঁচিয়ে বললো, স্যার স্যার আমার কমপ্লেন আছে।

শুনেই চমকে উঠলো ব্রহ্মদত্যি—কমপ্লান ? না, না এসব চলবে না। ও-তো নাকি পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের শত্রু। আমাদের কাছে না আসতে দেবার ষড়যন্ত্র। বসুন বসুন বসুন।

পেঁচো ভূত বললো, না স্যার কমপ্লান নয়, কমপ্লেন, অভিযোগ। আগে বাচ্চারা পেঁচোয় পেয়ে মরতো, এখন নানা ওষুধের কৃপায় আর মরছে না। ওষুধে আরো ভেজাল বা বিষ মেশানো যায় কিনা ভেবে দেখুন।

সভাপতি ব্রহ্মদত্যি বললো, ঠিক আছে, আপনি বসুন।...... আমি আপনাদের সকলের অভিযোগ শুনলাম। আমি তাল গাছের গেছো ভূতকে নির্দেশ দিচ্ছি, তিনি সব অভিযোগ তালপাতায় লিপিবদ্ধ করে যমরাজের সেক্রেটারি চিত্রগুপ্তের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

এমন সময় অদূরে শব্দ শোনা গেল, বলো হরি, হরি বোল। কারা যেন মড়া নিয়ে শ্মশানের দিকে আসছে।

ব্রহ্মদত্যি বললো, সভা এখানেই শেষ হলো।

বলেই খটাং করে শ্যাওড়া গাছে উঠে গেল। আব সব ভূত-পেত্নীরাও হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

খুব আশ্চর্যেব কথা, ভূত পেত্নীদের সকলেই খুব অল্পকথায় বক্তব্য জানালো অযথা ঘ্যানর ঘ্যানর করলো না।
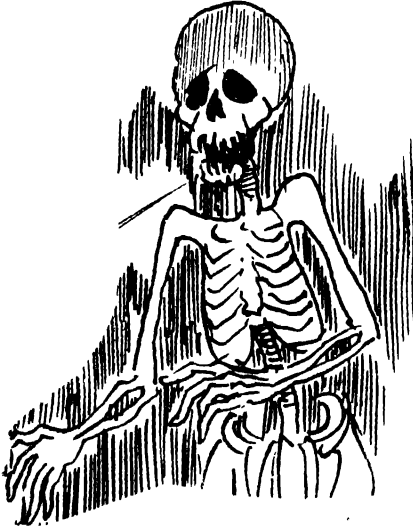
অদ্ভুত ভূত

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আমি তখন বেঙ্গল নাগপুর রেলে কাজ করি, সংক্ষেপে ওই রেলের নাম ছিল বি. এন. আর, এখন সে নাম বদলে হয়েছে এস. ই. আর অর্থাৎ সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

আমি ছিলাম সদর অফিসের লোক, কিন্তু পরিদর্শনের কাজ নিয়ে আমাকে প্রায়ই লাইনে লাইনে ঘুরতে হতো। এক রাত্রে লাইনে ঘোরার সময়ে এক ভূতের পাল্লায় পড়ে প্রাণ খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল—আজ সে কথাই বলি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে, একদিকে ফাসিস্ট শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, হিটলার ইওরোপের অনেক দেশই জয় করে নিয়েছে, রাশিয়ার ওপর প্রচণ্ড হামলা চলছে; ইংরেজ শক্তি ফাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যথাশক্তি লড়ছে।

ভারতের মাটিতেও যুদ্ধের আশঙ্কা। জাপান কলকাতার বুকে বোমা ফেলেছে। কলকাতা শহর ছেড়ে লোক পালাচ্ছে। সে সময় ট্রেনে শুধু সৈন্যদের চলাফেরা। বৃটিশ সৈন্যরা এই দেশের সর্বত্র ঘুরে ফিরে পাহারা দিচ্ছে। রেলের লাইনে শুধু মিলিটারি স্পেশাল। যাত্রীবাহী

ট্রেনের সংখ্যা খুব কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবু আমাদের কষ্ট করেই যেতে হতো। যেখানে সারাদিন তিনটে কি চারটে যাত্রী গাড়ি ছিল, সেখানে একখানা যাত্রীবাহী ট্রেন চলতে লাগলো ; ফলে গাড়ীতে অস্বাভাবিক ভীড় হতো, সেই গাড়ীতে ওঠা যেন ছোটখাটো যুদ্ধজয় করার সামিল।

তবু তো আমাদের লাইনে কাজে বেরোতে হতো। আমরা করতুম কি, ট্রায়াল বগিতে চেপে যাতায়াত করতাম। ট্রায়াল ভ্যান কি—তা আগে বলে নিই, নচেৎ এই বগির ভূত যে কি সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর—তা বোঝা যাবে না।

রেলের কারখানা থেকে বগি তৈরী হওয়া মাত্রই সেই বগি যাত্রীদের গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া হয় না, আগে মেল ট্রেনের পেছনে—একেবারে শেষে ট্রায়ালভ্যান লাগানো হয়, দরজা তালাবন্ধ থাকে, জানালাও বন্ধ থাকে, তাতে না থাকে আলোর ব্যবস্থা, না বিপদ সংকেতের চেন। বগিটা কেমন ছুটতে পারবে—সেটা পরীক্ষার জন্যে নতুন বগিকে মেলগাড়ীর পেছনে লাগানো হয়। রেলের লোকেরা এই আলোহীন বগিতেই যাতায়াত করে থাকে ; চাবি খোলা বা চাবি দেওয়া—তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। প্রত্যেক বড় স্টেশনেই ট্রেন-পরীক্ষক থাকে, তাদের কাছে রেলকামরার চাবিও থাকে।

এই ট্রায়াল ভ্যানের এক কামরাতেই জাঁদরেল এক ভূতের সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়েছিল। সেই গল্পই বলছি, ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

যতই মুখে বলি না কেন, — ভূত নেই, তবু ভূতের সামনাসামনি যদি হওয়া যায়, ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে আসে, তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়। আমার ত' সেই রকম অবস্থাই হয়েছিল।

চক্রধরপুর থেকে বিলাসপুর যেতে হবে আমাকে। রাত্রি এগারোটায় চক্রধবপুব থেকে আপ বোম্বে মেল ছাড়ে, ভোরবেলায় পৌঁছয় বিলাসপুরে। যুদ্ধের সময় তখন ঐ লাইনে একখানি মাত্র ভালো গাড়ী, সুতরাং অসম্ভব ভীড়। ঐ ট্রেনের স্থানাভাবের জন্যে মাঝপথের কোনো স্টেশন থেকে টিকিট বিক্রী করা হতো না—কোনো যাত্রীকে। সব স্টেশনেই এক কথা ঘোষণা করা হতো —ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই।

আমাকে বিলাসপুরে যেতেই হবে, বিশেষ কাজে—রেলেরই কাজ। মালগাড়ী হোক, মেলগাড়ী হোক—আমাদের কাছে যে কার্ডপাশ আছে, তাতে কোনো বাধা নেই, এমন কি গার্ডের কামরাতেও যেতে পারি। তবে আমরা খোঁজ করতাম, ট্রেনের পেছনে কোনো ট্রায়াল বগি আছে কিনা।

যে রাতের কথা বলছি—সেই রাতটায় প্রচণ্ড শীত পড়েছিল, বোধহয় মাঘ মাসের গোড়ার দিকটা হবে। স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল আপ বোম্বে মেলে চক্রধরপুর থেকে একটা ট্রায়াল বগি জুড়ে দেওয়া হবে, সুতরাং আমার বিলাসপুর যাওয়ার আর কোনো ভাবনা রইলো না। আমি রাতের আহারাদি সেরে ট্রায়ালভ্যানে উঠে হোল্ড-অল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। কামরায় আর কেউ নেই, থাকারও কথাও নয়। দরজা চাবি

বন্ধ; আপ বোম্বে মেলের পেছনে জোড়া হয়েছে বগিটা, অন্ধকার কামরা, ইলেক্ট্রিকের ব্যবস্থা নেই, বিপদজ্ঞাপক চেনও নেই। নিরিবিলিতে একটি ঘুম রাত কাবার করতে পারলেই সকালে বিলাসপুর।

ট্রায়াল বগিতে শুয়ে পড়ার সময়ই লক্ষ্য করেছি—চক্রধরপুর থেকে গাড়ী ছাড়লো। বোম্বে মেল এরপর একটানা ঘন্টা দেড়েক চলবে, মাঝে কোথাও দাঁড়াবে না। গাড়ীটা চলেও বেশ জোরে —

শুয়েছি; ঘুম-ঘুম যে একটু পাচ্ছিল না, তা নয়; ট্রেনের দুলুনিতে আমার, শুধু আমার কেন, অনেকেরই ঘুম ধরে যায়। বেশ ঝিমিয়ে পড়েছিলাম—

ট্রেনটা সবে স্পীডে চলতে শুরু করেছে। হঠাৎ মনে হলো আমার সামনের দিকে বেঞ্চে যেন কে এসে বসেছে। কালো কোট গায়ে—আমি যে দিকে পা রেখে শুয়েছি—ঠিক তারই উল্টোদিকের সীটে বসে আছে। ভদ্রতার খাতিরে আমি পায়ের দিকটায় মাথা যে দিকে রেখে ছিলাম সে দিকে পা রেখে— অর্থাৎ উল্টে ঘুরে শুলাম।

আমাকে উঠে ঘুরে শুতে দেখেই বোধহয় লোকটা কথা বললে। কিন্তু সে যা বললে—তা শুনে আমার সারা শরীর ত' প্রায় অসাড় হবার দশা। লোকটার প্রথম জিজ্ঞাসাই হচ্ছে —ধরা, কর্কশ কেমন রুক্ষ ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললে—"আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?"

হঠাৎ এ কী প্রশ্ন! রেলের লোক ছাড়া এ বগিতে ত' কারুর ওঠার কথা নয়; আর রেলের কেউ উঠলে অফিস সংক্রান্ত কথাবার্তাই হয়, না হয় পে কমিশনের দৌলতে টাকাকড়ি কি বাড়বে, কবে বাড়বে —সে সব আলোচনাই হয়। এমন বিশ্রী বিদঘুটে প্রশ্ন তো কখনো শুনিনি। ভয় পেয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, কালো একটা শরীর—বোধহয় চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না —কালো কোট না ওভারকোট গায়ে, বগির ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার—চেহারাটা মালুম হচ্ছে না—তবে কোনো একটা দেহ, সেই দেহে মুখ চোখ আছে কিনা—বুঝতে পারছি না, সচল দেহ না স্থানু লোক —তাও বোঝা যাচ্ছে না।

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় আবার সেই প্রশ্ন—"আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?"

এর কী জবাব দেব? কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভয় পেলে তো চলবে না। সাহস সঞ্চয় করে কোনো রকমে বলি—"না, আমি ভূত বিশ্বাস করি না।"

তৎক্ষণাৎ সেই ধরা রুক্ষ ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলার আওয়াজ শুনলাম—"কিন্তু আমি করি।"

ব্যস্, এই পর্যন্ত। কালো অন্ধকার পরিবেশেও বুঝলাম—লোকটা সেখানে নেই, কেমন যেন উবে গেছে। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে।

বোম্বে মেলের সামনে লাইন ক্লিয়ার—ঘন্টাখানেকের আগে তো দাঁড়াবার কথা নয়। রেলের ঝিক ঝিক ঝম ঝম আওয়াজে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল!

ভুতুড়ে দোলা

বিশু মুখোপাধ্যায়

অল্প বয়সে ভূত সম্বন্ধে কৌতূহল-মেশানো ভীতি সবারই থাকে, আমারও ছিল। ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগত বটে, কিন্তু বেশী ভয়ের গল্প হলে বেশ দু'চারদিন গা ছম্ ছম্ করত। মনে মনে তখন বলতুম, 'ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নি আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি!' ঠাকুমা ভূতের ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এই মন্তরটা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রমশঃ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার একটা কৌতূহলও জেগেছিল মনে। তখন সত্য ঘটনা ব'লে কেউ ভূতের গল্প বললে, আমি তাকে চেপে ধ'রে প্রশ্ন করতুম, আপনি স্বচক্ষে ভূত দেখেছেন কি? অনেকেই তখন আমতা-আমতা ক'রে বলতেন, আমি নিজে দেখিনি, কিন্তু নিজে দেখেছে এমন লোকের মুখ থেকে শুনেছি।

আমার এক বড় ভগ্নীপতি ছিলেন, তিনি খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা ভূতের গল্প শুনতুম। নানা ভাবে অনেকবার নাকি তাঁর সঙ্গে ভূতের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল। তিনি সেই কাহিনীগুলি এমনভাবে গুছিয়ে আমাদের কাছে বলতেন যে,

আমরা ভয় পেলেও বার বার সেগুলি শুনতে চাইতুম। একবার তিনি তাঁর পিসতুতো ভাই-এর এমন একটি ঘটনা আমাদের কাছে বলেছিলেন, যা আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি আরও এই জন্যে যে, সেই পিসতুতো ভাইকে ছোটবেলায় আমরাও দেখেছিলুম এবং এ-কাহিনী যে সত্য তা তিনি নিজেও আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন।

ভগ্নীপতির এই পিসতুতো ভাই ছিলেন তাঁর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাঁদের অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। গ্রামের মধ্যে দোতলা কোঠা বাড়ি ছিল একমাত্র তাঁদেরই। জমি-জায়গার আয় থেকে সংসারই শুধু চ'লে যেত না, বাড়িতে দোলদুর্গোচ্ছব পূজাআর্চাও হ'ত। ঐ পিসতুতো ভাই-এর বউটি ছিল ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বউটি শ্বশুরের ঘর আলো ক'রে ঘুরে বেড়াত। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাযত্নে, ঘর-সংসারের কাজকর্মে সকলের মুখেই বউ-এর সুখ্যাতি আর ধরত না! কিন্তু বিয়ের পর সাত-আট বছর কেটে যাবার পরও বউ-এর যখন কোনো ছেলেপুলে হ'ল না, তখন পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একমাত্র ছেলের কোনো ছেলেপুলে না হলে ছেলের বাপ-মায়ের ভাবনা হয় বৈ কি! তাঁরা বউ-এর ছেলেপুলে হবার জন্যে নানা ঠাকুর-দেবতার শরণাপন্ন হতে লাগলেন। এখানে-ওখানে বউ-এর নামে পূজাআর্চা দেন, মানত করেন। যে যা বলে তাই ক'রে, বউ-এর হাতে গণ্ডা-কতক মাদুলী ঝুলিয়ে দিলেন। এমনি ক'রে আরও প্রায় বছর দুই কেটে গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না! শেষে বউ-এর উপর কেমন যেন একটা বিরূপ ভাব দেখা দিতে লাগল শ্বশুর-শাশুড়ীর। বিশেষ ক'রে শাশুড়ীই সেটা প্রকাশ ক'রে ফেলতে লাগলেন নানা ভাবে। পাড়ার মেয়েরাও এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর সঙ্গে। এমন টুকটুকে মিষ্টি বউ-এর মুখে ক্রমশঃ ভয়ে-ভাবনায় কে যেন এক রাশ কালি ঢেলে দিলে। সুঠাম, সুশ্রী চেহারা দিন দিন রোগা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল। অনেকে এমন কথাও বললে যে, বউ-এর উপর নিশ্চয়ই কোন অশরীরীর দৃষ্টি পড়েছে— তাই ছেলেপুলেও হচ্ছে না, আর শরীরটাকেও চুষে খাচ্ছে।

এই সব শুনতে শুনতে বউ-এর মনেও একদিন ধিক্কার এসে গেল। সে স্থির করলে, এ জীবন সে আর রাখবে না। একদিন রাত-দুপুরে বাড়ির পাশেই এক জল-থইথই দীঘিতে ডুবে আত্মহত্যা করবে ব'লে সে বেরিয়ে পড়ল চুপি চুপি। আস্তে আস্তে পা টিপে বাড়ীর দবজা খুলে দীঘির পাড়ে এসে সে দাঁড়াল। চারিদিক আব্‌ছা চাঁদের আলোয় থম্ থম্ করছে। মৃত্যুভয় না থাকলেও, বউটি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সামনেই বেল-গাছের তলায় এক ইয়া লম্বা-চওড়া পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। আলো-আঁধারের মধ্যেও তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন বউটির কাছে। এসেই ধমকের সুরে বললেন, ছিঃ মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ! যাও, ঘরে ফিরে যাও—শীগ্‌গীরই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তবে এ কথা আর কারুকে ব'লো না তুমি।

গলায় পৈতে, খালি গা, দীর্ঘকায় এই পুরুষকে প্রণাম ক'রে বউটি ভয়ে ভয়ে আবার পা-টিপে-টিপে বাড়ি ফিরে এলো। সকলে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বাড়ীর কেউই এ কথা

জানতে পারলে না।

পরদিন সকাল থেকে বউ হয়ে গেল একেবারে অন্য মানুষ। এতদিন মন-মরা হয়ে যে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে, আজ তার মুখ হাসিখুশী, মনে আনন্দের জোয়ার! কয়েক মা.. যেতে না যেতেই ক্রমশঃ বউ-এর কোলে বাচ্চা আসার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল সকলের কাছে। শ্বশুর-শাশুড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে পাড়া-পড়শীদেরও আনন্দ আর ধরে না। বউ-এর তখন সে কি আদর-যত্ন! শাশুড়ী বলে, তুমি মা বেশী খাটাখুটি ক'রো না; শ্বশুর বলে, বউমাকে মাছের মুড়োটা দাও। আর তার স্বামীর তো কথাই নেই! সে যেখান থেকে যা পারে ভাল ভাল খাবার জিনিস এনে দেয় বউকে।

এমনি ক'রে দিন যায়। ব্রহ্মদত্যি ব্রাহ্মণের কথাটা কিন্তু বউ-এর পেটের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে। স্বামীকে বলি-বলি ক'রেও ভয়ে বলতে পারে না। শেষে একদিন থাকতে না পেরে ব'লেই ফেললে। স্বামী তো শুনে একেবারে হতভম্ব! কিন্তু এই হতভম্ব ভাব সহজেই কেটে গেল, যখন একটি মিষ্টি হাত-পা-নাড়া জ্যান্ত ডলি পুতুলের মুখ ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল সে। মাথায় একরাশ কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, টানা-টানা চোখ, আর তুলতুলে দেহটা যেন ময়দার সঙ্গে আলতা গুলে তৈরি করেছে কে!

ছেলের মা-বাবা তো বটেই, এমন কি ঠাকুমা-ঠাকুর্দা থেকে আত্মীয়স্বজন সকলেই আঁতুড়-ঘরে গিয়ে বিভোর হয়ে যেত,এই সাত রাজার ধন মাণিককে দেখে— তার দিক্ থেকে কেউই চোখ ফেরাতে পারত না!

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে, আঁতুড়-ঘরেই বিষাদের ছায়া নেমে এলো। বউটি হঠাৎ মারা গেল আট্‌কড়ায়ের আগের দিন সেপ্‌টিক জ্বরে। মারা যাবার একটু আগেও বউটির বাচ্চার দিকে চেয়ে চেয়ে সে কি দেখা! বাচ্চার গায়ে একটা হাত রেখেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

এমন ঘটনা ঘটবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি! সবাই দুঃখে শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কিন্তু এই শোককেও চাপা দিয়ে আর এক ঘটনা বাড়ির সবাইকে ভয়ে-ভাবনায় একেবারে কাবু ক'রে ফেললে! ব্যাপারটা ঘটল ঐ নবজাত শিশুকে নিয়ে। মা-মরা বাচ্চাকে কি ক'রে বাঁচান যাবে, এই নিয়ে যখন সকলেই জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত, তখন কোন্ এক অদৃশ্য হাত এসে যেন তার সব ভার নিজের হাতে তুলে নিলে।

দুধের বাচ্চাকে মানুষ করার হাঙ্গামা অনেক। তাছাড়া মায়ের মত বুকের রক্ত আর স্নেহ-যত্ন দিয়ে কেউই পারে না সাত-আট দিনের বাচ্চাকে বাঁচাতে! কিন্তু এ হাঙ্গামা কারুকেই পোয়াতে হ'ল না, বরং বাচ্চার আনন্দ-উচ্ছল মুখ ও হালুচালু ভাব দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গেল। ছেলের পেট যেন সারাক্ষণই ভ'রে আছে, খাওয়াতে গেলে খেতে চায় না, কান্নাকাটিও বেশী নেই। একটুকেঁদেই কাকে এদিক্-ওদিক্ দেখে আবার যেন চুপ ক'রে যায়, মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। গায়ের কাঁথা বা ঢাকা ভিজিয়ে ফেললে, কেউ বদলে দেবার

আগেই, সেগুলি সবার অলক্ষ্যে কে যেন পাশে টেনে ফেলে আবার নতুন পাটকরা কাঁথা-কাপড় বদ্‌লে দেয়।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বাড়ির কেউই তেমন ক'রে বুঝতে পারে নি, কিন্তু সেদিন বুঝল, যেদিন দেখল বাচ্চার দোলা বারান্দায় আপনা থেকেই দুলছে। বাচ্চার ঠাকুমা দোতলার বারান্দায় বাচ্চার জন্য একটা বেতের দোলা টাঙিয়েছিলেন। মা-মরা এই ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে, দোতলায় শুইয়ে দিয়ে, তিনি একটু নিশ্চিন্ত হতেন— সংসারের কাজকর্ম দেখতে পারতেন। কিন্তু এমন কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি! মানুষজন কেউ কোথাও নেই, অথচ দোলা আপনা থেকেই দুলছে! দুলতে দুলতে যেই দোলাটা থেমে আসছে, আবার যেন কেউ ঠেলে দিচ্ছে সেটাকে। বাচ্চার ঠাকুমা বাড়ির সবাইকে ব্যাপারটা ডেকে এনে দেখালেন। দেখে সবাই তো থ হয়ে গেল!

কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া-পড়শীরা ভেঙে পড়ল বাড়িতে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল আশেপাশের চারিদিকে। দূর দূর গ্রাম থেকেও লোক আসতে লাগল এই ভুতুড়ে দোলা দেখার জন্যে।

পাড়ার মাতব্বররা ছেলের বাপ ও ঠাকুর্দার কাছে, গিন্নীবান্নীরা ঠাকুমার কাছে গিয়ে বলতে লাগল রোজা ডাকিয়ে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। গয়ায় গিয়ে মায়ের পিণ্ডি দিতেও বলল কেউ কেউ। কিন্তু এক বছরের আগে গয়ায় মৃতের পিণ্ডি দেবার রীতি নেই। তাছাড়া ছেলের বাপ এ সবে আপত্তি করলে। এ ব্যাপারে সে ভয় পেয়ে গেল আরও এই জন্যে যে, এতে হয়ত ঐ শিশুর জীবন নিয়েও টানাটানি হতে পারে!

শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হ'ল না। দিনের পর দিন এই ভুতুড়ে কাণ্ড চলতে লাগল বাড়িতে। এক মাস, দু'মাস ক'রে ছেলে বড় হতে লাগল, হামা দিতে শিখল। ক্রমশঃ তার মুখে ভাত দেবার সময় এগিয়ে এলো। ছেলের মৃত মা-ই তখন অলক্ষ্যে থেকে তাকে তদারক করে, তার সঙ্গে খেলা করে। ছেলে উপরের ঘরে থেকে হাসে-খেলে। তাকে দেখার জন্যে ঠাকুমাকে আর উদ্‌গ্রীব হতে হয় না। শুধু একটি বুড়ী ঝিকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, বেশী টাকা দিয়ে, তার জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা বাড়ির সকলের গা-সওয়া হয়ে গেলেও সবারই মনে একটা চাপা অস্বস্তি লেগে গেল। তাছাড়া এক বছর হয়ে গেল অথচ ছেলের অন্নপ্রাশন হ'ল না! কতদিনই বা অস্বস্তিকর ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা টেনে যাওয়া যায়? এদিকে ছেলেও বড় হচ্ছে আর আত্মীয়স্বজনরাও যা-তা রটাচ্ছে! এমনি সময় ছেলের বাপ একদিন গয়ায় যাওয়াই স্থির করলে। যাওয়ার আগে তার বাপ-মার সঙ্গে যুক্তি ক'রে গেল যে, গয়া থেকে ফিরে এসেই ঘটা করে তারা ছেলের মুখে ভাত দেবে।

কিন্তু তার আর সুযোগ হয়নি। গয়া থেকে ফিরে এসে ছেলের বাপ ছেলেকে আর দেখতে পায়নি! যেদিন সে গয়ায় তার কাজ শেষ করে, সেই দিনই গ্রামে ঐ শিশু ডিপথিরীয়ায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

আশেপাশের যারা এই ভুতুড়ে ঘটনার কথা জানত, তারা সকলেই একবাক্যে এই মৃত্যুসংবাদ শুনে বলেছিল, মা-ই নিয়ে গেল বাচ্চাটাকে তার কাছে!

সেই দু'খানি পা

বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শুরুতেই জানিয়ে রাখি, ঘটনাটা আমার স্বচক্ষে দেখা নয়, শোনা। এ ঘটনা আমি যার কাছে জেনেছিলাম, তিনি নিজেই ছিলেন এ কাহিনীর এক অন্যতম চরিত্র। সত্য, মিতভাষী ও পরোপকারী এই মানুষটির প্রকৃত নাম আমি গোপন রাখছি। শুধু তোমাদের সামনে অবিকল তুলে ধরছি ভয়ংকর সেই কাহিনী।

সাল ১৯৪৭। সারা ভারতবর্ষে তখনও লুঠতরাজ, '৪৬-এর দাঙ্গা-হাঙ্গামার জের চলছে। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজজীবন টালমাটাল। এমনই এক সময়ে, আলোচ্য কাহিনীর বক্তা ভদ্রলোক, নাম সত্যেশ্বর, আসাম যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য, সার্ভেয়ার হিসাবে পুরনো রেকর্ডপত্র ঘেঁটে দেশবিভাগের পর আসামের কতটুকু ভারতে থাকবে আর কতটুকু পাকিস্তানে থাকবে তা স্থির করা। বস্তুত, তাঁর রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই ইংরেজ সরকার আসামে সীমানা স্থির করবেন।

গৌহাটি স্টেশন থেকে সোজা সার্ভে অফিসে গিয়ে দেখা করলেন সত্যেশ্বর। সার্ভে

অফিসে ছোটখাট কাজ সারতে সারতে তিনি দেখলেন রাত হয়ে গেছে। অথচ রাতে কোথায় থাকবেন তা ঠিক হয়নি। সত্যেশ্বরবাবু হোটেলের খোঁজ করছেন, এমন সময় তাঁরই অফিসের এক বিহারী পিওন শুকরাম জানাল যে, তাদের বাড়িতে সত্যেশ্বরের থাকবার মতো একখানা ঘরের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। ঘটনাচক্রে শুকরামদের বাড়িতে সে রাতে আশ্রয় পেয়ে সত্যেশ্বর নিঃসন্দেহে আশ্বস্ত হলেন। শত হলেও গৃহস্থ বাড়ির আপ্যায়ন আর মফস্বলের হোটেলের অভ্যর্থনার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে।

তা সত্যিই শুকরামের বাড়িতে সে রাতে ভাল আপ্যায়নই পেলেন তিনি। শুকরামের স্ত্রী পর্দানসীন অর্থাৎ বাইরের পুরুষ মানুষের সামনে বেরোয় না। কিন্তু তার দুই মেয়ে পূর্ণিমা আর সরসতিয়া, দুজনেরই বয়স বারো থেকে চোদ্দর মধ্যে, তাঁকে খুব যত্ন করলো। গাওয়া ঘি, পটল ভাজা,মুগ ডাল আর আচার দিয়ে হাতে গড়া রুটি গোটা দশেক খেয়ে ফেললেন সত্যেশ্বর। খাওয়ার সময় তাঁর পাশে বসে সরসতিয়া হাওয়া করতে লাগলো। আর পূর্ণিমা নিল পরিবেশনের ভার। খাওয়ার পাট চুকলে সত্যেশ্বর একটু লজ্জিত কণ্ঠে জানালেন তাঁর এতবেশি খাওয়াটা উচিত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে প্রতিবাদ জানাল শুকবাম আর তার দুই মেয়ে। মনে হলো অন্তঃপুর থেকে তার গৃহিণীও তাদের সমর্থন জানাল। তিনি অতিথি, হয়তো শুকরামদেরই যত্নের ত্রুটি হয়ে গেছে।

আঁচিয়ে ওঠবার পর পূর্ণিমা এক খিলি পান সেজে আনল। শুকরামের বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। হ্যারিকেনই ভরসা। এমন সময় উঠোনে কারও গলার আওয়াজ পেয়ে সবাই হঠাৎ চমকে উঠল। শুকবাম হ্যারিকেন হাতে বাইরে এসে দেখল সার্ভে অফিসের সত্যেশ্ববাবুর সহকর্মী শেখ মহিউদ্দিন উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। যদিও হিন্দু মুসলমানেব বিভেদ সে সময়ে সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছিল, কিন্তু সরকারী অফিসের কর্মীদেব মধ্যে সেটা বিদ্যমান ছিল না। এত রাত্রে আর একজন সহকর্মী তাঁর খোঁজ নিতে এসেছেন দেখে সত্যেশ্বর খুশি হলেন। তিনি শেখ সাহেবকে ডেকে এনে ঘরের মধ্যে বসালেন।

শেখ সাহেবের বয়স ষাট ছাড়িয়েছে। মুখে সাদা লম্বা দাড়ি, আর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা তাঁকে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। কথা তিনি বলেন কম শোনেন বেশি। দেশের রাজনীতি মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের আলোচনা দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠল।

বাত যখন প্রায় সাড়ে দশটা পূর্ণিমা এল সত্যেশ্বর বাবুকে শুতে ডাকতে। শেখ সাহেব যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। পূর্ণিমার পিছন পিছন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট শোবার ঘরটির দিকে চললেন সত্যেশ্বর। তবে কিছুদূর গিয়ে তাঁর খেয়াল হলো বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় শেখ সাহেবের কাছে বিদায় নেওয়া হয়নি। তিনি পূর্ণিমাকে দাঁড়াতে বলে আবার ফিরে এলেন বৈঠকখানায়। কিন্তু সেখানে তখন শুকরাম ছাড়া আর কেউ ছিল না। সত্যেশ্বরবাবুকে ফিরে আসতে দেখে শুকরাম যেন আঁতকে উঠল।

'কি হয়েছে দাসবাবু?'

সত্যেশ্বর শুকরামকে চমকাতে দেখে অত্যন্ত অবাক হলেন, তবু সে ভাব গোপন রেখে

বললেন, 'শেখসাহেব কি চলে গেছেন?'

শুকরাম মাথা নাড়ল, 'হাঁ, এইমাত্র চলে গেলেন।'

সত্যেশ্বর অগত্যা আবার ফিরে চললেন। পূর্ণিমার কাছে পৌঁছতেই সে দূর থেকে তাঁর ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। সত্যেশ্বরও নীরবে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। সবে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছেন তিনি এমন সময় খপ করে কে যেন তাঁর হাত চেপে ধরল। ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন সত্যেশ্বর, সেই ছায়ামূর্তি ইশারায় তাঁকে শব্দ করে উঠতে বারণ করল। আকাশে তৃতীয়ার মরা চাঁদ, তারই আলোয় সত্যেশ্বর দেখেন হাত ধরে আছেন শেখ সাহেব।

ফিসফিস করে শেখসাহেব বললেন, 'দাসবাবু, আমি আপনার জন্যেই চলে যেতে পারিনি। আপনি এই মোড়কটা আপনার কাছে রাখুন।' বলে শেখসাহেব তাঁর প্রিন্স কোটের পকেট থেকে একটা বড় সাদা মোড়ক বের করে সত্যেশ্বরের হাতে দিলেন। বললেন 'রাত্রে একবারের জন্যও এটা হাত ছাড়া করবেন না। খবরদার, তাহলে কিন্তু ভীষণ বিপদ উপস্থিত হবে।'

সত্যেশ্বর ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তবু কৌতূহল যায় না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কথা বলছেন কেন শেখ সাহেব?'

শেখসাহেব তেমনি ফিসফিস করে বললেন, 'বলবার সময় নেই, কিন্তু এটা হারাবেন না। ভীষণ বিপদ। খুদা হাফিজ।'

শেখসাহেব অদৃশ্য হলেন। তাঁর দেওয়া সাদা কাগজে মোড়া চৌকো বস্তুটা হাতে নিয়ে সত্যেশ্বর ঢুকলেন শোবার ঘরে।

ঘরটি মাটির। বিছানা করা আছে পরিপাটিভাবে, মায় মশারিটি পর্যন্ত টাঙানো আছে। একটি ছোটো টুলের উপর কুঁজো আর গ্লাস। সত্যেশ্বর পাঞ্জাবি খুলে সরিয়ে রাখলেন। তাবপর এক গ্লাস জল খেয়ে শুতে যাবেন, তাঁর মনে পড়ল মোড়কটার কথা, শেখসাহেব যেটাকে হাতছাড়া করতে নিষেধ করেছিলেন। তাড়াতাড়ি সেটাকে পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে কোমরে ঘুনসিতে রেখে দিলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

ক্লান্ত চোখে ঘুম নামতে বিলম্ব হলো না। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন জানেন না, হঠাৎ একটা খট খট শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথমটা কোথা থেকে শব্দটা আসছে বুঝতে চাইলেন তিনি। এদিক ওদিক ভালো ভাবে নজর করে ঘরের মেঝের দিকে চাইতেই আঁতকে উঠলেন। হ্যারিকেনটা এক পাশে কমান ছিল। তার স্তিমিত আলোয় দেখেন এক জোড়া খড়ম-পরা পা অত্যন্ত দ্রুত ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করছে। পায়ের উপরে মানুষের অবয়ব খুঁজতে গিয়ে সত্যেশ্বরের বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। কারণ সেখানে কোনো মানুষের দেহ ছিল না।

কোনো দুর্বল হৃৎপিণ্ডের মানুষ মারা পড়ত সেই মুহূর্তেই, কিন্তু সত্যেশ্বর একেবারে দুর্বল ছিলেন না। তাছাড়া তাঁব মনে হলো একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ের তখনও আরও বাকী ছিল। হঠাৎ তিনি দেখলেন খড়ম-পরা পা জোড়া

ঠিক তাঁর খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর সেই পা জোড়ার একটা পা উপরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটাও উঠে এল। অর্থাৎ পা জোড়া তখন সত্যেশ্বরবাবুর বালিশের পাশে। ক্রমে ধীরে ধীরে পা দুটো তাঁর গলার দিকে এগিয়ে এল।

আবার সত্যেশ্বর অনুভব করলেন একটা অদৃশ্য শক্তির প্রবাহ যেন তাঁর শরীর বেয়ে উঠে আসছে। এক আসুরিক শক্তিতে তিনি খাট থেকে মশারি তুলে লাফিয়ে নেমে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সমস্ত দেহ তখন ঘামে ভিজে জব-জব করছে। মনে হচ্ছে সেই এক রাতেই যেন তাঁর পরমায়ু অর্ধেক কমে গেছে। অত রাত্রে শুকরামের বাড়ির অন্যান্য ঘরের দরজা বন্ধ। টলমল পায়ে কোনো রকমে শুকরামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আচ্ছন্নের মতো তিনি বড় রাস্তায় এসে বসলেন।

পরদিন সকালে সবার আগে দেখা হলো সরসতিয়ার সঙ্গে। সরসতিয়া তাঁকে দেখে যেন চমকে উঠল। কিন্তু সত্যেশ্বর মেয়েটির দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে চাইলেন না। তিনি শুকরামের অপেক্ষায় ছিলেন। এক সময় শুকরাম বেরিয়ে এল। সত্যেশ্বর মুখে কোনো কথা না বলে সোজা শুকরামের ফতুয়ার বুকের কাছটা মুঠো পাকিয়ে ধরলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার শুকরাম শিশুর মতো শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সত্যেশ্বর কঠিন স্বরে জানতে চাইলেন, 'ওই ঘরের মধ্যে কাকে পুষে রেখেছিস বল?'

শুকরাম কাঁদছিল। কাঁদছিল তার মেয়েরাও। শুকরাম বলল, 'পারি না সাহেব, ভয়ে কিছু করতে পারি না। উনি ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। প্রতিবছর স্বপ্নে নতুন নতুন মানুষ নিয়ে আসবার আদেশ দেন। ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে ওর শরীরটা থেঁৎলে গিয়েছিল। অক্ষত ছিল শুধু ওর পা দুটো। আপনার আগে ওই ঘরে আরও সাত আটজন ভয় পেয়ে মারা গেছে। ওটা ছিল ঠাকুর্দার ঘর। আমি গয়ায় পিণ্ড দিতে চাই, কিন্তু বাড়িতে তিনটে মেয়েকে রেখে গয়া যেতে সাহস পাই না। এমন কাউকে পাইনি যারা গয়া যাবে।'

সত্যেশ্বর এখন অন্য মানুষ। গর্জন করে উঠলেন, 'তা বলে তুই নির্দোষ মানুষগুলিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবি? আমি যাব গয়ায়। বল তোর ঠাকুর্দার নাম।'

দিনের আলোতে সেই ঘর থেকে নিজের পাঞ্জাবিটা নিয়ে এলেন সত্যেশ্বর। সেই দিনই রওনা হয়েছিলেন গয়ায়। প্রেত-শিলায় পিণ্ডদান করেছিলেন। সেদিন সেই অভিশপ্ত ঘর থেকে পাঞ্জাবি নিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় ঘরের দেওয়ালে দেখেছিলেন একখানা বিবর্ণ ছবি। এক শুষ্ক চেহারার বৃদ্ধের। আরক্ত চোখ দুটিতে রাগত ভাব। আর বৃদ্ধের পা! পায়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর আবার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল ছবিটা বুঝি জীবন্ত। সে ছবি ঘরের মধ্যেই পুড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন তিনি।

শেখসাহেবকে পরে সব ঘটনা জানাতে তিনি গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যখনই আর এক পিওন বৈকুণ্ঠের মুখে শুনলাম যে শুকরাম আপনাকে ওর বাড়িতে নিয়ে গেছে, তখনই বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম। ওই সাদা মোড়কটা আমার এক শ্রদ্ধেয় পীরবাবার তাবিজ।'

যাই হোক, এ ঘটনার কিছুদিন পরে শুকরাম ওই বাড়ি ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে যায়। আর পিণ্ডদানের পর সে ঘরের বদনামও আর সত্যেশ্বর শোনেননি।

ভৌতিক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভূত আছে কি নেই এ তর্ক বহুদিনের। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও এ ধরনের তর্ক আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। দুটো তর্কেরই আজও নিষ্পত্তি হয়নি। বিজ্ঞানের যুগে তোমরা হয়তো এসব মানতে চাইবে না।

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যা দেখা যায় না, তার অস্তিত্বই নেই, এই তোমাদের মত।

ভূতের কথা তোমাদের মতন এতদিন আমিও বিশ্বাস করতাম না। অনেক জায়গায় ভূত দেখার আমন্ত্রণ পেয়েছি। পোড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছি, ঘোর অমাবস্যায় শ্মশানে ঘোরাফেরা করেছি। কিছু চামচিকে আর শেয়াল ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনি।

ভূত সম্বন্ধে আমিও ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়ে উঠছিলাম, এমন সময় ব্যাপারটা ঘটল।

ঠিক আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে সমর রায়। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, লেখাপড়াতেও তেমনই উৎসাহী। বি, এ. পরীক্ষা দেবার আগে মাঝে মাঝে আমার কাছে

পড়তে আসত। সেই সময়ে তার বিদ্যাবুদ্ধি পরখ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তা ছাড়া একেবারে পাশের বাড়িতে থাকত, খুব ছোটোবেলা থেকেই তাকে দেখছি।

ইদানীং অনেকদিন সমরের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছিলাম পরীক্ষার পর সে বাইরে কোথায় বেড়াতে গেছে।

এক সন্ধ্যায় ঘরে বসে একটা বই পড়ছি। বাইরে ঝড়ের আভাস জানালা, দরজার পর্দাগুলো দমকা বাতাসে উড়ছে। দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও যেন গায়ে এসে পড়ল, কিন্তু বইটা এত ভাল লাগছিল যে উঠে গিয়ে জানালাগুলো বন্ধ করতেও ইচ্ছে করছিল না।

হঠাৎ সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। ভাবলাম ঝড়। চোখ ফিরিয়েই কিন্তু অবাক হলাম। সমর এসে দাঁড়িয়েছে। উস্কখুস্ক চুল, পাংশু মুখ।

কি সমর, কবে ফিরলে? বইটা মুড়ে প্রশ্ন করলাম।

সমর কৌচে, আমার পাশে বসে বলল, এই একটু আগে। জামা কাপড় ছেড়েই আপনার কাছে চলে আসছি।

কি ব্যাপার? মনে হল সমরের বোধ হয় জরুরী কোন কথা বলবার আছে।

আপনার সময় হবে এখন? আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

হাসলাম, অফুরন্ত সময়। বল কি তোমার কথা?

আপনি ভূত বিশ্বাস করেন মাস্টারমশাই? এ প্রশ্ন হাজার বার হাজার জায়গায় শুনেছি। সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম, কি বলতে চাইছ বল?

মৃত্যুর পর মানুষ শেষ হয়ে যায় না মাস্টারমশাই। ভূত বলুন আত্মা বলুন, তারা আছে। মাঝে মাঝে তারা দেখাও দেয়।

বুঝলাম কোন কারণে সমর খুব উত্তেজিত হয়েছে। অনেকেরই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। আধো অন্ধকারে গাছপালা দেখে ভূতপ্রেত কল্পনা করে, কিংবা বদমাইশ লোকের প্রতারণায় ভুলে মনে করে অশরীরী কিছু একটা দেখেছে। সমরের পিঠে হাত রেখে বললাম, মাথা ঠাণ্ডা করে কি হয়েছে বল তো?

সমর কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ আর কপাল মুছে নিল তারপর একটু দম নিয়ে বলতে আরম্ভ করল।

লক্ষ্ণৌতে আমার এক পিসি আছেন আপনি জানেন বোধ হয়? হ্যাঁ, তোমার কাছেই শুনেছি। তিনি কোন এক স্কুলের শিক্ষিকা, তাই না?

সমর ঘাড় নাড়ল, পিসি বৈজনাথ শিক্ষাসদনে পড়ান। তিনি অনেকদিন ধরে তাঁর কাছে আমাকে যেতে লিখছেন, কিন্তু একটার পর একটা ঝঞ্ঝাটের জন্য যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তাই পরীক্ষার পর ভাবলাম, এখন তো প্রচুর অবসর, এইবার ঘুরে আসি। মাসখানেক আগে দেরাদুন এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে গেলাম।

তোমার বাবার কাছে শুনেছি। আমি কৌচের ওপর পা দুটো তুলে ভাল হয়ে বসলাম।

আপনি শুনলে হাসবেন, জীবনে এই আমার প্রথম রেলযাত্রা। কাজেই উৎসাহের অন্ত

ছিল না। প্রত্যেক স্টেশনে, ট্রেন থামতেই আমিও নেমে প্লাটফর্মে পায়চারি করতে আরম্ভ করি। গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে কামরায় উঠি। কিন্তু এক স্টেশনে বিপদ ঘটল।

আমি সোজা হয়ে বসলাম, কি ট্রেন ছেড়ে দিল তো?

সমর আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বলতে লাগল, এক স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম একটি বছর আট-নয়েকের মেয়ে, বেশ ফুটফুটে চেহারা, কোকড়ানো চুল, পরনে নীলচে রঙের একটা ফ্রক, আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

প্রথমে ভাবলাম আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েটি বোধহয় অন্য কাউকে ডাকছে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, না আর কেউতো ধারে কাছে নেই। মেয়েটিকে বাঙালী বলেই মনে হল। প্লাটফর্মের ওপর বেশীর ভাগই অন্য জাতের জটলা। মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমায় সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ভাবলাম, বিদেশে মেয়েটি নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছে। আমাকে স্বজাতি দেখে সাহায্য চাইছে।

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি এগোতে সে চলতে শুরু করল স্টেশনের বিশ্রামকক্ষের দিকে। বুঝতে পারলাম, সম্ভবতঃ ওই বিশ্রামকক্ষে তার কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া বিপদে পড়েছেন কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। কিন্তু না, বিশ্রামকক্ষের সামনে একটু দাঁড়িয়ে মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে আবার হাত নেড়ে ডেকেই আরও এগিয়ে গেল।

এ ধারে একটা বকুলগাছ। অজস্র বকুল ঝরে পড়েছে পথের ওপর। পাশে স্টেশনের সীমানার রেলিং। মেয়েটি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

আমি জোরে জোরে হেঁটে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং ঠিক সময় আমি আর উৎকণ্ঠা দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল?

হুইসেল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। এদিকে চেয়েদেখি মেয়েটি উধাও। এক নিমেষে যেন মুছে গেল। আমি ট্রেনের দিকে ছুটলাম কিন্তু ধরতে পারলাম না। দুরন্ত গতিতে ট্রেন যেন আমার চেষ্টাকে উপহাস করতে করতে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ পরে আমি হাসলাম। ওই তোমার ভৌতিক গল্প! মেয়েটি তোমায় বোকা বানিয়ে সরে পড়েছে। বয়স কম হলে হবে কি, মেয়েটি ভারি ওস্তাদ মনে হচ্ছে।

সমর আমার হাসিতে যোগ দিল না। গম্ভীর গলায় বলল, আমার কাহিনী এখনও শেষ হয়নি মাস্টার মশাই।

আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। বললাম, বেশ, বলে যাও।

আমি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ফেল করার কথা বললাম। তিনি পরের স্টেশনে ফোন করে দিলেন, যাতে তারা আমার বিছানা আর সুটকেসটা নামিয়ে রাখতে পারে। এর পরের ট্রেন রাত সাড়ে নটায়। হাতে অঢেল সময়।

সমস্ত বিশ্রামকক্ষগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কয়েকজন দেহাতী যাত্রী বসে আছে।

মেয়েটি কোথাও নেই। স্টেশনের বাইরে কয়েকটা টাঙ্গাওয়ালাকে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তারা কেউই কিছু বলতে পারল না।

আশ্চর্য লাগল, চোখের সামনে থেকে মেয়েটি কি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এই প্রচণ্ড দিনের আলোয় কোথায় সে সরে যেতে পারে!

আশ্চর্য হবার আমার আরও বাকি ছিল। রাত সাতটা নাগাদ সারা স্টেশনে হই চই। সবাই খুব ব্যস্ত। গিয়ে খবর নিয়েই চমকে উঠলাম। দেরাদুন এক্সপ্রেসের সঙ্গে এক মালগাড়ীর ভীষণ ধাক্কা লেগেছে। অনেক লোক আহত হয়েছে, মারা গেছে বেশ কয়েকজন। আপাততঃ সব গাড়ি বন্ধ। দু একটা রিলিফ ট্রেন সাহায্য নিয়ে ছোটাছুটি করছে। স্টেশন মাস্টারের কামরায় খুব ভিড়। অনেকেই আত্মীয়স্বজনের খবর নেবার জন্য ব্যাকুল।

ভিড় কমতে খবর পেলাম, দেরাদুন এক্সপ্রেসের সামনের চারখানা বগি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সামনের তিন নম্বরের বগিতে আমার থাকার কথা। সেই মুহূর্তে নতুন করে আবার মেয়েটির কথা মনে এল। মেয়েটি যদি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে না নিয়ে যেতো, তাহলে আমার কি অবস্থা হতো ভেবেই শিউরে উঠলাম।

সেই রাত্রেই দুটো টেলিগ্রাম করলাম। একটা কলকাতার বাড়িতে আর একটা লক্ষ্ণৌতে, পিসির কাছে। লিখে দিলাম যে ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার হাত থেকে আমি বেঁচে গেছি। পথে এক স্টেশনে আমি নেমে পড়েছিলাম।

লাইন ঠিক হতে দিন দুয়েক লাগল। তারপর লক্ষ্ণৌ রওনা হলাম, পিসিকে খবর দিয়ে।

সারারাত মেয়েটির কথা ভাবলাম। বিধাতার আশীর্বাদের মতন মেয়েটি যেন আমার প্রাণরক্ষা করতেই এসেছিল। কিন্তু কাজ শেষ করে মেয়েটি কোথায় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন এগারোটা নাগাদ লক্ষ্ণৌ পৌঁছলাম। স্টেশনে পিসি এসেছিলেন। খুব ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছিলাম, তবু চিনতে অসুবিধা হল না। পিসির চেহারা প্রায় একই রকম আছে।

প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, খবরের কাগজে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পড়ে আমার যা অবস্থা হয়েছিল। কেবল মনে হচ্ছিল, এর জন্যে যেন আমিই দায়ী। আমি বার বার তোকে আসতে লিখেছিলাম। তারপর তোর টেলিগ্রামটা পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। কি ব্যাপার বল তো?

সব ব্যাপারটা বললে পিসী হয়তো বিশ্বাসই করতেন না। বিশেষ করে তিনি যখন স্কুলে বিজ্ঞান পড়ান। কাজেই মেয়েটির ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গিয়ে বললাম, চা খেতে একটা স্টেশনে নামতে ট্রেন ছেড়ে দিল পিসি। ছুটে গিয়েও ট্রেন ধরতে পারলাম না।

পিসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান তোকে বাঁচিয়েছেন, জন্ম জন্ম যেন তোর চা খাওয়ার নেশাটা থাকে।

দুজনে টাঙ্গায় উঠলাম। প্রায় আধঘন্টার ওপর চলার পর একটা বাড়ির সামনে টাঙ্গা থামল পিসির নির্দেশে।

পিসি নেমে চিৎকার করলেন, সুন্দর, সুন্দর। একটি ছোকরা নেমে এল। আমার সুটকেস আর বিছানা নিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। পিসির পিছন পিছন আমিও ওপরে উঠলাম।

মাঝারি সাইজের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে পিসি বললেন, ওই ঘরটা তোর। যা জামা কাপড় ছেড়ে নে। আমি জলখাবারের বন্দোবস্ত করি। শরীর খুবই ক্লান্ত ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

এক কোণে একটা টেবিল, তার ওপর বাতিদান। একটা আলনা, ছোট একটা খাট। দেওয়ালে গোটা তিনেক ছবি। সামনের ছবিটার দিকে চাইতেই সমস্ত শরীর বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতন কেঁপে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল ভয়ের কালো একটা ছায়া আমাকে আবৃত করার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ডাকলাম, পিসি, পিসি।

পিসি বোধ হয় নিচের রান্নাঘরে ছিলেন। কোন সাড়া পেলাম না। কিন্তু পিসিকে আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ির মাঝ বরাবর নেমে আবার ডাকলাম পিসি, ও পিসি।

এতক্ষণে আমার ডাক পিসির কানে পৌঁছাল। হন্তদন্ত হয়ে পিসি সিঁড়ির কাছে এসে বললেন, কিরে, কি হয়েছে?

একটু এ ঘরে এসো তো।

আমি ছুটে ওপরের ঘরে এসে দাঁড়ালাম। হাঁপাতে হাঁপাতে পিসিও এলেন একটু পরে। কি হল রে তোর? শরীর খারাপ হয়নি তো? এত ঘামছিস কেন?

জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘামের বিন্দু মুছে ফেলে বললাম, না, শরীর আমার ঠিক আছে। কিন্তু এ ছবিটা কার? এই যে?

হাত দিয়ে সামনের ফটোটা দেখালাম। পিসি বললেন, ওটা টুনুর ফটো। আমার মেয়ে, টুনু।

—মেয়ে?

—হ্যাঁ, তাকে তুই দেখিসনি। তোর জন্মাবার বছর খানেক আগে টুনু মারা গেছে। টাইফয়েডে। বোধহয় বছর আটেক হয়েছিল বয়স।

শেষদিকে পিসির কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় হয়ে এল। কিন্তু ঠোঁটটা কামড়ে থেমে গেলাম। কিন্তু কিরে, কি বলবি বল? পিসি বললেন।

—তুমি কি বিশ্বাস করবে পিসি? বিশ্বাস করবার কথা নয়।

কথাটা বল, তবে তো বুঝব বিশ্বাস করার কথা কিনা। পিসি আমার ভাবভঙ্গী দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন।

টুনুদির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে পিসি। আমার কথা শেষ হবার আগেই পিসি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ভাবলেন, নির্ঘাৎ ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে।

একটু একটু করে সব বললাম। যখন শেষ করলাম, পিসির চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। পিসি বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু একটি কথার প্রতিবাদ করলেন না, কিছু অবিশ্বাস করলেন

না। শুধু বললেন টুনুই তোর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এবার সমর আমার দিকে ঘুরে বসল। বলুন মাস্টার-মশাই কি করে এটা সম্ভব? মারা যাবার পরও কি আত্মার স্নেহ, দয়া মায়ার আকর্ষণ থাকে? নিজের আত্মীয়দের বাঁচাবার জন্য তারা কি মানুষের দেহ ধরে আবার ফিরে আসতে পারে মরলোকে?

বাইরে ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমগাছের একটা ডাল জানলার পাল্লায় মাথা ঠুকছে অনবরত। জলের ঝাপটায় ঘরের অনেকখানি ভিজে গিয়েছে।

সেই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কি উত্তর দেব সমরের প্রশ্নের!

চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া মানুষ নিজের লোককে বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে? তাও কি সম্ভব!

তান্ত্রিক

ধীরেন্দ্রলাল ধর

দুর্গাবিনোদ ইস্কুল মাস্টারের ছেলে। অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে এম-এ পাশ করলেও মুরুব্বির অভাবে ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারল না। শেষ অবধি হলো কেরানী। এখনকার দিনে কেরানীগিরির আবার দুটো ভাগ হয়েছে, নীচু কেরানীর মাইনে হয় সওয়া শো থেকে শুরু, আর উঁচু কেরানীর মাইনে শুরু হয় সওয়া দুশো টাকা থেকে। মুরুব্বিহীন দুর্গাবিনোদ নীচু ধাপের কেরানী হলো। তাও জুটলো অনেক কষ্টে। এম-এ পাশেও কুলোয়নি। এই কেরানীগিরির জন্য আবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

যাক চাকরিটা হয়ে দুবেলা অন্নের সংস্থান তো হলো। দুর্গাবিনোদের পড়াশুনার শখ আছে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে সে লাইব্রেরীতে হাজিরা দিয়ে চলল, রাত ন'টা অবধি। দর্শনশাস্ত্রে সে এম-এ পাশ করেছে, এবার হিন্দু দর্শনটা সে ভালভাবে বুঝে নিতে চায়।

ধর্ম কী? ঈশ্বর কী? মানুষ কেমন করে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে? এই বুঝতে বুঝতে শেযে এসে পড়ে যে সব সাধু সন্ত মহাত্মা সাধনা করতে করতে ভগবদ্-শক্তি

লাভ করেছিলেন তাঁদের কথা। ভারতের সাধকদের যত সব অলৌকিক কীর্তির কথা পড়তে পড়তে দুর্গাবিনোদ সাধু দর্শনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। রবিবারে ছুটির দিনে তার আর বাড়িতে বসে থাকা চললো না। কলিকাতার আশেপাশে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোথায় কোন্ আশ্রম আছে, কোথায় কোন্ তান্ত্রিক থাকেন, সেখানে সে যাওয়া আসা শুরু করলো।

দুর্গাবিনোদ আশ্রমে যায়, আরো দশ জনের মাঝে বসে, আশ্রমিক মহাত্মাদের বাণী শোনে, তারপর প্রণাম করে বিদায় নেয়। ফেরার পথে মহাত্মার বাণী মনে মনে আলোচনা করে, মহাত্মা কত বড় সাধক তার একটা পরিমাপ করার চেষ্টা করে। মহাত্মার কোন অলৌকিক শক্তি আছে কিনা জানার চেষ্টা করে। একদিন খবর পেল হাওড়ার এক গ্রামে এক তান্ত্রিক আছেন তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। জলপড়া দিয়ে অম্লশূল সারান, কানে কাঠি দিয়ে কালা মানুষের বধিরতা দূর করেন, কঠিন বাতের বেদনা সামান্য বুলিয়ে আরাম করে দেন।

যিনি খবরটা দিয়েছিলেন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

বাস থেকে নেমে মাইল খানেক হেঁটে গেলে একটি ছোট্ট গ্রাম। গাঁয়ের গোড়াতেই এক পুকুর পাড়ে একটি ছোট্ট মন্দির, মন্দিরের পাশেই একখানি চালাঘর। ঘরের দাওয়ায় একজন জটাধারী সাধু বসে আছেন, সামনে ধুনুচীতে আগুন জ্বলছে, পাশে একটা কলসী ও ভাঁড়। কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা হাত জোড় করে সামনে মাদুরে বসে আছে।

দুর্গাবিনোদও বসে পড়লো।

সাধুর বয়স বেশী নয়, তার চেহারা বলিষ্ঠ, রং কালো, মাতার জটাও বিশেষ দীর্ঘ নয়। চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল। তার উপর কপালে চন্দন লেপা। ভক্তির চেয়ে ভয় হয় বেশী।

দুর্গাবিনোদের দিকে নজর ফেলতেই সে হাত জোড় করে প্রণাম জানালো। সাধু নিজে থেকেই বললেন— কী চাই? গুরু? গুরু মেলা অত সহজ নয়, আগে নিজেকে তৈরী কর, তারপর গুরু। পাত্র ফুটো হলে জল রাখবি কেমন করে? আধার ঠিক না হলে মন্ত্রশক্তি ধারণ করবি কেমন করে? সে মন্ত্র যে দেবে তার কোন লাভ নেই, যে নেবে সেও ব্যর্থ হবে। তৈরী হ'।

দুর্গাবিনোদ ভরসা পেল। বললো—কিভাবে তৈরী হতে হবে?

—বাক সংযম কর, বেশী কথা বলবি না। নিরামিষ আহার করবি। অযথা কোন পরিশ্রম করবি না, শক্তিসঞ্চয় করবি। সন্ধ্যার পর কোন মন্দিরে বা গঙ্গার তীরে চুপ করে ঈশ্বরের ধ্যান করবি। ধীরে ধীরে মন আত্মস্ত হবে। চিত্ত দৃঢ় হবে। তখন গুরুমন্ত্র নিয়ে সাধন-ভজনের কথা উঠবে, তার আগে কিছু হবে না।

দুর্গাবিনোদ এতদিনে যেন একটা আলো দেখতে পেল। গুরু ও মন্ত্রের কথাটা সে ভেবেছে, কিন্তু এমন ভাবে তার হদিশ কেউ তাকে বাতলাতে পারেনি। তান্ত্রিকের উপর তার বিশ্বাস হলো। প্রথম দর্শনেই এমনভাবে মনের কথাটা টেনে বলা সহজ নয়।

বিকাল অবধি দুর্গাবিনোদ কালীবাবার সামনে বসে রইল। অবধূত কালীবাবা আর তার সঙ্গে কোন কথা বললেন না। কলসী থেকে ভাঁড়ে মদ ঢালেন আর খান। আর অসুস্থদের রোগের কথা শোনেন। দু-এক জনকে ওষুধও দেন। ওষুধ মানে কাউকে ধুনির ছাই, কাউকে ধূপের আধপোড়া কাঠি।—এই ছাইটা তিন ভাগ করে তিন দিন সকালে খালি পেটে খাবি।—এই কাঠিটা একটা তামার মাদুলিতে ভরে ধারণ করবি ইত্যাদি।

বিকেলবেলা দুর্গাবিনোদ প্রণাম জানিয়ে উঠে পড়লো। কালীবাবা একবার তাকিয়ে হাসলেন শুধু।

দুর্গাবিনোদ অনেক আশ্রমে ঘুরেছে, অনেক মহারাজকে দর্শন করেছে, দিনের পর দিন অনেকের উপদেশ-বাণী শুনেছে। কিন্তু কালীবাবার মতো অলৌকিক ক্ষমতা কারও দেখেনি। ছাই দিয়ে রোগ সারানো, কানে কাঠি দিয়ে বধিরতা আরাম করা, হাত বুলিয়ে বাতের বেদনা মুক্ত করা— এসব বড় কম শক্তির কথা নয়। এই মানুষটি কিছুটা ঐশ্বরিক শক্তি যে আয়ত্বে এনেছেন— একথা মানতেই হবে। দুর্গাবিনোদ কালীবাবার কাছে নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু করলো। যদি ইনি প্রসন্ন হয়ে কৃপা করেন, তাহলে দুর্গাবিনোদও একদিন কৃতার্থ হবে।

কালীবাবা সেই যে প্রথম দিন কথা বলেছিলেন, তারপর থেকে আর কথাই বলেন না। প্রণাম করলে হাসেন আর হাত তুলে বলেন—জয়স্তু।

দুর্গাবিনোদ এদিকে নিরামিষ খাওয়া শুরু করেছে, কথা কম বলে, অনর্থক কোন ঘোরাফেরা করে পরিশ্রম করে না। রাত বারোটা অবধি বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কালীবাবার কথা মতো নিজেকে সে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলেছে।

হঠাৎ একদিন মাস ছয়েক পরে কালীবাবা বললেন—তুই তো রবিবারে আসিস, আসছে শনিবার আয় না। সেদিন অমাবস্যা, রাতে মায়ের পূজো দেখবি?

— এ তো আমার সৌভাগ্য।

—সন্ধ্যায় চলে আসবি। রাতে এখানে থাকবি। সারা রাত জাগতে পারবি তো? আমি সারা রাত পূজো করি।

—একটা রাত তো।

—তাহলে আসার সময় মায়ের পূজো নিয়ে আসিস।

—কী আনতে হবে বলুন?

—তুই আর কী আনবি? তিন বোতল দেশী মদ আনবি। কারণবারি—তাতেই হবে।

কালীবাবা গুণগুণ করে উঠলেন—মদ খাই মা কালী বলে—তারপর কলসী থেকে এক ভাঁড় মদ নিয়ে গলায় ঢাললেন।

দুর্গাবিনোদ সেদিন খুশি হলো। কালীবাবা মদ চেয়েছেন। পূজো দেখার জন্য ডেকেছেন। এবার তিনি প্রসন্ন হবেন। উৎফুল্ল মনে দুর্গাবিনোদ সেদিন বাড়ি ফিরলো।

শনিবার সন্ধ্যায় এক রেশন ব্যাগের মধ্যে তিন বোতল দেশী মদ নিয়ে দুর্গাবিনোদ কালীবাবার আশ্রমে এলো, তখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কালীবাবা দাওয়ায় বসেছিলেন,

বললেন—এনেছিস? দে—

বোতল তিনটি নিয়ে কালীবাবা মন্দিরে চলে গেলেন, বললেন—দু ঘন্টা এখন বোস, পূজোর সময় আমি তোকে ডাকবো।

মাদুর পাতা ছিল, দুর্গাবিনোদ সেই মাদুরের ওপর উঠে বসলো।

ক'মিনিট বসে থাকার পরেই দুর্গাবিনোদ বুঝলো রাতের অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকার মতো স্থান সেটা নয়। কানের পাশে মশার ডাক আর থামতে চায় না। বুদ্ধি করে দুর্গাবিনোদ বেশনের থলির মধ্যে একখানা চাদর এনেছিল। এবার সেই চাদরখানা দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ে দিল। শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে রইল। তবু মনে হয় যেন মশা কামড়াচ্ছে।

সামনে অন্ধকার, মাঠ ঘাট গাছপালা সবই কালোয় মিশে গেছে। অনেকটা তফাতে দু-তিনটে ঘরেব জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। কাছাকাছি মানুষ আছে বলে মনে হয় না। কালীবাবার এই ঘরখানাতেও কেউ থাকে না। তাঁর পরিজনরা থাকে ওই গ্রামে। এখানে কালীবাবা একা থাকেন, সাধন-ভজনের জন্য। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। চারিপাশে নিঝুম। এই তো সন্ধ্যা হয়েছে, এরই মধ্যে মনে হয় রাত যেন দুপুর হয়ে গেল।

এভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে।

কালীবাবাও তো মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

পাশে একজন কথা বলার মানুষ থাকলে ভাল হতো। বড় একা একা মনে হয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে দুর্গাবিনোদ ঝিমুতে শুরু করে।

দুর্গাবিনোদ কোন এক সময় বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। সহসা ঘুম ভাঙলো কালীবাবাব ডাকে— আয উঠে আয়— এবার মায়ের আরতি হবে।

ধড়মড় কবে উঠে দুর্গাবিনোদ কালীবাবার অনুসরণ করলো।

মন্দিরেব মধ্যে পিদিম জ্বলছে। ধুপধুনায় অন্ধকার। ছোট্ট প্রতিমাটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সামনে কিছু জবা ফুল, আর মদের তিনটে বোতল। কালীবাবা আসনে গিয়ে বসলেন, বললেন, —তুই দরজার বাইরে বোস। দুর্গাবিনোদ বাইরে বসে পড়লো।

কালীবাবা ওঁ হ্রিং বলে মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করলেন। মাঝে মাঝে জবা ফুল তুলে প্রতিমার চবণে অর্ঘ্য দিতে লাগলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক এইভাবে পূজা করার পর হাঁক দিয়ে উঠলেন—মা কালী করাল-বদনা-লোল-জিহ্বা মা— তারপর পঞ্চপ্রদীপের আরতি শুরু কবলেন।

এবাব প্রদীপের আলোয় ধোঁয়ার মাঝেও কিছু কিছু নজরে পড়তে লাগল। দুর্গাবিনোদ দেখলো ঘরের মধ্যে দরজার পাশে আরেকজন কে বসে আছে। ও কে? কখন এলো?

পঞ্চপ্রদীপ ঘুরতে ঘুরতে আলোটা যখনই সেদিকে পড়ে দুর্গাবিনোদ লোকটির মুখের পানে নজর করে। কি বিশ্রী ফ্যাকাশে মুখ, যেন মড়ার মতো।

আরতি শেষ হয়। শাঁখ বাজিয়ে কালীবাবা বসলেন। মদের তিনটি বোতল মায়ের চরণে স্পর্শ করিয়ে হাঁক দিলেন—মা কালী করাল-বদনা...লোল-জিহ্বা মা—

তারপর বললেন—প্রণাম কর—প্রসাদ নে—

দুর্গাবিনোদ প্রণাম করলো।

বোতল থেকে এক ভাঁড় মদ ঢেলে কালীবাবা বসে থাকা সেই লোকটির মুখে ধরলেন, বললেন—খাও।

লোকটি মদ খেলো।

কালীবাবা সেই ভাঁড়ে আবার মদ ঢাললেন। তাকে বললেন— ধরো, ওকে দাও—

লোকটি ভাঁড় ধরলো, হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল দুর্গাবিনোদের দিকে।

মানুষের হাত যে এতটা লম্বা হয়, দুর্গাবিনোদ তা জানতো না। ভাঁড় সুদ্ধ হাতখানা সোজা দরজা পার হয়ে চলে এলো তার মুখের কাছে।

দুর্গাবিনোদ থ'।

—ভয় পাসনি, খা, মায়ের প্রসাদ—কালীবাবা বললেন।

দুর্গাবিনোদ তাকিয়ে দেখলো। হাতখানায় কোথাও এতটুকু মাংস নেই, সবটাই কঙ্কাল। হাতের মালিকের পানে তাকালো—মুখ কই, কঙ্কালের করোটি!

দুর্গাবিনোদের সারা দেহ কেঁপে উঠলো।— না না বলেই এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠেই সে ছুটলো। সোজা পথ দিয়ে সে ছুটলো। কানে এল পিছনে কে যেন অট্টহাসি হাসছে।

সেই অন্ধকার পথে পুরো দু'মাইল ছুটে এসে দুর্গাবিনোদ থামলো একেবারে বাজারের মধ্যে। তখনও সকাল হতে অনেক দেরী। ভয়ে ভয়ে সে পিছন পানে তাকালো, পিছনে কেউ আসছে কিনা।

বাজারে অনেক ঘরের দাওয়ায় মানুষ শুয়েছিল। তাদের দেখে দুর্গাবিনোদ ভরসা পেল। একটা দোকানের দাওয়ায় সে বসে পড়লো।

পরক্ষণেই মনে হলো সেই হাতখানা তার মুখের সামনে মদের ভাঁড়টা যেন এগিযে ধরেছে। দুর্গাবিনোদ চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সকালে বাজারের লোকেরাই দুর্গাবিনোদকে বাসে তুলে দিয়েছিল।

ভয়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে ক'দিন তার সময় লেগেছিল।

ভুতুড়ে কামরা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ওদেব বাড়ির নিমগাছটার তলায় বসে কান চুলকোতে চুলকোতে বলটুদা আমায় জিজ্ঞেস কবলে, আচ্ছা প্যালা, ভূত সম্বন্ধে তোর আইডিয়া কী?

আমি বললুম, কোনো আইডিয়া নেই।

শুনে বলটুদা ভীষণ ব্যাজার হল। এত ব্যাজার হল যে খচ্ করে কানে একটা খোঁচাই খেয়ে গেল। শেষে মুখটাকে এক ভাঁড় রাবড়ির মত করে বললে, কেন? আইডিয়া নেই কেন?

আমি বললুম, কী করে থাকবে? কখনো দেখিনি তো।

—শুনে-টুনেও কিছু মনে হয় না?

—একদম না, লোকে নানা রকম ডেসক্রীপশন দেয়, কেউ বলে, খামোকা একটা কাটামুণ্ডু ঘ্যাঁচাৎ করে কামড়াতে এলো, কেউ বলে সাদা কাপড় পরে রাত দুপুরে ছাতের ওপর হেঁটে যাচ্ছে, কেউ বলে আমগাছে এক পা আর জামগাছে আর এক পা দিয়ে—

বল্টুদা বললে, বাজে বকিস্ নি। ধর, এই নিমগাছটায় একটা ভূত আছে—

এইদিন-দুপুরেই দারুণ চমকে আমি একবার নিমগাছটার দিকে চেয়ে দেখলুম। না, ভূত-টুত কিছু নেই, কেবল ঠিক আমার মাথার ওপরেই একটা কাক বসে রয়েছে। কাককে আদৌ বিশ্বাস নেই, একটু সরে বসলুম তক্ষুণি।

বল্টুদাকে বললুম, তোমার নিমগাছের ভূতটাকে খামোকা আমি ধরতে যাব কেন? কী দরকার আমার? ভূত ধরা-টরা আমি আদৌ পছন্দ করি না—তোমাকে সাফ বলে দিচ্ছি।

—কিন্তু মনে কর, ভূত যদি তোকেই ধরে? মানে, তোকেই ধরতে পছন্দ করে যদি?

আমি দস্তুর মতো ঘাবড়ে বললুম, বল্টুদা, এবার আমি বাড়ি চলে যাব।

বল্টুদা খপ্ করে আমার হাত ধরেটেনে বসালো। বললে, আহা, যাচ্ছিস্ কেন? বললুম বলেই কি সত্যি সত্যিই কি ভূতে ধরেছে নাকি তোকে? মানে, আমি সেদিন ভূতের পাল্লায় পড়েছিলুম কিনা—সেই ব্যাপারটাই তোকে বলবো।

আমি বললুম, তুমি আবার কবে থেকে টেনিদার মত গল্পবাগীশ হলে বল্টুদা?

টেনিদার নাম শুনেই বল্টুদা জ্বলে গেল। বললে, টেনি! তার কথা আর বল্িস নি। তোদের দলের ওই সর্দারটা এক নম্বরের গুলবাজ—খালি বানিয়ে বানিয়ে যা তা গল্প বলে। সেদিন আবার আমাকে দিব্যি ভুজুং-ভাজুং দিয়ে 'দি গ্রেট আবার খাবো রেঁস্তোরায়' আড়াই টাকার খাবাব খেয়ে গেলো! - নাকটাকে কি রকম যেন তেলে ভাজা সিঙাড়ার মত করে বল্টুদা বললে, ছোঃ ছোঃ। যাবার আগে আমার পিঠ চাপড়ে কী সব মেফিস্টোফিলিস-টিলিস্ বলেও গেল—কিছু বুঝতে পারলাম না। রামো—রামো টেনি আবার একটা মানুষ।

বুঝতে পাবলুম, টেনিদা বল্টুদার প্রাণে দারুণ দাগা দিয়ে গেছে, আড়াই টাকার শোক বল্টুদা ভুলতে পারছে না। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, টেনিদার কথা ছেড়ে দাও ও ওইরকম। তোমার ভূতের গল্পটাই বলো।

—গল্প? আমি বানিয়ে বলার মধ্যে নেই। যা বলবো, একদম সত্য ঘটনা।

—আচ্ছা, বলতে থাকো।

তখন বল্টুদা আর একবার বেশ করে কান চুলকে নিলে, তারপর বলতে থাকল।—

আমার বড়দির বড় মেয়ে—দিল্লীতে জন্মেছে বলে যার নাম 'রাজধানী', ছোটবেলায় যাকে আমি ভুল করে 'দাদখানি' বলে ডাকতুম, আর বড়দি যাকে বলতো 'ধানীলঙ্কা' তার বিয়ে হয়েছে এক কোলিয়ারীর ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। এবার পুজোর ছুটিতে আমি সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

দিন দশেক বেশ আরামে থেকে খুব খেয়ে দেয়ে, ওদের মটর গাড়িতে অনেক বেড়িয়ে টেড়িয়ে কলকাতায় ফিরে আসছিলুম। সন্ধ্যের পরে গাড়ি বদলাতে হল ছোট একটা জংশন স্টেশনে। ট্রেনে বেজায় ভিড়, শেষে দেখি, পেছন দিকের একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে সব যাত্রী হুড় মুড় করে নেমে যাচ্ছে। দেখে খুব মজা লাগলো। আমি ফাঁকা গাড়িটায়

টুপ্ করে উঠে বসলুম। সতরঞ্চি-জড়ানো ছোট বিছানাটা পেতে, মাথার কাছে সুটকেসটা রেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়া গেল।

ট্রেন আরো প্রায় কুড়ি মিনিট এখানে থাকবে, আমি উঠে বসে দেখতে লাগলুম। অন্য সব গাড়িতে লোক উঠছে নামছে, এদিকে কেউ আর আসছে না। বোধহয় পেছন দিকের গাড়ি বলেই এটার ওপর কারুর নজর নেই। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। একটা রেলের কামরায় একলা যেতে ভারী মজা লাগে, নিজেকে বেশ লাট-বেলাটের মত মনে হয়।

এর মধ্যে জন দুই মাড়োয়ারী যাত্রী অনেক লটবহর নিয়ে আমার গাড়ির দিকে তাক করে আসছে বলে বোধ হলো। ভাবলুম এই রে, এসে ঢুকল বুঝি। হঠাৎ একজন লোক তাদের কী যেন বললে, অমনি তারা সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিকে ছুটলো। আমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপরেই মনে হল, ওদের বোধ হয় থার্ড ক্লাসের টিকিট ছিল, ওই লোকটা বলে দিয়েছে এটা সেকেণ্ড ক্লাস , সেই জন্যই সরে পড়ল।

যাই হোক, বেশী ভেবে চিন্তে লাভ নেই। গাড়ি ছাড়তে আর কিছু দেরী আছে, কিন্তু আমি আর বসতে পারছিলুম না। একে তো আসবার আগে বিস্তর খাইয়েছে, বলেছে, 'ছোটমামা, রেলে খালিপেটে যেতে নেই, শরীর খারাপ করে।' আমিও তাই শুনে লুচি-মাংস-মিষ্টিতে গলা পর্যন্ত ঠেসে নিয়েছি, তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেল, পেটে এখনও দেড় মণ ভার, তা রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, দারুণ ঘুম পাচ্ছিল। গাড়িতে যে ওঠে উঠুক, আমি তো আপাতত লম্বা হই।

যা ভাবা তাই করা। আমি শুয়ে পড়লুম। গাড়ি ছাড়তে বোধহয় মিনিট দশেক দেরী ছিল তখনো, কিন্তু আমার ঘুমিয়ে পড়তে তিন মিনিটও লাগল না। আর সেই ঘুমের ভেতরেই টের পেলুম ট্রেনের হুইসিল বাজছে, কামরাটা নড়তে আরম্ভ করেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় আধখানা চোখ খুলে দেখলুম অন্য যাত্রী আর কেউ ওঠেনি। নিশ্চিন্তে ঘুমনো যাক তবে।

নিশ্চিন্তেই আমি ঘুমোলুম।

রাত তখন কত হয়েছে জানি না, হঠাৎ আমার চট্‌কা ভাঙল। ভীষণ মশা কামড়াচ্ছে আর কি রকম একটা গন্ধ নাকে লাগছে। চমকে চেয়ে দেখি, গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কামরায় নিতল অন্ধকারে গোটা চারেক আলো জ্বলছিল, পাখা ঘুরছিল, কিন্তু এখন আলো নেই, পাখাও চলছে না।

ব্যাপারটা কী? বাইরে তাকালুম। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু কালো পাঁচিলের মত থমথমে অন্ধকার। সে অন্ধকারে একটাও তারা নেই, জোনাকি নেই, কিছু নেই। জানালার অন্য দিকে তাকালুম, ঠিক একই দৃশ্য। যেন রাতারাতি গাড়িটাকে কেউ একটা আলকাতরার সমুদ্রের ভেতর তলিয়ে দিয়েছে। তারপরে মনে হল, কেবল আলকাতরা নয়, ধোঁয়ার মত কী যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে তার ভেতর, নিশ্চয় কুয়াশা।

ব্যাপারটা কী?

রাত যে কখনও এত অন্ধকার হয়, সে আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আকাশে যদি ঘন কালো মেঘ দেখা দেয়, তার ভেতরেও অন্ততঃ আবছা একটা আলোর আভাস থাকে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায় তাও যদি না হয়, লাইনের ধারের ঝোপে জঙ্গলে অন্ততঃ দুটো একটা জোনাকির ফুল্‌কী জ্বলে। এমন কাণ্ড তো কখনো দেখিনি!

ট্রেন কি কোনো স্টেশনে থেমে আছে? তা' হলে আলো কই? স্টেশনের বাইরে লাইন-ক্লিয়ার না পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? তা' হলে সিগন্যালের বাতিও তো দেখা যাবে। কোথায় সে সব?

এদিকে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাক খাচ্ছে আমাকে ঘিরে ঘিরে। আর কী নিদারুণ ভাবে মশা কামড়াচ্ছে—সে আর তোকে কী বলব প্যালা। তার ওপর দুর্দান্ত গরম! আমি বসে বসে ঘামতে লাগলুম।

বেঞ্চিব ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিলুম, মশাদের যত নজর দেখছি পায়ের ওপরেই। শেষে জেরবার হয়ে যেই একটা চাঁটি হাঁকড়েছি—তোরে কি বলবো প্যালা—সেটা আমার পায়ে লাগলো না!

খরখরে লোমওলা নরম কী একটা জিনিসের ওপর ঘপাং করে গিয়ে চড়টা পড়ল। ঘুঁৎ কবে কী একটা বিটকেল আওয়াজ হল, কালো মতন কে যেন শূন্যে লাফিয়ে উঠল, আমার চোখের সামনে দুটো সবুজ আগুন দপদপ করে উঠল তারপরেই কি যেন ধপাৎ করে বাইরে পড়ে গেল।

আমি বুঝতে পারলুম, কামরার দরজাটা খোলা।

উঠে বন্ধ করবো কি, হাত-পা আমার আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে এলো! কে এই কালো জীব—কী সে? ট্রেনেব ভেতরে সে আমার পায়ের কাছে কোত্থেকে এলো, কেনই বা চড় খেয়ে ঘুঁৎ করে লাফিয়ে উঠল, আর লাফিয়েই বা গেল কোথায়? অমন অস্বাভাবিক দুটো সবুজ চোখই বা কেন—আর সে চোখে কোন হিংস্র প্রতিহিংসা লুকিয়ে ছিল?

তবে কি এ সব ভৌতিক ব্যাপার?

ব্যস্, মনে করতেই আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। এই বার বুঝতে পারলুম, গাড়ির এই কামরাটা নিশ্চই ভুতুড়ে। তাই জংশন স্টেশনে লোকগুলো সব হুড়মুড়িয়ে এই গাড়ি থেকে নেমে পালিয়েছে, তাই মাড়োয়ারী দুজন এ গাড়িতে উঠতে এসেও অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে উলটো দিকে দৌড় দিয়েছে।

আর আমি এমন নিরেট গর্দভ যে এসব দেখেও কিছু বুঝতে পারিনি! এই মারাত্মক ভুতুড়ে কম্পার্টমেন্টে উঠে নিশ্চিন্তে ঘুম লাগিয়েছি!

কী করবো এখন? নেমে পড়বো গাড়ি থেকে? তারপর যেদিকে চোখ যায়, টেনে দৌড় লাগাবো?

কিন্তু এই অন্ধকারে চোখ আর কোন দিকে যাবে? দিগ্‌বিদিক দূর থেকে, নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না যে! আর পালাবো? চোর-ডাকাতের হাত থেকে পালানো যায়,

পুলিশের হাত থেকেও হয়ত যায়, কিন্তু ভূতের পাল্লা থেকে? খপ্ করে ত্রিশ গজ লম্বা একখানা হাত বাড়িয়ে ঘাড়টি টেনে ধরবে!

হঠাৎ টপ্-ট্প-টপাৎ!

মাথার ওপর কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়ল। তারপরেই বাইরে বিট্কেল ছ্যারাৎ ছ্যারাৎ আওয়াজ। ঠিক মনে হল, কে যেন একটা লম্বা পাইপ দিয়ে জল ছুঁড়ছে!

শুধু মনে হওয়া নয়—ছ্যারাৎ করে কোত্থেকে একরাশ বিচ্ছিরি জল আমার নাকে মুখে এসে আছড়ে পড়ল। —বাপ্‌রে গেছি গেছি—বলে আমি জানলা বন্ধ করে ফেললুম। সামনে সেই আওয়াজটা চলতে লাগল—মনে হল, সেই অথই অন্ধকারে একপাল পেত্নির বাচ্চা আলকাতরা গোলা নিয়ে হোলি খেলছে।

আমি বসে বসে 'রঘুপতি রাঘব'-টাঘব গাইতে চেষ্টা করলুম। গলা দিয়ে গান বেরুল না, খালি বুঁ-বুঁ করে এমন যাচ্ছেতাই আওয়াজ বেরুতে লাগল যে আতঁকে উঠে চুপ করে গেলুম।

ভয়ে কাঠ হয়ে কত ক্ষণ বসে আছি জানি না, জলের সেই ছ্যার ছ্যারানি কখন থেমে গেছে তা-ও টের পাইনি। আচমকা-সেই কালি-ঢালা অন্ধকার আর সাদা কুয়াশার ভেতরে একটা লাল আলো। বিশ্বাস করবিনি প্যালা, শুধুই একটা লাল আলো। ঠিক গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে—জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখলুম। আমার মনে হল, একচোখে যেন একটা দৈত্য হাঁ করে চলে আসছে আমার দিকে!

এতক্ষণ চুপ করেই ছিলুম এইবার আমি 'বাপরে মারে, করে একটা আকাশ ফাটানো চিৎকার ছাড়লুম। আর লাল আলোটা যেন শূন্যের ভেতরে থমকে দাঁড়ালো—তারপর ধাঁ করে কোন দিকে যেন মিলিয়ে গেল!

আমার আর চোখ মেলে চেয়ে থাকবার সাহস ছিল না। বেশ বুঝতে পারছিলুম, আজ এই ভুতুড়ে রেলগাড়ির কামরাতেই অপঘাতেই আমাব প্রাণটা যাবে। একবার গলায় হাত দিয়ে পৈতেটা খুঁজে দেখলুম কিন্তু তাকে তো সেই সাত বছর আগে জামার সঙ্গে ধোপা-বাড়িতে চালান করে দিয়েছি, এখন আর কোথায় পাওয়া যাবে।

বেশ বুঝতে পারলাম, আজ আমার বারোটা বেজে গেল। আমাকে নিয়ে এই ভুতুড়ে কামরাটা যেন কোন্ নরকে গিয়ে হাজির হয়েছে জানি না, কিন্তু এরপর একটার পর একটা বিভীষিকা আসতে থাকলে, আমার রক্ত একদম জমাট বেঁধে যাবে, তার পরেই সোজা হার্টফেল! বাড়িতে মা-বাবার কাছে পৌঁছতে পারবো না। এখন থেকেই সোজা ভূতের দলে ভর্তি হয়ে যাব।

চোখ বুজে মনে মনে 'রাম বাম' জপ করছি, এমন সময়—

বাজখাঁই গলায় কে বললে, ইউ রোগ্!

আঁতকে লাফিয়ে উঠলুম। অন্ধকার জায়গায় কোত্থেকে ঝলমলে আলো। আর সেই আলোয় ইয়া ঢ্যাঙা এক সাহেব দাঁড়িয়ে। আবার বাজখাঁই স্বরে বললে, ইউ রোগ্। তুম্

কোন হ্যায়?

ওরে বাপ্‌রে সায়েব ভূত ! আমার রাম নাম গিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছল। আবার একখানা মোক্ষম চিৎকার ছেড়ে আমি গাড়ির মেঝেতে চিৎপাত হয়ে পড়লুম! বিশ্ব-সংসার মুছে গেল!

এই পর্যন্ত বলে বলটুদা থামল! আমি আকুল হয়ে বললুম, তারপর?

—তারপর আর কী? ভীষণ যা-তা ব্যাপার।

—মানে?

মানে আবার কি? কামরাটা খারাপ, জংশন স্টেশনেই সেই জন্যে ট্রেন থেকে কেটে নিয়ে শেডের মধ্যে ঢুকিয়েছিল আমাকে সুদ্ধ। ঘুমের ঘোরে কিচ্ছু টের পাইনি আমি। জুৎ পেয়ে একটা কালো কুকুর আমার বিছানায় উঠে এসেছিল, গাড়ি ধোয়ার জল ছর ছর করে আমার মুখে এসে পড়েছিল, লাল লণ্ঠন হাতে একটা কুলি এদিকে আসছিল, আমার চিৎকারে ভয় পেয়ে ডেকে এনেছিল ওদের ইন্‌স্‌পেক্টরকে। আর তাকে দেখেই আমার দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল।

আমি বললুম, অ্যাঁ।

বলটুদা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি তোমার টেনিদার মত বানিয়ে গল্প বলি না, এ হল রিয়্যাল ভূতের ব্যাপার। আচ্ছা, এবারে বাড়ি যেতে পারিস।

এই বলে বলটুদা উঠে পড়ল। হন হন করে নিজেই হেঁটে চলে গেল আলেকজাণ্ডারের ভঙ্গিতে।

খুনী ভূতের কাণ্ডকারখানা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

আমার মামার বাড়ি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত নৃসিংহপুর গ্রামে। যে সময়কার কথা বলছি তখন আমার বয়স ছিল সাত কি আট। বিরাট দুমহল বাড়ি, চারদিকে ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু বাড়ির লোকেরা ভূতের ভয়ে মূল দোতলা দালানটায় রাত্রিকালে শুতে পারত না। পূর্বদুয়ারী দালানটার সামনে ছিল মস্তবড় উঠোন। উঠোনটার দুপাশে ছিল লম্বা টানা দুটো একতলা ঘর। বাঁ দিকের ঘরখানাতে রান্নাবাড়া হত আর ভাঁড়ার থাকত। ডান দিকের ঘরখানাতে রাত্রিবেলায় শোয়া হত। ডানদিকের লম্বা ঘরখানার সঙ্গে লাগোয়া দুদিকে দরজাওয়ালা একখানা ঘর ছিল। সেই ঘর দিয়ে বারমহলে যাওয়া হত বলে ঘরখানাকে বলা হত চলন ঘর। ঘরখানা খালি পড়ে থাকত। রাত্রিকালে ডোমেদের পতিলাল নামে এক

সাহসী লোক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি পাহারা দেবার জন্য ঐ ঘরখানায় শুত। সদর দরজার বাইরে সামনেই ছিল একটা পুকুর। চারদিকে বাঁশঝাড় আর কয়েকটা গাছ। পুকুরটার ডানদিকের কোণে বাড়ির পাঁচিলের কাছাকাছি ছিল বিরীক্ষি একটা তেঁতুলগাছ। মোটা গুঁড়িওয়ালা বিশালদেহী গাছটা কতদিনের পুরনো তা কেউ বলতে পারত না। তবে লোকমুখে শোনা যায়, গাছটা নাকি চালানে গাছ। বহুকাল আগে গাছচালানো মন্ত্র-জানা এই গাঁয়েরই কোন লোক একটা উড়ন্ত গাছকে দেখে মন্ত্র দ্বারা নামিয়ে সেটাকে বসিয়ে দেয় এইখানে।

ছেলেবেলা থেকেই মামার বাড়ির প্রতি আমার একটা বেজায় টান ছিল। লোকে বলত, মামার বাড়িতে আমার জন্ম হয় এবং এই বাড়ির উঠোনের এক কোণে আমার নাড়ী পোঁতা ছিল বলেই আমার টানটা এত বেশী ছিল। কিন্তু আমার সে টানের আসল কারণটা কেউ জানত না। মামার বাড়ির প্রতি আমার টানের আসল কারণ ছিল ঐ দালানটা। ভুতুড়ে দালানটাকে ঘিরে ভূতের যে সব কাণ্ডকারখানা চলত, মামার বাড়ি এলেই সেই সব কাণ্ডকারখানার গল্প শুনতে পেতাম। সেটাই ছিল আমার আকর্ষণের বস্তু।

মামার বাড়িতে যতদিন থাকতাম, রোজ রাতে লম্বাঘরে শোবার সময় মা মাসিমা ও আমার দিদিরা মিলে ভূতের গল্প করত। তখন পতিলাল মামার স্ত্রী যুপীমামীও এসে যোগ দিত। ভুতুড়ে কাণ্ড সম্বন্ধে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথাও বলত। তখনো পর্যন্ত ভূত আমি দেখিনি। মৃত্যু, পরলোক বা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। তবু টিমটিমে লণ্ঠনজ্বালা, আলোছায়ার মৃদু কাঁপনভরা ঘরে বসে বা শুয়ে সেই সব গল্প শুনতে আমার বড় ভাল লাগত। গল্প শুনতে শুনতে একটা আতঙ্কিত বিস্ময় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ত আমার শিশুমনে। একটা অনির্বচনীয় উত্তেজনার রোমাঞ্চ জাগত আমার সারা শরীরে। গা-ছমছমে ভয় লাগার সঙ্গে একটা ভাল-লাগা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত কেমন যেন।

আমার একমাত্র মামার কিশোর বয়সেই মৃত্যু হয়। আর সে মৃত্যুর কারণটাও নাকি ভৌতিক। শুনেছিলাম তাঁর মৃত্যুর তিন মাস আগে এই বাড়িতেই একদিন দুপুরবেলায় যখন কেউ ছিল না, হঠাৎ ভূত দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েন তিনি। দালানটার সব দরজা জানালা তখন বন্ধ থাকলেও সামনের দিকে হলঘরের একটা জানালা হঠাৎ খুলে যায় আব সেই খোলা জানালা দিয়ে বরফের মত সাদা লম্বা একটা হাত বেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে মামাকে। তা দেখে ভয়ে খুব জোর একটা চিৎকার করে মাটিতে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়েন মামা। চিৎকার শুনে বাইরে থেকে লোকজন ছুটে এসে মুখে চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরায়। এই ঘটনার তিন মাসের মধ্যেই মৃত্যু হয় মামার। মামার মৃত্যুর অনেক আগেই আমার দাদু ও দিদিমার মৃত্যু হয় এই বাড়িতেই। তারও আগে আমার দুই মাসিও কুমারী অবস্থায় এই বাড়িতেই মারা যান।

সবার আগে এই বাড়িতে প্রথম মৃত্যু হয় আমার মার ঠাকুরমার। তারপর মৃত্যু হয় মার বৃদ্ধ ঠাকুরদার।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর মার দাদু ঐ দালানটার মধ্যেই একা শুতেন। তখন তাঁর বয়স নব্বই

হলেও তিনি বেশ শক্ত সমর্থ এবং সাহসী ছিলেন। একদিন ভোরবেলায় তাঁর শোবার ঘরে লণ্ঠনের আলোটা সবেমাত্র নিভিয়ে দিয়েছেন, এমন সময় আধো আলো আধো অন্ধকারে দেখতে পেলেন, দালানের সিঁড়ির পাশের চোরা-কুঠরী থেকে চওড়া লালপাড় শাড়ী পরা ঘোমটা মাথায় তাঁর স্ত্রীর মত দেখতে এক নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। সে জ্ঞান আর ফেরেনি। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শোনা যায়, মার দাদু দালানের সিঁড়ির নীচে চোরা-কুঠরীর মেঝে বা দেওয়ালে বেশ কিছু গুপ্তধন পুঁতে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই গুপ্তধনের কথা তাঁর স্ত্রী ছাড়া কাউকে বলেননি জীবনে, মৃত্যুকালেও কাউকে বলে যেতে পারেননি। তাই তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর প্রেতাত্মা ভূত হয়ে সেই ধন আগলাচ্ছে, যাতে সেই ধনে কেউ হাত দিতে না পারে, তার জন্য সেই দুটো প্রেতাত্মা সদা সর্বদা কড়া নজর রেখে চলেছে বাড়িটার উপর। সারাদিন প্রেতাত্মা দুটো বাড়ির পিছনের আমগাছে অথবা সামনের তেঁতুলগাছে থাকত আর রাত্রি হলেই তারা গাছ থেকে নেমে আসত বাড়ির ছাদে। দালান অথবা লম্বা ঘরের ছাদের উপরে নামার সময় দুম্ করে একটা শব্দ হত। তারপর তারা সারারাত ধরে ছাদের উপর ঘোরাফেরা করত। কখনো বা ছাদের উপর চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত।

তবে এই দুই প্রেতাত্মা ছাড়াও আরো কিছু ভূত ছিল দালান বাড়িতে। বাড়িতে সবাই বলাবলি করত, যাদের অকালে মৃত্যু অথবা অপঘাতে মৃত্যু হয়, তাদের সকলের আত্মার সদ্‌গতি হয় না। তাদের অনেকেরই মৃত আত্মা অশরীরী বায়ুভূক প্রেত হয়ে বাড়ির আশেপাশে বা আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে ইচ্ছামত আকার ধারণ করে। আমার মার বাবা মাও প্রৌঢ় বয়সে মারা যান। তাঁদের কারো বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়নি। তাঁরা কেউ দীর্ঘদিন রোগভোগ করেননি, অসুখ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই কথা বন্ধ হয়ে মারা যান। ফলে মৃত্যুকালে কেউ কোন কথা বলে যেতে পারেননি। দাদু ও দিদিমার মৃত্যুর পর আমার আর এক মাসির মৃত্যু হয়। তাঁর তখন বিয়ে হলেও কোন ছেলেপুলে হয়নি।

মামাদের কেউ না থাকার জন্য সেখানকার সব বিষয়সম্পত্তি আমার মা মাসিমাকেই দেখাশোনা করতে হত। আমার পৈত্রিক বাড়ি ছিল মামার বাড়ি থেকে দশ বারো মাইল দূরে গোপালপুর নামে একটা গ্রামে। আমি সেখানে থেকেই পড়াশুনা করতাম। বাবার মৃত্যুর পর মাকে দু জায়গার বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করতে হত। মাসিমা থাকতেন মেসোমশাই-এর চাকরির জায়গায়। তবে মা যখন মামার বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকতেন মাসিমাও তখন চলে আসতেন সেখানে।

মামার বাড়ি যাবার কথা শুনলেই আমার খুব আনন্দ হত। আর সেই আনন্দের প্রধান কারণ ছিল ভূতের কাণ্ডকারখানা শোনা আর ভূত দেখার এক আতঙ্কিত কৌতূহল। ভূতের গল্প যে শুধু মা মাসিমার কাছেই শুনতাম তা নয়, সে গল্প বলার আরো একজন ছিল। সে হলো বলাইকাকা। বলাইকাকা ছিল জাত বোষ্টম। নাম বলহরি দাস বৈরাগী। বছর পঁয়তাল্লিশ

বয়স। শক্ত চেহারা, শ্যামবর্ণ। মাথায় খোঁচা— খোঁচা চুল। গলায় তুলসীকাঠের মালা। সে ছিল আমার মামার বাড়ির কর্মচারী। বাড়ি আর জমিজমা দেখাশোনা করত। কেউ না থাকলে সে নিজেই রান্না করে খেত আর বাড়িতেই শুত। বলাইকাকা মানুষ হিসাবে যেমন খুব ভাল ছিল, তেমনি ছিল দারুণ সাহসী। আমাদের যে দালানটায় দিনের বেলায় ঢুকতে সবাই ভয় পেত, চাকরি নিয়ে এ বাড়িতে আসার পর থেকে সেই দালানের হলঘরে একা একটা লণ্ঠন জ্বেলে শুত সে। বলাইকাকা নিজে ভূত প্রেতে কোন ভয় না করলেও আমাকে অনেক ভূতের গল্প বলত।

মামার বাড়িতে আমার আর একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল। সে হলো আমার প্রায় সমবয়সী ও খেলার সাথী নারাণ। নাম নারায়ণচন্দ্র মালিক, জাতিতে কোটাল। আমাদের পাড়াতেই থাকত। গ্রামের পাঠশালা পর্যন্ত পড়াশুনা করে তার বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করত আর বাড়ির গরু বাছুর দেখাশোনা করত। বয়স অনুপাতে তারও খুব সাহস ছিল। আমি মামার বাড়িতে গেলে রোজ সারা বিকেল আমার কাছে কাছে থাকত। সন্ধের সময় আমাদের বাড়িতে বসে থাকত। সেও ভূতের গল্প বলত। তবে সে কখনো ভূত দেখলে ভিরমি খেত না। বলাইকাকা যেমন ভূত দেখলে গলার মালাটা ছুঁয়ে হরিনাম জপ করত, সেও তেমনি রামনাম জপ করত সাহসের সঙ্গে। তাব বিশ্বাস, হরি বা রামের নাম করলে ভূত পালিয়ে যায়। এরই জন্য নারাণকে আমার খুব ভাল লাগত।

তখন কার্ত্তিক মাস। পূজোর ছুটিতে মামার বাড়িতে ছিলাম আমি। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি লম্বাঘরে লণ্ঠনের আলোয় পড়ছিলাম। মা মাসিমা ছিল রান্নাঘরে। বলাইকাকা দালানে কি একটা কাজ করছিল। তখন মেসোমশাইও বাড়িতে ছিলেন। তিনি তখন বৈঠকখানা ঘরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের বৈঠকখানা ছিল দু মহল বাড়িটার সীমানার বাইরে। এমন সময় নারাণ ছুটতে ছুটতে এসে বলাইকাকাকে ডাকল, একটা জিনিস দেখবেন, আসুন। বলাইকাকার সঙ্গে আমিও বেরিয়ে গেলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাঁচিলের পাশ দিয়ে বৈঠকখানার পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল নারাণ। তারপর সেই বিবীক্ষি তেঁতুলগাছটার উপর দিকে হাত বাড়িয়ে বলাইকাকাকে কি দেখাল।

তখনও অন্ধকার গাঢ় হয়নি। সেই পাতলা অন্ধকারে তেঁতুলগাছটার মাথার উপরে যা দেখলাম তাতে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। আমার পাশে তখন বলাইকাকা আর নারাণ না থাকলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। আমি দেখলাম লালপাড় শাড়িপরা অতি বিশাল শুভ্রধবল এক নারীমূর্তি তেঁতুলগাছের মাথায় একটা পা আর দালানের ছাদের উপর একটা পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। এত উঁচু যে, মনে হলো, তার মাথাটা আকাশ ভেদ করে আমাদের দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বলাইকাকা গলার মালায় হাত দিয়ে 'হরিবোল হরিবোল' বলতে লাগল। নারাণ রামনাম জপ করতে লাগল।

আমরা বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, মা মাসিমা লণ্ঠন হাতে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারাও বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। বলাইকাকা কিন্তু কাউকে কিছু না বলে

একহাতে একটা লণ্ঠন আর একহাতে একটা নারকেল ঝাঁটা হাতে করে সোজা দালানের ছাদে চলে গেল। তারপর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তেঁতুলগাছটার দিকে মুখ করে ঝাঁটা উঁচিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, আয় যত সব ভূতপ্রেত, ডাকিনীযোগিনী কে কোথায় আছিস। এই ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। আমি জাত বোষ্টমের ছেলে। আমার গলায় আছে তুলসীকাঠের মালা। এতে স্বয়ং বিষ্ণু বাস করেন।

এই বলে গোটা ছাদটাতে ঝাঁট দিতে লাগল বলাইকাকা। তখন কেবলি আমার মনে হতে লাগল, বলাইকাকা মানুষ নয় দেবতা। যাই হোক, ভূত দেখার প্রথম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় সে রাতে ঘুমই হলো না আমার। ভাবলাম, ঐটাই সেই খুনী ভূত যা একের পর এক করে অনেকের প্রাণ হরণ করেছে। আবার কখন কি করে বসে তার ঠিক নেই। তবে বলাইকাকার কথা ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম মনে।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা হলো না। সেই খুনী ভূতের কাণ্ডকারখানা একেবারে বন্ধ করতে পারল না বলাইকাকা। এর পর বছরখানেকের মধ্যে আমার বড়দিদি এই বাড়িতেই মারা গেল। বড়দি অবশ্য কিছুদিন হতে স্ত্রীরোগে ভুগছিল। কিন্তু কিছুদিনের জন্য ঠাঁইনড়া হয়ে মামার বাড়িতে এসেই রোগ তার বেড়ে যায়। মৃত্যুকালে সেই খুনী ভূতটাকে তার আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে বড়দি।

এর পর মেসোমশাই চাকরি ছেড়ে এসে বাড়িতে লোকজন রেখে চাষ করতে লাগলেন। বাড়িতে রাঁধুনি, ঝি, ক্ষেতমজুর রাখতে হলো। লোকজনের ভীড়ে গমগম করতে লাগল বাড়িটা রাত পর্যন্ত। দূর থেকে শশধর পণ্ডিত নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে আনিয়ে বাড়িতে যজ্ঞ ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা হলো। মেসোমশাই মাসিমা দালানের একটা ঘরেই শুতে লাগলেন। একেবারে বন্ধ হয়ে গেল খুনী ভূতের কাণ্ডকারখানা।

মামার বাড়িতে গিয়ে বড় ভাল লাগত আমার। আগেকার সেই নিরানন্দ নীরব ভুতুড়ে বাড়িটা আনন্দে ঝলমল করতে লাগল। বছর কতক বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। কিন্তু সহসা নীল নির্মেঘ আকাশে কালো মেঘের ছায়ার মত হরষে বিষাদ নেমে এল বাড়িতে। ঘুসঘুসে জ্বরে ধরল মেসোমশাইকে। প্রথম প্রথম রোজ সন্ধ্যের সময় জ্বরটা এসে সারারাত ভোগ করে সকালে ছেড়ে যেত। কোন ওষুধে কাজ হলো না। কিছুদিন পর আরো বেড়ে গেল। জ্বরটা তখন সকালেও ছাড়ত না। তার উপর নিউমোনিয়া হলো। উত্থানশক্তি রহিত হয়ে দিনরাত বিছানাতেই পড়ে থাকতেন মেসোমশাই। খবর পেয়ে মা আমাকে স্কুলবোর্ডিং -এ রাখার ব্যবস্থা করে মামার বাড়িতে এসে মাসিমার কাছেই থাকতে লাগলেন। আমি তখন নবম শ্রেণীতে পড়ি।

মা এসে শহর থেকে বড় ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করলেন। দামী ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হলো। সবাই বলল, দালান ঘরে শোয়ার জন্যই জ্বর যাচ্ছে না। কিন্তু মেসোমশাই শিক্ষিত মানুষ কোন ভয় বা কুসংস্কার ছিল না তাঁর যুক্তিবাদী মনে। তাই দালান ছেড়ে লম্বাঘরে শুতে রাজী হলেন না। তবে জ্বরটা যে ভুতুড়ে তা তিনি শেষকালে স্বীকার করলেন। কিন্তু

তখন কোন উপায় ছিল না।

আমি মাঝে মাঝে দেখতে আসতাম মেসোমশাইকে। আমার মাসতুতো ভাইবোনেরা তখন ছোট। একদিন সন্ধ্যের সময় মেসোমশাই ক্ষীণকণ্ঠে আমাকে বললেন, ভূত তাড়াতে চাকরি ছেড়ে এখানে এসে বাস করছিলাম। এখন ভূত আমাকেই তাড়াচ্ছে। আমি মরলেই গোটা বাড়িটাকে আবার গ্রাস করবে ওরা। তাই বলছি বৈঠকখানা ঘরের চারদিকে পাঁচিল তুলে ঘর বাড়িয়ে ওখানে মা মাসিমাকে নিয়ে উঠে যাব যত তাড়াতাড়ি পারি। এখানে থাকলে আরো বিপদ ঘটবে।

দিনকতকের মধ্যেই মারা গেলেন মেসোমশাই। আবার নিরানন্দ হয়ে উঠল গোটা বাড়িটা। চাষ তুলে দেওয়া হলো। বলাইকাকা আর একজন ঝি ছাড়া বাকি লোকজন সব ছাড়িয়ে দেওয়া হলো। রাত্রিতে মা মাসিমা থাকত লম্বাঘরে। বলাইকাকা থাকত দালানে। পতিলালমামা শুত চালা ঘরে। বাড়ির ঝি মাসির কাছে শুত লম্বাঘরে।

বৈঠকখানাটাকে বসবাসের যোগ্য করে তোলার জন্য কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। কাজ শেষ হলেই ওখানে উঠে যাওয়া হবে ভুতুড়ে বাস্তু ভিটেটাকে চিরদিনের মত ভূতের হাতে ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু তার আগেই আবার একটা অঘটন ঘটল।

একদিন দুপুরবেলায় মা মাসিমা দালানে কাজ করছিল। মাসিমার কোলের ছেলেটা হলঘরের খাটের উপর শোয়ানো ছিল। ছেলেটা ঘুমিয়েছিল। ছেলেরা উঠোনে ছায়ায় খেলা করছিল। বলাইকাকা বাইরে ছিল। কাজ সেরে মাসিমা ছেলেটাকে তুলতে গিয়েই দেখল ছেলেটা মরে পড়ে আছে। গলায় আঙ্গুলের দাগ বসা। জিবটা বেরিয়ে এসেছে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মাসিমা। এই আশ্চর্যজনক অলৌকিক মৃত্যু দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই।

সেইদিনই দালান থেকে সব জিনিসপত্র বার করে অন্য সব ঘরে রাখা হলো। ঠিক হলো বৈঠকখানা ঘরের পাঁচিলের কাজ শেষ না হলেও দিনকতকের মধ্যে ওখানেই উঠে যাওয়া হবে।

আমার মামার বাড়িটা ছিল নির্জন পরিবেশে। বাড়ির পিছনে ও বাঁ দিকে ছিল মাঠ। প্রতিবেশী বলতে ছিল খুবই কম। যাও বা ঘরবাড়ি ছিল তা দূরে দূরে। এদিকে আমাদের বাড়িতে তখন মা মাসিমা খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আরো মেয়েলোকের দরকার। দিনের বেলাই কাটতে চায় না। মা তাই আমার দুই দিদিকে তাদের শ্বশুরবাড়ি থেকে আনা করালেন।

আমি ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পড়ছি কলকাতায় মেসে থেকে, দিনকতকের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। মা তখন মামার বাড়িতেই থাকতেন। আমার দিদিরাও বেশ সাহসী ছিল। তারা আসায় মনে কিছুটা জোর পেলেন মা মাসিমা। আমি রাত্রিতে নারাণকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে শুতাম। বাকি সবাই লম্বাঘরে শুত।

সেদিন রাত্রিতে আমি বৈঠকখানা ঘরে নারাণের সঙ্গে গল্প করছি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

খুনী ভূতের কাণ্ডকারখানা

তখন শীতকাল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি। হঠাৎ ভিটেবাড়ি থেকে মেয়েদের সমবেত কান্নার রোল উঠল। আমরা তখন দুজনে ছুটে গেলাম বাড়িতে। দেখলাম আমার দুই দিদির দুটি কোলের শিশু মাসিমার ছোট ছেলের মত অকস্মাৎ বিনা রোগে রহস্যজনকভাবে মারা গেছে। তেমনি গলায় কালসিটে দাগ। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ভূতের অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু ভূত যে খুনী মানুষের মত মানুষ খুন করে, তা কখনো শুনিনি। এর আগে এ বাড়িতে যে সব মৃত্যু হয়েছে, তা খুনী ভূতের পরোক্ষ প্রভাবের ফলে এবং তা কল্পিত হলেও হতে পারে। কিন্তু এই তিনটি শিশুমৃত্যুর ঘটনায় খুনী ভূতের প্রত্যক্ষ হাত ছাড়া ভাব কোন কারণ খুঁজে পেলাম না আমি এবং পরবর্তী কালেও বুদ্ধি দিয়ে অনেক বিচার করেও পাইনি।

পরদিন সকালেই ভিটেবাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব নিয়ে বৈঠকখানা বাড়িতে গিয়ে উঠল। বলাইকাকা হতাশ হয়ে বলল, আমি হেরে গেলাম বাবা। মনে হচ্ছে, ঠাকুর দেবতা সব মিথ্যে।

এর পর বলাইকাকা কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য গাঁয়ে চাকরি করতে গেল। একজন গণৎকার এসে মা'দের বলল, অনেক আগেই তোমাদের ভিটে ছাড়া উচিত ছিল। যাই হোক আর কোন উৎপাত হবে না তোমাদের উপর। তবে রাত-বিরাতে তোমাদের কেউ যেন ঐ বাড়ির সীমানা দিয়ে না যায় বা বাড়ির গুপ্তধন তোলার চেষ্টা না করে। গাঁয়ের কোন দূষিত জায়গা দিয়েও কেউ যেন না যায়।

ক্রমে বছরখানেক কেটে গেল। আমি তখনো কলকাতায় থেকে পড়ছি। খুনী ভূতের কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। তখন শীতকাল। দিনকতকের জন্য ছুটি পড়ায় আমি একদিন মামার বাড়ি যাবার জন্য এগারটার ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হলাম। তখন ধান ওঠার সময়। মা মামার বাড়িতেই ছিলেন।

ভেবেছিলাম বেলাবেলি বাড়ি পৌঁছাব। কিন্তু ট্রেনটা পথে অত্যধিক লেট করায় গুস্করা স্টেশনে পৌঁছাতেই পাঁচটার উপর হয়ে গেল। তারপর স্টেশন থেকে বাস ধরে দেবপুরের চটিতে নামতে ছটা বেজে গেল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকার রাত। দেবপুর থেকে নৃসিংহপুর মাঠের উপর দিয়ে সোজাপথে গেলে দু মাইল। কিন্তু অন্ধকারে মেঠোপথে না গিয়ে বাঁধা সড়ক ধরে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত গেলাম। তারপর ক্যানেলের বাঁধ ধরে গাঁয়ের পথে যেতে লাগলাম। বাঁধ থেকে নেমে কোন দিক দিয়ে গাঁয়ে ঢুকব তা ভাবতে লাগলাম। একদিকে শ্মশান আর মুসলমানদের গোরস্থান, অন্যদিকে দীঘির পারের দূষিত জায়গা আর বোষ্টমদের সমাধিক্ষেত্র। বর্তমানে ক্ষ্যাপাবাবা নামে এক কালীসাধক এসে সে শ্মশানে ঘর করে কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে এক পবিত্র মনোরম আশ্রমে পরিণত করে তুলেছে শ্মশানটাকে। কিন্তু তখন এ সব কিছু ছিল না। তাই পশ্চিম প্রান্তের দীঘির পারের পথটাই ধরলাম।

লম্বা দীঘি। দু'পারে গাছের এলোমেলো জটলা। আমি ডানদিকের পথ ধরে এগোতে

লাগলাম। কিন্তু যেতে যেতে দুদিকে দুটো গাছের তলায় এসেই হঠাৎ গাটা ছমছম করে উঠল আমার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। পা আর উঠল না। একবার উপর দিকে তাকাতেই অন্ধকারে আবছা দেখলাম সেই খুনী ভূতটাই আকারটাকে ছোট করে দুটো গাছের মাথায় দুটো পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো, দাঁত বার করে হাসছে। তখন গণৎকারের কথাটা মনে পড়ে গেল আমার, 'গাঁয়ের মধ্যে কোন দূষিত জায়গায় তোমাদের কেউ যেন না যায়।' বুঝলাম, এবার আর আমার নিস্তার নেই। আমি গাছের তলা দিয়ে যেতে গেলেই আমার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকাবে। কাছে কোন বাড়িও নেই। তাছাড়া শীতকাল বলে সন্ধ্যের পরেই সবাই বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। গোটা গাঁ প্রায় নিশুতি।

এমন সময় আমার বলাইকাকার কথাটা মনে পড়ে গেল। একমাত্র বলাইকাকাই আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত। আমার সব জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তিবোধ ব্যর্থ হয়ে গেল। কাউকে ডাকতেও পারলাম না চিৎকার করে।

ঠিক সেই সময় আমি দেখলাম, আমার উল্টোদিকে অর্থাৎ গাঁয়ের ভিতর থেকে একজন লোক আসছে। কিছুটা সাহস পেলাম তাতে। কাছে আসতে বললাম, কে গো?

লোকটি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, কোন ভয় নাই বাবা, এস আমার সঙ্গে।

গলা শুনে দেহে প্রাণ ফিরে এল আমার; আর একটু হলেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতাম আমি। গলার স্বরে বুঝলাম, বলাইকাকা, যার কথা কত ব্যাকুলভাবে ভাবছিলাম এতক্ষণ। আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললাম, বলাইকাকা, তুমি কি অন্তর্যামী? কিন্তু এ সময় এলে কোথা থেকে? তুমি ত এখন এখানে থাক না।

বলাইকাকা বলল, শরীরটা খারাপ বলে দিনকতকের ছুটি নিয়ে এসেছি। যাই হোক, এস আমার সঙ্গে। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি আর কোন কথা না বলে বলাইকাকার পিছু পিছু চললাম। কিন্তু বাড়ির দরজার কাছে এসেই পিছন ফিরে আর দেখতে পেলাম না বলাইকাকাকে। ডেকে কোন সাড়াও পেলাম না। ভেবেছিলাম বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গল্প করব। কতদিন পর দেখা হলো।

এত রাতে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল মা মাসিমা। বকাবকি করতে লাগল। আমি ট্রেন লেটের কথা বললাম। কিন্তু বলাইকাকার কথাটা বললাম না।

কিন্তু পরদিন সকালেই নারাণের কাছে গিয়ে সব বললাম। কথাটা শুনেই চমকে উঠল নারাণ। বলল, সেকি কথা দাদা, বাবাঠাকুর যে তিন চার দিন আগেই দেহ রেখেছেন। ঐ দীঘির পারেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। এখন গোঁসাইদের বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে ওঁর স্ত্রী থাকেন।

আমি তখন নারাণকে সঙ্গে নিয়ে বলাইকাকার সমাধির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর নতজানু হয়ে ভক্তিভরে বললাম, বলাইকাকা, জীবনে তুমি আমাদের অনেক উপকার করে গেছ। মৃত্যুর পরেও আজ তুমি আমার যে উপকার করে গেলে তা পুনর্জীবন দানেরই তুল্য।

তোমাকে ভূতপ্রেত ভেবে ছোট করব না। তুমি যথার্থ হরির দান। একজন মহাপ্রাণ বৈষ্ণব। তোমার মহান আত্মা মানবকল্যাণের জন্য শরীরী রূপ ধরে গতরাতে আমাকে মৃত্যুসম চরম ভয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে যে উপকার করে গেলে, আমি তা জীবনে ভুলতে পারব না। ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি যেন আপন পুণ্যবলে বৈকুণ্ঠে গিয়ে বিষ্ণুর পর্ষদ হয়ে অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ করতে পার।

যে ভূতকে আমি বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না, যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না, সেই ভূতের ভালমন্দ দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ কাজের এক জীবনগত অভিজ্ঞতায় যে পরম বিস্ময় আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম, সেই বিস্ময়ের অনুভূতি আমার মনের মণিকোঠায় এক অক্ষয় রত্নরূপে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে আজও। আর থাকবেও চিরদিন।
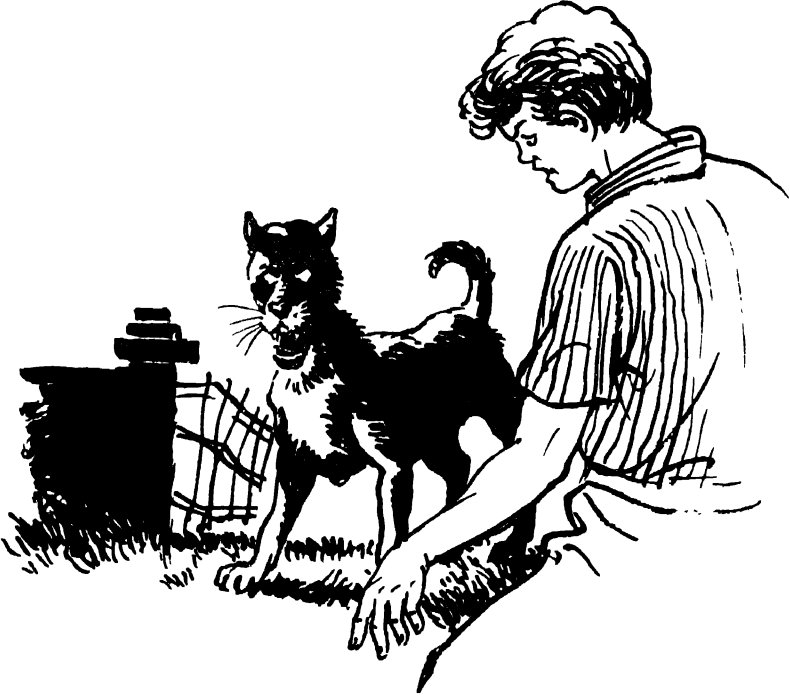
ভুতুড়ে গাড়ির যাত্রী

কণা বসু মিশ্র

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। যেন বিশাল একটা হিমবাহ গলে-গলে পড়ছে। জানুয়ারির শীতলতম রাত। শহরটা সারা গায়ে বরফের গুঁড়ো মেখে অন্ধকারে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। পটকা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন দিকে যে ছুটছে হুঁশ নেই। বোধ হয় কাকঝোরার দিকে। কারণ, পরদিন সকালে ওই কাকঝোরার কাছেই হিলকার্ট রোডের ওপর ওর জ্ঞান ফিরেছে কিনা।

ওই সময় দার্জিলিং যেতে পইপই করে বারণ করেছিলেন মা। কিন্তু যেখানে নিষেধ সেখানেই যে পটকা। তা ছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে ও বাজিও ধরেছিল, শীতের সঙ্গে লড়াই করে তবেই কলকাতা ফিরবে। চট করে দার্জিলিং মেলের একখানা রিজার্ভেশান পেতেও ওর কোনও অসুবিধা হয়নি। কেননা, ভিড়টা তখন কলকাতামুখী। শীতের দেশে শীতের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। দলে-দলে লোক পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে সমতলভূমির দিকে।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা অটো নিয়ে পটকা সোজা চলে যায় শিলিগুড়ি বাস

টার্মিনাসে। তখন সন্ধ্যে সাতটা হবে। লাক্সারি বাসগুলো পর পর দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ আগেই নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। সাতটার পর পাহাড়গামী সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ। নেহাত বাঘের বাচ্চা না হলে কেউ এ সময় দার্জিলিং আসে? পটকা নামের দিক থেকে ছেলেমানুষ হলেও সে এখন রীতিমত সাবালক। ওই নামটার ওপরে পটকার মোহ তো নেইই, বরং দারুণ রাগ। পৈতৃক সম্পত্তি অনেকেরই থাকে না। কিন্তু পিতৃদত্ত ভাল একটা নাম পাওয়ার অধিকার তো সকলেরই থাকে? এই কৈফিয়ত যিনি দিতে পারতেন, তিনি পটকার বাবা। অনেকদিন আগেই স্বর্গারোহণ করেছেন। পটকার মা কলেজে পড়ান। পটকা স্কুলের বারো ক্লাসের গণ্ডি ডিঙিয়ে সম্প্রতি কলেজে ঢুকেছে। তাই উঠতি বয়সের চ্যালেঞ্জটা ওর যেমন আছে, তেমনই আছে দুর্গমকে জয় করার নেশা। পটকার মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সটাও করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মায়ের এক ছেলে হওয়ার যা জ্বালা! মা কিছুতেই চান না, ছেলে তেনজিং নোরগে হোক, কিংবা এডমন্ড হিলারি।

পটকা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে যদি কোনও ল্যান্ডরোভার ভাড়া পাওয়া যায়। খিদের জ্বালায় ওর পেটের মধ্যে ছুঁচো দৌড়চ্ছে। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে বিষণ্নমনে পায়চারি করতে থাকে বাস টার্মিনাসে। তারপর ফুটপাথের চায়ের স্টল থেকে এক খুরি চা নেয় আর দুটো বিস্কুট। পটকা চায়ের ভাঁড়ে ঠোঁট ছোঁয়াতেই দ্যাখে, একজন নেপালি ড্রাইভার একটা খালি ল্যান্ডরোভারের স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। ভাঁড় ফেলে দিয়েই পটকা চোঁ-চোঁ দৌড়। ও আবদারের ভঙ্গিতে বলে, "দাজু! তোম দার্জিলিং মে জায়গা? হামকো লে চলো?"

ড্রাইভার বলে, "কিতনা ফগি ওদোর! হাম ক্যায়সা যায়গা?"

কিন্তু পটকা নাছোড়বান্দা, "তোম কিতনা রূপেয়া মাঙতা হ্যায়?"

ড্রাইভার হাসে। পান খাওয়া লাল ছোপের হাসি। বলে, "বহুত ঠান্ডি হ্যায়। রূপেয়া তো জাদা দেনা পড়ে গা।"

পটকা বলে, "কই বাত নেহী হ্যায়। জরুর দেগা।"

ও ড্রাইভারের চোখের সামনে চারখানা একশো টাকার নোট বাগিয়ে ধরে। টিউশনির টাকায় পটকার পকেটটা বেশ গরম। সেইসঙ্গে মাও কিছু ট্রাভেলার্স চেক দিয়ে দিয়েছেন, দার্জিলিঙের ব্যাঙ্ক থেকে পটকা যাতে ভাঙিয়ে নিতে পারে। চারদিকে ছিনতাই, ডাকাতি যে পরিমাণ হচ্ছে, তাই ক্যাশ টাকা ওকে বেশি সঙ্গে নিতে দেননি মা। পটকা টাকাটা বাগিয়ে ধরেই ভাবে, কাল রোববার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। ড্রাইভার ছোঁ মেরে নোটগুলি কেড়ে নেয়। পটকা মনে-মনে বিড়বিড় করে, 'মাটি টাকা, টাকা মাটি।'

টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পটকা একলাফে উঠে বসে ড্রাইভারের পেছনের সিটে। স্টার্ট দিতেই গাড়ির এঞ্জিন গর্জে ওঠে। রাস্তার দু'পাশে শাল গাছের সারি। জঙ্গল। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। অদ্ভুত গলায় কোনও একটা পাখিও ডাকছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে হিমেল হাওয়ার হাড় কাঁপুনি, চারদিকে দারুণ নির্জনতা। গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটাটা একশো আর আশি মাইলের মধ্যে লাফালাফি করতে-করতে গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা খায় একটা শাল

গাছের গায়ে। ড্রাইভার ক্ষিপ্রহাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নেয়। বুনো শূকরের মতো গোঁ-গোঁ করতে-করতে ল্যাণ্ডরোভার ফের ছুটে চলে।

ড্রাইভারের কান-মাথা কালো মাফলার দিয়ে জড়ানো। গায়ে গরম কালো পুলওভারের ওপর গরম কালো কোট। ওর চ্যাপটা মুখখানায় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কপালের নীচে কুতকুতে একজোড়া চোখ।

ওরা সেবক ব্রিজ পেরিয়ে যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে শুরু হয় আঁকাবাঁকা পথ। যে পথ ফিতের মতো চলে গেছে কখনও উঁচু, কখনও নিচু। একেই তো বলে জিগজাগ কোর্স। রাস্তার একদিকে খাদ, অন্যদিকে নদী। খাদের নীচ দিয়ে তিস্তা বয়ে চলেছে। পটকা একটা জিনিস সব সময় লক্ষ্য করে, যখনই পাহাড়ের গায়ে হাজার-হাজার ফিট উঁচুতে কোনও রাস্তা তৈরি হয়, তখনই কোনও নদীকে চিহ্ন রাখা হয়। কখনও বাঁ দিকে, কখনও ডান দিকে পাহাড় আর নদী ঘুরে-ঘুরে চলে যায় সরল কিংবা বক্ররেখায়। পটকা কাচের জানলায় চোখ রেখে যদিও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কুয়াশার দাপটে পাহাড়, খাদ, রাস্তা মহাশূন্যে পরিণত হয়েছে। ঠাণ্ডাটা ক্রমেই জাপটে ধরছে। পটকার গায়ে উলের সোয়েটার, গরম কোট এবং সবেধন নীলমণি একটি চাদর। মা সঙ্গে বেডিং দিয়েছিলেন। কিন্তু শিয়ালদায় আসার পথে পটকা পার্ক সার্কাসে এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে এসেছে। ও তো যাচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার করতে, তা সঙ্গে আবার গুড়ের কলসি কেন বাপু!

চাদরটা ব্যাগ থেকে বের করে পটকা সিটের গায়ে মাথা রাখে। ওদিকে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। দুর! ঘুম আসছে না। যদি ধস নামে? পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টির সঙ্গে ধসের একটা সম্পর্ক রয়েছে! ড্রাইভার নাকি-নাকি গলায় কোনও একটা নেপালি গানের সুর ভাঁজছে। পটকার রাষ্ট্রভাষায় দৌড় খুব বেশি নয়। নেপালি ভাষাও জানা নেই। ও ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করে।

"ড্রাইভারজি!"

"কেয়া হ্যায় সাব?"

"ধস নামে গা?"

"কিঁউ?"

"বৃষ্টি হোতা হ্যায়?"

ড্রাইভার খুক-খুক করে হাসে। বলে, "পাহাড় পর যব এক তরফ সে বারিষ হোতি হ্যায়, তব ধস নামতা।"

পটকা তবু ভাবে, ওপর থেকে যদি পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়ে, তবে ড্রাইভারের সব খেলই খতম। পটকার চোখে পড়ে মাঝে-মাঝে আলোর বিন্দু! হয়তো সেখানে বস্তি আছে। অন্ধকার আর কুয়াশা মাখামাখি হয়ে ঢেকে রয়েছে। শুকনো স্টেশনই বা কখন পেরিয়ে গেল পটকা কিছুই টের পায়নি। দিনের বেলা হলে কত মনোরম দৃশ্যই না ওর চোখে পড়ত। অবশ্য কুয়াশা ঘন না থাকলে। আকাশের মেঘ কখনও পায়ের তলায়। মেঘের সঙ্গে

লোফালুফির খেলাটা পটকার দারুণ লাগে। শীত তাড়ানোর জন্য পটকা একটা গান ধরে, 'ব্রহ্মময়ী! আমায় দে মা পাগল করে।'

ড্রাইভার বলে, "কেয়া গানা গাতা হ্যায় বাবুজি?"

পটকা গান থামিয়ে বলে, "ভগবান কা গানা।"

"আপ বোম্বাই ফিলিম কা গানা নেহি জানতা?"

পটকা বলে, "জানতা, জানতা। আভি ভগবান কি গানা নেহি, গানে সে তো ডর ভি নেহি যাতা।"

ড্রাইভার খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। বলে "আপকো ডর লাগতা বাবুসাব? কিঁউ?"

পটকা বলে "গাড়ি গিরনে সে তো ভূত হো জায়গা।"

ড্রাইভার বলে, "নেহি। হামি পাকা ডেরাইভার আছি। দেখিয়ে।" ড্রাইভার গাড়িটাকে দোলনার মতো দোলাতে থাকে। উলটো দিক থেকে আর-একটা গাড়ির জোরালো আলো পড়ে। বাঘের চোখের মতো আলোটা ছুটে আসে। পটকা আশ্বস্ত হয়। এই নির্জন রাতে আরও কেউ দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছে তা হলে? ভাবতে-ভাবতেই গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায়। পটকা তো অবাক। এ সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ওভারটেক করা তো সম্ভব নয়। গাড়িটা গেল কোথায়? পাহাড়ের মাথায় কি আরও কোনও রাস্তা আছে? পটকা প্রশ্ন করে, "ড্রাইভারজি! থোড়া আগাড়ি মে যো গাড়ি আয়া, ওহি গাড়ি কিধার চলা গিয়া?"

ড্রাইভার বলে, "ভেলকি হ্যায়।"

পটকার চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। ও বুকের মধ্যে অসংখ্য হাতুড়ির শব্দ শুনতে পায়। ড্রাইভার নির্বিকারভাবে স্টিয়ারিং ধরেই থাকে। চারদিকের বিশ্বচরাচর কুয়াশা আর অন্ধকারে ঢাকা। শুধু গাড়ির একটানা গোঁ গোঁ শব্দ। পটকা ভাবে, ড্রাইভারটা কি ম্যাজিসিয়ান? ওর খুব ইচ্ছে হয় ড্রাইভারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে।

"তুমহারা নাম কেয়া হ্যায় ড্রাইভারজি?"

"মেরা নাম কুলবাহাদুর ছেত্রী।"

"তোম্ কিতনা বরষ সে এহি রাস্তামে গাড়ি চালাতে হ্যায়?"

"হাম ? বিশ বরষ হো গিয়া।"

পটকার হঠাৎ মনে পড়ে, ওর পকেটে চিউইংগাম আছে। এ একটা কুলবাহাদুরকে দেয়। নিজেও চিবোতে থাকে। চিউইংগাম চিবোতে-চিবোতে কুলবাহাদুর বলে, "এই রাস্তার প্রতিটি বাঁক মুখস্থ। যাদের জন্ম, মৃত্যু দুইই পাহাড়ে, তাদের আবার পাহাড়কে ভয়?"

বার কয়েক ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা হঠাৎ থেমে যায়। পটকা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। চারদিকে ঝাঁক-ঝাঁক আলো। পটকা প্রশ্ন করে, "কুলবাহাদুর। হামলোক দার্জিলিং আ গিয়া?"

কুলবাহাদুর বলে, "নেহি, ইয়ে কার্শিয়াং হ্যায়।"

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় পেরিয়ে যায়। গাড়ি রেখে কুলবাহাদুর তো হাওয়া। পটকা হিহি করে কাঁপতে-কাঁপতে চায়ের স্টলের দিকে এগিয়ে যায়। ও রুটির গায়ে চিজ লাগিয়ে সবে

কামড় বসিয়েছে, এমন সময় গুম-গুম শব্দ। শব্দটা বাড়তে প্রচণ্ড জোরে যেন বিস্ফোরণ হয়। খানিকটা পাহাড় ধসে পড়ে।

বেঁচে যায় পটকা আর চায়ের দোকানটাও। পেছনের খানিকটা রাস্তা ধস নেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কী সর্বনাশ! ল্যাণ্ডরোভারটা কোথায়? সেটাও কি চাপা পড়েছে? পটকা পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকায়। ঠিক তখনই দুটি ঠাণ্ডা হাত ওর দু'কাঁধ চেপে ধরে। পটকার সারা শরীরে শীতল স্রোত বয়ে যায়। পটকা তোতলাতে থাকে, "কে এ? কে. ..? কে... ?" ও পেছন ফিরে দ্যাখে কুলবাহাদুর। পটকা ভয়ার্ত গলায় বলে, "আভি কেয়া হোগা ড্রাইভারজি?" ড্রাইভার দেঁতো হাসি ছুঁড়ে বলে, "আউর দুশো দিজিয়ে।"

পটকা অসহায়ভাবে তাকায়। এই প্রথম ওর মনে হয়, ও একটা খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। কুলবাহাদুরের কাজটাই কি তবে এই? রাতের সওয়ারিকে পাকড়াও করা? সেইজন্যই এই হিমেল রাতে ও বাসস্ট্যাণ্ডে ওত পেতে থাকে। ওর পকেটে কি ভোজালি আছে? অথবা রিভলভার? পটকা মনে-মনে ক্যারাটের প্যাঁচ কষতে থাকে। পটকার কাছে নগদ দুশো নেই. মাত্র একশো আছে। বাকি সবই ট্রাভেলার্স চেক। কুলবাহাদুর যদি ভোজালি কিংবা রিভলবার বের করে, পটকাও তবে ক্যারাটের কায়দায় ওকে ঘায়েল করবে। যদিও পরমুহূর্তেই টেপরেকর্ডারেব মতো মনের মধ্যে বেজে যায় মায়ের কথা, 'আমি যে একটা ভাল ছেলের মা হতে চেয়েছিলুম পটকা!' এই মুহূর্তে সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই। আত্মরক্ষার জন্যই তো ক্যারাটে শেখা? অন্যায়ের সঙ্গে মোকাবিলা কখনও নয়।

ওদিকে ফের পাহাড় ভাঙার শব্দ, গুম...গুম....গুম। পটকার পায়ের তলার মাটি থরথব করে কেঁপে ওঠে। তখন কুলবাহাদুরের অবিশ্বাস্য হাতটাই পটকা পরম বিশ্বাসে চেপে ধরতে চায। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায়, চরম বিপর্যয়ে ও মানুষকেই বিশ্বাস করতে চায়। কিন্তু এ যেন হাত নয়। একটা কঠিন হাড়। হাতটায় কি ক্ষুর লাগানো রয়েছে? কুলবাহাদুর সেই মুহূর্তেই লোভের চোখ ঘুরিয়ে বলে, "আউর দুশো?"

ওর চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। পটকার গলা শুকিয়ে কাঠ। বলে, "আভি একশো লিজিয়ে। পরশু ট্রাভেলার্স চেক ভাঙায় কে আপকো আউর একশো দে দুঙ্গা।"

কুলবাহাদুর বলে, "নেহি দেনে সে বিলকুল গড়বড় হো যায়গা।" সূচিভেদ্য অন্ধকার। টর্চের জোরালো আলোয় চারদিক আলোকিত হতেই পটকা দ্যাখে, ওরা সত্যিই একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পটকা কাঁপা গলায় বলে, "কুলবাহাদুর। কেয়া হোগা?"

"কুছ্ নেহি হোগা। আপ আইয়ে।"

আবার তেড়ে বৃষ্টি নামে। পটকার গায়ে ভাগ্যিস বর্ষাতি ছিল। কুলবাহাদুর আগে-আগে যায়। পেছনে পটকা! এই রাস্তাটাই কেবল অবিচ্ছিন্ন আছে, যদিও বিপজ্জনক।

কুলবাহাদুর গাড়িতে স্টার্ট দিতেই কোত্থেকে একটা লোক এসে হাজির। পটকার সামনের সিটে সে থপ করে বসে পড়ে। ড্রাইভারের চেনা লোক হয়তো। নেপালি ভাষায় দু'জনে

কথা বলতে থাকে। লোকটার গায়ে বর্ষাতি নেই, হাতে ছাতাও নেই। অথচ সে ভেজেনি। পটকা এবং ঐ লোকটার মধ্যে হাতখানেক দূরত্ব। তার সঙ্গে ওর মাঝে-মাঝেই চোখাচোখি হতে থাকে। লোকটার দৃষ্টি কুৎসিত। পটকা চোখ সরিয়ে নেয়। গাড়িটা দুরন্ত গতিতে বাঁকের পর বাঁক ঘুরতে-ঘুরতে খাদে পড়তে-পড়তেও বেঁচে যায়। কুলবাহাদুর বলে, "এহি রাস্তামে একঠো অ্যাক্সিডেন্ট হুয়া হ্যায়।"

পটকার সামনের আগন্তুক খনখনে গলায় হেসে ওঠে। কুলবাহাদুরও তার সঙ্গে গলা মেলায়। পটকা বুঝতে পারে না এতে হাসির কী আছে? ড্রাইভার বলে "এহি রাস্তামে পুলিশ কো সাথমে স্মাগলার কো গোলি বদলা হোতা। কম সে কম ছ'সাতশো ফিট নিচুমে গাড়ি গির গিয়া।"

সেই লোকটা হঠাৎ বলে ওঠে, "এইসা মাফিক?" কথাটা বলেই ল্যাণ্ডরোভারের দরজাটা খুলে সে ঝাঁপ দেয় খাদে। পটকা চিৎকার করে ওঠে। ওর শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু কুলবাহাদুর নির্বিকার। পটকা ভয়ার্ত গলায় বলে, "লোকটা যে পড়ে গেল কুলবাহাদুর?"

কিন্তু সে পাত্তাই দেয় না। পরমুহূর্তেই একটা হাত পটকার কাছে এগিয়ে আসে। কোনও মুখ নেই। শরীর নেই। শুধু হাত। ফ্যাসফেসে গলায় কে যেন বলে, "একটা সিগারেট হবে দাদা?"

পটকার প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা। হাতটা ওর চোখের সামনে শুধুই ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে থাকে। পটকা তোতলাতে থাকে, "আপ ..আপনি?" হঠাৎ দ্যাখে সিটে বসে আছে সেই লোকটা। তারপরই পটকা বেহুঁশ।

কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার সময় ওর খুব ইচ্ছে ছিল, পাগলাঝোরা দেখবে, দেখবে বাতাসিয়া ল্যুপ। হায় রে, কোথায় বা প্রকৃতি আর কোথায় পটকা।

ড্রাইভারের চেঁচামেচিতে ওর চৈতন্য হয়, "দার্জিলিং মে আ গিয়া।"

চকবাজার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গাড়ি থামে। পটকা চোখ কচলে দ্যাখে সেই লোকটা নেই।

"কুলবাহাদুর! ওহি আদমি কাঁহা গিয়া?"

কুলবাহাদুর খেঁকশিয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসে। বলে, "ভ্যানিশ।"

পটকার মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। কুলবাহাদুর আর ওই লোকটা কি জাদুকর? না অন্য কিছু? পটকা বুকে ক্রশ-চিহ্ন আঁকে। কুলবাহাদুর বলে, "পরশু রাত দশ বাজে হাম হিঁয়া রহে গা। রূপেয়া নেহি দেনে সে জান লে লেগা।"

কুলবাহাদুর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বৃষ্টি, বরফের গুঁড়োয় পটকা জমে যেতে থাকে। ও টর্চ জ্বেলে গাইড বুকে হোটেল খোঁজে। দমকা হাওয়ায় গাইড বুকটা হঠাৎ ছিটকে চলে যায়। অন্ধকারে বার্চ গাছগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। পটকার পাশ কাটিয়ে তখন গড়গড় করে চলে যায় কুলবাহাদুরের ল্যাণ্ডরোভার। গাড়িটা সোজা গিয়ে ছিটকে পড়ে খাদে। টর্চের আলোয় গাড়ির নম্বরটা পড়তে পটকার ভুল হয়নি। ও আঁতকে ওঠে। পরক্ষণেই

ভাবে, এ কি কুলবাহাদুরের দ্বিতীয় খেল? পটকা উত্তেজিতভাবে একটা সিগারেট ধরায়। হাঁটতে-হাঁটতে ও এক সময় আবিষ্কার করে, ও রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছে। পটকা স্বস্তি বোধ করে। ভবঘুরে বাউণ্ডুলেদের জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলো চিরকাল জায়গা রেখে দেয়। পটকা এক কাপ গরম চায়ের লোভে এদিক-ওদিক তাকায়। এত রাতে এই ঠাণ্ডায় কোথায় চায়ের স্টল? পটকা স্টেশনমাস্টারের ঘরে উঁকি মারে। কাচের জানলা-দরজা সব বন্ধ। উনি নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে ভেতর থেকে কার যেন নাক ডাকার গর্জন আসছে। সে গর্জন কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়। পটকা জোরে দরজায় ধাক্কা দেয়। ডাকে, "মাস্টারবাবু!' মাস্টারবাবু!" কোনও উত্তর নেই। একেই পটকার মনের মধ্যে বিষণ্ণতার ঝড়। শিলিগুড়ি ছাড়ার পর নানা বিচ্ছিন্ন ভাবনা মনের মধ্যে তোলপাড় করে, তারপর আবার ঠাণ্ডায় বরফ হওয়ার মতো অবস্থা। স্টেশনমাস্টারকে ডেকে তুলে বলে কয়ে যদি এক কাপ চা ম্যানেজ করা যায়? ওঁর ফ্লাস্কে নিশ্চয় চা আছে। পটকা ভাবে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। এলোমোলা পা ফেলতে-ফেলতে পটকা স্টেশনের শেষ মাথায় চলে যায়। জায়গাটা একটু অন্ধকার। শরীরটাকে গরম করার জন্য পটকা আর-একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটে সবে একটা টান মেরেছে, এমন সময় ভুঁই ফুঁড়ে কে যেন ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। আরে, এ যে কুলবাহাদুর! গাড়ির দুর্ঘটনাটা তবে কি সত্যিই ভেলকি? কুলবাহাদুরের চোখ হিংস্র জন্তুর মতো জ্বলতে থাকে। সে দেঁতো হাসি হেসে বলে, "আঁইয়ে বাবুসাঁব, আঁইয়ে, আঁপকো চা পিঁয়ায়গা।"

কুলবাহাদুরের গলার স্বর নাকি-নাকি শোনাচ্ছে কেন? বেমালুম বদলে গেছে। একটা মাংসহীন কঙ্কাল ক্রমেই ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

"বাঁচাও...বাঁচাও..." পটকা চেঁচিয়ে ওঠে। ও ছুটতে-ছুটতে দ্যাখে, প্ল্যাটফর্মের আর-এক মাথায় সান্টিং-করা একটা টয় ট্রেন। পটকা লাফিয়ে ওঠে মাঝখানের বগিতে। দরজাটা ভেতর থেকে লক করে দিয়েই ও হাঁফাতে থাকে। বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে ও দু'জন গার্ডকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়। তারপর পটকা গরম চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ে। ও শুয়ে-শুয়ে ভাবে, কুলবাহাদুরের যথার্থ রহস্যটা কী? ভূত যদি হবে, তবে টাকা নিল কেন? টাকা আরও চাইছেই বা কেন? তবে কি কোনও অতৃপ্ত আত্মা, যে টাকার জন্য খুন হয়েছিল, সেই লোকটা কি ছিল ওর শাগরেদ? এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পটকা ঘুমিয়ে পড়ে।

মাঝ রাত্তিরে পটকার ঘুম ভেঙে যায়। ওর মনে হয়, চাদরটা ধরে কে যেন টানাটানি করছে। একেই পটকা ঠাণ্ডায় জমে একেবারে বরফ, তারপর আবার চাদরে টান? পটকা ভাবে, রাস্তার কুকুর-টুকুর নাকি? নাকি ধেড়ে ইঁদুর? ও চাদরটা টেনে নেয়। কিন্তু এবার মনে হয়, ওর উলটো দিকে চাদরের তলায় কেউ যেন ঢুকে পড়েছে। তবে কি কোনও ভিখিরি? বেঞ্চের তলায় এতক্ষণ ঢুকে ছিল হয়তো। পটকার হাঁটুর সঙ্গে তার হাঁটু লেগে ঠোকাঠুকিও হতে থাকে। পটকা লাথি মেরে ওটাকে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তার পা দুটো

ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরে চিমটের মতো। পটকার মায়া হয়। আহা! এই ঠাণ্ডায় ওই বা যাবে কোথায়? সেও মানুষ আমিও মানুষ। মানুষের কি জাত আছে? বরং দুটো মানুষ জড়াজড়ি করে থাকলে ঠাণ্ডাটা একটু কমই লাগবে। কিন্তু মানুষটা যেন ওর হাঁটুতে ক্রমেই হাড় বিঁধিয়ে দিচ্ছে। কাঁকড়ার মতো সরু-সরু আঙুলগুলো দিয়ে মাঝে-মাঝে চিমটি কাটছে। পটকার দারুণ রাগ হয়। একে এই খিদে, তৃষ্ণা এবং শীতে ওর প্রায় অচৈতন্য অবস্থা, তারপর আবার এই ঝামেলা? পটকা চাদর ধরে হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারে। লোকটা তড়াক করে উঠে বসে। তারপর জ্বলন্ত চোখে পটকার দিকে চেয়ে থাকে। পটকা রাগী গলায় বলে, "তোম কোন হ্যায়? তোমকো মতলব কেয়া?" লোকটা পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দেয়, "মঁতলব তোঁ তোঁমার ভাঁই। আঁমার আঁস্তানাটা দঁখল কঁরেছ, অ্যাঁ?"

পটকার বুকের রক্ত হিম। ও কি ফের ভূতের পাল্লায় পড়েছে? পালাবার পথ নেই। দরজাটা লক করা, পটকা দ্রুত উঠে গিয়ে দরজায় লাথি মারে।

লোকটা খনখনে গলায় হেসে বলে, "দাঁদা! এঁকটা সিঁগারেট হঁবে? মঁনে নেঁই? ল্যাঁণ্ডরোঁভারে আমিঁ যেঁ আঁপনার সঁহযাত্রী ছিঁলাম!"

আরে সর্বনাশ! এ কি সেই ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া লোকটা? কুলবাহাদুরের সেই শাগরেদ? পটকা দরজায় দড়াম-দড়াম লাথি কষাতে থাকে। তারপরই ছুট...ছুট...ছুট...।

শয়তানের জাগরণ

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

বহু বছর হয়ে গেল, কিন্তু ঘটনাটা এখনো স্মৃতি-পটে পরিষ্কার হয়ে ফুটে আছে। সেই ভয়ংকব দিনটির কথা যখনই মনে পড়ে তখনই আতঙ্কে শিউরে উঠি। এত বছব পবে আজও সেই আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাইনি, বোধহয় কোনোদিন পাবও না। অথচ ঘটনাটা এমনই যে, কেউ সেটা বিশ্বাস কবতেই চায় না। ভাবে, আমার বোধহয ভুল বকাব অভ্যেস আছে। কি করে তাদেরকে বোঝাই যে ঘটনাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষবে সত্যি। একজন সাক্ষীও ছিল, কিন্তু সে আর ইহজগতে নেই।

আমি তখন ছিলাম সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেন। কিছুদিন আগেই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে একদফা জোর লড়াই হয়ে গেছে। সে লড়াইয়ে আমাদের অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। তাই লড়াই শেষ হওয়ার পরই আমাদের সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা হলো, আর আমাকে পাঠানো হলো সীমান্তের এক সামরিকঘাঁটিতে। ঝড়ের ঠিক পরেই যেমন প্রকৃতি শান্ত হয়ে যায় তেমনি লড়াইয়ের উত্তেজনার পর আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও তখন হয়ে পড়েছিল খুবই নিরুত্তাপ, একঘেয়ে। রুটিন

বাঁধা কাজকর্মের পর বাকী সময়টা আমরা সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব করে আর তাস খেলেই কাটিয়ে দিতাম। বিশেষতঃ তাস খেলাটা খুবই চলত।

আমি যে ব্যারাকটায় থাকতাম সেটা ছিল বেশ বড়সড়, দোতলা, ঠিক ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো। আশেপাশে কিছুটা দূরে দূরে আরো অনেকগুলো ব্যারাক। ব্যারাকগুলোব সামনে ও পেছনে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, সেখানে আমাদের ড্রিল, প্যারেড, খেলাধুলো এই সব হতো। আমাদের তাসের আসর বসতো একতলার ঠিক মধ্যিখানে একটা বড় ঘবে, যাকে আমরা বলতাম ক্লাবঘর। এই তাসের আসরে সবচাইতে পাকা খেলোয়াড় ছিল আমাদের ব্যারাকের মাইকেল জন। তাসের যে কোনো রকম খেলাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যেত সেই জিতেছে। আমাদের ব্যারাকের সব তাসুড়ে তো বটেই, অন্যান্য ব্যারাক থেকে যারা খেলতে আসত, তারাও যে যার পকেট ফাঁকা করেই ফিরত। প্রথম প্রথম কেউ কিছু মনে করেনি, হাসিঠাট্টা করেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই জনের জেতার বহর বেড়ে চলতে লাগল। ওর অবিশ্বাস্য তাসের হাত আর ভাগ্য নিয়ে শুরু হয়ে গেল ফিসফাস, চাপা গুঞ্জন। একজন তো আবার ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে আমাদের জানাল জনেব ভাবগতিক মোটেই সুবিধের নয়। বেহিসেবী খরচ করাটা নাকি ওর মজ্জাগত অভ্যেস আর সব সময়েই নাকি ও ধারদেনায় ডুবে থাকে। এসব জানা সত্ত্বেও কিন্তু জনের আড্ডা মারা বা তাসের আসর বসানো বন্ধ হলো না। তার কাবণ, জনের চেহারায় আর বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে এমন একটা অমোঘ আকর্ষণ আর সম্মোহনী শক্তি ছিল যে ওকে চট করে কেউ এড়িয়ে যেতে পারত না। মজার মজাব গল্প বলে, গান করে মজলিশ জমাতেও জন ছিল সিদ্ধহস্ত। তবে আস্তে আস্তে কিন্তু ওর ওপর সকলের মোহ কেটে যেতে লাগল। অনেকেই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, তাস ভাঁজবার সময় ও বিলি করার সময জন হাতের কাযদায় কিছু তাস সরিয়ে ফেলে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তক্কে তক্কে রইল জনকে হাতেনাতে ধরার জন্য।

ঘটনাটা যেদিন ঘটল, সেদিনটা ছিল রবিবার। সবে শীত পড়তে শুরু করেছে, বেলা ছোট হয়ে এসেছে। সেদিন আমাদের ব্যারাকের মাঠে সারাদিন ধরে খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়েছিল। সব অনুষ্ঠান যখন শেষ হলো তখন প্রায় সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। জন একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে সকাল থেকেই ক্লাবঘরে তাসের আসর জমিয়ে বসেছে। আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছিল। তাদের এগিয়ে দিতে গিয়ে গল্প করতে করতে আমিও বেশ খানিকটা চলে গিয়েছিলাম। যখন ফিরে এলাম, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে ভালভাবে। আমাদের ব্যারাকের মাঠ একদম ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। গেট দিয়ে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম ক্লাবঘরের বাইরে একটা জানলার সামনে দীর্ঘদেহী একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে কান পেতে ক্লাবঘরের কথাবার্তা একমনে শুনছিল সে। লোকটা আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ নয়, উপরন্তু ঐরকম পোশাকপরা অত দীর্ঘদেহী লোক আমাদের বা আশেপাশের

ব্যারাকে কখনো দেখিছি বলেও মনে হলো না।

ওর হাবভাব দেখে বেশ একটু খট্‌কা লাগল আমার। কোনো সৈনিক ছাউনির একেবারে ভেতরে এরকম একজন অচেনা লোক থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। বিপদের আভাস্ পেয়ে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে ক্লাবঘরে খুব চড়াগলায় তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গিয়েছিল। একাধিক লোক একসঙ্গে চেঁচাচ্ছিল, তাদের মধ্যে জনের গলাই শোনা যাচ্ছিল বেশি। সে যেন খুব উত্তেজিতভাবে কি একটা কথার প্রতিবাদ করে চলেছে। আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ক্যাপটেন মাথুরের গলা কানে এল। সে খুব রাগতভাবে বলছে, 'দেখ জন, বেশি চেঁচিও না। অনেক দিন ধরেই আমাদেব সন্দেহ হচ্ছিল যে তুমি তাস হাতসাফাই কর। আজ একেবারে হাতেনাতে ধরেছি। এখুনি তাস দেবার সময় তুমি কড়ে আঙুল দিয়ে প্যাকেটের তলার দিক থেকে তাস টেনেছ, স্বচক্ষে দেখেছি। সবাব হাতের তাস গোন। তোমার কাছে একটা তাস নিশ্চয়ই বেশি পাওয়া যাবে। শীগগির তাস দেখাও।'

জন অবশ্য অত কাঁচা ছেলে নয়, সে প্রাণপণে প্রতিবাদ করতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল, মাথুরকেই সবাই সমর্থন করছে। তারা সবাই চাইছে যে জনের হাতের তাস পরীক্ষা করে দেখা হোক।

হঠাৎ সকলের মিলিত কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে জনের গলা শোনা গেল। যে ভয়ংকর শপথ সে করল তা লিখতে এখানো আমার কলম কেঁপে যাচ্ছে। সে বলে উঠল, 'শোন সবাই, আমি মোটেই তাস চুরি করিনি। যে কোনো শপথ আমি করতে পারি। যদি আমি তাস সরিয়ে থাকি, তাহলে এখুনি যেন অন্ধকারের রাজা, নরকের প্রভু শয়তান এসে আমাকে চিরদিনের জন্য নিয়ে চলে যায়।'

জনের মুখ থেকে এই কথাগুলো বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভোজবাজি ঘটে গেল। চমকে উঠে দেখলাম, দীর্ঘদেহী লোকটা এক লাফে খোলা জানালা দিয়ে ক্লাবঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। ভেসে এল জনের তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। তারপরেই একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, আবার সেই দীর্ঘদেহী লোকটা এক লাফে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম তার কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় জন ছট্‌ফট্ করছে।

আমি তখনো কিছুটা দূরে ছিলাম। তাড়াতাড়ি পা ফেলে ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই লোকটা একদৌড়ে ব্যারাক বাড়িটার কোণ ফিরে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল। একবার, এক পলকের জন্য ওদের দুজনের মুখটা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। দেখেছিলাম জনের মুখ একদম ফ্যাকাসে। এক অসহ্য যন্ত্রণায় আর আতঙ্কে ওর দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর দীর্ঘদেহী লোকটার দুই জ্বলন্ত চোখের তীব্র দৃষ্টিতে ফুটে বেরোচ্ছে চরম হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য কি একটা অজানা ভয়ে আমার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ওদের ধরব বলে দৌড়লাম। কিন্তু ব্যারাকের বাঁক

ঘুরে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই, চারিদিকে ফাঁকা, নির্জন।

আবার দৌড়ে ফিরে এলাম সামনের দিকে। গেটের প্রহরীকে চেঁচিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ এইমাত্র বেরিয়ে গিয়েছে কিনা। সে জানাল, না। অগত্যা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ক্লাবঘরে ফিরে গেলাম।

ভিতরে যে দৃশ্য অপেক্ষা করছিল তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। দেখলাম, যে জনকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে দীর্ঘদেহী অচেনা লোকটার কাঁধে ছট্‌ফট্ করতে দেখেছি সে সশরীরে ঘরের একটা ইজিচেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ভাগ্যক্রমে ক্লাবে সেই সময় আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু ছিল, সে পরীক্ষা করে জানাল জন মারা গিয়েছে।

হতবুদ্ধি হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখের সামনে তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলছে। ঘরের ভেতরে অত লোকের চিৎকার চেঁচামেচি যেন কানে যাচ্ছিল না। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর ঘরে কি ঘটেছে শুনতে চাইলাম। সবাই একসঙ্গে যা বলল, তার সারমর্ম করলে দাঁড়ায়ঃ জন যথারীতি তাস বিলি করার সময় প্যাক থেকে তাস সাফাই করেছিল। ক্যাপ্টেন মাথুর সেটা দেখতে পেয়ে জনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি বেধে যায়, যেটা আমি ঘরের বাইরে থেকেই শুনেছি একটু আগে। এই সময় জন হঠাৎ ঐ ভয়ংকর কথাগুলো বলে উঠে। সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বাইরের জানালা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে টেবিলের তাসগুলোকে উড়িয়ে দেয়। আর জন আর্তচিৎকার করে চেয়ারে ঢলে পড়ে। একটুখানি ছট্‌ফট্ করেই তার দেহ স্থির হয়ে যায়।

সব শোনার পর আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। ভাবলাম তাহলে একটু আগে আমি কি দেখেছি আর কেনই বা দেখেছি? যা দেখেছি তা অন্য কাউকে কি বলা যায়? অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত আশেপাশে যারা ছিল, তাদের আমার দেখা ঘটনাটা বলতে গেলাম। ফল হলো বিপরীত, তারা বিশ্বাস তো করলই না উল্টে ভাবল হঠাৎ প্রচণ্ড শক খেয়ে আমার মাথা বোধহয় গোলমাল হয়ে গেছে। আমাকে সুস্থ করার জন্যই তখন আবার কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে আমারও সন্দেহ হতে লাগল, তাহলে কি সবটাই আমার চোখের আর মনের ভুল!

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্যাপটেন ভার্গব কখন একসময় কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। ক্লাবঘরের ঠিক ওপরের কামরাটাতেই থাকত ও। শরীরটা বেশ কিছুদিন ধরে খারাপ যাচ্ছিল বলে সারাদিন ভার্গব ওপর থেকে নামেনি। আমার কথা শুনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে জিজ্ঞেস করল, 'চৌধুরী তুমি দেখেছ? জনের জন্যে যে অপেক্ষা করছিল, তাকে দেখতে পেয়েছ তাহলে?'

ভার্গবের কথা শুনে এই চরম বিভ্রান্তির মধ্যে যেন অকূলে কূল খুঁজে পেলাম। যাক তাহলে আমি পাগল হয়ে যাইনি, ভুলও দেখিনি। ভার্গব দোতলার ঘরের জানালাতেই বসেছিল। রহস্যময় দীর্ঘদেহীকে সেও ভালভাবেই লক্ষ্য করেছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির বিচিত্র খেয়ালে আমরা দুজনই ক্ষণিকের জন্যে অতিপ্রাকৃত কিছু একটা দেখতে পেয়েছি।

তার ফলে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল তার অভিশাপ থেকে সারা জীবনেও মুক্তি পেলাম না।

আমাদের দুজনের মুখে হুবহু একই ঘটনার বর্ণনা শুনে ব্যারাকের অন্যান্য লোকেরা প্রথমে একটু থমকে গিয়েছিল। কেউ কেউ ভয়ও পেয়েছিল, কিন্তু বেশির ভাগ সহকর্মীই আমাদের পাগল আর মিথ্যেবাদী ব'লে বিদ্রূপ করেছিল।

যাই হোক, এরপর থেকে ব্যারাকে তাস খেলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ঐ দিনের ঘটনা নিয়ে কেউ খোলাখুলিভাবে আলোচনাও করতো না। তবে চাপা গুঞ্জন তল্লাটের সব কটা ব্যারাকেই চলত। আমাকে আর ভার্গবকেও সবাই যেন এড়িয়ে যেতে লাগল। ভার্গব অবশ্য এর অল্প কয়েকদিন পরেই এক জিপ দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু আমি এখনো বেঁচে আছি, আর সেদিনের দুঃসহ স্মৃতির বোঝা বয়ে চলেছি। এখনো মাঝে মাঝে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটি স্বপ্নে দেখে ঘুম ভেঙে যায় আর আতঙ্কে হিম হয়ে উঠে বসে বিনিদ্র রজনী কাটাই।

জবানবন্দী

অসিতকুমার চৌধুরী

রিটায়ার করার পর তমালবাবু মামুদপুরের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ পেলেন। সেখানেই তাঁকে থাকতে হবে। মামুদপুর ট্রেনে হাওড়া থেকে দ্-আড়াই ঘণ্টার পথ। জায়গাটা ভালই লাগল তমালবাবুর।

প্রকল্পে কাজ করেন চারজন ডাক্তার, একজন টাইপিস্ট, ক্যাশিয়ার, জনা ছয়েক কেরানী। তাছাড়া কজন ট্রেনি নার্সও আছেন। তমালবাবুর কাজ হলো কেরানীদের কাজকর্ম দেখাশোনা করা।

ডাক্তাররা প্রায় সবাই নতুন পাশকরা ছেলে-ছোকরা মানুষ। দারুণ উৎসাহেই তাঁরা কাজ করেন। প্রকল্পের প্রধান, ডাক্তার সেন থাকেন কলকাতায়। প্রায় সপ্তাহেই কদিনের জন্য এসে কাজকর্মের তদারক করেন। সাধারণের চাঁদায় প্রকল্পের কাজ চলে। কিছু সরকারী অনুদানও পান ডাক্তার সেন।

মাসকতক বেশ ভালভাবেই কেটে গেল তমালবাবুর। লোকজনের ব্যবহার ভাল।

কাজেরও তেমন চাপ নেই। তাছাড়া স্থানীয় কেরানীরাও ওঁকে যথেষ্ট সমীহ করে। থাকার ব্যবস্থা ভাল। মেস করে বাইরের সবাই থাকেন।

একদিন ডাক্তার সেন বললেন, তমালবাবু, নার্সদের ট্রেনিং-এর জন্য একটা কঙ্কাল আনতে হবে। ডাক্তার পাত্র যেতে রাজী হয়েছেন। আপনিও তাঁর সঙ্গে যান, ওটা কিনে আনুন গিয়ে।

কঙ্কাল কেনার কথাটা শুনে মনে মনে বেশ ভয়ই পেলেন তমালবাবু। একটা মানুষের আসল কঙ্কাল কিনে বয়ে আনতে হবে সঙ্গে করে! ব্যাপারটা যেন কেমন অস্বস্তি জাগাল ওঁর মনে।

ডাক্তার পাত্রের বয়স খুবই কম। হেসে বললেন, কেন মিছে ঘাবড়াচ্ছেন বলুন তো। নেড়েচেড়ে দেখে তো কিনব আমি। না হয় বাক্সটা বইবও আমি। আপনি শুধু সঙ্গে থেকে দরদামটা করবেন। তাতে অত ঘাবড়াবার কি আছে!

দোকানের মালিক একটার পর একটা কঙ্কাল এনে ওঁদের সামনে স্ট্যান্ডে টাঙিয়ে দিতে লাগলেন। তমালবাবু বিস্ফারিত চোখে সেগুলোর দিকে শুধু তাকিয়েই রইলেন। ওঁর বারবার মনে হচ্ছিল, ওগুলো একদিন মানুষের দেহ নিয়ে চলাফেরা করত। কে জানে ওদেরই কেউ হয়তো একদিন ওঁর পাশ দিয়েই হেঁটে গেছে। মনে মনে শিউরে উঠলেন তমালবাবু।

অনেক দেখাশোনার পর ডাক্তার পাত্র একটা কঙ্কাল পছন্দ করলেন। বললেন, এটা একটি মেয়ের কঙ্কাল। বোধহয় চোট পেয়ে মারা গেছিল মেয়েটি। তা হোক। এটাই নেব আমরা।

দরদাম করে কঙ্কালটা কেনা হলো। তারপর ওটাকে বাক্স-বন্দী করে ট্যাক্সিতে তোলার সময় তমালবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন ব্যথাভরা একটা দীর্ঘশ্বাস। চমকে উঠে উনি তাকালেন বাক্সটার দিকে।

ডাক্তার পাত্র হেসে বললেন, কি অত ভাবছেন বলুন তো? আপনাকে ওটা আর ধরতেই হবে না। স্টেশনে কুলি নিয়ে নেব। আর ওখানে পৌঁছে, ওটা আমিই বয়ে নিয়ে যাব সেন্টারে। মিছিমিছি চিন্তা করবেন না তো। সামান্য একটা কঙ্কাল।

ভয়ে ভয়ে তমালবাবু বললেন, আপনি যাই বলুন আর তাই বলুন, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, যার কঙ্কাল তার জীবনটা বড় দুঃখের ছিল।

হাসলেন ডাক্তার পাত্র। বললেন, হতেই পারে। দুঃখীদের কঙ্কালই তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। জীবনে সুখী যারা তারা আর এমন ভাবে কঙ্কাল হবে কি করে?

সন্ধ্যাবেলা কেন্দ্রে ফিরে এলেন ওঁরা দুজনে। তখনি গেটের কাছে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে। একটা আসল কঙ্কাল যে আনা হচ্ছে, তা মুখে মুখে চারদিকে রটে গেছিল এর মধ্যে। তাই দেখতে আশপাশের গ্রামবাসীরা এসেছে।

ডাক্তার পাত্র কঙ্কালটাকে অফিস-ঘরের স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দিলেন। কঙ্কালটা স্ট্যান্ডে দুলতে শুরু করল। যারা এতক্ষণ বেশি সাহস দেখাচ্ছিল তারা সবাই ছুটে পালাল। বাকিরা থতমত

খেয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

পরদিন থেকে নার্সদের ক্লাস শুরু হয়ে গেল। পড়াবার সময় কঙ্কালটাকে ক্লাসরুমে নিয়ে যাওয়া হতো। অন্য সময় ওটাকে রাখা হতো অফিস-ঘরেই।

সেঘরে বসেই তো কাজ করতে হয় তমালবাবুকে। তাই চেষ্টা করেও ওটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না তমালবাবু। কাজের ফাঁকে ফাঁকে থেকে থেকেই ওঁর নজর গিয়ে পড়ে কঙ্কালটার দিকে। আর তখনি ওঁর বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুভূতি জাগে। ভয় আছে তাতে, তাছাড়া আছে আরও একটা ভাব যা ওঁকে বারবার বলে মেয়েটা জীবনে সুখ পায়নি। ও তাই ওর দুঃখের কথা শোনাতে চায়। এ কথা কাউকে বলতে পারছিলেন না তমালবাবু। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়েই ওঁর দিন কাটছিল।

কদিন পরে টাইপিস্ট মুখার্জীবাবু এসে বললেন, আপনাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, আমি রোজ শেষে অফিস থেকে বার হই। নিজের হাতে তালা লাগাই দরজায়। চাবিটা নাইট গার্ড কিস্কুকে দিয়ে যাই। অথচ রোজ এসে দেখি রাতে কে আমার টাপরাইটারটা ব্যবহার করেছে। আমার হাতের মেশিন অন্যে ব্যবহার করলে আমি টের পাই।

কিস্কুকে ডেকে তমালবাবু ধমকালেন। বললেন, আর যেন সে টাইপরাইটারটা ব্যবহার না করে। টাইপ শিখতে হলে ও তো বর্ধমানে গিয়ে দিনের বেলা শিখতে পারে। ওর তো রোজ নাইট ডিউটি।

কিস্কু থতমত খেয়ে বলল, স্যার রাতে তো আমি ওঘরে ঢুকি না। মুখার্জীবাবুর খুব সাহস, তাই সন্ধ্যের পর একা ওঘরে বসে টাইপ করেন। কঙ্কালটা দেখলেই আমার ভীষণ ভয় করে।

তমালবাবু ভাবলেন, ধরা পড়ে গিয়ে কিস্কু নিজের দোষ কাটাবার জন্যই এসব কথা বলছে। কিন্তু আজ এই ধমক খাওয়ার পর আর সে নিশ্চয়ই ও মেসিনে হাত দেবে না।

বেশ কদিন কিছুই আর ঘটল না। কিন্তু তারপর একদিন মুখার্জীবাবু ভীষণ রাগ করে বললেন, আপনি যদি এখনি ব্যবস্থা না নেন তো টাইপ মেশিনটা খারাপ হলে তার দায়িত্ব আমি নেব না। ও তো আবার রোজ রাতে টাইপ করা শুরু করেছে। বিনা পয়সায় হাত পাকাবার সুযোগ ও ছাড়বে কেন?

অগত্যা কিস্কুকে বদলি করলেন তমালবাবু নিতাইয়ের জায়গায়। আর নিতাইকে আনলেন ওর জায়গায়। নিতাই তেমন লেখাপড়া জানে না। টাইপরাইটার চালাবার প্রয়োজন হবে না ওর।

দুদিন পরে নিতাই এল ওঁর কাছে। এদিক ওদিক দেখে বলল, স্যার আমি অফিস ঘরে রাতে ডিউটি দেব না। আমাকে অন্য কোথাও বদলি করেন।

অবাক তমালবাবু বললেন, কেন ওখানে তোমার অসুবিধাটা কি হচ্ছে?

একটু ইতস্তত করে নিতাই বলল, আজ্ঞে রাতে অফিস ঘরের মধ্যে কেমন যেন এক অদ্ভুত শব্দ ওঠে, খট খট খট খট, একটানা শব্দ। ও শব্দ যে কোথা থেকে আসে কে জানে!

তমালবাবু হেসে বললেন, ইঁদুর-টিদুর হবে। ওর জন্য তোমাকে আমি বদলি করতে রব না।

ব্যস্ত হয়ে নিতাই বলল, না স্যার না, ওঘরে ইঁদুর ঢুকবে কি করতে? তা ছাড়া একটানা মন শব্দ তো ওঠে টাইপ মেশিন থেকে, আমি জানি। শব্দ ওঠে অথচ ঘরের দরজা তো ইরে থেকে বন্ধ থাকে। তাহলে?

মনে মনে শিউরে উঠলেন তমালবাবু। কে অত রাতে বন্ধ ঘরে টাইপ করে? কই কঙ্কালটা াসার আগে তো এমন কথা কারও মুখে কখনও শোনা যায়নি! তবে কি......

তবুও মুখে হাসি এনে বললেন, বেশ, আজ রাতে যদি শব্দ ওঠে তো দরজাটা খুলে খবে। বন্ধ ঘরে ভূতে তো মেশিন চালায় না!

ব্যাজার মুখ করে নিতাই চলে গেল।

মাঝরাতে হঠাৎ কিস্কুর চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল তমালবাবুর। ও ঘরের ডাক্তারবাবুও র হয়ে এলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিস্কু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, শীগ্গির আসুন ্যার। নিতাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। আসুন জলদি।

অফিস ঘরের বারান্দায় নিতাই পড়ে আছে। অফিস ঘরের দরজা হাট করে খোলা। তমালবাবু দেখতে পেলেন রাতের বাতাসে অন্ধকারে কঙ্কালটা অল্প অল্প দুলছে। কেন যেন মনে হলো ওঁর, কঙ্কালটা ওঁর কানের কাছে সেই প্রথম দিনের মতোই গভীর দুঃখে নিশ্বাস ফেলল। কি যেন বলল ও। খুব ভয় পেয়ে গেলেন তমালবাবু।

ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে দেখলেন। না ভয়ের কিছু নেই। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতেই নিতাই চোখ মেলল। খানিকক্ষণ বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ডাক্তার পাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, নিতাই, কি হয়েছিল তোমার?

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নিতাই। বহুকষ্টে কান্না থামিয়ে বলল, স্যার রাতে আমি আর এখানে ডিউটি দেব না। ও ঘরে ভূত আছে। মেমসাহেব ভূত।

তার মানে? অবাক ডাক্তার পাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল ঠিক করে বল তো! ভূত আসবে কোথা থেকে? কি বলছ তুমি?

কান্না-মেশানো গলায় নিতাই বলল, রোজকার মতো মাঝরাতে ঘরের মধ্যে একটানা খটখট আওয়াজ উঠতেই ও স্যারের কথা মতো মনে সাহস এনে দরজাটা খুলেছিল। বাইরের আলো ঘরের মধ্যে পড়তেই টাইপ মেশিনের সামনে বসে থাকা এক মেমসাহেব ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। কি করে মেমসাহেব ঘরে ঢুকল এ কথা যখন ও ভাবছে হঠাৎ মেমসাহেব বদলে গিয়ে সেখানে ওই কঙ্কালটা বসে আছে ও দেখতে পেয়েছিল। আতঙ্কে ও চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

কিস্কু বলল, সেই চিৎকার শুনেই ও ওর ডিউটির জায়গা থেকে ছুটে এসে দেখে নিতাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কঙ্কালটা কিন্তু হাওয়ায় দুলছিল তার জায়গাতেই।

কেউ কিছু বলার আগেই ডাক্তার মুখার্জী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই ওঁর মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ শোনা গেল। উনি বার হয়ে এলেন একটা কাগজ হাতে। বললেন, কাগজটা টাইপরাইটারে লাগানো ছিল। কেউ কিছু ওতে টাইপ করেছে। আলোয় কাগজটা নিয়ে গিয়ে পড়া হলো।

স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে তাতে, আমার নাম সিন্থিয়া ম্যাকডোয়েল। ক'বছর আগে ফ্রেডি ম্যাকডোয়েলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি ম্যাকগ্র জনসন কোম্পানীতে টাইপিস্ট ছিলাম। ফ্রেডির সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না আমি। ও ছিল ভীষণ লোভী ও অসৎ। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওকে বদলাতে। একদিন ওর সঙ্গে ঝগড়া হবার সময় ও হঠাৎ আমাকে ওর হকি স্টিক দিয়ে প্রচণ্ডভাবে মারে। রাগলে ওর জ্ঞান থাকত না। ওর সেই মারে আমি মরে যাই। টাকার লোভ দেখিয়ে ও ডাক্তার আলিকে দিয়ে আমার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে লিখিয়ে নেয়। সেই রাতেই আমাকে কবর দেওয়া হয়। আর সেই রাতেই কবর-চোররা আমাকে কবর থেকে তুলে নিয়ে যায়। আমি বিচার চাই। আমার বাবা খুব গরীব। তিনি থানায় ডায়েরি করেছিলেন, আমার মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে। থানা কিছুই করেনি। আমি আপনাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। আপনারা কিছু করুন দয়া করে। তা না হলে আমার মুক্তি নেই।

ডাক্তার সেনের চেনাজানা কজন পদস্থ পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে নতুন করে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। কবরখানায় গিয়ে সিন্থিয়ার দেহাবশেষ পাওয়া গেল না। কবর খালি। ফ্রেডি আর আলিকে তখন থানায় এনে জেরা করা শুরু হলো। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে দুজনেই তাদের দোষ স্বীকার করল।

সিন্থিয়ার কঙ্কালটাকে আবার যথাযথ ধর্মীয় আচারে তাঁর কবরে শুইয়ে দেওয়া হলো। এর পর থেকে আর কেউ কখনই ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাতে টাইপ মেশিনে কাজ করেনি।

ভূতের কাছারি

মুরারিমোহন বেদান্তাদিতীর্থ শাস্ত্রী

ছেলেবেলায় ঠাকুমা ও দিদিমারা নাতি নাতনিদের ভূতের গল্প বলে ঘুম পাড়াতেন। সত্যি সত্যি বাচ্চা ছেলেদের যদি ভূতের কোন গল্প বলা যায়— ছেলে যতই দুষ্টু হোক না কেন ভূতের নাম শুনলেই অস্থির হয়ে পড়ে। আদপে ভূত বলে কোন বস্তু আছে কিনা সন্দেহ থাকলেও কিন্তু আছে। পুরাকালে যে সমস্ত মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটেছে বা ঠিকমত শ্রাদ্ধ শান্তি না হয়ে থাকলে বা তাদের দুষ্টু কর্মের জন্য, তাদের উর্দ্ধ গতিতে বাধা সৃষ্টি হয় ফলে তারা আকাশ মার্গে বায়বীয় দেহে আনাচে-কানাচে গাছপালায়, পায়খানায়, মাঠে. ধানক্ষেতে, বট ও অশ্বত্থ গাছে আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং সেইখান থেকেই নানা প্রকার আকার ইঙ্গিতের দ্বারা মানুষের সংসার জীবনকে অতিষ্ঠ করে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেয়। এই ভাবেই আমাদের দেশে ভূতের রাজ্য চলে আসছে অনেক দিন থেকেই। মানুষ ভূতকে ভয় পায়। ভূতও মানুষকে ভয় পায়।

আজ থেকে প্রায় একশ বৎসর আগের সত্য ঘটনার কথা বলছি— পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া

ভূতের কাছারি

জেলার ঘাল্না গ্রামে একটি ভূতের কাছারি ছিল— অর্থাৎ বহু প্রকাবের ভূত এসে জড়ো হত একটি অশ্বত্থ গাছের তলায়, মধ্য রাত্রিতে আন্দাজ এক ঘটিকা থেকে তিন ঘটিকার মধ্যে তারা উপস্থিত হত। ধারাবাহিকভাবে প্রতি শনি এবং মঙ্গলবার এবং জনসাধারণের কিছু উপকারের ইচ্ছায় সেবা করত— দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের, যেমন— পাড়ার একটি মোড়ল তাঁর নাম হচ্ছে যুগল খাঁ বাড়ীতে অনেকে তার ওপর নির্ভরশীল। সে একমাত্র রোজগারী, মারা গেলে সংসারটা ভেসে যাবে। তার জন্য গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা দুঃখিত ও চিন্তিত। কি করে তাকে বাঁচান যায়। তখনকার দিনে ইংরেজী শাসনে গ্রামে গঞ্জে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু হয়েছে। লোকটি কিন্তু মধ্য বয়সী। ডাক্তার, বদ্দি, হাকিমী, কবিরাজী চিকিৎসা সবই একে একে ফেল করল। কোন চিকিৎসা তার কাজে লাগল না। সকলেরই ধারণা ও আর বাঁচবে না। মিছিমিছি চেষ্টা করা। এক্‌জন বৃদ্ধা দূর গ্রাম থেকে এসে বলল, তোমরা অনেক কিছু করলে কিন্তু ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলে না। আমার একটা কথা শোনো আমি বলে যাই। কাল শনিবার অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে তোমরা এই রোগীটাকে নিয়ে গ্রামের ষষ্ঠীতলায় অশ্বত্থ গাছের চৌমাথায় যদি রাত্রি বারোটার মধ্যে রেখে আসতে পার তাহলে ওখানে ভূতেদের কাছারি বসে, অনেক সেরা জাতের ভূত আসে এবং কিছু কিছু রোগীদেব ঔষধ দিয়ে যায়। শুনেছি আমরা ডাক্তার-ফেরৎ মানুষদের আরোগ্য জীবন ফিবে আসে। বুড়িটার কথা শুনে বাড়ীর লোকেরা ঠিক করল আগামীকাল অমাবস্যায় রোগীটিকে নিয়ে রাত্রি বারোটার মধ্যে ষষ্ঠীতলায় রেখে আসবে। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, কোলের মানুষকে চিনতে পারা যায় না এমন অবস্থায় রোগীটিকে নিয়ে সেই গাছতলায় ফেলে রাখল। ফেলে রাখার সময় দেখে, সেখানে ভীষণ ঝড়ে গাছের পাতাগুলো সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে। যে কজন সেখানে রোগীকে নিয়ে গেছিল তারা ভয়ে পালিয়ে গেল ও রোগীটি আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রইল। মহারাত্রি (একটা থেকে দুটো) দারুণ রাত্রি। সেই রাত্রিতে একের পর এক ভূত এসে হাজির হলো এবং রোগীটিকে ঘিরে শলাপরামর্শ হল এবং তাদের মধ্যে ঠিক হল রোগীকে সুস্থ করে তোলা হোক। ঔষধ খাইয়ে দিল এবং কাপড়ে কিছু ঔষধ বেঁধে দিয়ে আবার ধরাধরি করে তার বাড়ীর উঠানে ফেলে দিয়ে গেল। পর দিন সকালে ঘরের লোকেরা দেখতে পেল কর্তা বাড়ীর উঠানে পড়ে আছে। তার শরীর হিমের ঠাণ্ডায় একেবারে জড়সড়। মাঝে মাঝে চোখের পলক ফেলছে এবং হাঁ করছে। বাড়ীর লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বদ্দিকে ডাকল। সে এসে বলল রোগী বেঁচে আছে, মেয়েরা একটু গরম দুধ নিয়ে এসে ওর মুখে ঢেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর স্পন্দন বাড়তে লাগল। ডাক্তার খুব আশ্চর্য বোধ করল। এইভাবে ভূতের কাছারির মাহাত্ম্য জনে জনে প্রচার হতে লাগল এবং শাস্ত্র কথায় ভূতকে যে দেবযোনীবিশেষ বলা হয় এই শাস্ত্রকথা সত্যে রূপ দিল এবং তখন থেকেই গ্রামের

কারো কোন কঠিন ব্যাধি হলে কাছারিতে নিয়ে ফেলত। ভূতেরা বিচার করে দেখত রোগী বাঁচবে কি মরবে। বর্তমান যুগেও সেই ঘাল্না গ্রামে ভূতের কাছারির গল্প ছেলে বুড়ো সকলেরই মনে শিহরণ সৃষ্টি করে। আর এখনও সেই গাছ তলায় প্রদীপ জ্বেলে ও ভালমন্দ খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এই বিজ্ঞান প্রভাবিত সংসারে ভূতের কথা মানুষের মনে প্রবল অনুভূতি সৃষ্টি করে। ছেলেমেয়েরা এখনও সেই স্থান দিয়ে ভরদুপুরে বা সন্ধ্যায় আনাগোনা করে না পাছে তাদের ভূতে ধরে। এই হল আমাদের মরজীবনের ভূতের কাহিনী, জড়িত হয়ে আছে সাড়া দুনিয়ায়।

পিণ্ডিদান

প্রবোধ নাথ

অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর পথটাই বেছে নিল পরান সাহা। বাপের দেওয়া কিছু টাকা ছিল। ছোটবেলার বন্ধু বিশু মল্লিক ব্যবসা করবে বলে স্ট্যাম্প পেপারে সই দিয়ে টাকাটা নিল মোটা সুদের লোভ দেখিয়ে। সুদও দিল ক'মাস। তারপর রাতারাতি ব্যবসা গুটিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিল বিশু মল্লিক, সাত তল্লাট গরু খোঁজা খুঁজেও তার পাত্তা পেল না পরান সাহা। টাকার শোকে আর অভাবের জ্বালায় ঠিক করলো পরান, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে বরং সুইসাইড করা ভাল। ছেলেকে ডেকে বললো, বাবা ঘনশ্যাম, বিশু মল্লিক আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা ধার নিয়ে যে কাগজখানায় সই করেছে ওখানা আছে আলমারিতে। পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সইও আছে। যত্ন করে রাখিস কাগজখানা। বেঁচে থাকতে তো আমি ওর দেখা পেলাম না, তবে বিশু মল্লিক বেঁচে থাকলে ওর সঙ্গে তোর দেখা করাবোই। সেদিন কাগজখানা দেখিয়ে টাকাটা কিন্তু আদায় করিস।

ঘনশ্যাম বাপের কথাটা ঠিক বোঝে না, তবু ঘাড় কাত করে।

আর একটা কথা, পরান বলে, আমি যদি হঠাৎ মারাও যাই, মরতেই পারি মানুষের জীবন তো, তবে যেন তড়িঘড়ি গয়ায় পিণ্ডি চড়িয়ে বসবি না। পাক্কা দুটি বছর অপেক্ষা করবি বিশু মল্লিকের জন্য। দেখা না পেলে তখন যা ভাল বুঝিস করবি। কেমন!

আর সে রাতেই ভাগীরথী এক্সপ্রেসে গলা দিল পরান সাহা।

অপঘাতে মৃত্যু। মরলেই ভূত। প্রথমটাই যা একটু কষ্ট, তারপরই শরীরটা একদম পাখির পালকের মতো হালকা। ভূত হয়ে রেল লাইনের ধারে এক দীঘল শেওড়া গাছে একনাগাড়ে সাত রাত সাত দিন ঘুমিয়ে কাটালো পরান। বেঁচে থাকতে ভাবনায় চিন্তায় কত রাত ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। ঘুমিয়ে এখন শরীরখানা শান্ত হলো, সুস্থির হলো। মনে পড়লো বিশু মল্লিকের কথা। ও শয়তানটার জন্যেই আজ তার এ ভূতের দশা। ঠিক করলো প্রথমে গ্রামেগঞ্জে ওকে খুঁজে দেখবে। এখন তো আর হাঁটা চলার বালাই নেই। শুধু মনে মনে ভাবলেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং বেঁচে থাকলে বিশু মল্লিককে খুঁজে বার করতে সময় লাগবে না।

তার আগে একবার ছেলে ঘনশ্যাম ও বৌকে দেখার বাসনা হলো পরান সাহার। কেমন আছে ছেলেটা বাপকে হারিয়ে।

শেওড়া গাছ ছেড়ে হাওয়ায় ভেসে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললো পরান সাহা। গ্রামে ঢুকতেই দেখলো চণ্ডীতলার মাঠে অনেক লোকের ভিড়। ছেলে ঘনশ্যাম একটা চেয়ারে বসে আছে তার বাপের ছবির সামনে চুপটি করে। এটা তবে তার শোকসভা হচ্ছে। পরান সাহা ভাবল, বাঃ! খুব ভাল তো । একটু না হয় বসে দেখাই যাক কি দিয়ে কি করে গেরামের মানুষ। মাঠের ধারে একটা গাব গাছে পা ঝুলিয়ে বসলো পরান।

সভায় লোকজন মন্দ হয়নি। মাইক লাগিয়ে কার্তিক সভা ম্যানেজ করছে। বলছে, পরান সাহার এ শোকসভার আয়োজন করেছেন আমাদের গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজদরদী হরগোবিন্দবাবু। তিনি এখুনি এসে পড়বেন। আপনারা দূরে না দাঁড়িয়ে থেকে সভায় এসে বসুন।

হরগোবিন্দবাবুকে চিনতো পরান। বিশু মল্লিকের শালা। বিশু মল্লিক ফেরার হওয়ার পর বোনের সংসার বাঁচাতে হরগোবিন্দবাবু সেই যে সে সংসারে গিয়ে উঠলো আর ফিরে যায়নি নিজের বাড়িতে। এখানে থেকেই ভগ্নীপতির ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিশাল করে তুলেছে। চেহারায় সাধক সাধক ভাব। কাঁচা পাকা এক জঙ্গল দাড়ি গোঁফে মুখখানা ঢাকা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মুখে রাধাকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনো বুলি নেই। বেঁচে থাকতে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে পরান সাহার। মানুষটাকে মোটেই ভাল লাগতো না তার। সব সময় চোখে মুখে যেন কি খাই কি খাই ভাব।

কার্তিক আবার ঘোষণা করলো, এবার সভার কাজ শুরু হচ্ছে। সভাপতির আসনে এসে বসবেন মহামান্য শ্রীহরগোবিন্দ বিশ্বাস।

হরগোবিন্দবাবু সভাপতির চেয়ারে এসে বসলো। তাকে দেখে পরান সাহা এমন চমকে

উঠলো যে গাছের ডাল থেকে হড়কে নিচে পড়ে যাওয়ার যোগাড়! ব্যাটা, তুমিই তবে হরগোবিন্দবাবু! শয়তান, চোর, জোচ্চোর! হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগলো পরান সাহা।

হয়েছে কি, মরে ভূত হওয়ার পর পরান সাহা একটা অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে। এটা অবশ্য সব ভূতেরাই পায়। সে দৃষ্টি দিয়ে ভূতেরা অনেক অজানা জিনিস, অদেখা বস্তু জানতে পারে, দেখতে পায়।

ওই যে ঘড়িটা হাতে দিয়ে সভা ম্যানেজ করছে কার্তিক ওটা পরানেরই ঘড়ি। লাইনে গলা দেওয়ার পরদিন সকালবেলা কার্তিকই ওকে প্রথমে দেখতে পায়। দেখে ওর হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিজের হাতে পরে তবেই গ্রামে গিয়ে খবর দেয়।

কার্তিকের পরে ও পথে আসে নৃপতি। পরানকে মরে পড়ে থাকতে দেখে দুঃখ করে। এদিক সেদিক তাকিয়ে পরানের পকেট থেকে দুটাকা পঞ্চান্ন পয়সা তুলে নিজের পকেটে ভরে গ্রামে ফিরে ঘনশ্যামকে খবরটা দিয়ে কর্তব্য সারে।

সে যা গেছে যাক। তার জন্য পরান মোটেই ভাবিত নয়। কিন্তু ওই হরগোবিন্দ! এক মুখ গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের আড়ালে নিজের আসল মুখখানা ঢেকে চেহারাখানা পাল্টে বিশু মল্লিকই কিনা আজ দু'বছর ধরে হরগোবিন্দ সেজে দিব্যি নিজের সংসারে সুখে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে ঘুণাক্ষরেও কি জানতে পেরেছিল এটা পরান সাহা! সে তখন কতদিন গেছে বিশু মল্লিকের দোকানে জিনিস কিনতে। মাঝে মাঝে শুনিয়েছে তার ভগ্নীপতির টাকা মারার কাহিনী। শুনে মাথা নেড়ে তাকে শুধু কেষ্ট নাম শুনিয়েছে হরগোবিন্দ।

যাক, আত্মহত্যাটা তবে সার্থক হয়েছে পরান সাহার। ভূত হয়েছে বলেই চিনতে পারল বিশু মল্লিককে। এখন গ্রামের পাঁচজনের কাছে ব্যাটার পরিচয়টা ফাঁস করাতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

ছেলে বৌয়ের সঙ্গে দেখা করার বাসনা ত্যাগ করে পরান নদীর ধারে শ্মশানঘাটের পঞ্চবটের মগডালে গিয়ে বসলো। ওখানে দেখা হলো ছোটবেলার বন্ধু ফেলুরামের সঙ্গে। বছর দশেক আগে শান্তিপুর-কালনা ফেরি ঘাটে নৌকাডুবিতে মারা গিয়েছিল ফেলা। পরানের মুখে সব শুনে ফেলা লাফিয়ে উঠলো, বললো, চল, এখনি ব্যাটার ঘাড় মটকে আসি।

দূর, তাহলে আমার টাকাটা আদায় হবে? প্রথমে ওর গোঁফ দাড়ি কামিয়ে গ্রামের পাঁচজনের কাছে পরিচয়টা ফাঁস করতে হবে যাতে ঘনশ্যাম টাকাটা আদায় করতে পারে।

বুঝলাম, কিন্তু আমাদের যে লোহা ছোঁওয়া বারণ। নইলে খুরের একটানে হরগোবিন্দে মুখের জঙ্গল সাফা করতে কতক্ষণ।

না ওভাবে হবে না। এমন রাস্তা বার করতে হবে যেন ব্যাটা নিজেই নিজের দাড়ি গোঁফ কাটতে বাধ্য হয়।

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে দু'জনে আবার চণ্ডীতলার মাঠে এসে গাব গাছের ডালে বসে। সভা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। হরগোবিন্দ ঘনশ্যামকে কাছে ডেকে কি যেন বলছে। কি বলছে শোনার বাসনা মনে পোষণ করতেই পরান সাহা গাছের ডালে বসেই শুনতে পায়

হরগোবিন্দ বলছে, খরচ খরচা হবে বলে পিণ্ডি দেবে না? তোমার বাবা যে তবে নরকে পড়ে পচবে হে! যাও মাকে নিয়ে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ঘুরেও এসো আর পিণ্ডিটাও দিয়ে এসো। টাকার জন্যে ভাবছো কেন, আমি তো আছি। দেখ আমার ভগ্নীপতির সই করা একটা কাগজ আছে তোমার বাবার আলমারিতে। ওখানা আমায় এনে দিলেই আমি তোমাকে হাজার টাকা অমনি দিয়ে দেব।

কিন্তু বাবা যে কাগজখানা খুব যত্ন করে রাখতে বলেছে দু'বছর, ঘনশ্যাম বলে।

কি লাভ! হরগোবিন্দ অল্প হাসে, বিশু মল্লিক কি আর কোনোদিন ফিরবে ভেবেছো? আর সে না ফিরলে ও কাগজখানার মূল্যই বা কি! তার চেয়ে তুমি বরং কাগজখানা নিয়ে কাল বা পরশু আমার বাড়িতে এসো, আমি নয় তোমাকে দেড় হাজার টাকাই দেব।

বেশ, ভেবে দেখি। মাকেও জিজ্ঞেস করি মা কি বলে।

ভাবো, তবে বেশি দেরি করো না। যা করার কাল পরশুর মধ্যেই করো। আমি আবার কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাব কিনা!

শুনে পরান আর ফেলুরাম ঠিক করলে যা করার দু'একদিনের মধ্যেই করতে হবে। কারণ লোভে পড়ে ঘনশ্যাম যদি কাগজখানা একবার হাতছাড়া করে আর টাকা পেয়ে গযায় গিয়ে যদি পিণ্ডি চড়ায় তবে বিশু মল্লিকেব পিণ্ডি চটকানোর আগেই নিজের দফা গযা।

এ অবস্থায় কি করা যায় বল তো ফেলুরাম? পরান বন্ধুব পবামর্শ চায়।

ও আমি ভেবে রেখেছি। হরগোবিন্দের দাড়িতে উকুন ছাড়তে হবে যাতে ব্যাটা উকুনেব কুটকুটুনিতে ছটফটিয়ে দাড়ি কাটতে বাধ্য হয়।

বুঝলাম। কিন্তু আমরা উকুন পাবো কোথায়? ভূত হয়ে তো আমাদের সকলেরই নেড়া মুণ্ডি।

সেও আমি ভেবে রেখেছি। আমার নাতনী পুঁটির মাথা ভরা উকুন। ওখান থেকে চাট্টি এনে হরগোবিন্দের দাড়িতে ছাড়লেই হবে।

দূর! পরান সাহা মাথা ঝাঁকায়, ও সব পাতি উকুনে হরগোবিন্দের কিচ্ছু হবে না। সরু চিরুনি চালিযে কিংবা উকুন মারার ওষুধ লাগিয়ে উকুন তাড়াবে। আসল চীনে উকুন চাই।

ওখানে বসেই অন্তর্দৃষ্টি চালিয়ে তাও বার করলো ফেলুরাম। মানকুণ্ডুর পাগলা গারদের এক পাগল, উকুনের জ্বালাতেই বেচারা পাগল হয়েছে, ওর মাথা ভর্তি চীনে উকুন। ডাক্তাররা দিন ওকে ঘুমের ইন্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। জেগে থাকলেই শুধু চুল ছেঁড়াছিঁড়ি ... চিৎকার। ওর মাথা থেকে চাট্টি উকুন এনে ঘুমন্ত হরগোবিন্দের দাড়িতে ছেড়ে দিল ফেলুরাম। দিযে দু'জনে গাব গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

উকুনের কুটকুটুনিতে ঘুম ভেঙে গেল হরগোবিন্দবাবুর। এ কি আপদ রে বাবা! এত যত্ন করার পরও কিনা দাড়িতে উকুন! বিছানায় বসে আয়না সামনে ধরে দাড়িতে সরু চিরুনি চালালো কতক্ষণ, তারপর আবার ঘুমুতে গেল। কিন্তু উকুনের কামড়ানিতে দু'চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্যেও সারা রাত এক করতে পারলো না।

পিণ্ডিদান

ভোরের আলো ফুটতেই ডেটল, উকুন মারার ওষুধ আর কার্বোলিক সাবান নিয়ে হরগোবিন্দ বাথরুমে ঢোকে। ওষুধ মেখে, দাড়িতে সাবান ঘষে তিন ঘণ্টা স্নান সেরে বাথরুম থেকে যখন হরগোবিন্দ বের হলো ছোবড়ার ঘষটানিতে মুখখানা টকটকে লাল। ভাবলো বুঝি নিশ্চিন্ত। কিন্তু চীনে উকুন এত সহজে কাবু হওয়ার পাত্র নয়! আর হরগোবিন্দের মতো এমন নধরকান্তি মানুষের সুস্বাদু রক্ত, উকুনদের যেন ভোজবাড়ির নেমন্তন্ন। তবে কিনা দিনের আলো ফুটলে ওরা হাত পা খেলিয়ে একটু বিশ্রাম করে। তাই হরগোবিন্দের দিনটা কাটলো ভালয় ভালয়। কিন্তু সন্ধ্যের পরেই চুলকুনি বাড়লো। ঘুমুলে পরে দাড়ির জঙ্গলে শুরু হলো বাঘ ভাল্লুকের লড়াই। লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নামলো হরগোবিন্দ। এক পাক চর্কি নাচন নাচলো। তারপর খুঁজে এক শিশি 'টিকটোয়েন্টি' বার করে ঢাললো দাড়ি ভরে। ব্যস, চুলকানি একেবারে বন্ধ।

চীনে উকুন কিন্তু ভারী চালাক। টিক টোয়েন্টির উগ্র গন্ধ পেয়ে একদম দাড়ির গোড়ায় গিয়ে লুকোলো সবকটা। কোনোটা আবার গোড়ার গর্তে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। ওষুধের তেজ সরতেই শুরু হলো দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে তাণ্ডব নৃত্য। গেছিরে গেছিরে চিৎকারে হরগোবিন্দ নাচতে লাগলো উইচিংড়ের মতো।

ভোরের আলো ফুটলেই হরগোবিন্দ দাড়িকাটার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। গ্রাম ছেড়ে লোপাট হওয়ার পর প্রায় আজ আড়াই বছর দাড়ি গোঁফ কাটেনি হরগোবিন্দ। এখন কেটে শান্তি।

দাড়ি গোঁফ কামিয়ে গন্ধ সাবান মেখে স্নান করতে করতে যেন আপনা থেকেই দু'চোখ বুজে আসতে লাগলো। এমন সময় স্নানঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চাকর খবর দিল, বাবু, ঘনশ্যামবাবু এয়েচেন একখানা কাগজ হাতে করে। আপনি নাকি কাগজখানা কিনবেন বলেছিলেন।

শুনেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে হরগোবিন্দ। স্নান সেরে কোনো রকমে গায়ে জামা-কাপড় চড়িয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে বলে, এনেছো? বেশ বেশ, দাও কাগজখানা। বাপের পিণ্ডি দিতে যাবে বলে কথা, ও তোমাকে আমি আরও পাঁচশো টাকা বেশিই দেব।

হরগোবিন্দের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ঘনশ্যাম। অবাক হয়ে বলে, আপনি! আপনিই তবে বিশু মল্লিক! দাড়ি গোঁফে মুখ ঢেকে হরগোবিন্দ সেজে দিব্যি এতকাল চালিয়ে দিলেন! আর আমার বাবা বেচারা অকালে প্রাণ দিয়ে মরলো!

হরগোবিন্দ ওরফে বিশু মল্লিক থমকে যায়।

ঘনশ্যাম উঠে দাঁড়ায়। কাগজখানা বুকে চেপে ধরে বলে, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আসছি পাড়ার পাঁচজনকে নিয়ে। বাবার পিণ্ডিদান করতে আপনি আমায় গয়ায় পাঠাচ্ছিলেন, এখন ফিরে এসে আপনার পিণ্ডি চটকাবো। দুমদাম পায়ের আওয়াজ করে ঘনশ্যাম বেরিয়ে যায়।

গালে হাত বোলাতে বোলাতে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বিশু মল্লিক। বসে সামনের দেওয়াল আয়নার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

ভুতুড়ে মৌমাছি

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

কত বিচিত্র কারণে কখনও কখনও এমন কিছু ঘটে যায় যা মানুষ বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমনি একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে একশ বারো বছর আগে— ১৯৬৫ সালে এক সেপটেম্বরের সন্ধ্যায়। রচেষ্টারের ওয়াশিংটন হল লোকে লোকারণ্য. তিল পর্যন্ত রাখার জায়গা নেই। সে যুগের বিশ্বের দুই সেরা বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়— লুই ফক্স আব জন ডিয়ারি সেদিন বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছেন। ঠিক এক বছর আগেও তাঁদের মধ্যে খেলা হয়েছিল কিন্তু সে খেলা শেষ হয়নি। বিজয়ী যে কে তাও ঠিক হয়নি। তাই এই ফাইন্যালে চমক আরও বেড়ে গিয়েছে। হলের গেট অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে ভিড়ও জনতার সমুদ্রে রূপ নিয়েছে। খেলার ফলাফল শোনার জন্য তাঁরা চঞ্চল হয়ে আছে। ভেতরেও উৎসাহী দর্শকদের বাঁধ ভাঙো ভাঙো অবস্থা।

খেলা শুরু হ'ল। দর্শকদের মধ্যে নেমে এল অদ্ভুত নীরবতা। মুগ্ধ নয়নে কৌতূহলী

ক্রীড়ামোদীরা অবাক হয়ে দেখছে দুই বিলিয়ার্ড যাদুকরের কৌশল। দুজনেই সমান সমান।

প্রথম পালা পড়ল লুই ফক্সের। ফক্স তাঁর বিলিয়ার্ড দণ্ডটি দিয়ে অনুপম কায়দায় একের পর এক মেরে চলেছেন। পয়েন্টের অঙ্ক একশো, দুশো, তিনশো করে বেড়েই চলেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী যেন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কোন রকমে তিনি যুঝে চলেছেন। নিশ্চিত হার। ফক্সের পালা শেষ হয় হয়। আর একটা সোজা মার বাকী। ফক্স এটা ঠিকমত মারতে পারলে নির্ঘাৎ জয়ী হবে। উত্তেজনায় নির্বাক দর্শকরা অপেক্ষা করছে সেই মারটির জন্য। চারপাশ নিস্তব্ধ নিঝুম। জয়ের আশায় উৎসাহী ফক্স এগিয়ে চলেছেন বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে তার শেষ মারটির জন্য। দর্শকরাও তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে! সারা পৃথিবীর মানুষের সংবর্ধনা পাওয়ার সুখ-স্বপ্নে ফক্সের প্রাণ-মন দুলে দুলে উঠছে। আর ওদিকে পরাজয়রত ডিয়ারি আনত ম্লান মুখে অপেক্ষা করছে সেই অভিশপ্ত মুহূর্তটির জন্য।

লুই ফক্স হাতের কিউটি দিয়ে তার শেষ মারটি মারতে যাবেন, এমন সময় কোথা থেকে যেন ছোট্ট একটা মৌমাছি গুন্ গুন্ শব্দে বিলিয়ার্ড টেবিলের দিকে উড়ে এল। তার হাল্কা পাখা দুটি নিয়ে উড়তে উড়তে, ঘুরতে ঘুরতে সে বলটির উপর গিয়ে বসল। মুচকি হেসে ফক্স হাত দিয়ে মৌমাছিটি তাড়িয়ে আবার রেডি হলেন বলটি মারার জন্য। কিন্তু এ কী ব্যাপার! আবার সেই মৌমাছিটা ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠিক সেই বলটির উপর বসে পড়ল। ছোট্ট এই মজার ঘটনায় চারপাশে হাসি ও গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ এই বিচ্ছিরি ঘটনায় ফক্স একটু বিরক্ত হলেন। বেয়াদপ মৌমাছিটাকে তাড়াবার জন্য ফক্স বলটাকে একটু ঠেলে দিলেন। এবার মৌমাছিটা গুন্ গুন্ করে ফক্সের নাকের পাশ দিয়ে ঘুরে একদম উধাও হয়ে গেল! কিন্তু ওদিকে ফক্সের অসতর্কতার জন্যই বিলিয়ার্ড টেবিলে বলটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে গড়িয়ে কয়েক ইঞ্চি দূরে সরে গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ফক্স তাঁর পালা হারলেন। গম্ভীরভাবে টেবিলের সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী ডিয়ারী টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি যেন তাঁর সকল হারানো উদ্যমকেই ফিরে পেয়েছেন। ধীরে ধীরে বেশ সতর্কতার সঙ্গে তিনি তার কিউ দিয়ে একের পর এক মেরে চললেন। আর পয়েন্টের পরিমাণও ক্রমেই বাড়তে থাকল। এতক্ষণ যে হারছিলেন হঠাৎ তার জয়ের আশা দেখে দর্শকরাও বিস্মিত হয়ে উঠল। দর্শকরা এবার ডিয়ারিকেই উৎসাহ দিতে আরম্ভ করল। হতচিত্ত পরাজিত ডিয়ারিব গম্ভীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। ক্রমে ডিয়ারি তার শেষ মারটি মেরে ফক্সের পয়েন্টের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেলেন। হাজার হাজার দর্শকের উল্লাসের মধ্যে ডিয়ারি বিশ্ববিজয়ী ঘোষিত হলেন।

আর ওদিকে লুই ফক্স পাথরের মূর্তির মত এক কোণে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভেবে চলেছেন কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। অর্থহীন দৃষ্টিতে ফক্স দর্শকদের উল্লাসের দিকে তাকিয়ে। দর্শকদের প্রচণ্ড চিৎকারের মধ্যেও তিনি সেই ছোট্ট মৌমাছিটার গুন্ গুন্ ধ্বনিই বেশি করে শুনছেন। সেই ধ্বনিই তার কাছে হলের সব কোলাহলকে ছাপিয়ে দিচ্ছে। যখন মনে করছেন

মৌমাছিটা যেন তাঁকে ঘিরেই উড়ে চলেছে। চঞ্চল হয়ে ওঠেন ফক্স। না, এর হাত থেকে ছাড়া পেতেই হবে। মুক্তি পেতেই হবে। এপাশে বিশ্ববিজয়ী ডিয়ারি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ফক্সের সামনে। কিন্তু ফক্সের সেদিকে খেয়াল নেই। উদাস দৃষ্টিতে ফক্স তাকিয়ে আছেন। তাঁকে সেই মৌমাছিটার গুন্ গুন্ ধ্বনি পেয়ে বসেছে। হঠাৎ ফক্স সেই ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে অন্ধকার গলি দিয়ে উদ্দেশ্যহীন পথে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু না তবু তার মনে হচ্ছে দর্শকদের চিৎকার আর মৌমাছির গুন্ গুন্ ধ্বনি তাঁর পিছু নিয়েছে। ক্লান্ত শ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ফক্স আর ছুটতে পারেন না। থেমে পড়লেন শহরের বাইরে একটা ছোট্ট পাহাড়িয়া নদীর উপর, ছোট্ট পুলের উপর। কাঠের পুল। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী। না এখনও ফক্সের নিস্তার নেই। ফক্স নদীর জলের সেই কুল কুল ধ্বনির মধ্যেও দর্শকদের উল্লাস ধ্বনি আব তাকে ছাপিয়ে ওঠা সেই মৌমাছিটার গুন্ গুন্ ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। না... আর সহ্য হয় না। ফক্সের মুখ থেকে অকস্মাৎ এই কথাটা বেরিয়ে আসে।

তারপর কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল তা কেউ জানে না। শুধু সবাই জানে তার পবদিন ভোরবেলায় সেই নদী দিয়ে যেতে যেতে প্রহরীরা দেখতে পায় প্রাণহীন নিথর ফক্সের শরীরটাকে। টুকরো পাথর খন্ডের খাদের মধ্যে সেটা আটকে আছে।

ইচ্ছাপূরণ

সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ গল্প হয়ত তোমরা অনেকেই পড়েছ। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর ইচ্ছাপূরণকে সত্য ঘটনা বলেন নি, কিন্তু আমার 'ইচ্ছাপূরণ' একেবারে খাঁটি সত্যের ভিত্তিতে লেখা। ঘটনাটি 'লাভলির' কাছে শোনা। তোমরা হয়ত ভাবছ লাভলি আবার কে? লাভলি চোদ্দ পনের বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে—তার একটা পোশাকি নাম নিশ্চয় আছে—সে নামটা স্কুলের খাতাতেই থাক। নাম জানতে পারলে তোমরা লাভলিকে যাকে বলে প্রশ্নবাণে উত্যক্ত করতে পার তাই নামটা জানালাম না—লাভলি একটা বড় স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী—স্কুলের নামটাও গোপন থাকল। গোয়েন্দাগিরি করে তোমরা লাভলিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা কর।

যা হোক, এবার গল্পে আসা যাক। কিন্তু তার আগে আর একটা ভূমিকার দরকার। লাভলির বাবা বড় উকিল, ঠিক মক্কেল পরিবৃত বলব না। তাঁর আশে পাশে বাড়ীতে, কাছারিতে সব সময় ছোট বড় উকিলরা তাঁকে ঘিরে থাকে। অভিমন্যুর মত জুনিয়রদের ব্যূহ ভেদ

করে ইচ্ছা থাকলেও তিনি বাইরে বেরুবার অবকাশ পান না। এইত কিছুদিন আগে লাভলির দিদির বিয়ে হল। ছেলে ইঞ্জিনিয়র, SAIL -এ কাজ করে। লাভলি ও তার জেঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেরা খুব আনন্দ করেছিল—বাবাকে কিন্তু বিয়ের দিন ছাড়া অন্য দিনও কোর্ট, কাছারি, মোকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। বাবার একমাত্র হবি 'Occult Science' ফলিত জ্যোতিষের চর্চা। অবসর সময়ে অর্থাৎ গভীর রাতে তিনি ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় ফলিত জ্যোতিষের বই পড়েন ও নোট করেন। বড়দিদি লিলির এ সব বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। লাভলিই বাবার 'হবিতে' সঙ্গদান করত। E. S. P. Extra Sensory Perception এর ওপর বাবার নোট পড়েছে। একজামিনের আগে বার বার ইচ্ছা করেছে যে প্রশ্নগুলি সে পড়েছে সেইগুলোই যেন পরীক্ষায় আসে। এক আধটা হয়ত এসেছে কিন্তু বেশির ভাগ আসেনি তাতে সে হতাশ হয়নি। আশা করে আছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সে পরীক্ষকদের দিয়ে তার জানা বিষয়গুলোর ওপর প্রশ্নপত্র তৈরি করাবে। লাভলির মাধ্যমিক পরীক্ষার এখনও দেরী আছে। অতএব সে কথা ছেড়ে মূল গল্পে আসা যাক। গল্পের শুরু লাভলির দিদির বিয়ের পর থেকে। দিদি জামাইবাবু নৈনিতালে হনিমুন করতে গেলেন এবং পনের দিন পরে ফিরে এলেন। বাবা ব্যস্ত থাকায় ওদের বাইরে বেরুবার অবসর খুব কমই হয়। দিদি নৈনিতাল থেকে ফেরার পর লাভলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিদির কাছ থেকে নৈনিতাল ভ্রমণের গল্প শুনেছে। ছবির মত নৈনিতাল শহর—হ্রদ, পাহাড়, মলের পাশে পাশে সাজানো দোকান। যা চাও তাই পাওয়া যায়। দিদি যে মোমের খেলনা এনেছিল সেগুলো লাভলিকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। তা ছাড়া রানীক্ষেত, আলমোড়া, কসৌনী—কসৌনীর অপূর্ব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।

লাভলির প্রতিদিন ঘুমোবার আগে ইচ্ছা করতে লাগল—যেন তাদের নৈনিতালে যাওয়া হয়। ইচ্ছা করার সময়টা দুমিনিট থেকে বাড়তে বাড়তে ২০ মিনিট হল। লাভলি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করত শোওয়ার পর যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত। সেদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। লাভলি শুনল কোনও ইংরাজ পুরুষের কণ্ঠস্বর—"Lovely, you love Nainital, come with me"—লাভলি তুমি নৈনিতাল ভালবাস, আমার সঙ্গে এস। যদিও কথাগুলো জড়ান—লাভলি ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী তার বুঝতে অসুবিধা হল না। সে বিছানা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, মনে হল একটা অদৃশ্য হাত তার দিকে এগিয়ে এল, 'Hold my hand' আমার হাত ধর। কিছুক্ষণ পর সে দেখল সে নৈনিতালের হ্রদের পাশে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সঙ্গে কেউ নেই। হ্রদ, দোকান, রাস্তা, পাহাড় ঠিক যেমন দিদির কাছে শুনেছে। ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারল সে স্বপ্ন দেখছিল। তবে কি তার ইচ্ছাপূরণ স্বপ্নের মধ্যেই হয়ে গেল। কদিন পর লখনউ থেকে মার কাছে চিঠি এল দাদুর শরীর খারাপ মেয়ে জামাইদের একবার দেখতে চান। সামনেই পুজোর ছুটি—মা নাছোড়বান্দা লখনউ যেতেই হবে এবং সেই অবসরে লখনউ থেকে নৈনিতাল ঘুরে আসা যাবে। সঙ্গে লাভলি যাবে, বাবাও রাজী হয়ে গেলেন। সেই রাতে লাভলি আবার স্বপ্ন

দেখল—ঠিক দেখা নয় স্বপ্নে শুনতে পেল। "Welcome to Nainital Lovely"লাভলি নৈনিতালে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

হাওড়া থেকে লখনউ, লখনউ থেকে ট্রেনে কাঠগুদাম—আর কাঠগুদাম থেকে ট্যাকসিতে নৈনিতাল—নৈনিতালে হোটেল বুক করা ছিল না। একদিনের জন্য একটা হোটেলে তারা জায়গা পেল। সেই রাতে আবার লাভলি স্বপ্ন দেখল না—না—স্বপ্নে শুনল সেই ইংরাজের স্বর—"Welcome to Nainital Lovely. Room No. 27 in Hotel S is booked for you. I shall wait for you". নৈনিতালে স্বাগত জানাই। হোটেল এস-এ ২৭ নং রুম তোমাদের জন্য ঠিক করা আছে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" লাভলি বাবা মাকে বলল হোটেল এস- এ চেষ্টা করলে কেমন হয়। হোটেল এস তাদের হোটেল থেকে কাছেই। ইংরাজদের আমলে তৈরি বিরাট হোটেল। বড় বড় বেড রুম, ড্রইং রুম, ডাইনিং হলে বল ডান্স করা হত মনে হল। রিসেপসনের মহিলা তাদের নাম, ঠিকানা, শুনে বললেন, "আপনাদের নামে চারদিনের জন্য ২৭নং কামরা রিজার্ভ করা আছে। পুরো চার্জও দেওয়া আছে।" তাঁরা আশ্চর্য হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। লাভলিরা ২৭নং কামরায় ঢুকল। বিরাট বেড রুম। বড় বড় খাট, পুরানো দিনের টেবিল, চেয়ার, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল। লাভলির মনে হল কেউ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তার কানে কানে বলছে, 'Welcome Lovely'—স্বাগত লাভলি—কড়া চুরুটের গন্ধ—মনে হল কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে কড়া চুরুট খাচ্ছে—কিন্তু মা বাবা নির্বিকার—চুরুটের গন্ধ নিশ্চয়ই তাঁরা পাননি—পেলে ঠিক বলতেন। গরম জলে চান করে ডাইনিং টেবিলে খেতে খেতে লাভলি অন্যমনস্ক হয়ে গেল—তাব মনে হল কোনও অশরীরী আত্মা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে প্লেট থেকে তাকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে কিন্তু এমনভাবে যাতে সে ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে না পারে।

খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারা হোটেল থেকে নীচে নেমে এল। লেকের পারে বেড়ান, মলের জিনিসপত্র দেখা ও কেনা চলতে লাগল। নৈনিতালে মোমের তৈরি শিল্পকর্ম বিখ্যাত। অনেক কিছু কেনার পর লাভলির মোমের একটা সুন্দর কুকুর পছন্দ হল। দরদাম করা হল—কিন্তু মার কাছে অত টাকা ছিল না। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বাড়ী থেকে টাকা এনে কুকুরটা নিয়ে যাওয়া যাবে না। মা দোকানদারকে কুকুরটা আলাদা কবে রাখতে বললেন—পরদিন নিয়ে যাবেন। বেশ অন্ধকার, কনকনে ঠাণ্ডা, আকাশে মেঘ জমেছে—শীতে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে পৌঁছে ঘরের তালা খুলে আলো জ্বালিয়ে তারা অবাক—লাভলির পছন্দ করা মোমের কুকুরটা টেবিলের ওপর রাখা, নীচে ক্যাশমেমোয় দোকানদারের নাম আর সে যে দাম বলেছিল সেই দামের প্রাপ্তির রসিদ। লাভলিরা সকলেই অবাক। তারা দোকান থেকে সোজা হোটেলে এসেছে—তার আগে অন্য কেউ এসে তালা খুলে ঘরে কুকুরটা রেখে আবার তালা বন্ধ করে কি করে উধাও হতে পারে। তারা হোটেল রিসেপশানে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের ঘরের চাবি তাঁরা আসার আগে অন্য কেউ

নেয়নি—রুম সার্ভিসের লোকেরাও জানাল তাঁরা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পরে তারা দুপুরে ঘর পরিষ্কার করেছে। বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে কেউ তাঁদের ঘরে যায়নি। বাবা মা সম্ভাব্য অনেক কিছুই আলোচনা করলেন কিন্তু কোনও জবাব মিলল না। ঠিক হল আগামীকাল ঐ দোকানে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত কিছু জানা যেতে পারে। লাভলির কিন্তু দৃঢ় ধারণা হল, যে অশরীরী তার সঙ্গে কথা বলে সেই হয়ত কুকুরটা তার জন্য এনে রেখে গিয়েছে। খাওয়া দাওয়া করে জল্পনা-কল্পনার পর তাঁরা শুয়ে পড়লেন। পরদিন সেই দাকানে গিয়ে দেখা গেল কুকুরটা নেই। প্রশ্ন করে জানতে পারা গেল একজন কম বয়সী ইংরাজ সাহেব কুকুরটি বেশি দাম দিয়ে নিতে চাইলেন। দোকানদার আপত্তি করেছিলেন, সাহেব তাতে বলেছিলেন তিনি কুকুরটা লাভলি মিস্ সাহেবার কাছে পৌঁছে দেবেন। দোকানদার তখন যে দাম ঠিক হয়েছিল সেই দামেই কুকুরটা দিয়ে দেন। দোকানদার তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কুকুরটা পেয়েছেন কি?" লাভলি হ্যাঁ বলতে তিনি স্বস্তি পেলেন। কি করে এসব সম্ভব হল তার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

সেদিনের ঘটনাগুলো আরও আশ্চর্যজনক। কি জানি কেন লাভলির মনে হল কোনও অদৃশ্য শক্তি তার ইচ্ছা পূরণ করছে। তার ধারণা কতদূর সত্যি পরীক্ষা করার জন্য লাভলি সারাদিন নানা রকম ইচ্ছা করে গেল। গাড়ী, জামা, প্রসাধন, ঘর সাজানোর টুকিটাকি জিনিস, বই, ছবির অ্যালবাম তার ইচ্ছার ঝুলি থেকে বার হতে লাগল কি জানি তার কেমন মনে হল সব জিনিসগুলোই তার কাছে ঠিক পৌঁছাবে। লেকের প্যারাপেটে বসে হঠাৎ তার যেন কেমন ইচ্ছা হল ফুচকা হলে ভাল হত। হঠাৎ দেখল তার পাশে একটা শালপাতার ঠোঙা—ঠোঙায় চারটে ফুচকা। ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ ছিল না। লাভলি ফুচকাগুলো তাড়াতাড়ি খেয়ে বীনেতে ঠোঙাটা ফেলে দিল। বাড়ী পৌঁছে চাবি খুলে ঘরে ঢুকে দেখল লাভলির বিছানার ওপর একটা স্যুটকেশ। স্যুটকেশে লাভলির ইচ্ছাপূরণের সব জিনিস ভর্তি—এবার অবশ্য কোনও ক্যাশমেমো ছিল না। যদিও উপহার পাওয়াটা লাভলির গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল বরং না পেলেই আঘাত পেত। যা হোক আগের দিনের মতই রিসেপশানে এনকোয়ারি করলেন। ফল একই—কেউ তাদের ঘরে কোনও জিনিসপত্র রেখে যায়নি।

পরদিন ছিল নৈনিতালে থাকার শেষ দিন। তার পরদিন সকালে নৈনিতাল থেকে নামতে হবে। সেদিনও অনেক ঘোরাঘুরি হল, অনেক কেনাকাটা হল—লাভলি অতি কষ্টে নিজের ইচ্ছাকে চেপে রাখল—যখনই কোনও ইচ্ছা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল লাভলি মনে মনে বলতে লাগল "আমার কিছুই ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা করবে না। ইচ্ছা করতে দেব না।" কিন্তু একটা ইচ্ছা লাভলি কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। যে তাকে এইসব উপহার দিয়েছে তাকে একবার দেখার লোভ সে সম্বরণ করতে পারল না। ইচ্ছার সঙ্গে অবশ্য ভয়ও মিশে ছিল—তার বন্ধু অশরীরী।

সন্ধ্যাবেলায় তালা খুলে সকলের আগে লাভলি ঘরে ঢুকল। যদি তার বন্ধু তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। লাভলির মনে হল কোনও অশরীরী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে

তাড়াতাড়ি আলোর সুইচ টিপল—ঘর আলোয় ভরে উঠল। লাভলির মনে হল বন্ধু রাগ করে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হয়ত আর দেখা দেবে না। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ভীষণ শীত, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। খাওয়া দাওয়া সেরে লাভলি তাড়াতাড়ি লেপের মধ্যে আশ্রয় নিল। বাবা, মাও শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে লাভলি ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে ঠিক বোঝা গেল না লাভলির ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের রুমলাইট দপ্ করে নিভে গেল। লাভলি বুঝতে পারল তার অশরীরী বন্ধু তার পাশে এসে বসেছে। তার ভয়ও করছে ভালও লাগছে। অশরীরী ইংরাজ লাভলিকে ইংরাজীতেই নিজের কথাগুলি বলে গেল—তোমার সুবিধার জন্য বাংলাতে বলছি, "লাভলি, তুমি আমাকে দেখতে চেয়েছ কিন্তু আমি অশরীরী। ইচ্ছা করলে শরীর গ্রহণ করতে পারি—কিন্তু সে তো আমার শরীর না—হয়ত দেখলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে। আলোটাও নিভিয়ে দিয়েছি। তুমি আমাকে বন্ধু মনে কর। আমায় বয়স—আমি নিজেই জানি না—স্থান কালের বন্ধন আমাদের নেই।

আমাদের বাড়ী স্কটল্যাণ্ডের গ্ল্যাসগো শহরের কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমি ব্রিটিশ আর্মিতে যোগ দিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে শেষ অবধি বর্মায় যাই। সেই সময় বর্মার পতন হয়। আমরা তখন ভারতে চলে আসি। আর্মিতে কেন যোগ দিয়েছিলাম? আর্মিতে যোগ দেওয়া আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক ছিল। ছোটবেলা থেকে আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম—সেও আমাকে ভালবাসত—আমাদের বয়স তখন কম, কাজে কাজেই বিয়ের প্রশ্ন ওঠে নি। মেয়েটি ছিল খুব সুন্দরী।—লম্বা—টানা দুটি চোখ—পদ্মফুলের মত রঙ—আর তেমনি মিষ্টি স্বভাব। সকলেই তাকে ভালবাসত। মেয়েটির নাম লিডা। তার ছিল বেড়ানোর খুব সখ। ভারতবর্ষকে সে খুব ভালবাসত—আর কখনও না দেখেই হিমালয় সম্বন্ধে তার কৌতূহল। আমি তাকে বলতাম আমরা বিয়ের পর হনিমুনের জন্য হিমালয়ে যাব। তুমি বোধ হয় জান আমাদের দেশ স্কটল্যাণ্ড পাহাড় আর হ্রদে ভরা। তবে হিমালয়ের বিরাটত্ব বিশালতা আমরা জানতাম না—হিমালয়ের হ্রদ যে কত বড় ও গভীর তাও জানতাম না। আর্মিতে জয়েন করে আমার ফিঁয়াসের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে বলল তুমি নিশ্চয় ভারতবর্ষে যাবে আব আমাদের হনিমুনের জন্য হিমালয়ের কোনও শহর ঠিক করে আসবে। যুদ্ধে ঈজিপ্ট থেকে টবরুক, টবরুক থেকে বর্মা হয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছালাম। এতদিনে যুদ্ধের গতি বদলাল—আমাদের জিত হতে লাগল। যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আমাদের রেজিমেন্ট লখনউতে পোস্টেড। আমি ছুটি নিয়ে নৈনিতাল বেড়াতে এলাম। প্রথম দর্শনেই নৈনিতালের প্রেমে পড়ে গেলাম। পাহাড় আর হ্রদ, হ্রদ আর পাহাড়—আমাদের দেশের ল্যাণ্ডস্কেপকে অনেকগুণ বাড়ালে নৈনিতালের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লিণ্ডাকে নিয়মিত চিঠি লিখি, তার উত্তর অনেক জায়গা ঘুরে এসে পৌঁছায়। নৈনিতাল এই হোটেল তখন আর্মির জন্য রিজার্ভ ছিল। আমি এই ২৭ নং কামরাতেই ছিলাম। লিণ্ডাকে জানালাম আমাদের হনিমুন নৈনিতালে হবে। নৈনিতাল থেকে চিঠি, ফটো লিণ্ডাকে পাঠালাম। লিণ্ডা খুব খুশী।

লিখল দিন গুণছি। তুমি ছাড়া পেলেই আমরা বিয়ে করে নৈনিতাল যাব। আরও কিছুদি র কেটে গেল। যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু আমাদের মুক্তির আদেশ আসেনি তবে প্রতিদিন আদেশের অপেক্ষা করছি। দেশে ফেরার আগে আর একবার নৈনিতাল দেখে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না। সেবারও নৈনিতালে এই ২৭ নং কামরায় ছিলাম। দু একদিন পরে অর্ডালি একটি কেবল নিয়ে এল। খুলে দেখলাম লিণ্ডা নেই। কদিনের অসুখে মারা গেছে। লিণ্ডার শেষ আশা পূর্ণ করতে পারিনি—আমাদের হনিমুনের স্বপ্ন পূর্ণ হোল না।

সেইদিনই রাতে আমি আমার কপালে রিভলভার রেখে ট্রিগার টিপে দিলাম। সেই থেকে অশরীরী আমি এখানেই আছি। তবে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়ও যাই। মধ্যে একবার লিণ্ডার কবরে ফুল দিয়ে এসেছি। লিণ্ডার ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি কিন্তু মনে হয়েছে অন্য কোন মেয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে হয়ত মুক্তি পাব। তুমি জান না তোমাদের কলকাতার বাড়িতে আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম। হয়ত লিণ্ডার আত্মাই আমাকে ওখানে নিয়ে যায়। তোমার সঙ্গে লিণ্ডার চেহারা ও স্বভাবের অনেক মিল আছে। তোমার বেড়ানোব সখ জানতে পেরে আমিই তোমাদের নৈনিতাল নিয়ে আসি। লিণ্ডার ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি কিন্তুতোমার ছোটখাট ইচ্ছা পূরণ করে আমি খুব খুশী। মনে হচ্ছে আমার মুক্তির সময় আসছে। এর পর আলোটা ফের জ্বলে উঠল। লাভলির অশরীরী বন্ধু চলে গেলেন মনে হল। আশ্চর্য, এই রকম অলৌকিক ঘটনায়ও লাভলি বিচলিত হয়নি। লাভলির কেবল মনে হতে লাগল কি করে তার অশরীরী বন্ধুকে মুক্তি দেওয়া যায়।

পরদিন নৈনিতাল ছেড়ে লখনউ হয়ে কদিন পর লাভলিরা কলকাতার বাড়ীতে পৌঁছাল। সঙ্গে অশরীরী বন্ধুর দেওয়া উপহার। যারা গল্প শুনল অনেকেই বিশ্বাস করল না। কদিন পরে রাত্রে লাভলি বুঝতে পারল তার অশরীরী বন্ধু কলকাতায় এসেছে—ফুলের তোড়া ও অর্কিড উপহাব নিযে। এবার কিন্তু লাভলি ভয় পেয়ে গেল। যদি বন্ধু বেশিদিন থাকে তাহলে জানাজানি হবে—বন্ধুকে বলল, বন্ধু তুমি ফিরে যাও। অশরীরী বন্ধু বলল, লাভলি তুমি আমার মুক্তির বন্দোবস্ত কর। তোমাদের কলকাতায় অনেক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন। শুনেছি তাঁরা অশরীরী আত্মাকে মুক্তি দিতে পারেন।

পরদিন লাভলি একজন প্রসিদ্ধ সাধক তান্ত্রিকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব ঘটন জানাল। তান্ত্রিক পূজো করে তাকে মন্ত্রপূতঃ ফুল দিলেন। সেদিন রাতে অশরীরী বন্ধুর আবির্ভাব হল। বন্ধু লাভলির হাত থেকে ফুল নিল। তারপর আর তার দেখা পাওয়া যায়নি।

খবর নিয়ে জানা গিয়েছিল ১৯৪৫ সালে নৈনিতালের হোটেলের ২৭ নং কামরায় একজন তরুণ ইংরাজ আর্মি অফিসার রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ২৭ নং কামরায় সাধারণতঃ কেউ থাকতে চান না। কিন্তু তান্ত্রিক সাধকের মন্ত্রপূতঃ ফুলের প্রভাবে বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক না কেন "নৈনিতালে হোটেল এস"-এর ২৭ নং কামরায় অশরীরী আত্মার উপস্থিতির আর কোনও কথা শোনা যায়নি।

মাঝরাতের জলসায়

শিশিরকুমার মজুমদার

প্রসন্ন বলল, 'এত রাতে ওখানে যাবার কি দরকার । জায়গাটা ভাল নয়। দিনের বেলাতেই তমন লোকজন যায় না। আব তুই বলছিস এখন যাবি!'

ননী বারান্দায় পায়চারি করছিল। সেখান থেকে বলল, 'ভূতের ভয় আমার নেই। তাছাড়া এটা তো আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তুই তো জানিস প্রসন্ন, রঘুর সঙ্গে আমার আব আজকাল মোটেও সদ্ভাব নেই। বাড়ি নিয়ে মামলাটাই এর কারণ। ও মামলায় আমি জিতেছি। তারপর থেকে রঘুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখিই একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর রঘুরাও তো কলকাতা ছেড়ে গাঁয়ে চলে এসেছিল। কদিন আগে হঠাৎ ওর চিঠিটা পেলাম। ওই তো তোর টেবিলে ওটা আছে, পড়ে দেখ না। এর পর আর আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয় কিছুতেই।'

প্রসন্ন টেবিলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিল। খুলে পড়ল। অদ্ভুত চিঠি। লেখা আছে—

ননী, বন্ধু ছিলি, মিথ্যা মামলা জিতে শত্রু হলি। তোর তো খুব সাহস শুনি। আয় না

আমার কাছে। মবতে বসেছি, এ অসুখ সারার নয়। মরার আগে তোর সঙ্গে শেষ বোঝাপড় করতে চাই। তোর জন্য অপেক্ষা করে থাকব আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে। সে বাড়ি গ্রামে বাইরে 'ভবদুলাল ভবন'। আসবি কিন্তু, সাহসী বীরপুরুষ।

প্রসন্ন বলল, 'আমার আপত্তি ওই বাড়িটা নিয়ে। চক গোবিন্দপুরের ভবদুলাল ভবনে মানুষ থাকে বলে শুনিনি। তবে ভেঙে পড়েনি, কারণ রঘুদের লোকজনরা ওটা নিয়মিত দেখাশোনা করে। তা রঘুরা তো ও বাড়িতে থাকে না। বিশাল খালি বাড়িটা তালা বন্ধ হয়েই পড়ে থাকে। ভূতের বাড়ি বলেই জানে সবাই এখানে। ওখানে ও তোকে গুম করতে পারে।'

বারান্দা থেকে ননী ঘরে এল। হাতঘড়ি দেখে বলল, 'চলি। বাইরে সাইকেল রিকশা পাব নিশ্চয়ই এখন রওনা দিলে সাতটা নাগাদ নিশ্চয়ই পৌঁছাব ওই ভবদুলাল ভবনে। দেখতে চাই ও আমার সঙ্গে এতদিন পরে কি ব্যবহার করে!'

'খুন করবে, নয় ভয় দেখাবে। হয়তো বা বোকার মতো তোকে দিয়ে নতুন দলিল লিখিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। অবশ্য সে দলিল টেঁকে না।' বলল প্রসন্ন। 'কিন্তু তোর গোঁয়ার্তুমির মানে হয় না। মামলার পর মুখ দেখাদেখিও বন্ধ তোদের দুজনের। তারপরও যখন তোকে আসতে লিখেছে ওই রকম ভাষায়, তখন তোর বোঝা উচিত, মুখোমুখি দেখাটা তেমন আনন্দের ব্যাপার হবে না। তবুও যদি যেতে চাস তো কাল সকালে যাস। রাতেই যেতে হবে তার কি মানে আছে?'

হাসল ননী, বলল 'কলকাতা ছাড়ার আগে আমি গেছিলাম রঘুর প্রাণেব বন্ধু রাখালের কাছে, সে তো আমারও বন্ধু। বলল, রঘুর নাকি ভীষণ অসুখ। কেমন আছে তাও জানে না। তবে বঘুরা তো ও বাড়িতে থাকে না। ও বাড়ির সুনাম নেই। শুনেই মনে মনে ঠিক করেছি রাতেই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। ওই যে দেখলি না, ও আমাকে বীরপুরুষ বলে ঠাট্টা করেছে। এটাই হবে তার উত্তর।' টেবিলের ওপব থেকে চিঠিখানা তুলে ভাঁজ করে পকেটে পুরল ননী। কোনও দিকে না তাকিয়ে বলল, 'ষ্টেশনে নেমেই তোর কথা মনে পড়ল, অনেক দিন দেখা হয়নি বলে দেখা করে গেলাম। এর সঙ্গে ও বাড়িতে যাওয়ার কোন সম্বন্ধ নেইরে প্রসন্ন। চলি।' বলে ননী বার হয়ে গেল।

ভবদুলাল ভবনের সামনে সাইকেল রিকশাটা থামিয়ে রিকশাচালক জোরে জোরে ঘন্টা বাজাল বেশ কয়েকবার। ভেতর থেকে কারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রিকশা চালক বলল, 'আমি বলেছিলাম বাবু, কেউ থাকে না এখানে। ওই দেখুন কেউ সাড়াও দিচ্ছে না, কোথাও আলোও জ্বলছে না। আপনি কি নামবেন এখানে?'

তাকিয়ে তাকিয়ে বাড়িটা দেখছিল ননী। সত্যি কোথাও আলোর দেখা নেই। রঘু ওকে এখানে এসে দেখা করতে বলেছে, কিন্তু ও তো লেখেনি, সে এখানেই থাকে। তাছাড়া কদিন আগে ও খুব অসুখে ভুগেছে। এখন তাহলে তো ওর গ্রামের বাড়িতেই থাকা সম্ভব। সেখানেই যাবে নাকি ও এখন?

এ গাঁয়ে ও এর আগে কখনো আসেনি। প্রসন্ন ওখানে এসেছে এর আগে ক'বার।

কলকাতায় প্রসন্ন আর রঘু ওর সঙ্গে একই কলেজে এক সঙ্গেই পড়ত। রঘু আর ও একই পরিবারের শরিকের ছেলে। রঘুদের বাড়ির সবাই বরাবর দেশেই বাস করেছেন। অতীতে নীর ঠাকুর্দা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। গ্রামের সম্পত্তির মূলধনের জোরে কলকাতাতেও কিছু সম্পত্তি করেন তিনি। সেই স ম্পত্তির কিছু অংশ দাবি করে বসে অন্য শরিকরা। তাই নিয়েই শেষ পর্যন্ত মামলা বাধে। মামলা চালু করেছিলেন ননীর বাবা, রঘুর বাবার অন্যায় দাবি ও দখলদারির বিরুদ্ধে। সেই মামলার নিষ্পত্তি হলো রঘু আর ননীর আমলে। দু'পক্ষের কর্তারা তখন পরপারে। ননীর পক্ষে রায় দিলেন বিচারক। জয়ের খবর পেয়ে ননী ছুটে গেছিল রঘুর কাছে। বলেছিল, 'আরে তুই নাকি কলকাতা ছেড়ে দেশে চলে যাবি ঠিক করেছিস। কেন? ও বাড়ি তোকে ছাড়তে হবে না। তোর উকিলকে বল, ও বাড়িটা আমি তোকে দানপত্র লিখে পাকা করে দিচ্ছি। তাহলেই তো ঝামেলা মিটবে।'

ঝামেলা মেটেনি। ভীষণ রাগে রঘু শহর ছেড়েছিল। ও-ই মুখ দেখাদেখি বন্ধ করেছিল।

রিকশাওয়ালা বলল, 'বাবু, তাহলে গ্রাঁমে এদের বাড়িতে নিয়ে যাই আপনাকে? সে বাড়িও আমি চিনি।'

তাই করতে যাচ্ছিল ননী। তখনি অন্ধকার বাড়িটার নিচের তলা থেকে একটা ডাক শোনা গেল। একটা দরজা আওয়াজ করে খুলে গেল। সাদা কাপড় পড়া একজন বাইরে বার হয়ে এলো। স্পষ্ট শোনা গেল তার কথা, 'কে? ননী এসেছিস নাকি? আয আয়। আলো নেই দেখে চলে যাচ্ছিলি নাকি রে?'

এ যে রঘুর গলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাড়াতাড়ি রিকশা থেকে নেমে পড়ল ননী। বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢোকাব আগেই রঘু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ব্যঙ্গ করে বলল, 'অন্ধকার দেখে ভয়ে পালাচ্ছিলি না কি রে সাহসী পুরুষ। আমি তো তোকে এখানেই আসতে লিখেছিলাম। তবে?'

সেকালের জমিদার বাড়ি। বাগান সামনে, তার মাঝ দিয়ে পথ। সে পথের দুপাশে অন্ধকারে কিছু দূর দূর পাথরের মূর্তিগুলো কেমন যেন ভয় দেখানো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। এগোতে এগোতে ননী বলল, 'ভয় নয় রে রঘু। আলো নেই দেখে ফিবে যাচ্ছিলাম। তোদের এখনকার বাড়িতে।'

রঘু ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ' এত রাতে এলি, কেউ তোকে কিছু বলেনি? ওই রিকশাওয়ালাটা?'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রঘুর সামনে দাঁড়াল ননী। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, ' না, না, কি বলবে। তোর দেখা না পেলে বিপদে পড়তাম এত রাতে। যাক সে কথা। চল ভিতরে চল। 'আলো জ্বালবি না?'

হি হি করে হাসল রঘু। 'আলো? কলকাতা থেকে এলি, লোডশেডিং জানিস না। দেখ, এখুনি হয়তো আলো এসে যাবে। আয় ভিতরে আয়।'

রঘুর পেছন পেছন ঘরের মধ্যে ঢুকল ননী। নাকে সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা ভ্যাপসা

গন্ধ লাগল ওর। যেন এ ঘরের দরজা জানালা বহুদিন খোলা হয়নি। থমকে দাঁড়াল ননী।

থমকে থেমে ঘাড় ঘোরল রঘুও। হেসে বলল, 'কি হলো রে? আবার ভয় পেলি নাকি, বীরপুরুষ!'

'অন্ধকারে কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। এ ঘরের দরজা জানালাগুলোও সব বন্ধ নাকি রে?' আন্দাজে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল ননী, 'মোমবাতি নেই? জ্বাল না। আমার অসুবিধা হচ্ছে।'

তখনি দড়াম করে আওয়াজ তুলে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সে আওয়াজে চমকে উঠেছিল ননী। ঘরটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ডুবে গেল। অবাক ননী বলল, 'ওরে রঘু কোন দিকে তুই, আলো না হলে এগোবে কি করে রে?'

সঙ্গে সঙ্গে রঘু বলে উঠল, 'আলো তো জ্বলবে নারে বীরপুরুষ। এ বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন নেই। নেই কেরোসিনতেল, লণ্ঠন। এমনিই এগিয়ে চল। আমরা ওপরে যাব।'

'কি পাগলের মতো বকছিস! এ বাড়ি তোদের নিজেদের বাড়ি। এর আনাচে কানাচে তোর চেনা। অন্ধকারেও চলতে পারিস। আমি নতুন, শেষে কি ঠোক্কর খেয়ে ঠ্যাং ভাঙব? মোমবাতি বা লণ্ঠন আন।' বলে অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে রঘুকে ধরতে গেল ননী। ওকে সামনে না পেয়ে অবাক হয়ে বলল, ' এই রঘু, তুই কোথায় গেলি? আরে, অন্ধকারে আমি যে সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছি না! আলোর ব্যবস্থা নেই এখানে?'

'না'। বেশ যেন জোর দিয়েই বলল রঘু। 'চল ওপরে চল এখানে তোকে থাকতে হবে না।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আওয়াজ করে অন্য দিকের একটা দরজা খুলে গেল। অন্ধকারেই বুঝতে পারল ননী, ওটা ভিতরে বাড়িতে যাবার দরজা। আবছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রঘু ডাকল, 'আয় আমার সঙ্গে।'

দরজাটা খুলে যাওয়াতে মনে মনে স্বস্তিবোধ করল ননী। রঘুর পেছন পেছন দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়ে ও অবাকই হলো। ভিতর বাড়িরও কোথাও কোনোখানে আলো জ্বলছে না। বারান্দার শেষে একদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা অন্ধকারের মাঝে আরও অন্ধকার হয়ে আছে। সেদিকেই এগোলো রঘু। বলল, 'আয় বীরপুরুষ, দোতলায় তোব থাকার ব্যবস্থা করেছি। সেখানেই সবাই তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। আয়, আয়।'

কিছুটা এগিয়ে ননী জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে আর কে কে থাকে রে রঘু। শুনেছিলাম, তোরা নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েছিলি, তাহলে?'

সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে রঘু বলল, 'থাকেন সবাই। ওপরে গেলেই তো তাঁদের দেখতে পাবি। তাঁরা তো তোর জন্যই অপেক্ষা করে আছেন। তুই আমার এত বড় বন্ধু। তোকে তো সবাই আদর-যত্ন করবে রে।' ওর গলার স্বরে ব্যঙ্গের ঝাঁজ।

সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ননী বলল, 'তুই দেখছি মামলার ব্যাপারটা এখনও ভুলিসনি। অথচ ও ব্যাপারে আমার তেমন দোষ ছিল না।'

'মিছে কথা বলিস না ননী।' বেশ যেন রাগ করেই বলল রঘু, 'ওসব মিছে কথা শুনতে ভাল লাগে না। তাছাড়া তোকে এখানে এখন ডেকে এনেছি মণ্ডা মিঠাই খাওয়াতে নয়। ডেকে এনেছি ওই মামলার ব্যাপারটাই নতুন করে মিটিয়ে ফেলতে। উঠে আয় ওপরে।' বাঁক নিয়ে সিঁড়িটা সোজা উঠে গেছে দোতলায়। বাঁক ঘুরে ফের থমকে দাঁড়াল ননী। অবাক কাণ্ড, দোতলাতেও কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। এতক্ষণ একটানা অন্ধকারে থেকে, অন্ধকার ওর চোখে অনেকটা সয়ে গেছে। ও দেখল,দোতলার টানা বারন্দার একদিকে সারি সারি ঘর। তার প্রত্যেকটার দরজাই বন্ধ। অন্য দিকে বুক সমান উঁচু জাফরি কাটা রেলিং। ওদিকেই নিচে বোধ হয় ভিতর বাড়ির উঠান। রঘু বারান্দায় উঠে গেছিল। না ফিরেই বলল, 'থামলি কেন? আয় , আয় তোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছি। কোনো অসুবিধা হবে না তোর।'

আর উপরে না উঠে ননী বলল, 'তুই কি রঘু আমাকে ভয় দেখাবার জন্য এখানে এনেছিস? এ বাড়িতে তো দেখছি কেউ থাকে না। সব ঘর বন্ধ।'

হি হি করে হাসল রঘু। বলল, 'বাজে কথা। কে বলল সব ঘর বন্ধ। কোন ঘরটাতে তুই থাকতে চাস বল। প্রথম ঘরটা নাচঘর, ওটা থাক। দুনম্বরে থাকতেন দাদুর বাবা। একশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। তার মধ্যে নববই বছর কাটিয়ে ছিলেন এই ঘরে। পাশেরটা দাদুর ঘর। তিনিই তোর দাদুর বন্ধু ছিলেন। তাঁকেই তোর দাদু ভাল মানুষ পেয়ে ঠকিয়েছিলেন। তাঁর টাকায় কেনা কলকাতার বাড়ির দলিল নিজের নামে করেছিলেন। এ তো জচ্চুরি! আমাদের পক্ষে অনের সাক্ষী ছিল। কিন্তু তোর বাবা টাকা খাইয়ে তাদের মুখও বন্ধ করে দিল। আর তুই, জানতিস মামলাটা চালু আছে, অথচ আমাকে সে ব্যাপারে কোনো দিনও কোনো কথা বলিসনি, আপনজনের মতো হেসেছিস, গল্প করেছিস, এক সঙ্গে সিনেমা দেখেছিস, বাড়িতে এসেছিস, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিস। শয়তান কোথাকার, ও সবই ছিল তোর ভড়ং। তলে তলে মামলায় এক তরফা রায় নেবার ফন্দি! আমাদের উকিলটাকে কত টাকা খাইয়েছিলি? কলকাতার অতবড় বাড়িটা স্রেফ ঠকিয়ে দখল নিলি। এই সবের আজ ফয়সালা করব বলেই তোকেডেকে এনেছি রে বীর পুরুষ। এ বাড়িতে কেউ নেই বলছিস কেন? এ বাড়িতেই তো তাঁরা সবাই আছেন, যাঁদের তুই ঠকিয়েছিস। আয়, আয়, উঠে আয়, তিন নম্বরের ঘরটা খুলে দিচ্ছি। এখন বিশ্রাম কর। রাত দশটায় অমাবস্যা লাগবে। তখনই তাঁরা আসবেন, ফয়সালা হয়ে যাবে মামলাটা পাকাপাকি ভাবে। উঠে আয় তুই।'

থমকে গেল ননী। এই প্রথম ওর মনে কিছুটা ভয় ঢুকল। একি বলছে রঘু। এভাবে বাহাদুরী করে এখানে না আসাই উচিত ছিল ওর। অমন একটা চিঠি পেয়ে ওর অন্তত একবার ভাবা উচিত ছিল। রঘু ওকে নিয়ে এখন কি করতে চায়? ও বলছে এ বাড়িতে এখন আরও অনেকেই আছেন, আছেন তো তাঁরা কোথায় আছেন? সব ঘরগুলোই তো বন্ধ সামনে।

'উঠে আয় তুই। উঠে এলি?' যেন ধমকেই বলল রঘু। 'চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে

থাকলেই হবে? তোকে আসতেই হবে এখন ওপরে। নইলে যাবি কোথায়?'

সহজ হবার চেষ্টা করে ননী বলল, 'আচ্ছা, এসব কি পাগলামি করছিস তুই বল তো? ওপরে যেতে বলছিস, যাবটা কোথায়, দেখতেই তো পাচ্ছি, সব ঘরগুলো বন্ধ। আমার তো মনে হচ্ছে,. এ বাড়িতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের সব ঘরের সব দরজাগুলো এক সঙ্গে খুলে গেল। আর প্রত্যেকটা দরজা দিয়েই সাদা ছায়া ছায়া পোশাক পরা এক একজন মানুষ বার হয়ে এসে রেলিং-এর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। সবার শেষে বিশ্রী আওয়াজ তুলে সামনের একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। যেন বহুদিনের বন্ধ হয়ে থাকা জংধরা দরজা খুলল। অবাক ননী দেখল, তার ভিতর থেকেও সাদা ছায়ার মতো পোশাকপরা একজন দশাসই পুরুষ বাইরে এসে দাঁড়াল। যে দাঁড়াল সেও যেন ওকেই দেখছে।

রঘু বলল, 'ভীতু কোথাকার, বলছি লোডশেডিং চলছে। ওই তো তোর থাকার ঘরের দরজা খুলে গেল। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমার আত্মীয়-স্বজনরা। সামনেই ঠাকুর্দা। তিনিই তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। সেই জন্যই তো তোকে এখানে ডেকেছি। ওসব আলোর কথা ছাড়তো! ও নিয়ে আমি কখনও সত্যি বলব না। সত্যি যা তা হলো, এ বাড়িতেও অনেকে থাকেন।'

অনেকটা স্বস্তিবোধ করল ননী, বাকি ক'ধাপ উঠে ও বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে ও ঠাকুর্দাকে প্রণাম করতেই যাচ্ছিল। তিনি বলে উঠলেন, 'থাক থাক আর অত ভক্তির দরকার নেই। ওখানেই থাক। কেন তোমাকে ডাকা হয়েছে জান?'

বেশ অস্বস্তির সঙ্গে ননী বলল, 'না তো ঠিক জানি না। রঘুর চিঠিটায় মাথামুণ্ডু কিচ্ছু নেই। কেন যে আসতে হবে আমাকে এখানে, তা নিয়ে কিছুই লেখেনি। শুধু আমাকে ভীতু কাপুরুষ বলে মনের ঝাল ঝেড়েছে।'

'তোমাকে ডাকা হয়েছে শাস্তি দেবার জন্য। যে অন্যায় তুমি করেছ তোমার বন্ধুর সঙ্গে. সে তো বিশ্বাসঘাতকতা। তার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে।'

'মানে, আমাকে কি আপনারা বাগে পেয়ে গুম করে রাখবেন?' বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই বলল ননী। মনে মনে একটু ভয়ও পেল। লোডশেডিং কতক্ষণ চলবে এখানে। আলো আসবে না! দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইকে যেন কেমন দেখাচ্ছে। কেমন যেন দেখাচ্ছে ঠাকুর্দাকে। মনে হচ্ছে হাওয়ায় ভাসা হাল্কা তাঁদের দেহ। স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। তার ওপরে ঠাকুর্দার কথাগুলোও যেন কেমন ফ্যাসফেসে।

'ঢোকো ঘরেতে তুমি। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।' ঠাণ্ডা গলায় বললেন ঠাকুর্দা, 'ঘরে ঢোকা ছাড়া আর তোমার অন্য কোনও উপায় নেই। ঘরে তোমাকে ঢুকতেই হবে।'

মনে অনেক সাহস এনে ননী বলল, 'আপনাদের এই সব পাগলের প্রলাপ শুনতে আমি এখানে আসিনি। ভেবেছিলাম রঘু সব ভুলে গেছে। হ্যাঁ, তা তো গেছেই। নইলে যে বাড়ি নিয়ে এত কথা, তা তো আমি মামলা জেতার পরই ওকে দানপত্র করে বিনা শর্তে দিতে

চেয়েছিলাম। তা ও নিল না কেন? এখন আমাকে মিথ্যা দোষী করা হচ্ছে।'

'তুমি তো জুতো মেরে গরু দান করতে চেয়েছিলে, তা রঘু নেবে কেন? ওর কি মানসম্মান নেই? তাছাড়া বাড়ি দিয়েই দেবে তো অমন গোপনে অতদিন মামলা লড়লে কেন?'

একথার যে কি উত্তর দেবে তা ননী ভেবেই পেল না। মামলা লড়েছিলেন ওদের বাঁধা আইনজীবি। তিনি ছিলেন ওর বাবার একান্ত বন্ধু। অনেক বলা সত্ত্বেও তিনি কোনও কথাই শোনেননি। তার জন্য ওকে দায়ী করা অন্যায়।

পরক্ষণেই ওর মনে হলো, এ কথা বললে রঘু মানবে কেন? ওযে এ সব কথা এখন বানিয়ে বলছে না, তার প্রমাণ ও দেবে কি করে! ভয়ঙ্কর অস্বস্তিতে ননী বলল, 'ও মামলার জন্য আমি দায়ী নই। অনেক বলা সত্ত্বেও আমাদের উকিলমশাই ও মামলা চালিয়ে গোছিলেন। তাঁকে থামাতে পারিনি বলেই তো বাড়িটা আমি রঘুকে দান করে দিতে চেয়েছিলাম। তাহলে আমি আর কিসে দোষী?'

'ওসব তোমার বানানো কথা। আমাদের খপ্পরে পড়ে এখন বলছ। ও কথা আমরা বিশ্বাস করব না। এসো, ঘরে ঢোকো। ওই ঘরের মধ্যে তোমাকে আর তোমার অপবিত্র আত্মাটাকে বন্দী করে রাখব। কেউ জানবে না। কেউ শুনতেও পাবে না তোমার আর্তনাদ। এই ঘরেই চিরকাল বন্দী হয়ে থাকবে তুমি। এই তোমার শাস্তি। এস, এস, এস, সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে যাও। আর দেরি কর না। রাত অনেক হলো।' হঠাৎ সামনে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন ঠাকুর্দা। বললেন, 'এই দুনিয়ায় এখন আর কারও ক্ষমতা নাই তোমাকে রক্ষা করে। এস, এস, এস।'

মনের সমস্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে খানিকটা এগিয়ে গেল ননী। বলল, 'এ আপনাদের অন্যায় জুলুম। আমার সম্বন্ধে যা তা ভেবেছেন। এখন আমাকে তেমনি মিছিমিছি বিপদে ফেলতে চান। আমি যদি না ঢুকি ঘরে, তাহলে আপনি কি করতে পারেন?' বারান্দার মাঝখানে থেমে বলল ননী।

'আমার কথা না শুনলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। আমি আঁধার ভৈরবকে জাগাব। সে তোমার চুলের মুঠি ধরে তোমাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দেবে। যাই কর আর তাই কর, শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে।'

'ঠিক আছে।' রুখে দাঁড়িয়ে ননী বলল, 'আমি আর ওদিকে এগোবই না। নিচে নেমে যাব। সেখানথেকে হেঁটেই স্টেশনে চলে যাব।' বলেই তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কোথায় বিশ্রীভাবে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সেই ডাক থামার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটার অন্য কোনওখানে একটা বেড়াল ককিয়ে উঠল— ওঁয়াও ওঁয়াও ওঁয়াও। যেন বেড়ালটা বাড়ির কোনো ঘরে আটকা পড়েছে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে ননী সিঁড়ির বাঁকের মুখে এসে পড়ল। এ বাড়িতে আর ও একমুহূর্তও থাকবে না। বাঁক ফিরতেই কি যেন এসে সজোরে ওর মুখে থাপ্পড় মেরে গেল। আতঙ্কে শিউরে উঠল ননী। থমকে দাঁড়াল সিঁড়ির বাঁকে।

ওপর থেকে তখনি রঘুর গলা শোনা গেল, 'বীরপুরুষ পালাচ্ছিস? পালাবি কোথায়? এ বাড়িতে ঢোকা যায় বার হওয়া যায় না। উঠে আয়, উঠে আয় বলছি। এলি উঠে।'

এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে তিন চারটে করে সিঁড়ি লাফিয়ে নেমে ননী একতলার বারান্দায় এসে থামল। ডানদিকের একটা দরজা দিয়েইও এখানে এসেছিল। সেই দরজাটা দিয়েই বাইরে চলে যাবে। অন্ধকার ওর চোখে একদম সয়ে গেছে। দরজাগুলো ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। প্রথম দরজাটা খুলল না, দ্বিতীয়টাও খুলল না। তাহলে ও কোন দরজা দিয়ে ভিতরে এসেছিল?

কানে এল ওর পিছনের সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ। কে যেন পা ঠুকে ঠুকে নামছে নিচে, থপ, থপ, থপ। সে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পাগলের মতো তৃতীয় দরজাটাতে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা মারল ননী। দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। প্রায় মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে রয়ে গেল ননী। যাক বাবা, বাইরে যাবার পথ তাহলে ও খুঁজে পেয়েছে এতক্ষণে।

অন্য দিকের দরজাটার দিকে এগোলো ও। এগোতে ওকে হলো না। পিছনের দরজাটা প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা জুড়ে ঘোর অন্ধকার ঘনাল। কোন দিকে যে কি তা আর বুঝতে পারল না ননী। আন্দাজে ও বাইরের দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওটা বন্ধ। ওটা ও কিছুতেই খুলতে পারল না। এই দরজাটা নয়, নিশ্চয়ই অন্য আর একটা দরজা আছে ঘরে, সেটা দিয়েই ভিতরে এসেছিল রঘু। দেয়াল ধরে ঘরের একদিক থেকে অন্য দিকে হাতড়েবেড়াতে লাগল ননী। আছে, আরও দুটো দরজা আছে ঘরটাতে, কিন্তু সে দুটোও খোলে এমন শক্তি নেই ওর দেহে। ওকে এ ঘরের মধ্যেই বন্দী করেছে রঘু। কিন্তু কেন? কি করেছে ও রঘুর। মামলা জিতেও ও তো বাড়িটা দিয়েই দিতে চেয়েছিল। তাহলে ও কেন এমন করছে ওর সঙ্গে। সত্যি ভীষণ ভয় পেয়েছে ননী। যা করছে রঘু তা তো আর সহজভাবে নেওয়া যাবে না। ও তাহলে এখন কি করতে চায় ওকে নিয়ে? প্রাণে মেরেফেলতে চায়? তা কি সম্ভব! কিন্তু ওর ঠাকুর্দা, তিনিও তো এর মধ্যে আছেন। তাঁর মতো বয়স্ক একজন!

আতঙ্কে শিউরে উঠল ননী। ঠাকুর্দা। তিনি তো কবেই গত হয়েছেন। তিনি আসবেন কি করে আবার? ছায়া ছায়া মূর্তিগুলো তাহলে কাদের? রঘু কি ওকে ভয় দেখিয়ে কিছু লিখিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সে লেখায় ওর কি লাভ হবে। বাইরে বার হয়েই তো ও অস্বীকার করবে ওই লেখার কথা। তবে কি কবতে চায় রঘু ওকে নিয়ে।

'মজা করতে চাই আমি তোকে নিয়ে।' ওর কানের কাছে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল রঘু।

আতঙ্কে ফিরে দাঁড়াল ননী। হ্যাঁ, ওর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে একজন! যার গলাই বলে দিচ্ছে সে রঘু। কিন্তু এই বন্ধ ঘরের মধ্যে এল কি করে ও? ঘরের কোনও দরজা তো খোলার শব্দ পায়নি ননী!

'আমাদের আর কিছুই বাধা দিতে পারে না। ওরে বোকা, ওরে গাধা, এখনও বুঝলি না আমরা কে? মামলার কথা গোপন রেখে, আমার বন্ধু সেজে, মনে মনে তুই খুব মজা

লুটছিলি। এখন আমিও তোকে এখানে এনে এই ঘরের মধ্যে বন্ধ করে তেমনি মজা লুটছি। এ বাড়িতে কেউ আসে না। রাতের অন্ধকারে আমরা ঘুরে বেড়াই আনাচে-কানাচে। আমরা যে মুক্তি পাইনি রে। পাব কি করে বল? ভাল মানুষ আমার ঠাকুর্দাকে তোর ঠাকুর্দা ঠকিয়েছিল। যখন সে কথা ঠাকুর্দা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সে কি হাহাকার। তাঁর সেই হাহাকারই আজও তাঁকে এই বাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছে। তারপর আমার সঙ্গে তুই বিশ্বাসঘাতকতা করলি। আমি মরার আগে পর্যন্ত সে কথা ভুলতে পারিনি। আমিও তাই মুক্তি পাইনি। আজ তোর সঙ্গে শেষ খেলা খেলে তৃপ্তি পাব। কি জানি, তখনই হয়তো আমার, আমার ঠাকুর্দার মুক্তি । উঃ! কি যন্ত্রণা নিয়েই না আমরা দুজনে এই বাড়িটার চার দেওয়ালের মধ্যে ঘুরে মরছি। আয় না কাছে আয়, তোকে ভাল করে বুঝিয়ে দিই কি যন্ত্রণা আমাদের।'

এক ছুটে ননী ওদিকের দরজাটার উপর আছড়ে পড়ল। সেকালের মজবুত মেহগনি কাঠের দরজা একটুও নড়ল না।

হি হি করে হেসে উঠল রঘু। অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে ডাকল, 'ও ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দা, এসো, এসো দেখে যাও কি মজা! খাঁচায় আটকা পড়া ইঁদুরের মতো করছে ও। এসো না দেখে যাও। আর, আপনারাও আসুন সকলে, যে যেখানে আছেন।'

না, ঘরের কোনও দরজা খুলে যাবে না। সব কটাই শক্ত করে বন্ধ করা। সত্যিই খাঁচাকলে আটকা পড়া ইঁদুরের মতোই অবস্থা ওর। এখন যদি ও বুদ্ধি হারায় তো সর্বনাশ হবে। যাই কেন ঘটুক না, ওকে সাহস দেখাতেই হবে। তা না হলে ওরা পেয়ে বসবে। এদিক ওদিক তাকাতে থাকল ননী।

রঘু বলল, 'তোর মনে আছে ননী, সে দিনটা ছিল আমাদের বাড়িতে উৎসব। আমার গানবাজনা ভাল লাগত। ওস্তাদ বিলিমোরিয়া এসেছিলেন সেদিন। গান বেশ জমে উঠেছিল। এমন সময় মাখনবাবু, আমাদের সরকারমশাই, আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, তোর মামলা জেতার কথাটা! তুই জানতিস। তুই আমাকে কিছু না বলে, আমারই ঘরে বসে মাথা দুলিয়ে গান শুনছিলি। সে দিনের কথাটা আজও আমি ভুলিনি রে। আজও এখানে গানের জলসা হবে। তুই শুনবি, আর আমরা সবাই বসে বসে খুশিতে মাথা দোলাব।'

কথার শেষে ও দুবার হাতে তালি মারল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা নবকের আলোর আভাস জাগল। বাইরের দরজাটা আঁকড়ে ধরে ননী তাকিয়ে দেখল, ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা। ওস্তাদ কানে হাত চাপা দিয়ে গান গাইছেন, তার ভাষা শুনে আঁতকে উঠল ননী।

আয় জেগে আয় অন্ধকারের শব তোরা।
নরক জাগা গান শোনাব আজ তোদের।
আসর ঘিরে বস না তোরা সদ্য মরা আনকোরা।
বাজবে হাড়ের খটখটানি বাদ্য মধুর।
কলজে ছেঁড়া সুরের সাথে ধর না তোরা,

শ্মশান জাগা গুমরে ওঠা হাওয়ার সুর।

গানের মাঝেই রঘু এগিয়ে এল ননীর দিকে। হি-হি করে হেসে বলল, 'কিরে এখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, তোর সম্মানে গান গাইছেন ওস্তাদ, বস এসে, বাহবা দে, মাথা দোলা, তা না হলে গান উনি উৎসাহ পাবেন কি করে?'

ওর কথা শেষ হতেই আসরের সবাই মুখ ফিরিয়ে এক সঙ্গে বলল, 'তা তো নিশ্চয়ই, তা তো নিশ্চয়ই। আসুন আপনি, বসুন এসে।'

শিউরে উঠল ননী। আসর ঘিরে বসে থাকা যারা ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছে, সব কজনেই কঙ্কাল। মাঝখানে তানপুরা হাতে গান গাইছে যে ওস্তাদ সেও কঙ্কাল।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ননী। প্রাণপণ শক্তিতে দরজাটা ধাক্কা দিতে লাগল। বিকট আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল। প্রায় ছিটকে বাইরে বার হয়ে এল ননী। পিছনে প্রাণ-কাঁপানো অট্টহাসি উঠল। পড়িমরি করে ছুটে ননী গেটের বাইরে এসে পড়ল। আবারও ছুটতে যাচ্ছিল হঠাৎ যেন সামনে এসে থামল একটা সাইকেল রিকশা। রিকশা থেকে প্রসন্ন চেঁচিয়ে উঠল, 'ভয় পাস না ননী, ভয় পাস না। আমি প্রসন্ন।' ননী ওখানেই ঢলে পড়ল।

তারপর যখন ও চোখ খুলল, ও শুয়ে আছে প্রসন্নর ঘরে। প্রসন্ন ওকে তাকাতে দেখেই বলল, 'যাক বাঁচলি। যা চিন্তায় ফেলেছিলি!'

কেমন যেন চোখে তাকাল ননী ওর দিকে।

প্রসন্ন বলল, 'তুই চলে যেতেই আমার মনে হলো কাজটা ভাল করলাম না। তোর পেছন পেছন রিকশা নিয়েই ছুটেছিলাম। আগে গেছিলাম রঘুদের এখনকার বাড়িতে। ওখানে সবাই বললেন, মাস দুই আগে রঘু মারা গেছে। শুনে অবাক হলাম, তাহলে রঘুর নামে কে তোকে চিঠি দিল? এর মধ্যে গোলমাল আছে বুঝেই চলে এসেছি এখানে। তা তুই অমন পাগলের মতো ছুটছিলি কেন?'

তখনি ননীর মনে পড়ল রঘুর চিঠিটার তারিখ প্রায় আড়াই মাস আগের। তাহলে ওই ভয়ঙ্কর চিঠিটা রঘু বেঁচে থাকার সময়ই লিখেছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্যই কি তাহলে ওর আত্মা আজ এমন করে ওকে বন্দী করেছিল! ভাগ্যিস ওর ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলে গেছিল, তা না হলে যে কি হতো!

ভূতের ভালবাসা

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

ঝড় উঠেছে। উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে ঝড়। দুরন্ত ঝড়। আমরা তিনজন— অভয়, অমর আর আমি ফিরছিলাম চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা থেকে। আমাদের গ্রাম থেকে মেঠো পথে মেলার দূরত্ব মাইল সাতেক হবে। রাস্তা ধরে গেলে আরো অনেক বেশি, তাই মাঠের মাঝখান দিয়েই যাতায়াত করত সবাই। কেননা, তখনকার দিনে পালকি আর গোরুর গাড়ি ছাড়া অন্য কোন যানবাহন ছিল না আমাদের এদিকে।

সন্ধ্যের কিছু আগেই মেলা থেকে বেরিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা। বিকেলের দিকে দু-এক টুকরো ভবঘুরে মেঘ হাল্কা বাতাসের ধাক্কায় ধাক্কায় উদাসমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আকাশের গায়ে। কিন্তু তা যে শেষপর্যন্ত গোটা আকাশ কালো করে এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে কে জানত!

ধু ধু মাঠের মাঝামাঝি আমরা তিনজন। এখন মেলার দিকে ফিরে গেলেও মাইল দুয়েক হাঁটতে হবে। সামনেও তাই। কেননা, দুমাইলের আগে কোন গ্রাম নেই। সুতরাং দুদিকের দূরত্বই যখন সমান তখন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম।

মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি আমরা। বাতাসের বেগে চলা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকাই দুঃসাধ্য।

সেকি উন্মত্ত হাওয়ার মাতামাতি! গাছপালা সব দুলে দুলে সারা। মাঠের মধ্য থেকেই নজরে পড়ছে হাওয়ার বেগে দূরের বড় বড় গাছগুলো এক-একবার মাটিতে নুয়ে পড়ে পরক্ষণেই আবার মাথা তুলে উঠছে আকাশের দিকে। এই ক্ষ্যাপা বাতাসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আকাশচেরা চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎচমক আর বাজের গর্জন। তদুপরি রাশি রাশি ধুলো। বাতাসের ঝাপটায় ধূলোবালির উদ্দাম স্রোত দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় যেন। এই অবস্থায় কোনক্রমে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছি আমরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা প্রান্তরের বুকে নেমে এল অন্ধকারের কালো যবনিকা। চারদিক ডুবে গেল অসীম অন্ধকারের অতল গহ্বরে! সর্বাঙ্গে সেই অন্ধকারের তীব্র স্রোতের স্পর্শ যেন অনুভব করছি সবাই। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু অন্ধকাব। অন্ধকার আর অন্ধকার। নীরন্ধ্র অন্ধকারের নিশ্ছেদ যবনিকা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলেছি তিনজন। চলতে চলতে একসময় মেঠো রাস্তা হারিয়ে চষা জমির ওপর দিয়ে চলেছি আমরা।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির আবির্ভাব। সেকি বর্ষণ। প্রতিটি ফোঁটাই তীক্ষ্ণভাবে এসে গায়ে বিঁধছে। গলে যাচ্ছে কর্ষিত মাটির সমস্ত চাঙ্গড়া। সেই কাদায় একবার পা পড়লে তুলতে যেন জীবন বেরিয়ে যায়। এ অবস্থায় কি চলা সম্ভব! তবুও চলেছি আমবা।

শুনেছি এরকম দুর্যোগেই নাকি নানা বিপদাপদ্ দেখা দেয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। উঃ, কী ভীষণ রাত্রি! সেই রোমহর্ষক ঘটনার কথায় পরে আসছি।

ফাঁকা মাঠের বুকে নিবিড় কালো মসীকৃষ্ণ অন্ধকার আর বজ্র-বিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণ। সঙ্গে উদ্দাম হাওয়া এবং বড বড় ড্যালা গলা কাদা। এরই মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পাগলা হাওয়ার প্রচণ্ড দাপটে মাঝে মাঝেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি আমরা পরস্পরের কাছ থেকে। ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকির পব আবার মিলিত হচ্ছি।

ইতিমধ্যে কে কতবার আছাড় খেয়ে পড়েছি তার কোন হিসেব নেই। জলে-কাদায় জামা-কাপড় ভিজে একাকার। দেহ যেন আর বইছে না। এমন বিপদে কখনো পড়িনি। গুরুজনদের নিষেধ সত্ত্বেও কেন যে আজ মেলা দেখতে বেরিয়েছিলাম তাই ভাবছি। কপালে এখন যে কি আছে কে জানে! বৃষ্টি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। হাওয়ার তীব্রতাও বাড়ছে বই কমছে না। ফলে হাড়-কাঁপানো শীতে আমাদের অবস্থা রীতিমত সঙ্গীন। চলা দায়,তবু চলতেই হচ্ছে।

সহসা বিদ্যুৎচমকে সামনের দিকে প্রচুর গাছগাছালি নজরে পড়ল। জঙ্গল বলেই মনে হল।

ঠিক সেই সময় কম্পিত কণ্ঠে বলল অমর—সর্বনাশ! এ যে সেই জায়গায় চলে এলাম মনে হচ্ছে।

—হুঁ। সায় দিল অভয়।

—কোন জায়গা? জিজ্ঞাসা করলাম।

—পরে সব জানতে পারবি। ক্ষীণকণ্ঠে জানাল অমর।

—পরে কেন? এখন....আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল অভয়

—এখন চুপ কর।

ওরা যে কিছু একটা গোপন করছে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল আমরা কাছে। কিন্তু কেন? কেন এই গোপনীয়তা? ভাবতে গিয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল আমার।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন আমরা তিনজন বন্ধু হলেও ওরা আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়। তার মধ্যে অভয় আবার অমরের চেয়েও দু-এক বছরের বড়। ওদের দুজনেরই পৈতে হয়েছে। হয়নি আমার, প্রবাদ আছে গলায় যজ্ঞোপবীত থাকলে ভূত-প্রেত নাকি স্পর্শ করতে পারে না।

তাছাড়া অভয়ের সাহসের কথা লোকের মুখে মুখে। ভয়ডর কাকে বলে জানে না ও। অমরও বড় একটা ভীতু নয়। কিন্তু আমি!

আমি তো আর ওদের মত সাহসী নই। তাই এই পরিস্থিতিতে হাজার ভয়ের চিত্র ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়।

এই রকম যখন আমার মনের অবস্থা ঠিক তখনই হঠাৎ বলে উঠল অভয়— শোন, এখন থেকে আমরা তিনজন একসাথে হাত ধরে যাব। কারো হাত যেন কোনরকমে খুলে না যায়। সাবধান। খুব সাবধান।

এ কথা শুনে আমার অবস্থা তখন আরো সঙ্গীন।

কিন্তু উপায় কি! এই দারুণ ঝড়-বৃষ্টির ভেতর তো আর সারারাত মাঠের মাঝে বসে থাকা যায় না! তাই একসাথে হাত ধরে চলেছি আমরা। চলেছি ধীরে ধীরে। অতি সন্তর্পণে চলেছি তো চলেইছি।

—আর কত হাঁটতে হবে? সকরুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

—বেশি না। এসে গেছি প্রায়। জানাল অভয়।

—মানে? সঙ্গে সঙ্গে অমরের ব্যগ্র প্রশ্ন।

—এ সব ব্যাপারে আসল জায়গায় ওরা কোন ক্ষতি করতে পারে না।

অভয়ের কথায় অমর চুপ করে গেলেও আমি কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলাম না।

—কি বলতে চাস তোরা খুলে বল তো! বেশ জোরেই কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল আমরা মুখ থেকে।

—এমন কিছু ব্যাপার নয়। চল্, ওখানে গিয়ে বসে সব খুলেই বলছি। জোরে পা চালিয়ে দিল অভয়।

সহসা আবার আকাশটাকে ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বিদ্যুদ্দীপ্তিতে বুঝলাম জঙ্গলটার খুবই কাছাকাছি এসে গেছি আমরা।

—বাঁচা গেল। এখানে একটু বসে ঝড়-জল কমলেই রওনা দেব আবার। যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল অভয়ের।

—তাই ভাল। অমরের মন্তব্য।

—আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এই জঙ্গল দেখেই তো তুই কেমন যেন

চমকে উঠলি।

—ও কিছু না।

—তোদের ব্যাপার-স্যাপার বোঝা দায়। মেলায় এসে ভুল করেছি মনে হচ্ছে।

—কিছুই ভুল করিসনি। তোর নিজের কথাই তুই ভাবছিস। সবার অবস্থাই তো এক। তোকে কি আমরা বিপদে ফেলব! সহানুভূতির সুরে বলল অভয়।

—তা হলে এই জঙ্গলটার ব্যাপার চেপে যাচ্ছিস কেন?

—চাপার কিছু নেই। বস্ এখানে। সব বলছি।

গাছতলায় বসলাম আমরা তিনজনে।

তারপর অভয়ের মুখ থেকে ঐ জায়গার কথা শুনে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল।

—ভয়ের কিছু নেই। আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হল ওদের দুজনের কণ্ঠ থেকে।

—এই ঘোর অন্ধকারে দুর্যোগের রাতে শ্মশানে বসে বলছিস ভয়ের কিছু নেই। আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।

—হ্যাঁ রে। খোদ শ্মশানে প্রেতাত্মা কোন ক্ষতি করতে পারে না। উপদেশের সুর বেজে উঠল অভয়ের কণ্ঠে।

—রাখ তোর গল্পকথা। বিরক্তি প্রকাশ করলাম আমি।

—আচ্ছা অভয়, শুনেছি অপদেবতারা নাকি অনেক সময় ছদ্মবেশে আসে?

—ধ্যুত্তরি তোর ছদ্মবেশের নিকুচি করেছে! আলোচনার আর সময় পেলি না? অমরের কথায় রেগে উঠলাম আমি।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আর ঐ সব কথাবার্তার দরকার নেই। চুপচাপ বস্। একটু পরেই তো চলে যাব আমরা। বলল অভয়।

জুবুথুবু হয়ে শ্মশানে বসে আছি আমরা তিনটি অসহায় প্রাণী। সামনেই একটা প্রকাণ্ড ঝিল। ঝিলের চারপাড়েই নানারকম ছোট-বড় গাছ আর বুনো ঘাস। এ ছাড়া চারিদিকেই উন্মুক্ত প্রান্তর। দিনে এর পাশ দিয়ে খুব কম লোকই যাতায়াত করে। আর রাতে তো কথাই নেই। বড় একটা কেউ ঘেঁষে না। পরে জানতে পেরেছিলাম এই পথে আমাদের আসার কথা নয়। ভুল করে এসে পড়েছিলাম। আর এখানেই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। আমার মত ভীতুর কথা বাদই দিলাম। ঐ অভয়প্রদানকারী চরম সাহসী অভয়ের অবস্থাও তখন অবর্ণনীয়।

আকাশের চেহারার কোন পরিবর্তন হয়নি। তখনো তার বুকে জলভরা মেঘ। বাজের তীব্র গর্জনের সঙ্গে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে সমানে। বৃষ্টি পড়ছে একইভাবে। বাতাসের উন্মত্ততাও কিছু কমেনি। প্রেতাত্মার কান্নার মত সাঁই সাঁই করে গাছপালা দুলিয়ে ঝিলের মিসকালো জলে ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে সে দিগন্তের ওপর দিয়ে। এর সঙ্গে আছে একটানা ঝিঁ ঝিঁর ডাক আর একঘেয়ে ব্যাঙের চিৎকার। তদুপরি বড় বড় গাছগুলো ডালে ডালে জড়াজড়ি করে অতিকায় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে ভয়াল মূর্তিতে। তীব্র হাওয়ার বেগে প্রেতমূর্তির মত দুলছে লতাগুচ্ছ। চারপাশে বিরাজ করছে কেমন যেন একটা ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকতা। মনে হয় বুঝি একটা নীরব ধ্বংস মুখ বুজে অপেক্ষা করছে এখানে। হয়তো কোন অশুভ আত্মা ভর করে আছে গোটা অঞ্চলটার ওপর। বিচিত্র শব্দময় অন্ধকারে এই অদ্ভুত অপার্থিব

পরিবেশে অজ্ঞাতেই বুঝি গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। অতি বড় সাহসীরও ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যায়।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় চমকে উঠলাম আমরা। কেমন যেন একটা কান্নার আওয়াজ মনে হল। তবে আচমকা ভয় পেলেও ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব আরোপ করলাম না আমরা। কেননা, ঝড়-জলে নানারকম শব্দই তো কানে আসছে। তা ছাড়া এই দুর্যোগ, শ্মশানে বসে এই ধরনের কিছু একটা মনে হওয়া অস্বাভাবিকও নয়। তাই সবাই ভাবলাম এটা এমন কিছু না। হতে পারে আমাদের মনের ভুল।

না, মনের ভুল ঠিক নয়। আবারও শোনা গেল সেই একই আওয়াজ। তবে অস্পষ্ট। একি! এ যে সত্যি সত্যি কান্না।

—কোন ভয় নেই। তোরা আমাকে জড়িয়ে ধরে থাক। গলায় পৈতে থাকলে ওরা ছুঁতে পারে না। অভয়ের কম্পিত কণ্ঠের ক্ষীণ স্বর প্রমাণ করল অভয় আর সেই আগের অভয় নেই। কর্পূরের মত উবে গেছে ওর দুর্জয় সাহস।

—তুই কতবার কতরকম কথা বলবি! আগে বললি শ্মশানে অপদেবতা কোন ক্ষতি করতে পারে না। এখন বলছিস গলায় পৈতে থাকলে ওরা ছুঁতে পারে না। এরপর আবার যে কি বলবি কে জানে! এই আতঙ্কের মধ্যেও আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই কানে এল— মিউ...মিউ...

সর্বনাশ! এ যে বিড়ালছানার কান্না। তা হলে অমরের কথাই তো ঠিক। প্রয়োজনে ছদ্মবেশও ধারণ করে অপচ্ছায়ারা।

ক্রমশ মার্জার-শাবকের ক্রন্দন একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। না, আর কোনরকম সন্দেহের অবকাশ নেই। ছদ্মবেশেই প্রেতযোনি আসছে।

তিনজনের সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে। অভয়প্রদানকারী অভয়ের অবস্থা রীতিমত শোচনীয়। তার কম্পিত কণ্ঠ থেকে অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হচ্ছে—

'ভূত আমার পুত

পেত্নী আমার ঝি।

রাম-লক্ষ্মণ সাথে আছে।

করবি আমার কি!'

—তোরাও আমার সাথে বল। কোনক্রমে বলে উঠল অভয়।

শুরু করলাম আমরাও।

প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি ছাপিয়ে ক্রমশই কান্নার আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। মনে হল আমাদের কাছেই এগিয়ে আসছে মায়াবিনী।

মিউ....মিউ....

এ যে একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছে। না, দূরত্ব বলে আর তেমন কিছু নেই বললেই চলে।

এখন উপায়! উপায় আর কি! এই শ্মশানেই বুঝি আজ সব শেষ।

আমার মাথায় তখন রাশি রাশি এলোমেলো চিন্তা। প্রায় বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছি

সে এক সাঁঝের বেলা

মধুশ্রী মৈত্র

আমাদের কেশব সেন স্ট্রীটের বাড়ীটা অনেক দিনকার পুরনো, তা প্রায় অনেক দিনেরই হবে কারণ যখন বাড়ীটা হয়েছিল, তখন সেখানটা ছিল এক গোরস্থান। পরে বড়োদের মুখে শুনেছি সোনার বেলপাতা পুঁতে অনেক পূজোটুজো দিয়ে তবে নাকি বাড়ী করতে হয়েছিল ওখানকার দিনের বিখ্যাত চোখের ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচীকে, যার কাছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও চোখ দেখাতে এসেছেন।

তা সে যাই হোক, আগেকার দিনের অনেক বাড়ীর মতোই আমাদের বাড়ীতে ও একটা আলসেবিহীন ছোট ছাদ ছিল বড়ো ছাদের একেবারে গায়ে গা লাগানো, য'কে আ বলতাম নেড়া ছাদ।

সেদিন যাই-যাই বিকেলের আলো-আঁধারিতে আমার ছোট পিসি একাই ছাদে, তারপর চুল বাঁধতে এল ঐ তেতলাতেই আমার এক দাদুর ঘরে।

হঠাৎ এক বিকট চিৎকার। এমনই সেই চিৎকার যা আমাদের অতবড় তিন

একতলা থেকে শোনা গিয়েছিল। সবাই তো দুদ্দাড় করে ওপরে, কি ব্যাপার হলটা কি? আমাদের ছোটদের চোখে তো একরাশ বিস্ময় আর ভয়।

এদিকে ছোট পিসি ঐ চিৎকার করে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে এসে দোতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তারপর মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে জ্ঞান তো ফিরলো, কিন্তু সে কি হিন্দী বুলি। অনবরত বলছে 'ম্যায় কস্তুরী বাঈ আখরদ্ হু।' আর গায়ে কি জোর, দু-তিন জনে ধরে রাখতে পারছে না। মুখ চোখ লাল, দাঁত কিড়মিড় করছে।

ঠাকুমা, মা, পিসিরা তো সব ঠকঠক্ করে কাঁপছে। একেই আমাদের বাড়ী সম্পর্কে নানারকম গল্প শোনা যেত, তারপর আবার এই কাণ্ড।

এরপর এল ওঝা, সে তো কিছুই করতে পারল না, নানারকম মন্তরতন্তর ঝাড়ফুঁক সবই চলতে লাগলো। তারপর একদিন বললো, 'হ্যাঁ বুঝেছি, এইবার তোর দফারফা করছি আমি', বলেই বাড়ীর একজনকে বললো 'এক ঘড়া জল নিয়ে আসুন।' তারপর ছোট পিসিকে বললো 'যা, এবার দাঁতে কামড়ে ঐ ঘড়াটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়।' আমরা তো বোকার মতো তাকিয়ে একটা অলৌকিক কাণ্ডকারখানার জন্যে অপেক্ষা করছি আর ভাবছি এও কি সম্ভব? ছোট পিসি কিন্তু সত্যি সত্যি দাঁত দিয়ে জল ভর্ত্তি ঘড়াটা নিয়ে আমাদের ভেতরবাড়ীর উঠোনের ধারের ছোট রকটা থেকে লাফিয়ে নামলো, তবে রাস্তা অবধি যাওয়ার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ওঝা তো হাল ছেড়ে দিল, এদিকে কস্তুরীবাঈ তো ছোট পিসিকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সবারই মন খারাপ, মাথায় হাত। এযে সত্যি সত্যি ভুতুড়ে গল্পকেও ছাড়িয়ে গেল।

এরপর এলেন এক মহিলা ওঝা তিনি নাকি ভূতপেত্নী তাড়ানোর ব্যাপারে খুবই পটু। তিনিও নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আরম্ভ করলেন আর এইসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার চোটে আমরা সবাই রাত্তিরে এক ঘরে খুব কাছাকাছি গুটিসুটি মেরে শুতাম। তেতলাকে তো প্রায় ভূতেদের আড্ডাখানাই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কাজের লোকে সন্ধ্যাবেলায় কিছুতেই কোন কারণেই যেতে চাইত না। ঐ বিরাট একান্নবর্তী পরিবাবে এই এক ঘটনা একেবারে ঝড় বইয়ে দিল।

এরপর আবার সেই মহিলা ওঝা ফতোয়া জারি করলেন, ছেঁড়া জুতো মুখে করে রাস্তায় ফেলে আসতে হবে, তা এবার কিন্তু অজ্ঞান-টজ্ঞান না হয়েই ছোট পিসি সত্যি করেই আদেশ পালন করলো।

ব্যস্ একেবারে স্বাভাবিক, সবাই তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যাক্ কস্তুরী বাঈ শেষ পর্যন্ত ছাড়লো, তাহলে আমার পিসি বেচারাকে।

একদিন আমার ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, তুই কি দেখেছিলি, যে অমন করে .. করে উঠেছিলি?' আমরা সবাই ঘিরে বসেছি বড়োদের চোখ রাঙানি সত্ত্বেও, চিটে ...ছি লাগার মতো আমরা কেউ যাচ্ছি না।

... পিসি শুরু করলো— 'জানো বড়োমা, সেদিন সন্ধ্যেবেলা আয়নার সামনে চুল ... হঠাৎ আয়নার মধ্যে দিয়ে সে যে কি বীভৎস একটা মুখ দেখলাম, সে মুখটা ক্রমশঃ

এগিয়ে আসছিলো আমার দিকে— 'কথা আর শেষ হোল'না. মুখ চোখ লাল করে ছোট পিসি আবার অজ্ঞান, বুঝতেই পারছো আবার একপ্রস্থ হৈ হৈ ব্যাপার। যাই হোক, মুখ চোখে জল দিতে আবার কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল, ঠাকুমাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এবার কিছু হলে দোষের ভাগী তাকেহ হতে হোত।

এর পর দিন গেছে গড়িয়ে, একের পর এক অনেকেই চলে গেছেন। পঞ্চান্নজনের বিরাট একান্নবর্তী বাড়ীটাকে মাঝে মাঝে হঠাৎ সন্ধেবেলা গেলে খুব খালি লাগে, কিন্তু আজও আমার সব যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ছোট পিসির ঐ ঘটনাটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। অনেকে বলেন হিস্টিরিয়া, কিন্তু তাই যদি হয় ঠিক এক মাসের জন্যে একটি পুরনো পরিবারের খাঁটি বাঙ্গালী পরিবেশে মানুষ হওয়া একটি মেয়ে কি করে হিন্দী বলেছিল আর কস্তুরীবাঈ-এর নামটিই বা তার ঠোঁটের আগায় কে বসিয়ে দিয়েছিল? যাই হোক, মীমাংসার ভারটা তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। আর একটা কথা জেনে তোমরা হেসো না যেন, আমি বাপু এই বয়সেও আমাদের ঐ বাড়ীর ছাদে রাত্তিরে উঠলে এখনও 'রাম রাম' বলি।
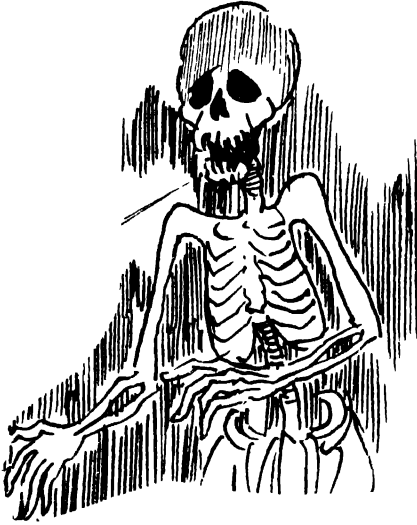
কর্তব্য

হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়

বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গেল। কখন যে আকাশে উড়তে পারব কোন ঠিক নেই। আজকাল আমাদের এয়ারলাইন্সগুলোর এই এক হয়েছে। মানুষের সময়ের কোন দাম আছে কিনা এদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বুঝতে কষ্ট হয়।

সেই রাত থাকতে বেরিয়েছিলাম। ভোর পাঁচটায় রিপোর্টিং। সুতরাং পাঁচটার আগেভাগেই এয়ারপোর্ট পৌঁছানো উচিত। আগের দিন পাড়ার একটা ট্যাক্সিকে বলে রাখাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি, ঠিক সময়েই এয়ারপোর্টে পৌঁছেছিলাম। রিপোর্টিং ডেস্কে পৌঁছে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। বায়ুদুতের এই ফ্লাইটের রিপোটিং টাইম আজকের জন্যে বেলা দশটায় ঠিক হয়েছে। প্লেন ছাড়বে এগারোটায়। যাদের বাড়িতে টেলিফোন আছে ফোন করে বায়ুদুতের অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেলিফোন নেই যাদের বাড়িতে তাদের অবস্থাই শুধু আমার মতো। যেন টেলিফোন না থাকাটাই মস্ত এক অপরাধ।

হাওয়াইজাহাজে চড়ার অভ্যাস আমার বিশেষ একটা নেই। নমাসে ছমাসে বেড়ালের

ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত এক-আধবার ঘটে।

রাহুলদা টিকিটটা দিয়ে যখন বললেন যে, এই চা বাগানের ভ্যালুয়েশনের কাজটার দায়িত্ব আমাকেই দেওয়া হল, যারপরনাই কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। ভ্যালুয়েশনের কাজটা আমাকে অবশ্য নিজের হাতে করতে হবে না। ইনসিওরেন্স কোম্পানীরই ভ্যালুয়ার মিঃ এস. এন. দাস আমার জন্যে কুচবিহার এয়ারপোর্টে থাকবেন এবং আমার সঙ্গে গিয়ে ভ্যালুয়েশন করে রিপোর্ট দেবেন আমার তত্ত্বাবধানে বলে আমাকে জানানো হয়েছে।

এ হেন কাজের দায়িত্ব পেয়ে রাত থাকতে বেরিয়ে পরে এয়ারপোর্টে আসা কিংবা বসে থাকাতেও খুব একটা অসুবিধা ছিল না। একা একা বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। শেষে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গল সামনের রিপোর্টিং কাউণ্টারে অন্তত জনা পনের দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কাউণ্টার খুললেই যাতে প্রথম দাঁড়াতে পারি কাউণ্টারের সামনে, একটা চেয়ারে তাই বসেছিলাম। বাধ সাধল আমার ঘুম।

অগত্যা জনা পনেরোর পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। রিপোর্টিং কার্য সমাধা করে ডিপার্চার লাউঞ্জে ঢুকতেই পেটের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। মনে পড়ল এক কাপ চা ছাড়া সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়েনি। লাউঞ্জের ভেতর একটা স্ন্যাক্স কাউণ্টার অবশ্য আছে তবে তার "মূল্য তালিকার" বহর দেখে ওদিকে না তাকানোই শ্রেয় মনে হল।

লাউঞ্জ থেকে বায়ুদূতের বাসটা আমাকে যখন ছোট্ট ষোল মিটার ডোনিয়ারের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল তখন ঘড়িতে প্রায় বারোটা এরপর কুচবিহার পৌঁছে চা-বাগানে পৌঁছতে জিপে প্রায় ঘণ্টাচারেক লাগে বলে শুনেছি। কখন যে পৌঁছাব সেই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

প্লেনে ওঠার পরও শুনলাম ফ্লাইট এখন ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ অতিরিক্ত মালপত্র হয়ে যাওয়ায় এই ফ্লাইটে এত ওজন ওঠানো সম্ভব নয়। কিছু মাল না নামালে ফ্লাইট উড়বে না।

বেশ কিছুক্ষণ পাইলট আর যাত্রীদের বাকবিতণ্ডা চলার পর দেখলাম এক ভদ্রলোক তার মালপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। কি ব্যবস্থা হল বুঝতে পারলাম না। তবে বুঝলাম এবার প্লেন আকাশে উড়বে। মালপত্র নিয়ে আমার অবশ্য চিন্তার কিছু ছিল না। আমার মালপত্র বলতে সাকুল্যে একটি ব্রিফকেস।

সিটবেল্ট বেঁধে এয়ারহোস্টেসের কাছ থেকে তুলো নিয়ে কানে লাগালাম। আজকের খবরের কাগজটা সামনের আসনের পিছন থেকে টেনে নিয়ে মনোনিবেশ করলাম।

ছোট্ট ডোনিয়ার আমাদের নিয়ে আকাশে উড়ল। সত্যি বলতে আমার ভাগ্যে যে কয়বার শিকে ছিঁড়েছে, এত ছোট প্লেনে কখনও উঠিনি। নতুন অভিজ্ঞতা হলেও বেশ ভয়-ভয় করছিল।

কর্তব্য

কুচবিহার এয়ারপোর্টের ওপর চক্কর খেয়ে ডোনিয়ার যখন নামছে আমার ঘড়িতে দুটো বেজে গেছে। এত বেলায় ভাত খাবার চিন্তা বিসর্জন দিলাম। প্লেনের খাদ্য অবশ্য পেটে পড়েছিল, কিছুক্ষণ অন্তত চালানো যাবে।

ভাবছিলাম এখনও কি চা-বাগানের গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে! মিঃ দাসও নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করে করে চলে গেছেন। আমার জন্যে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা টানা নিশ্চয়ই কেউ বসে থাকবে না।

এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালাম। ভুল আমার তখনই ভাঙ্গল। একটি বছর তিরিশেকের যুবক আমার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল— আপনি মিঃ ঘোষ?

সম্মতি জানাতেই আমার হাতের ব্রিফকেসটা প্রায় কেড়ে নিয়ে ওর সঙ্গে আমাকে আসতে অনুরোধ করল।

—মিঃ দাস কি এসেছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আজ্ঞে না, উনি সন্ধ্যার মধ্যেই বাঁগানে পৌঁছে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

এই মিঃ দাসকে আগে কখনও দেখিনি। তবে শুনেছি অনেক। ভদ্রলোকের নাকি খুব কথার দাম। এই দিকের সব চা-বাগানের ইনসিওরেন্সের ভ্যালুয়েশন করে বেড়ানোই ওনার কাজ। ওনার সম্বন্ধে যেটুকু শোনা আছে তাতে বলা যায়— আসবেন যখন বলেছেন কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকার চেষ্টা করা যায়।

কুচবিহারে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা বাগানের দিকে রওনা হলাম। পথ সত্যিই মনোরম। মুগ্ধ হয়ে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখছিলাম। কলকাতার ছেলে মুক্ত আকাশ আর মুক্ত বাতাস পেলে বিরাট কিছু পাওয়া হয়ে যায়। আমি কবি নই, কিন্তু আজ বেশ কবিত্ব করতে সাধ যাচ্ছিল। ড্রাইভার ছেলেটি বেশ ভাল। পুরো নাম আদিত্য রায়। তবে সবাই আদি বলেই ডাকে। বাড়ি ঐ চা-বাগানেই। ও বলেই চলেছিল।

একটা টিলার ওপর বাড়ি দেখিয়ে আদি বলল, এই বাড়িটা কার জানেন কি স্যার? জায়গাটার নাম গৌরীপুর।

গৌরীপুরে কোন বিখ্যাত লোকেব বাড়ি ছিল কিনা ঠিক করতে পারলাম না। সেই কথাই বললাম।

শুনলাম বাড়িটা নাকি প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার প্রমথেশ বড়ুয়ার। বড়ুয়াসাহেবের বাড়ি যে আসামের গৌরীপুরে শুনেছিলাম— বোধ করি কোন এক সময়ে। স্মৃতি আমার ঠিক সময়ে ঠিকমত সঙ্গ কখনই দেয় না।

প্রায় ঘণ্টাতিনেক চলার পর দুপাশে চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলল। জিজ্ঞাসা করলাম, এই বাগানই আমার গন্তব্যস্থল কিনা। শুনলাম আর সামান্যক্ষণের মধ্যেই ওদের বাগানে এসে পড়ব।

একটা বড় কালভার্ট পেরিয়ে আদি বলল, এই আমাদের বাগানের সীমানায় ঢুকলাম স্যার। দেখলাম বাবুদের নিয়ে যাতায়াত করতে করতে সৌজন্যতাবোধটা বেশ ভালরকমই

গড়ে উঠেছে ওর মধ্যে।

ওদের 'চা বাগিচার' ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, অসমীয়া ভাষায় চা-বাগান-এর পরিভাষা এটাই বলে আদি জানাল। দুপাশে সবুজ চা-গাছ ভরে আছে। রাস্তার দুপাশ দিয়ে টানা তারের বেড়া। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আদি বলল, গরু-ছাগলের হাত থেকে চা-গাছকে বাঁচাতেই এই ব্যবস্থা।

চা-বাগানের বাংলোর সামনে যখন গাড়ি থেকে নামলাম, অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। সুন্দর বাংলো। চা-বাগানের বাংলো সম্পর্কে যেমন গল্প শুনেছি বা ছবিতে দেখেছি তেমন নয়। একেবারে কেতাদুরস্ত আধুনিক বাংলো বাড়ি। মালিকদের বা ডিরেক্টরদের শখ আছে বলতে হবে।

বাংলোর সামনে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়েছিলেন এক সুদর্শন যুবক। পরিচয় হতে জানলাম ইনিই গার্ডেন ম্যানেজার মিঃ সেন। মিঃ দাস এখনও এসে পৌঁছননি বলে উনি জানালেন।

যে ঘরটি আমার থাকার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আকারে বেশ বড়। সম্পূর্ণ মেঝে কার্পেটে মোড়া। দুটি সিঙ্গল খাট। একপাশে গুটিকয় সোফা, একটি সেন্টার টেবিল, একটি ওয়ার্ডরোব, একটি ড্রেসিং টেবিল। পাশে দেওয়ালের গায়ে ব্রাকেটে দুটি নিভাঁজ টাওয়াল।

ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। বাথরুমটিও আকারে বেশ বড়। বাথটাব, কোমড়, গরমজল ঠাণ্ডাজলের এলাহি ব্যবস্থা। দেখেই আমার জমিয়ে স্নান করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

মিঃ সেন আমাকে ফ্রেশ হয়ে নিতে বলে গেলেন। স্নান সেরে পাটভাঙ্গা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে যখন বাংলোর লনে এসে দাঁড়ালাম, চারিদিক কেমন ঝিম মেরে রয়েছে। ঝিঁঝিঁগুলো আপন মনে ডেকে চলেছে। কেমন একটা গা-ছমছম পরিবেশ।

একটি লোক এসে সেলাম দিয়ে আমি এখন কি খাব জানতে চাইল। একেবারে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়াই সঙ্গত মনে হল। তাই বলে দিলাম।

মিঃ সেন এলেন আরও কিছু পরে। বেশ আড্ডা জমাতে পারেন। ওনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময় কতটা চলে গেছে খেয়াল করিনি। ঘড়িতে চোখ পড়ল— নটা বেজে গেছে। মিঃ দাস তো এখনও এলেন না!

সত্যি বলতে কি, এই কাজে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। মিঃ দাস না এলে আমার এই আসাটার কোন মানেই থাকবে না। আমি হয়ত ঘুরে ঘুরে বাগান আর বাগানের সব যন্ত্রপাতি দেখতে পারি, কিন্তু তার ভ্যালুয়েশন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

মিঃ সেন সেকথা জানাতে উনিও কিছুটা চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। বললেন— সত্যিই তো! মিঃ দাস কাল রাতে আমাকে ফোন করে জানালেন উনি ধুবড়িতে একটা চা-বাগানে এখন আছেন। ওখানে কাজ শেষ হতে হতে আজ দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যাবে। সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের বাগানে পৌঁছে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

রাত প্রায় দশটা বাজতে মিঃ সেন চলে গেলেন। বলে গেলেন, দেখুন হয়ত ঐ বাগানে

আটকে গেছেন। কাল সকালে ঠিক এসে পড়বেন। আপনি ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

ডিনার খেয়ে বেশ খানিকটা রাত করেই শুয়েছিলাম। নূতন জায়গায় ঘুম আসতে চাইছিল না। তার ওপর অতবড় একটা ঘরে একদম একা, কেমন একটা অস্বস্তি লাগছিল।

বুঝিবা একটু তন্দ্রামতন এসেছিল। দরজা ধাক্কানোর আওয়াজে উঠে বসলাম।

— মিঃ ঘোষ, দরজা খুলুন!

এত রাতে দরজাটা খোলা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারলাম না। সারা বাংলোয় আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। এই অবস্থায় দরজা খোলাটা কি উচিত হবে।

—মিঃ ঘোষ, আমি এস. এন. দাস। দরজা খুলুন। রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্টের জন্য বড় দেরি হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুললাম। এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। দোহারা চেহারা, গায়ে একটা সাফারি সুট, একমাথা কাঁচাপাকা চুল। কপালের ওপর একটা সদ্য তৈরি হওয়া ক্ষত। এখনও রক্ত পড়ছে বলে মনে হল।

—একি! কি হয়েছে আপনার?

—আর বলবেন না! রাত্রির অন্ধকারে ব্যাটারা হেডলাইট না জেলে গাড়ি চালায়, একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা! কোনক্রমে যে এসে পৌঁছতে পেরেছি এই রক্ষে।

আমি বললাম, আপনি একটু বসুন। গার্ডেন ম্যানেজারের বাংলোটা পাশেই, ওনাকে ডেকে দেখি কোন ওষুধ পাওয়া যায় কিনা— আপনার ঐ ক্ষতটার এখনি ফার্স্ট এডের প্রয়োজন।

— আরে আমার জন্য চিন্তা করবেন না। এই সামান্য কাটায় আমার কিছুই হবে না।

—এখন আমি যা বলছি শুনুন। আমার পক্ষে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হবে না। অ্যাক্সিডেন্টে আমার ড্রাইভার প্রচণ্ড ইনজিওরড্, হসপিটালে পাঠিয়েই চলে এসেছি। আপনি নতুন লোক, আমি না এলে বিপদে পড়ে যাবেন সেই চিন্তা করেই এসে কোনক্রমে ফ্যাক্টরির কেয়ারটেকারকে ধরে মেশিনপত্রগুলো দেখে নিয়েছি। কাগজপত্রগুলো সব বার করুন, একটা রিপোর্ট আমি এখনই তৈরি করে দিচ্ছি। কারণ কালকে আর আমার পক্ষে আসা সম্ভব হবে না। আপনার তো আবার পরশু ভোরেই ফ্লাইট!

—চিন্তা করে দেখলাম, কথাটা খারাপ নয়। পরশুদিন আমাকে ফিরে যেতেই হবে। কাল যদি ভদ্রলোক না আসতে পারেন আমি বেশ অসুবিধায় পড়ে যাব। আমার ঘুম না হয় দিনের বেলাতেই হবে।

কাগজপত্র সব ওনাকে বুঝিয়ে দিয়ে পাশে বসলাম। একমনে কাজ করতে লাগলেন ভদ্রলোক। বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি।

ঘুম যখন ভাঙ্গল দেখি সামনে মিঃ সেন। —কি ব্যাপার মশাই! সারারাত কি এইভাবে সোফায় বসে ঘুমিয়েছেন নাকি? এদিকে আপনার জন্যে আমি একটা খুব খারাপ খবর নিয়ে এসেছি।

অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। হঠাৎই মিঃ দাসের কথা মনে পড়ল। আরে কোথায় গেলেন ভদ্রলোক! চারিদিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। হয়ত বাথরুম গিয়েছেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিঃ সেন-এর দিকে তাকালাম।

—আপনার আসাটা এবার বৃথাই গেল মিঃ ঘোষ। মিঃ দাস যে বাগানে ছিলেন সকালে ওনার খোঁজে সেখানে ফোন করেছিলাম। ওরা জানাল মিঃ দাস সন্ধ্যানাগাদ কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পথে একটা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে ওনার গাড়ির। ঘটনাস্থলেই মিঃ দাস মারা গেছেন।

—মারা গেছেন!

—হ্যাঁ। ওনার ড্রাইভারের অবস্থাও খুব খারাপ। হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

আমার মাথায় কিছুই আর ঢুকছিল না। রাত্রে যিনি এলেন তিনি তবে কে? অ্যাক্সিডেন্টের কথা অবশ্য উনিও বলেছিলেন। কিন্তু মারা গেলে আসেন কি করে?

টেবিলের ওপর কাগজপত্রগুলো ঠিকই আছে। রিপোর্ট তৈরি। দেখালাম মিঃ সেনকে। সব বললাম ওনাকে। দেখেশুনে উনিও চমকে উঠলেন। বললেন— চলুন তো, মিঃ দাসের মৃতদেহটা এখনও আছে— গিয়ে দেখে আসি।

মিঃ সেনের গাড়িতে হাসপাতালে পৌঁছতে খুব একটা সময় লাগল না। মিঃ সেন ডাক্তারদের দেখলাম বেশ পরিচিত। ভিতরে যেতে আমাদের কোন অসুবিধা হল না।

মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে আমি চমকে উঠলাম। কপালে সেই কাটা দাগ, রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। একমাথা কাঁচাপাকা চুল। সেই সাফারি সুট।

দাঁড়াতে পারছিলাম না। কোনরকমে দৌড়ে পালিয়ে এলাম। কখন যে মিঃ সেন আমাকে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন জানতেই পারিনি।

বাংলোয় পৌঁছে টেবিলটার সামনে দাঁড়ালাম। রিপোর্টগুলো ঠিক তেমনভাবেই পড়ে আছে। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম কাগজপত্রগুলো— মিঃ দাসের শেষ ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট। ভদ্রলোক ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে শেষ কর্তব্যকর্মটুকু করে গেছেন।

ভাবছিলাম, রিপোর্টগুলো কোম্পানীতে জমা দিতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ পুলিশ রিপোর্টে উনি মারা গেছেন রাত বারোটার পরে হওয়ায় আজকে— আর রিপোর্টের তারিখ গতকালের।

সেই আশ্চর্য গাছ

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

কার্সিয়াংয়ে এর আগেও বার দুয়েক এসেছেন রামকণ্ঠবাবু। জায়গাটা তাঁর প্রতিবারই ভালো লাগে। ওঠেন এসে বাসস্ট্যান্ডের কাছে ম্যালের পাশেই একটা মারোয়াড়ী হোটেলে। প্রতিবারই এক হপ্তা বরাদ্দ তাঁর। এর মধ্যে প্রথম দিন দুই শুধু ঘুমিয়েই কাটান ভদ্রলোক। বাকি দিনগুলো এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দেন। একদিন হয়তো দার্জিলিং অথবা কালিম্পং যান। একদিন হয়তো মিরিক। শরীর মেজাজ ভালো থাকলে কোনোদিন হয়তো শহরের উপকণ্ঠে ইগলস্ ক্রাগ নামক জায়গাটায় গিয়ে বসে থাকেন। সুন্দর একটা ছিমছাম রেস্তোরাঁ আছে টিলার মতো উঁচু জায়গাটায়। সারা শহরের একটা ভিউ পাওয়া যায়। রামকণ্ঠবাবুর কার্সিয়াং তাই ভারী পছন্দ।

বছর খানেক বাদে আবার তাই ঘুরে ফিরে কার্সিয়াং আসা। এবারের সময় নির্বাচনটা খুব একটা ভালো হয়নি। জুনের প্রথম থেকেই দারুণ বৃষ্টি নেমেছে এই পাহাড়ী অঞ্চলে। তবু এলেন। এবার আসার অন্য একটা কারণও ছিল। একমাত্র ভাগ্নী দময়ন্তী বাসা নিয়েছে

রেডিও স্টেশনের পাশেই। ভাগ্নীজামাই বদলি হয়ে এসেছে এখানকার আকাশবাণীতে। ভাগ্নীর ওপর বরাবরের টান রামকণ্ঠবাবুর। তাই বদলির খবর পেয়ে ভাবলেন ক'দিন ঘুরে আসা যাক ওদের ওখানে। দেখে আসবেন সেদিনকার পুঁচকে ভাগ্নী কতটা গিন্নীবান্নী হয়েছে। তাছাড়া জায়গাটা যখন কার্সিয়াং, তখন বৃষ্টিবাদলা, খারাপ আবহাওয়া কোনোকিছুই তাঁকে সংকল্প থেকে নড়াতে পারলো না। একদিন রাতের বাসে কোলকাতার ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই চেপে বসলেন ধর্মতলা থেকে। পরদিন দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলেন কার্সিয়াং, বাড়ি খুঁজে পেতে মোটেই অসুবিধা হলো না।

ভাগ্নীর কাছে শুনলেন ক'দিন ধরেই রোদের মুখ নাকি দেখা যাচ্ছে না।

রাতদিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আকাশের চওড়া উঠোনটায় রাজ্যের বাদলা মেঘের গাদাগাদি ভিড়। কেউ যেন ঠাঁইনাড়া হতে রাজী নয়। আর সেরকমই কনকনে ঠাণ্ডা বাসস্ট্যান্ড থেকে আসার পথেই ভিজে গেছেন রামকণ্ঠবাবু। বেজার কণ্ঠে বললেন, এবার বোধহয় রোদ্দুর দেখা বরাতে নেই আমার।

গরম জলে স্নান-টান সেরে চায়ের কাপে চুমুক দেবার পর মেজাজটা বেশ শরীফ লাগলো ভদ্রলোকের। কাঠের বারান্দায় বসে শেষ বিকেলের মেঘাচ্ছন্ন কার্সিয়াংকে দেখতে দেখতে ভাগ্নীব সঙ্গে গল্পে মেতে গেলেন। ইতিমধ্যে ভাগ্নীজামাই সুশীল অফিস থেকে চলে এসেছে। আর এক প্রস্থ গল্পে মেতে গেলেন সবাই। চিরদিনের চাখোব লোক রামকণ্ঠবাবু।

এখানকার নামী টি এস্টেটের অতীব সুস্বাদু চা এবং মুচমুচে পাঁপড় চিবুতে চিবুতে ভাবতে লাগলেন কয়েকটা দিন বেশি থেকে যাবেন কিনা।

পরদিন সকালেও আকাশের মুখ গোমড়া। মেঘ আর ঘন কুয়াশায় সমস্ত শহরটা যেন একটা ধূসর পর্দাব আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। পাহাড়ী রাস্তায় জল দাঁড়াতে পারে না। দুপুরের দিকে সামান্য সময়ের জন্য বৃষ্টি বিশ্রাম নিলে গুটিগুটি তিনি বেরিয়ে পড়লেন ম্যালের দিকে ছাতি মাথায়। রাস্তায় লোকজন খুব একটা নেই। শুধু কিছু কাজের মানুষ ওয়াটারপ্রুফ চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নিজের নিজের ধান্ধায়। ম্যালের কাছে গিয়ে হঠাৎই মনে পড়লো তাঁর, হাতের অনেকদিনের পুরনো পলার আংটির পাথরটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। আলগা পাথরটা যে কোনো সময় খসে যেতে পারে। দোকানে একটু দেখিয়ে নিলে কেমন হয়? ভাবতে ভাবতেই আঙুলের দিকে তাকালেন রামকণ্ঠবাবু। আর বুকের মধ্যেটা তাঁর ছ্যাঁৎ করে উঠলো। আংটিটা হাতে ঠিকই আছে, কিন্তু দামী পাথরটা কখন যেন আলগা হয়ে পথে পড়ে গেছে। কি সর্বনাশ! কোথায় এখন খুঁজবেন তিনি! তাঁর অত শখের আংটি। হঠাৎ হারোনোর দুঃখে মুষড়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু হাল ছাড়লেন না। ভাবলেন একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক, যদি বরাতগুণে পেয়ে যান। আবার ফিরতে লাগলেন ম্যাল থেকে। মাথায় ছাতা। গুটিগুটি পিঁপড়ে পায়ে রাস্তায় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে রাখতে।

চারিদিক তখন আবার কালো হয়ে এসেছে। মেঘগুলো যেন সব এসে ভিড় করেছে

তাঁরই মাথার ওপরে। হতাশ হয়ে ভাবলেন আর কেন, এবার বাড়ির দিকে ফেরা যাক। রেডিও স্টেশনের একটু আগে পথটা যেখানে অনেকটাই ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে, সেইখানে রাস্তার ধারে একটা ঝাঁকড়ামাথা বেঁটে মতো অদ্ভুত পাহাড়ী গাছের নিচে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলেন রামকণ্ঠবাবু। বৃষ্টি বুঝি আবার নামলো। ছাতার ওপরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ ওজনদার হয়েই নামছে। রামকণ্ঠবাবু জমাট কুয়াশায় ডুবে থাকা নিতল খাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে ভাবলেন— ইস্! পাথরটা যদি খুঁজে পাওয়া যেতো। একটা জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছটা সড়সড় করে উঠলো। শীত যেন আরও চেপে বসছে। এক পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেলেন রামকণ্ঠবাবু। ওটা কি? ঠিক তাঁর পায়ের কাছে রাস্তার এপাশেই ওটা কি পড়ে? নিচু হয়ে বস্তুটাকে তুললেন তিনি। আংটির সেই আলগা পাথরটা! বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মুখে তাঁর কথা সরলো না। আশ্চর্য কাণ্ড বটে! এভাবেও তবে হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়! অনেক যত্নে, অনেক সন্তর্পণে কোটের পকেটে রাখলেন দামী পাথরটাকে। এখানে আর কিছু করবেন না। কোলকাতায় গিয়ে তাঁর প্রথম কাজই হবে আংটিতে আলগা পাথরটাকে সেট করা। মুষড়ে পড়া ভাবটা কেটে গিয়ে মনটা হঠাৎই দিব্যি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো তাঁর!

দিন দুয়েক পরের কথা। স্থানীয় একটা গোলমালকে কেন্দ্র করে কার্সিয়াংয়ে বিক্ষিপ্ত কিছু খুনজখমের ঘটনা ঘটে গেছে। ফলে বিকেলবেলার পর থেকেই রাস্তাঘাট শুনশান। হাওয়ায় ভাসছে আরও একটা বড় ধরনের গণ্ডগোল হবার আশঙ্কা। কিন্তু ঘরে বসে থাকার লোক নন রামকণ্ঠবাবু। বিকেলবেলার দিকটায় আকাশ খানিকটা পরিষ্কার দেখে টুকটুক করে বেরিয়ে পড়েছেন ম্যালের দিকে। ভাগ্নীর সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই। কিন্তু ম্যালে গিয়ে বুঝলেন এসে ভালো কাজ করেননি। বাসস্ট্যান্ডের কাছটায় গিজগিজ করছে পুলিশ, মার্কেটের কাছে নাকি আবার একটা খুন হয়েছে। ম্যালের দিকটায় ভ্রমণার্থী লোকজন নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ।

গতিক সুবিধের নয় দেখে রামকণ্ঠবাবু ফিরে চললেন বাড়ির দিকে। আজ আর বৃষ্টি হয়নি। রাস্তাঘাট অনেকটাই শুকনো। নতুন একটা ছড়ি কিনেছেন, সেটাই ঠুকতে ঠুকতে এগোচ্ছিলেন তিনি, হঠাৎই বিপত্তি। দপ্ করে চারপাশের আলো হঠাৎই নিভে গেল। লোডশেডিং আর কি। মনে মনে হাসলেন তিনি। কোলকাতার এই দুরারোগ্য ব্যাধিটা শেষে কার্সিয়াংয়েও ছড়িয়েছে। সূর্যাস্তের প্রায় মুছে যাওয়া আলোয় সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছিলেন। দূরে কোথায় যেন কুকুর ডাকছে। অন্ধকারের মধ্যে গা ছমছম করে উঠছে সেই ডাকে। বাড়িটা আর বেশি দূরে নয়। এমন সময় পিঠের ওপর হঠাৎ কার হাতের চাপ অনুভব করলেন রামকণ্ঠবাবু। কেউ যেন তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার একপাশে। ভয়ার্ত গলায় একটাই মাত্র শব্দ করতে পারলেন, কে?

হাতের ঘড়িটা আর মানিব্যাগটা চটপট ছাড়ুন তো দাদু। নইলে এক ধাক্কায় ঐ খাদের

মধ্যে ফেলে দেবো। টুঁ শব্দটি করতে পারবেন না। কর্কশ অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর কানের পাশে যেন গমগম করে উঠলো। অন্ধকারে মুখটা দেখা যায় না। তবু অনুমানে বুঝতে পারলেন লোকটা বাঙালীই হবে। অন্তত উচ্চারণে তাই মনে হলো তাঁর। কঠিন থাবার মতো তাঁর একটা হাত। লোকটা রীতিমতো শক্তি ধরে। ঘামতে ঘামতে রামকণ্ঠবাবু বুঝলেন পালাবার পথ নেই। রাস্তার একপাশে নির্জন যে জায়গাটায় ছিনতাইকারী তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে সেখানে মাথার ওপরে কালো কালো একটা গাছের ডালের আভাস। পাতা কাঁপার অস্পষ্ট কেমন যেন শব্দ। রামকণ্ঠবাবু মনে মনে চাইলেন, ইস্ আলোটা যদি এক্ষুণি একবার জ্বলে উঠতো, হয়তো রেহাই পেতেন। অকস্মাৎ তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে সারা শহরে আলো জ্বলে উঠলো। পাশেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলবাড়িটার মস্ত ফ্লাড লাইটটা প্রায় মুখের ওপর এসে পড়েছে। একটা অস্ফুট শব্দ করে ছিনতাইকারী দু'হাতে মুখ ঢাকলো। তারপর ঘড়ি আর মানিব্যাগ না নিয়েই নিচের অন্ধকার ঢালু রাস্তা দিয়ে ছুটে পালালো। ঘটনার আকস্মিকতায় এতটাই চমকে গিয়েছিলেন রামকণ্ঠবাবু যে বেশ কিছুক্ষণ সেইখানেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। মাথাটা কেমন যেন করছে। তারপর একসময় কানের কাছে হাত নিয়ে শুনলেন ঘড়ির টিকটিক শব্দ। মানিব্যাগটাও পকেটে বহাল তবিয়তে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবার তিনি দ্রুত হাঁটা দিলেন বাড়ির দিকে।

সেদিন রাতে কিছুতেই ঘুমুতে পারলেন না রামকণ্ঠবাবু। মাথাটা তেতে আছে। সেইসঙ্গে বিচিত্র সব ভাবনায় ঘুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। দামী পাথরটা কেমন অদ্ভুতভাবে খুঁজে পেলেন। মানিব্যাগ আর দামী ঘড়িটাও ছিনতাই হোল না। বরাত মানেন না তিনি। কিন্তু যে সব ঘটনা ঘটে গেল, তার কি ব্যাখ্যা দেবেন তিনি? ভাবতে-ভাবতে একসময় চমকে উঠলেন রামকণ্ঠবাবু। শোঁ-শোঁ করে হাওয়া উঠেছে। খানিক পরেই তুমুল একটা ঝড় এসে আছড়ে পড়লো চারদিকে। কাঠের বাড়িটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। কোথাও বুঝি শার্সির কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো। তারপর শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি বুঝি গত কয়েকদিনের মধ্যে হয়নি। অবিরল সেই বৃষ্টিধারার মধ্যে রামকণ্ঠবাবুর ভয় হতে লাগলো, কে জানে পাহাড়ী শহরটাকে ভাসিয়ে নেবে না তো! অন্ধকারের মধ্যে দু'চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন তিনি। হঠাৎই যেন বুকের মধ্যে একটা ঘা লাগলো। নিকষ অন্ধকারের মধ্যে আলোর ঝলকানির মতোই সমস্ত চেতনা যেন শিউরে উঠলো তাঁর। আর এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের আনন্দে দিশাহারা হয়ে গেলেন তিনি। এবার সত্যিই তিনি বুঝতে পেরেছেন রাস্তার পাশের অদ্ভুত আকৃতির সেই বেঁটেমতো গাছটা আসলে একটা কল্পতরু। যার কাছে চাইলেই সবকিছু পাওয়া যায়। তাই না আকস্মিকভাবে ফিরে পেয়েছেন আংটির পাথরটা। হারাতে হয়নি ঘড়ি আর মানিব্যাগ। রামকণ্ঠবাবু এখন বুঝতে পারছেন ইচ্ছে প্রকাশের সময় সৌভাগ্যবশত তিনি ছিলেন ঐ কল্পতরুর নিচে। তাই ফলে গিয়েছে তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আশ্চর্য! এ গাছের হদিস এতকাল

কেউ পায়নি কেন?

ধড়মড় করে খাটের ওপর উঠে বসলেন রামকণ্ঠবাবু। বিরল কেশ চকচকে মাথাটায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রথমেই তাঁর ইচ্ছে জাগলো অনেকদিনের লালিত আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার। হারানো চুল ফিরে পাবার জন্যে কিই না করেছেন তিনি। রাশি-রাশি টাকা খরচ করে গুচ্ছের তেল মেখেছেন মাথায়। খবরের কাগজে টাকের বিজ্ঞাপন দেখলেই পরখ করে দেখেছেন বারবার। সম্ভবত এই একটা জায়গাতেই তাঁর মনের দুর্বলতা। কিন্তু হা হতোস্মি! টাকাই গেছে, টাক রয়ে গেছে আগের মতোই। এবার সেই টাকের হাত থেকে মুক্তি পাবেন তিনি। কল্পতরু যখন জুটে গেছে, তখন আর ভয় কি! সকালবেলা প্রথমেই তিনি যাবেন ঐ কল্পতরুর কাছে। প্রার্থনা করবেন মাথা ভর্তি কালো কুচকুচে চুল। কতদিনের স্বপ্ন তাঁর। হয়তো বৃক্ষদেবতা এবারও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। রামকণ্ঠবাবুর ইচ্ছে হলো গলা ছেড়ে গান ধরেন। মনের এই বিপুল আনন্দ কোথায় লুকিয়ে রাখবেন তিনি! চারিদিক কাঁপিয়ে কোথাও বুঝি বাজ পড়লো এবার। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে আরও। খটখট করে কাঁপছে কাঠের দরজা। হাওয়া যেন হয়ে উঠেছে আরও উদ্দাম, ঘুমের আচ্ছন্নতায় হারিয়ে যাবার আগে শেষবারের মতো তিনি ভাবলেন, এ বৃষ্টি থামবে তো?

একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙলো তাঁর। আজ আর সকালবেলা কেউ তাঁকে ডেকে দেয়নি। থমথমে আকাশের ভারী কালো চেহারা, টিপটিপ করে এখনও চলেছে বৃষ্টি। চায়ের অপেক্ষায় বসে না থেকে তিনি তড়াক করে উঠে পড়লেন। ছাতাটা বাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দেরি না করে। ভাগ্নীকে বললেন, আমি এক্ষুণি আসছি। এসে চা খাবো। আসলে সবাইকে তিনি চমকে দিতে চান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

জায়গাটা তাঁর আবছা মনে আছে। যদিও অন্ধকারের মধ্যে দেখা তবু বেঁটে চেহারার অদ্ভুত আকৃতির সেই কল্পতরু ঠিক তিনি খুঁজে বার করবেন। আর তারপর... ।

রাস্তাটা সামনেই খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মনে আছে তাঁর। ছোট্ট একটা বাঁক সামনে। তারপরই ম্যালের দিকে যাবার রাস্তাটার ডান দিকে একপাশে সেই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কল্পবৃক্ষ। উত্তেজনায় দম যেন আটকে আসে তাঁর।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। এই তো সেই জায়গাটা। অদূরে সেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। কিন্তু সেই অলৌকিক গাছটা গেলো কোথায়? সেই কল্পতরু? সহসা মাথাটা তাঁর টলে উঠলো। রাস্তার একপাশে অতলগর্ভ খাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে ভেঙে পড়েছে অনেকটাই পাথুরে জমি। কালকের প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিশ্চিত ফলাফল। আর ধসে যাওয়া বিশাল ভূমিখণ্ডের সঙ্গে চিরদিনের মতোই তলিয়ে গেছে স্বপ্নের সেই কল্পতরু। কুয়াশা আর অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো করে। তবু রাস্তার যতটা সম্ভব কাছ থেকে অবসন্ন ভারাক্রান্ত মনে রামকণ্ঠবাবু সেই গভীর খাদের মধ্যে বৃথাই খোঁজ করছিলেন গাছটিকে। নিজের অজান্তেই হাতটা বারবার চলে আসছিল চকচকে টাকের ওপরে।

সত্যিকারের ভূত
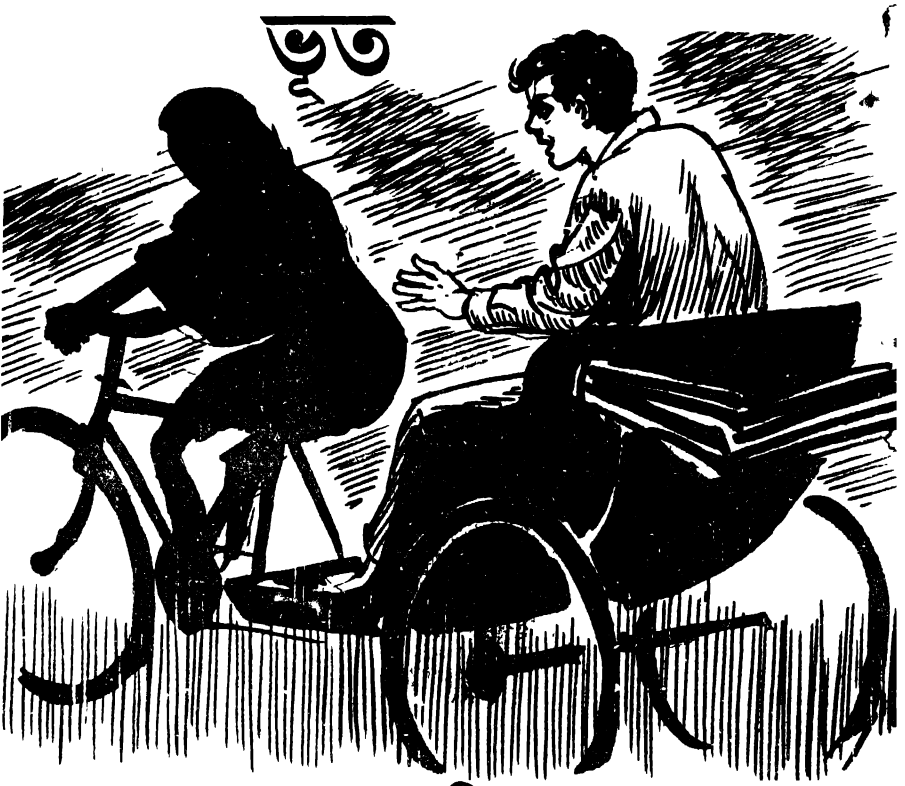
পমা মিত্র

সন্ধ্যেবেলায় ক্লাব ঘরে বসে আছে সুমিত, নরেন আর রঞ্জন। সামনে খবরের কাগজের ওপর টাল করা রয়েছে একরাশ মুড়ি, গরম গরম বেগুনি আর আলুর চপ। কনকনে শীতে কলকাতার তাপমাত্রা নেমে গেছে ১০°সেলসিয়াসে। তার ওপর আবার কোল্ড ওয়েভ বইছে। কাজেই বসে বসে মুড়ি আর তেলেভাজা শেষ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। খাওয়াটা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় লোডশেডিং হয়ে গেল।

নরেন বলে উঠল — এযে দেখছি গোদের ওপর বিষফোঁড়া। একে বেজায় শীত তার ওপর আবার অন্ধকার।

সুমিত পকেট থেকে দেশলাই বের করে ফস্ করে কাঠি জ্বালিয়ে দুটো মোমবাতি জ্বালালো।

রঞ্জন— এখন চায়ের দোকানের ছোড়াটা চা নিয়ে এলে হয়।

চারদিকে ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে দুটো মোমবাতির শিখা জ্বলছে। মাঝে মাঝে

হাওয়ায় দুলছে। দুর থেকে কোন একটা বাড়ি থেকে জেনারেটারের আওয়াজ ভেসে আসছে। চায়ের দোকানের ছেলে রতন এসে ভেজানো দরজা খোলার সাথে সাথে দমকা বাতাসে মোমবাতি দুটো নিভেগেল।

বাবু বাতি জ্বালেন দেখি— বলে রতন চায়ের মগ ও কাপগুলো টেবিলে রাখলো।

মোমদুটো আবার জ্বালাবার পর ওরা বেশ আয়েস করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলো।

নরেন বলে উঠলো— হঠাৎ বাতি দুটো নিভে যাওয়ায় আবহাওয়াটা ভুতুড়ে মনে হচ্ছিল।

সুমিত বললো—একটা ভূতের গল্প বললে বেশ হয়।

রঞ্জন— আমার বাবা ভয় করে।

নরেন— সুমিত তুই একটা গল্প বল না।

সুমিত — কেন তুই আগে বল।

নরেন— তোর পরে আমি বলবো। জানিস তো ওস্তাদের মার শেষ রাতে।

রঞ্জন—তোরা কি আরম্ভ করেছিস। আমার কিন্তু ভূতের গল্প শুনলে খুব ভয় হয়।

সুমিত বলে — নারে বুম্বা ও গল্পটা তোব খুব ভালো লাগবে। ঠিক এই রকম একটা অন্ধকার শীতের রাতের কথা ভাবছি। তখন কলেজে পড়ি। হাত-খরচা চালাবাব জন্যে ছোটখাট টিউশানি করি। তখন স্কুলের annual পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। ছোট ছেলেটির মাথায় কিছুতেই গড়ের অংক ঢোকাতে পারছিলাম না। দু'ঘন্টা ধবে অংক করতে করতে মাষ্টার ও ছাত্র যখন খুবই ক্লান্ত তখন ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি টিউশানি বাড়ি থেকে বের হলাম। সর্টকার্ট ধরে বাড়ি যাব ঠিক কবলাম। এ বাস্তাটার একধারে বসতবাড়ি, অন্যদিকে একটা বিখ্যাত হাসপাতালের পেছনের অংশ। ফুটপাথের দিকে যে বাড়িটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ঐ হাসপাতালের ডেড্ বডির কোল্ড স্টোরেজ। রোগীরা মরে গেলে পর তাদের আত্মীয়দের নিতে দেবী হলে বা দুর্ঘটনায় মাবা গেলে পোষ্টমর্টেমের জন্য ঐ হিমঘরে রাখা হয়।

ছেলেবেলা থেকেই সন্ধ্যার পর ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে কি রকম গা ছম্‌ছম্ করতো। সেদিন ওখানে গিয়ে মনে হল এ পথে কেন এলাম। ট্রাম লাইন দিযে ঘুরে গেলেইতো হতো। এবাউট টার্ন করতে গিয়ে যেই ডানদিকে ঘুরেছি হঠাৎ দেখি — ফুটপাথের ধার ঘেঁষে একটি বেঁটে মোটাসোটা বউ দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে। মাথায় একবার ঘোমটা দিচ্ছে আর খুলে ফেলছে। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুপাটি দাঁত লেগে গিয়েছে। ভাবছি পেছন ফিরে ছুটি। কিন্তু পা এমন ভারি লাগছে যে নাড়াতে পারছি না, এমন সময় দুরে বেলতলা রোড দিয়ে একটা প্রাইভেট কার মোড় ঘুরে এ রাস্তায় ঢুকলো। গাড়ির হেডলাইট আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। অবশেষে পড়লো সেই ভূত বউটির ওপরে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি রাস্তাব ধারে যেমন কিছুক্ষণ পর পর থাকে টেলিফোনের Key-board এর প্রায় ৩/৪ ফুট লম্বা মোটাসোটা চৌকো বক্স—সে রকম একটা বক্সের গায়ে সিনেমার একটা বড় পোষ্টার লাগানো আছে। আঠা কম থাকায় পোষ্টারেব উপরের অংশটা খুলে গেছে। বাতাসে ঐ পাতলা বিজ্ঞাপনটা একবার উপরে উঠছে ও নীচে নামছে। অন্ধকারে ওটাই মনে হচ্ছিল একটা ভূত বউ বা পেত্নী মাথায় ঘোমটা দিচ্ছে আর খুলছে। আমার তখন যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

রঞ্জন— যাক্ তাহলে আসলে ভূত নয়।

সুমিত— ভূত কি আর সত্যি সত্যি আছে, ও হচ্ছে মনের ভুল।

নরেন বললো—কে বলে ভূত নেই। শোন তবে আসল ভূতের গল্প বলছি। কবেকার কথা কিন্তু ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

রঞ্জন— লাইট এলে পর বলো। আমি কিন্তু ভূতের গল্প শুনে একা একা বাড়ি যেতে পারবো না।

সুমিত— তোমার ম্যাক্সি পবে থাকা উচিত ন্যাকা চৈতন্য কোথাকার।

নরেন একটা সিগারেট ধরায। তারপর ধোঁয়ার রিং তৈরী করতে কবতে বলে— জানিস তো কসবায় আমার মামাদেব তিন বিঘা জমির উপব বাগানবাড়ি রয়েছে। ভোলা দাস নামে এক মালি ঐ সব দেখাশোনা করতো। ও একাধারে চাষি, মালি, কেয়াবটেকার ও চাকরেব কাজ করতো। ওখানে যে সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছগুলো দেখেছিস সবই ওব হাতে তৈবী। দশ বছব আগে ফুলই বিক্রী হত দেড় হাজার টাকার। এই ভোলা দাসের বাড়ি ছিল বাঁকুড়ায পাত্রসায়র গ্রামে। মামাবাড়ির জমি ও বাড়ি দেখতে দেখতে ও নিজেও দেশে অনেক জমি-জমা করে অবস্থা ফিবিয়ে ফেললো। তোরা ত জানিস মামা-মামী দিল্লীবাসী। শুধু শীতকালে কসবায় আসে মাসখানেকের জন্য। ভোলা দাসের এখন বয়স হয়েছে সত্তর। কাজ থেকে অবসর নিয়ে বাড়িতেই জায়গা-জমি দেখাশোনা কবে। শীতকালে একবার কবে কসবায আসে মামার সাথে দেখা করার জন্য। শত হলেও একটা প্রাণের টান রয়েছে এ বাড়িব সাথে।

বছর পাঁচেক আগে একবাব গেলাম মামা-মামীর সাথে দেখা করতে। দেখি ভোলা দাস বসে আছে। পরনে সেই চিরন্তন কালো রঙের আমার দাদুর গায়ের আলপাকার কোট। বগলে পুরানো ছাতা, পায়ে রবারের জুতো। হাতে একটা থলি।

আমাকে দেখে খুব খুশী হল। বললো আমি কত বড় হয়ে গেছি। ছোটবেলায় ফুল ছেঁড়ার জন্য কত বকুনি খেয়েছি ভোলা দাসের। আমরা ছোটরা ছড়া করে ক্ষেপাতাম—

ভোলা দাস
শুধু করে হাসফাঁস

সত্যিকারের ভূত

ফুলগাছে দিলে হাত
মাথায় ওর পড়ে বাজ।

খুব আগ্রহভরে আমায় আমন্ত্রণ করলো ওর দেশের বাড়িতে বেড়ানোর জন্যে। আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে ওর গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলো। তাদের ও খুব আদর যত্ন করেছে। রাতে পঞ্চায়েত প্রধানের কোঠা-বাড়িতে থাকতে দিয়েছে।

আমি কথা দিলাম একবার যাবো বলে। শেষে দু'বছর আগে একদিন বর্ধমান লোকালে চেপে বসলাম। গাড়ি দেড়ঘন্টা লেট করে সাড়ে সাতটায় বর্ধমান স্টেশানে এসে পৌঁছালো। সেখান থেকে যেতে হবে বাসে করে পাত্রসায়র গ্রামে। প্রায় দু'ঘন্টার রাস্তা। লোকজন, আলুর বস্তা, আটার বস্তা বাসে তুলতে তুলতে প্রায় আটটা বাজলো। বাস বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বেশ শীত। জানালাগুলো সব বন্ধ। সময় কভার কবার জন্য বেশ স্পীডে যাচ্ছে বাস। শেষে একসময় অর্থাৎ প্রায় পৌনে দশটায় আমাকে একটা বড় রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে সটান বাঁকুড়া শহরের দিকে চলে গেল।

শীতের রাত। চারদিকের জমাট অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চোখে অন্ধকার সয়ে যাবার পর দেখতে পেলাম কিছুদূরে রাস্তার ডানপাশে একটা ঝুপড়ির মত দোকানে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম দক্ষিণ সায়র দীঘির পাড়াটা কোথায়? দোকানদার বললো ঐ বাঁ ধারের সরু রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে যান। এখান থেকে প্রায় এক মাইল পথ হবে। কিন্তু এত রাতে হেঁটে যেতে পারবেন কি? অচেনা রাস্তা। দেখুন যদি একটা রিক্সা বা সাইকেল ভ্যান পেয়ে যান ত ভালো হয়। রাস্তা দিয়ে কিছু দূর যেতেই দেখলাম একটা বটগাছের নিচে দুটো সাইকেল রিক্সা রয়েছে। কিন্তু এত রাতে ও পাড়ায় যেতে চাইলো না। অগত্যা ট্রাভেল ব্যাগটা হাতে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। মাঝে মাঝে পকেট থেকে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে পথ দেখতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা হয়ে গেল হাঁটছি ত হাঁটছি। ধারে কাছে কোন লোকালয় নেই। নেই কোন রিক্সা। ভাবলাম ফিরে যাই কিন্তু যাবো কোথায়? এত রাতে বর্ধমানে যাবার বাস পাবো না। এদিকে পাড়াগাঁয়ের শীত তার ওপর আবার বাতাস বইছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা ঝকঝকে আওয়াজ। শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। একটা সাইকেল রিক্সা যাচ্ছে। রিক্সাটাকে দাঁড় করালাম। তারপর একলাফে রিক্সায় উঠে বসলাম। বললাম দক্ষিণ সায়র দীঘির পাড়ায় যাব। রিক্সাওলা ঘাড় নেড়ে চালাতে আরম্ভ করলো। যাক্ সমস্যার সমাধান হল। একটা সিগারেট ধরালাম। রিক্সার ঢাকনাটা শতছিন্ন। আর আওয়াজও খুব। কিছুক্ষণ পর যে রাস্তাটা এলো তার একধারে ধু ধু করছে মাঠ, আরেক ধারে ধানের ক্ষেত। ধানকাটা হয়ে গেছে। গোড়াগুলো রয়েছে। কিছুদূরে একটা নদী দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে দক্ষিণ সায়র দীঘি আর কতদূর?' রিক্সাওলা বললে, 'আর বেশী দূর নেই বাবু।'

রিক্সা চলছে তো চলছেই। মনে একটু ভয় হলো। এই অজপাড়াগাঁয়ে একা একা না এলেই ভাল হত। শহুরে বাবুকে নিয়ে কি কুমতলব আঁটিছে কে জানে? একটু লক্ষ্য করে দেখলাম, মাঠ ঘাটগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মনে হ'ল এক জায়গাতেই রিক্সাটা ঘোরপাক খাচ্ছে। মুখ দিয়ে বের হ'ল 'ঠারো ‍িয়াসে।' এবার সেই সাইকেল রিক্সা এমন জোরে ঘুরপাক খেল যেন মনে হ'ল নাগরদোলায় চেপেছি। খুব জোরে ওর কাঁধে একটা থাবা মারলাম। কিন্তু এ কি? হাতে সাদা চাদরটা চলে এল। রিক্সায় চালকের সিটে কেউ নেই— শূন্য। শুধু চারদিকে একটা ঠান্ডা বাতাসের ঝলক বয়ে গেল।

পরদিন সকাল বেলায় চোখ মেলে দেখি — চারদিকে অনেক লোকজন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটি বাড়ির চাতালে শুয়ে আছি। ভোলা দাসকেও দেখলাম উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। একজন মহিলা এসে একটা কাঁসার গেলাসে করে গরম দুধ দিয়ে গেল। বলল, 'খেয়ে নাও বাবা, তোমার ওপর দিয়ে যা ধকল গেছে।'

ভোলা দাসের বাড়িতে দুপুর বেলায় স্নান করে গরম গরম ডাল, ভাত, সুক্তো ও পোনামাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে নিলাম। সাড়ে চারটার সময় ঘরে ভাজা গরম মুড়ি দিয়ে এক মগ চা খেলাম। শরীরটা তখন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ভোলা দাসকে বললাম, 'চল তোমাদের গ্রাম দেখে আসি।' দুজনে বের হলাম। ক্ষেতের আলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বেশ ভালো লাগছে। পশ্চিমদিকে রয়েছে একটা বড় দীঘি। এর নামই দক্ষিণ সায়র। ভোলা দাস বলল, 'চলুন আমার গুরুমার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'গুরুমা কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞেস করলাম। 'ঐযে হেথায় চুড়া দেখা যাচ্ছে।' উত্তর দিল ভোলা দাস।

পুকুরের ওপার থেকে একটা সুরেলা গলা ভেসে এল, 'কি রে নরেন আর ভোলা এলি?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি মিশমিশে কালো একজন গ্রাম্য মহিলা। পরনে লাল পেড়ে কোরা শাড়ি। চুলগুলো খোলা। চোখদুটো অদ্ভুত গভীরতায় টলটল করছে — ঠোঁটে স্মিত হাসি। দেখলেই মন গলে যায়।

ভোলা দাস বললে — ইনিই আমার গুরুমা আশাপূর্ণা মা।

ভক্তিভরে প্রণাম করলাম।

উনি বললেন— চল্ নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।

আমরা হেঁটে যাচ্ছি মাঠের আলের উপর দিয়ে নদীর দিকে। মাঠের পাশে বট ও অশ্বত্থ গাছের ঝোপ। মা বললেন— পঞ্চাননতলা, এখানে প্রণাম কর। প্রণাম করে মাথা তুলতেই দেখি একপাশে পড়ে আছে সেই ভাঙ্গা রিক্সাটা। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে আশাপূর্ণা মা হেসে উঠলেন। বললেন — এটাই সেই পঞ্চাননতলা — আর এই সেই রিক্সা। যে

তোকে এনেছিলো সে মানুষ নয় — ভূত। আমিই পাঠিয়েছিলাম ওটাকে। তা না হলে সেই অমাবস্যা অষ্টমী তিথির রাত্রে এখান দিয়ে একা হেঁটে গেলে — তোমাকে আজ আর বেঁচে থাকতে হতো না।

সেই ভীষণ বিভীষিকার রাতের কথা মনে পড়লে— এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। আর সেই সাধিকার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে।

হঠাৎ লাইট জ্বলে উঠল; কিন্তু উঃ উঃ করে অজ্ঞান হয়ে গেল রঞ্জন।

অন্যরকম

সুনীল দাশ

'তোমবা তিনজনের একজনও ভূত বিশ্বাস ক'রো না, অথচ তিন বন্ধুই ভূতেব গপ্পো শোনাব জন্যে বসে আছ। তোমাদের কাছে ওই রকম কোনো কাহিনী বলার মানে হয় না, তবে এতো ক'রে বলছ যখন, তখন আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে, বলা শেষ হ'লে ওই নিয়ে আমায় কোনো রকমের প্রশ্ন করতে পারবে না।' — ব'লে ডক্টর সান্ন্যাল তাঁর পাইপে আগুন ধরালেন ।

বাইরে টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে যা মেঘ তাতে মনে হচ্ছে খানিক পবেই আবার মুষলধারে নামবে। এই এলাকার ট্রান্সমিটার জ্বলে গিয়ে বিকেল থেকেই কারেন্ট নেই। পাহাড়ের গায়ে এই ট্যুরিস্ট বাংলোয় জেনারেটারও নেই। মোমের আলোয় আমরা তিন বন্ধু ডক্টর সান্ন্যালের শর্তে রাজি হয়ে গিয়ে অশরীরী আত্মা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে আগ্রহী হলাম।

ডক্টর সান্ন্যাল বলতে শুরু করলেন।

'আমি তখন সবে এম.এস-সি পরীক্ষা দিয়েছি। একেবারে ছেলেবেলার থেকেই ভূতটুতের

ব্যাপারে আমার বিশ্বাস-টিশ্বাস কিছু ছিল না। তবে ওই সময়টা থেকে প্যারানর্মাল বিষয়টা আমাকে একটু একটু করে বেশ টানতে শুরু করেছিল। উদ্ভট, বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন কিছু শুনলেই সেটা তলিয়ে চুলচিরে দেখার জন্যে ছুটে যেতাম।

'সেবার গেছিলাম আমেদাবাদ শহরে।

'আমার মেশোমশাই আমেদাবাদের প্রবাসী বাঙালী ছিলেন। নদীর ওপারে, সবরমতী আশ্রম থেকে বেশ কিছুটা দূরে, একটা বাড়িও করেছিলেন মেশোমশাই। তবে তাঁর দুই ছেলে বাইরে চাকরি করায় বিপত্নীক মেশোমশাই তখন একলাই থাকতেন সে বাড়িতে। পুরোনো এক চাকর ছিল সে বাড়িতে। ওই এলাকাটাই তখন খুব নিরিবিলি। মেশোমশাইয়ের বাড়ি আর নদীর মাঝ বরাবর একটা দরজা-জানালা বন্ধ বাইরের থেকে তালামারা দোতলা বাড়ি প্রথম দিন থেকেই নজর টেনেছিল আমার। হালে নদীর ওপারটায় শহর বেশ রমরম করতে শুরু করেছে, নতুন নুতন বাহারি ঘর-বাড়িতে। জমির দাম চড়ছে। চট্ করে ওখানে এখন জমি মিলবে না। কিন্তু তালামারা ওই বাড়িটা পড়ে আছে দিনের পর দিন। বাড়ির সংলগ্ন পাঁচিল ঘেরা বিশাল জায়গা। এ বাড়ি ভেঙে বিশাল জায়গাটা নিয়ে কিছু একটা করার উদ্যম দু-একজন নিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ এগোয়নি। আমার মেশোমশাই এবং আশপাশের লোকজনের মুখে শুনলাম বাড়িটা নাকি অভিশপ্ত। যে ওখানে বাড়ি করতে আসবে তাব অপঘাতে মৃত্যু নাকি অনিবার্য। ব্যাপারটা ঠিকমত বলতে না পারলেও আবছা আবছা ধারণা দিল ওই বাড়িটা থেকে খানিক দূরে মুচিপাড়ার লোকজন।

'ওই মুচিপাড়ার বামকান্ত তখন সে বাড়ির কেয়ার-টেকার। বাড়ির মালিক তখন দূর দেশে থাকেন। বামকান্ত খুব সাহসী লোক। তার কাছেই বাড়িব চাবি। কেনার জন্যে কেউ খোঁজ খবর করলে সে দরজা খুলে দেখায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। অশরীরীদের আনাগোনার ব্যাপারটা পরখ কববার জন্যেও কখনো সখনো ধনী কেউ কেউ তাদের কাউকে পাঠিয়েছেন শোনা গেল। রামকান্ত ওই বাড়ির আউট-হাউসে, সামনের গেটের পাশেই দুটো ঘরের কোনো একটাতে বাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একরাত কাটিয়ে তাবা আর কেউ দ্বিতীয় রাতে আসেনি। মন্তব্য করে গেছে, ভাগ্যিস বাইরের ঘরে ছিল। ভেতরের কোনো ঘরে বা দোতলায় থাকলে আর প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরতে হতো না।

'রামকান্তর থেকে খোঁজখবর নেওয়ার পর আমি মেশোমশাইকে ধরলাম ব্যাপাবটা আমাকে খুলে বলার জন্যে।

'আমার মেশোমশাই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। খুব বিষয়ী মানুষ। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, ওই বাড়িতে এক বৌ খুন হয়ে যাওয়ার পর থেকেই নানারকমের উৎপাত চলছে ওখানে। বৌটির গা-ভর্তি সোনার গয়নার লোভেই তাকে খুন করেছিল কেউ। সে বৌ নাকি এখনো গয়না পরে ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়িময়। মরার পব থেকে বৌটি একটির পর একটি প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। গয়নার লোভ দেখিয়ে সে মানুষ টেনে নিয়ে যায় ওই বাড়ির মধ্যে, তারপর গলাটিপে মেরে রেখে যায়। এক রাতের জন্যেও যারা নাকি ওই বাইরের দুটো

ঘরের কোনো একটাতে শুয়েছে, তারা সকলেই বৌটির হাসি, হাঁটাচলার শব্দ শুনেছে।

'এসব শোনামাত্র আমি ঠিক করলাম একটা রাত ওই বাইরের দুটো ঘরের একটাতে থাকবো।'

'মেশোমশাই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে ভুতুড়ে গপ্পে কান দিচ্ছ। যত্তসব!'

'কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা হওয়ায় মেশোমশাই নিজেই রামকান্তকে ডেকে সব ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে, সঙ্গের একটা ঝোলায় কিছু জিনিসপত্তর নিয়ে চলে গেলাম সেখানে।

'হেমন্তের রাত। শীতের আমেজ এসে গেছে বেশ খানিকটা। রামকান্ত একটা সুতির চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। একটা ঘরে আমার জল, হ্যারিকেনের আলো সব বন্দোবস্ত করে সে পাশের ঘরটায় চলে গেল। রাত কাটানোর জন্যে আমি মেটাফিজিক্সের মোক্ষম একটা বই পড়তে শুরু করে দিলাম। হঠাৎ রাত্রে বৃষ্টি শুরু হ'ল।

'ঘন্টাখানেক পর থেকেই আমার বাড়ির ভেতরটায়, দোতলায় যাওয়ার জন্যে কৌতূহল বাড়তে থাকল। কিন্তু ঘরের ভেতর দিকের দরজাতে তালা দেওয়া। রামকান্ত এসে খুলে না দিলে ভেতবে যাওয়া যাবে না। আমার কৌতূহলটা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হ'ল যে আমি রামকান্তকে ডাকার জন্যে বাইরের দিকের দরজাটার খিল খুললাম।

'দরজা খুলেই আমি অবাক!

'দেখি, দরজার সামনে, অন্ধকারে রামকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটা অন্তর্যামী নাকি! তবে লোকটা বেশ শীতকাতুরে। নইলে এমন হালকা শীতে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়েছে কেন?

'আমি ঘরের মধ্যে ফিরে এসে, ঝোলা থেকে টর্চটা নিয়ে বললাম, 'দোতলার ঘরে যাবো। তালাটা খুলে দাও ভাই।'

'রামকান্ত আমার কথায় ততটা অবাক হ'ল দেখলাম না, ততক্ষণে নিঃশব্দে চাবির গোছা বার করে অন্দর মহলে যাবার দরজা খুলে দিল। আমি টর্চটাকে পকেটে পুরে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে রামকান্তকে অনুসরণ করলাম।

'ভয়ডর জিনিসটা আমার চিরকালই কম। কিন্তু রামকান্ত যেন আরো বেপরোয়া। ওই দরজা থেকে এগিয়ে ভেতরে কয়েক পা এগিয়েই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। আলোটা না নিয়ে ও অন্ধকারেই সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে দিয়ে উঠতে থাকল হাতে চাবির গোছা নিয়ে। আমি হ্যারিকেনটা নিয়ে ওর পেছনে পেছনে উঠলাম। ওকি আমি হঠাৎ দোতলায় যাচ্ছি বলে খুব বিরক্ত। এখন একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত।

'দোতলায় পৌঁছে সে প্রথম ঘরটাই খুলে দিল। আমি আলোটা নামিয়ে রেখেছি। ঘরটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাদুড় ডানা ঝাপটে বেরিয়ে গেল। একই সঙ্গে কুচকুচে কালো একটা বেড়াল বেরিয়ে এসে বারান্দার রেলিংয়ে বসে বিশ্রী রকমের ডাক দিল। অন্ধকারে

তার চোখ দুটো জ্বলছিল। আমার দিকে একবারটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে নিয়েই সে ঝাঁপ দিল নিচের চৌকো অন্ধকার চত্বরে। সঙ্গে সঙ্গে আমি পকেট থেকে টর্চ বার করে দেখতে গেলাম। টর্চটা জ্বালতে জ্বালতেই আমি একবার তাকালাম রামকান্তের মুখের দিকে।

'এই প্রথম ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি। কেঁপে গেয়ে আমার হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল। দেখলাম মাথার চাদর মুড়ি দিয়ে অন্য একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এ রামকান্ত নয়। এ যথেষ্ট বয়স্ক। মুখটা বিশ্রী রকমের পোড়া। একটাও কথা না বলে লোকটা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে এই সময়। কেমন দিশেহারা হয়ে আমি হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

'পুরানো আমলের বড় ঘর। আসবাব-পত্তর কিছু নেই, ফাঁকা। শুধু রঙচটা দেওয়ালে যেন কিছু অয়েল-পেন্টিং। এ বাড়ির মালিক পরিবারের বিভিন্ন লোকের তৈলচিত্রই হবে। আলো তুলে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে ছবিগুলো দেখলাম। আশা করছিলাম ওর মধ্যে সোনার অলঙ্কারের জন্য খুন হয়ে যাওয়া বধূটিকে খুঁজে বার করবো। কিন্তু ও ঘরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তৈলচিত্রই বেশী। শুধু একটা ছবি অল্প বয়েসী একটি ছেলের। বছর উনিশ-কুড়ি বয়স হবে। যীশুর মত সরল সুন্দর অথচ কেমন যেন বিষাদ মাখানো মুখশ্রী। ছবিটার চোখ দুটো খুব জীবন্ত। এক্ষুণি বুঝি দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়বে দুচোখ বেয়ে।

'এর মধ্যে একটা অন্য রকমের ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে টের পেলাম। ওই ঘরটাতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় বা আতঙ্ক নয়, একটু আগে দেখা ওই বিশ্রী রকমের পোড়া মুখের বৃদ্ধ নয়, কি রকম একটা বিষন্নতা আমার বুকের মধ্যে যেন চেপে বসতে শুরু করল। অকারণে বুকের ভেতরটা বিষাদে দুমড়ে-মুচড়ে যেতে লাগল। ওই রকম একটা গা-ছমছমে মারাত্মক আতঙ্কের পরিবেশে আমার ভেতরকার এই পরিবর্তনটা দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। এ রকম হচ্ছে কেন? ক্রমশ বাড়ছে। এ ধরনের অসহ্য কষ্ট তো বেশিক্ষণ আমি সইতে পারবো না। বাইরের ঝোড়ো বাতাস এবং বৃষ্টি আর কতক্ষণ চলবে? বিশ্রী রকমের পুড়ে যাওয়া মুখের বৃদ্ধটি কি এখনো সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে?

'আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

'বাইরে বেরিয়ে দেখি, অল্প সময়েব মধ্যে আবহাওয়া বদলে গেছে পুরো। বৃষ্টি থেমে গেছে। ঝোড়ো বাতাসও নেই। চারিপাশ শান্ত। আকাশে চাঁদ। চাঁদের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

'ঘরের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি করে অবাক হ'তে হল আমায়। ঘরটা থেকে যত দূরে সরে যেতে থাকলাম আমার বুকের ভেতর থেকে খানিকটা আগের মারাত্মক বিষাদভাবটা ততই হালকা হ'য়ে যেতে থাকল। বেশ অনুভব করলাম, ভয়ঙ্কর বিষন্ন এলাকাটার বাইরে চলে যাচ্ছি আমি। বুকের ভেতরে যে দুমড়ানো ভাবটা ছিল সেটা শান্ত হয়ে এলো।

'এরপরেই দেখি, সেখানে দোতলা থেকে সিঁড়িটা ছাদের দিকে উঠে গেছে, সে জায়গাটায় দুধ-সাদা পোশাকে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ফিকে জ্যোৎস্নায়। গয়নার লোভ দেখিয়ে মানুষ

টেনে আনা সেই বৌটির প্রেতাত্মা সালোয়ার কামিজ পরে দাঁড়িয়ে নেই তো? পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল। যীশুর মত মুখশ্রীর সেই তরুণটি— চোস্ত আর চুড়িদার পরে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকাল মাত্র। ওকে দেখে আমার ভয় হল না, দুঃখ হল।

'পাতলা জ্যোৎস্না ছিল, তবু আলোটা সঙ্গে থাকলে ভাল হয় ভেবে আবার ঘরটাতে ঢুকলাম। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুকের মধ্যে বিষাদের ভারি পাথরটা চেপে বসতে থাকল। হ্যারিকেনটা নিয়ে আমি এক-রকম ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। আর বেরিয়ে আসার পর, আগের মতই, ঘর থেকে যত দূরে সরতে লাগলাম আমার ভেতরের বিষাদটাও তত পাতলা হতে থাকল।

'সিঁড়ির মুখে হ্যারিকেনটা নিয়ে গিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করবো। পরিত্যক্ত এই বাড়িটার মধ্যে অল্প সময়েব ফারাকে আমি অচেনা যে দুজনকে দেখলাম তাদের একজনও এই মুহূর্তে আমার সামনে নেই। কিন্তু ওদের এলাকায় আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি বলে ওরা কি আমায় শাস্তি দেবে? এক্ষুনি কিছু একটা কি ক্ষতি করবে আমার?

'আমি আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ছাদে উঠে যাওয়ার ওই সিঁড়িটা আমায় কেমন যেন টানছিল, ভীষণ রকমের টানছিল। মনে হচ্ছিল তক্ষুণি ছুটে যাই ওই খোলা ছাদটাতে আর ওই উঁচু ছাদটা থেকে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়ি নিচে। সত্যি সত্যি কেউ যেন আমায় ভেতর থেকে ঠেলছিল। আমার ভেতরের সেই ঠেলা আর হালকা চাঁদের আলোয় সেই সিঁড়িটার ডবল টান কেমন এক চুম্বক শক্তির আকর্ষণের মত আমাকে খোলা ছাদের দিকে উঠিয়ে নিচ্ছিল।

'ছাদের খোলা দরজা দিয়ে ছাদে চলে এলাম। চাঁদের আলোয় প্রকান্ড প্রাচীন ছাদটা যেন হাসছিল। আমি সেই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ার জন্যে এগোতে গেলাম, সেই সঙ্গে আমার পেছন থেকে দু-তিনজন লোক আমায় চেপে ধরল। আর তখনই সেই রাতে প্রথমে জ্ঞান হারালাম আমি।

'পরে জ্ঞান ফিরল যখন দেখলাম রামকান্ত এবং আরো চারজন আমায় ঘিরে বসে আছে। আমি চোখ মেলতে তারা আশ্বস্ত হ'ল।

'রামকান্ত বলল, 'আপনি ওই ভেতরের বাড়ির ছাদে গিয়েছিলেন কেন? আপনাকে ভেতরে যাওয়ার দরজার তালা খুলে দিল কে? আপনি কেন ছাদের ওপর থেকে লাফ দিতে যাচ্ছিলেন?'

'আমি রামকান্তের প্রশ্ন এড়িয়ে উল্টে তাকেই প্রশ্ন করলাম, 'তুমি ছিলে কোথায় রামকান্ত? আমি তোমাকে ডাকতেই তো দরজা খুলেছিলুম!'

'আমি তো পাশের ঘরেই শুয়েছিলুম। মাঝরাতে একবার উঠে আপনি কি করছেন দেখতে এসে আপনার দরজায় ঠেলা দিতেই ওটা খুলে গেল। অন্ধকার। ঘরে আপনি নেই।

লণ্ঠনটাও নেই। কিন্তু ভেতরে যাওয়ার দরজায় তালা মারা। ভয় পেয়ে গেলুম। মুচিপাড়ায় গিয়ে এদের চারজনকে ডেকে আনলুম। লণ্ঠন আর লাঠিসোটা নিয়ে খুঁজতে শুরু করলুম। নিচের থেকে একটু আগে আমাদের একজন দেখেছে আপনি হ্যারিকেন নিয়ে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন। তাই তো সময় মত গিয়ে আপনাকে ধরতে পারলুম। নইলে কি সর্বনাশটাই হতে যাচ্ছিল।'

'আমি বললাম, 'শোনো, মেশোমশাইকে এসব কথা কিছু বলো না। এই নাও, এই টাকাটা রাখো। তোমরা মিষ্টি খেয়ো সবাই।' বলে ওদের কিছু টাকা দিয়েছিলাম। সকলেই খুশি হয়েছিল। তারপর থেকে ভোর হওয়া পর্যন্ত ওরা আমার কাছেই থাকল। আমি কি দেখেছি না দেখেছি কিছুই বলিনি ওদের। ওরাও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু একজন কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে জানতে চাইল,' বউটির গায়ে আন্দাজ কত ভরি গয়না ছিল?'

'আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি কখনো ওই বউটির আনাগোনা টের পেয়েছো? বউটি খুন হয়েছিল কবে?'

'রামকান্ত বলল, 'এ সব ডাক্তার সাহেবই জানেন। তার মুখ থেকেই আর পাঁচজন এসব ঘটনা শুনেছে।'

'আমি আর কোনো কথা বললাম না। আমার রাতের সেই বুক-চাপা-পাথর- ভারের মত বিষাদের অনুভবটার কথা মনে করে তখনো কেমন আচ্ছন্ন লাগছিল। পরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত ওই অনুভবের স্মৃতিটা আমায় খুব ভাবিয়েছে। বছর দুয়েক পরে একবার তো আমি স্রেফ সেটা পরখ করতেই আবার গেছিলাম মেশোমশাইয়ের ওখানে। কিন্তু ততদিনে সে বাড়ি ভেঙে ওই জায়গায় মাল্টিস্টোরিড হাউস-কমপ্লেক্স তৈরী হয়ে গেছে।'

একটানা এতোটা বলার পর ডক্টর সান্ন্যাল এই প্রথম থামলেন। বাংলোর আর্দালিটা এই সময় আমাদের সকলের জন্যে কফি আর পাকোড়া নিয়ে হাজির হয়েছে। শর্ত ছিল কোনো রকমের প্রশ্ন করা চলবে না, তাই আমরা কেউ কিছু বলছিলাম না। কিন্তু অন্যদের মত তখন আমার মুখেও প্রশ্ন এসে আটকে আছে। প্রথম প্রশ্ন গয়না পরা সেই বউটি ডক্টর সান্যালেব গপ্পে একবারও আসেনি কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, দোতলার ওই ঘরের দুঃখ-ছায়া। ব্যাপারটা কি।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ডক্টর সান্ন্যাল মোমের আলোয় আমাদের তিন বন্ধুর দিকে তাকিয়ে নিলেন একবার। তারপর বললেন, 'গল্পের শেষ অংশ কিন্তু এখনো বলিনি। শেষের দিকটাতে অন্য একটা চমক আছে— সেটা পরে বলবো। আগে ওই মন ভার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বলে নিই।'

'প্যারানর্মাল সাবজেক্টটাকে নিয়ে তারপর তো কম পড়াশোনা করিনি। কিন্তু বহু বছর ধরেই আমি ওই ব্যাপারটার কোনো রকমের নজির পাচ্ছিলাম না। তারপর হালে, কলিন্স উইলসনের মিস্টিরিস্ বইটিতে পেয়েছি 'থট্ প্রজেক্সন' কথাটা। অতৃপ্ত আত্মার দুঃখ, স্থানের সীমায় ঘন হ'য়ে সঞ্চিত থাকে। ওই এলাকায় ঢুকে পড়লে সেই বিষাদ অন্য মানুষের

মধ্যেও সংক্রামিত হবে। এবার গল্পের শেষটুকু বলি।

'যা বলছিলাম, পরদিন সকালে রামকান্তের ওখান থেকে মেশোমশাইয়ের কাছে এলাম যখন, সদ্য ঘুম থেকে ওঠা মেশোমশাই আমায় দেখে হেসে বললেন, 'কেমন হ'লো— তোমার ভৌতিক মালমশলা যোগাড়?'

'ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলাম, 'ভালোই।'

'মেশোমশাই হেসে বলেছিলেন, 'ঝলমল করে মল বাজিয়েছে? নাকি চাপা হাসির সঙ্গে চুড়ির শব্দ শোনা গেল?'

'আপনার গল্পের সঙ্গে আমার দেখার কোনোরকমেব মিলই নেই, আমি তো অন্যরকম দেখেছি।' 'অন্যরকম! অন্যরকম কি?' এবার মেশোমশাই সত্যি-সত্যিই চমকে উঠলেন। তার চোখ মুখের ভাব একেবারে পাল্টে গেল। আমি একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিযে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগের রাতের সব ঘটনা খুলে বললাম।

'শোনার পর মেশোমশাই কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পাবলেন না। তাব মুখেব রেখায় তখন রীতিমত আতঙ্ক জেগে গেছে। খানিক পরে বললেন, 'ঠিকই দেখেছ তুমি।' আমি বললাম, 'কিন্তু মেশোমশাই, এর আগে যারা দেখেছে তারা সবাই তো দেখেছে খুন হয়ে যাওয়া বউটিকে।'

'তারা কেউ বাড়িটার ভেতবে যায়নি। আসলে তাবা কেউ সত্যিসত্যি কিছু দেখেনি। আমার গল্পটা তাদের কল্পনাকে উস্‌কে দিয়েছে খানিকটা করে।'

'মানে?' আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

'মানে, ওই বাড়িতে সোনার গয়নার লোভে কোনো বউ খুন হয়নি। ওটা আমাব বানানো গল্প। এ তল্লাটে আমি ছাড়া আর পুরোনো লোকতো কেউ নেই। আমার গল্পটা চালাতে তাই অসুবিধা হয়নি। আজ আমি তোমাকে খুলেই বলি, ওই ভুতুড়ে গপ্পোটা ছেড়ে আমি বেশ কিছু লোককে বোকা বানিয়েছি। যারা ওই বাড়ি এবং জায়গা কিনতে এসেছে তাদেরকে আমি ওই গপ্পোটা বলে খানিকটা ভয় ধরিয়ে দিতে চেয়েছি। ওখানে গোটা জায়গাটা জুড়ে মাল্টিস্টোরিড্ বিল্ডিং উঠলে আমার বাড়িটার দশাটা কি হবে ভেবে দ্যাখো। দক্ষিণটা পুরো আটকে যাবে।'

'কিন্তু বাড়িটা পোড়ো বাড়ি হ'ল কি করে?'

'মেসোমশাই আমার প্রশ্ন শুনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন প্রথমে। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'ওই বাড়িতে যারা ছিল তাদের মধ্যে এক বয়স্ক পাগল এক দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মারা যায়। তার মুখটা বিশ্রী রকমের ঝলসে গেছিল। ওই ঘটনার কিছু দিনেব মধ্যে ওদের উনিশ বছরের সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেটি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তারপরই ওরা বাড়ি ফাঁকা করে, তালা বন্ধ করে বম্বে চলে যায় রামকান্তের বাবাকে কেয়ার-টেকার করে যায়— পরে রামকান্ত সেই চাকরি করে যাচ্ছে।

'আমি অবাক হয়ে বললাম, 'বাড়ির খদ্দেরদের আপনি তো আসল এই ঘটনাই বলতে

পারতেন। এর প্রতিক্রিয়া কি কম হ'তো?'

'আবার খানিকটা সময় চুপ করে থাকলেন মেশোমশাই। তারপর নামানো গলায় বললেন, 'কোনদিন কাউকে বলিনি। আজ বিশ বছর পর তোমাকে বলছি। ছেলেটির সাধারণ অসুখ-বিসুখে আমিই ওষুধ দিতুম। একদিন কথায় কথায় ওকে বলেছিলুম বংশে পাগলের রোগ থাকলে, পাগল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় সে বংশের মানুষদের মধ্যে। আমার ওই অসতর্ক মন্তব্যটা যে সুস্থ ছেলেটাকে ওভাবে পাগল করে ছাড়বে ভাবতে পারিনি। ছেলেটির আত্মহত্যার পর থেকে একটা অপরাধ-বোধ কুরে কুরে খেয়েছে আমাকে।'

এই পর্যন্ত বলে ডক্টর সান্যাল আমাদের তিন বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন। বোধহয় দেখতে চাইলেন, তিনজন ভূত অবিশ্বাসী বন্ধুর ভাবনার মধ্যে কোথাও একটু চিড় ধরেছে কিনা।

পিশাচ

অনিন্দ্যশঙ্কর রায়

বেশ কিছুদিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেও শেষ অবধি আমার বদলির আদেশটা ঠেকাতে পারলুম না, আমাকে চলে আসতে হল কলকাতার বাইরে।

যেখানে পোস্টিং হল, সে জায়গাটার নাম হোসেনপুর। আমাদের পশ্চিম বাংলার মধ্যেই সীমান্ত অন্তবর্তী একটি ছোট জায়গা, যাকে ঠিক গ্রামও বলা যায় না, আবার শহর তো নয়ই।

ভয়ে কয়েকদিন সিঁটিয়ে রইলুম। কেন না, খবর আছে জায়গাটি বড্ড স্পর্শকাতর। খুব অল্পেতেই নাকি সেখানে দুন্ধুমার কান্ড বেঁধে যায়। হবেই বা না কেন? তার গা ছুঁয়ে কলকলধ্বনিতে ছুটে চলেছে পদ্মানদী, একটি ছোট্ট নৌকা চেপে সেই নদী পার হলেই একেবারে ভারতবর্ষের বাইরে চলে যাওয়া যায়। সীমান্তবর্তী স্থান বলে হয়ত হোসেনপুর সবসময়তেই একটা ধারাবাহিক অপরাধ প্রবণতার ব্যাধিতে ধুঁকছে, লোকে বলে যে এখানকার মিশানো মাটিতেই নাকি দোষ আছে। হয়ত তাই, কিন্তু আমি বেশি চিন্তিত ছিলাম দশমাস

আগেকার একটা বীভৎস ঘটনার কথা মনে করে! কেবল আমি একাই নই, দেশবাসীও সকলেই জানে সেদিনের সেই ব্যাপারটার কথা।

নদীর ওপারে বাংলাদেশ, এপারে ভারত। দুই দেশের দুই ভিন্ন আইন। তাই চোরাচালান এখানে অবাধ। ছোটখাট খুনজখম দাঙ্গাহাঙ্গামা এখানকার নিত্যকার ঘটনা। এমন কি হোসেনপুরের খুদে খুদে ঝুপড়ি দোকানের মালিকগুলোও পর্যন্ত বেআইনী বিদেশী জিনিস নিয়ে নির্ভয়ে প্রকাশ্যে লোফালুফি করে। প্রশাসন শিথিল, সরকারী বাহিনীর একাংশ চরম দুর্নীতিগ্রস্থ। ঝোপ বুঝে কোপ মারার সদা প্রচেষ্টা ; সীমান্তের চোরাই চালানকে তারা প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে মাসে হাজার হাজার টাকা ও মাইনের অতিরিক্ত কামাই করে যাচ্ছে।

কিন্তু আজ থেকে দশ মাস আগে হোসেনপুরে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা ভয়ানক। অশান্তির অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল! দপ্ করে করে সেদিনের অখ্যাত হোসেনপুর ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল, দেশের প্রায় সবকটি কাগজেরই শিরোনামা হয়ে পড়েছিল ব্যাপাবটা।

সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই যা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে— সেই সর্বনাশের বীজ হোসেনপুরে বহুদিন ধরে সবার অগোচরে যত্রতত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তারই ফল ফললো হঠাৎ! তুচ্ছ কারণে এমন এক জাতিগত হিংসার লেলিহান শিখা দুর্দমগতিতে চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ল, যেটা রুখবার ক্ষমতা সেই সময় কারুর ছিল না, ঐ অপদার্থ জেলাপ্রশাসনের তো নয়ই।

পরবর্তীকালে, বেসরকারী হিসাবে তো বলে যে সেই হিংসার বলি হয়েছিল কম করেও তিনশোজন মানুষ! ক্ষয়ক্ষতি সীমাহীন।

ঐ সমস্ত কারণেই আমি সেখানে না যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের অফিসের ম্যানেজমেন্ট বড় কড়া ; তাদের কাছে আদেশ মানে আদেশ, সেখানে নড়চড় হবার কোন উপায় নেই। তুমি যাবে না কারণ তোমার সেখানে যেতে ভয় লাগছে ; কিন্তু তোমার বদলে অন্য যাকে পাঠাবো, তার কি ভয় লাগবে না? অথচ অর্ডারটা আখেরে তোমারই। তাই, হয় যাও—কিম্বা অফিসের ছাপানো যে ফর্ম আছে, তাতে একটা পদত্যাগপত্র লিখে দিয়ে এক্ষুণি চলে যাও, তুমি ছাড়লে আমরা এ চাকরিতে অন্য ছেলে পেয়ে যাবো।

আমাদের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সাহেবের ধারালো বাক্যবাণে পুড়তে পুড়তে বাড়ি ফিরে এলাম! তবে আশাভঙ্গের মধ্যেও আমার সান্ত্বনা একটিই, যে অর্ডার শুধু আমার একারই নয়, অন্য দুটি বাইরের ছেলের নামেও করা হয়েছে। তাদের একজন শিলিগুড়ির, অপরজন আলিপুরদুয়ার।

প্রকৃতপক্ষে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করার জন্যই আমাদের ব্যাঙ্ক সরকারের নির্দেশে হোসেনপুরে একটা ছোট শাখা অফিস খুলেছে। চাকরিতে আরো উন্নতির পরীক্ষায় যারা পাশ করে বসে অপেক্ষা করছিলুম, তাদের মধ্যেই বেছে বেছে তিনজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হোসেনপুরের চাষীদের ব্যাঙ্ক ঋণে সাহায্যের জন্য।

এখন জানি না, কতদিন এখানে থাকতে হবে?

হোসেনপুরে এসে দেখি এখানে যেন এক যুদ্ধবিধ্বস্ত ভয়াবহ পরিবেশ। চতুর্দিক থমথম করছে, মানুষ এখানে ফিসফিসিয়ে কথা কয়, এমনকি ডালে বসে একটা পাখিও গান গায় না গলা ছেড়ে। এ কিরকম অদ্ভুত অবস্থা? আমি জীবনে কোন দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল এর আগে কখনো দেখিনি। হোসেনপুরের মাটিতে পা দিয়ে আমি একটি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলুম। দশমাস আগের মানুষের রক্ত নিয়ে সেই ভয়াবহ হোলিখেলার স্মৃতি আজও যেন সাধারণ মানুষের মনে এক নিশাকালীন দুঃস্বপ্নের মতন এঁটে বসে আছে, এ বুঝি এক আতংকপুরী। এখানে আনন্দ নেই, শান্তি নেই, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তো অনেক দূর। আমরা ব্যাঙ্ক খুলে বসে থাকি, কিন্তু দিনের মধ্যে সাত-আটজনের বেশী গ্রাহকও আসে না। বাইরে বেরিয়ে যদিও বা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আগ্রহসহকারে আলাপ পরিচয় করতে যাই, কিন্তু সেও দেখি একটা দায়সারা গোছের উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কিন্তু সুযোগ পেলে তারাই মাঝে মধ্যে ত্যাড়াবাঁকা জবাব দিতেও ছাড়ে না, ভাবখানা এমন, যেন— দেখছো আমাদের এই ভীষণ অবস্থা, আর তারই মধ্যে তোমরা শহর থেকে এখানে ব্যাংক খুলে সহানুভূতি জানাতে এসেছো? যাও ভাগো এখান থেকে।

ব্যাংকের অন্য দুটি ছেলে, স্বদেশ আর নিরঞ্জন —যারা একই সঙ্গে বদলীর হুকুম পেয়ে হোসেনপুরে এসেছে, তারা দুজন আর আমি মিলে একটা মেস বানিয়ে এখন একসাথেই থাকি। আমরা কেউ রাঁধতে জানি না, তাই খাওয়া-দাওয়া করবো বাইরে, রাত্তিরে রোজ মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে মাইলখানেক দূরে বাজারের কাছে একটা হোটেলে খেতে যাবো শুনে হোসেনপুরের একজন লোক ঠোঁট উলটে বলে — অত বেশি সাহস দেখাবেন না মশাই, তাহলে বেঘোরে সব পৈত্রিক জানগুলো খোয়াবেন! জানেন, ঐ যে মাঠ — সেখানে কত মানুষের লাশ দাঙ্গার সময় শিয়াল কুকুরে টেনে টেনে খেয়েছে?

আমি শুনে বললুম — তাতে কি? এখন তো আর লোক মরছে না, অবস্থা তো এখন স্বাভাবিক।

— হুঁ, স্বাভাবিক! তাহলে তো কোন কথাই ছিল না, অতগুলো মানুষের অপঘাত মৃত্যু, সে কি আর এমনি এমনিই বসে থাকবে? আজকাল তো রাত্রে ঐ মাঠে কেউ হাঁটেই না।

— হাঁটে না! কেন হাঁটে না?

লোকটা অতঃপর বিতৃষ্ণভাবে হাসল — ওমা তাও জানেন না! অথচ ড্যাং ড্যাং করতে করতে এখানেই এসেছেন চাকরি করতে? পিশাচ, বুঝলেন দাদা, পিশাচ! হোসেনপুর দাঙ্গার পরে এখন প্রেত-নগরী হয়ে গেছে। আজকাল রাতের অন্ধকারে পিশাচের দল মাটির তলা থেকে উঠে আসে, তারা খুঁজতে থাকে জ্যান্ত মানুষ! তাদের চোখের সামনে একবার পড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু, মানুষের রক্ত পান করতে তারা বড় ভালোবাসে। এরা কি করে হল তা জানেন? এখানে যারা খুন হয়েছে বা অপঘাতে মরেছে, তাদের প্রেতাত্মাগুলোই নতুন দেহ নিয়ে হয়েছে পিশাচ! অন্ধকারের ভিতর এদের চেহারাগুলি তো আর দেখেননি, দেখলেই

বুঝতে পারতেন এরা কোনো বয়সটয়স বিচার করে না, জাতি ধর্মও দেখে না, একমাত্র প্রিয় জিনিস শুধু তাদের মানুষের তাজা রক্ত!

লোকটা তারপর খুব উত্তেজিত হয়ে অনেক কথাই বলে গেল। তার মুখ থেকে শুনলাম, গোটা হোসেনপুরটাই যদিও আজ সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভৌতিক আতঙ্ক আমাদের মেসবাড়ির সামনে যে প্রকাণ্ড চেহারার গোলামগঞ্জের মাঠ — সেইখানেই নাকি সব চাইতে বেশি! পিশাচ নাকি ঐ মাঠের মধ্যেই বেশি ঘোরে। তাছাড়া ঐ যে দূরের গ্রামগুলি, সেইগুলোও গত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, ওসব জায়গায়ও আজকাল আর কোন মানুষ থাকে না। একটা ঘরও কি আর আস্ত রয়েছে নাকি? ঐ হোসেনপুরবাসী বললো —আপনারা খববদার অন্ধকারে বেরুবেন না, সারাদিন অভুক্ত থাকলেও নয়। বলিহারি বুদ্ধি বটে আপনাদের, গোলামগঞ্জের মাঠে কি আজকাল রাত্রিবেলা কোনো লোক হেঁটে বেড়ায়? কাউকে দেখেছেন কি হাঁটতে? বলছি তো, ওখানে গিয়ে চাবচারটে জোয়ান মানুষই এখন অবধি সাবাড়। আপনাবা যদি হাঁটেন, তো মড়াব সংখ্যা আরো বাড়বে — বলুন না, তাই কি চান? তাই যদি শখ হয় তো যান, রাত্রে পিশাচের পাল্লায় পড়ুন গিয়ে, আমি আর কি করবো, আমি তো আব আপনাদের হাত ধবে চেপে রাখতে পাবি না? হুঁ, যতসব জঞ্জাল এসে হোসেনপুবে জুটেছে। কেন যে মরতে এবা আসে, বুঝে পাই না?

এদিকের লোকগুলোর কতাবার্তার ধবনধারণই কেমন কাঠখোট্টা, এদের দেশে দাঙ্গা হবে না তো হবে কোথায়? এখনও পর্যন্ত আমি একটি মাত্র ভদ্রলোকই শুধু দেখেছি, যাক — পবে আসছি সে কথায়।

তারপব এই চাষাড়ে লোকটাকে স্বদেশই শেষ পর্যন্ত গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিল। আব, ঐসব ফালতু গুলগপ্পে কান না দিয়ে আমরা তিনজন বাতে একসঙ্গে হোটেলে খেতে যাই, অবশ্য হাতে থাকে টর্চ। মাঝে মাঝে মাঠেব মধ্যে অন্ধকারে খসখস শব্দ শুনে চমকে আলো জ্বালিয়েই দেখতে পাই যে হয় একটা গোদা মেঠো ইঁদুর, কিংবা খ্যাঁকশিয়ালের বাচ্চা। কখনো বা চাঁদের আলোয় ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় ধূসর বঙের একটা প্যাঁচা। তৎক্ষণাৎ অর্জুন গাছের মগডালে শুরু হয়ে যায় আক্রান্ত কাকেদেব প্রবল আর্তনাদ। হঠাৎ অদ্ভুত সুরে কেঁদে ওঠে কোন এক অসুস্থ কুকুর। কিন্তু এর বেশি আব কিছুই আমরা দেখি না, মানুষ তো দেখতে পাইই না।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম— হোসেনপুরের একজন অতিসজ্জন জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের আলাপ হয়েছে, তার নাম সাজ্জাদ আলি রহমান। তিনি ঐতিহাসিক, এককালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, দিল্লিতেও করেছেন বেশ কিছুকাল, এখন অবশ্য রিটায়ার্ড।

যদিও তিনি বয়সে অনেক বড়, তবু তাঁর সঙ্গে সব বিষয় নিয়েই আমরা খোলাখুলি আলোচনা করি, কখনো-সখনো রীতিমতো তর্কও শুরু হয়ে যায় আমাদের মধ্যে। একদিন

তো আমি স্থানীয় লোকেদের পিশাচ সম্মর্কিত কুসংস্কারের কথাটিও তাঁকে বললুম। ভেবেছিলুম যে, তিনি পণ্ডিত মানুষ, তার উপর আবার একজন কুসংস্কারবিরোধী মুসলমান ঐতিহাসিক, তাই নিশ্চয়ই ব্যাপারটা শুনে খুব হাসবেন, কিন্তু অবাক কাণ্ড, যে দেখলুম রহমান সাহেবও রীতিমতন গম্ভীর হয়ে বললেন — হ্যাঁ, আপনারাও তাহলে ওটা শুনেছেন? রাত্রে কিন্তু বাড়ির বাইরে বেরুবেন না। আর যদি একান্তই বেরুতে হয়, তবে মাঠের উপর দিয়ে কখনো হাঁটবেন না, কারণ সেখানে পিশাচ আছে। আমি তাদের দেখেছি।

— আপনিও তাদের দেখেছেন! বলেন কি?

রহমান সাহেব বললেন — হ্যাঁ দেখেছি, হোসেনপুরে পিশাচ দেখা আর আশ্চর্য্যের ব্যাপার কি? আজ পর্যন্ত অনেকেই দেখেছে। এই জায়গায় পিশাচ বেরুবে না তো বেরুবে কোথায়, আপনাদের ঐ শান্তির শহর কলকাতায়? এখানে কদিন থাকুন না, আপনারাও সব দেখবেন।

পরে ওনার কথাগুলো শুনে আমার বন্ধু দুজনও দারুণ অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোক কি হঠাৎ বার্ধক্যে পড়ে গেলেন, নাকি আমাদের মতন শহরের ছেলেদের পেযে কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল জোকস করে নিতে চান? কিন্তু ওঁর মত মানুষ কি শেষপর্যন্ত একটা গেঁযো অশিক্ষিতের মতন ব্যবহার করবেন? আশ্চর্য্য!

কিন্তু নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরাও একটি সময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলাম। এটা তো ঠিকই, যে মাঠে ঢুকলে আর হাওয়া পাই না? চতুর্দ্দিকে বিকট রকমের গুমোট ভাব, কেমন একটা বিশ্রী উগ্র গন্ধ। ঠিক পচা নয়, আবার পোড়াও নয়, কিন্তু গন্ধটা খুব অদ্ভুত। নাকে একবার ঢুকলেই রীতিমতন অস্বস্তি বোধ হয়। এবং রাত্রি ঠিক আটটা বাজলেই একটা কুকুর খুব খারাপ ভাবে মাঠের মধ্যে শব্দ করে কেঁদে ওঠে। কুকুবে কাঁদা মানেই, ছোটবেলা থেকে জানি যে একটা অশুভ ইঙ্গিত। কিন্তু আরো অস্বাভাবিক ব্যাপার, যে রাত্রে মাঠ তো দূরের কথা, তার ধারকাছ দিয়েও আমরা ছাড়া আর কোন মানুষ হাঁটে না কেন? একজনেরও কি কোনোদিন রাত্রে ওষুধ কেনা, বা ডাক্তার ডাকাবও প্রয়োজন হয না? খুবই অদ্ভুত পরিবেশ।

এই ভাবে দিন যায়। একদিন হঠাৎ স্বদেশ কিছুদিনেব ছুটি নিয়ে বাডি গেল, রইলুম আমি আর নিরঞ্জন। সেদিন রাতে যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা দুজন মেসে ফিবছি, সহসা আকাশখানা লাল হয়ে কাল বৈশাখী শুরু হয়ে গেল। তখনই বুঝেছিলাম যে এ আমাদের শহরে বসে বাড়ির জানালা ফাঁক করে দেখা সেই পরিচিত শৌখীন ঝড় নয়, এর গতিপ্রকৃতিই অন্যরকম ; একরাশ দুরন্ত বাতাসের কুণ্ডলী মাঠের বুকে গজরাতে গজরাতে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে, অসাধারণ শক্তিতে নিমেষেই কাৎ করে ফেলছে নুইয়েপড়া কোনো গাছের মোটা ডালকে।

আমরা অবশ্য খুব সাবধানেই হাঁটছি। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ধূলোর ঝাপটা। কিন্তু তার সঙ্গেই বুকের রক্ত হিম করে দেওয়া ঝড়ের একটা অপার্থিব নেপথ্য হুংকার, কই —

এবকম তো আগে কোনদিন শুনিনি! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, তবুও আমরা সন্তর্পণে শবীর বাঁচিয়ে ফিরে এলাম মেসে।

কিন্তু আমরাও কি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইনি? কপালে ভ্রূকুটি পড়েছে দুজনের। চলতে চলতে আজ আমার কেন জানি না বারেবারেই শুধু মনে হচ্ছিল যে ঝড়ের মধ্যে কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে। যে পিছু নিয়েছে সে মানুষ নয়, এমন কি পার্থিব পৃথিবীর কোন জীবও নয়; অবশ্য মাথা ঘুরিয়েও আমি সরাসরি কাউকে দেখতে পাইনি। মেসে ফিরে নিরঞ্জন প্রকারান্তে যতই তার মনে সন্দেহটা উত্থাপন কবতে চেয়েছে, আমি ততবারই তাকে নিরস্ত করেছি, আসলে আমার ধনুভঙ্গ পণ, সংস্কারের কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াবো না। এখনও অবধি যার প্রমাণ পাইনি, তাকে বিশ্বাস করবোই বা কেন?

কিন্তু পরদিন নিরঞ্জন হঠাৎ জ্বরে পড়ল। সে রাত্রে চিঁড়ে মুড়ি খেয়েই শুয়ে পড়েছে, কিন্তু আমার হল মুস্কিল, আজতো তাহলে আমাকে একাই হোটেলে খেতে যেতে হয? একবার ভাবলাম থাক, আজ রাত্রে আর একলা গিয়ে কাজ নেই, কিন্তু পরক্ষণেই আমার 'ইগো' তে একটা খুব বড রকমের আঘাত লাগল। ছি ছি ছি কোথাকার একটা গেঁজেল কুসংস্কার, আর আমি কিনা তাতেই ভয় পাচ্ছি? তৎক্ষণাৎ স্থিব করলুম যে যাইই মনে হোক না কেন, আজ রাত্রে আমি একলাই যাবো এবং গিয়েই প্রমাণ করে দিয়ে আসবো যে গোলামগঞ্জের মাঠকে খামোখা ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু এতদিন বাদে বুঝতে পারছি যে আমার সেদিনের গোঁয়ার্তুমী ছিল শুধু একতাল ভীতির উপর একটুখানি ফিনফিনে ঠুনকো বর্ম।

অসুস্থ নিরঞ্জনও অবশ্য আমাকে পই পই করে বারণ কবেছিল। বলেছিল — ভালোকথা বলছি, তুমি আজ একলা ঐ নির্জন মাঠের উপর দিয়ে যেও না, চেযে দেখো আকাশটা, আজও আবার ঝড় আসছে।

আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললুম — কি হবে, আমাকে পিশাচে ধরবে?

নিবঞ্জন তখন অধৈর্য্য হয়ে বললো — সত্যি, তোমাকে নিয়ে আব পারা গেল না! কিছুই না হোক, মাঠের মধ্যে বিষাক্ত সাপ বা পাগলা শিয়ালওতো থাকতে পারে?

— হ্যাঁ পারে। আমি বললুম — সে তো দুজন বা তিনজন থাকলেও বেরুতে পারে। কিন্তু এতদিন যখন তারা দর্শন দেয়নি, তখন আজই যে দেবে তাইই বা ভাবছো কি করে? তুমি বরং এখন শুয়ে একটু বিশ্রাম নাও, আমি ততক্ষণ ঘুরে আসছি।

অগত্যা আমি জিদ করেই বেরিয়ে পড়লুম ঘর থেকে। কিন্তু দুর্ভোগ কিঞ্চিৎ বাড়ল বই কমল না, ভেবেছিলুম যে আজ একটু তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া করে সন্ধ্যের মুখেই মেসে ফিরে আসবো, এদিকে চেয়ে দেখি আকাশ ভর্তি ঘন মেঘ, মাটির বুকে তখনই গাঢ় অন্ধকার জমে গেছে। সেই আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে আমাকেএকলা আসতে দেখে হোটেলওয়ালারও মুখখানা থমথমে গম্ভীর হয়ে পড়ল, সে কি আমার জন্য দুশ্চিন্তা —

নাকি খদ্দেরের সংখ্যাল্পতা দেখে, কে জানে ?

তারপর যখন ফিরে আসছি, তখনই দেখি মাঠের উপর যথারীতি অন্ধকার, পরিবেশটা যেন আরো গুমোট হয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে প্রাণহীন ধরিত্রীকে চমকে দিয়ে আকাশের বুকে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। গতকাল পেয়েছিলাম কাল বৈশাখী, আজ হয়ত তার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টিও নামবে। আমি টর্চ জ্বেলে হেঁটে চলেছি। রাতের আকাশটা থমথমে লাল। সেখানে একটিও তারা নেই।

যা আন্দাজ করেছিলাম কিছুক্ষণের মধ্যে তাইই ঘটল। গোঁ গোঁ করে একরাশ খ্যাপা হাওয়া ঝড়ের বার্তাবাহক হয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল। তারই সাথে সাথে নামল ঝির ঝির করে বৃষ্টি।

মাঠে স্বভাবতই কোন লোক নেই, আমার সঙ্গেও বর্ষাতি কিংবা ছাতি কিছুই ছিল না, সুতরাং আমি টর্চ জ্বেলে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগলুম সামনের দিকে। বেশ কিছুটা দূরে যেখানে জোনাকীর মতন বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলছে, আমাকে এখন সেখানেই পৌঁছুতে হবে। তার ধারে কাছেই আমাদের মেস।

কিন্তু এই বর্ষণসিক্ত রাতের ভিতরও আজ আবার সেই গন্ধটা পেলাম। এখন যেন আরো উগ্র, আরো প্রকট। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলা গাঁয়ের শ্মশানেও একদিন এইরকমই একটু গন্ধ আমি পেয়েছিলাম, একি তারই মতন — না কি অন্য রকম? কিন্তু অকস্মাৎ এই গন্ধের কারণটা কি! এমন হাওয়া আর বৃষ্টির মধ্যে তো কোনো গন্ধ সহজে ভেসে আসবাব নয়?

পথ চলতে চলতেই ভাবছি যে ঝড়ের আওয়াজটা বড্ড বেশীরকম ধারালো, এ কি শুধু বাতাসেরই গর্জন, নাকি তারও আড়ালে অন্য কিছু? এক অপার্থিব জান্তব চিৎকার, তাহলে কি রহমানসাহেব একদিন যেটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ; আজ সেটাই মিলে যাচ্ছে! তিনি বলেছিলেন এখানে পিশাচ আছে, আপনিও একদিন তাকে দেখতে পাবেন।

সহসা রহমানসাহেবের কথাটা চিন্তা করেই দেহের প্রতিটি রোমকূপ আতঙ্কে খাড়া হয়ে উঠল। এখন যা বুঝতে পারছি তাতে এই ঝড়ের হুংকার, বাসী গন্ধ, এ সমস্তই এক আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস—আর আমার রক্ষা নেই। সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে আজ একা মাঠে নেমেছিলাম, সেই গোঁয়ারতুমীর ফল আমাকে ভোগ করতে হবে বই কি?

এই অভিশপ্ত গাঁ একদিন মানুষের তাজা রক্তে স্নাত হয়েছিল, নিতান্ত মূর্খের মতন যখন আমি তারই অশুভ গ্রাসের মধ্যে পা ফেলেছি আমার শেষ চিৎকারটাও সম্ভবতঃ কেউ শুনতে পাবে না। হ্যাঁ, আজ রাত্রে একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ রক্তপিপাসু প্রেত আমার পিছু নিয়েছে। ভালোই বুঝতে পেরেছি যে পিশাচ আমার পিছনে আসছে। তাকাই, আর দেখি মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতন একতাল জমাট অন্ধকার গুঁড়ি মেরে আমারই দিকে, তার সে যে কি বিভীষিকা—তা যে চোখে দেখে নি, সে বুঝবে না। ঐ সে এল, এল—আমাকে ধরল বলে—আমি তখন প্রাণভয়ে উন্মাদের মতন দৌড়তে লাগলুম!

সে এক কঠিন মুহূর্ত। টর্চটা কখন হাত থেকে পড়ে গেছে। আর আমি ছুটছি! ছুটতে

ছুটতেও প্রতিমুহূর্তেই করছি মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা। হিংসায় জর্জরিত রক্তপাগল পিশাচ তখন আমার পিছন পিছন হুংকার দিতে দিতে দৌড়ে আসছে! তার লক্ষ্যবস্তু একজনই। ঝড়জলের রাত্রে রক্তের সন্ধান পেয়ে আর কি সে ছাড়ে? ঐ অশুভ কুকুরটাও চিরাচরিত ভঙ্গীতে ডুকরে কেঁদে উঠল।

মনে হচ্ছিল যেন পুরো একটি যুগ ধরে দৌড়ুচ্ছি। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি যদি কোনোগতিকে ঐ সচল বিভীষিকার দংশন থেকে মুক্তি পাই, এবং ভাবতে ভাবতেই মাঠের একেবারে সীমানার কাছে প্রচণ্ড হোঁচট খেয়ে আছড়িয়ে পড়ছিলুম মাটির উপর। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারে আবিভূর্ত হয়ে কে যেন দেবদূতের মতন আঁকড়ে ধরলেন আমার দেহটাকে ! আমিও আর পারি না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তখনও মনে হচ্ছিল তিনি কে, তিনি কি স্বয়ং ঈশ্বর— যদি না হন, তবুও তাঁকেই নমস্কার।

কতক্ষণ যে অ চৈতন্য হয়ে পড়েছিলুম, তা এখন বলতে পারি না। চোখটা খুলেই দেখি আমি একটি সাধারণ ঘরে অতি সাধারণ পালংকের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছি, আর সামনেই বসে পরমস্নেহভরে আমাকে বাতাস করছেন সাজ্জাদ আলি রহমানসাহেব। হেসে বললেন —কেমন আছেন, গায়ে ব্যথাট্যাথা নেই তো?

আমি তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বললুম —পিশাচটা কি এখনও তাড়া করে আসছে!

রহমানসাহেব তৎক্ষণাৎ আবার হেসে উঠে বললেন —না, সে আর এখানে নেই।

আপনি নিশ্চিন্তে আমার ঘরে থাকতে পারেন।

— এখানে কি করে এলাম?

সাজ্জাদ আলি রহমান বললেন — আমি রাত্রে ছাত্র পড়িয়ে মাঠের পাশের একটা রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে শুনতে পেলাম আপনার আর্ত চিৎকার! তখনই আমি গোটা কয়েক ছাত্রকে যোগাড় করে মাঠের মধ্যে ঢুকে আপনাকে তুলে নিয়ে আসি। দেখলেন তো, কত ছেলেমানুষ আপনারা? তখনই যদি জেদ করে মাঠের উপর দিয়ে অন্ধকারে না হাঁটতেন, তাহলে কোনো বিপদই হত না। আল্লার অশেষ দয়া, তাই আজ আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি! নইলে ঐ গোলামগঞ্জের মাঠে রাত্রে কেউ একা হাঁটে? ছিঃ।

আমি শুনে অভিভূত হয়ে বললুম —আপনি আজ আমার জীবনরক্ষা করেছেন রহমানসাহেব। আপনি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন, এখানে পিশাচ আছে।

সাজ্জাদ আলি ম্লান হাসলেন — হ্যাঁ পিশাচ তো থাকবেই! আমরা নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধালাম, এ ওর রক্ত তুলে মুখে মাখামাখি করলাম, আর এখানে পিশাচ থাকবে না? আনাচে-কানাচে অন্ধকারে, এখানেই তো মানুষ বেশি দেখবে পিশাচ।

— কিন্তু রহমানসাহেব, আমরা যখন দলবেঁধে অন্ধকারে মাঠে হাঁটি, তখন কেন পিশাচ

দেখি না? একা থাকলেই কি যত বিপদ!

সাজ্জাদ আলি বললেন — দেখুন, ভয় অবিশ্বাস কিংবা আতংক, এসব তো নিঃসঙ্গতার মধ্যেই বেশি করে জন্ম নেয় —তাই নয় কি? তাহলে আপনাদের পিশাচই বা কেন জন্মাবে না, বলুন? এখানকার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ আজও দাঙ্গার ভযাবহ স্মৃতির দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, প্রতিনিয়তই তাদের আশংকা, এই বুঝি জাগল —পিশাচ আবার জেগে উঠল! সে জাগলে তো আর রক্ষা নেই কারো। তা বলুন, এই পিশাচকে রুখবে কে, সত্যিকারের ভূতপ্রেত বার হলে তো মানুষ কবেই ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক করে সেগুলোকে হাঁকিয়ে দিত, কিন্তু এই যে পিশাচ এখন হোসেনপুরের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, এতো হাজার হাজার অপদেবতার চেয়েও বেশি ভয়ংকর! একটি প্রাচীন বটগাছের শিকড়ের মতন আজ হোসেনপুরের প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, সেই আতঙ্কই তো আজ পিশাচ সেজে তাড়া করে বেড়ায় মাঠের মধ্যে একা চলা মানুষকে। একটু আগে তারই শিকার হয়েছিলেন আপনি।

আমি অবাক হয়ে বললুম —সাজ্জাদসাহেব, তাহলে কি সত্যিকারের পিশাচ বলে এখানে কিছুই নেই? আমি আজ রাত্রে অন্ধকারে কি দেখলাম!

সমস্ত মানুষই যা দেখে, তাই দেখেছেন! মনের জগতে সৃষ্টি একরাশ কষ্টকল্পিত আতংক?

আমি তবুও রহমানসাহেবকে প্রশ্ন করতে ছাড়ি না — কিন্তু কেন দেখলাম বলতে পারেন?

রহমানসাহেব হেসে বললেন —এখানকার অন্য দশটা সন্ত্রস্ত মানুষের মতন এই পরিবেশে আপনিও আপনার অবচেতন মনে পিশাচই দেখতে চেয়েছিলেন, তাই-ই দেখতে পেলেন! যাইহোক, আর কোনো ভয় নেই আপনার — বিপদ কেটে গিয়েছে। এখন কষ্ট করে বসে এই দুধটুকু খেয়ে ফেলুন তো দেখি।

আমি ধীরে ধীরে উঠে বসি। শরীর ঝিমঝিম করছে। আতংকের ঘোরটা এখনও কাটে নি। কল্পনায় হোক কিংবা যেভাবেই হোক, আমি অন্ধকারের মধ্যে আমার পিছু পিছু যে জমাট দুঃস্বপ্নটাকে ছুটে আসতে দেখেছিলাম, তার কথা চিন্তা করেও আমার শরীর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে!
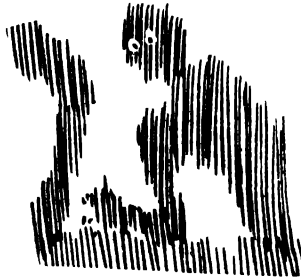
গাজোলের পীরবাবা

পোপো মুখোপাধ্যায়

আমাব আব তখন পিছোবার জাযগা নেই। দেওয়ালে একেবারে পিঠ ঠেকে গেছে। এক পা এক পা কবে এগোতে এগোতে কালো আলখাল্লা পরা সেই বিশাল মূর্তিটা তখন আমার এক হাতেব মধ্যে এসে গেছে। তাব গরম নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগছে। চোখ দুটো ভাঁটার মতন ঘুরছে। তার মাথা প্রায় ছাদে ঠেকেছে। মুখ দিয়ে ক্রমাগত লাল ঝরছে। মাঝেমাঝে হ্যাঁ করছে। দাঁতগুলো ধারালো ছুরির মতো চকচক করছে। আর এক পা এগোলেই আমাকে ধরতে পারবে। আমার সমস্ত স্নায়ু যেন অবশ হয়ে গেল। পালাবার রাস্তা নেই এটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের খাঁচাব ওপর দমাদম ঘা মাবছিল। একটা ঠাণ্ডা শিরশিবানি সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে গেল। এবার আমার শেষ।

এই পর্যন্ত বলেই আমি থামলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো স্বর চিৎকার করে উঠল, তাবপব? তারপর কি হলো? তুমি বাঁচলে কেমন করে? তারপর মূর্তিটা কি করল?

আমি চোখ বুজে চাযে একচুমুক দিয়ে বললাম, দাঁড়া যা টেনশন, আমারই গলা শুকিয়ে

যাচ্ছে। একটু গলা ভিজিয়ে নিই।

এবার ছোটদের সঙ্গে বড়রাও গলা মেলাল। আমার মাসতুতো দাদা তুষারদা বলল, তুই একেবারে মোক্ষম জায়গায় থামলি। এমন ক্ল্যাইম্যাক্সে পৌঁছে কেউ থামে?

আমি হেসে বললাম, ঐটাই তো আসল। কখন থামতে হবে এটা বড় লেখক আর বড় ওস্তাদ ছাড়া কেউ জানে না। তোমাদের আগ্রহটা ধরে না রাখতে পারলে আমার গল্প বলাই খতম।

এমন সময় মাসিমা ঢুকলেন। মিলিটারী অফিসারের মতো কড়া নির্দেশ দিয়ে বললেন, অনেক রাত হয়েছে, খাবার টেবিলে চলে যাও। খেতে খেতে গল্প হবে।

অগত্যা গুটিগুটি সবাই গিয়ে বসলাম খাবার টেবিল ঘিরে।

এই ফাঁকে যারা প্রথমের অংশটুকু থেকে বাদ পড়েছ, তাদের ছোট করে গল্পের মুখটা ধবিয়ে দিই। গল্প নয় ঠিক, আমার জীবনের সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা।

ঘটনাটি ঘটেছিল গতবছর শীতকালে মানে ডিসেম্বর মাসে। জায়গাটার নাম গাজোল। মালদা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। বাসের যোগাযোগ ভালই আছে। একদম গ্রাম এবং মুসলমান প্রধান। সেই গ্রামে এক মস্ত সাধক আছেন। তিনি পীরবাবা নামে খ্যাত। গোটা উত্তরবঙ্গে সবাই একডাকে চেনে। পীরবাবা অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কোনো শনিবার অমাবস্যা পেলে তিনি সারারাত কঠিন সাধনায় বসেন। সেই সময় তাঁর ওপর জিনের ভর হয়। ভরের মুখে তিনি অনেকের ভূতভবিষ্যৎ বলে দেন। গতবছর মালদায় দাদার মেয়ের অন্নপ্রাশনে গিয়ে এই খবরটা প্রথম আমার কানে আসে। দাদার ভায়রাভাই দিলীপদা পীরবাবার বিরাট ভক্ত। তাঁর ধারণা তিনি যা কিছু করেছেন মানে ব্যবসা-গাড়ি-বাড়ি সব কিছু ঐ পীববাবাব জন্যে। আমার আবার ও সবে একদম বিশ্বাস নেই। তাই দিলীপদার মুখে ওঁর কথা শুনেই আমি লাফিয়ে উঠলাম যাব বলে। দিলীপদা প্রথমে রাজী হননি, তাবপর জেদাজেদি করতে নিমরাজী হলেন। ঠিক হলো আমি, দিলীপদা আর বৌদি যাব। তবে দিলীপদা প্রথমেই আমাকে সাবধান করে দিলেন, বললেন, দেখ তুই বলছিস বলে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু গিয়ে বাবাকে যেন কোনোরকম পরীক্ষা-টরীক্ষা করতে যাস না। তাহলে কিন্তু নিজের বিপদ ডেকে আনবি।

আমি বললাম, আরে না না আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। আমি যথেষ্ট ভক্তি নিয়েই যাব। শুধু দেখব ভূত বা জিন উনি কি ভাবে নিয়ে আসেন। তাব সঙ্গে যদি উপরিপাওনা হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎটা জানা যায় তবে মন্দ কি।

আমরা প্ল্যানমতো শনিবার রাত আটটাব সময়ে স্টার্ট করলাম। দিলীপদা আর বৌদি সারাদিন উপোস করেছেন। ওখানে নাকি এই নিয়ম। আমি অবশ্য ওদিকে যাইনি। শরীরকে কষ্ট দিয়ে কিছু করা আমার ধাতে সয় না।

বেরুবার সময়ে বৌদি দেখি প্রচুর ফুল বেলপাতা বোঝাই একটা সাজি সঙ্গে নিয়েছেন। আমি আব কি নেব। গলায় ঝোলান ক্রুশটা মাথায় ঠেকিয়ে নিলাম। পকেটে নিলাম বিদেশী

চার্জার টর্চটা।

গাড়িতে সময় বেশিক্ষণ লাগল না। ন-টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে গেলাম। একদম গ্রাম, অধিকাংশ মাটির বাড়ি। আমরা যে বাড়িটার সামনে গিয়ে নামলাম সেটাও মাটির, তবে মাথাটা টিন দিয়ে ঢাকা সামনে অনেকটা উঠোন। একে শীতকাল, তার ওপরে অমাবস্যা। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। বারান্দায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছিল। আমরা সেইদিকে এগোলাম। কাছে গিয়ে দেখি দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা চাদর ঢাকা দিয়ে একটা হ্যারিকেনের পাশে বসে আছে। কারুরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। একটা কালো কুকুর পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। বাবার কথা জিজ্ঞেস করতে ওরা আমাদের বসতে বলল। বৌদি আর দিলীপদা ওখানেই বসে পড়লেন। আমি বসলাম না, বাড়িটার চারিদিক ঘুবে দেখতে লাগলাম।

মাটির বাড়ি হলেও বেশ শক্ত। পিছন দিকে অনেক বড় বড় পাথর ফেলা আছে, কি জন্যে কে জানে! আমি পিছনদিকে একটা দরজা-টরজা থাকবে আশা করেছিলাম। কিন্তু সে সব কিছুই নেই। সামনের ঐ একটা দরজাই সম্বল। আমি পিছনদিকে প্রতি ইঞ্চি জায়গা টর্চ দিয়ে তন্নতন্ন করে দেখছিলাম। পাশেই একটা বেলগাছ। তার ডালে উঠে ছাদে উঁকি মারলাম। কোনো কিছুই নেই। আমি হতাশ হয়ে যখন সামনের দিকে চলে আসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি একটা কালো মোটা লোক, চাদরে মুখ অর্ধেক ঢাকা আমার সামনে হাজির। আমি দারুণ চমকে গেছি। লোকটা ঠাণ্ডা গলায় বলল, এখানে কি করছেন? এদিকে আসা বারণ আছে জানেন না?

আমি বললাম, এখানে বাথরুম নেই কোনো?

লোকটি একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, ঐ দিকে চলে যান। এদিকে আর আসবেন না। বিপদ হতে পারে।

কোনো কথা না বলে আমি সামনে চলে এলাম, তবে লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না।

সামনে আসতেই দিলীপদা বললেন, কোথায় গিয়েছিলি, এ দিকে সময় হয়ে গেছে। ভেতরে চ'।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ঢোকার মুখে দেখি সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলল, আপনাদের কারো কাছে টর্চ নেই তো। থাকলে দিয়ে যান। ওখানে কোনো আলো জ্বালা চলবে না।

আমি টর্চ জমা না দিয়েই ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঢোকার মুখটা খুবই সরু। একজন করে লোক ঢুকতে পারে। তবে ঘরটা অনেকটা বড়। একদিকে টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। যতটুকু না আলো দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি ছায়া। সেই আলোয় দেখলাম এক কোণে পীরবাবা বসে আছেন একটা বাঘছালের আসনে। কালো আলখাল্লা পরা বিশাল চেহারা। সাদা দাড়ি অনেকটা ঝুলছে। মাথায় টাক, দু চোখ বোজা, গলায় পুঁতির মালা।

মালা জপ করছেন।

একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে মালা মাটিতে ঠক করে ঠেকাচ্ছেন। ঐ আওয়াজটা যেন ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে অনেকগুণ হয়ে আমাদের কানে বাজছে।

আমরা ছাড়াও ঘরে আরো দর্শনার্থী ছিল। বেশির ভাগই মহিলা। সবই গ্রামের দিকের। সবাইয়ের হাতেই ফুলের ডালা, মিষ্টির বাক্স। আমরা শহর থেকে এসেছি বলে বোধ হয় আমাদের সামনের জায়গাটা ছেড়ে দিল। আমরা মাটিতে বসলাম। মাটির মেঝে খুব ঠাণ্ডা।

আমি একটু পরেই উঠে দাঁড়ালাম। কবজি উলটে দেখলাম রাত সাড়ে বারোটা। তার মানে এখনো আধঘণ্টা। বাবার নাকি ভর হয় ঠিক একটার সময়ে। গ্রাম বলে বোধহয় চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সবাই একদৃষ্টে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পিছন ফিরে সেই লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করলাম। দরজায় এখন আর সে নেই। দরজাটা বন্ধ।

বাবার পেছনদিকে বিরাট ছায়া দুলছে। একদৃষ্টে তা দেখতে দেখতে আমার বোধহয় একটু তন্দ্রামতো এসেছিলো। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলাম। সোঁ সোঁ শব্দ করে বিশাল একটা কিছু বাড়ির চালায় এসে বসল মনে হলো। চালাটা মড়মড় করে উঠল। নিমেষের মধ্যে দেখি পীরবাবার দেহটা আরো লম্বা ও বড় হয়ে গেছে। মাথাটা প্রায় ছাদে ঠেকছে। চোখের মণিগুলো যেন বড্ড চকচক করছে। পাশ থেকে একজন বলল, বাবার ভর হয়েছে, আপনাদের যা প্রশ্ন করার করুন।

সবাই প্রণাম করে একে একে নিজের প্রশ্ন করতে লাগল। একটা খুব ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে দূর থেকে উত্তরগুলো ভেসে আসছিল। আওয়াজটা ঠিক যান্ত্রিক নয় আবার মানুষের গলাও নয়। কেমন অপার্থিব যেন। গায়ে কাঁটা দেয়। হঠাৎ সেই আওয়াজটা থেমে গেল। তার বদলে একটা বীভৎস স্বর ভেসে এল সে স্বর আমি কোনোদিন ভুলব না। অতিবড় সাহসীরও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায় সে স্বর শুনলে। সেই কণ্ঠস্বর বলল, আমাকে বারবার কষ্ট দিয়ে ধরে নিয়ে আসা —একবার যদি সুযোগ পাই তাহলে তোকে চিবিয়ে খাব।

পরমুহূর্তে একটা ঝটপট আওয়াজ কানে গেল। তারপরই দেখলাম পীরবাবা আবার নিজের আসনে বসে। দিলীপদা বললেন, বাবার নাকি রাতে দু তিনবার ভর হয়। আবার ভর হতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি হবে। আমি ভাবলাম এই ফাঁকে একটু বাইরে ঘুরে আসি। কিন্তু দরজার কাছে এসে দেখি তখনো তা বন্ধ। ওধার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একজন বলল, এক বার ঢুকলে ভর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে যাওয়া যাবে না। আমি আবার নিজেব জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এবার কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেই সেই আগের মতো ব্যাপার আরম্ভ হলো। এবার বাড়িটা এত জোরে কেঁপে উঠল যে মনে হলো ছাদ বুঝি ভেঙে পড়বে। সবে দু'একজন বাবাকে প্রশ্ন করেছে হঠাৎ ঘরের ভেতরেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। অবাক হয়ে ভাবলাম দরজা তো বন্ধ তবে এত হাওয়া আসছে কোথা থেকে? পীরবাবা মনে হলো টলছেন। টলতে টলতে ওঁর হাত থেকে সেই পুঁতির মালা

ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই হি-হি করে এক হিমশীতল হাসির শব্দ আর তার পরই মনুষ্যকণ্ঠের বীভৎস চিৎকার। সারা ঘরে যেন তাণ্ডব চলছে।

আলোটা আগেই নিভে গিয়েছিল। সামনে প্রচণ্ড ঝটপটানি হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পারছি না। ভয়ে সবাই এ ওকে জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ আমার মনে হলো পকেটেই তো টর্চটা আছে। তাড়াতাড়ি সেটা বের করে জ্বালিয়ে সামনে ফেললাম। যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম। পীরবাবা মাটিতে শুয়ে আছেন আর তাঁর বুকের ওপর একটা কালো রঙেব ভয়ঙ্কর মূর্তি। পীরবাবা প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। সেই মূর্তিটা দাঁত দিয়ে ওঁর গলার কাছটা কামড়াবার চেষ্টা করছে।

আমি টর্চ জ্বেলে এক পা এগোতেই সেই মূর্তিটা উঠে দাঁড়াল। আমি টর্চ জ্বেলেই আছি। সেই বিরাট মূর্তিটা এক পা এক পা করে এগোতে লাগল। আমি পিছোতে পিছোতে দেওয়ালে আটকে গেলাম। আমি ওব চোখের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছি না। বেশ বুঝতে পারছি, একটা কিছু না করলে ওটা আমাকে মেরে ফেলবে। পীরবাবার মন্ত্রপূত মালাটা যে কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে। ওটা পেলেও ঠেকান যেত, কিছু না পেয়ে আমি আমার শেষ সম্বল ক্রশটা গলা থেকে খুলে সামনে বাগিয়ে ধরলাম। মূর্তিটা থমকে গেল। তারপর এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল। ঠিক এই সময় আমার অবশ হাত থেকে টর্চটা মাটিতে পড়ে গিয়ে ঘরের ভেতরটা অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল। সেই অন্ধকারে অনুভব করলাম, বাড়িটা একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। তারপর সব নিস্তব্ধ। আমার গা দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে। ছুটে দরজার কাছে এসে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। দরজা খুলে গেল। আমি দিলীপদা আর বৌদিকে নিয়ে ছুটে বেরুলাম। তারপর কি ভাবে যে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি আমার কিছুই মনে নেই।

এই পর্যন্ত বলে দম নিতে আমি একটু থামি। টেবিলের চারধারে একবার চোখ ঘুরিয়ে নি। কারো মুখে রা-টি নেই, সবাই হাঁ করে আমার কথা গিলছে। আমি আবার শুরু করি—

দুদিন আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। ঐ বীভৎস মূর্তিটা বারবার আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াত। ওটা যে কি, জিন না প্রেত, তা জানি না। আর পীরবাবা যে কিভাবে ওকে নিয়ে আসতেন তাও বুঝতে পারিনি। তবে পীরবাবার জীবন যে একদিন ওদের হাতেই শেষ হবে তা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলাম।

খাওয়া আমার হয়ে গিয়েছিল। তাই উঠতে উঠতে বললাম, জানি, আধুনিক বিজ্ঞান এটা নিশ্চয় মেনে নেবে না, তবে বুদ্ধিতে সব কিছুর কি ব্যাখ্যা চলে?

অন্ধকারের মূর্তি

বিধান মজুমদার

আজ হঠাৎ সে দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমি ছোট। সকালের আলো উঠোনে এসে পড়েছে। একটু আগে বকুলগাছের ডালপালা পুরো আলোটাই কবজা করে রেখেছিল। দক্ষিণের ঝাপটা বাতাসে ডালপালা নুয়ে পড়তেই উঠোনে এসে গড়াগড়ি। আমার পরের বোন মিনু, একপ্রস্থ গজর-গজর শেষ করে উঠোনে এসে বসল। বগলে খাতা, বই, হাতে দু'খানা আটার রুটি। রান্নাঘরে ঢুকে গুড় খুঁজছিল। না পেতেই প্রথমে চিৎকার, তারপর গজর-গজর। প্রতিশোধ নিল বইয়ের ওপর। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়া শুরু করল। কিছু বোঝা যায় না। ভাঙা-ভাঙা আবার কখনও একনাগাড়ে উচ্চারণ। ছোটবোন খুকু চোখ ঢুলুঢুলু, বিছানায় আরও কিছুক্ষণ গড়াগড়ি খাবে কি না ভাবছে, আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে বসল। ওকে কিছু বলতে যাব, মা এসে সামনে দাঁড়ালেন। মিনুকে ডাকলেন। খুকুকে ইশারায় তাঁর কাছে আসতে বললেন। ওরা এসে গেলে তিনজনকে পাশাপাশি দাঁড়াতে বললেন। হাত ধরাধরি করে, সামনের দিকে মুখ করে।

বেশ মনে আছে, অনেকক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে আছি, একই জায়গায়। মায়ের নির্দেশমতো প্রায় মিনিট পনেরো পর আমাদের তিনজনেরই হাত-পা কাঁপা শুরু হল। এই সাতসকালে হঠাৎ মা এভাবে দাঁড়াতে বললেন কেন। কেউ কোনও দুষ্টুমি করে ফেললাম নাকি। মিনু বরাবরই মিটমিটে শয়তান। হাড়ে-হাড়ে দুষ্টুমি। এমনভাবে চেঁচিয়ে পড়া মানেই মা-বাবাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে পড়া। আমি তখনও পড়তে বসিনি। মা সেটা দেখেছেন। আবার খুকুকেও ডেকে উঠিয়ে পড়াতে বসাইনি। আমি বড়। এ-দায়িত্বটা আমিই পালন করি। মায়ের কড়া নির্দেশ। এসবের জন্যই, না কি অন্য কিছু ভাবছি! বড়-বড় চোখ করে ওদের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছি। কারও মুখে কোনও কথা নেই। সকলে ভয়ে জড়সড়। মা হয়তো চাবুক খুঁজছেন, বা এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেই শাস্তি দেবেন। খুকু, মিনুর মাথায় কী ঘুরছে জানি না, আমার মাথায় নানা ভাবনা এসে জড়ো হচ্ছে।

মা এলেন আধঘণ্টা পর। হাতে থালা ভর্তি মুড়ি। সঙ্গে খানিকটা গুড়। আমার হাতে থালাটা দিয়ে বললেন, "এখন তোরা গুড়-মুড়ি খা, দুপুরের জন্য এক ডেকচি পান্তাভাত আছে, তিনজনে ভাগ করে খাবি। বাবাকেও ঠিকমতো গুছিয়ে খেতে দিবি। আমি যাচ্ছি। যদি আজ ফিরতে না পারি, কাল সকালে ঠিক ফিরব। এসে যেন কিছু না শুনি।" ব্যস, এইটুকুই, আর কিছু বললেন না। আমরা তিনজনে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। দ্রুতপায়ে দরজাটা বাইরে থেকে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, মা হনহন করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন আর আমরা তিনজন তখন কিছু একটা হয়েছে এই আশঙ্কায় ভয়ে জড়সড় হয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে মায়ের দ্রুত পায়ে হেঁটে চলা দেখছি। পাশের ঘরে বাবা বসে ছিলেন, মায়ের চলে যাওয়া দেখছিলেন কি না জানি না। যখন আমরা তিনজনেই উঠোনে এসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি, বাবা চৌকি থেকে নেমে এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন। আমাদের তিনজনের দিকেই তাকালেন। তখনই কিছু বললেন না। বাবার চোখ তখন ছলছল করছে। কেন জানি না, কিছুক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদেরকে বারান্দায় খেলতে বলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সেই বয়সে অতশত বোঝার ক্ষমতা ছিল না, তবে কিছু যে একটা হয়েছে ভেবে আমি কোনও কথা বললাম না। মিনুও বলল না। আর খুকুর তো তখন কিছুই বোঝার মতো বয়স ছিল না। ও চুপচাপ আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। এতটা সময় ওকে এভাবে চুপচাপ থাকতে কখনও দেখিনি। প্রায় মিনিট পনেরো কেউ কিছুই বললাম না, মা চলে যাওয়ার পর বাবাকেও কিছু বললাম না, কান্নাকাটিও করলাম না —মায়ের পেছনেও ছুটে গেলাম না। একটা ঘোরের মধ্যে কেমন যেন সব দ্রুত ঘটে গেল।

রোদ্র এখন তাপ ছড়াচ্ছে, তাপ বাড়ছে, উঠোনে বসার মতো অবস্থা নেই। তিনজনে বসে লুডো খেলছিলাম। বাবা এসে বললেন, "ঘরে গিয়ে খেলো, এখানে প্রচণ্ড রোদ।" আর কিছু বললেন না। যাওয়ার সময় খুকুর চোখের দিকে তাকালেন। খুকু খেলা বোঝে

না। শুধুই দান চালতে জানে। সবসময়ই ঘুঁটি ফেলার কৌটোটা ওর হাতে থাকা চাই। মাথা দোলায়। কৌটো ঝাঁকায় "পুট পুট", কখনও "ছক্কা, ছক্কা" বলে চিৎকার করছে। আমি আর মিনু কী করব, একরকম বসাই। এতক্ষণ একটা কথাও মুখ ফুটে বলেনি। মা চলে যাওয়ার সময়ও বলেনি, এখন খেলতে বসে কী না করছে। ছক্কাটা ও খুব ভাল চেনে। 'ছক্কা' না পড়ে 'দুম্নি' বা 'তিম্নি' পড়লেই মুখ-চোখ নাড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। আমার পিঠে এলোপাতাড়ি ঘুসি মারছে একটার পর একটা। মিনু আমার মতো নয়। আমার বারণ সত্ত্বেও ওর দিকে তেড়ে যাচ্ছে। চুল ধরে টানছে। আর তারপরেই যা হয়, খুকুর হাত-পা ছোড়া। বোর্ডের ঘুটি ছুঁড়ে ফেলা, কৌটো আছড়ে দুমড়ে ফেলা। আমার পিঠের ওপর সমানে চড়-ঘুসি। প্রায়ই ও এরকমই করে। আজ যেন একটু বেশিই। মিনু চোখ পাকায়, কড়া-কড়া কথা বলে, মারধোরও করে। আর ওর ওপর রাগটা আমার ওপর শোধ নিচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরেই এই গণ্ডগোল। তার মধ্যেই খেলা চলছিল। শেষপর্যন্ত একটা রফা হল। আমি আর মিনু একবার দান চাললে ও তিনবার চালবে। ও খেলবে। ওর দুটি ঘর গুণে আমি চালব। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খেলা চলছিল, ও কী করে টের পেল ওর ঘুটি আসলে চলছে না। ব্যস, এবার আর রক্ষে নেই। দু হাতের মুঠিতে আমার চুল শক্ত করে ধরে আমার মাথাটা ওর মুখের সামনে নিয়ে গেল। এমনভাবে ধরে রেখেছে আমি ঘাড় ঘোরাতে পারি না। বেকায়দায় পড়ে চিৎকার করছি, বাবা হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে ছুটে এলেন। ধমক দিলেন। তিনজনের উদ্দেশ্যেই।

খুকু তখনও আমাকে ধরেই রেখেছে। আমি জোর করে ছাড়াতে চাইলাম না, পাছে ওর রাগটা আরও বেড়ে যায়। বাবার ধমকে কোনও কাজ হল না। উল্টে এবার কান্না শুরু হল। বাবা যত ধমকাচ্ছেন কান্নার জোর ততই বাড়ছে। যাকে বলে গলা ফাটিয়ে। মিনু ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল, পারল না। আমি কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না. অনেকক্ষণ পর কান্না থামল। হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে গুম মেরে বসে রইল। একেবারে চুপচাপ। আমি রান্নাঘরে এটা-ওটা খুঁজে একমুঠো কাঁচা মুগডাল ওর হাতে গুঁজে দিলাম। কাঁচা মুগডালটা খুব ভালবাসে। মিনু ছুটে গিয়ে একটা পেয়ারা পেড়ে এনে দিল। খুকু কিছুই ছুঁল না। আবার কাঁদতে লাগল। সারা বাড়ি কাঁপিয়ে। চোখমুখ লাল। জবাফুলের মতো। চোখের জল গাল বেয়ে সারা শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে, সেদিকে হুঁশ নেই। কাঁদতে-কাঁদতে নিজের চুল নিজেই টানছে। হাত পা আছড়াচ্ছে। যেন ওকে কেউ আমরা খুব মেরেছি।

বাবা কী বুঝলেন, ওকে কোলে তুলে পেয়ারাতলায় গেলেন। আদর করতে লাগলেন। ওর এই কান্না যে মায়ের জন্য, আমি বুঝতে পারছিলাম। মিনুও বুঝতে পেরেছিল। আমরা এ-নিয়ে কেউ কিছু বললাম না। কারণ মা চলে যাওয়ার সময় বাবা একটা কথাও বলেননি। কোনওরকম আপত্তিও করেননি। দু'জনের চোখই ছলছল করছিল। আমরাও দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারিনি।

বেলা তখন এগারটা। স্কুল না থাকলে এ-সময়ে আমাদের ব্যস্ততা বাড়ে। আমি আর

মিনু রাস্তার ওপাশে ইটভাটার টিউবওয়েল থেকে বালতি-বালতি জল টানি। চৌবাচ্চা ভরি। কলসি ভরি। জল টানা হলে মিনু ঘরদোর, উঠোন ঝাড়পোঁছ করে, আমি পেছনের ফালি জমির ওপর পেয়ারা, বাতাবিলেবু, কাঁঠালের শুকনো পাতা ঝাঁট দিই। কাজ অল্প, কিন্তু সময় লাগে অনেক। কাজ শেষ হলে তিন ভাইবোনে পেয়ারাতলায় বসে গায়ে-মাথায় তেল মাখতে থাকি। রগড়ে-রগড়ে। বাবার নির্দেশ। সে সময়ই বাবা এসে দরজায় ধাক্কা দেন। আমরা টের পাই শব্দের আওয়াজে। তিনজনই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে "বাবা, বাবা" বলে দরজা খুলতে যাই। কে আগে বাবার কাছে পৌঁছতে পারে। বাবার হাত থেকে জিলিপির ঠোঙাটা ছোঁ মেরে নিতে পারে। আমাদের বোধবুদ্ধি কম। হল্লা বাধাই। জিলিপি নিয়ে কাড়াকড়ি শুরু করি। মা দেখেন, আমাদের কাণ্ড দেখে হাসেন। আবার মেজাজ ঠিক না থাকলে কোনও-কোনওদিন লাঠি বাগিয়ে তেড়ে আসেন। বসিয়ে দেন দু-চার ঘা। রাগ কমলে সেদিনই সকলকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে অনেক কথা বলেন। বলেন, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে তোরা কেউ দেখিস না মানুষটার কিছু হল কি না। কী হতে পারে, কখনও মাথায় আসেনি। ভাবতে গেলে জিলিপিগুলো দুই বোন শেষ করে ফেলবে। তবে একদিন দেখেছিলাম, বাবা সেদিন হাতে করে কিছুই আনেননি। মিনু, খুকু বায়না শুরু করল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল, আমি কিছু বললাম না। বলতে পারলাম না। বাবার চুল উসকোখুসকো, মুখ শুকনো। ভীষণ ক্লান্ত মনে হল। সিঁড়ির নীচে ক্রাচ রেখে চৌকিতে শুয়ে পড়লেন। কারও সঙ্গে কোনও কথা বললেন না, মায়ের সঙ্গেও না। খাওয়াদাওয়ার সময় মা ডেকে কোনও সাড়া পেলেন না। না পেয়ে আমাদের একান্তে বললেন, "আজ বোধ হয় মলমের একটা কৌটোও বিক্রি হয়নি।"

বাবা আর মা যে রাত জেগে অসুখবিসুখের নানারকম মলম, পাউডার তৈরি করেন তা আমি অনেকদিন দেখেছি। দিনের বেলায় বাবা পাড়ার দোকানে মলম ফেরি করেন। তাও জানি। কিন্তু এক-একদিন মলমের কৌটো যে একটাও বিক্রি হতে পারে না। তা কখনও ভাবিনি। ভাবি হয়তো হয়েছে দু-একটা। তা দিয়ে জিলিপি আনা যায় না। তার জন্য মনখারাপের কী আছে! কিন্তু এর মধ্যে যে কিছু লুকিয়ে আছে, কোনওদিনই বোঝার চেষ্টা করিনি।

পাশেই কাকিমার বাড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজল। কারও মধ্যে কাজ করার কোনও ইচ্ছে নেই। খিদেতেষ্টা বলে যে কিছু আছে, টের পাওয়া গেল না। বাবা খুকুকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। আমি আর মিনু লেবুগাছের চারপাশে ঘুরছিলাম। সেখানে আমাদের কী কাজ ছিল জানি না। বোধ হয় এমনি এমনিই ঘুরছিলাম।

অনেকক্ষণ হল বারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে। বাবা বললেন, "যা তোরা দু'জন চান করে ভাত খেয়ে নে।"

"তুমি খাবে না?" মিনু বলতেই বাবা আমাদের দু'জনের দিকে একবার তাকালেন, তারপরেই খুকুকে নিয়ে ইটভাটার দিকে চলে গেলেন। ইটভাটার গায়ে পুকুর। পুকুরের ওপারে বিশাল আমবাগান। আমি মিনুকে একা রেখে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। ভাবলাম,

ডাকি। কী মনে হল, ডাকলাম না। ফিরে এলাম। ভাবলাম, মা নেই, মা এলে মায়ের সঙ্গেই খাবেন। যেদিন বাড়ি থাকেন মায়ের সঙ্গেই খান। খুকুও তাই। আমি আর মিনুই আগে-আগে খেয়ে নিই।

ফিরে এসে দেখি মিনুর চোখে জল। বাবার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। আমাকে দেখেও তাকাল না। তখন আকাশে মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে ঝুলছে। বোধ হয় বৃষ্টির আয়োজন। মিনু কেন কাঁদছে, জিজ্ঞেস করতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। হয়তো খিদে পেয়েছে। বললাম, "চল, তোকে খেতে দিই।" ও শুনল কিনা জানি না, কাঁদতেই লাগল জোরে জোরে। বিশ্রী সুরে। ওর মাথায়, গালে হাত বুলিয়েও কান্না থামাতে পারি না। সত্যি বলতে কী, ওর কান্না দেখে আমারই চোখে জল এসে গেল। ওর জন্যই কী জানি আমারও বুক একটু একটু করে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। ভাবার মতো সময় ছিল না। ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলাম। রান্নাঘরে। ভাত বেড়ে দিলাম। জল দিলাম। ও খাচ্ছে দেখে আমার বুকটা নেচে উঠল। অন্যদিন আমার আগে মা ওকে খেতে দিলে কত রাগ করেছি। আজ ওকেই আমি খেতে দিচ্ছি। কী যে আনন্দ হচ্ছে! ও খাচ্ছে। আমি দেখছি। খিদেই পেয়েছিল। পাওয়ারই কথা। নিজের ওপর রাগ হল। কেন ওকে এতক্ষণ খেতে দিইনি! মিনু ঠাণ্ডা হতেই বাবা আর খুকুর জন্য চিন্তা হল। কেউই এখনও খায়নি। আমি কী করে খাই। ভাত বেড়ে ফেললাম। কিন্তু খেতে পারলাম না ঢাকা দিয়ে রেখে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেলাম। মিনুকে ঘুমোতে বলে বারান্দায় দাঁড়ালাম। দূরে চোখ ফেললাম। কাউকে ফিরতে দেখছি না। দৌড় দিলাম বাগানের দিকে। পড়ি কি মরি —একটার পর একটা গর্ত পেরিয়ে ইটভাটা ছাড়ালাম, তারপর খোলা মাঠ। এর আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হল না। ভেবেছিলাম, ভাটার পরেই আমবাগান। যা হোক, মাঠের শেষে বাগানের মধ্যে ঢুকলাম। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি, দৌড়চ্ছি। এতটা পথ, ভাবতে পারিনি! বাগানের মাঝখানে এসে গেছি। এ-মুহূর্তে হাঁটার আর শক্তি নেই। বিশ্রাম একটু নিতেই হবে। ঘাম ঝরছে। চোখ ঝাপসা। বাবাকে, খুকুকে দেখার জন্য চারদিকে তাকালাম। কোথাও কাউকে দেখছি না। বাগানের ভেতর কারও পায়ের শব্দও পাচ্ছি না। গেঞ্জিটা খুলে ভাল করে চোখ মুছলাম। আবার তাকালাম। দুপুরটা কি হঠাৎ থিতিয়ে এল? চেষ্টা করেও দৃষ্টি বেশি দূর ফেলতে পারছি না। চারপাশে অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। অনেকক্ষণ আগে থেকেই আকাশ পাক খাচ্ছিল। ঘোলা হচ্ছিল। এটা তারই ফল নাকি!

ভাবলাম, বাবা নিশ্চয়ই আকাশ দেখেছেন। ওইটুকু বাচ্চা নিয়ে কিছুতেই আর এখানে থাকবেন না। বাগানের যেখানেই থাকুন, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বেন। বেরোলেই দেখতে পাব। এত গাছের তলা খুঁজতে গেলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সত্যি-সত্যি অন্ধকার নামবে। তখন কিছুই দেখতে পাব না। ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বরং এখানে দাঁড়িয়েই মিনিট পনেরো অপেক্ষা করি। তারপর কিছু একটা ভাবা যাবে। না, কিছু ভাবা যাবে না। সোজা বাড়ি। এখনই যা অবস্থা, বাড়ি ফেরা কঠিন। তবু অপেক্ষা করতে লাগলাম। দাঁড়িয়ে বসে

একই জায়গায়।

মিনুটা কী করছে কে জানে। কাউকে না পেয়ে কেঁদেই হয়তো ভাসাচ্ছে। ভরসা, পাশের বাড়ির পাতানো কাকিমা। কান্না শুনতে পেলে অবশ্যই একবার আসবেন। আমাদের দরজা বন্ধ করে তাঁর কাছেই মিনুকে রাখবেন। এসব ভাবতে গিয়ে দেখি, অন্ধকার আমার চারপাশে এগিয়ে আসছে। একলা পেয়ে আমাকে গিলে ফেলবে নাকি! দুপুরটা না হয় থিতিয়ে গেছে। কিন্তু বিকেলটা গেল কোথায়? গোটা বাগানটাকেই এখন অন্ধকার গিলে ফেলেছে। সুনসান চারদিক। গাছের মাথার উপর দিয়ে দু-একটা পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দে চমকে-চমকে উঠছি। ঝিঁঝির ডাক। কিসের যেন একটা বিশ্রী ডাক। শেয়ালের ডাক, অন্য কোনও জন্তুর! এই গভীর ঘন বাগানে থাকতেও পারে। এখন কী করি! চোখে আর কিছু দেখছি না। দেখতে পাচ্ছি না। আমার সামনে পেছনে সবকিছুই অন্ধকার। কালো-কালো আমগাছগুলো মাথা দোলাচ্ছে। ঝিনঝিন কড়কড় শব্দ উঠছে। আমার বুকের ভেতর কাঁপছে। রীতিমত ভয়ে। আমার সব কিছু কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। দৌড়ে যে পালাব সে সাহসও পাচ্ছি না। অথচ পালিয়ে যাওয়া ছাড়াও কোনও উপায় নেই। কী করব ভাবছি, হঠাৎ বিঘত কয়েক দূরে দুটো চোখ জ্বলে উঠল। কেমন বীভৎস। স্থির একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে। আমার দিকে তাকাচ্ছে। " কে-এ-এ-এ—" কোনওরকমে বললাম বটে, কিন্তু ভয়ে আমার জিভ শুকিয়ে আসছে। পিটপিট করে তাকালাম। বাড়ি দুলছে। নুপুর বাজছে। হাতে, পায়ে মুখে চুনের গোলা। চোখের ওপর লেপটানো কালো কালি। দু'কানে বিশাল গোল রিং। ঝপর-ঝপর দুলছো। একপলক কি দু'পলক তাকিয়েই আমি আর নেই। চোখ, মুখ, কান, মাথা কোনও কাজ করছে না। শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট পাচ্ছি। চোখ বুজলাম। চোখ খুললাম। আর সে-সময়েই মূর্তিটা আমাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল। তারপর পৃথিবী অন্ধকার।

যখন চোখ খুললাম, দেখি মা পাশে বসে আছেন। আমাদের বাড়িতে। মায়ের শরীরে জড়ানো বিচিত্র শাড়ি। সারা গায়ে কীসব প্রলেপ। রংচং মাখা। পার্বতীর পোশাক। মায়ের নরম হাত আমার মাথার ওপর। বিলি কাটছেন। "এতক্ষণে কোথায় ছিলে"? আমি বললাম। "চৈত্রের এই ক'টা দিনই তো..... দূর-দূর পাড়ায় পার্বতী সেজে আমাকে নাচ দেখাতে হবে রে, বাবা! তোর বাবা এখন আর ভাঙা পা-টায় জোর পান না। ডাক্তার হাঁটাচলা বন্ধ করতে বলেছেন।"

বাবা কখন ফিরেছেন টের পাইনি। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ানো পাশে মিনু আর খুকু। তিনটে জলজ্যান্ত মানুষ একেবারে বোবা।

পুরানো দিনের মাছি

অনীশ দেব

খাওয়া-দাওয়া হই-হুল্লোড় সব মিলিয়ে আসর যখন একেবারে জমজমাট, ঠিক তখনই তাতা এসে শাড়ির আঁচলে ছোট্ট টান মেরে আমাকে একপাশে ডাকল। আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকাতেই ও চাপা গলায় বলল, 'দিদি, রুমুকা আসতে পারবে না। পিসিমণি বলল, ক'দিন ধরেই যেন কী হয়েছে—ঘর ছেড়ে একদম বেরোচ্ছে না। সবসময় জানলা-দরজা বন্ধ করে বসে আছে।'

তাতার কথায় বেশ অবাক হয়ে গেলাম। রুমুকা আসবেন না!

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করেছি আমি। সেই উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে আজ খাওয়া-দাওয়া হইচই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা সব এসেছে। অথচ রুমুকা আসবেন না!

রুমুকা আমাদের আপন কাকা নন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি। বাবার কীরকম যেন ভাই হন। ওঁদের বাড়িটা আমাদের খুব কাছেই—মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ। একটা পুকুর

পেরিয়ে যেতে হয়।

ছোটবেলায় যখন খেলাধুলো করতাম, তখন রুমকাই ছিলেন আমাদের কোচ। কবাডি খেলা হোক কিংবা ব্যাডমিন্টন, রুমুকা কখনওই পিছিয়ে পড়তেন না। তাছাড়া দেশ-বিদেশের কতরকম খেলার কত যে খবর রাখতেন! আমার বা তাতার জন্মদিন নিয়ে মা বা বাপির তেমন উৎসাহ না থাকলেও রুমুকা কোথা থেকে এসে একেবারে হইহই কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন। কখ্খনও আমাদের জন্মদিন ভুলে যাননি।

আমার ডাকনাম ঝিনি। কিন্তু রুমুকা সবসময় আমাকে ঝুনঝুনি বলে ডাকেন। বলেন, 'ঝুনঝুনির মধ্যে একটা তালের ব্যাপার আছে।' আমার আর তাতার স্কুলের পড়াশোনায় রুমুকা ছিলেন বিনিমাইনের গৃহশিক্ষক। যখন তখন এসে পড়াতে শুরু করে দিতেন। কিন্তু ওঁর কাছে পড়তে কখনও আমাদের খারাপ লাগত না। বাপি সবসময় মাকে বলতেন, 'রমণীরঞ্জন যতদিন আছে তদ্দিন ওদের লেখাপড়া নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই।'

এই হলো রুমুকা —অথবা রমণীরঞ্জন সিন্‌হা। লম্বা ফরসা চেহারা। টানটান শক্তপোক্ত শরীর। কপাল স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা বেশি চওড়া। সাদা-কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে ফুলহাতা শার্ট আর ধুতি। গত দশ-বারো বছর ধরে আমি আর তাতা মানুষটাকে এই একই রকম দেখেছি।

রুমুকা বিয়ে করেননি। অল্পবয়েসে বিধবা হওয়া দিদিকে নিয়ে থাকেন। দিদির কোনো ছেলেমেয়ে নেই। ছোট দোতলা বাড়িতে ওঁরা দুজন, আর একজন কাজেব লোক—সীতাদি।

রুমুকা ঠিক নিয়ম করে চাকরি করেননি। সবার কাছে যা শুনি তাতে এর মধ্যেই উনি গোটা বারো চাকরি পালটেছেন। একদিন এই বারবাব চাকরি পালটানোব কথা জিগ্যেস করায় হেসে আমার বিনুনিতে আলতো টান মেরে বলেছেন, 'ঝুনঝুনি, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে। আমার লাইফটা হলো যাকে বলে "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির"।

তবে এইবার চাকরি ছাড়ার পর রুমুকা ঠিক করেছেন, স্টেশনের কাছাকাছি একটা দোকান দেবেন। মাস দুয়েক ধরে তারই খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন।

দিন দশেক আগে যেদিন আমি উচ্চমাধ্যমিকেব রেজাল্টের কথা বলতে গিয়েছিলাম, সেদিনও রুমুকা পড়ার বই-টই ছুঁড়ে ফেলে একেবারে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠেছেন বাচ্চাছেলের মতো। বলেছেন, 'এটা নিয়ে দারুণভাবে সেলিব্রেট করতে হবে, বুঝলি? সেদিন আমি তোদের গান গেয়ে শোনাব।'

অথচ আজ রুমুকা এলেন না! তাতাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ও ফিরে এসে যা বলল তাতে ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। রুমুকার কী হয়েছে যে সবসময় জানলা-দরজা বন্ধ করে বসে আছেন? রুমুকা কি কোনো কারণে ভয় পেয়েছেন? যে মানুষটার জীবন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির', সে ভয় পেয়েছে! ঠিক করলাম আজ রাতেই রুমুকার

সঙ্গে দেখা করতে যাব।

খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির পালা যখন শেষ হলো তখন রাত দশটা বেজে গেছে! মাকে আর বাপিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে তাতাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম রুমুকার বাড়ির দিকে। বাপি সঙ্গে আসতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি বারণ করলাম। একে তো তাতা যথেষ্ট বড়, ক্লাস টেনে পড়ে, ও সঙ্গে থাকছে—তা ছাড়া, এই তো কাছেই বাড়ি। দরকার হলে সীতাদি আমাদের এগিয়ে দেবে।

মা টিফিন কেরিয়ারে খাবার-দাবার সাজিয়ে দিলেন। আর পিসিমণির জন্য আলাদা বাক্সে মিষ্টি দিলেন। পিসিমণি খুব সাত্ত্বিক মানুষ। পুজো-আর্চা, গঙ্গাজল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

এখন বর্ষার সময়। যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমরা ছাতা নিয়ে বেরোইনি। মাত্র তো দশ-পনেরো মিনিটের ব্যাপার। তা ছাড়া টিফিন কেরিয়ার, টর্চ, ছাতা এসব একসঙ্গে সামাল দেওয়া ভারি মুশকিল।

কাদা প্যাচপেচে একটা জায়গা সাবধানে ডিঙিয়ে আমি তাতাকে জিগ্যেস করলাম, 'তাতা, তুই রুমুকাকে আসার জন্যে বলেছিলি?'

তাতা বলল, 'না। আমি বাড়িতে ঢুকতেই পিসিমণি ওই খবর দিল। তারপর বলল, তুই ওপরে গিয়ে একবার ডেকে দ্যাখ। তখন আমি দোতলার ছাদের ঘরে গেছি। গিয়ে দেখি ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ। শুধু ভেতর থেকে একটা হুসহুস শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হলো, রুমুকারই গলার আওয়াজ। তখন আমি রুমুকার নাম ধরে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে হুসহুস শব্দটা থেমে গেল। বেশ ভয় পাওয়া গলায় রুমুকা চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে? গলাটা কেমন যেন পিকিউলিয়ার শোনাল। আমার একটু ভয় ভয় করছিল। কোনোরকমে বললাম, আমি তাতা। আমাদের বাড়ি যাবে না? অমনি সব চুপচাপ হয়ে গেল। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না আর। আমি আরও দু'তিন বার রুমুকার নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু সেই নো রিপ্লাই। তখন আমি ছুট্টে পালিয়ে এসেছি।'

তাতার কথা শুনে, আমার অবাক হওয়ায় ব্যাপারটা আরও বাড়ছিল। মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না।

আমরা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পুকুরটা জলে জলে টইটম্বুর। অন্ধকারে জল ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না। দু'এক জায়গায় আলোর টুকরো ঠিকরে পড়েছে। ব্যাঙদের বর্ষা-অধিবেশন এখানে আরও জোরদার। জোলো বাতাসে পুকুরপাড়ের দুটো মাঝারি গাছ এপাশ-ওপাশ দুলছে। একটু দূরেই রুমুকাদের বাড়ি। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাড়ির কোথাও কোনো আলো চোখে পড়ছে না। এর মধ্যেই ওঁরা সবাই শুয়ে পড়ল নাকি?

মনের মধ্যে একটা শিরশিরে অস্বস্তি নিয়ে রুমুকাদের বাড়ি পৌঁছলাম। অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দেবার পর সীতাদি দরজা খুলল। আমাদের দেখেই চোখ গোল গোল করে বলল, 'তোমরা এত রাতে!'

আমি বললাম, 'পিসিমণি কোথায়? রুমুকা কোথায়?'

'দিদিমণি পুজো করছে— ঠাকুরকে শোয়াচ্ছে। আর দাদাবাবু ওপরে— বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আমি আর তাতা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মিষ্টির বাক্সটা সীতাদির হাতে দিয়ে বললাম, 'এটা পিসিমণিকে দিও। বোলো আমরা এসেছি, রুমুকার ঘরে গল্প করছি।'

আর সময় নষ্ট না করে আমরা দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোলাম।

সিঁড়িতে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। তার আলোটা কেমন ঘোলাটে। সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠলেই বাড়ির পিছন দিকের অগোছালো বাগানটা দেখা যায়। তবে এখন, অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শুধু বাতাসে গাছের পাতার অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

দোতলার অর্ধেকটা ছাদ। আর বাকিটা রুমুকার ঘর। অন্ধকার ছাদে আরও গাঢ় একতাল অন্ধকারের মতো ঘরটা একপাশে দাঁড়িয়ে। ঘরে আলো জ্বলছে কিনা বোঝার উপায় নেই, কারণ দরজা-জানলা সব বন্ধ। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমি 'রুমুকা রুমুকা' বলে ডাকলাম। ধাক্কাও দিলাম কয়েকবার। ঘরের ভেতরে বই-টই জাতীয় কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। তাতা পিছন থেকে আমার হাত ধরে টান মারল। চাপা গলায় বলল, 'চলে চল—'

আমি ওর কথা গ্রাহ্য না করে আবার ডাকলাম।

কোনো সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন চেঁচিয়ে বললাম, 'রুমুকা, আমি আর তাতা তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি। আমার পরীক্ষার রেজাল্টে তুমি খুশি হওনি? তাই নেমন্তন্নে গেলে না!'

কোনো জবাব এল না ভেতর থেকে। তাতা আবার আমার হাত ধরে টান মারল। কিন্তু আমার কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল। চেঁচিয়ে বললাম, 'তুমি দরজা না খুললে আমরা দু'জন সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকব, বৃষ্টিতে ভিজব।'

এমন সময় মেঘ ডেকে উঠল। বিদ্যুতের রেখা ঝলসে গেল আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। আর প্রায় একই সঙ্গে খটাস করে খুলে গেল রুমুকার ঘরের দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' মানুষটা। কিন্তু আলোছায়ার মাঝেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ওঁর মাথাটা বেশ ঝুঁকে পড়েছে। যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সেই মানুষটার মুখে-চোখে কী যে দেখলাম— আমার চোখে জল এসে গেল পলকে— 'রুমুকা!'

রুমুকা আমার হাত ধরে পরম স্নেহে মাথায় হাত বোলালেন, বললেন, 'ভিজিসনি তো? আয়, আয়, ভেতরে আয়। আয়, তাতা—'

আমরা ঘরে ঢুকতেই চট করে দরজা বন্ধ করে দিলেন রুমুকা। তারপর বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বিছানায় গিয়ে বসলেন। মাথাটা কিন্তু সামান্য ঝুঁকেই রইল।

রুমুকার ঘরে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো বই। দেওয়ালের তাকে, বিছানায়, মেঝেতে এলোমেলোভাবে রাখা অসংখ্য বই। ওঁর অভ্যাস হলো পেনসিল দিয়ে বইয়ের পাতায় পাতায় অসংখ্য মন্তব্য লেখা। উনি বলেন, 'খুঁটিয়ে কোনো বই পড়তে হলে বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার সময় মনের ভাব, মতামত, মন্তব্য এসব লিখে রাখা দরকার। তাহলে বইটা মনে দাগ কেটে যায়। তা ছাড়া পরে বইটা আবার পড়ার সময় ওই মন্তব্যগুলো খুব সাহায্য করে।' রুমুকার এই অভ্যাসটা আমি খানিকটা রপ্ত করে ফেলেছি। দেখেছি, তাতে সত্যিই পড়াশোনার সুবিধে হয়।

রুমুকার বিছানা নীল রঙের একটা বেডকভারে ঢাকা। তার ওপরে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে চারটে বই, একটা হলুদ রঙের পেনসিল, আর একটা সাদা ইরেজার। এছাড়া আরও একটা অদ্ভুত জিনিস পড়ে আছে বিছানায়— একটা ছোট লাঠি।

ঘরের ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা মাঝারি টেবিলের ওপরে আমি টিফিন কেরিয়ারটা নামিয়ে রাখলাম। চোখের জল মুছে রুমুকাকে দেখলাম ভালো করে।

রুমুকার সারা শরীরে কেমন এক অবসন্ন ভাব। ফরসা রঙ কিছুটা মলিন মনে হলো। কপালে আর চোখের নিচে ভাঁজও যেন অনেক বেশি। পরনের গেঞ্জি আর পাজামা অন্যদিনের মতো ধোপদুরস্ত নয়।

রুমুকা আমার দিকে তাকালেন। ওঁর উজ্জ্বল চোখে কেমন এক ভয়ার্ত আকুল ভাব। আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। তাতা কখন যেন আমার হাত আঁকড়ে ধরেছে। বুঝলাম, ও ভয় পেয়েছে। এই রুমুকাকে ও চিনতে পারছে না। আমার কাছেও এই মানুষটা অচেনা।

রুমুকা বললেন, 'বোস— তোরা বোস—'

ঘরে একটা টুল, একটা বেতের মোড়া, আর একটা চেয়ার রয়েছে। আমি বিছানায় রুমুকার প্রায় মুখোমুখি গিয়ে বসলাম। তাতা মোড়াটা আমার কাছটিতে টেনে নিয়ে এসে বসল।

রুমুকা হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'ঝুনঝুনি, তোর রেজাল্টের খাওয়া-দাওয়া হইচই কেমন হলো?'

আমি বিছানায় রাখা লাঠিটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'পড়াশোনা করতে তোমার আজকাল লাঠি লাগছে নাকি?'

রুমুকা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'না রে, লাঠিটা নিয়েছি...' হঠাৎই চুপ করে গেলেন।

আমার রাগ হলো। অভিযোগের সুরে বললাম, 'তুমি তো আমাদের সেই ছোটবেলা থেকে সত্যি কথা বলতে শিখিয়েছ। আর তুমি নিজেই সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছ! ঠিক করে বলো তো তোমার কী হয়েছে? ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছ না, দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে

আছ— কী ব্যাপার বলো তো?'

রুমুকা জেদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে শক্ত হয়ে বসে রইলেন।

আমি তাতার দিকে ফিরে বললাম, 'তাতা, ঘরের জানলা-দরজাগুলো খুলে দে তো—'

ইলেকট্রিক শক-খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন রুমুকা। ওঁর চোখে-মুখে পলকে নেমে এসেছে গাঢ় আতঙ্কের ছায়া। ভয়ার্ত গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'খুলিস না! খুলিস না! খুললেই ওগুলো ভেতরে ঢুকে পড়বে।'

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ওগুলো? ওগুলো মানে?'

'মাছি! মাছি!' প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন রুমুকা। তারপর ধপাস করে বসে পড়লেন বিছানায়। ডান হাতের শক্ত মুঠোয় তুলে নিলেন খাটো লাঠিটা। ঘরের চারপাশে অনুসন্ধানী নজর বুলিয়ে নিলেন একবার।

বিছানায় লাঠিটা রাখার মানে এবার বুঝতে পারলাম আমি। কিন্তু লাঠি দিয়ে মাছি তাড়াতে এত মরিয়া কেন রুমুকা?

আমি ওঁকে সাহস যোগানোর জন্য বললাম, 'মাছিকে এত ভয় পাচ্ছ কেন? মাছি কি তোমাকে খেয়ে ফেলবে!'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন রুমুকা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই বুঝবি না, ঝুনঝুনি। এ সাধারণ মাছি নয়...'

'মউমাছি?' আমি পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম।

রুমুকা হাসলেন না। আমার দিকে ভয়ের চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'মউমাছি নয়। পুরনো দিনের মাছি।'

'পুরনো দিনের মাছি! তার মানে?'

হাতের লাঠিটা বিছানায় রেখে বিষণ্ণ হাসলেন রুমুকা। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'বললে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না...'

'আমি করব। তুমি বলো। সব তোমাকে বলতেই হবে। কেন তুমি ক'দিন ধরে এমনই করছ। কী হয়েছে তোমার?'

আমার জেদ রুমুকা জানেন। তাই এমনভাবে উনি বিছানায় গুছিয়ে বসলেন যে, আমি বুঝতে পারলাম, সবকিছু খুলে বলার জন্য উনি মনে মনে নিজেকে তৈরি করছেন। রুমুকার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, ওঁর ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণার একটা তোলপাড় চলছে। আমার ভীষণ মায়া হচ্ছিল।

আচমকা বাজ পড়ার শব্দে আমাদের কানে যেন তালা লেগে গেল। মেঘের গুড়গুড় শব্দ মিলিয়ে যেতেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেলাম। ঘরের পাখাটা ফুলস্পিডেই ঘুরছে, কিন্তু জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকায় কেমন একটা গুমোট ভাব।

রুমুকা খুব সিরিয়াস মুখ করে বললেন, 'তোদের সব বলছি, কিন্তু আর কাউকে এ-কথা

বলিস না। তাহলে আমাকে সবাই পাগল ভাববে।'

আমি ঘাড় নেড়ে কথা দিলাম। তাতা বলল, 'কাউকে বলব না। মরে গেলেও বলব না।'

'শোন তাহলে...' কয়েকবার ঘরের এপাশ-ওপাশ দেখলেন রুমুকা, তারপর হাতে হাত ঘষে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করে থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'আমার বই পড়ার নেশার কথা তো তোরা জানিস। এও জানিস যে, বই পড়ার সময় আমি বইয়ের মার্জিনে পেনসিল দিয়ে নোট লিখি। একজন ফ্রেঞ্চ ম্যাথামেটিশিয়ান পিয়ের দ্য ফার্মা-র এরকম নোট লেখার অভ্যেস ছিল। ১৬২১ সালে তিনি আর এক ম্যাথামেটিশিয়ান ডায়োফ্যান্টাসের লেখা "অ্যারিথমেটিকা" নামের একটি বই কিনেছিলেন। সেই বইয়ের মার্জিনে তিনি এমন একটি মন্তব্য লিখে গিয়েছিলেন যা থেকে "ফার্মাজ্ লাস্ট থিয়োরেম" নামে একটি উপপাদ্যের জন্ম হয়। এই উপপাদ্যটা প্রমাণ করতে অঙ্কবিদদের ৩২৭ বছর লেগে গিয়েছিল।'

কথা বলতে বলতে রুমুকা নিজের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাচ্ছেন বলে আমার মনে হলো। তা না হলে উনি মাছির কথা থেকে ম্যাথামেটিশিয়ানের কথায় যেতেন না।

ঘরের টিউব লাইটের আলো একপাশ থেকে রুমুকার কপালে এসে পড়েছে। চকচকে সেই জায়গায় একটা শিরা ফুলে রয়েছে।

'ফার্মার কথা থাক, আমার কথা বলি—' রুমুকা আবার বলতে শুরু করলেন, 'বইয়ের মার্জিনে নোট লেখার জন্যে আমি একসঙ্গে এক ডজন করে পেনসিল কিনে রাখি। সেগুলো শেষ হয়ে হয়ে যখন একটা পেনসিলে এসে ঠেকে তখন আমি কলকাতা থেকে আবার নতুন এক ডজন পেনসিল কিনে নিয়ে আসি। ঝুনঝুনি তো জানিস, কোহিনূর পেনসিল আমার বরাবরই বেশি পছন্দ। কলকাতায় গিয়ে কলেজ স্ট্রিট পাড়ার পটুয়াটোলার একটা পাইকিরি খাতা-পেনসিলের দোকান থেকে আমি সবসময় কোহিনূর পেনসিল কিনি। শুধু পেনসিল কেন, কাগজ, ইরেজার এসবও আমি ওই দোকান থেকেই কিনি।

'ঠিক সাত দিন আগে আমি কয়েকটা কাজে কলকাতায় গিয়েছিলাম। আগের পেনসিলগুলো শেষ হয়ে গিয়ে একটায় এসে ঠেকেছিল। তাই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এসে ঠিক করলাম এক ডজন পেনসিল কিনে নিয়ে যাব।

'সেদিনটা ছিল মেঘলা। দুপুর দুটো নাগাদ আমি পটুয়াটোলার সেই দোকানটায় গেলাম। আর তারপর থেকেই যতসব অদ্ভুত ব্যাপার শুরু হলো—'

রুমুকা থামলেন। কপালে হাত বোলালেন— বোধহয় ঘাম মুছলেন। চোখের চশমাটা অকারণেই বারকয়েক নাড়াচাড়া করলেন।

তাতা কৌতূহলের গলায় জিগ্যেস করল, 'কী শুরু হলো?'

রুমুকা কয়েকবার ঢোঁক গিলে বলতে শুরু করলেন, 'দোকানটার নাম গ্লোব কনসার্ন। মাঝারি মাপের একটা রঙচঙে সাইনবোর্ডে শৌখিন হরফে নাম লেখা। দোকানটার সুনাম যথেষ্টই আছে, কারণ গলির মধ্যে হলেও সেখানে সবসময় খদ্দেরের ভিড় লেগেই থাকে।

'কিন্তু সেদিন দোকানটার কাছাকাছি গিয়েই আমি খানিকটা তাজ্জব হয়ে গেলাম।

'দুপুরের মেঘলা আকাশ থেকে অদ্ভুত এক আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই অপার্থিব আলোয় দেখলাম, দোকানটার সামনের পিচের রাস্তাটা একেবারে পালটে গেছে। কোথায় সেই খানাখন্দে ভরা ময়লা পিচের পথ! তার বদলে মসৃণ পরিচ্ছন্ন এক শানবাঁধানো চত্বর চোখে পড়ল আমার। চত্বরটা গলির তুলনায় মাপে অনেক বড়। আমি অবাক হয়ে এপাশ-ওপাশ দেখতে লাগলাম।

'ঠিক তখনই আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি খেয়াল করলাম।

'দোকানটা এমন এলাকায় যেকানে শব্দের ঝালাপালা সর্বদা লেগেই আছে। ট্রামের ঘড়ঘড়, বাস-গাড়ির শব্দ, রিকশ, সাইকেল ভ্যান, বইয়ের স্টল, মুটে, পথচারী— কী নেই সেখানে! কিন্তু সেদিন ওই শানবাঁধানো চত্বরে পা দেওয়ামাত্রই চারপাশের হরেকরকম শব্দ পলকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সব চুপচাপ। যেন ভুল করে কোনো উপাসনা-মন্দিরে আমি পা দিয়ে ফেলেছি।

'একটু দূরে আমি দোকানটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে গ্লোব কনসার্নের সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ল না, তার বদলে রঙচটা লম্বা একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম। তার অক্ষরগুলোর এমনই দুর্দশা যে ভালো করে কিছু পড়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া সবকিছু কেমন ঝাপসা লাগছিল আমার চোখে। দোকানটার দু'পাশে নকশা-কাটা দুটো থাম। তাদের গায়ে খোদাই করে কী সব যেন লেখা। তবে ডান দিকের থামে একেবারে শেষ লাইনে ১৯০৬ সংখ্যাটা লেখা ছিল এটা মনে আছে।

'আমি খানিকটা ইতস্তভাবে পা ফেলে দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। আবাক হয়ে দেখলাম, যে-দোকানটা খাতা-পেনসিল-কাগজ এসবে একদম ঠাসা থাকে সেটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। আর দোকানটাকেও বেশ অন্যরকম লাগছে।

'সামনে পালিস করা কাঠের লম্বা কাউন্টার। কাউন্টারের ওপাশে কেউ নেই। দোকানের মালিককে আমি চিনি— মানে, মুখ চিনি। বেঁটে মতো, মাথায় টাক, ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন, পান খাওয়ার অভ্যেস আছে। তাঁকে কোথাও দেখলাম না। আর যে-তিনজন সেল্‌সম্যানকে দোকানে বরাবর দেখেছি, তাদেরও পাত্তা নেই। দোকানের ভেতরে যে-সব র‍্যাক দাঁড় করানো রয়েছে সেগুলো খালি।

'দোকানের পিছন দিকের দেওয়ালে একটা বড় পেন্ডুলাম ঘড়ি চোখে পড়ল আমার। একটা প্যাঁচানো তারের সঙ্গে ধাতুর পিণ্ডটা ঝুলছে। আর ঘড়িটার সব কলকব্জা একটা কাচের গ্লোবের মধ্যে বসানো। ফলে বাইরে থেকেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া কাজকর্ম সবকিছু দেখা যাচ্ছে। ঘড়িটা দেখেই বেশ পুরনো মনে হচ্ছিল। পরে বইপত্র পড়ে জেনেছি, ওই ঘড়ি কম করেও দেড়শো বছরের পুরনো। এগুলোকে বলা হতো "ফোর হানড্রেড ডে ক্লক"। কারণ, একবার দম দিলে এই ঘড়ি চারশো দিন চলত। সে সময়ে এই ঘড়িগুলো

ইওরোপ আর আমেরিকায় খুব পপুলার ছিল। এত পুরনো পেন্ডুলাম ঘড়ি এই দোকানে কোথা থেকে এল কে জানে! তা ছাড়া দোকানেও তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! বেশ কিছুক্ষণ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেটে গেল। তারপর আমি দু'তিনবার "কেউ আছেন?" বলে হাঁক মারলাম। ওই নিস্তব্ধ পরিবেশে আমার কথাগুলো কেমন এক অদ্ভুত ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না, আর কাউকে দেখতেও পেলাম না। আমি এপাশ-ওপাশ নজর চালিয়ে দোকানদারকে খুঁজছি, হঠাৎই দেখি ঢ্যাঙা মতন একজন মানুষ কাউন্টারের ওপাশে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই মানুষটা কোথা থেকে আচমকা এসে উদয় হলো তা বলতে পারব না, তবে একে আমি আগে কোনোদিন দেখিনি।

'লোকটি বেশ লম্বা আর রোগা। গাল দুটো বসে গিয়ে দুটো গর্ত তৈরি হয়ে গেছে। তার কপালে অনেক ভাঁজ। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। দু'চোখে সুর্মাজাতীয় কিছু লাগানো, আর তার জন্যে চোখ দুটোকে চেরা গর্ত বলে মনে হচ্ছে। বয়েস সত্তর-টত্তর হবে। পরনে ঘিয়ে-রঙা সাটিনের ফুলহাতা জামা। তাতে বুকের বাঁ দিক ঘেঁষে বোতামের সারি নেমে গেছে। আর চওড়া পাড় শান্তিপুরী ধুতি বেশ যত্ন করে কোঁচানো।

'লোকটির গোটা মুখ আর হাত বেশ ফ্যাকাসে— যেন হোয়াইট ওয়াশ করা। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। সে বিড়বিড় করে কী যেন বলল আমাকে, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, তার জিভ আর মুখের ভেতরটা ঠোঁটের মতোই টকটকে লাল— যেন এইমাত্র এক বোতল আলতা গিলে এসেছে।

'লোকটিকে ঘিরে অদ্ভুত এক আবছা কুয়াশা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। আর বর্ষার গুমোটের মধ্যেও আমার একটু শীত-শীত করছিল। আমি হতভম্ব চোখে মানুষটাকে দেখছিলাম।

'লোকটি যেন হাওয়ায় ভেসে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমাদের দুজনের মাঝে শুধু ওই কাঠের কাউন্টার। লোকটির ঠোঁট নড়ে উঠল আবার। বোধহয় জিগ্যেস করল, কী চাই। আমি ইতস্তত করে এক ডজন কোহিনুর এইচ. বি. পেনসিলের কথা বললাম। এমন সময় দু'তিনজনের কান্নার শব্দ আমার কানে এল। কয়েকজন মহিলা দোকানের আড়ালে কোথাও বসে বুক চাপড়ে মড়াকান্না কাঁদছে। সে-কান্না ভারি অদ্ভুত। কারণ কান্নার এক-একটা টান প্রায় দু'তিন মিনিট করে চলছে— তার মাঝে দম নেবার জন্যে কেউ একটুও থামছে না।

'কান্নার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের শব্দও হালকাভাবে কানে এল। আর সেই সঙ্গে অগুরুর মতো গন্ধও যেন টের পেলাম। বৃদ্ধ দোকানদার পেনসিল নিয়ে আসার জন্যে দোকানের পিছন দিকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তখনই দোকানের ভেতর দিকে মেঝেতে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচা আমার নজরে পড়ল।'

রুমুকা দম নেবার জন্য একটু থামতেই আমি চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কীসের খাঁচা, রুমুকা?'

রুমুকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জানি না, তবে তার ভেতরে কিছু একটা ছিল। কারণ, সেটা নড়ছিল, খাঁচার ফাঁকফোকর দিয়ে বোধহয় মাথা বাড়াচ্ছিল। ফলে কালো কাপড়টা বারবার এদিক-ওদিক উঁচু হয়ে উঠছিল। খাঁচার ভেতর থেকে একটা ফোঁসফোঁস শব্দ আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু আগেই তো বলেছি প্রত্যেকটা শব্দ কেমন ফাঁপা— আর তার অদ্ভুত এক প্রতিধ্বনিময় রেশ কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

'একটু পরেই দোকানদার কাউন্টারের কাছে এসে উদয় হলো। তার মুখ আরও বিবর্ণ, আরও ফ্যাকাসে লাগছে। ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝা যায় কান্না-টান্নার শব্দ সে মোটেই শুনতে পাচ্ছে না। অথবা, শুনতে পেলেও আমল দিচ্ছে না।

'লক্ষ্য করলাম, তাকে ঘিরে এখনও সেই রহস্যময় কুয়াশা। আর সেই সঙ্গে একটা নতুন জিনিসও চোখে পড়ল। চার-পাঁচটা ডুমো ডুমো নীল মাছি তার মাথার কাছে ভনভন করছে, কখনও মুখে-চোখে বসে পড়ছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, লোকটা মোটেই মাছিগুলোকে তাড়াচ্ছে না। ওগুলো মুখের ওপরে বসে আছে তো বসেই আছে।

'লোকটা এক ডজন পেনসিল নির্বিকারভাবে এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি টাকা দিতেই ঠোঁট বেঁকিয়ে সামান্য হাসল। তারপর এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল, বলল, এ-টাকা চলবে না। এমনিই নিয়ে যান।

'না, লোকটার কথা আমি শুনতে পাইনি, তবে ওর ঠোঁট নাড়া দেখেছি। আর তাই থেকেই হয়তো কথাগুলো আন্দাজ করে নিয়েছি। তা যাই হোক, পেনসিলগুলো মুঠো করে হাতে নেওয়ামাত্রই আমি একটা ধাক্কা খেলাম ঃ নীল রঙের পেনসিলগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা। তাছাড়া কোহিনূর পেনসিল নীল রঙের হয় বলে কখনও শুনিনি।

'আমি হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলাম। দোকান ছেড়ে রওনা হয়ে গেলাম চটপট। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শানবাঁধানো চত্বরটা পেরিয়ে একটা পিচের রাস্তায় পা দিতে আমার ঘোর কেটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই রোজকার চেনাজানা শব্দের ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার দু'কানে। ভালো করে চেয়ে দেখি আমি বহুদিনকার চেনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি।'

কথার মাঝে একটু ফাঁক পেয়েই তাতা জিগ্যেস করল, 'পিছন দিকে তাকিয়ে দোকানটাকে দেখতে পেলে না?'

রুমুকা বিমূঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। সবকিছু আগের মতোই। কোথাও কোনো শান-বাঁধানো চত্বর নেই। পুরনো দোকান, লম্বা সাইনবোর্ড, নকশা-কাটা থাম— কিছুই চোখে পড়ল না আমার। যেন গোটা ব্যাপারটাই আমার মনের ভুল।'

রুমুকা শেষদিকের কথাগুলো বিড়বিড় করে বলছিলেন। কান পেতে বেশ কষ্ট করে শুনতে হচ্ছিল। আমি রুমুকার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলাম, 'ঠিকই ধরেছ তুমি। গোটা ব্যাপারটাই তোমার মনের ভুল!'

রুমুকা মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না রে, মনের ভুল নয়, এর অন্তত দুটো প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে—'

'কী প্রমাণ?' একরোখা গলায় জিগ্যেস করলাম আমি।

'পেনসিলগুলো তোরা একবার দ্যাখ, তাহলেই খানিকটা বুঝতে পারবি।'

এই কথা বলে রুমুকা দেওয়ালের তাকে রাখা দু'থাক বইয়ের ফাঁক থেকে কয়েকটা নীল রঙের পেনসিল বের করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

পেনসিলগুলো নতুন, এখনও কাটা হয়নি।

রুমুকা বললেন, 'কোম্পানির নামটা পড়ে দ্যাখ—'

আমি আর তাতা ঝুঁকে পড়ে নামটা পড়লাম। এফ. এন. গুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি। এই কোম্পানির পেনসিলের কথা কখনও আমরা শুনিনি।

রুমুকা বললেন, 'ব্রিটিশ আমলে, আমাদের ছোটবেলায়, এই পেনসিল চালু ছিল। এফ. এন. গুপ্তদের কারখানা ছিল নর্থ ক্যালকাটায়— সিঁথিতে। এই পেনসিল কমপক্ষে চল্লিশ বছর হলো বাজার থেকে উঠে গেছে। এখন কোনো দোকানে এই পেনসিল পাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া....'

'তা ছাড়া কী?'

রুমুকা কোনো উত্তর না দিয়ে কয়েকটা করে পেনসিল আমার আর তাতার হাতে দিলেন। ওগুলো ধরামাত্রই আমরা চমকে উঠে একটা ভয়ের শব্দ করে ফেললাম, ওগুলো সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিলাম বিছানায়।

পেনসিলগুলো যেন বরফ দিয়ে তৈরি।

রুমুকা বিড়বিড় করে বললেন, 'এটাই বলতে চাইছিলাম। সেইদিন থেকেই এই পেনসিলগুলো এরকম কনকনে ঠাণ্ডা— এটাই একটা প্রমাণ যে, ব্যাপারটা আমার মনের ভুল নয়।'

বুককাঁপানো শব্দে মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। বৃষ্টির শব্দ কয়েক গুণ বেড়ে গেল যেন। রুমুকার টেবিল-ঘড়িতে রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। আমরা বাড়ি ফিরব কী করে কে জানে! মা-বাপি নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন। কিন্তু রুমুকার দিশেহারা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর অন্য কোনো কথা ভাবতে পারছিলাম না।

তাতা ফস করে জিগ্যেস করে বসল, 'আর একটা প্রমাণ কোনটা?'

রুমুকা নড়েচড়ে বসলেন। চোখ থেকে চশমটা খুলে নামিয়ে রাখলেন বিছানায়। আঙুল দিয়ে বেশ কয়েকবার চোখ ঘষলেন, নাকের গোড়াটা ম্যাসাজ করলেন। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের সিলিং-এর দিকে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে তাতার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'ওই মাছিগুলো। ওগুলোই দ্বিতীয় প্রমাণ যে, সেদিন আমি ভুল দেখিনি।'

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'রুমুকা, তুমি নিশ্চয়ই সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে

বেশি ভেবেছ? তুমি যদি ভুল না দেখে থাকো, তাহলে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটার কী মানে হতে পারে? একটা কিছু মানে তো নিশ্চয়ই থাকবে।'

রুমুকা মাথা নাড়লেন একমত হয়ে। চশমাটা চোখে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে একটু অন্যরকমভাবে বসলেন। তারপর বললেন, 'সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে আমি বোধহয় কম করেও কয়েক হাজার বার ভেবেছিরে ঝুনঝুনি। তাতে যে-মানেটা বারবার বেরিয়ে আসতে চাইছে সেটা খুব ভালো নয়। শুনলে তোদের মন খারাপ হয়ে যাবে...'

আমি জেদী গলায় বললাম, 'হোক মন খারাপ, তোমাকে বলতেই হবে। তুমি একা একা এরকম কষ্ট পাচ্ছ, আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

'তাহলে শোন। আমার যা মনে হয়েছে বলছি।' রুমুকা ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের মহাবিশ্বে যে-সময়ের স্রোত, তারই কোথাও একটা গরমিল হয়ে গিয়েছিল সেদিনের সেই মেঘলা দুপুরে। এ-ধরনের ব্যাপারকে অনেকে টাইম-স্লিপ বলেন। এই টাইম-স্লিপের জন্যেই হয়তো সেদিন হঠাৎ করে আমি ১৯০৬ সালে স্থাপিত হয়েছে এমন একটা দোকানঘর দেখে ফেলেছিলাম। দোকানটার সবকিছুই অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো— এমনকি ওই দোকানদার, পেনসিল, খাঁচা, মাছি সবই পুরনো আমলের। সুতরাং বলতে পারিস কোনো এক ঘটনাচক্রে এখনকার সময়ের সঙ্গে পুরনো সময়ের একটা যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল—'

'তাহলে কি বলতে চাও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ওই দোকানটার জায়গায় ওইরকম একটা ভুতুড়ে দোকান ছিল?'

'আমি প্রথমটায় তাই ভেবেছিলাম। তাই ও-পাড়ায় গিয়ে খোঁজখবরও করেছিলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। শুধু এটা জেনেছি, এখনকার দোকানটা আঠেরো বছরের পুরনো। তার আগে ওখানে একটা চীনে লন্ড্রি ছিল।'

'আচ্ছা, রুমুকা, মাছিগুলো ওরকমভাবে উড়ছিল কেন? এমনিতে তো মরা মানুষের মুখে ওরকম মাছি বসে—'

রুমুকা ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন, বললেন, 'সেটাই তো ভারি অদ্ভুত। আমার যা মনে হয়েছে সেটা ভালো নয়— তবু তোরা যখন জোর করছিস তখন বলি। আমার ধারণা, ওই দোকানদার ভদ্রলোক— ঠিক ইয়ে— মানে, জীবিত মানুষ ছিলেন না— হয়তো সদ্য মারা গেছেন। দোকানের ভেতর থেকে সেইজন্যেই হয়তো কান্নাকাটি আর খোল-করতালের শব্দ ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গে অগুরুর গন্ধ, কুয়াশা আর মাছি...সব মিলিয়ে আমার মন বলছে, লোকটা সাধারণ মানুষ ছিল না— অন্য কিছু ছিল। তার ঠোঁট আর মুখের ভেতরটা টকটকে লাল ছিল কেন আমি বলতে পারব না। আর কালো কাপড়ে ঢাকা ওই খাঁচায় কী ছিল তাও আমি আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু যতই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি ততই আমার ভয় করতে থাকে।

'সময়ের বিশাল একটা ফারাক ডিঙিয়ে আমার কিছুক্ষণের জন্যে যোগাযোগ হয়েছিল পুরনো সময়ের সঙ্গে। সেখান থেকে, কেমন করে জানি না, পেনসিলগুলো আর মাছিগুলো চলে এসেছে আমার কাছে। এই দুটো প্রমাণ সবসময় আমাকে ওই মেঘলা দুপুরটার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া তোরা তো জানিস, ক'মাস ধরে আমি একটা দোকান খোলার কথা ভাবছি। দোকান খোলার পর আমি থাকব কাউন্টারের ওপাশে, দোকানের ভেতরে। তখন টাইম-স্লিপের দুর্ঘটনায় কোনো আগামী দিনের খদ্দের হয়তো এসে দাঁড়াবে আমার দোকানে— এক ডজন পেনসিল চাইবে। তখন...' হঠাৎই থেমে গিয়ে মাথার চুলের গোছা চেপে ধরলেন রুমুকা, অদ্ভুত গলায় বললেন, 'জানিস, যখন আমি এইসব কথা ভাবি তখন যেন পাগল-পাগল লাগে। মনে হয়, মনে হয়...'

আমি ঝুঁকে পড়ে রুমুকার হাত চেপে ধরলাম। টের পেলাম, ওঁর হাত ঘামছে। আমি বললাম, 'তুমি এসব আজগুবি চিন্তা ভুলে যাও। তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার কিচ্ছু হবে না।'

রুমুকা অবসন্ন গলায় বললেন, 'ভুলতে হয়তো পারতাম। কিন্তু পারছি না শুধু ওই মাছিগুলোর জন্যে। ওরা সুযোগ পেলেই আমার কাছে চলে আসে।

ক্যামেরা

নীলাঞ্জন নন্দী

নিয়মিত ডায়রি লেখার অভ্যেস আমার নেই। তবে কখনো কোনো ঘটনা তেমন ভাবে নাড়া দিলে তার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখি। এ অভ্যেস বহুদিনের। ১৯৯০-এ যখন বাবা মারা গেলেন, তখন ডায়রি লিখেছিলাম। ভীষণ একা লাগতো তখন। আমাব দিদি সরমার ১৯৮৭-তে বিয়ে হয়ে যায় দিল্লীতে। কালেভদ্রে কলকাতায় আসে। ঠাকুর্দার তৈরি এই বিশাল বাড়িটায় এখন আমি আর কাজের লোক রাধারমণ। মাত্র দুটি প্রাণী। মাঝে মাঝে বাড়িটার হাঁ করা ক্ষুধার্ত মুখটা যেন আমায় গিলতে আসে। যতটা সম্ভব নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখি। মডেলিং অ্যাসাইমেন্টের ছবিগুলো বাড়িতে বসেই ঝাড়াই-বাছাই করি। এতে দিব্যি সময় কেটে যায়।

কিন্তু হঠাৎই গত শুক্রবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনার অপ্রত্যাশিতায় এতটাই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম যে এ ক'দিন ডায়রি লিখতেও বসতে পারিনি। সেদিন সকাল

থেকেই আকাশের অবস্থা ভালো ছিল না। কখনও মুষলধারে আবার কখনও বা ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়েই চলেছিলো। দশটা নাগাদ স্নান সেরে, খাটের তলা থেকে ডাকব্যাকের জলনিরোধক জুতো জোড়া বের করে পায়ে পরলাম। ক্যামেরার ব্যাগটা গোছাতে গিয়েই মাথার ব্যথাটা টের পেলাম। সারা কপালটা জুড়ে একটা চিনচিনে ব্যথা। তার সঙ্গে শুরু হলো চোখের জ্বালা। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম— জ্বর আসছে। থার্মোমিটারটা ভালো করে ধুয়ে জিভের তলায় মিনিট খানেক রাখতেই দেখলাম ১০২° উঠেছে। অফিস যাওয়ার চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে, জামা-প্যান্ট ছেড়ে, পাজামাটা পরে নিলাম। তারপরে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাধারমণকে বলে দিলাম, আমায় বিরক্ত কোর না। আজ দুপুরে কিছু খাবো না। শুধু একটু বিশ্রাম চাই এখন।

বেশি জ্বর হলে লক্ষ্য করেছি, নাক-মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোতে থাকে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। যখন ঘুমটা ভাঙলো, তখন বেড-সাইড টেবিলের ঘড়িটার দিকে চোখ পডতেই দেখলাম দুটো পাঁচ। এর মধ্যেই বৃষ্টিটা ধরে এসেছিলো। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে চোখে পড়লো কৃষ্ণচূড়া গাছটা। তার ডাল থেকে বৃষ্টির জল পাতা বেয়ে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছিলো। আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

নিচে রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে যদিও জল জমেনি। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা গাড়ি, ভেজা পিচে ছড়-ড়-ড় শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে। দু'একটা রিকশার চাকা এই ঝিমধরা দুপুরের শান্তিকে, তার ঢকর-ঢকর আওয়াজে নষ্ট করছে।

ঠিক এমন সময় আমার বাবার কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো ডায়রিটাব কথাও।

বাবার ডায়রি লেখার অভ্যেস ছিলো। উনি নিয়মিত লিখতেন। শুনেছি ঠাকুর্দাও নাকি ডায়রি মেনটেন করতেন। আমার দিদিকেও ডায়রি লিখতে দেখেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। অন্তত বিয়ের আগে পর্যন্ত দেখেছি। এখন আর সে অভ্যেস আছে কি না, জানি না।

গত মাসে দোতলার স্টোররুমটা পরিষ্কার করাচ্ছিলাম। তখনই বাবার চারটে ডায়রি হাতে আসে। ১৯১৭-১৯১৬। চার বছরের এক এক দিনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আমার জন্ম ১৯১৭-তেই। যখন আমি মায়ের পেটে, তখন থেকে শুরু করে আমার জন্মের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটা দিনের লিপিবদ্ধ করা প্রতিটি কথা পড়েছি। বাবাব স্বপ্ন, আশা আর আশঙ্কার স্পষ্ট ছবি, মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। '১৭, '১৪ আর '১৫ সালের ডায়রি পড়া হয়ে গেছিলো। '১৬-র ১৭ই মার্চ পর্যন্ত এগিয়েছিলাম। হঠাৎই জানি না কেন বাবার কথা মনে পড়তেই, '১৬-ব ডায়রিটা তখনই পড়তে ইচ্ছা হলো।

জ্বর দেখেই ক্রোসিন ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেছিলাম। তাই এখন শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। চোখে জ্বালাও নেই। শুধু মাথাটা একটু ধরে আছে। দুই রগে সামান্য ব্যথা রয়েছে।

দেরাজ থেকে স্টোররুমের চ্যাপ্টা পেতলের চাবিটা বের করে দোতলায় নেমে এলাম।

দরজটা খুলতেই সেই চাপা গন্ধটা নাকে এসে লাগলো। বহুদিনের ধুলো আর বন্ধ পরিবেশের গন্ধ। আলোটা জ্বালালাম। একসঙ্গে দুটো একশো ওয়াটের বাল্ব জ্বলে উঠলো, সবুজ শেডে। ঘরটা আসলে বাবার 'স্টাডি' ছিলো। ঠাকুর্দার মতো ব্যবসায় মাথা ছিলো না ওনার, তবে ডাক্তারি করে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিলেন। ঠাকুর্দা অবশ্য এতে কোনো আপত্তি করেননি। বাবাকে বিলেতে পাঠিয়ে এফ. আর. সি. এস করিয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে বাবার পসারও জমে ওঠে ভালোই। প্রথমে আর জি. কর., তারপরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস।

ঘরের তিনটে দেওয়াল জুড়ে কাচের পাল্লা দেওয়া আলমারি। বইয়ে ঠাসা। মেঝেতে ছড়ানো-ছিটোনো নানান রঙের ও আকারের বাক্স, সুটকেস আর গাদা গুচ্ছের মেডিক্যাল জার্নাল। ঘরে দুটো জানলা। রঙিন সার্সি বসানো তাতে। সেটা বছরভর বন্ধই থাকে। আমি চাই না এই বন্ধ ঘরটায় কোনো পাখি এসে বাসা বাঁধুক। জানলার পাশেই বড় টেবিলটার ওপরে '৬৬-র ডায়রিটা রেখেছিলাম। সার্সিগুলো খুলে দিয়ে চেয়ারটা টেনে বসলাম। বাইরে মৃদু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ কানে এলো। খোলা জানলা দিয়ে মেঘলা দিনের আলো এসে ঘরে পড়ছে। ঠাণ্ডা একটা হাওয়াও যেন আসছিলো। ডায়রিটা খুলে পড়তে শুরু করলাম ১৮ই মার্চ থেকে। বাবা লিখছেন...

১৮ই মার্চ ' ১৬

আজ হঠাৎ বীরেন সকালে টেলিফোন করেছিলো। বললো কাল নাকি পার্ক স্ট্রীটের 'ওয়াল্টার্সে' নীলামে যাবে। আমি তো প্রত্যেক রবিবারই যাই। বীরেন জিগ্যেস করছিলো ও সরাসরি যাবে, নাকি আমি ওকে তুলে নিয়ে যাবো? আমি বললাম, ওকে যাওয়ার পথে তুলেই নিয়ে যাবো। কাল ভুবনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওঁর ছেলের অপরেশনটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করিয়ে ফেলবো। সেন্ট আর্থার্স চ্যারিটি ফান্ড থেকে বোধহয় অপারেশনের জন্য অর্ধেক টাকা যোগাড় করতে পারবো! ভুবনবাবুর ছেলের ছবি চাই। ওদের দপ্তরে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে। ভুবনবাবুর মতো একটা নীলামের দোকানের কেরানীর পক্ষে দশ হাজার টাকা যোগাড় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ঠিকই। এরকম মানুষদের সাহায্যের জন্যেই সেন্ট আর্থারের মতো সংস্থা রয়েছে। আমার মন বলছে ওরা টাকাটা দেবে।

১৯শে মার্চ ' ১৬

একটু আগে নীলাম থেকে ফিরলাম। বীরেন একটা উনিশ শতকের ফরাসী কলম কিনেছে, ষাট টাকায়। তেমন সস্তা নয়। তবুও ও খুশিই হয়েছে। প্রথমদিন নীলামে এসে পটাপট দর চড়িয়ে ভেবেছে, 'আমি কী যেন একটা করলাম! আরও বারকয়েক ওখানে গেলে বোধকরি ও আরও বিবেচনা করে দর হাঁকবে। ফেরার পথে বীরেনকে নামিয়ে দিয়ে এলাম।

বাড়িতে এসে স্টাডিতে ঢুকে হাতের মোড়কটা খুললাম। আজ একটা ক্যামেরা কিনেছি। বেশ পুরনো জার্মান ক্যামেরা। ১২০ ফরম্যাটের— 'ফিশার'। এই কোম্পানি শুনেছিলাম

কয়েক বছর ব্যবসা করেই উঠে যায়। তবে ক্যামেরার সুনাম আছে। আজ নীলামের টেবিলে এটাকে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। একশো পঁচিশে কিনে ফেললাম। মনে তো হয় সস্তাই পড়েছে। ছবি তোলার নেশা আমার বহুদিনের। একটা 'জাইসাইকন' আছে। তবুও আরও ক্যামেরা কেনার ইচ্ছে। এই ক্যামেরাটা বেশ ভারী। সম্পূর্ণ কালো রঙের। লম্বায় প্রায় ইঞ্চি সাতেক, চওড়ায় ইঞ্চি চারেক। লম্বাটে চেহারা। অনেকটা 'ইয়াশিকা-৩০' -এর মতন। আগামীকালই একটা ফিল্ম কিনে ভরতে হবে। অজিতের বছর তিনেক বয়স হলো। ওর ছবি দিয়েই এটার ওপেনিং করবো।

২০এ মার্চ '১৬

আজ হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে হঠাৎই রাস্তায় ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। উনি ছেলের সঙ্গে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে হাঁটছিলেন। আমি ড্রাইভারকে ওঁদের পাশে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বললাম। আমায় দেখে একগাল হেসে উনি বললেন, আপনার বাড়ির ওদিকেই যাচ্ছিলাম। অন্নদা স্টুডিওতে। কাল যে বললেন ছেলের ছবি তোলাতে হবে! দেখি ভুবনবাবুর ছেলে পলাশ মুখ টিপে হাসছে। যেন ছবি তোলার কথায় খুব মজা পেয়েছে। আমি গাড়ির দরজা খুলে ওঁদের ভেতরে ডাকলাম। বললাম, স্টুডিওতে ছবি তুলে কোনো লাভ নেই। মিছিমিছি পয়সা খরচ হবে। তার চেয়ে বরং আমিই তুলে দিচ্ছি ছবি। বাড়িতে চলুন। গাড়িতে বসেই কথাবার্তা বলতে বলতে জানতে পারলাম ভুবনবাবুরা শ্যামপুকুরে থাকেন।

বাড়িতে এসে গতকাল নীলামে কেনা ক্যামেরাটা বের করলাম। আর জাইসাইকনটাও। দুপুরে ওয়ার্ড-বয় নবীনকে দিয়ে একটা 'ইলফোর্ড' ফিল্ম কিনে আনিয়েছিলাম। সেটাই ভরে ফেললাম ফিশারটায়। জাইসাইকনে ফিল্ম আছে।

ভুবনবাবু আর ওনার ছেলে পলাশকে নিয়ে ছাদে উঠে এলাম। এখনও অনেক আলো বাকি আছে। চৈত্র মাসের শেষ বিকেলের রোদ ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব চরাচরে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। পলাশকে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে পর পর দুটো ছবি তুললাম। একটা নতুন ফিশারে, আর একটা জাইসাইকনে। বলা যায় না, নতুন ক্যামেরায় ছবি কেমন উঠবে! তাই, টু বি অন দি সেফ সাইড, জাইসাইকনেও একটা তুলে রাখলাম। ছবি তোলার পর ওঁরা বাড়ি চলে গেলেন।

২১শে মার্চ '১৬

কোত্থেকে কী যে হয়ে যায়, বলা যায় না! হঠাৎই আজ সকালে ভুবনবাবু ছুটে এলেন আমার কাছে। কারণ জানতে চাওয়াতে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

জানতে পারলাম আজ ভোরে হঠাৎই ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অসাবধানতায় পা পিছলে পড়ে পলাশ গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

আর. জি. করের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করেই আমার কাছে এসেছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না!

দুপুর পর্যন্ত চেষ্টা করেও পলাশকে বাঁচানো গেলো না। মাথাটা ফেটেছিলো ঠিকই। তবে স্টিচ আর ইঞ্জেকশনগুলো পড়ার পর কন্ডিশানটা স্টেবল হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু না! ঠিক দুটো দশে পলাশ মারা গেলো। আমার আর কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না। আজ এই পর্যন্তই।

২২শে মার্চ '১৬

কাল পলাশ মারা যাওয়ার সময়ে ওর মৃত্যুর কোনো সঠিক এক্সপ্লেনেশন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবে এখন বোধহয় পারছি। আমি ডাক্তার হলে কি হবে? সর্বজ্ঞ নই। বিশ্বের সমস্ত কিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়! তাই হয়তো আমি মনে মনে ঈশ্বর, শয়তান, মিরাকেল, কালা-জাদু বা ভূতেও বিশ্বাস করি। জানি না কেন আমার মনে হয়— পৃথিবীতে সবকিছু বিজ্ঞানের আওতায় আসে না। সব সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান দিতে পারে না। পৃথিবীতে, অগোচরে অনেক কিছুই লুকিয়ে আছে, যা আমাদেব সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে।

গতকাল বেলা তিনটেয় ডেথ সার্টিফিকেট লিখে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসি। আসলে আমিও তো সন্তানের বাবা! মা-মরা ছেলের বাবা। ভুবনবাবুর মুখটা দেখার মতো কলজের জোর আমার ছিল না। কী করে আর এক পিতার নির্মম দুঃখটাকে...!

বাড়িতে ফিরে স্টাডিতে ঢুকে নতুন কেনা ক্যামেবাটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। আর ভাবছিলাম পলাশের কথা। ওর শেষ ছবিটা এই ক্যামেরাতেই বন্দী রয়েছে। মাত্র বারোটা বসন্ত কাটালো ছেলেটা— এত তাড়াতাড়ি চলে যাবার কি খুব দরকাব ছিলো?

স্ক্যালপেল (অপারেশনের ছুরি) হাতে নিলেই যেমন কাটা-ছেঁটা করতেন মন চায়, ঠিক তেমনই হাতে একটা ক্যামেরা থাকলে আপনা হতেই ডান হাতের তর্জনীটা ছটফট করে। অজিতের ডায়রিয়া হয়েছে, বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ওর ছবি তোলাটা মুলতুবি রইলো।

বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি ঠিক এমন সময় জানলার ফ্রেমে একটা পায়রা এসে বসলো। দুধসাদা গায়ের রঙ, তবে ডানায় একটা ধুসর দাগ। এরা দল বেঁধে এই বাড়িরই তিনতলায় কোথাও একটা থাকে। এদের বকম-বকম ডাকও শুনেছি। হাতের কাছে এমন এক লিভিং সাবজেক্ট পেয়ে, পট করে একটা ছবি তুলে নিলাম নতুন ক্যামেরাটায়। কে জানে কেমন উঠবে? পায়রাটা কিছুক্ষণ পর ডানা ঝটপটিয়ে উঠে গেলো। হয়তো পাশের বাড়ির কার্নিশে।

আজ সকালে এক মেজর অপারেশন ছিলো। মোটামুটি ভালোই হয়েছে। বিকালে বারান্দায়

এসে দাঁড়াতেই নিচে আমার নীল রঙের মরিসের পাশে সাদা মতো কি একটা পড়ে থাকতে দেখলাম। পেছনে চাকার ডান দিকে!

নিচে নেমে দেখি একটা পায়রা— ডানাগুলো ছড়ানো, মরে কাঠ। সারা শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। দুধসাদা পায়রাটার ডানায় একটা ধূসর দাগ! চেনা লাগলো। গতকালই মনে হয় এর ছবি...

হঠাৎই পিঠ বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেলো। মনে মনে ভাবলাম, ওই ফিশার ক্যামেরাটা দিয়ে পলাশের ছবি তুললাম— ও মারা গেলো! ওই ক্যামেরায় পায়রাটার ছবি তুললাম, সেও মারা গেলো! তবে কি...! ভাগ্যে অজিতের ছবি তোলা হয়নি! না জানি কী হতো— ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম জানালাম।

ক্যামেরাটার ইতিহাস কী? কোত্থেকে এসেছে ওটা? এই প্রশ্ন মাথায় ঘুরছে। পুরোপুরি শিওর না হলেও, আমার মনে হয় ক্যামেরাটা ভুতুড়ে!...

ওটাকে কিছুক্ষণ আগে বি. ও. এ. সি'র সবুজ এয়ারব্যাগটায় খবরের কাগজ মুড়ে তুলে রেখেছি। ওটাকে আর কোনোদিন ব্যবহার করবো না। কোনোদিনও না।

২৩শে মার্চ '৬৬

গতকাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। বিছানায় শুধু এপাশ-ওপাশ করেছি। ছোট্ট অজিত পাশে অকাতরে ঘুমিয়েছে। সকালে হসপিটালে বেরোবার আগে ও জিগ্যেস করেছিলো ক্যামেরাটার কথা— ও ওই ক্যামেরায় ছবি তুলতে চায়! ওইটুকু বাচ্চা ছেলে, ওকে আসল কথা বলি কী করে? তাই বলেছি ক্যামেরাটা খারাপ হয়ে গেছে। অজিত বরাবরই শান্ত। এ নিয়ে আর আমায় বিরক্ত করেনি।

হসপিটাল থেকে আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়েছিলাম। ড্রাইভার রামরতনকে গাড়িটা একটু জোরে চালাতে বললাম। গন্তব্য ওয়াল্টার্সের নীলামের দোকান। ফিশারের ইতিহাস না জানা অবধি শান্তি পাচ্ছি না। ওই ক্যামেরার পেছনে কী কাহিনী থাকতে পারে?

আর. জি. কর. থেকে পার্ক স্ট্রীট। বেশ অনেকটা পথ। যখন ওয়াল্টার্সের দোকানে ঢুকছি, আলো প্রায় মরে এসেছে। রাস্তার উল্টো দিকে ফ্লুরিসের কেক-পেস্ট্রির দোকান। দোকানের রঙিন সাইন-বোর্ডে ছোট ছোট আলো নেচে নেচে যাচ্ছে।

দোকানে ঢুকে ভুবনবাবুকে দেখতে পেলাম না। উনি ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন কে জানে? একমাত্র ছেলের মৃত্যুশোক কি এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়? ঠিক কতদিন লাগে কারো অস্তিত্বকে মন থেকে মুছে ফেলতে? কেউ কি বলতে পারে?

দোকানের মালিক রাজন মেহেরোত্রা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। আমি ওনার পুরোনো খদ্দের। আমার শুকনো মুখ দেখে উনি কারণটা জানতে চাইলেন। সবিস্তারে সব বললাম ওনাকে। ততক্ষণে টেবিলে এলাচ দেওয়া চা এসে গেছে। ভুরভুর করে গন্ধ বোরোচ্ছে।

রাজনবাবু চিন্তিত মুখে কাপটা তুলে নিয়ে একটা লম্বা চুমুক দিলেন। তারপরে বললেন— এরকম ব্যাপার...আপনার কোনো ভুল হয়নি তো? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে না বলাতে, উনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলে একটা পুরোনো কালো খাতা বের করে সামনে রাখা ছোট প্যাডে খসখস করে কী যেন লিখলেন। কাগজটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। বললেন— ক্যামেরাটা ওনারই ছিলো। কাগজটায় লেখা : পিটার লরেন্স, ১৩২ নং পেমান্টেল স্ট্রীট।

রাস্তাটা চেনাই ছিলো। আমার এক বুড়ো গোয়ানিজ পেশেন্ট থাকতেন সান্ডেল স্ট্রীটে, পেমান্টেল স্ট্রীটের পাশেই। এলাকাটা নোংরা, অন্ধকার আর গোলকধাঁধার মতো। রাজ্যের সরু সরু গলি এসে মিশেছে একটা আরেকটার সঙ্গে। জায়গাটা রিপন স্ট্রীটের দক্ষিণে,যত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বাস।

রাজনবাবু বললেন, পিটার সাহেবের বয়স প্রায় আশি। একমাত্র মেয়ে জোসেফিনা গত বছর মারা যাবার পর বাড়ি থেকে তেমন একটা আর বেরোন না। দিন পনেরো আগে হঠাৎই একদিন বিকেলে এসে ওই ক্যামেরাটা উনি ভুবনবাবুকে দিয়ে যান। একটা ছোট কাগজে আমার উদ্দেশ্যে কয়েকটা লাইন লিখে গেছিলেন। এত আঁকাবাঁকা হাতের লেখা, যে ভীষণ কষ্ট হয়েছিলো পড়তে। তাতে লেখা ছিলো ক্যামেরাটা বেচে দিন। যা দাম পাবো তাতেই আমি খুশি।

চিঠিটা পড়ে ভেবেছিলাম ওনার বোধহয় অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাই যত তাড়াতাড়ি পেরেছিলাম, ক্যামেরাটাকে বেচে ওনাকে সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু আপনি যে ঘটনা শোনালেন— আমার তো মাথা ঘুরে যাচ্ছে। সত্যিই যদি ক্যামেরাটার পেছনে কোনো কাহিনী থাকে,সেটা পিটার সাহেব জানতে পারেন।

রাজনবাবুর সঙ্গে আর কথা বাড়াইনি। চলে গেলাম পিটার লরেন্সের কাছে। ভাঙা-চোরা একটা প্রায় পোড়ো বাড়ির দোতলায় উনি থাকেন। অপরিষ্কার কামরা। অপর্যাপ্ত আলো আর অসহ্য একটা নাম-না-জানা জান্তব গন্ধ পরিবেশটাকে ভারী করে রেখেছিলো। সারা ফ্ল্যাটটায় কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। বোধহয় উনি একাই থাকেন। বৃদ্ধ পিটার লরেন্স একটা তুলো-ওঠা, রঙ-চটা সোফায় বসে আমায় লক্ষ্য করছিলেন। আমার কাছে ঘটনাগুলো শুনে বললেন— আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। আমি আপনার জীবনে বিপদ ডেকে এনেছি। স্বার্থপরের মতো কাজ করেছি নিজেকে বিপদমুক্ত করতে। উনি বললেন, ক্যামেরাটা আমার দাদার ছিলো। ডেরেক লরেন্সের। সে খুব একটা স্বাভাবিক ছিলো না। চার্চে যেতো না, বাইবেল ছুঁতো না। যখন ওর প্রায় ২৫ বছর বয়েস, ও হঠাৎ চুপিচুপি একটা স্যাটানিক গ্রুপের মেম্বার হলো। গ্রুপটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের চর্চা করত। পরিবারের সকলে ওকে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু কেউই সফল হয়নি। দাদার ভীষণ প্রিয় ছিলো এই ক্যামেরা। বীভৎস সব বলির ছবি ও তুলেছিলো ওই ক্যামেরাটা দিয়েই। শুনেছি

ঘটনাটা ঘটার কয়েকদিন পর একটা ফ্যাশন অ্যাসাইনমেন্ট ছিলো। নিকনের ব্যাগটা খুলতেই আঁতকে উঠলাম। আমার সাধের পনেরো হাজার টাকা দামের স্টিলজ্-এর স্ট্যান্ডটা বেঁকেচুরে গেছে। স্ক্রুগুলোতেও মরচে পড়েছে। ঝকঝকে ক্রোমিয়াম স্টিলেব এই মজবুত স্ট্যান্ডটা কী ভাবে যে...

আসলে ভুলটা তো আমারই! ভুতুড়ে ক্যামেরাটাকে এই স্ট্যান্ডের ওপরে তুলেই মরণ শাটারটা টিপেছিলাম। ক্যামেরাটা তো নষ্ট হলোই— আমার স্ট্যান্ডটাও অকেজো আর বাতিল হয়ে গেলো। চিরকালের জন্য। কারণ, শাটারটা পড়ার সময়, আয়নায় স্ট্যান্ডটারও প্রতিবিম্ব পড়েছিলো!!

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের লড়াই চলেছে পুরোদমে। ডাঁই করে রাখা জিনিসপত্রের ভিড়ে, সবুজ বি. ও. এ. সি'র এয়ারব্যাগটা চোখে পড়লো। তালা লাগানো ছিলো না। খুলতেই বেশ কিছু ওষুধের বিজ্ঞাপনের বোর্ডের নিচে একটা লম্বাটে প্যাকেট দেখতে পেলাম। পুরোনো ছেঁড়া খবরের কাগজে মোড়া। প্যাকেটটা খুললাম। ক্যামেরাটাকে দেখে তো মনে হয় এখনও দিব্যি চলে। হঠাৎই মাথায় একটা প্রশ্ন এলো, বাবার মনের ভুল নয়তো? সবটাই নিছক কল্পনাও তো হতে পারে...!

কিন্তু বাবা তো বেশ কম কথার মানুষ ছিলেন। মনগড়া ঘটনার কোনো মূল্য ওনার কাছে ছিলো না। তবে কি...!

মাথায় একটা বুদ্ধি বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠলো। একটা পরীক্ষা করতে হবে। ক্যামেরাটাকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে এলাম। ফিল্ম ডায়ালে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তিন লেখা রয়েছে। অর্থাৎ '৬৬ -তে তোলা সেই পায়রা আর ভুবনবাবুর ছেলে পলাশের ছবি রয়ে গেছে এর অভ্যন্তরে। ফিল্মটা বোধহয় অকেজো হয়ে গেছে। সেই দুটো ফটো তোলার পর আর ব্যবহারই হয়নি এ ক্যামেরাটা।

ক্যামেরাটাকে খাটের উপরে রেখে নিকনের ব্যাগটা থেকে স্টিলজ্-এর স্ট্যান্ডটা বের করলাম। ক্যামেরাটাকে তার উপরে বসিয়ে সেল্ফ-টাইমারের বোতামটায় দম দিয়ে দিলাম। আর তারপরে শাটারটা টিপলাম। এভাবে, আপনা-আপনিই ছবি ওঠে। ফটোগ্রাফারের দরকার পড়ে না!

হঠাৎ কানে এলো কির-র-র-র-কির র-র-র শব্দ। শাটারটা পড়তে আর বড়জোর সেকেন্ড ছয়েক বাকি! যেন র‍্যাটল স্নেকেব গা-হিম করা ঝুমঝুমির শব্দ। লেন্সটা সোজা, নিজের নিরেট কালো শরীরের দিকেই তাক করা! ক্যামেরাটা যেন নিজেই নিজের ছবি তুলবে। আসলে, ক্যামেরাটাকে আমি বসিয়েছি আয়নার সামনে। পুরোনা দিনের আলমারির এক পাল্লায় বেলজিয়াম মিরর। ক্যামেরার প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখা যাচ্ছে। আমি ঘরের এক কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। মন বলছে আজ যদি এই হতচ্ছাড়া শয়তানের যন্ত্রটার মনে প্রতিহিংসা জাগে, জাগে মরণের নেশা, তো ব্যাটা নিজেকেই মারুক!

খুট! চিড়-বিড়-বিড়-ড়-ড়-ড়-ড়! দুম! তিনটে শব্দ পরপর হলো। অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

খুট! শাটারটা পড়লো।

চিড়-বিড়-ড়-ড়! আয়নায় আড়াআড়ি ভাবে একটা চির ধরলো! ফেটে গেল!

দুম! শব্দটা এলো ক্যামেরার ভেতর থেকে। জানি, হয়তো কান পাতলে মরে ভূত হয়ে যাওয়া ডেরেকের চাপা আর্তনাদও শুনতে পেতাম। ঠিক তারপর—

ক্যামেরার লেন্সটায় একটা ফাটল ধরলো। এক্সপোজার, ফোকাস রিং খসে পড়লো মাটিতে। পেছনের ডালাটা খুলে গিয়ে ফিল্মটা বেরিয়ে পড়লো— পেট থেকে বেরিয়ে পড়া নাড়িভুঁড়ির মতন। মৃত্যু হলো ওটার! যেন ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গেলো।

ঘটনাটা ঘটার কয়েকদিন পর একটা ফ্যাশন অ্যাসাইনমেন্ট ছিলো। নিকনের ব্যাগটা খুলতেই আঁতকে উঠলাম। আমার সাধের পনেরো হাজার টাকা দামের স্টিলজ্-এর স্ট্যান্ডটা বেঁকেচুরে গেছে। স্ক্রুগুলোতেও মরচে পড়েছে। ঝকঝকে ক্রোমিয়াম স্টিলেব এই মজবুত স্ট্যান্ডটা কী ভাবে যে...

আসলে ভুলটা তো আমারই! ভুতুড়ে ক্যামেরাটাকে এই স্ট্যান্ডের ওপরে তুলেই মরণ শাটারটা টিপেছিলাম। ক্যামেরাটা তো নষ্ট হলোই— আমার স্ট্যান্ডটাও অকেজো আর বাতিল হয়ে গেলো। চিরকালের জন্য। কারণ, শাটারটা পড়ার সময়, আয়নায় স্ট্যান্ডটারও প্রতিবিম্ব পড়েছিলো!!

মুখে বরফের কুচি গুঁড়িয়ে গেল

সুচিত্রা মিত্র

ভূত আছে কি না আছে— এমন কথা বলতে চাই না। কারণ ভূত বললেই মনে হয় গল্পকথা। কিন্তু Spirit বলে কিছু একটা আছে এটা আমি বিশ্বাস করি। আর এ নিয়ে তো গবেষণা চলে আসছে— চলছে। কিন্তু সে কথা থাক। আমার জীবনে কয়েকবার যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল তারই একটা বলি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা? সে আপনাদের মর্জি। বহুবছর আগে ১৯৪৫-৪৬ সাল হবে। আমি বি. এ পড়ি স্কটিশ চার্চ কলেজে। গান গাই, ছাত্র রাজনীতি করি, টিউশানি করি, আড্ডা মারি— এমনই বয়স তখন। সময়টা ছিল শীতকাল। কলেজের শেষে পার্টির cell meeting ছিল গোয়াবাগানে এক ছাত্রনেতার বাড়িতে। সেখান থেকে যখন পথে নামলাম তখন বিকেল সাড়ে ছটা হবে। কিন্তু শীতের বিকেল তো— তাই

অন্ধকারটা নামে তাড়াতাড়িই। গোয়াবাগানের কাছেই সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট। সেখানে আমার এক সহপাঠিনীকে economics-এর একটা বই, কিছু নোট্‌স দিয়ে বাড়ি ফিরব— এমনই বলা ছিল বাড়িতে। এখনকার কথা বলতে পারি না, কিন্তু তখন সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ছিল খুবই সরু আর নোংরা। যাইহোক বন্ধুর বাড়িতে কাজ এবং আড্ডা সেরে যখন রাস্তায় বেরুলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। বাড়ি ফিরলে কপালে বকুনি আছে নির্ঘাত— ফলে জোর কদমে হাঁটা শুরু করলাম। ওই সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ধরে এঁকে বেঁকে কিছুটা হাঁটলেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, তারপর 2B বাস ধরে ভবানীপুরের বাড়িতে। তখনও কলকাতা শহরে কিছু কিছু রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলত। সন্ধ্যের একটু আগেই কাঁধে মই নিয়ে লোক এসে গ্যাস জ্বালাত আবার ভোরবেলা ওইভাবে এসেই নিভিয়ে যেত। এ রাস্তায়ও গ্যাসের আলো। একে শীতের রাত্তির তায় গ্যাসের আলো পথটা খুব আলোকিত নয়। একটা গ্যাসপোস্ট থেকে আর একটার দূরত্বের মধ্যে শীতের রাতের ধোঁয়াশা এবং ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল। একটু হয়তো অন্যমনস্কই ছিলাম। হঠাৎ মনে হল পেছনে কে জানি আসছে। তখন চুরি, ছিনতাই এসবের হাঙ্গামা ছিল না। তাই সে ভয় আমার হয়ইনি। কিন্তু 'পেছনে কে আসছে' এই বোধ হতেই গা ছম্‌ছমিয়ে উঠল। আমি ভীতু এ বদনাম আমার নেই। ছোট থেকেই আমি ডাকাবুকো। কিন্তু সে রাত্তিরে কী যে হল— ঘাড় ফিবিয়ে পেছনে দেখব যে তাও পারলাম না। মনে হল ঘাড়টা যেন স্ক্রু দিয়ে আঁটা। হাঁটার বেগটা বাড়ালাম। একটা গ্যাসপোস্ট পেরিয়ে পড়লাম জমাট অন্ধকারের কবলে... আর ঠিক সেইসময়েই পেছনে (কি বলব তাকে আজও জানি না) প্রাণীটি হন্‌হনিযে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল। ওরেঃ বাস্! কি ঢ্যাঙা! আপাদমস্তক সাদা কোনও কাপড়ে জড়ানো— বোধকরি শীতের জন্যে। আর পাশ দিয়ে যখন গেল তখন যেন মুঠো মুঠো বরফের কুচি আমার ওপর ছড়িয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখদুটো রইল সামনের গ্যাসপোস্টের দিকে— প্রাণীটিকে ওই আলোয় আর একবার দেখবার ইচ্ছেয়। কিন্তু ওমা! গ্যাসের আলোয় যাবার আগেই' প্রাণীটি কোথায় উবে গেল। 'উবে গেল' বলছি এই কারণেই যে তাকে আর আলোর তলায় দেখলাম না। যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝালাম হয়তো কোনও বাড়িতে ঢুকে গেছে নয়তো বা আশপাশের কোনও গলিতে। জোরে হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু কোথায় কি? আমার বাঁপাশে একটা খাটাল আর ডানপাশে একটা বাড়ির উঁচু টানা দেওয়াল। এছাড়া কোনও বাড়ির দরজা বা সরুগলি নেই! তারপর? তারপর বুকের ধকধকানি মাথায় বয়ে কেমন করে যে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম— তা মনে নেই। বলতে পারেন চোখের ভুল। হতে পারে। কে জানে? যেমন ধরুন না কেন— এই যে সারাদিন কাজের পর রাত বারোটায় টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে যখন লেখাটা লিখছি মনে হচ্ছে কে যেন ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে, কি লিখছি, পড়ছে। ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসও আমার গালে লাগছে...কেমন যেন একটা uncanny feeling একে কি বলবেন আপনারা? এমন অভিজ্ঞতা আমার আরও অনেক...কিন্তু থাক। সেগুলো পরে কোনও সময় না হয় বলা যাবে।

তারাও আসে

মানবেন্দ্র পাল

এই রকম একটা বীভৎস দৃশ্য দেখতে আসার ইচ্ছে আমার মোটেও ছিল না। এলাম শুধু আমার বন্ধু পশুপতির একান্ত অনুরোধে।

থানার ও. সি. রামেন্দু মজুমদারের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল। ওঁকে বললাম, "আমার এক বন্ধুর খুব ইচ্ছে ডেডবডিটা একবার দ্যাখে। আপনার আপত্তি না থাকলে ওঁকে নিয়ে আপনার সঙ্গে যাই।"

রামেন্দুবাবু চোখ ছোট করে হেসে বললেন, "ওইরকম একটা বাজে লোকের ডেডবডি দেখতে কারও ইচ্ছে করে!"

বললাম, "আসলে আমার বন্ধুটি ওইসব নিয়ে অল্পস্বল্প চর্চা করে কিনা! সাধুজিকে ও চিনত।"

"তার মানে আপনার বন্ধুও ওইসব প্রেতচর্চা করেন?"

"হ্যাঁ, ওটা ওর এক ধরনের শখ আর কী!"

"বেশ, নিয়ে আসুন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা স্টার্ট করব।"

পশুপতি, যাকে বলে নিপাট ভালমানুষ, তাই। বিয়েথাও করেনি। আত্মীয় বলতেও তেমন কেউ নেই। শহরের একটেরে একটা পুরনো দোতলা বাড়ির নীচের তলায় থাকে। দোতলায় থাকে ভাড়াটে। বাড়িটা তার পিসিমার। পিসিমার কাছেই ও মানুষ হয়েছে। পিসিমার মৃত্যুর পর তাঁর মোটারকম সম্পত্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু পিসিমার অভাবটা সে মর্মে মর্মে বোঝে। বাস্তব জীবনের কোনও অভিজ্ঞতা তার নেই। এতদিন যা কিছু তার দরকার, সব পিসিমাই করে দিতেন। আজ পিসিমার অভাবে সে লক্ষ্মীছাড়া না হলেও ছন্নছাড়া। ভাগ্যিস দোতলায় ভাড়াটে ছিল। তাই দরকারে সাহায্য পেয়ে বেঁচে যায়।

বেঁটোখাটো মানুষটি। ছোট করে কাটা চুল। মোটা-মোটা আঙুলে চার-চারটে পাথর বসানো আংটি ঝলমল করে। পরনে আধময়লা ধুতি আর গায়ে ফতুয়া। ফতুয়ার পকেট দুটো অস্বাভাবিক বড়। আর সেই পকেট দুটোয় থাকে নানা রকমের 'স্টোন', লোহার একটুকরো পাত, একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস, একটা ছোট পেন্সিল আর একটা নোট বই। একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে সে সামান্য মাইনেয় কাজ করে। এমন চাকরি না করলেও তার কিছু এসে যেত না। তবু যে সে করে, সেটা ওর পিসির আদেশ পালনের জন্যই। তিনি বলতেন, "চাকরি কখনও ছাড়বে না বাবা। স্বোপার্জিত অর্থের সম্মানই আলাদা, তা টাকার অঙ্ক যাই হোক না কেন।"

আর পিসিমা ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সাড়ে ন'টায় অফিস রওনা করিয়ে দিতেন বলে আজও সে ঠিক সাড়ে ন'টায় পান চিবোতে-চিবোতে, পায়ে রবারের জুতো আর মাথায় ছাতা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে অফিস যায়।

হেঁটে-হেঁটেই যায়, কেননা পিসিমা তাকে যথাসম্ভব ট্রামে-বাসে চড়তে নিষেধ করেছিলেন। অফিসে প্রায়ই পাঁচজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, "পশুপতিদা আমার হাতটা দেখে দিন।"

পশুপতি কাউকে ফেরায় না। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করে এক-একজনের হাত দেখে। মাঝে-মাঝে নোটবইটা বের করে কীসব অঙ্ক কষে বিধান দেয়।"

হাত-দেখা, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান গণনা করা ছাড়া তার আর-একটা শখ প্ল্যানচেট করা। এই শখটা ওর বেড়েছে পিসিমার মৃত্যুর পর। হরতনের মতো কাঠের প্ল্যানচেট নয়। ও প্ল্যানচেট করে কাপ দিয়ে। মেঝেতে চকখড়ি দিয়ে একটা বড় বৃত্ত আঁকে। বৃত্তের গায়ে A থেকে Z পর্যন্ত লেটারগুলো লেখা। বড় বৃত্তের মধ্যে একটা ছোট বৃত্ত। সেখানে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চা খাওয়ার একটা কাপ উলটো করে বসিয়ে তার ওপর আলতো করে আঙুল ছুঁয়ে পরলোকগত অতিপরিচিত কোনও আত্মাকে স্মরণ করে। ঘরে তখন জ্বালিয়ে দেয় হালকা নীল আলো। কাছেই জ্বলে ধূপ। টুঁ শব্দটি নেই। একটু পরেই কাপটা নড়ে ওঠে। পশুপতি গলা খাটো করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "কে? পিসিমা?"

উত্তরে কাপটা আঙুলসুদ্ধু চলে যায় প্রথম 'Y'-এর কাছে, তারপর 'E' এর কাছে, তারপর 'S'। অর্থাৎ 'YES' অথচ শুনেছি পিসিমা ইংরেজি লেখাপড়ার বিন্দুবিসর্গও

জানেন না।

যাই হোক, এইভাবে প্রায়ই নির্জন ঘরে বসে রাতের বেলায় পিসিমাকে ডাকত। আর প্রশ্ন করে-করে উত্তর জেনে নিত। যেমন, কখনও জ্বর হলে জিজ্ঞেস করত, "কোন ডাক্তারকে দেখাব? কী খাব?" কিংবা "অফিসের অনেকেই বেশ কিছু টাকা ডবল করার জন্য 'ফিক্সড ডিপোজিট' করে। আমিও করব কি?"

প্রশ্ন করার দু' মিনিট পরেই কাপটা আঙুল সমেত প্রথমে চলে যায় 'Y'-এর কাছে, তারপর 'E'-এর কাছে; তারপর 'S'। পশুপতি নিশ্চিন্ত মনে ১০ হাজার টাকা জমা করে দেয়।

একদিন পিসিমাকে ডেকে বলল, "একজন তান্ত্রিক গোছের সন্ন্যাসী এসেছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। উনি প্রতি শনিবার ওঁর কাছে যেতে বলেছেন। সন্ন্যাসীকে দেখলে ভয় করে। নামকরা সাধু। ওঁর কাছে যাব কি?"

উত্তর পাওয়ার আগেই নাকি লোডশেডিং হয়ে যায়। তারপর পিসিমাকে আর ডাকা হয়নি।

এসব কথাই পশুপতি আমাকে অকপটে বলে। আমার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু ওর আর নেই। বলা বাহুল্য, আমার এই আধপাগলা বন্ধুটির কাজকর্ম, কথাবার্তা বেশ উপভোগ করি।

ওর মুখেই সাধুর খবর শুনলাম। কোথা থেকে যেন এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধুটি এসেছেন। শহরের বাইরে আস্তানা গেড়েছেন। নাম শঙ্করানন্দ। মাঝে-মাঝে বিশেষ দিনে গভীর রাতে সাধুজির কাছে, কিছু লোক আসেন। ভদ্রলোকই বলা যায়। গভীর রাতে সাধুজি নাকি প্রেত নামান। যাঁরা সেখানে যান তাঁদের প্রত্যেকের তিনটি করে প্রশ্নের উত্তর কোনও অশরীরী আত্মার কাছ থেকে পাওয়া যায়। আমার বন্ধুটিও প্রায়ই এই প্রেত নামানো চক্রে যোগ দেয়। ওর মুখেই শুনেছি, রাত দুটোর পর নির্দিষ্ট সময়ে একটা ছায়া-মূর্তি ঘরের দেওয়ালে ভেসে ওঠে। তাকে যা প্রশ্ন করা হয় তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় সমাধিস্থ সাধুজির গলা থেকে।

সাধুজির ক্রিয়াকলাপে পশুপতির আগ্রহী হওয়ার প্রধান কারণ, প্রথম যেদিন সে অনাহূত গিয়েছিল তখন ধ্যানস্থ সাধুজি নাকি চোখ বুজেই তার নাম ধরে ডেকেছিলেন, "এসো পশুপতি, তোমার অপেক্ষাতেই আছি।"

পশুপতি তো শিউরে উঠেছিল। আশ্চর্য! সাধুজি তার নাম জানলেন কী করে! শুধু নাম জানাই নয়, তার অপেক্ষাতেই আছেন! সাধুজি শুধু বাংলাতেই নয়, কাউকে হিন্দিতে, কাউকে ইংরাজিতেও সম্বোধন করেন।

তারপর থেকেই সাধুজির কাছে পশুপতির যাওয়া-আসা। কথায়-কথায় পশুপতি তাঁকে জানিয়েছিল, তার প্ল্যানচেট করার কথা। শুনে সাধুজি খুব খুশি হয়েছিলেন। পরে নাকি বলেছিলেন, তিনিও প্ল্যানচেট করবেন। তাঁর কাছে দারুণ একটা জিনিস আছে। সেটা পশুপতিকেই দেখাবেন।

শুনে পশুপতি আনন্দে, আবেগে একেবারে রোমাঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু পশুপতির দুর্ভাগ্য, তার এই 'অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন' সাধুজি — গত রাতে রহস্যজনকভাবে মারা গেছেন। রাতে কেউ কেউ নাকি দূর থেকে তাঁর মর্মান্তিক আর্তনাদ মাত্র একবার শুনতে পেয়েছিল। সকালবেলায় এসে দেখে দরজা খোলা। আর সাধুজি দরজার ওপর মরে পড়ে আছেন।

পুলিশ অবশ্য অনেক আগে থেকেই সাধুজির ওপর নজর রেখেছিল। তাদের মতে, সাধুজি এক নম্বরের ভণ্ড। কোনও বিশেষ মতলবে এখানে ডেরা বেঁধেছেন। তবে এখনও তেমন প্রমাণ পায়নি। প্রমাণ পেলেই হাজতে ঢোকাবে।

যাই হোক, আমরা যখন জিপ থেকে নামলাম তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে মাঠের শেষে একটা টালির ঘরে সাধুজির ডেরা। জায়গাটা নির্জন। লোকবসতি কম। পেছনে গভীর জঙ্গল।

ঘরের সামনে কিছু লোকের ভিড়। সবার চোখে-মুখে ভয়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একজন কনস্টেবল।

ভেতরে ঢুকলাম। একখানি মাত্র ঘর। ঘরে কোনও আসবাবপত্র নেই। একটা বাঘছাল মেঝেতে পাতা। একটা কমণ্ডলু। গোটা পাঁচেক মড়ার খুলি। একটা বিরাট ত্রিশূল। ঘরের মাঝখানে কিছু পোড়া কাঠ। বোধ হয় হোমটোম কিছু করা হয়েছিল। পেছনে একটা দরজা। দরজাটা জঙ্গলের দিকে যাওয়ার। সেই দরজাটার ওপর পড়ে ছিল শঙ্করানন্দের বিশাল দেহ।

"দেখেছ পশুপতি, কী ভয়ঙ্কর!" ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। কিন্তু পশুপতি তখন পাশে ছিল না। ঘরে সবাই যখন মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত, ও তখন ঘরের অন্যদিকে কিছু যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। অথচ সাধুজির মৃতদেহটি শেষবারের মতো দেখবার জন্যই নাকি তার আসা।

ও.সি. দেহটা হাতের বেঁটে লাঠি দিয়ে এদিক-ওদিক করে দেখে কিছু নোট করে নিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী মনে হয়? মার্ডার কেস?"

ও.সি. একটা সিগারেট ধরিয়ে হালকা ভাবেই বললেন, "কে কিসের স্বার্থে মার্ডার করবে বলুন! মার্ডার করার পেছনে তো একটা মোটিভ থাকবে।"

"কিন্তু.."

"হয়তো প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল, বেরোতে যাচ্ছিল, মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে মরেছে। পোস্টমর্টেম করলেই বোঝা যাবে।" এই বলে কনস্টেবলদের মৃতদেহ গাড়িতে তুলে দিতে আদেশ করলেন।

ইচ্ছে করেই আমি আর কথা বাড়াইনি। কী দরকার?

ফেরার পথে বামেন্দুবাবু শহরের মুখে আমাদের নামিয়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন। আমরা একটা রিকশা নিয়ে নিলাম।

পশুপতিকে এতই গম্ভীর মনে হচ্ছিল যে, অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। বুঝতে পারছিলাম সাধুজির এই হঠাৎ মৃত্যুতে ও খুব কষ্ট পেয়েছে।

একটু পরে বললাম, "মনটা তোমার খুব খারাপ হয়ে গেছে, না?"

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, তা তো স্বাভাবিক। ওঁর কাছে যেতাম। ওঁর স্নেহ পেয়েছিলাম। উনি আমায় অনেক গোপন কথাও বলেছেন। আর কিছুদিন ওঁকে পেলে আমিও অলৌকিক কিছু করতে পারতাম।"

রিকশাটা একটা ঝাঁকানি দিয়ে মোড় ফিরল। বললাম, "সাধুজির মৃত্যুটা তোমার কীরকম মনে হয়?"

ও চট করে উত্তর দিল না। একটু ভেবে পালটা প্রশ্ন করল, "তোমার কী মনে হয়?"

বললাম, "ও.সি. তো বললেন প্রেশারে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে..."

বাধা দিয়ে পশুপতি বলল, "ও.সি. তো কোনও গুরুত্বই দিলেন না। যা বললেন তা তো ওঁর অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়।"

একটু থেমে বলল, "স্বাভাবিক বা স্ট্রোকে মৃত্যু হলে কি কারও চোখ অমনভাবে ঠেলে বেরিয়ে আসে?"

বললাম, "সে-কথা আমারও মনে হয়েছে।"

"তারপর খেয়াল করেছিলে বোধ হয় লোকগুলো বলছিল গভীর রাত্তিরে সাধুজির আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল।"

"হ্যাঁ, একবার।"

"হ্যাঁ, একবারই। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার চিৎকার করার সময়টুকুও পাননি।"

একটু থেমে ভাঙা-ভাঙা গলায় পশুপতি বলল, "সাধুজির পাথরের মতো শরীরটা তে দেখলে। তা ছাড়া আমি বিশ্বাস করি, ঐশ্বরিক শক্তিতেও তিনি শক্তিমান। সেই মানুষ যদি সত্যিই আর্তনাদ করে থাকেন তা হলে বুঝে দ্যাখো কত না জানি ভয় পেয়েছিলেন।"

আমি রিকশাওয়ালার কান বাঁচিয়ে বললাম, "তা হলে কি তুমি মনে করো এটা খুন?"

পশুপতি বিজ্ঞের মতো ঠোঁটের ফাঁকে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল, "সেটাই তে রহস্য। অবশ্য আমি কিছু একটা অনুমান করতে পারি। তবে তা মাননীয় ও.সি. মহাশয়ে অনুমানের মতো নয়। আমার অনুমান, আমি জানি, একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক। কি সে-কথা বলা যাবে না। লোকে পাগল বলবে।"

মনে-মনে বললাম, 'ঠিক কথাই। কেননা তুমি নিজেই তো একটা পাগল। কাজে প্রলাপ ছাড়া তুমি আর কী বলবে!'

আমি আর ও-প্রসঙ্গে না গিয়ে বললাম, "তা তুমি সারা ঘরে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলে?'

ও অমনই চটজলদি জবাব দিল, "যা পাওয়ার জন্য আমি এখানে এসেছিলাম।"

"পাওয়ার জন্য?"

"হ্যাঁ, পাওয়ার জন্য? খুবই সামান্য জিনিস।"

বলে পশুপতি সিট থেকে একটু উঠে দাঁড়িয়ে ফতুয়ার সেই বিরাট পকেট থেকে জিনিস অতি গোপনে বের করে দেখাল।

"এটা আবার কী?"

"দেখতেই পাচ্ছ।"

"হ্যাঁ, দেখতে তো পাচ্ছিলাম। একটা চায়ের কাপ। তবে সাধারণত যেমন সাদা কাপ হয়, সেরকম নয়। কুচকুচে কালো। তার গায়ে আবার একটা চোখ আঁকা। একটাই চোখ, কিন্তু কী ভয়ঙ্কর সে চোখের চাউনি!"

"এটা নিয়ে কী করবে?"

"কী করব তা জানি না। তবে সাধুজি আমায় বলেছিলেন এটা নাকি দারুণ শক্তিশালী মিডিয়াম। নির্জন ঘরে একা বসে এক মিনিট আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে থাকলেই একজন পাগলা সাহেবের ভর হয়। যা জানতে চাইবে তার উত্তর পাবে। মাঝে-মাঝে সে নিজে থেকেই কিছু উপদেশ, নির্দেশ দিতে পারে। এই কাপের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করা যাবে। তবে মাসে মাত্র একদিন, অমাবস্যার রাতে।"

বলতে-বলতে পশুপতির গলা উত্তেজনায় কেঁপে উঠল।

একটু সামলে নিয়ে বলল, "সাধুজি সম্প্রতি তিব্বত গিয়েছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ লামার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কাপটা সেই লামার।"

"লামার কাছ থেকে সাধু কাপটা পেলেন কী করে?"

"সাধুজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি হেসে বলেছিলেন, ইচ্ছের জোরে।"

"ইচ্ছের জোরে!"

"হ্যাঁ, ব্যস ওইটুকু কথা। বাকিটা বুঝে নাও।"

বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ইচ্ছে পূর্ণ করার জন্যে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। দুর্বল বৃদ্ধ লামা কি আর ওই দুর্দান্ত সাধুজির জোর সহ্য করতে পেরেছিলেন?

"কিন্তু সাধুজি বোধ হয় ওটা এতদিন ব্যবহার করতে পারেননি। ওটা ব্যবহার করেছিলেন কাল। অমাবস্যার আগেই। আর তারই পরিণতি এই।" বলেই পশুপতি আমার হাত থেকে কাপটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পকেটে পুরে রাখল।

"কিন্তু কাপটা নিয়ে এসে কি ভাল করলে?"

"কেন? খারাপ কী?"

বললাম "দ্যাখো, ওসব যদিও আমি বিশ্বাস করি না, তবু সত্যিই যদি কাপটার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা থাকে তা হলে হয়তো বিপদ ঘটতে পারে।"

"কী বিপদ?"

"তুমি হয়তো সেই পাগলা সাহেবের শক্তিকে সামলাতে নাও পারতে পারো।"

পশুপতি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, "না পারবার কী আছে? আমি তো নিয়মিত কাপ চালি।"

"সে-চালায় আর এ-চালায় তফাত আছে। তুমি কাপের মিডিয়ামে তোমার পরিচিত বিশেষ একজনকে ডাকো। আর এই কাপ সম্বন্ধে যা শুনলাম — না ডাকতেই এক পাগলা

সাহেব ভর করে। দুটোয় তফাত আছে।"

পশুপতি গম্ভীরভাবে বলল, "সে আমি ম্যানেজ করব।"

"তা ছাড়া সাধুজির জিনিস তাঁর অনুমতি ছাড়া নিয়ে আসা ঠিক হল না।"

পশুপতি দাঁতের ফাঁকে হেসে বলল, "এরকম অলৌকিক জিনিস কেউ কাউকে দান করে না। কৌশলে নিতে হয়। তা ছাড়া এটা তো এখন বেওয়ারিশ জিনিস। তাই না?"

আমি আর কথা বাড়াইনি। আমার কেমন যেন মনে হল এইমাত্র যেসব কথা পশুপতির মুখ থেকে শুনলাম এ যেন আমার বন্ধু পশুপতি নয়, অন্য কেউ।

তিনদিন পর।

রাত তখন বারোটা হবে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কে?"

উত্তর পাওয়ার দরকার হল না। দেখি, পশুপতি, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম।

"কী ব্যাপার? এত রাতে?"

ও কোনওরকমে বলল. "তুমি একবার এসো।" মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একেবারে ফ্যাকাসে।

"কী হয়েছে?"

"আমার কেমন ভয় করছে।"

রাস্তায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সেটায় গিয়ে উঠলাম।

ট্যাক্সিতে উঠে ও বলল, "রাত দশটা নাগাদ হঠাৎ আমার ইচ্ছে করল কালো কাপটা চেলে দেখি। যদিও — জানি অমাবস্যা ছাড়া ওটা চালা নিষেধ।

"খড়ি পেতে, ধূপ জ্বেলে কাপটা মাঝখানে বসালাম। তারপর আঙুল ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই কাপটা ভীষণভাবে নড়ে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে এসেছেন?'

"উত্তরে কাপটা লেটারগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যে নামটা জানাল তা দেখে আমি আঁতকে উঠলাম! আমি ভাই কিছুতেই বুঝতে পারছি না। না ডাকতেই শঙ্করানন্দ এলেন কেন?"

আমি সাহস দিয়ে বললাম, "তাতে ভয় পাওয়ার কী আছে?"

পশুপতি বলল, "আছে। তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আমি তো কম দিন প্ল্যানচেট করছি না! এবার করতে গিয়ে বেশ অনুভব করতে পেরেছি একটা কিছু বিপদ ঘটতে চলেছে। তাই বাধ্য হয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। ঘরে একা থাকতে ভরসা পাচ্ছি না।"

ওর বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। বেচারী দরজায় তালা লাগাবারও সময় পায়নি। কোনও রকমে শেকল তুলে চলে এসেছে।

কিন্তু ভয় পাওয়ার কী আছে তা বুঝতে পারলাম না!

ঘরে ঢুকে দেখি হালকা নীল আলো জ্বলছে।

মেঝেতে সেই পরিচিত দৃশ্য। খড়ি দিয়ে বড় বৃত্ত আঁকা। বৃত্তের গায়ে A থেকে Z পর্যন্ত বর্ণমালা। আর কালো কাপটা কাত হয়ে পড়ে আছে।

"এটা এরকম ভাবে কেন? এটা তো উপুড় হয়ে থাকবে।"

পশুপতি বলল, "উপুড় করা অবস্থাতেই ফেলে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি..."

দেখার আরও কিছু ছিল। কালো কাপের গায়ে সেই ভয়ঙ্কর চোখটা যেন রাগে জ্বলছিল। অদ্ভুত ব্যাপার।

সাহস দিয়ে বললাম, "বোধ হয় জোর বাতাসে উলটে গেছে।"

মুখে বললেও মনে-মনে জানি অত বড় আর ভারী কাপ ঝড়েও ওলটাবে না।

"কী করা যায় বলো তো?

বললাম,"একবার আমার সামনে চালো তো। দেখি।"

পশুপতি বোধ হয় এইটেই চাইছিল।

"জানি না আর কারও সামনে আত্মা আসবে কি না। তবু দেখি।"

বলে কাপটা ছোট বৃত্তের ওপর ঠিক করে বসিয়ে ডান হাতের তর্জনীটা ছোঁয়াল।

অবাক কাণ্ড! আঙুল ছোঁয়ানো মাত্র কাপটা বৃত্তের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে লাগল।

পশুপতি বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, "জিজ্ঞেস করো আপনি কে এসেছেন?"

এটা যে জিজ্ঞেস করতে হয়, পশুপতি এতই নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, সেটুকুও ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু ও জিজ্ঞেস করার আগেই কাপটা যেন ওর হাতসুদ্ধ টেনে নিয়ে প্রথমে 'I' অক্ষর ছুঁয়ে চলে গেল 'K' অক্ষরের কাছে; সেখান থেকে ফের 'I' অক্ষরের কাছে; সেখান থেকে মেঝেতে খসখস শব্দ করে প্রথমে 'L' —ফের 'L' —তারপর 'Y' —

গ্রামারের সামান্য ভুল থাকলেও অশরীরীর বক্তব্যটা বুঝতে পশুপতির বাকি থাকেনি। ভয়ে কাপ ছেড়ে দিয়ে ও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাপটাও অমনই আপনাআপনি কাত হয়ে পড়ে রইল।

"স্বচক্ষেই তো দেখলে ভাই। এখন কী করি? কে এসে শাসিয়ে গেল তাও বুঝতে পাবলাম না।"

বললাম , "তখনই বলেছিলাম ওটা সাধুর জিনিস। ওভাবে ওটা আনা ঠিক হয়নি। যাই হোক আমি ব্যবস্থা করছি।"

বলে পশুপতির উত্তরের অপেক্ষা না করে কাপটা কাগজে মুড়ে খিড়কি দরজা খুলে বাড়ির পেছনের ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলাম।

পশুপতি আর্তনাদ করে উঠল, "ইস, ওইভাবে ওটা ফেলে দিলে! ওটা যে মন্ত্রঃ পূত..."

"নিকুচি করেছে তোমাব মন্ত্রের। ওটা থাকলে তুমি আবার ওটা নিয়ে বসবে। আর ভয়ে হার্টফেল করে মরবে।" মরার কথা শুনে পশুপতি বুঝি একটু শান্ত হল।

সে-রাত্রে অবশ্য পশুপতির কাছেই আমায় থাকতে হয়েছিল। দু'জনেরই ভাল ঘুম

হয়েছিল। মাঝরাতে শুধু একবার ব্যাঘাত হয়েছিল। হঠাৎ পশুপতি আমায় ধাক্কা দিয়ে চাপা আতঙ্কে বলেছিল, "খিড়কির দরজা কে ঠেলছে।"

"ঠেলুক।" বলে পাশ ফিরে শুয়েছিলাম। তারপর এক ঘুমে রাত শেষ।

ক্যালেণ্ডারে চোখ পড়তেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। আজ অমাবস্যা। পশুপতি আজ আবার সেই কাপটা নিয়ে চালতে বসবে না তো?

কাপটা অবশ্য আমি ফেলে দিয়ে এসেছি। কিন্তু সেটা কুড়িয়ে আনতে কতক্ষণ। এসব কাজে আবার সর্বনেশে আকর্ষণ থাকে। সে আকর্ষণ দুর্বল প্রকৃতির মানুষ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না।

যাইহোক, একবার খোঁজ নিয়ে আসতে দোষ কী?

এই মনে করে তখনই বেরিয়ে পড়লাম।

রাত তখন এগারোটা। ওদের পাড়াটা নিঃঝুম। শুধু গলির মুখে রাস্তার আলোটা যেন ভয়ে-ভয়ে কোনওরকমে তার কর্তব্য করে যাচ্ছে।

ওর বাড়ির সামনে এসে জানালার দিকে তাকাতেই দেখলাম, ঘরে হালকা আলো জ্বলছে। তা হলে পশুপতি আজও বসেছে।

দরজায় শব্দ করতে যেতেইদেখি দরজা খোলা। অবাক হলাম। দরজা খোলা কেন? এই বাড়িটার দোতলাতেও লোক আছে। কিন্তু দরজা বন্ধ করার দায়িত্ব পশুপতির।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। দোতলার সিঁড়ির মুখ অন্ধকার। পাশেই পশুপতির ঘর।

"এ কী! এ দরজাটাও খোলা।"

দরজা খুলে রেখেই পশুপতি কি কোথাও গেছে? আবার কি ও ভয় পেয়েছে?

ঘরে ঢুকে থমকে গেলাম। দেখি মাটিতে সেইভাবেই খড়ি পাতা। আর খালি গায়ে পশুপতি মেঝেতে পড়ে আছে। মুখটা বীভৎস।

তখনই দোতলার ভাড়াটেদের সাহায্যে পশুপতিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সারারাত যমে-মানুষে টানাটানি করে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ভরসা দিলেন, "ভয় নেই।"

যাক, অন্তত আমার সৌভাগ্য, ঠিক সময়ে আসতে পেরেছিলাম বলেই বন্ধুকে বাঁচাতে পেরেছি। ডাক্তারের মতে হাই ব্লাডপ্রেশারের জন্যই এইরকম হয়েছে।

কিন্তু সুস্থ হয়ে পশুপতি যা বলেছিল তা অন্য কথা।

সাধুজির ওই কাপটার ওপর লোভ সে সামলে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া মন্ত্রঃপূত কাপটা পড়ে থাকবে আঁস্তাকুড়ে! এ যে মহাপাপ! তাই সে কাপটা কুড়িয়ে এনেছিল। তারপর আজ অমাবস্যা বলেই কাপটা নিয়ে বসেছিল।

বসামাত্র কাপটা প্রচণ্ড জোরে নড়ে উঠেছিল। এত জোরে যে, পশুপতির হাত পর্যন্ত কাঁপছিল। কে এসেছেন—এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সেই একই কথা জানিয়ে দিল, "I KILL YOU"

তারপর কাপটা আঙ্গুলটা ঠেলে সরিয়ে মেঝেতে একটা বিদঘুটে শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল তার কাছে। সে উঠে দাঁড়াবার আগেই কাপটা তার পা বেয়ে উঠে পড়ল। একটা শুধু ঠাণ্ডা হিমশীতল স্পর্শ..... তারপর...... তারপর আর কিছু মনে নেই।

যাক, পশুপতি এ-যাত্রায় বেঁচে গেল। কিন্তু কাপটা?

কাপটা অদৃশ্য। সেটা যে কোথায় গেল, জানতে পারা যায়নি।

তারপর অনেকদিন পর্যন্ত দুটি দুর্ঘটনা আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল। সাধুজির মৃত্যু আর পশুপতির মৃত্যুর মুখ থেকে কোনওরকমে ফিরে আসা—এ-দুটি ঘটনার পেছনে কোন অদৃশ্য শক্তির হাত? দুই অপরাধীকে কি শাস্তি দিয়ে গেল কাপটার দুই সময়ের দুই অধিকারী? পশুপতির অপরাধ তুলনামূলকভাবে কম বলেই কি ও শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল?

এসব প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি।

হারান স্যারের ভূত

অনীশ দেব

ঠিক সক্কালবেলাতেই বিশ্বকাকু হই-হই করে এসে বাড়িতে ঢুকলেন। চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, "বাবান মৌ! শিগ্‌গির আয়! কোথায় গেলি তোরা সব? বউদি! শুনে যাও শিগ্‌গির। জবর খবর আছে তোমাদের জন্যে।"

আমি সবে বই নিয়ে পড়তে বসেছি। আর মৌ যখন হাত-মুখ ধুয়ে আয়নায় মুখ দেখছে। বিশ্বকাকুব চিৎকারে দু'জনই একছুটে দরজায় গিয়ে হাজির।

বিশ্বকাকু আমাদের দেখেই চোখ গোল-গোল করে বললেন, "জানিস, আজ ইস্টিশানের রাস্তায় হারান মাস্টার সুইসাইড করেছে?"

শুনে তো আমরা দু'জনেই অবাক।

কাকু দু'হাতে আমাদের কাঁধ খামচে ধরে বললে, "চ, ঘরে চ। তোদের মা কই?"

সুতরাং আমি আর মৌ চিৎকারে গলা ফাটিয়ে মাকে ডাকতে শুরু করলাম। বাবা বাজারে গেছেন সেইজন্যেই আমরা এতটা গলা চড়াতে পারছি। নইলে বকুনি বাঁধা ছিল।

বিশ্বকাকু গায়ের চাদরটা জম্পেশ করে গায়ে জড়িয়ে বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন। চেঁচিয়ে হাঁক পাড়লেন, "বউদি, জলদি এসো। সঙ্গে এক কাপ গরম চা। ভয়ে আমার শরীর কাঁটা দিচ্ছে। তার ওপর এই বাঘের সর্দি ধরা ঠাণ্ডা।"

হারান মাস্টার মশাইকে আমরা সবাই চিনি। অবশ্য এই আধা-শহুরে জায়গায় প্রায় সব্বাই সব্বাইকে চেনে। হারান মাস্টারমশাই আমাদের জেলা হাইস্কুলে পড়ান। মানে পড়াতেন। রোগা প্যাঁকাটির মতো চেহারা। গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে তেলচিটে চাদর। নাকে চশমা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। তিনকুলে তাঁর কেউ ছিল না। তবে তাঁর ছিল পড়ানোর খুব শখ। পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন। এ অঞ্চলে হারান মাস্টারের কোচিং ক্লাস যাকে বলে বিখ্যাত। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, আমি সেই কোচিংয়ে রোজ সন্ধ্যাবেলা পড়তে যাই। ক্লাস ফাইভে উঠলে মৌকেও ওখানে ভর্তি করা হতো। অন্তত মা-বাবা সেইরকমই ঠিক করে রেখেছিলেন।

বিশ্বকাকু আমার বাবার পিসতুতো ভাই। লোকে বলে ওর নাকি অনেক অভিজ্ঞতা। অন্তত পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ রকম ব্যবসা করেছেন। দু'হাজার নশো তিয়াত্তরটা ইংরিজি বই পড়েছেন। আর হায়ার সেকেণ্ডারিতে ছ' ছ'বার ফেল করেছেন। এককালে খুব ব্যায়াম করাতেন, কিন্তু সে অনুপাতে চেহারা ফেরেনি। বাবা একদিন জিগ্যেস করেছিলেন, "হ্যাঁরে বিশু, এত যে একসারসাইজ করলি, তা তোর চেহারা ফেরে না কেন?"

উত্তরে বিশ্বকাকু হাতের গুলি ফোলানোর চেষ্টা করে বলেছিলেন, "দাদা, শুধু মাংসপেশী ফোলালেই কি চেহারা ভালো হয়? আমার ব্যায়ামের এমনই কায়দা যে, শুধু হাড়গুলো মজবুত হবে। বাইরে থেকে দেখে কিছুটি বোঝা যাবে না। তবেই না হল গিয়ে রিয়েল একসাইজ—"

বাবা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, 'এক্সাইজ নয় বিশু, এক্সারসাইজ।'

বিশ্বকাকু গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঐ একই হল। হনলুলুর লোকেরা সংক্ষেপে এক্সাইজ বলে। আমি যেবার হনলুলু গিয়েছিলাম—"

"থাক। তুমি এখন কাজে যাও।"

বিশ্বকাকু জানতেন, বাবা রেগে গেলে আর 'তুই' বলেন না, বলেন, 'তুমি'। সুতরাং চুপচাপ কেটে পড়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

"হারান মাস্টারমশাই কীভাবে আত্মহত্যা করল, কাকু?" আমি প্রথম সুযোগ পেয়েই প্রশ্ন করলাম।

"গলায় চাদর দিয়ে সটান ঝুলে পড়েছে দেবদারু গাছের ডাল থেকে।" চোখ উলটে জিভ বার করে মরে যাবার অভিনয় করলেন বিশ্বকাকু।

মৌ চেঁচিয়ে উঠল, "মা, কাকু ভয় দেখাচ্ছে।"

মা ইতিমধ্যে গরম চায়ের কাপ নিয়ে হাজির।

"কী ছোড়দা, যা বলছ সব সত্যি নাকি?" মা বিশ্বকাকুকে 'ছোড়দা' বলে ডাকেন।

"বউদি, সত্যি আর কাকে বলে! কী যে দুঃখ ছিল হারানমাস্টারের মনে, তা কে জানে!" চায়ের কাপ নিয়ে আরাম করে চুমুক দিলেন কাকু ঃ "জানো তো, ইস্টিশানের পথটা কীরকম অন্ধকার! দু-পাশে সারি সারি ঝাঁকড়া গাছ। তার ওপর এবড়ো-খেবড়ো মাটির পথ। এমনিতেই রাত্তিরে ও -রাস্তা দিয়ে হাঁটা মুশকিল, তার ওপর এখন বোঝো। হারান মাস্টার নির্ঘাত ভূত হয়ে ও-পথে পায়চারি করবে, আর কোচিং ক্লাসের জন্যে ছাত্র-ছাত্রী খুঁজে বেড়াবে। বলবে, আঁই, আঁমার কোঁচিংয়ে ভঁর্তি হঁবি?"

মৌ আবার নাকী সুরে বলে উঠল, "মা, আবার ভয় দেখাচ্ছে—" বলে সোজা মায়ের শাড়ির ভাঁজে ঢুকে পড়তে চাইল।

বিশ্বকাকু দু-চার চুমুকে চায়ের কাপ খালি করে বললেন, "বউদি, তোমার মেয়েটা রামভীতু। আমার নাম ডোবাবে। তবে এই বাবানটা—" আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন বিশ্বকাকু ঃ "এ দারুণ সাহসী। বড় হয়ে ঠিক আমারই মতো দুর্দম, দুর্জয় অপরাজেয়, অ প্রতিরোধ্য আর অসমসাহসী বীর হবে। তুমি দেখে নিয়ো।"

বিশ্বকাকুর কথায় আমার বুকটা একটু যে ফুলে উঠল না তা নয়। কিন্তু আবার ভয়ও করতে লাগল। কারণ, আজ সন্ধ্যেবেলাতেই কোচিংয়ে যাবার কথা। বিশেষ করে হারান স্যার যখন মারা গেছেন তখন তো আরও যাওয়া উচিত। অন্তত খোঁজখবরটা তো নিতে হয়। কিন্তু যেতে হবে ওই বিপজ্জনক পথ দিয়েই। মনে মনে ঠিক করলাম, কাকুর মতো বীর হয়ে আমার কাজ নেই। ইস্কুলে না গিয়ে বিকেল-বিকেল বরং কোচিংয়ে যাব। সুসান, বিলু আর মৃণালের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে একসঙ্গে দল বেঁধে বাড়ি ফিরব। কিন্তু হারাণ স্যার তো ভালো লোক ছিলেন। তিনি কি মরে ভূত হবেন!

কথাটা বিশ্বকাকুকে জিগ্যেস করতেই তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "'আরে বোকা, মরে গেলেই কি তাঁর এতদিনের একটা অভ্যেস চলে যাবে? ছাত্র ঠেঙানো ভুলে যাবে একেবারে, যাক বউদি, আমি চলি। সকালেই খবরটা পেলুম, তাই ভাবলুম দিয়ে যাই। বাবানের সাহসটাও একবার পরীক্ষা হয়ে যাবে। আমি তো ইচ্ছে করেই ওই কাঁচা রাস্তা ধরে আজ থেকে দিনে সতেরোবার করে যাতায়াত করব। হারান মাস্টার আমাকে অনেকবার কান মুলে দিয়েছিল, তার শোধ নেব।"

এ কথা বলেই বিশ্বকাকু সঙ্গে সঙ্গে পগারপার। যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনই হঠাৎ চলে গেলেন।

মা সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বাবান, আজ সন্ধ্যেবেলা তোর কোচিংয়ে গিয়ে কাজ নেই।"

মৌ শাড়িব আড়াল থেকে উঁকি মেরে বলল, "যাক না, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ধরে মটাস্।"

আমি কোনও প্রতিবাদ করার আগেই বাবা বাজার থেকে ফিরলেন। বাজারের থলে দুটো মায়ের হাতে তুলে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "শুনেছ, হাই ইস্কুলের হারানবাবু আত্মহত্যা করেছেন?"

মা ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, শুনেছেন।

সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু আকাশের দিকে তাকালে মিটিমিটি তারা চোখে পড়ে। তাও আবার মাঝে-মাঝে ঢেকে যাচ্ছে ঝাঁকড়া-মাথা গাছের উশকো-খুশকো চুলের আড়ালে। ঝিঁঝি পোকা কোথায় যেন একটানা ডেকে চলেছে। সব মিলিয়ে রোজকার চেনা রাস্তাটা যেন অচেনা লাগছে। মনে সাহস জোগানোর চেষ্টা করলাম। ভাবতে লাগলাম বিশ্বকাকুর দুর্জয় সাহসের কথা— অন্তত তাব মুখে যেরকম শুনেছি। কিন্তু তাতেও ভরসা কই। তাছাড়া এ তো সবে সেই ভয়ঙ্কর কাঁচা বাস্তার শুরু।

টিপটিপে বুকে আস্তে আস্তে এগোলাম। দু-পাশে সারি-সারি বিশাল গাছ। বট-অশ্বত্থ-দেবদারু-জাম আবও কত কী! এ-রাস্তা দিয়ে কত যাওয়া-আসা করেছি, কিন্তু ভয় কখনও পাইনি। এখন শুধু হারান স্যাবের কথা মনে পড়ছে। কীভাবে তিনি চলতেন, কীভাবে হাসতেন, কীভাবে কথা বলতেন—সব।

আজ কোচিংয়ে গিয়ে কোনও লাভই হযনি, উলটে বিপদে পড়েছি। সুসান, মৃণাল, ওরা কেউ আসেনি। ভূতের ভয়ে কি না কে জানে! ফলে আমি একেবারে একা পড়ে গেছি। মাস্টাবমশাযের ভাইয়ের সঙ্গে কথায়-কথায় কখন যে শীতের বেলা পড়ে গেছে টেরই পাইনি। বাড়ি ফেরার সময় উনি একবাব জিগ্যেস করেছিলেন, এগিয়ে দিতে হবে কি না। আমি লজ্জায় বাবণ করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এগিয়ে দিলেই ছিল ভালো!

হঠাৎই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। বেশ ব্যথা লাগলেও চটপট উঠে হাত-পায়ের ধূলো ঝেড়ে নিলাম। কোন দিকে চলেছি সেটাই কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোথাও একটা শেয়াল ডেকে উঠল। হুক্কা-হুয়া—। ব্যস্, আমার তো হাত-পায়ে কাঁপুনি ধরে আর কি। শুনেছি অনেকে জোরে জোরে গান গেয়ে ভূতের ভয় তাড়ায়। কেউ বা রাম নাম করে। আমি তো গান বলতে শুধু 'জনগনমনঅধি—' ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর রাম-নাম? 'রাম-রাম' বলতে যদি 'মরা-মরা' হয়ে যায়? তাহলেই সর্বনাশ। হারান স্যার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুতুড়ে কোচিংয়ের প্রথম ছাত্রটি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, জোরে জোরে

চিৎকার করলে কেমন হয়? উঁহু, লোকে ভাববে আমি ভয় পেয়েছি। তার চেয়ে হো-হো করে অট্টহাসি হাসাই ভালো। তাতে ভয়টাও কেটে যাবে। আর যে শুনবে সে ভাববে আমি একটুও ভয় পাইনি।

এইসব নানান কথা ভাবছি, হঠাৎই কোথা থেকে ভেসে এল ডানা ঝাপটানোর ঝটপট শব্দ। তারপরই হুতুম প্যাঁচার কর্কশ চিৎকার। আর সব শেষে একদল শেয়ালের কান্না।

আর দেরি করলাম না। আলো-আঁধারির মধ্যে টেনে ছুট মারলাম। আর হা-হা-হি-হি-হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলাম। ওঃ, মনে যেন কিছুটা ভরসা পাচ্ছি। বই-খাতা নিয়ে কোনওরকমে ছুটে চলেছি, আর যত কষ্টই হোক না কেন হাসি থামাচ্ছি না। দু-পাশে ঘন কালো ছায়ার মতো গাছের গুঁড়িগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। কোনটা তার মধ্যে হারান স্যারের আস্তানা কে জানে। এখুনি হয়তো পেছন থেকে আমার হাফ-শার্টের কলার চেপে ধরে বলে উঠবেন, 'কী রেঁ, পাঁলাঁচ্ছিস কেঁন?'

ছুটতে ছুটতে বুকে আমার হাঁফ ধরে গেল। চিৎকারের চোটে গলা ব্যথা কবছে। এদিকে রাস্তাও প্রায় শেষ হয়ে আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ দেখি দূরে মাটির ওপরে একটা সাদা মূর্তি টান-টান হয়ে পড়ে আছে।

বুকটা আমার ছ্যাঁত করে উঠল। পারাবার পার হয়ে এসে শেষকালে—। হারান স্যার নয় তো! পুলিশ কি মৃতদেহটা রাস্তার ওপরেই ফেলে রেখে গেছে? কই, যাবাব পথে এ-বকম তো কিছু দেখিনি!

ততক্ষণে হাসি আমার বন্ধ হয়ে গেছে। চলার গতিও আপনা থেকেই কমে এসেছে। সাদা মূর্তিটা যেন নড়ছে! আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা লোক। চাদব মুড়ি দিযে পড়ে আছে। আর গোঁ গোঁ করে বিচিত্র শব্দ করে চলেছে। না, এ তো তাহলে ভূত নয। এ যে সত্যিকারের মানুষ!

"কে আপনি? কী হয়েছে?" ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্নটা করতেই চাদর মুড়ি দেওয়া লোকটা উঠে বসল। চাদর সরিয়ে উঁকি মারতেই চিনতে পারলাম ঃ বিশ্বকাকু! চোখ যেন ঠেলে বেবিয়ে আসবে। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। আমাকে দেখে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, "বাবান রে, তুই আজ তোর এই কাকুটার লাইফ বাঁচালি! নইলে হারান মাস্টারের গোস্ট আমাকে দিয়েছিল শেষ করে!"

আমি এবার অনেকটা সাহস ফিরে পেয়েছি। বিশ্বকাকুর পাশে বসে পড়ে বললাম, "কী হয়েছিল, কাকু? ভয় পেয়েছ কেন?"

"আর বলিস কেন! সতেরোবাব টহল মারব বলে বার-বার এ রাস্তার এমাথা-ওমাথা করছি, ঠিক তেরোবারের মাথায় একটা রক্ত-হিম-করা অট্টহাসি কানে এল। আমি ভাবলুম

কে? মানুষ, না প্রেত? তারপরই আর সন্দেহ রইল না, এ হারান মাস্টারের অট্টহাসি। তুই বিশ্বাস করবি না বাবান, আমার মতো দুর্দম, দুর্জয়, অপরাজেয়, অসমসাহসীও এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আমি তোদের বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে! শুনতে পেলাম, প্রেতটা সেই হাড়-কাঁপানো অট্টহাসি হাসতে হাসতে আমাকে তাড়া করে আসছে। হা-হা-হি-হি-হো-হো! ওঃ আমার তো গায়ে কাঁটা দিয়েছে। দরদর করে এই শীতেও ঘামছি। তারপর ছুটতে ছুটতে এখানটায় এসে মুখ থুবড়ে পড়লাম। চাদর মুড়ি দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি, এমন সময় তুই এলি—"

বিশ্বকাকু এখনও বড় বড় শ্বাস নিয়ে হাঁফাচ্ছেন।

আমি বললাম, "কাকু, বাড়ি চলো। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।"

"চল্ চল্, তাই চল্।" বিশ্বকাকু কোনওরকমে বললেন, "তবে এ ঘটনার কথা কাউকে বলিস না রে। আমার প্রেস্টিজ আকুপাংচার হয়ে যাবে।"

আমরা দু'জনে বাড়ির পথে এগোলাম। আমার তো হাসি চাপতে গিয়ে পেট ফাটার জোগাড়।

কী করে বুঝব, অট্টহাসি হেসে নিজের ভয় তাড়াতে গিয়ে আমি একজন দুর্দম, দুর্জয়, অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য অসমসাহসী বীরপুরুষকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বসে আছি!
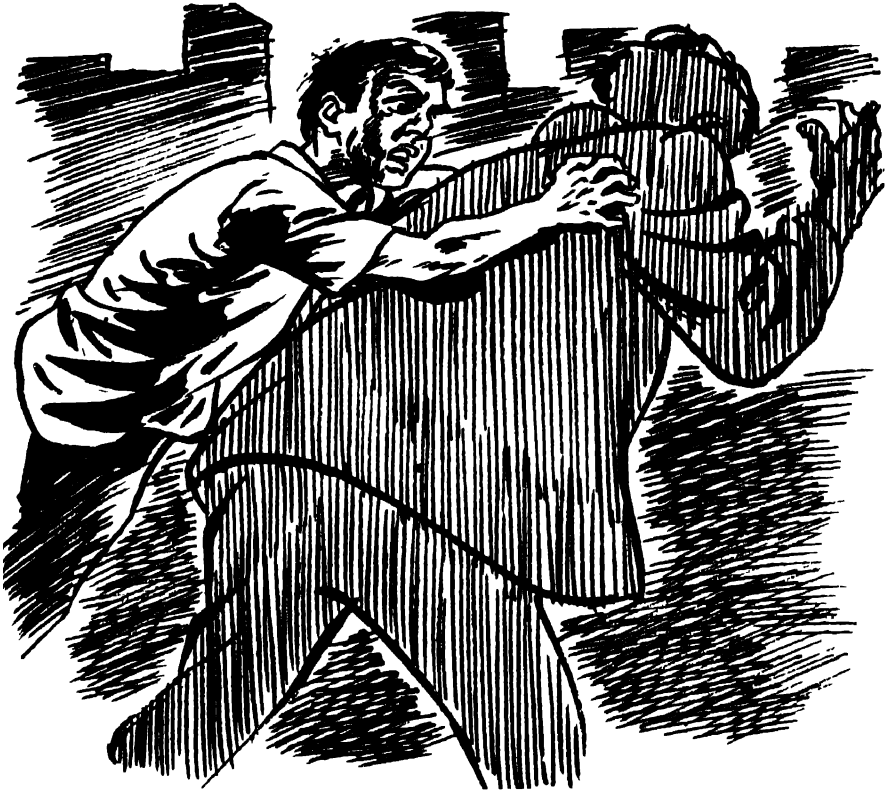
শয়তানের শেষ অভিযান

বরুণ দত্ত

প্রথমে ট্রেন, তারপরে বাস এবং অবশেষে নৌকোয় খেয়া পার হয়ে সুদেব যখন মামার বাড়ির গ্রামে পৌঁছুল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সুদেবের বয়স যদিও কৈশোরের সীমা পেরোয়নি, তবু তার মনে নানা যুক্তি-তর্ক-জিজ্ঞাসা। সব কিছু জানার ও বোঝার জন্য দারুণ কৌতূহল। এজন্য মামাবাড়িতে সুদেবের সমাদরও যথেষ্ট।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে বসল গল্পের আসর। তার অনেক আগেই চারদিক নিঃঝুম হয়ে পড়েছিল। কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব সেই গ্রাম্য রাতের অন্ধকারে।

দিদা, মামীমা, মামা—সকলের কাছে একই রকম বর্ণনা শুনে সুদেব ভাবতে থাকল ঘটনাটা কি হতে পারে! ভূত বলে তো আর সত্যি সত্যি কিছু নেই, তাছাড়া 'নিশি', 'অতৃপ্ত

আত্মা' এসব প্রচলিত কথাগুলোও যুক্তি-তর্কে টেঁকে না। কিন্তু যা ঘটে চলেছে, তাকেও অস্বীকার করা যাচ্ছে না সম্পূর্ণভাবে। বিশেষ করে বিভিন্ন রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে করতে মেজমামা থেকে বড়মামার বড় ছেলে দীপনদাদা পর্যন্ত সকলের চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল ভয় এবং অসহায়তা।

সুদেব ছাদের চিলেকোঠায় একা শুতে চাইলে ওঁদের সবার চোখ কপালে উঠল। একযোগে সবাই বললেন, 'না। তা হবে না। দস্যি ছেলে, তুমি কালই ফিরে যাও কলকাতায়। নাহলে কি হতে কি ঘটিয়ে বসবে!'

সুদেব অবাধ্য হতে পারল না বড়দের কথার। শুতে হলো দীপনদাদার সঙ্গে একই বিছানায়, দোতলার ঘরে। কথা বলতে বলতে দীপনদাদা একসময়ে হারিয়ে গেল ঘুমের দেশে। সুদেবের কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। পুরনো আমলের বিশাল দেওয়াল ঘড়িতে একটা শব্দ হলো ঢং করে। সুদেব ঘড়ি দেখল টর্চ জ্বেলে—সাড়ে বারোটা। পাশ ফিরে শুল, ঘুম আসছে এবার। সারাদিন ধকলটা কম যায়নি শরীরের উপর দিয়ে।

সবেমাত্র দু চোখের পাতা এক করেছিল সুদেব, ঠিক তখনই শুনতে পেল সেই শব্দ—শক্ত মাটিতে খরম পায়ে কেউ যেন হেঁটে চলেছে। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিচ্ছিল সেই শব্দ।

গ্রামের আরাধ্য দেবতা বাবা পঞ্চাননের মন্দিরের দিক থেকে শব্দটা উঠে ক্রমশ স্পষ্ট ও কাছাকাছি হতে হতে একসময় আবার পুবদিকে শেষ সীমা খেয়াঘাটের দিকে চলে গেল। ক্রমে মিলিয়েও গেল। এর পরে অন্তত এক ঘন্টা জেগে থেকেও আর কোনো শব্দ পেল না সুদেব। নানা চিন্তা ভিড় করে আসছিল ওর মাথায়।

পরদিন বেশ দেরিই হলো ঘুম ভাঙতে। দিদা জানতে চাইলেন, 'শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো ভাই?"

সুদেব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, দিদা। এমনিই একটু দেরি করে উঠলাম। কলকাতায় স্কুলের জন্যতো রোজই তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। এখানে এসে তাই একটু আরাম কবে নিচ্ছি।'

'তা হ্যাঁরে, কাল রাতে তোরা দুটিতে তো অনেকক্ষণ গল্প করিছিলি, কোনো শব্দ-টব্দ শুনিসনি?'

'না তো দিদা!' চটপট উত্তর দিল সুদেব। উদ্দেশ্য দিদাকে সত্যি কথা বলবে না। কিন্তু যেভাবেই হোক আজ রাতে ওকে ছাদে থাকতেই হবে। বৃথা সময় নষ্ট করা চলে না। ঐ একটা অজানা শব্দ গ্রামের সকলকে ভয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে।

দিদা ওর মনের কথা টের পান না। তাই বললেন, 'কিন্তু ভাই, আমরা তো শুনেছি!'

'ও বোধহয় হাওয়ায় বাঁশবনে গাছে গাছে ঘষটানির শব্দ।' ব্যাপারটা চাপা দিতে চায় সুদেব। কিন্তু দিদার মুখের দিকে চেয়ে বুঝল যে দিদা ওর উত্তরে খুশিও হননি, বিশ্বাসও করেননি।

সেদিনই দিদার অলক্ষ্যে ছাদের দরজার চাবিটি হস্তগত করল সুদেব। এবং মনে মনে তৈরী হয়ে থাকল সেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। দীপনদাদা ঘুমিয়ে পড়তেই খুব সাবধানে মশারি সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে ছাদে উঠে এল। তালা খোলার সময় একটু ভয় ভয় করছিল, পাছে শব্দ হয়! না, দারুণ সাক্‌সেসফুল হয়েছে সুদেব প্রথম চেষ্টাতেই। নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজাটা।

ছাদের উপরে পা ফেলতে থাকল আরও সাবধানে। আকাশে একফালি চাঁদ, হালকা বেশ মিষ্টি বাতাস মধ্যরাতের পরিবেশকে মায়াময় করে তুলেছে। ছাদের কোনদিকই তেমনভাবে পরিষ্কার নয়—জামরুল, সবেদা, আম, বেল, কাঁঠাল গাছের জটলা সব দিকেই। তবু তার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে তুলল সুদেব পঞ্চাননতলার দিকে।

অধীর প্রতীক্ষা। কলকাতার মতো মশার উপদ্রব নেই, তাই রক্ষে, নাহলে এতক্ষণে তাব প্লানই ভেস্তে যেত।

কালকের মতো ঠিক একটা ঘন্টা বাজল দোতলার ঘড়িতে, এটা রাত একটার শব্দ। সচকিত হলো, উৎকর্ণ হলো সুদেব। টেব পেল ভেতরে ভেতরে সে নিজেই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে!

অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, গাছগাছালির আঁকাবাঁকা ছায়ায় দেখল একজন দীর্ঘদেহ মানুষ পঞ্চাননতলার পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রথমে যেন একটু থমকে দাঁড়াল। শব্দটাও তখন নেই। থমকে থেমে কিছু বুঝি যাচাই কবেদেখছিল সেই ছায়ামূর্তি। তারপর হেঁটে চলল খেয়াঘাটের পথের দিকে। অমনি আওয়াজ উঠল খট্...খট...খট।

সুদেব নিজের চোখকে সইয়ে নেবার আগে পর্যন্ত ভেবেছিল ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় গাছগাছালির ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠছে, তা থেকেই একটি মনুষ্যদেহের আকার নিচ্ছে। এই আলো-আঁধারিতে কত মানুষ তো ভয় পেয়েছে, ভূত দেখেছে! সে যাই হোক, সুদেব নিজের চোখ-কানের উপর নির্ভর করে ছাদের রেনপাইপ বেয়ে তরতর করে নামল বেশ ঝুঁকি নিয়ে। তারপর যতদুর সম্ভব দ্রুতপায়ে খুব সাবধানে এগোতে লাগল শব্দের পিছুপিছু। শব্দটা কিন্তু মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে হচ্ছে! শব্দ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শব্দের উৎস কি তা ধরতে পারছে না, আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সব পথটা তো ইঁটবাঁধানো নয়, তবে কি করে অমন কঠিন শব্দ উঠছে!

হঠাৎ চমকে উঠল সুদেব। যাকে আবিষ্কার করে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল ও, সে গেল কোথায়? খেয়াঘাটে নৌকোটা তো বাঁধাই রয়েছে, জলও নিস্তরঙ্গ! তবে কি সুদেব যে তাকে এভাবে অনুসরণ করছে তা বুঝতে পেরে কোনো ঝোপঝাড়ে ঢুকে পড়ে ওকেই লক্ষ্য করছে!

গ্রামের মানুষরা, বিশেষ করে প্রাচীনরা, বড় বেশি দৈবনির্ভর, ভয়ই তাঁদের ভক্তির কারণ। আর তাই বিভিন্ন সময়ে এঁরা ঠকেনও কিছু লোভী মানুষের ছল-ছাতুরির কাছে।

আশাহত হয়ে সুদেব শেষ পর্যন্ত ফিরে এল বিছানায়—একই পথে, একই পদ্ধতিতে।

তখন তার শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে। তবু সে তার বিশ্বাসে দৃঢ় হলো—এ রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হবেই।

পরদিন আর একটু হলেই সুদেব ধরা পড়ে যাচ্ছিল দিদার কাছে। কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচল। না হলে দিদার জেরার মুখে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়তো সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ত। কারণ মিথ্যে কথায় অভ্যস্ত নয় সুদেব। প্রয়োজনে তাই নীরব থাকে তেমন হলে।

এই দেড়দিন সুদেব গ্রামের কারুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেনি, সে যে গ্রামে এসেছে তাই-ই বুঝতে দেয়নি। কিন্তু আজ সারাদিন যেন ব্যস্ত নেতার মতোই জনসংযোগ করল সাহসী কজন সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ঘুরল বনজঙ্গল, মন্দির, খেয়াঘাট, খেলার মাঠ, নদীর পাড়ের শ্মশান পর্যন্ত। সবাই দেখল সান্যালদের ডানপিঠে ভাগ্নে সুদেব গ্রাম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার বন্ধুদের সঙ্গে। এই বলছে ফিস্ট করবে, এই বলছে এবার গাজনে যাত্রা করবে, তার রিহার্সালের জায়গা কে দেবে বলো?

ছেলেটা বড় ভাল। তাই তার এসব হুজুগে কেউ কখনও বিরক্ত হয় না—বরং খুশিই হয়। শুধু কি তাই! এ বাড়িতে ডেকে চা-ওমলেট খাওয়ায় তো আর এক বাড়িতে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ। আর তাতে কোনো আপত্তি বা সংকোচ নেই সুদেবের। শুধু দিদার অনুমতিটুকু ছাড়া আর কোনো বাঁধা নেই তার।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হয়েছে, হয়েছে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রাও। সুতরাং বিকেল বিকেল খুশমেজাজে সুদেব আবার বেরিয়ে পড়ল গ্রাম পরিক্রমায়। খুঁজে খুঁজে দেখল খড়মের দাগ কোথাও কোথাও আঁকা আছে মাটির বুকে।

পুরোহিত নাকি সবাইকে সাবধান করে বলেছেন, 'শব্দ শুনে কেউ বাইরে যাবে না। কিছু অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য দেখলেও চিৎকার করবে না। তাতে সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত হারাতে হতে পারে।'

পুরোহিত ঠাকুরের দীর্ঘ ঋজু চেহারা, চোখ দুটি বিশাল, নাক-মুখ কাটা কাটা, কেউ তাঁর মুখের দিকে সোজা তাকাতেই পারে না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কেউ তর্কে যেমন যাচ্ছে না, অবিশ্বাসও করছে না। তাই একটা ভয় এবং অজানা প্রশ্নে মানুষের মন রাতের দ্বিতীয় প্রহরের পর থেকেই ভারী হয়ে ওঠে।

ক্রমে মানুষের মন জিজ্ঞাসায় ভরে উঠতে থাকে। বাতাসে ছড়াতে থাকে কত না সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী। এই সময়েই সুদেব এসে জমিয়ে বসেছে তার মামাবাড়িতে। তার বাউণ্ডুলে স্বভাব আর দস্যিপনা নিয়ে দিদার তাই সারাক্ষণ চিন্তা।

সেদিন রাতে পূর্বব্যবস্থামতো চারিদিকে সতর্ক ও সাহসী প্রহরা চলছে খুবই সন্তর্পণে। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, তবু শোনা যাচ্ছে না সেই বিশেষ শব্দ। চাঁদের আলোছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছে না কোনো সাদা কাপড় পরিহিত দীর্ঘ দেহ।

প্রায় এক ঘন্টা পরে শোনা গেল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বিশেষ শব্দ। কিন্তু দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না কোনো ছায়ামূর্তি বা কিছুই।

পলকহীন সুদেবের দৃষ্টি, কান তার সজাগ, বুকে উৎকণ্ঠার ধুকপুক শব্দ। অধৈর্য হয়ে খুবই সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে থাকল সে। এতদিনের পরিকল্পনা, হিসেব-নিকেষ, আশা কি মিথ্যে হবে! তাহলে যে ভবিষ্যতে আর ওকে বিশ্বাস করবেন না শিবসুন্দর।

ভয় কিছুটা ছিল, যদি ছুরি মেরে দেয় বা চালিয়ে দেয় পিস্তল! কিন্তু উত্তেজনায় এসব কিছুই নিরস্ত করতে পারল না সুদেবকে। সামান্য শব্দেই সচকিত হয়ে দেখল কালো একটা ছায়া প্রায় পৌঁছে গেছে খেয়াঘাটে।

সুদেব দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যান্ত্রিকগতিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছায়ামূর্তির উপরে। জাপটে ধরল আলখাল্লায় ঢাকা গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোর এতদিনের আতঙ্কের জীবটিকে। এবং ঠোঁটে চেপে ধরা বাঁশিও বাজিয়ে দিল প্রাণপণ শক্তিতে।

সুদেবকে কাহিল করে প্রায় উঠে পড়েছিল রাতের অজানা অতিথিটি, কিন্তু ততক্ষণে চারিদিক থেকে জ্বলে উঠেছে ছ'সাতটা টর্চের জোরালো আলো। শুধু তাই নয়, সুদেবের পূর্বনির্দেশ মতো দুজন মূর্তির চোখের উপরে ধরে রাখল টর্চের তীব্র আলো। ফলে অজানা সেই অতিথির সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

প্রকাশ পেল সব কথা। গ্রামের পুরোহিতকে সকলে সন্দেহ করলেও তিনি প্রকৃত দোষী নন, প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র।

ক্রমে জানা গেল সেই আসল দোষী একজন পুরাতত্ত্ববীদ্, শিক্ষিত, জানে দেশি-বিদেশি অনেকগুলো ভাষা। কিন্তু পুবাতত্ত্ব সম্পদের চোরাই ব্যবসা তার বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার নেশাও পেশা হচ্ছে গ্রামে-গ্রামান্তরে , ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহরে, তীর্থে, ভগ্ন পরিত্যক্ত মন্দিরে ঘুরে বেড়ানো এবং সময় বুঝে সেখানকার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আত্মসাৎ করা। সহজ পথে না হলে বাঁকা পথে নিতেও সে পিছপা হতো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসে ডুবতে বাধ্য হলো এই গোষ্পদে! কোনোভাবেই কল্পনা করতে পাবেনি যে এই সুদূর গ্রামে সে মাত্র তিন-চারমাসের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে, তাও কাজ সম্পূর্ণ কবার আগে।

হিসেবমতো দেখা যাচ্ছে সুদেবের মামাবাড়ির গ্রামের এই মন্দিরটির বযস কমবেশি একশো ষাট বছর। পর পর তিন বছর গাজনের মেলায় দর্শক হয়ে এসে ঐ বহিরাগত সব হিসেবই সংগ্রহ করে নিয়েছিল আগে। তারপর গ্রামের মানুষকে ভূতের ভয় দেখিয়ে কাবু করে তবেই হাত দিয়েছিল 'অপারেশনে'। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হলো না।

শহর থেকে এতদূরে, এমন শান্ত গ্রাম্য পরিবেশেও যে কোনো পুরাতাত্ত্বিক চোরের দৃষ্টি পড়তে পারে তা শুনে গ্রামের শিক্ষিত মানুষরাও প্রায় বোবা হয়ে রইলেন, বিস্ময়ের ঘোরে। কিন্তু শত জেরার মুখেও সে নিজের নাম 'শয়তান' ছাড়া আর কিছুই বলল না।

'শয়তান'-কে নিয়ে শিবসুন্দর তাঁর দলবলকে রওনা করে দিয়েছেন শহরের পথে। তারপর সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বিবৃত করলেন উপরের কাহিনী। পরে বললেন, 'এই সফলতা সম্ভব হয়েছে একটি কিশোরর অদম্য কৌতূহল ও অবিশ্বাস্য সাহসিকতায়। এই

কেসটি নিয়ে ঐ কিশোর মোট তিনটি কেসে সম্পূর্ণ সফল হলো। কিশোরটি কে, আশা করি তা আপনারা সকলেই অনুমান করতে পারছেন। এখনও সে ছাত্র। ছাত্র হিসেবেও সে দারুণ মেধাবী। ভবিষ্যতে সে আমাদের এই পেশায় আসতে আগ্রহী। পরিণত বয়সে সে যে একজন সফল ও বিখ্যাত গোয়েন্দা হবে, এ বিষয়ে আমরা একশো ভাগই নিশ্চিত।

'এই দেখুন শয়তানের হালকা সহজ যন্ত্রটি—যা দিয়ে এতদিন সে আপনাদের আতঙ্কিত করে রেখেছিল।' বলে শিবসুন্দর ছোট্ট দুটি যন্ত্র দেখালেন। সবাই সে ক্ষুদ্র যন্ত্র দেখে এবং তা থেকে সৃষ্ট শব্দ শুনে বিস্ময়ে হতবাক।

স্বনামধন্য গোয়েন্দা শিবসুন্দর এবার সেই সব কিশোর-যুবকদের সঙ্গে সহাস্য করমর্দন কবলেন যারা সুদেবের এই সফলতার সঙ্গী হয়েছিল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সব শেষে হাত বাড়িয়ে দিলেন সুদেবের দিকে। চোখে-মুখে তখন তাঁর প্রশংসা ও প্রশ্রয়ের হাসি। তারপর বিদায় নেবার আগে বলে গেলেন, এই মন্দিরের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা তিনি করবেন, এবং অনতিবিলম্বেই।

এক বিশাল জনতা খেয়াঘাট পর্যন্ত এসে শিবসুন্দরকে আন্তরিক ও সশ্রদ্ধভাবে বিদায় জানাল। সুদেব ও শিবসুন্দরের চোখে চোখে কথা হলো। সুদেব সকলের কান বাঁচিয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে বলল, 'কলকাতায় ফিরেই আমি আপনার কাছে যাব পরবর্তী নির্দেশের জন্য।'

মুশকিল-আসান

বসন্ত ভট্টাচার্য

ট্রেনটা আজ দারুণ লেট করেছে! বোম্বে থেকে দুপুর-দুপুর আসার কথা। আব এল কিনা রাত বারোটার পর। কোথায় যেন লাইন অবরোধ চলছিল।

বিকেল পর্যন্ত খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল পলাশ। চার বছর বাদে কলকাতা ফেরার সুযোগ পেয়েছে ছোট মাসির বিয়ে উপলক্ষে। নয়তো এ অসময়ে কোনোভাবেই তার কলকাতা আসা হতো না। বাবার ওখানে পোস্টিং, সে একা কী করে আসবে! আচমকা যেমন কলকাতা ছেড়ে বাবার সঙ্গে বোম্বে চলে যেতে হয়েছিল, আবার তেমনি আচমকাই কলকাতা আসার সুযোগ পেল সে।

ভেবেছিল বিকেলেই বেরিয়ে পড়বে পুরোনো পাড়ায়। মীর্জাপুর স্ট্রিটের সেই ওদের পুরোনো বাড়িটা যেখানে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই ছিল স্কুলবাড়িটা। বিদ্যুৎ, সমর আর প্রাণতোষরা সব আশাপাশেই থাকতো। অনেকেরই নিজেদের বাড়ি। অতএব গেলে ঠিক দেখা হয়েযেত।

কিন্তু ট্রেনের এই অস্বাভাবিক লেট করাটাই দারুণভাবেই হতাশ করে দিল পলাশকে। আজ আর কারো সঙ্গে দেখা হবে না তার। দেখা-সাক্ষাৎ হতে আরো অন্তত তিনটে দিন তো লাগবেই। কালই মাসির বিয়ে। একদিন বাদ দিয়ে বৌভাত। তাও আবার ধারেকাছে নয়। টালিগঞ্জ থেকে সেই উত্তরপাড়া।

একটু ঘুম ঘুম পেয়েছিল পলাশের কিন্তু বাবার ডাকে ঘুম চলে গেল তার। স্কুলের পরীক্ষা থাকায় মা আর মামার সঙ্গে আসতে পারেনি পলাশ। পরীক্ষা শেষ হতে তবেই বাবার সঙ্গে আসতে পেরেছে।

বাবা বললেন, এই পলাশ, এই দেখ, হাওড়া এসে গেছি। ওঠ, ওঠ। এখুনি নেমে ট্যাকসি ধরতে হবে।

ধড়ফড় করে উঠে পড়ে পলাশ। বাবাও তৈরী হয়ে নেন নামবার জন্যে। মালপত্র তেমন কিছু নেই, ছোট ছোট দুটো সুটকেস। একটাতে পলাশের জামা-প্যান্ট, অন্যটাতে বাবার সবকিছু।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাকসি স্ট্যাণ্ডে আসে ওরা। খাঁ- খাঁ করছে ট্যাকসি স্ট্যাণ্ড। একটাও ট্যাকসি নেই। দু'চারজন যারা ওদের সঙ্গে নেমেছিল, ট্যাকসি নেই দেখে কখন যে তারা সব উধাও হয়ে গেছে খেয়াল করেনি কেউ। এতক্ষণ হাওড়া ব্রীজটার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারেও তার চূড়ায় লাল বাতিটা দেখছিল পলাশ। ওদের ছাদের উপর দাঁড়ালে বেশ জ্বল-জ্বল করা লাল দুটো আলোই দেখতে পেত সে। কিন্তু এখন এতো কাছে থেকেও আলোটাকে আবছা লাগছে কেন! অনেক দূরে যেন অস্পষ্ট লাল ছোট্ট বিন্দু একটা!

পরমুহূর্তেই খেয়াল হয় পলাশের। ওর চোখের চশমা নেই! এবার সবটা মনে পড়ে পলাশের। ট্রেনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুমোবার আগে সীটের পাশে চশমাটা খুলে রেখেছিল। তারপর হাওড়া এসে পৌঁছুতেই বাবার ডাকে ব্যস্ত ভাবে উঠে পড়তে হয়েছিল, আর সে জন্যই তাড়াতাড়ি চশমা তুলতে বেমালুম ভুলে গেছে পলাশ। বাবাও খেয়াল করেননি। একে তো অনেক রাত হয়ে গেছে, তারপর যেতে হবে মীর্জাপুরের বাড়িতে! ট্যাকসি পাওয়া না গেলে বেশ অসুবিধে হবে!

পলাশ ভাবছিল বাবাকে কী করে কথাটা বলবে! এমন বে-খেয়াল কখনো হয না তার। আর আজ তাই হয়ে গেল। ওর মনে আছে বোম্বে যাবার আগে বাবার বন্ধু বিখ্যাত চোখের ডাক্তার খাণ্ডেলওয়ালকাকুর ওখান থেকে চশমাটা করিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। ক্লাসে ব্লাকবোর্ড দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। কথাটা সে বলেও ছিল বাবা-মাকে। কিন্তু প্রথম দিকে অতটা গুরুত্ব দেননি কেউ। বরং মা বলেছিলেন, রাতদিন টি. ভির পর্দায় মুখ লাগিয়ে থাক—

কথা শেষ করতে দেয়নি পলাশ। বলেছে, না মা, বিশ্বাস করো, ক্লাসে ব্লাকবোর্ডে কিচ্ছু দেখতে পাই না। স্যারেরা চোখ দেখাতে বলেছেন।

তারপরই বউবাজারের বিখ্যাত চোখের ডাক্তার খাণ্ডেলওয়াল-এর কাছে পলাশকে

নিয়ে যান ওর বাবা। চোখ পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, এতদিন ছেলেটাকে দেখোনি কেন প্রদীপ? চোখটা যে ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে।

পলাশের মনে আছে একের পর এক ফাঁকা চশমার ফ্রেমে কাচ বসিয়ে ওর চোখ পরীক্ষা করেছিলেন ডাক্তারকাকু। আর প্রশ্ন করেছিলেন কোন ক্লাসে পড়ছ?

ক্লাস থ্রি। ছোট্ট জবাব দিয়েছিল পলাশ। ডাক্তারকাকু ছোট্ট একটা কাচের টুকরো ফাঁকা ফ্রেমের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, পড় তো সামনের দেয়ালের লেখাগুলো।

দেয়ালে ঝোলানো এলোমেলো ইংরেজি অক্ষরগুলো বড়ো থেকে ছোট সবই পরিষ্কার দেখতে পেয়ে পড়ে দিয়েছিল পলাশ।

খুশি হয়েছিলেন ডাক্তারকাকু। দু'দিন বাদে চশমাও পেয়েছিল সে।

সেই চশমাটাই আজ তাড়াহুড়োয় হারিয়ে ফেলল পলাশ।

ট্যাকসি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবছিল বাবাকে কীভাবে সে কথাটা বলবে? লোকজন খুব একটা নেই-ই। একটাও ট্যাকসি নেই, রিকসাও নেই। তাকিয়ে দেখল পলাশ, দূরে একটা কুকুর শুয়ে ছিল ফুটপাতে শুয়ে থাকা দুজন ভিখিরীর পাশে। ধীরে ধীরে উঠে ল্যাজ গুটিয়ে সেটা চলে গেল অন্যত্র।

এখন একেবারে সুনসান অবস্থা। বলতে গেলে পলাশ আর ওর বাবা ছাড়া হাওড়ার এ চত্বরটাতে আর কেউ নেই। ছেলেকে নিয়ে এখন তিনি কী যে করবেন, একথাই ভাবছিলেন। হঠাৎ তাকান পলাশের দিকে। প্রশ্ন করেন, তোর চশমা কোথায় রে?

এবার প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়ে পলাশ, ভুল করে ট্রেনে ফেলে এসেছি বাবা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো—

আর কিছু বলেন না বাবা। ছেলেটাকে আর কী দোষ দেবেন! এতো ঘন্টা ট্রেন লেটে নিজেই একেবারে বিরক্তির শেষ সীমায়। ছেলের তো ভুল হতেই পারে!

দুজনে দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে এবার পলাশরা এগিয়ে আসে হাওড়া ব্রীজটার গোড়ায়। অনেক সময় এখান থেকে শাটল গাড়ি পাওয়া যায়।

কিন্তু না, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও কোন গাড়ির দেখা পেলেন না। ভা বনায় পড়ে গেলেন পলাশের বাবা। কী যে এখন করবেন ছেলেটাকে নিয়ে!

এ সময়ই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো।

সচকিত হয়ে উঠল পলাশ আর তার বাবা। তাকিয়ে দেখে ওদের কাছে ব্রীজের রাস্তার দিকের রেলিং ঘেঁষে একটা বেবি অস্টিন গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু বলার আগেই চালকের আসন থেকে মুখ বাড়ান একজন। বলেন, কী রে, কোথায় যাবি? এখানে যে!

এক মুহূর্ত থমকে থেকে সামলে নেন পলাশের বাবা। পরে আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়ে বলেন, আরে খাণ্ডেলওয়াল, তুই? তুই কোত্থেকে?

একটা পেশেন্ট খুব ট্রাবল দিচ্ছিল। তাকে দেখে ফিরছি।

ভালোই হলো। একেই বলে ভগবানের আশীর্বাদ, বলেন বাবা।

কেন রে, কী হলো? জানতে চান ডাক্তারকাকু। এতক্ষণে পলাশ চিনতে পেরেছে তার ডাক্তারকাকুকে। দারুণ খুশি হলো সে। কাকুর কাছ থেকে সে চশমাও করিয়ে নিতে পারবে! ওঁর কাছে তো সব লেখাই আছে!

ডাক্তারকাকু বলেন, তোরছেলে পলাশ না! বেশ বড়ো হয়েছে তো!

সে কথার সূত্র ধরে বাবা বলেন, হ্যাঁ দেখতেই বড়ো হয়েছে। বুদ্ধিতে সেই ছোটই রয়ে গেছে। দ্যাখ না, ট্রেনের কামরায় চশমাটা ফেলে এসেছে।

তাতে কী হয়েছে? আমি তো আছি। হেসেই জানান কাকু। তারপরেই যেন তাঁর খেয়াল হয়। কোথায় যাবি তোরা?

মীর্জাপুর স্ট্রিট। বাড়িতে যাবো।

তুই তো এখন বোম্বে থাকিস? প্রশ্ন করেন কাকু।

হ্যাঁ। জবাব দেন বাবা। তারপরই বলেন, তোর কাছে যেতে হবে, কিন্তু কবে যাই তাই ভাবছি। পলাশটার চশমা নাহলে যে একদণ্ড চলে না।

ডাক্তারকাকু বলেন, এখুনি চল, পলাশের চশমা করে দিচ্ছি।

এখন, মানে এতো রাতে চশমা করাবি? লোক আছে তোর? অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন রাখেন বাবা।

সে কথায় মুচকি হাসেন ডাক্তারকাকু। এজন্যেই তোদের সঙ্গে আমাদের এত তফাৎ। ডাক্তারের রাত-দিন বলে কিছু আছে নাকি? নে চল। উঠে আয় গাড়িতে।

কিন্তু বাড়ি যাবো যে!

সে হবেখন। চশমা দিয়ে বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে আসবো। হোলো তো? এবার উঠে আয় গাড়িতে। কথার শেষে ডাক্তারকাকুই ভেতর থেকে গাড়ির দরজার লক খুলে দিলেন। বললেন, তোরা পেছনে বোস।

ছোট গাড়ি। পলাশ আর তার বাবা পিছনের সীটে বসলো। গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। কাকু নিজেই চালাচ্ছেন। ঠিক করে বসার আগেই পলাশের মনে হলো হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে গেছে ওরা। ঠিক তাই। এটুকু ভাবতে ভাবতে দেখল গড়ের মাঠের মনুমেন্ট পার হয়ে ওদের গাড়ি ছুটে চলেছে পার্কস্ট্রীট ধরে। বোম্বে যাবার আগে পলাশ একবার ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে চাইনিজ খাবার খেতে এখানে এসেছিল। সে দোকানটাও নজরে পড়ল তার। হঠাৎ করে গাড়ি থেমে গেল। পলাশ দেখে উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা লোহার গেটের পাশে এসে থেমেছে কাকুর গাড়িটা। পরক্ষণেই লোহার গেট ডিঙিয়ে যেন কাছে এসে দাঁড়াল একটা সাহেবী পোশাক ঢাকা শরীর। কাকু বললেন, চলো অ্যান্টনি।

কাকুর পাশে বসলো সে। বাবা বললেন, অ্যান্টনি আমায় চিনতে পারেনি খাণ্ডেলওয়াল!

জবাবে ডাক্তারকাকু হাসলেন একটু। তারপরেই বললেন, নেমে এসো। এসো পলাশ, তোমার চশমাটা আগে করেনিই।

পলাশ তাকিয়ে দেখে বউবাজারের সেই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে থেমেছে গাড়িটা।

চার বছর আগে এখানকার চেম্বার থেকেই ওকে চশমা করিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সবাই। পুরো বাড়িটাতে বেশ একটা কর্মব্যস্ততা। চশমার দোকান, ডাক্তারখানা আরও কত কি! সবাই বেশ ব্যস্ত। আশ্চর্য! এতো রাতেও কাজ করে এরা!

সেই বড় হলঘরটাতে ওদের নিয়ে ঢোকেন ডাক্তারকাকু। অ্যান্টনী পট পট করে আই-টেস্ট রুমের আলোগুলো জ্বেলে দেয়। কাকু কাচের পর কাচ লাগিয়ে চোখ পরীক্ষা করেন পলাশের। অ্যান্টনি ওঁকে সাহায্য করছে।

চোখ দেখা শেষ করে প্রেস্‌ক্রিপশান লিখে দেন কাকু। সেটা হাতে নিয়ে অ্যান্টনি চলে যায় ভিতরে। পরক্ষণেই একটা চশমা নিয়ে এসে পলাশের হাতে তুলে দেয়, পরো তো খোকা।

চশমাটা পরে পলাশ। স্পষ্ট হয়ে ওঠে সব । জানালা দিয়ে দূরে দেখতে বলে কাকু প্রশ্ন করেন, হাওড়া ব্রীজটার আলো দেখতে পাচ্ছো? মনুমেন্টের মাথাটায় আলো দেখছো?

সেদিকে তাকিয়ে পলাশ বলে, হ্যাঁ কাকু, পাচ্ছি, সব পাচ্ছি।

খুশি হন কাকু। ঠিক আছে, আজ আর দেরি করাবো না। অ্যান্টনি তোদের পৌঁছে দেবে। ডোন্ট মাইন্ড! খুব ধকল গেছে আজ!

না-না, মনে করার কী আছে! বাবা বলেন। ওরা এসে গাড়িতে ওঠে। অ্যান্টনি গাড়ি চালাচ্ছে. বৌবাজার থেকে মীর্জাপুর স্ট্রিট, বড় জোর পাঁচ-সাত মিনিটের পথ! কিন্তু একি! গাড়ি যে ছুটেই চলেছে!

ওদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে অ্যান্টনি বলে, চাঁর বছর বাদে এলেন স্যার, কলকাতা কেমন পাল্টে গেছে দেখুন!

হুঁ দেখছি। কিন্তু, তুমি কোথায় যাচ্ছো এখন? বাড়ি চলো।

জবাবে হাসল অ্যান্টনি। এই তো স্যার আপনার হাউস। সত্যি তাই অ্যান্টনিটা কাজের আছে। গাড়ি থেকে নামে ওরা। অ্যান্টনি তার পকেটে হাত দিয়ে বলে, চশমার কেসটা রেখে দাও খোকা।

দারুণ সুন্দর আর মসৃন একটা চশমার ব্যাগ দেয় পলাশকে। সে বলে, আমার খুব পছন্দ হয়েছে অ্যান্টনিকাকা।

একটুখানি হাসে অ্যান্টনি। মাথার টুপিটাকে একটু নাড়িয়ে নিয়ে বলে, গুড নাইট। তাকায় পলাশ। দু'চার পলক মাত্র। এরই মধ্যে গাড়িটা যেন উধাও হয়ে গেল! সত্যি বড়ো বেশি স্পীডে গাড়ি চালায় অ্যান্টনি। বাড়ি পৌঁছনোর নাম করে নিমেষে দেখাল গড়ের মাঠ, খিদিরপুর ডক, টিভি টাওয়ার, এয়ারপোর্ট আর সবশেষে মীর্জাপুর স্ট্রিট!

বেল বাজান বাবা। একটু বাদেই জ্যেঠু বেরিয়ে আসেন, কখন তো হাওড়ায় এসেছিস! এতো টাইম লাগল কেন প্রদীপ? রাত চারটে বাজে!

চারটে! অবাক হন বাবা।

হ্যাঁ-হ্যাঁ। আগে ভতরে আয়, তারপর শুনবো সব। ইস্ জ্যেঠুটার আবার কতো কষ্ট

হয়েছে দ্যাখো। আদর করেন পলাশকে।

পলাশ বলে, চোখ দেখিয়ে চশমাও যে নিয়ে এলাম জ্যেঠু। তাই তো দেরি হলো। ডাক্তারকাকু ছিলো বলেই সব হলো জ্যেঠু। আমরাও বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

পলাশের কথা শুনে প্রশ্ন করেন জ্যেঠু, কোন ডাক্তার রে?

খাণ্ডেলওয়াল। বাবার জবাব। ওকেই হাওড়ায় পেলাম। অ্যান্টনিকে নিয়ে ও-ই পলাশের চশমা করে দিয়ে বাড়ি পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে দেয়।

জ্যেঠু পলাশকে বলেন, দেখি তোর চশমাটা। পলাশ খাপশুদ্ধ চশমাটা এগিয়ে দেয় জ্যেঠুকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উনি সব দেখতে দেখতে বলেন, খাণ্ডেলওয়ালটা চিরদিন লোকের উপকারই করে নিজে বেঘোরে মরল। সঙ্গে অ্যান্টনিটাও।

বাবা আর পলাশ কান খাড়া করে শোনে।

জ্যেঠু বলেন, বৌবাজার বোমা বিস্ফোরণে ওদের বাড়িটা একেবারে ধুলো হয়ে যায় রে। খাণ্ডেলওয়াল আর অ্যান্টনির ছিন্নভিন্ন লাশ দুটো পাওয়া যায় ওদেরই চেম্বারের মধ্যে। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। এতো মানুষ ওদের ভালবাসতো ভাবা যায় না! ওরাও সবাইকে ভালবাসতো! মানুষেরই উপকারই করতো! সে স্বভাব এখনো যায়নি দেখছি!

বাবা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। পলাশ তখন ভাবতে থাকে ডাক্তারকাকুর কথা। ওঁকে তো মানুষের মতনই দেখেছে সে। ভূত বলে তো মনে হয় নি!

অ্যান্টনিকাকাও তাই। কেমন করে তবে সব হলো?

চশমার খাপটা খুলে দেখে পলাশ। তাতে সেই পুরানো ট্রেনে হারিয়ে যাওয়া চশমাটাই আছে। খাপটা একেবারে নতুন। ছিল না বলেই অ্যান্টনিকাকা ওটা দিয়েছে বোধহয়!

মানুষ এক ছায়া দুই

চিরঞ্জীব সেন

সেই কবে, এখন থেকেই আড়াই হাজার বছর আগে অর্থাৎ যীশু খৃষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে খ্যাতনামা গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর 'হিস্টরিক' নামে গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কারাকোরাম মালভূমি অঞ্চলে একরকম 'পিপীলিকা' তাদের বাসা তৈরী করবার সময়ে মাটি খোঁড়বার সময়ে প্রচুর বালি বার করে, আর সেই বালির সঙ্গে মিশে থাকে প্রচুর গুঁড়ো সোনা। ঐ সব অঞ্চলের জঙ্গি উপজাতিরা মাটি খুঁড়ে সোনার বালি সংগ্রহ করে।

কিন্তু হেরোডোটাস একটু ভুল করেছিলেন। তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন কোনো পারসিক পুঁথি থেকে। তিনি লিখেছিলেন এই পিপীলিকা "শেয়ালের চেয়ে বড় কিন্তু কুকুরের চেয়ে ছোট"। পিপালিকা কখনই এত বড় হয় না। আসলে ওগুলি কাঠবেড়ালীর মতো এক প্রকার প্রাণী।

অধুনা ডঃ মাইকেল পাইসেল নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী হিমালয়ের ঐ অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে ঐ প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন ও তারা যে সোনার বালি আহরণ করে তাও তিনি দেখেছেন। অতএব হেরোডোটাসের ঐ তথ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হেরোডোটাসের কাহিনী পড়ে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এবং সুলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট স্বর্ণ আহরণকারী পিপীলিকার সন্ধানে অভিযান চালিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ডঃ মাইকেল পাইসেলের এই আবিষ্কারের খবর পেয়ে একজন ভারতীয় দুঃসাহসিক অভিযাত্রী স্থির করেছেন তিনি ভারত সীমান্তে লাহুল ও স্পিতির দুর্গম অঞ্চলে অভিযানে যাবেন। ঐ অঞ্চলে নাকি স্বর্ণ আহরণকারী ঐ প্রাণী দেখা যায়। ঐ অভিযাত্রী যার নাম নটরাজন। তিনি ভারত সরকারেব অনুমতি লাভ করেছেন।

যে কাহিনী লিখতে যাচ্ছি সেই কাহিনীর সঙ্গে এই অভিযান জড়িত তাই হেরোডোটাস ও ডঃ মাইকেল পাইসেলের নাম উল্লেখ করতে হল।

আমি একজন লেখক। কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছি। বই লিখে আমার ভালই আয় হয়। পৈত্রিক সম্পত্তি ও কিছু গচ্ছিত অর্থ আছে। বাবা ও মা কবেই গত হয়েছেন। আমি বিয়ে করার আগে পর্যন্ত আমার বোন ললিতা সংসার দেখাশোনা করত।

ললিতাকে সুন্দরী বলা যায়। শান্ত, কম কথা বলে, নিয়মনিষ্ঠ। কিন্তু বেচারী একটা গোপন ব্যথা লুকিয়ে রাখে। তাকে দেখলে আমার ও আমার স্ত্রীর কষ্ট হয়।

আমার বিয়ের পর ললিতা অনেকটা সহজ হয়েছিল। বৌদির সঙ্গে তার খুব ভাব। আমার ছেলেদুটিও ললিতাকে আন্টি বলতে অজ্ঞান। ললিতার ঔ গোপন ব্যথাটুকু ছাড়া আমাদের ছোট পরিবাব সুখী পরিবার।

বিজন আমার স্ত্রীর পিসতুতো ভাই। আমাব বিয়ের সময়ে বিজনের সঙ্গে ললিতার পরিচয় হয়।

বিজন ছেলেটা ভালো। স্বাস্থ্যবান, বিজ্ঞানে স্নাতক, হালে দার্জিলিং-এ মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে পর্বতারোহণে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে। তার আগে ও পরে হিমালয়ে ট্রেকিং করেছে।

বিজন একটা চাকরি করে তবে সে চাকরিতে সে সন্তুষ্ট নয়। সে এমন একটা চাকরি চায় যাতে তাকে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে হবে। কোনো অ্যাডভেঞ্চারের মুখোমুখি হতেও তার আপত্তি নেই।

একদিন রঞ্জন তাকে ঠাট্টা করে বলে, বিজু তুমি অ্যাডভেঞ্চার চাও ত আমি রেলইয়ার্ডে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ওয়াগন ব্রেকারদের সঙ্গে অনেক অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ পাবে। গুলি ছুট্‌বে দনাদন্ দনাদন্, বলে বিজনের মুখের সামনে দুই হাত বাড়িয়ে বন্দুক চালাবার ভঙ্গি করে।

তবে রঞ্জন একটা কাজ করল। রঞ্জন চিত্রশিল্পী, ছবি আঁকে। সব রকম ছবি সে আঁকতে পারে। প্রদর্শনীতে তার ছবি বিক্রিও হয়। অনেক ক্যালেণ্ডারে তার আঁকা ছবি দেখা যায়। সে বিজনের একখানা পোর্ট্রেট এঁকে ফেলল। শুধু দুই রঙে, কালো আর নীল। কোমরে দুটো হাত রেখে বিজন সোজা দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি। ভালই চেনা যাচ্ছে। ছবিখানা সে ললিতাকে উপহার দিল।

ললিতা ছবিখানা পেয়ে ভারি খুশি। সেখানা সে বাঁধিয়ে ডাইনিং স্পেসের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখল।

দুই ভাই ললিতাকে লতি বলে ডাকে। বোনটি তাদের বড় আদরের আর বিজনও তাদের ভাইয়ের মতো। বিজন ভাল চাকরী পেলে বিয়ে হবে।

ললিতা ভারি সুন্দর গান গায়, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানগুলি তার খুব প্রিয়। রজনীকান্তের ও রামপ্রসাদী গান সে নিখুঁত সুরে গাইতে পারে। ঘরখানি সে সুরে ভরিয়ে দেয়।

এই ভাবে চলছিল। আমরা ভালই আছি। আমরা অল্পে সন্তুষ্ট, অভাব অভিযোগ নেই।

এমন সময়ে একদিন সকালে বিজন একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ হাতে হাজির, বেশ উত্তেজিত।

জিজ্ঞাসা করি, কি খবর বিজন? কোনো গরম খবর? রেডিওতে ত সেরকম কিছু শুনলুম না।

না, দাদা, কোনো গরম খবর নয়, তবে আমি একটা চাকরি পাচ্ছি এই সঙ্গে আমার জিগরি দোস্ত রমেশও একটা চাকরি পেতে পারে। এই যে বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখুন।

বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন জনৈক ডঃ নটরাজন। হিমালয়ে দুর্গম লদাখ, লাহুল ও স্পিতি অঞ্চলে অভিযান চালাবার জন্যে বটানি ও জুওলজিতে একজন সায়েন্স গ্রাজুয়েট চাই। পর্বতারোহণে ও ট্রেকিং-এ অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকা চাই। এ ছাড়া একজন ডাক্তার চাই। হিমালয়ের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় থাকলে অগ্রাধিকার। কলকাতার এক হোটেলে ডঃ নটরাজনের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।

বিজনের জন্যে চা এসে গিয়েছিল। সে কাপে চুমুক দিচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি দেখা করবে নাকি?

নিশ্চয়, এ চাকরি আমার হবেই সঞ্জয়দা, ওরা লোক পাবে কোথায়? সব কোয়ালিফিকেশন আমার আছে। আর আমার বন্ধু রমেশ ত ডাক্তার। মিলিটারিতে ডাক্তারের চাকরি করেছে। আমরা দুজনেই আজই হোটেলে ডঃ নটরাজনের সঙ্গে দেখা করব।

সঞ্জয় আর রঞ্জন দুই ভাই ভেবেছিল তাদের বোন ললিতা বোধহয় বাধা দেবে কিন্তু সে বিজনকে উৎসাহ দিল।

বিজন হেসে বলল, ডঃ নটরাজন আমার কথা ভেবেই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আজ বিকেলেই সুখবর পাবে। আমার প্রিয় খাবার গরম ফুলকো লুচি আর হিং দেওয়া আলুরদম খাওয়াতে হবে। আমি এখন যাই।

বিকেলে হাসিমুখে ফিরে এল বিজন, সঙ্গে তার বন্ধু রমেশকেও এনেছে। ঘরে ঢুকেই বলল, ময়দা মাখা হয়েছে? সুখবব গুড নিউজ। আমরা দুজনেই মনোনীত হয়েছি, আপাতত যেতে হবে দেরাদুন, সেখান থেকে যাত্রা শুরু হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম কিসের অভিযান এবং কোথায় হবে?

বিজন সংক্ষেপে বলল লদাখের লাহুল ও স্পিতি অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় কাঠবেড়ালির মতো একরকম প্রাণী আছে।

তারা পাহাড়ের গায়ে গর্ত খুঁড়ে বাসা তৈরী করে। গর্ত খুঁড়ে তারা যখন ওপরে মাটি তোলে তখন বালিও ওঠে আর সেই বালিতে থাকে স্বর্ণচূর্ণ, সোনার বালি।

রঞ্জন পাশের ঘরেই ছিল। বেরিয়ে এসে বলল, সব শুনতে পেয়েছি। তোমার ত একটা ক্যামেরা আছে না। আমার জন্যে পাহাড়ের কিছু ছবি তুলে আনবে যা দেখে আমি ছবি আঁকতে পারব।

বিজন যখন উৎসাহভরে সকলের সঙ্গে কথা বলছিল আমি তখন তার বন্ধু রমেশকে লক্ষ্য করছিলুম। দেখলুম সে শুধু ললিতাকেই দেখছে, ললিতা ছাড়া তার কোনদিকেই মন নেই। এটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু কিছু বলতেও ত পারি না। রমেশ ললিতার দিকে এই বিশেষ মনোযোগ না দিলেও যুবকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না।

এরপর কয়েকটা দিন কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন বিজন এসেছিল। তার কাছ থেকে জানা গেল ওরা ডঃ নটরাজনের কাছ থেকে চিঠি ও টাকা পেয়েছে। সঙ্গে কি কি জিনিস নিতে হবে তার একটা তালিকাও পেয়েছে আর বিশেষভাবে বলা হয়েছে লাইফ ইন্সিওরেন্স করা না থাকলে তা যেন যাত্রার আগে করে নেওয়া হয়। প্রিমিয়ম জমা দেবার টাকা অভিযাত্রী দল থেকে পাওয়া যাবে। নিয়মিত কোনো বেতন দেওয়া হবে না, অভিযান শেষ হলে একটা থোক টাকা দেওয়া হবে। বিজন বলল, টাকা কে চায় আমি কি টাকার জন্যে যাচ্ছি নাকি?

যাত্রার একটা তারিখ ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তবে আলমোরা থেকে নয়। ওদের যেতে বলা হয়েছে দিল্লী। দিল্লী থেকে ওরা প্লেনে চড়ে যাবে লদাখ, যেখানে আছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিমানক্ষেত্র। এটা সামরিক দিক বিচার করে করা হয়েছে। লদাখে সাতদিন থাকতে হবে, সেখানে কিছু প্রশিক্ষণ নিতে হবে তারপর লাহুল ও স্পিতির দিকে যাত্রা। তারপর সেখানে থেকে মূল অভিযান শুরু হবে, যেতে হবে দুর্গম অঞ্চলে।

সেদিন মার্চ মাসের চার তারিখ। মার্চ মাসেরই সাত তারিখে ওরা কলকাতা থেকে যাত্রা করবে। ডঃ নটরাজন দিল্লী চলে গেছেন ।

মার্চ মাসের ছয় তারিখে বিকেল হবার আগেই রমেশকে নিয়ে বিজন এল। তখন চায়ের সময় হয়েছে। আমাদের ছোট বাড়ির সংলগ্ন ছোট একটা বাগান ছিল। সবুজ ঘাসের ছোট লন ঘিরে মরশুমি ফুলের বেড়া। এই সময়ে নানারকম রঙিন ফুল ফুটেছে, ফ্লক্স, সলভিয়া, সুইট পি, ডায়াস্থাস ইত্যাদি। রঞ্জন বলল, দাদা বাগানের লনে সবাই মিলে চা খাওয়া যাক। সে নিজেই বেতের চেয়ার ও মোড়া এবং একটা ছোট টেবিল নিজেই বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। রমেশও সাহায্য করতে এগিয়ে এল। টেবিল ঘিরে ছ'টা চেয়ার ও মোড়া সাজান হল।

যথাসময়ে দিপালী ও ললিতা দু'জনে মিলে টি-পট ইত্যাদি সাজিয়ে দিল। কিছু খাবারও তৈরী করেছিল, তাও এনে সাজাল। রমেশ যেন দিপালীকে নয়, লতুকে সাহায্য করতে অতি মাত্রায় ব্যস্ত। এটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। লতুর মুখেও বিরক্তি ফুটে উঠছিল।

চা পর্ব শেষ হবার পর বিজনদের আসন্ন অভিযান নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

সময় কেটে যায়। নানাবকম কথা হয়। ললিতার ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা হয়।

হারু এসে বলে টেবিলে খাবার সাজানো হয়েছে। ডাইনিং স্পেসে ঢুকে দেখি রঞ্জন আব রমেশ এসে গেছে। দিপালী একটা চেয়ারে বসে কিছু টুকিটাকি কাজ করছিল। রমেশ একটা চেয়ারে বসে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। তার বিপরীতে ছিল রঞ্জনের আঁকা বিজনেব সেই ছবি। ছবিখানায় আলো পড়ে চকচক করছিল। রমেশ উঠে ললিতার পাশের চেয়াবে বসে বলল, ছবিতে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে।

তা নয়, আমি রমেশের মতলব ধরতে পেরেছি, সে ললিতার পাশে বসতে চায়। খেতে খেতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলুম কিন্তু রমেশ প্রায় ললিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে বিড়বিড় করে কি বলে যাচ্ছে। ফলে বেচারী ললিতা খেতেই পারছে না তাছাড়া সে রীতিমতো বিরক্ত। রমেশের বকবকানি সে কিছুক্ষণ সহ্য করল তারপর সে হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, বড়দা আমার মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। আমি শুতে যাচ্ছি। বৌদি তোমরা কিছু মনে কোরো না। পরে আমি খাব এখন।

ললিতার উঠে যাওয়াটা আমাদের ভাল লাগল না। ঘরের আবহাওয়া যেন গুমোট হয়ে গেল।

আবহাওয়া হালকা করবার জন্যে রঞ্জন উঠে তার স্টিরিওতে একটা চটুল গান বাজিয়ে দিল। আমার মনে হল রমেশ এমন কিছু বলেছে যা লতু সহ্য করতে পারেনি। রমেশ জানে

না লতু মোটেই হালকা মেয়ে নয়। পরে জানা যাবে কি বলেছে কিন্তু রমেশ বিজনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে আমরা কিছু বলতে পারি না। আমাদের সকলের মন খারাপ হয়ে গেল।

যাই হোক খাওয়া শেষ হল। এবার ওরা যাবে। আমিই বিজনকে বললুম, লতুর সঙ্গে দেখা করে যাও। দোতলায় লতুর একটা নিজস্ব ছোট ঘর আছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিজন ফিরে এল। তার মুখ থমথম করছে। রমেশের দিকে একবার চাইল। কিছু বলতে যেয়েও কিছু বলল না।

আমাকে ও রঞ্জনকে বলল, দাদা, ছোড়দা, কবে ফিরব বলতে পারছি না তবে আমার জন্যে শুভকামনা কর যেন সফল হয়ে ফিরতে পারি।

রমেশ বলল, হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল থেকে আমরা ফিরব কিনা বলতে পারি না। আমার তিন কুলে কেউ নেই, লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাগুলো কে পাবে! তবুও একজনের নাম লিখে তাকেই নমিনি করেছি, বলে হো হো করে হেসে উঠল।

আমরা কিছু না বলে ওদের খানিকটা এগিয়ে দিলুম। বিজন, সুযোগ পেলে খবর দেবার চেষ্টা করো।

বিজন একবার পিছন ফিরে ওপরের দিকে চাইল। জানালায় ছলছল মুখে ললিতা দাঁড়িয়ে ছিল।

দিল্লি পৌঁছবার পর বিজন আবার আমাব স্ত্রী দিপালীকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। তারা পরদিনই লদাখ অভিমুখে যাত্রা করবে। লদাখে পৌঁছেও বিজন আমাদের প্রত্যেকের নামে চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল মার্চ মাস হলেও ওদের তুষার ঝড়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। এর প্রায় দশদিন পরে আমরা আরও একখানা চিঠি পেয়েছিলুম এবং সেইটেই তার শেষ চিঠি।

এরপর তিন চার মাস কেটে গেল। বিজন বা অপারেশন গোল্ড-ডিগারের কোনো খবব নেই। তবে তিন মাস পরে একটা ছোট খবর পাওয়া গেল। যারা এই অভিযানের আয়োজন করেছিল দিল্লিতে তাদের একটা অফিস ছিল। ঠিকানা ও ফোন নম্বর বিজন আমাদের জানিয়েছিল। রঞ্জন দিল্লিতে তাদের অফিসে ফোন করল। তারা বলল, তারাও বিশেষ কিছু জানে না। গত সপ্তাহে তারা একটা খবর পেয়েছে যে সকলে নিরাপদে আছে। কাঠবেড়ালী জাতীয় সেই প্রাণীটির সন্ধান পাওয়া গেছে, বেশ কয়েকটা দেখাও গেছে কিন্তু সোনার বালি এখনও পাওয়া যায়নি। এর বেশি ওরা কিছু জানে না বা আমাদের জানাল না।

তবে ওরা বলেছে খবরের কাগজের পাতায় নজর রাখতে। অভিযাত্রীদল সফল হলে খবরের কাগজ মারফত তা জানান হবে। তারপর থেকে আমরা প্রতিদিনই খবরের কাগজের ওপর নজর রাখতে লাগলুম।

এরপর প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন দুপুরে ললিতা ডাইনিং স্পেসে বসে একখানা

বই পড়ছিল আর মাঝে মাঝে বিজনের সেই ছবিখানা দেখছিল। হঠাৎ সে দাদা, বৌদি, ছোড়দা বলে চিৎকার করে উঠল। রঞ্জন তখন বাড়ি ছিল না। আমি আর দিপালী ছুটে এলুম। লতুর মুখে কথা নেই। তার দুই চোখ বিস্ফারিত, দরদর করে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ছবির দিকে তর্জনি তুলে কি যেন দেখাচ্ছে।

আমরা দুজনেই জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে রে লতু, ভয় পেলি কেন?

তোমাদের চোখ নেই? ছবিখানা ভাল করে চেয়ে দেখ না। বিজুর ঠোঁটের হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে। হাত দুটো ঝুলে পড়েছে, যেন হতাশ। দাদারে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরা হলো না, বলেই সে টেবিলে দুই হাত রেখে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দিপালী তার পাশে বসে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তুই ভুল দেখেছিস লতু, তাই কখনও হয় নাকি? মিছে 'াবিস না, সব ঠিক আছে। বিজু ঠিক ফিরে আসবে।

লতু কিছুই ভুল দেখেনি। আমরাও সভয়ে দেখলুম ছবির বিজনের মুখ ম্লান, দুই হাত দুই পাশে ঝুলছে। আমি ভুল দেখছি না, ঠিকই দেখছি।

রঞ্জন বাড়ি ছিল না। সে ফিরতেই তাকে সংক্ষেপে ঘটনা বলে বললুম, তুই এখনি অপারেশন গোল্ড-বিভাগের দিল্লি অফিসে ফোন কর।

লতু কোথায়?

সে ওপরে নিজের ঘরে।

রঞ্জন তখনি দিল্লিতে ফোন করল। যে সংবাদ আমরা শুনতে চাইনি সেই গভীর বেদনাদায়ক সংবাদ আমাদের শুনতে হল। এক দুর্ঘটনায় বিজন মারা গেছে। দুর্ঘটনা কি এবং কি করে ঘটল তা এখনও জানা যায় নি।

দিপালীকেও ডেকে এক দুঃসংবাদ জানান হল। বেচারী ভীষণ মুষড়ে পড়ল। কান্না রোধ করতে পারল না। বলল, এই খবর আমি লতুর কাছ থেকে কি করে লুকিয়ে রাখব।

আমি বললুম, লুকিয়ে রাখতে হবে, লতু অনুমান করেছে তবুও খবরটা বেচারীকে শোনাতে চাই না।

সময় বসে থাকে না। আমরা অভিনয় করে যাচ্ছি। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। লতু অস্থির, নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছে না। আমাদের ক্রমাগত বলছে, দাদা, ছোড়দা তোরা বিজুর খবর আনতে পারছিস না।?

রঞ্জন বলল, ওদের দিল্লি অফিসে কয়েক বার ফোন করেছিলুম, কোনো সাড়া পাইনি। খবরের কাগজেও কিছু পাইনি।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। লতু নিজের ঘরে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে। নিচে কদাচিৎ নামে।

তখন দুপুর। আমি নিচে আমার ঘরে বসে প্রুফ দেখছি, এমন সময় ঘরে ঢুকল রমেশ। প্রথমে তাকে চিনতে পারি নি। লোকটা যেন কুঁজো হয়ে গেছে। দাড়ি বেশ বড় হয়েছে। দৃষ্টি বিহ্বল। একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল দেখে মনে হলো সে রীতিমতো ভীতিগ্রস্থ। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে কি যেন দেখছে।

জিজ্ঞাসা করলুম কি ব্যাপার, পাহাড়ে কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? বিজন কি মারা গেল? কবে ফিরলে?

লোকটাকে আমরা পছন্দ করি না। তবুও বিজনের খবর জানবার জন্যে ওকে তাড়িয়ে দিলুম না।

রমেশ বলল, বলছি, এক গ্লাস জল।

হারু বেচারা তখন ঘুমোচ্ছিল। আমি নিজেই তাকে জল এনে দিলুম। জল পান করে গেলাস নামিয়ে রেখে রমেশ বলল, আমাদের অনুসন্ধান কাজ বেশ ভালই চলছিল, যে প্রাণী মাটি খুড়ে সোনার বালি তুলে আনে সেই প্রাণীর সন্ধানও পেয়েছিলুম। এই কাজ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কীট-পতঙ্গ, প্রজাপতি,ও গাছপালার নমুনা সংগ্রহ করছিলুম। ফটোও তুলছিলুম। একটু দম নিয়ে বলল, তখন আমরা তিব্বত সীমান্তে। তীব্বতের সীমানা অতিক্রম করা যাবে না। সেদিন আমি ও বিজন অনুসন্ধান কাজ চালাচ্ছি। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। মাঝে মাঝে কুয়াশা হচ্ছে। তখন আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এইরকম একবার কুয়াশা সরে যেতে আমরা দুজনে আবার চলতে আরম্ভ করলুম। বিজন হঠাৎ থেমে গেল। আঙুল তুলে আমাকে একটা গাছ দেখাল। গভীর খাদের ধারে একটা গাছ, পাঁচ ছ'ফুট উচ্চতা, কুল গাছের মতো পাতা। অজস্র ফল ধরেছে। আকারে সুপুরির মতো, রং উজ্জ্বল হলদে। এমন গাছ আমরা দেখিনি। শুধু তাই নয়,গাছটির ডালে ডালে অনেক প্রজাপতি। বিজন গাছের দিকে তাকাল। প্রজাপতি সংগ্রহ করবে, গাছের ফল ও পাতাও চাই।

বিজনকে এগিয়ে যেতে দেখে আমি বললুম, সাবধান বিজন, পাশেই গভীর খাদ, সাবধান, নাই বা গেলে।

বিজন শুনল না। গাছের কাছে যেতেই প্রায় সব কটা প্রজাপতি উড়ে গেল। দু একটা বড় রঙিন প্রজাপতি তখন বসে ছিল। একটা বড় চ্যাপ্টা পাথর ছিল। বিজন সেই পাথরে উঠল। আর বলব কি? বিজন সেই পাথরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা উল্টে গেল আর বিজন চকিতে অদৃশ্য। সে সেই খাদে পড়ে গেল।

এই পর্যন্ত বলে রমেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। আমিও স্থাণুর মতো বসে আছি। রঞ্জন বাড়ি নেই। চোখের সামনে শুধু লতুর মলিন মুখ ভাসছে।

রমেশ আবার আরম্ভ করল। আমি তখনি প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে আমাদের ক্যাম্পে

যেয়ে সেই দুঃসংবাদ শোনালুম। হৈ চৈ পড়ে গেল। কিন্তু মুশকিল হল যে তখুনি উদ্ধার কাজ আরম্ভ করা গেল না। গভীর কুয়াশা। কুয়াশা যখন কাটল তখন সন্ধ্যা হয়েছে। অতএব সেদিন কিছু করা গেল না।

পরদিন সকালে রোদ উঠতে না উঠতে আমরা দল বেঁধে খাদের দিকে যাত্রা করলুম। অনেক পরিশ্রম করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা সেই খাঁদে পৌঁছে খানিকটা নিচে নামতে পারলুম। কিন্তু নিচে কিছুই দেখা যাচ্চে না। একজন একটা পাথর ফেলল পাথর পড়বার কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। তবুও আমরা বেলা তিনটে পর্যন্ত অনেক চেষ্টা চালালুম কিন্তু বৃথা। আমাদের বিজন চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল। আমরা পারলুম না। আমাদের ক্ষমা করবেন।

শোনো রমেশবাবু, সব শুনলুম। আমার বলার কিছু নেই। তবুও একটা কথা বলছি তুমি আমাদের বাড়ি আর এসো না, ললিতার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা কোরো না। কথাটা মনে রেখো।

রমেশ চলে গেল। আমার মনের ভিতরে কেন যেন বলল, রমেশ সত্যি কথা বলেনি। ওর বলবার ধরনটাই কি রকম। বেশ সন্দেহজনক। এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে ডঃ নটরাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা। মনে হয়, তিনি দিল্লি ফিরেছেন।

রঞ্জন ফিরতেই তাকে বললুম দিল্লিতে একবার ফোন করতে।

সৌভাগ্যক্রমে ডঃ নটরাজনকেই পাওয়া গেল। তিনি বললেন দলবল নিয়ে তিনি গতকাল মাত্র দিল্লি ফিবেছেন। হ্যাঁ, অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। বিজন মারা গেছে। দু-তিন দিনের মধ্যে আমি প্রেস কনফারেন্স ডাকব। খবরের কাগজ পড়লে সব জানতে পারবেন। রমেশ? হ্যাঁ তার মাথায় মনে হয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে। বন্ধুকে হারিয়ে এমন হতেই পারে।

ডঃ নটরাজন বোধহয় কোনো কারণে ব্যস্ত ছিলেন। বেশিক্ষণ কথা বলা গেল না।

তিন-চার দিন কেটে গেল। বিজন যে মারা গেছে এ খবর যথাসাধ্য চেষ্টা করে চেপে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে লতু আজকাল খবরের কাগজ পড়ছে না। কোনো কিছুতেই তাব আগ্রহ নেই। তাকে একরকম জোর করে খাওয়াতে হয়। ওপরে নিজের ঘরেই থাকে। নিচে নামলেও ডাইনিং স্পেসে এসে বিজনের ছবির দিকে ফিরে চেয়ে থাকে। তার বৌদিকে বলে, তোমরা আমাকে না বললে কি হবে, আমি জানি বিজু আর কোনোদিন আমার কাছে ফিরে আসবে না।

ডঃ নটরাজনের প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্ট কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এবং হেরোডোটাসের তথ্য সত্য প্রমাণিত হওয়ায়হৈচৈ পড়ে গেছে। এ বিষয়ে খবরের কাগজে আরও নিবন্ধ এবং চিঠিপত্রও ছাপা হচ্ছে।

একদিন দুপুরে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা লিখে ক্লান্তি বোধ করলুম। কফি খাবার ইচ্ছে হল। হিটারে জল গরম করে নিজেই কফি বানিয়ে বিজনের ছবির সামনে একটা চেয়ারে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি। বিজনের ছবিখানা দেখছি, রঞ্জন মন্দ আঁকেনি। বিজনের নাকের ডান দিকে ছোট্ট একটা বাদামী রঙের আঁচিল আছে, সেটাও আঁকতে ভোলেনি।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ঘরের মধ্যে খুব একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল। আমার কাপ ধরা হাত কেঁপে উঠল। কাপটা নামিয়ে রাখলুম। ছবির দিকে চোখ পড়ল। এ কি? বিজন কোথায়? এ ত একটা কঙ্কাল। কঙ্কাল মিলিয়েগেল। শীতল হাওয়াও চলে গেল। তারপর দেখলুম বিজনের ছবির ওপর দু'ফোটা লাল রক্ত। ছবিতে কোথাও লাল রং নেইত, রক্তের ফোঁটা কোথা থেকে এল। কফি শেষ করে আমি ছবির কাছে যেয়ে দেখলুম রক্তের ফোঁটা নয়। ক্ষুদ্র দুটি পোকা।

হাত দিতেই আমার হাতে লাল রং লেগে গেল। পোকা দুটোর রং সাদা। হাতের লাল রং মুছে আমি পোকা দুটোকে তুলে আমার ঘরে এনে ছোট একটা কাঁচের গেলাস চাপা দিয়ে আমার টেবিলের একপাশে রেখে দিলুম । লতুকে কিছু বললুম না। যাতে তার চোখ না পড়ে এই জন্যেই আমি পোকা দুটোকে সরিয়ে নিয়ে গেলুম।

পরদিন দুপুরে আমি বেরিয়েছিলুম। বেহালায় একজন ফিল্ম প্রযোজক ও ডিরেকটরের সঙ্গে মিটিং ছিল। এঁবা আমার একটা গল্পের ছবি তুলবেন। টিভি পর্দার জন্য আমার একটা উপন্যাস সিরিযাল করতে চায়।

রঞ্জনও বাড়ি নেই। সে দিপালীকে বলে গেছে তার ফিরতে রাত্রি আটটা হবে। বাড়িতে আছে শুধু লতু, দিপালী আব আমাদের কাজের লোক হারু।

বাডি ফিবতে আমাব সন্ধ্যা হযে গেল। বাড়ি ঢুকেই টের পেলুম একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। টের পেলুম আমার ঘরে ঢুকে। ঘরে একটা ছোট তক্তপোষ আছে। লিখতে লিখতে ক্লান্ত লাগলে আমি সেই তক্তপোষে শুই। দেখি কি সেই তক্তপোষে রমেশ শুয়ে রয়েছে। বিড়বিড় করে কি বকছে আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে।

আমি ওকে গ্রাহ্য না কবে ঘর থেকে বেরিয়ে, ভেতরে ঢুকলুম। আমি বাড়ি ফিরেছি তা দিপালী ও লতু টের পেয়েছিল। তাই তারা কিছু বলবার জন্য উত্তেজিত ভাবে আমার দিকে এগিয়ে এল।

"বেশ জোরেই বললুম, রাসকেলটাকে আসতে আমি বারণ করেছিলুম, এল কেন? রাসকেলটার কি হয়েছে। ব্যাটাকে দেখছি মেরে তাড়াতে হবে।

দাদা ঐ শয়তানটা একটা কুগ্রহ। কি করেছে জান? বাইরের দরজার কড়া নাড়তে হারু দরজা খুলে দিয়েছিল। বৌদি তখন নিচে চা করছিল। আমি ঐ চেয়ারটায় বসেছিলুম। শয়তানটার এত সাহস যে সোজা এখানে চলে এসেছে। আমরা নিচে থাকলে ওপরেই

উঠে যেত। আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে কিনা, ললিতা বিজন ত আর নেই, আমি আগে যে প্রস্তাব করেছিলুম সেটা কি তোমার মনে আছে, বলতে বলতে বিজুর ছবির নিচে ঐ চেয়ারটায় বসে যেই আমাকে বলেছে, আমি তোমাকে আমার ঘরণী করতে চাই। যেই না এই কথাটা বলা সঙ্গে সঙ্গে বিজুর ছবিটা ওর ওপর পড়ল। ছবির ভারি ফ্রেমের কোণ লেগে ওর কপাল ফেটে গেল। তারপর ডেভিলটা চেয়ার থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। হারুর সঙ্গে ওর ভাইপো দেখা করতে এসেছিল। দুজনে ধরাধরি করে তোমার ঘরে তক্তপোষে শুইয়ে দিয়েছে।

দিপালী বলল, লোকটা ঘরে ঢোকার পর থেকে মাঝে মাঝে নিজের পিছন দিকে চেয়ে দেখছিল । তুমি বিশ্বাস করবে না, লোকটা যখন লতুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তখন আমি দেখেছিলুম দুটো ছায়া, একই মানুষের দুটো ছায়া কি করে হয়? এই আলো ওর গায়ে পড়েছিল তাতেই ছায়া পড়তে পারে কিন্তু দুটো ছায়া কি করে হয়? ভুল দেখেছি?

বিজনের ছবিখানা তখনও টাঙানো হয়নি, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল। ছবির দিকে চাইলুম, কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম না।

দিপু আমাকে চট্ করে একটু চা করে দাও। গলা শুকিয়ে গেছে। চা খেয়ে ব্যাটাকে তাড়াতে হবে। হারু তোকে বললেই ক্লাব থেকে নরেন আর দুলালকে ডেকে আনবি। ব্যাটাকে উত্তমমধ্যম না দিলে ওর আক্কেল হবে না।

চা খেয়ে আমি ঘবে ঢুকে দেখি রমেশ উঠে বসেছে। আমি ঘরে ঢুকতেই জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, আপনি ঐ পোকা দুটো কোথায় পেলেন? আঙুল দিয়ে দেখাল।

কেন? যেখান থেকেই পাই না কেন? তোমার কি দরকার? তুমি ভালয় ভালয় আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

যাব, ঐ পোকা এখানে কি করে এল? হিমালয়ের যে অঞ্চলে আমরা অভিযান চালাচ্ছিলুম সেখানে এই পোকা অজস্র, মাঝে মাঝে ওরা দেহ থেকে লাল রং-এর কিছু মোচন করে। বরফের ওপরেও এই পোকা দেখেছি, সেই পোকা এদেশে কি করে এল?

রমেশ জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল। মাঝে মাঝে দু হাত দিয়ে মাথা টিপছিল আর পিছন দিকে বেঁকিয়ে চেয়ে দেখছিল।

আমি তেড়েমেড়ে বললুম পোকা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামতে হবে না। তুমি বিদেয় হও, ছিঃ ছিঃ তুমি বিজনের বন্ধু। তোমার এমন আচবণ, লজ্জা কবে না। গেট আউট।

রমেশ উঠে দাঁড়াল, তার পা টলছে। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিবে দেখল। আমিও দেখলুম দুটো ছায়া , ছায়া দুটো রমেশেরই।

রমেশ দাঁড়িয়ে পড়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, বিজন ভাই আমাকে মুক্তি দে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তখন আমার ঘাড়ে শয়তান চেপেছিল। শয়তান আমাকে

বলল, একটু ঠেলা দে। বিজন খাদে পড়বে আর মরবে, তোর পথ পরিষ্কার। আমিও ঠেলা মারলুম প্রাণের বন্ধুকে, ভাই বিজন আমাকে মুক্তি দে...।

আরও কিছু বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় নামল, রাস্তায় আলো জ্বলছে। দুটো ছায়া তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে।

আমার পাশে এসে দিপালী আর লতু দাঁড়িয়েছিল। তারাও দেখল, মানুষ এক ছায়া দুই।

যাক আপদ বিদায় হল এবং চিরতরে। পরদিন সকালে দেখা গেল আমাদের বাড়ি থেকে কাছেই একটা গাছের ডালে দড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে রমেশ ঝুলছে।

এদিকে বিজনের ছবিতে তার দুটো ঠোঁটে সেই হাসি ফিরে এসেছে।

আদিম আতঙ্ক

অদ্রীশ বর্ধন

গাড়ি রাখার ছোট্ট জায়গায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিল মাধবী।

পরী বললে—'ফুটফুটে বাড়ি তো!'

মন্দ বলেনি পরী। শুধু ফুটফুটে নয়, টুকটুকেও বলা যায় ছোট্ট এই বাড়িটাকে। নিজের বাড়ি বলতে তো এতদিন কিছুই নিজের ছিল না মাধবীর। এই তার প্রথম নিজস্ব বাড়ি। এ বাড়ির দিকে তাকালেই মনটা শান্ত হয়ে যায়।

এখনও তাই হচ্ছে। এতক্ষণ ভুগছিল চাপা টেনশনে। এখন রিলাক্সড়।

আশপাশের অদ্ভুত পরিবেশ মুহূর্তের জন্যে মুছে গেল মন থেকে।

বললে—'একতলার অর্ধেক আমার অফিস আর ওয়েটিং রুম। বাকি অর্ধেক ব্যাঙ্কের দখলে। তাহলেও সুন্দর বাড়ি। দেখলে মনে হয়, শুধু চেহারায় নয়—চরিত্রেও এ-বাড়ি আর পাঁচটা বাড়ির থেকে আলাদা। তাই নয় কি?

'ঠিকই তো।'

এতক্ষণ কথা হচ্ছিল গাড়ির মধ্যে বসে। এবার নেমে আসে বাগানের রাস্তায়। পড়ন্ত রোদ হিমেল হাওয়াকে যেন আয়-আয় করে ডেকে আনছে। কনকনে শৈত্য বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। মাধবীর গায়ে ফুলহাতা সবুজ সোয়েটার। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত জিনস_ ট্রাউজার্স। তা সত্ত্বেও হাড়সুদ্ধ যেন কেঁপে উঠছে। এ-সময়ে অবশ্য এখানকার আবহাওয়ায় এই খেলাই দেখা যায়। দিনে মোলায়েম ভাব—রাতে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা।

একটানা অনেকক্ষণ ড্রাইভিং হয়েছে। আড়ষ্ট হয়ে গেছে মাসল। আড়মোড়া ভাঙে মাধবী। মাসল খিঁচে ধরা তাতে যদি কমে। তারপর ঠেলে বন্ধ করে দেয় গাড়ির দরজা। খটাং আওয়াজটার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে ওপরের পাহাড় থেকে, গড়িয়ে নেমে যায় নিচের শহরে। গোধূলির নিথরতায় জাগায় সামান্য শিহরণ—একটি মাত্র শব্দের শিহরণ।

ডাক্তার মাধবী লাহার কানের মধ্যে দিয়ে সেই শব্দ বিচিত্র এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে মগজের মধ্যে। গোটা মগজটা থমথমে করে ওঠে সেই আশ্চর্য ইলেকট্রিক সিগন্যালে। একটি মাত্র শব্দ। মস্ত এক সঙ্কেত।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাধবী। মনে পড়ে যায়, ফ্রেড হয়েলের লেখা বিখ্যাত সেই কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংলাপটা। এ সংলাপ মানুষের নয়—এক ইনটেলিজেন্ট কালো মেঘপুঞ্জের। আক্রমণ হেনেছিল সৌরজগতে। ধ্বংস করে এনেছিল পৃথিবীকে। কিন্তু ভাল লেগেছিল বিঠোফেনের বি-ফ্লাট-মেজর সোনাটা।

বলেছিল—'শব্দকে আমরা ব্যবহার করি শুধু মনের মতন বৈদ্যুতিক ছন্দের প্যাটার্ন গড়ে নিয়ে ব্রেনকে আরও বেশি কাজে লাগানোর জন্যে।'

শব্দ! ইলেকট্রিক্যাল প্যাটার্ন! সিগন্যাল!

শৈত্যবোধটা আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে মাধবীর সারা গায়ে। আস্তে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ায় গাড়ির পিছনে। তাকায় শিবালয় শহরের দিকে। শহরের মাঝের দিকে। কোথাও কিছু নড়ছে না।

পরীও তাকিয়েছিল নিচের শহরের দিকে। মুখে ভাসছে খুশি। কথাতেও ঠিকবে আসে উচ্ছ্বাস—'দিদিরে, এইখানেই আমি থাকব চিরকাল।'

জবাব দিল না মাধবী। তার মন তখন ছুটছে প্রতিধ্বনির পেছনে। ফিরে তো এল না প্রতিধ্বনির ঢেউ। নামতে নামতে হারিয়েই গেল। বাতাসের নরম শব্দ ছাড়া এখন আর কোনও শব্দ নেই।

সাইলেন্স, সাইলেন্স... খণ্ড খণ্ড নৈঃশব্দ্য বিরাজমান চারিদিকে। কসমিক সাইলেন্সও বুঝি এত ভয়াবহ নয়। নৈঃশব্দ্য তো একরকম হয়—একই চেহারা আর চরিত্রর হয়—সাহিত্যিকরা এককথায় বলেন, অখণ্ড নৈঃশব্দ্য।

কিন্তু মাধবীর তো তা মনে হচ্ছে না। যেন অগুন্তি নৈঃশব্দ্য খণ্ড খণ্ড চেহারা আর চরিত্র নিয়ে ভাসছে তার চারপাশে। রাতের শ্মশানে টের পাওয়া যায় এই নৈঃশব্দ্যকে—টের পাওয়া যায় গোরস্থানে—মৃতদেহকে ঘিরে ওঠে যে কালান্তক নৈঃশব্দ্য —এ যেন তাই।

ধাঁধায় পড়ে মাধবী। হঠাৎ এ-ধরনের ভাবনা মনের মধ্যে চেপে বসছে কেন, তা বুঝে ওঠে না। নৈঃশব্দ্য তো তার কাছে নতুন কিছু নয়। শব্দের উৎপাত অসহ্য লাগে তার কাছে বরাবরই। কিন্তু কখনও তো এমনভাবে ভাবেনি যে নৈঃশব্দ্যেরও অনেক চেহারা, অনেক চরিত্র থাকতে পারে। এই মুহূর্তে টুঁটি টিপে ধরা বিশেষ এই নৈঃশব্দ্যটাকেই বা শ্মশান অথবা গোরস্থানের নৈঃশব্দ্য বলে মনে হচ্ছে কেন? এই পাহাড়ি অঞ্চলের গরমকালের রাতের নৈঃশব্দ্য সে উপভোগ করেছে মনপ্রাণ দিয়ে। সে বড় মিঠে নৈঃশব্দ্য। যদিও তা নিরেট নৈঃশব্দ্য নয় মোটেই। ঝাঁকে ঝাঁকে পোকাদের উৎপাত চলে জানলার বন্ধ সার্সির ওপর। বাইরের বাগানে সমানে গান গেয়ে যায় ঝিঁঝি পোকা। নিশাচর পাখি মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটায়। হাওয়ায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত আলোড়ন। সব আওয়াজ মিলে মিশে গিয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যখন তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে—তখন তা নিছক নৈঃশব্দ্য না হলেও —শব্দের জগতে তার ঠাঁই নেই। এছাড়াও শহরের নিদ্রা যখন গাঢ় হয়, তখন জাগ্রত হয় আর একরকম নৈঃশব্দ্য। গোটা শহরটা ঘুমিয়ে থেকেও যেন জেগে থাকে। নৈঃশব্দে বলতে থাকে—দ্যাখো, দ্যাখো , ঘুমন্ত নগরীকেও তুমি টের পাচ্ছ মনের কান দিয়ে।...এই নৈঃশব্দ্যকেও ভালবেসেছে মাধবী। অতীন্দ্রীয় অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছে, নিশীথ নগরীর নীরব সংলাপ।

কিন্তু এইমাত্র যে নৈঃশব্দ্য করাল দাঁতের কামড় মেরে বসে গেল তার অণু-পরমাণুতে—এই রকম নৈঃশব্দ্য তো কখনও শোনেনি মাধবী। শীতের রাতের হাড় হিম করা নৈঃশব্দ্যের চেয়েও কামড় অনেক বেশি ভেতরে প্রবেশ করেছে শুধু একটাই কারণে...

অতলান্তই শুধু নয়—এর অতলে রয়েছে আতঙ্ক—অজানা আতঙ্ক—মুখ বুঁজে ঘাপটি মেরে রয়েছে তারা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে...সুযোগ পেলেই মাথা তুলবে—নৈঃশব্দ্যকে খান খান করে ছাড়বে...

আর ঠিক এই কারণেই নার্ভাস হয়ে যায় মাধবী। ভয়-ভয় ভাবটা প্রকটতর হয়ে ওঠে। অবাঙমানসগোচর ভয় সহস্র প্যাঁচ মেরে ঘিরে ধরে ওর তনুমনকে. .

যেন এক দানবিক অট্টহাসির পৈশাচিক অট্টরোল ফেটে পড়ার আগে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে নৈঃশব্দ্য নিতলের অন্ধকূপে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে মাধবী? সে সাহসও হচ্ছে না। প্রতিবেশীরা যদি দলে দলে বেরিয়ে আসে? ওর নার্ভাসনেস দেখে অনুকম্পার চোখে তাকায়? সে যে ডাক্তার—ভয় পাওয়া তো তাকে সাজে না।

বিমুগ্ধ নয়নে পাহাড়ি গাঁয়ের দিকে চেয়ে থেকে বললে পরী—'এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে আমি কিন্তু যাচ্ছি না কোথাও। শান্তি...শুধু শান্তি!'

শান্তি? তা রয়েছে বটে। উপদ্রবের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। তবে কেন অনাহূতদের অস্তিত্ব টের পেয়ে এমন সিঁটিয়ে যাচ্ছে মাধবী? ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়? অতীন্দ্রীয় অতি-অনুভূতি বোধ? পাঁচটা ইন্দ্রিয়র বাইরের বিরাট জগৎ ওৎ পেতে থাকে অহোরাত্র—জীবজন্তুরা টের

পায়—মানুষ সবসময় টের পায় না—মাধবীর মনের মধ্যে সেই শক্তির অকস্মাৎ উদয় ঘটছে কেন?

বোগাস! ছায়া দেখে চমকে উঠছে মাধবী। অল ননসেন্স!

গাড়ির পেছনকার ট্রাঙ্ক খোলে মাধবী। তুলে আনে পরীর একটা বড় সুটকেস। তারপর আর একটা। দ্বিতীয় সুটকেসটা ধরে নামিয়ে নেয় পরী। হাত বাড়ায় ট্রাঙ্কের মধ্যে বইয়ের ব্যাগটার দিকে।

'বেশি বোঝা নিসনি। বারে বারে নিয়ে যাবি।'

বইয়ের ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে লন পেরিয়ে চলে আসে দুজনে পাথর দিয়ে বাঁধানো পথে। পথের শেষে গাড়িবারান্দা। ছায়া জমছে সেখানেও। যেন ছায়ার ফুল ফুটেছে। একে-একে পাপড়ি মেলে ধরছে।

সামনের দরজা খুলে ধরল মাধবী। পা ফেলল ভেতরে। হাঁক দিল —'বাসন্তী?'

জবাব নেই।

'বাসন্তী, আমরা এসে গেছি।'

আওয়াজ মিলিয়ে গেল বাড়ির মধ্যেই। ভেতরের নৈঃশব্দ্য টুক করে গিলে নিল চড়া গলার ডাককে।

হলঘরের শেষ প্রান্তে জ্বলছে একটা আলো। বাড়ির আর কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। আলোটা জ্বলছে রান্নাঘরে। দরজাটা দু'হাট করে খোলা।

হাতের সুটকেস মেঝেতে নামিয়ে রাখল মাধবী। সুইচ টিপে জ্বালল হলঘরের আলো। ডাকল—'বাসন্তী?'

'বাসন্তী কে দিদি?' হাতের বই-ব্যাগ আর সুটকেস মেঝেতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে পরী।

'বলতে পারিস আমার হাউস কীপার। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সবই করে। ও তো জানে এখন আমরা আসব। সাড়া দিচ্ছে না কেন? হয়তো রাতের রান্না নিয়ে মশগুল।'

'কানে কালা বোধহয়?'

'আরে না।'

'এখানেই থাকে?'

'হ্যাঁ। গ্যারেজের ওপরে মেজানিন ফ্লোরে,' কথা বলতে বলতে গাড়ির চাবি আর মানিব্যাগ ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেয় মাধবী। আয়না লাগানো দেওয়ালে সাঁটানো ছোট বাহারি টেবিলের ড্রয়ার। পেতলের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো আয়না।

দেখেই ভাল লাগে পরীর—'খুব বড়লোক তো তুমি। এমন সুন্দর আয়না—চব্বিশ ঘন্টা কাজের লোক—'

হাসে মাধবী—'তোর মাথা! বাসন্তীর জন্যে খরচ তো করতেই হবে—রুগি দেখব, না হাঁড়ি ঠেলব?'

'বাসন্তী বোধহয় ওর ঘরে রয়েছে—চলো যাই।'

'তাহলে রান্নাঘরের আলো জ্বলবে কেন? আগে চল রান্নাঘরে।'

হলঘর পেরতে থাকে মাধবী—পেছনে পরী।

এসে গেছে রান্নাঘর। বেশ বড়। সিলিং বেশ উঁচুতে। ঘরের মাঝখানে রান্নার জন্যে বড় টেবিল। চারটে ইলেকট্রিক বার্নার রয়েছে সেখানে, একটা গ্রীল, খানিকটা জায়গা কুটনো কাটা আর ময়দা মাখার জন্যে। মাথার ওপর থেকে ঝুলছে চকচকে স্টেনলেস স্টীলের ইউটিলিটি র‍্যাক। হাতা, চামচে, খুন্তি, বাটি, থালা—সবই লাগানো রয়েছে সেখানে—হাত বাড়ালেই যাতে পাওয়া যায়। টেবিল-কাউন্টারের ওপরটা সেরামিক টালি দিয়ে বাঁধানো। নিচের ক্যাবিনেটগুলো কালচে পালিশের কাঠ দিয়ে তৈরী। ঘরের শেষ প্রান্তে রয়েছে একজোড়া ওয়াটার বেসিন, একজোড়া গ্যাস উনুন, একটা মাইক্রোওয়েভ উনুন আর একটা রেফ্রিজারেটর।

ঘরে ঢুকেই বাঁয়ে মোড় নিয়েছিল মাধবী, এগিয়ে গেছিল দেওয়ালের গায়ে লাগানো ছোট্ট লেখবার টেবিলটার দিকে। এই টেবিলে বসেই খাবারের মেনু বানায় বাসন্তী, বাজারের ফর্দ তৈরী করে, হিসেব লেখে। বাইরে কোথাও গেলে, এইখানেই চিরকুট লিখে রেখে যায়—যাতে বাড়ি ফিরে মাধবী পড়ে নেয়। কিন্তু সেরকম চিরকুট নেই টেবিলে। ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে মাধবী, এমন সময়ে কানে ভেসে এল পরীর অস্ফুট চিৎকাব। জোরে নিঃশ্বাস নিয়েই থেমে গেল হঠাৎ।

পরী মাঝের রান্নার টেবিল ঘুরে এগিয়ে গেছিল ভেতর দিকে —টেবিলের শেষের দিকে। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে রেফ্রিজারেটরের পাশে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে, চেয়ে আছে মেঝের দিকে। বিস্ফারিত চাহনি নিবদ্ধ রয়েছে জোড়া বেসিনের মাঝে—তলার মেঝেতে।

দূর থেকে এইটুকু দেখেই আতঙ্ক ফেটে পড়ল মাধবীর অণু-পরমাণুতে। জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেছিল মাঝের বড় টেবিল ঘুরে পরীর দিকে।

মেঝেতে শুয়ে আছে বাসন্তী, চিৎ হয়ে। মারা গেছে। দু'চোখের পাতা পুরো খোলা, কিন্তু সে চোখে প্রাণ নেই। ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে ওপরের ঠোঁট আর নিচের ঠোঁট। চেপে বসেছে জিভের ওপর। ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে জিভ—তাতে গোলাপি ভাব নেই—বিবর্ণ।

চকিতে এই দৃশ্য দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল মাধবী। তাকিয়েছিল ছোট বোনের দিকে।

মাধবীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে পরীর ঘোর কেটে গেছিল। ডেডবডিব দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল দিদির দিকে।

মাধবী ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল টেবিলের অন্যদিকে—ডেডবডি যেখান থেকে দেখা যায় না। বসাল টেবিলের সামনের চেয়ারে।

আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসে পরীর দুই ঠোঁট। এতক্ষণ ছিল শক্ত। বললে—'ওই কি বাসন্তী?'

'হ্যাঁ।'

'কি রকম চেয়ে রয়েছে বলো? ফোলা সমস্ত শরীর...কালসিটে সারা গায়ে মুখে... চাউনিটা কী ভীষণ... অত কালসিটে কেন, দিদি?'

'বেশ কয়েকদিন মড়া পড়ে থাকলে অমন তো হবেই।'

'পচা গন্ধ তো নেই।'

ভুরু কুঁচকে যায় মাধবীর। দিন কয়েক আগে মারা গেলে শরীর কালচে মেরে যেতে পারে, ফুলেও উঠতে পারে—পচা গন্ধ তো থাকা উচিত।

ফের বলে পরী—'মুখের ভাব অমন বিকট কেন? চাউনি অমন কেন? দেখছে কাকে?'

কি বলবে মাধবী?

পরীই বলে গেল—'চেচিয়ে উঠেছিল বাসন্তী—মবে গেছে চেচানি শেষ হবার আগেই।'

না, এরকম মড়া মাধবী লাহা কক্ষনো দেখেনি। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একদৃষ্টে চেয়েছিল মাধবী। চেনা মানুষেব ডেডবডি এত বিকৃত হলে মনের মধ্যে কষ্ট তো জাগবেই।

গোটা মুখখানা ফুলে গেছে। ফুলে উঠেছে শরীরটাও। বাসি মড়া ফুলে ওঠে ঠিকই, কিন্তু সেই ফোলা আর এই ফোলায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। তার চেয়েও বড় কথা, বাসি মড়ার পাশে বসলে নাকে দুর্গন্ধ ভেসে আসবেই। বাসন্তীর মড়া থেকে কোনও বাজে গন্ধ বেরুচ্ছে না।

আরও খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে মাধবী দেখল, কালচে আর ফেটে-ফেটে যাওয়া চামড়ার এহেন অবস্থা তো টিস্যু পচন থেকে হয়নি। পচন যদি শুরু হয়ে থাকে, তাহলে তার জেব এখনও চলা উচিত। অথচ এত ঠাহর করেও সেবকম কোনও লক্ষণ মাধবীর চোখে ধরা পড়ছে না। ফোস্কা নেই, ফুসকুড়ি নেই, গলে যাওয়া নেই, ক্ষত নেই। রস পর্যন্ত গড়াচ্ছে না। শরীরে পচন ধরলে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে চোখে—কেননা শরীরের অন্য টিস্যুদের চেয়ে অনেক নরম টিস্যু দিয়ে তৈরী হয় চোখ। কিন্তু বাসন্তীর চোখ তো চমৎকার বয়েছে। পচনেব চিহ্নমাত্র নেই।চোখের মণিদুটোও পরিস্কার। ঘোলাটে ভাব দেখাই যাচ্ছে না—মৃত্যুর পর যে রকম দেখা যায়।

ওই চোখ যখন জীবন্ত ছিল, তখন সেখানে অষ্টপ্রহর খুশির জোনাকি নেচে নেচে বেড়াত। আর ভাসত মমতা। বয়সে বাষট্টি হতে পারে, মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে যেতে পারে—তবুও মুখখানা ভারি মিষ্টি ছিল বাসন্তীর। ঠাকুমা-দিদিমাদের মতন মায়া-মমতায় ভরা স্নিগ্ধ শীতল। কখনও নরম, কখনও শক্ত গলায় শাসন করে গেছে মাধবীকে—যেন দু নাতনি। কথার টানে নেপালি ছোয়া থাকত—কিন্তু বাঙালিয়ানা ছিল বেশির ভাগ। গান গাইত বড় মিষ্টি গলায়। রান্না করতে করতে গান, বেসিন ধুতে ধুতে গান—গান ছাড়া বুড়ির জীবনে যেন আর কিছুই ছিলনা। সেই গান এ বাড়িতে আর শোনা যাবে না।

মাধবী যতই চায় ততই মনে হয়, চামড়া যেন থেৎলে গেছে। সারা গায়ে বুঝি কালসিটে ছড়িয়ে পড়েছে। কালো কোথাও নীল, কোথাও কালচে হলদে—কোথাও একটা রঙের

ওপর আর একটা চেপে বসেছে। চামড়াকে ভয়ানক ভাবে থেৎলানো না হলে এরকম রঙ ফুটে উঠবে না। কিন্তু থেঁৎলানি তো শরীরের এক-আধটা জায়গায় থাকা উচিত—শরীরময় এরকম থেৎলানি যে একেবারেই নতুন ঘটনা। চামড়ার এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ নেই। প্রতি বর্গ ইঞ্চি চামড়াকে থেঁৎলে পিটিয়ে ঘা দিয়ে কালসিটে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

মুখের প্রতি সেন্টিমিটারেও সেই থেঁৎলানির চিহ্ন। নোড়া দিয়ে যেন ধরে ধরে পেটানো মুখের সমস্ত চামড়া —এতটুকুও ফাঁক রাখা হয়নি কোথাও। ভাঙচোর নেই কোনোওখানে —গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট ঘটলে যেমন দেখা যায়—এই রকম কালসিটে মেরে যায় গোটা মুখ—কিন্তু হাড়গোড় তো আস্ত থাকে না—যা রয়েছে এই মুখে —নাক চিবুক ঠোঁট চোয়াল—সবই রয়েছে আস্ত।

মেপে মেপে পিটিয়ে গেলে এইরকম কালসিটে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

আর একভাবে এই কালসিটে দেখা দিতে পারে। গোটা শরীরটাও বিরঙ হয়ে যেতে পারে। চাপটা যদি আসে শরীরের ভেতর থেকে। চামড়ার ঠিক নিচেই যে টিস্যু রয়েছে, সেই টিস্যু ফুলে উঠলে চামড়ার রঙ এইভাবে পালটে যেতে পারে। কিন্তু আপাদমস্তক এইরকম নিখুত থেঁৎলানি। আর কালসিটের ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হলে ফোলানিটা হওয়া উচিত আচমকা—ভয়ানকবেগে —অবিশ্বাস্য জোরে যদি না হয়, চামড়ার সেরকম চাপ পড়বে না—কালসিটে আর থেঁৎলানি জাগানোর মতন চাপ সৃষ্টি হবে না।

কিন্তু তা কি সম্ভব? না, কক্ষনো না।

শরীর কখনও দুম করে ফুলে বেলুন হতে পারে না—চামড়ায় অ্যাকসিডেন্টের এফেক্ট ফেলতে পারে না। জীবন্ত টিস্যু কখনোই এত বেগে হু-উ-উ-স করে ফুলে ওঠে না। কিছু কিছু অ্যালার্জি কেসে হঠাৎ ফুলুনি বিচিত্র নয়—সবচেয়ে প্রকট ঘটনাটা দেখা গেছে পেনিসিলিনে যাদের অ্যালার্জি আছে, তাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এমন কোনও কারণের সন্ধান আজও পায়নি মাধবী যা মানুষের শরীরকে ধাঁ করে ফুলিয়ে তুলতে পারে—চক্ষের নিমেষে শরীরময় কুৎসিত কদাকার কালসিটের ছাপ মেরে যেতে পারে... প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার চামড়াকে থেঁৎলে দিতে পারে...

গোটা শরীরটার এইভাবে ফুলে ওঠাকে ময়না-তদন্ত স্ফীতি বলেও চালিয়ে দেওয়া যায় না। এরকম স্ফীতি অবশ্য কালেভদ্রে দেখা যায়—তখন তাকে ক্লাসিক কেস বলা যায়।

কিন্তু এ-কেস সে-কেস নয়; এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই মাধবীর মনে।

থেঁৎলানির জন্যেও যদি বা হয়, শরীর ফুলবে কেন? প্রথম খটকা তো সেইখানেই।

তাহলে কি বিষ প্রয়োগ? খুবই বিরল বিশুদ্ধ বিজাতীয় বিষ না হলে তো এমন কাণ্ড সম্ভব নয়। বিষবিজ্ঞানে আজও এমন বিষের কথা লেখা হয়েছে বলে মাধবীর মনে হয় না। তার চাইতেও বড় কথা, আশ্চর্য এই বিষের সান্নিধ্যে এল কি করে বাসন্তী? বিষ ওর শরীরে ঢুকল কি করে? বাসন্তীর তো কোনও শত্রু নেই।

বিষ নয়, বিষ নয়—অন্য কিছু।

অশরীরী নয়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমার বন্ধু পার্থ বিয়ের পর বউকে নিয়ে হনিমুনে গেল প্রতাপগড়। হাওড়া স্টেশনে তাদের তুলে দিয়ে এলুম। খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল দুজনকেই।

দিন পনের ষোল পরে তারা ফিরল। পার্থর চিঠি পেয়ে স্টেশনে আমি ছিলুম। তখন দেখলুম দুজনেই কেমন গম্ভীর আর অন্যমনস্ক। ট্যাকসি চেপে বাড়ি পৌঁছনর মধ্যে টেব পেয়ে গেলুম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা কিছু ঘটে গেছে।

দেখে শুনে খোঁজখবর নিয়ে নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করেছিল পার্থ। তার বউ মীনাক্ষী সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ও শিক্ষিতা। মীনাক্ষীরও পছন্দ হয়েছিল পার্থকে। দুপক্ষেরই মাথার ওপর অভিভাবক নেই। তাই নিজেরাই সব ম্যানেজ করে নিয়েছিল।

বিয়ের পর যতটুকু দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে, দুজনের মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য দেখেছিলুম। নিঃসন্দেহে ওদের সুখী দম্পতির তালিকার ফেলতে পেরেছিলুম।

কিন্তু হনিমুন থেকে ফিরে ওদের মধ্যে উল্টোপাল্টা দেখলুম সব? দু'জনেই যেন প্রচণ্ড

ঝড়ঝাপটা খেয়ে কেমন যেন কাকতাড়ুয়া হয়ে পড়েছে, মুখেও সে লালিত্য আর হাসি নেই। ভীষণ ক্লান্ত। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। পরস্পর নিতান্ত দরকার ছাড়া কথা বলছে না। ওদের ফ্লাটে অল্প কিছুক্ষণ বসে অস্বস্তি নিয়ে ফিরে এলুম।

কদিন পরে এক রোববার পার্থর ফ্লাটে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেলুম। বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলুম, তাই। গিয়ে দেখি, পার্থ একা চুপচাপ বসে আছে। মীনাক্ষী নেই। পার্থ বলল, আয় বোস। না এলে আমি যেতুম আজ।

বসে বললুম, তোর শরীর খারাপ নাকি?

পার্থ শুকনো হেসে বলল, কেন? বেশ তো আছি।

শুনেছি প্রতাপগড় ভারি স্বাস্থ্যকর জায়গা। সবাই সেখানে যায় স্বাস্থ্য ফেরাতে!...হাসতে হাসতে।. .আর তুই ফিরলি অস্বাস্থ্য নিয়ে। কী রে!

পার্থ গম্ভীর মুখে সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, ও কিছু না! একটু ইনসমনিয়ালতো হচ্ছে। ঠাণ্ডা ধরিয়ে ফেলে ছিলুম। তার ওপর পেটের গোলমাল।

তোর বউ কোথায়?

মীনু বেরিয়েছে।

তুই গেলিনে যে?

পার্থ মুখ তুলে আবার কেমন হাসল।..এমনি। কিছু ভাল লাগে না।

ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড়,মেরে বললুম, ওরে আমার চাঁদু। কিছু ভাল্লাগে না? বিয়ের পর তো মনে হচ্ছিল বউ-এর আঁচলের গিট খুলতে পারছিলে না। প্রতাপগড়ে গিয়ে গিট খুলে ফেললে যে! ব্যাপার কি? কী হয়েছে বলতে আপত্তি আছে?

পার্থ আমার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টে তাকাল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, তুই ঠিকই ধবেছিস। একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে! কিন্তু ঠিক কি ঘটেছে' আমার পক্ষে স্পষ্ট বলা কঠিন। তারপর সে একহাতে চুল আঁকড়ে ধরে মুখ নামাল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, প্রতাপগড না গেলে হয়তো ভালই করতুম। মীনু আমাকে ওখানে যেতে বারণ করেছিল। কান দিইনি।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললুম,পার্থ! আপত্তি না থাকলে বলতে পারিস আমাকে। সত্যি বলতে কি, একটা কিছু হয়েছে তোদের মধ্যে—এটা ধরে নিয়েই আজ তোর কাছে এসেছি।

পার্থ বলল, তোর কাছে আমার জীবনের তো কোন কিছুই গোপন নেই। তোকে বলতে আপত্তি থাকবে কেন? কিন্তু এই ব্যাপারটা তুই বিশ্বাসই করবিনে। হেসে উড়িয়ে দিবি। তাই বলতে আমার ইচ্ছে করছে না।

দ্যাখ্ পার্থ আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তোর কিছু যায় আসে না। কারণ, ব্যাপারটা তোদের নিজস্ব। ...আমি তীব্র কৌতূহলে অস্থির হয়ে বললুম। ...বরং আমার মনে হয়, তুই সবটা বললে তোর নিজেরই মনটা হাল্কা লাগবে। তুই বল।

পার্থ উঠে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করে এল। তারপর পা ছড়িয়ে

সোফায় বসল। আবার সিগ্রেট ধরাল একটা। তারপর বলতে শুরু করল।..

প্রতাপগড়ে পাহাড় যেমন আছে, জঙ্গলও রয়েছে, আর আছে নদী। প্রকৃতি যেন নিজের হাতে চমৎকার করে সাজিয়ে রেখেছে জায়গাটা। আশেপাশে দুচারটা কলকারখানা ব্রিটিশ আমল থেকেই আছে। আজকাল সেগুলো কেন্দ্র কেরে নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু আদি প্রতাপগড় এখন শান্ত নির্জন আর সুন্দর। কারণ নদী পাহাড় অরণ্যের সীমানায় যেসব ঘরবাড়ি—তা বড়োলোকের সম্পত্তি, বাংলা-বিহারের রাজ-রাজারা আর ব্যবসায়ীদের মরসুমী আড্ডা। একটা পাবলিক স্বাস্থ্যনিবাসও আছে ওদিকটায়। আর নদীর ধারে যে বাংলো বাড়ি, তার মালিক পার্থর চেনাজানা এক বাঙালী ভদ্রলোকের। তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন—তাঁর ছেলে এখন ওটার মালিক। বাবা সুবাদে পার্থর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল কয়েক মাস আগে। বিয়ের পর পার্থ হনিমুন কাটানোর জন্যে প্রতাপগড়ের ওই সুন্দর বাড়িটাই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল। মীনাক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে সেই নতুন মালিকের কাছে গিয়েছিল—বাড়িটা যাতে ওরা কিছুদিনের জন্য পায়। অবশ্য ভাড়া দিয়েই নিতে চেয়েছিল।

অভ্র—বাড়ির নতুন মালিক সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু ভাড়া নিতে চায়নি। তাদের নাকি নানান জায়গায় অমন অনেক বাড়ি আছে! পাহাড় জঙ্গল এলাকায় এই রকম সুন্দর ছোটখাটো বাংলো করে রাখা তাব বাবার অভ্যাস ছিল। সেগুলো কখনো কাকেও ভাড়াব বিনিময়ে দেওয়া হয়নি বা এখনও হয় না। পার্থ যদ্দিন খুশি প্রতাপগড়ের বাড়িতে কাটাতে পারে। তবে একটা কথা—

প্রতাপগড়ের বাড়িটা নিয়ে কিছুদিন থেকে একটা বাজে গুজব রটানো হয়েছে। বাড়িটা নাকি ভুতুড়ে! আসলে এ গুজব রটিয়েছে ওখানকারই কিছু লোক—অভ্রর বাবার কাছে তারা বাড়িটা কিনতে চেয়েছিল, পায়নি তাই। কতবার অভ্র একা বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে, কোনো ব্যাপার দেখেনি বা ভূতের নাম গন্ধও টের পায়নি। তাছাড়াও আরও কতজনে গিয়ে থেকেছে! কেউ কিছু দেখেনি।

এখন পার্থ খুশি। সে গিয়ে ওখানেই থাকলে বরং সেইসব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের মুখে চুনকালি পড়বে। অভ্র তাই সমস্ত বাড়িটা খালি রাখতে চায় না।

শুনে মীনাক্ষী কিন্তু আপত্তি করেছিল। পার্থ ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী কবে নেয়! মামাকে যাবার আগে ব্যাপারটা একটুও বলেনি, তাব কারণ—বলা যায় না, আমি যদি আবার ভূত-প্রেতের ভয়টা মীনাক্ষীর মনে আরও চাঙ্গা করে দিই। আসলে, সত্যি বলতে কি— পার্থর ধারণা ঠিকই। আমি ভূতের ব্যাপারে ভারি গোঁড়া আর বিশ্বাসী। আত্মা যদি থাকে, ভূত-প্রেত নিশ্চয়ই আছে— এ আমার ধারণা! ছাত্র জীবনে নাস্তিক, পার্থর সঙ্গে এ নিয়ে কি কম তর্কা-তর্কি হত?

যাই হোক, দুজনে তো প্রতাপগড়ে গিয়ে পৌঁছল। জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মীনাক্ষী কিন্তু এত মুগ্ধ হয়ে পড়ল যে আব ভূতপ্রেতের খুঁতখুতানি ওর মন থেকে দূরে চলে

গেল। বাড়ি দেখাশোনা যে করে, তাকে আগে থাকতে অভ্র চিঠি দিয়ে রেখেছিল। সে থাকে কারখানাগুলোর কাছাকাছি। ঠিক সময় এসে বাড়ি গোছগাছ করে রেখে অপেক্ষা করছিল পার্থদের জন্য। লোকটা বাঙালী—মোটামুটি লেখাপড়া জানে—জাতে বামুন। অতিথিদের জন্যে রান্নাবান্না সেই করে দেয়। কাজকর্মের ঝি বা লোকজন দরকার হলে তাও নিয়ে আসে। এসবের জন্য তাকে অবশ্য পয়সাকড়ি দিতে হয়। ওর নাম হারাধন। হারাধন জানাল যে এসব করে গড়ে তার মাসে একশোর বেশি উপরি রোজগার হয়।

মীনাক্ষীর আনন্দে খুঁত পড়ার ভয়ে হারাধনকে ভূত সম্পর্কে কোন কথাই জিজ্ঞেস করল না। হারাধনও অবশ্য নিজে থেকে কিছু বলল না। সে টাকা নিয়ে বাজার চলে গেল। ফেরার সময় একটি মেয়েকে নিয়ে এল। হারাধনেরই মেয়ে। বছর উনিশ-কুড়ি বয়স। শ্যামলা রঙ, চেহারায় মোটামুটি শ্রী আছে, স্বাস্থ্যে একটা উদ্ধতলালিত আছে। মেয়েটির নাম মঞ্জু। মীনাক্ষী জেরা করে জেনে নিল, মঞ্জু। মঞ্জুর বিয়ে হয়েছিল এখানেই— স্বামী একটা কারখানায় চাকরী করত। দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বিধবা মঞ্জু বাবার কাজে সাহায্য করে। আরও সব ভাইবোন আছে ওর, মা আছে—চলে যায় কোনরকমে। এ বাড়িতে যে-সব বাবুরা আসেন, তাদের সেবাযত্ন টুকিটাকি কাজকর্ম বাবার পাশে থেকে সেও করে। বখশিশ পায়।

পার্থ আরও আশ্বস্ত হল এইসব ব্যবস্থা দেখে। সে নিজে যেমন মীনাক্ষীও তেমনি একটু অলস প্রকৃতির। নিজের হাতে বিছানা গোছাতেও কষ্ট হয়, মঞ্জুকে পেয়ে ওরা খুশি হল।

প্রথম কয়েকটা দিন বেশ প্রাণচাঞ্চল্যে কেটে গেল। দিনে ঘোরাঘুরি, রাতে গভীর ঘুম। না— কোন ভূতপ্রেত, কোন রহস্যময় ব্যাপার কিছু ছিল না। হারাধন রাত্রে কিচেনের বারান্দায় খাটিয়া পেতে ঘুমায়। মঞ্জু সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরে যায়। আবার ভোর ছটার মধ্যে চলে আসে। বেডটি নিয়ে দরজা নক করে।

পার্থর মন ভরে গিয়েছিল স্বর্গের স্বাদে। মীনাক্ষীরও। জানালা দিয়ে সকালের পাহাড় আর নদী—নদীর ওপারে সবুজ অরণ্য দেখতে দেখতে ওরা বেডটি খেত। কোন কোন দিন বা রাতে বৃষ্টি হতো অঝোর ধারায়। নির্জন ঘরে ওরা স্বামী স্ত্রী প্রেমভালবাসার, অপার্থিব সুখে আপ্লুত হয়ে উঠত।

তখনও কোন অশুভ আত্মার রহস্যময় পদসঞ্চার ঘটেনি।...

হঠাৎ একরাতে ঘুম ভেঙে গেল পার্থর। ঘড়ি দেখল, রাত তিনটে। টেবিলল্যাম্প জ্বালল। কেন ঘুম ভাঙল খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ল, জেগে ওঠার পর কয়েক সেকেণ্ড বাইরে যেন কি একটা শব্দ শুনেছিল। পাশে মীনাক্ষী কাৎ হয়ে অন্য দিকে ঘুরে ঘুমোচ্ছে। মীনাক্ষী কি? কিন্তু মীনাক্ষী একা এতরাত্রে দরজা খুলে বাইরে বেরোবে—এটা অবিশ্বাস্য।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগল তার। কিন্তু মীনাক্ষীকে ঘুম থেকে ওঠাল না। ভাবল সকালে জেনে নেবে।

সকালে মীনাক্ষীকে কথাটা বলতেই মীনাক্ষী আকাশ থেকে পড়ল। অসম্ভব। সে শোয়ার পর একবারও ওঠেনি। গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছে সারা রাত। সে বলল সম্ভবত রাতে শোয়ার আগে হারাধন জলের গ্লাস আনতে জল পড়েছিল মেঝেয়— তার ওপর পা ফেলে হেঁটেছে সেই দাগ।

তবু মনে কেমন খুঁতখুতোনি থেকে গেল পার্থর। পরের রাতটা আর কিছু ঘটল না। কিন্তু তার পরের রাতে অদ্ভুত কাণ্ড হল।

কী শব্দে ঘুম ভেঙে গেল পার্থর। সে টেবিলল্যাম্প জ্বালাল। দেখল যথারীতি পাশে মীনাক্ষী ঘুমোচ্ছে। একটি মিষ্টি সুগন্ধ টের পেল পার্থ। শরতকাল তখন বৃষ্টি হচ্ছে। তার ওপর জায়গাটা সমুদ্রতটের হিসেবে খানিকটা ঠাণ্ডা পড়ে। মীনাক্ষী আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। পার্থরও শীত করছিল এখন। কিন্তু মীনাক্ষী যে বেডকভারটায় গা ঢেকেছে, সেটা ছোট। টানাটানি করতে যাওয়ার মানে হয় না। সে উঠে বসে সিগ্রেট ধরাল। তারপর মনে পড়ল, আজ তার ঘুম ভেঙেছে কী একটা শব্দে— সেটা বাইরের কোন আওয়াজ নয়— খুব কাছের। ঘুমটা চলে গেছে বুঝতে পারছিল সে। উঠে বাইরে বেরোল। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের ফিকে জ্যোৎস্না। আকাশ পরিষ্কার। বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সামনের লনে নামল। সেই সময় হঠাৎ তার কানে অস্পষ্ট দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল। সে চমকে উঠল।

এই বাংলোবাড়িটায় মোটমাট ছখানা ঘর! চিকেন আর স্টোর সমেত। তারা যে ঘরে থাকে, সেটা একেবারে শেষ প্রান্তে। পশ্চিম আর দক্ষিণে এই ঘরের লাগোয়া আর তিনটে ঘর রয়েছে। বারান্দায় উঠে বাঁহাতি ঘরটা ড্রইং রুম তার ওপাশে আরো দুটো এক সারিতে বড়ো ঘর। শোয়ার ব্যবস্থা আছে দুটোতেই। তাদের ঘর থেকে সব ঘরেই পরপর যাওয়া যায়। প্রত্যেক দরজায় সুদৃশ্য দামী পর্দা আছে।

ভূতের ভয় আছে নাকি এই বাড়িটায! তখন সে মুহূর্তে পার্থর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। কিন্তু সে সাহসী আর বেপরোয়া বরাবর। বারান্দায় সতর্কভাবে উঠে ড্রইং রুমটার দরজায় এসে কান পাতল, অবাক হল ভিতবের কোন ঘরে অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে।

তারপর যেন দেশলাই জ্বালার শব্দ শুনল সে। জানালা বন্ধ। কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে দ্রুত ফিরে এল নিজের ঘরে। মীনাক্ষী একই ভঙ্গীতে ঘুমোচ্ছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে ভাবতে থাকল ব্যাপারটা। একবার মনে হল, হারাধনকে ডাকবে নাকি। পরে ভাবল, তাহলে কি কেউ রাত্রে এসেছে এখানে— অভ্রবাবুর কোন লোক? ..

সকালে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল ভূতটুত বাজে কথা। সত্যি গতরাত্রে একজন এসেছে— অন্যঘরে কাটিয়েছে, এবং সে লোকটি আর কেউ নয়, স্বয়ং অভ্র।

খুব হাসাহাসি সে নিয়ে। অভ্র অতরাতে আর বিরক্ত করতে চায়নি ওদের। হঠাৎ একটা কাজে এসে পড়েছে। কদিন থাকবে।

পরের রাতে আবার ঘুম ভেঙে গেল পার্থর। ঠিক একটি সময়ে— একই ধরনের শব্দই। মীনাক্ষী যথারীতি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। পার্থ সিগ্রেট জ্বেলে বাইবে এল। তখন সবে একটুখানি জ্যোৎস্না ফুটেছে। সে বাড়ির পশ্চিমে বাগানটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। বেদী বাঁধানো সাদা পাথরের পরীমূর্তির নীচে কারা দুজন বসে আছে যেন।

পার্থ চুপিচুপি এগোল বাড়ির ছায়ায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে। বড়োজোর বিশ বাইশ হাত তফাতে ওরা বসে আছে। এবং তখনি ভীষণ চমকাল পার্থ। অভ্র বসে রয়েছে— তাব পাশে একটি মেয়ে। মেয়েটি যেন মীনাক্ষীই; জ্যোৎস্না যেটুকু আছে তাতেই স্পষ্ট টের পেল— ও মীনাক্ষী ছাড়া কেউ নয়।

সে কি চোখে ভুল দেখছে? হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের আড়ালে গেল সে। নাঃ চোখের ভুল নয়— মীনাক্ষীই!

কী করবে ভেবে পেল না সে। সারা শরীর নিঃসাড় হয়ে পড়ল, তাব মাথা ঘুরতে থাকলো। আশ্চর্য তার স্ত্রী মীনাক্ষীর সঙ্গে এঁই অভ্রর গোপন প্রণয় আছে। একটুও টের পায়নি।

হতবুদ্ধি হয়ে সে বসে রইলো কতক্ষণ। তারপর দেখল ওরা দুজনে উঠেছে। পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকবে সম্ভবত। পার্থ মুহূর্তে ঠিক করল, নিজের ঘরে গিয়ে মীনাক্ষীকে অপ্রস্তুত কবে দেবে এবং সোজা চার্জ করবে। তার ধারণা হল, মীনাক্ষী পার্থর ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে অভ্রর কাছে চলে গিয়েছিল পাশের দরজা দিয়ে। এখন নিশ্চয় বিছানা খালি দেখতে পাবে সে।

পার্থ বাড়ি ঘুরে বেরিয়ে বারান্দায় এল। তারপর দরজাব পর্দা তুলে অবাক হয়ে দেখল মীনাক্ষী তো তেমনি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাহলে?

অবাক হতবুদ্ধি হয়ে সে বেরল। অভ্রর সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল, সে কে তাহলে? পাথরেব বেদীর কাছে গিয়ে সে দেখল বাড়ির পিছন দিকের ঘরের দরজার সামনে দুটিতে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই সময় অভ্র দেশলাই জ্বেলে সিগ্রেট ধরাল। এবার দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলোয মেয়েটির মুখ দেখতে পেল পার্থ। হ্যাঁ মীনাক্ষীই তো বটে। এতটুকু ভুল নেই।

পার্থ তখন হাবাগোবা হয়ে গেছে পুরো। ব্যাপারটা স্বপ্নের ঘোরে দেখছে না তো? আর স্থির থাকতে না পেরেসে এক লাফে প্রকাশ্যে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ডাকল মীনাক্ষী।

অমনি দুজনে সাঁৎ করে ভিতরে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। তখন পার্থ আবার বাড়ির দক্ষিণ ঘুরে ঘরে পৌঁছল। দেখল মীনাক্ষী তখনও ঠিক একই ভঙ্গীতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সে তাকে ঠেলে ঘুম ভাঙ্গতে চেষ্টা করল। অনেক ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙল মীনাক্ষীর। চাঁদর সরিয়ে বলল, কী হল? হ্যাঁ এও তো মীনাক্ষী।

পার্থ সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে এবার বলল, তাহলে দ্যাখ কী উদ্ভট সমস্যায় পড়ে গেছি। আমি স্পষ্ট দেখছি মীনাক্ষী অভ্রর সঙ্গে কথা বলছে। এদিকে মীনাক্ষী কিন্তু যথাবীতি বিছানায়

শুয়ে আছে। এটা কী করে হয়?

আমি বললুম আচ্ছা পার্থ, তুই চাদর তুলে দেখেছিলি কী?

পার্থ, বলল না। কিন্তু চাদরের ফাঁকে মাথায় সেই একই চুল, একই গন্ধ। নিজের বউকে ভুল করব?

বললুম, তাহলে হ্যালুসিনেসন। বউকে বেশি ভালবাসিস কি না।

পার্থ গুম হয়ে বসে রইল। একটু পরে আমি চলে এলুম। যা হবার তার তো হয়েই গেছে— মাঝখানে আমি কেন স্বামী স্ত্রীর ওই নিষ্ঠুর সমস্যায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। পার্থটা বোকা। আমি ওকে বলতে চেয়েছিলুম, বিছানায় যে মেয়েটি মীনাক্ষী চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল সে হারাধনের মেয়ে মঞ্জু— তা বলতে পারলুম না। ওদের ভাগ্য ওরা নিজেরা সামলে নিক।

চেনাশোনা ভূত

রবিদাস সাহারায়

হাবুল নন্দী এক্সপেবিমেন্ট মাস্টাব। সে বেড়ালেব বাচ্চাকে কুকুবেব ডাক এবং কুকুবেব বাচ্চাকে বেড়ালেব ডাক শেখাবার জন্য বেশ কিছুদিন ধবে গবেষণা কবে আসছে. তাব যুক্তিও খুব জোবালো। মানবশিশুরা ছোটবেলা থেকে যে পবিবেশে থাকে সেই ভাষাই তাবা শিখে নেয়। তারা তো আর মাতৃভাষা শিখে জন্মায না। যে ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে তারা থাকে সে ভাষাই হয় তাদের কথ্য ভাষা। কাজেই জন্মেব পরই যদি কুকুরেব বাচ্চা বেড়ালের বাচ্চার সঙ্গে থাকে তবে বেড়ালের ডাকই সে ডাকতে শিখবে। বেড়ালেব বাচ্চা কুকুবেব সঙ্গে থাকলে শিখবে কুকুরের ডাক।

দুঃখের বিষয়, এই গবেষণায় সে সফল হতে পারেনি। কারণ দেখা গেছে কুকুবছানা আর বিড়ালছানা তাদের বিপরীত ভাষা শেখবার আগেই আশ্চর্যজনক ভাবে অদৃশ্য হযেছে।

শাগরেদ গদাইকে হাবুল বলল, তুই একটা হোপলেস। কোনো বহস্যেব সমাধানই তোকে দিয়ে হয় না। তাই এমন একখানা এক্সপেবিমেন্টও বানচাল হযে গেল।

গদাই বলল, হাবুলদা, কুকুর বেড়াল নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একটা তোতাপাখি নিয়ে মাথা ঘামালে এতদিনে মানুষের মতো কথা বলতে শিখে যেত। আমাদেরও বাণিজ্য হয়ে যেত কিছু।

—কি রকম?

—তোতাপাখির কথা শুনিয়ে লোককে অবাক করে দেওয়া যেত। পয়সা আদায় হতো লোকের কাছ থেকে। কথা-বলা পুতুল দিয়ে লোকে টাকা রোজগার করছে না?

—দূর, ওসব তো পুরনো হয়ে গেছে। নতুন কিছু চাই।

—নতুন কিছু? হ্যাঁ, আমার মাথায় একটা গ্রান্ড আইডিয়া এসেছে।

—কি আইডিয়া?

—ফটিক নাকি সেদিন কলকাতা গিয়ে মাসি সরকারের ম্যাজিক দেখে এসেছিল।

—মাসি সরকার! বলিস কিরে!

—হ্যাঁ, ঐ রকমই একটা নাম।

—মাসি সরকার নয়, পি সি সরকার।

—ঐ মাসি পিসি একই হলো। তিনি নাকি অদ্ভুত ম্যাজিক দেখান। ভূতের সঙ্গে কথা বলেন। ফটিক সেই ম্যাজিক দেখে এসে তার বন্ধু গালটুকে বলেছে। গালটু বলেছে, তার এক মামাও নাকি ভূতের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

—তাই নাকি? তা হলে আমরাও ভূত নিয়েই গবেষণা করব। গালটুর মামাকে খুঁজে বের কর।

ফটিককে ধরে গালটুর মারফত আলাপ হয়ে গেল তার মামার সঙ্গে। নিজের মামা নয়, পাতানো মামা। অদ্ভুত চেহারা। বয়স কত কে জানে? তোবড়ানো গাল, কপালে একটা আব। নাম তুবড়িলাল। সে নাকি ভূতের ওঝা।

হাবুল তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি সত্যি ভূতের সঙ্গে কথা বলেন?

তুবড়িলাল জবাব দিল, হ্যাঁ, সত্যি বৈকি। বিপাকে পড়লে ভূত বাবাজী নিজেই বলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। আমি তখন বলি, তুই সাতটা গ্রাম পেরিয়ে চলে যা। ভূত তাতেই রাজী হয়। আমি তখন তাকে ছেড়ে দেই।

গদাই জিজ্ঞেস কবল, আপনি তাহলে ভূত ধরতেও জানেন?

তুবড়িলাল জবাব দিল, হ্যাঁ, তাও জানি। ভূত ধরার একটা যন্ত্রও আমার কাছে আছে।

হাবুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বলেন কি?

—হ্যাঁ। তবে সবসময় ঐ যন্ত্রটা ব্যবহার করি না। খুব দরকার বুঝলে ভূতকে ধরে ঐ যন্ত্রে পুরে রাখি। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পাবি কেমন ভূত। ভাল ভূত হলে ছেড়ে দিই। তাকে দিয়ে অনেক কাজকর্মও করাই। সে খুব অনুগত হয়ে যায়। আর খারাপ ভূত হলে এমন দূরে চালান কবে দিয়ে আসি যাতে ভূত বাবাজী আর ঐ এলাকায় ফিরে আসতে না পাবে।

গদাই বলল, কিন্তু ভূতকে কি আর ওভাবে তাড়ানো যায়? ওরা নাকি হাওয়ায় উড়ে চলে আসতে পারে?

তুবড়িলাল বলল, যাতে না আসতে পারে তার কৌশলও জানি। ভূতকে ছাড়ার পর এমন মন্ত্র আওড়াবো যে ওর ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

এত সব কথা শোনার পর হাবুলের বিশ্বাস হলো লোকটা খুবই গুণী। তাই সে বলল, আমাকে ঐ রকম একটা যন্ত্র যোগাড় করে দেবেন?

তুবড়িলাল বলল, আমার যন্ত্রটাই বেচে দেবো। আমি ছেড়ে দিচ্ছি ভূত তাড়ানোর কাজ। অনেক ভূত তাড়িয়েছি। কত ভূতকে দিয়ে কত কাজও করিয়েছি। আর ভাল্লাগে না।

গদাই জিজ্ঞেস করল, কি রকম কাজ করিয়েছেন ভূতকে দিয়ে?

তুবড়িলাল জবাব দিল, সে ওদের মেজাজ বুঝে করিয়ে নিতে হয়। কোনো পরিশ্রমের কাজ করার সময় ওরা সাহায্য করলে খুব সহজেই তা করা যায়। অথচ তুমি বুঝতেও পারবে না তোমার সঙ্গে ভূত কাজ করছে।

তুবড়িলালের কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল হাবুলের মন। সে ভাবল, যে ভাবেই হোক যন্ত্রটাকে হাতাতে হবে। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। তাই সে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কত টাকা হলে বেচবেন?

তুবড়িলাল উল্টে প্রশ্ন করল, তুমি কত টাকা দিতে পারবে?

হাবুল ভেবে দেখল, তার কাছে বিশ-পঁচিশ টাকার বেশি নেই। এত কম টাকায় দিতে রাজী হবে কি তুবড়িলাল? অবশেষে গদাই রফা করল ত্রিশ টাকায়। হাবুলের পঁচিশ আর গদাই বাড়ির লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে পাঁচ টাকার মতো দিতে পারবে। আশ্চর্য, তাতেই রাজী হয়ে গেল তুবড়িলাল।

পুরনো দিনের একটা কাঠের মহাজনী বাক্সকে রঙ করে তৈরি করা হয়েছে ভূত ধরার যন্ত্র। সেটাই তুবড়িলাল এনে হাজির করল। ত্রিশ টাকা কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিয়ে শিখিয়ে দিল ভূত ধরার মন্ত্র।

তুবড়িলাল নিয়মকানুনও শিখিয়ে দিল হাবুলকে। কোনো জায়গায় ভূত আছে জানতে পারলে বাক্সের মুখ খুলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কতগুলো ছেঁড়া কাগজের টুকরো রেখে দিতে হবে ভিতরে। তারপর মন্ত্র পড়তে হবে। কোন লোকটা মরে ভূত হয়েছে তা জানতে পারলে তো কথাই নেই। সেই লোকটার মূর্তি মনে মনে কল্পনা করতে হবে। তারপর মন্ত্র পড়তে হবে চোখ বুজে। কিছুক্ষণ পর পর চোখ খুলে দেখতে হবে বাক্সের ভেতর ছোঁড়া কাগজ নড়ছে কিনা। একটু নড়লেই বুঝতে হবে ভূত এসেছে। তখন চট করে বাক্সের মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে বাক্সটাকে। ব্যস ভূত ধরা হয়ে গেল। এবার ভূতটাকে যেখানে চালান করতে চাও সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

কৌতূহলী হয়ে হাবুল ও গদাই জিজ্ঞেস করল, তারপর?

তুবড়িলাল বলল, এবার একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিই। সেই মন্ত্রটা বলেই খুলে দেবে বাক্সের

মুখ। তবে এসব কাজ রাতের বেলাই করবে। কারণ দিনের বেলা তেনারা বের হন না।

—ভূত যদি আমাদের তাড়া করে?

—সেই মন্ত্রও শিখিয়ে দিচ্ছি। ভূতকে পথ ভুলিয়ে দেবার জন্য ভুলভুলাইয়া মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের।

গদাই কাগজ ও ডটপেন নিয়ে তৈরি হলো মন্ত্রগুলি লিখে রাখার জন্য। অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল তুবড়িলাল। বলল, না না, লিখে রাখলে মন্ত্রের গুণ থাকবে না!

হাবুল আর গদাইকে তাই মেনে নিতে হলো। বার কয়েক দুজনে আউড়ে নিতেই মন্ত্রগুলি প্রায় শেখা হয়ে গেল। সহজ মন্ত্র। তবে ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটাই একটু বিদঘুটে। সহজে মনে রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু উপায় কি? লিখে রাখা যখন যাবে না।

হাবুল জিজ্ঞেস করল, ভূতের সঙ্গে যদি কথাবার্তা বলতে চাই তা হলে কি করতে হবে?

তুবড়িলাল বলল, সব ভূত কিন্তু কথা বলতে চায় না। তবে সেটা তাদের মেজাজের ওপর নির্ভর করে।

ভূত ধরার বাক্সটা পেয়ে হাবুল খুব খুশি। যে বাইরের ঘরটাতে সে থাকে তার দরজায় একটি ছোট পিচবোর্ডের ওপর লিখে দিল— ভূতবিশারদ এইচ নন্দী।

বাড়িতে হাবুল আর তার বড়মামা লালুচাঁদ ছাড়া পুরুষ মানুষ কেউ নেই। মামা যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন ততক্ষণ ছোট সাইনবোর্ডটা দরজায় থাকে না। মামা বেরিয়ে গেলেই ওটা ঝুলতে থাকে সগৌরবে। মামীমা চোখে কম দেখেন। কাজেই ধরা পড়ার ভয় কম।

ভূত-ধরা যন্ত্র কেনার পর হাবুলের প্রধান চিন্তা হলো ওটাকে কাজে লাগাতে হবে। ভূত নিয়ে নানারকম গবেষণাও শুরু করে দিল। গদাইকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহ কবতে লাগল, কোথায় কোন বাড়িতে ভূত আছে। সেই ভূতের পরিচয়ও তারা জানবার চেষ্টা করল।

ভূতের উপদ্রব আছে খবব পেলেই হাবুল আর গদাই সেখানে ছুটে যায় কিন্তু হাতে-নাতে প্রমাণ কিছু পায় না। তারা ভাবে, ভূত ধরার যন্ত্রের খবর পেয়েই কি ভূতগুলি সব পালিয়ে যাচ্ছে?

দিনরাত শুধু চিন্তা, ভূত চাই, ভূত ধরতে হবে। ভূত ধরে যদি তার সঙ্গে কথা বলতে পারে তা হলে তো সোনায় সোহাগা। তবে সব ভূতের ভাষা তো এক নয়। সেই ভাষা বুঝবারও একটা কায়দা বের করতে হবে। তবেই কেল্লা ফতে। ভাগ্যিস সে কুকুর বেড়াল নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিল। তাই তার সামনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ খুলে গেল। হাবুল ও গদাই হন্যে হয়ে ভূতের খোঁজে ঘুরতে থাকে অন্ধকার অলিগলিতে আর খানাখন্দে।

এদিকে হাবুলের বড়মামা লালুচাঁদের কাছে খবর এল— কচুবেড়িয়ায় তাঁর ভাই কালুচাঁদের খুব অসুখ। ভাইকে দেখবার জন্য লালুচাঁদ সেদিনই কচুবেড়িয়া চলে গেলেন।

এবারে বাড়িতে পুরোপুরি স্বাধীন হাবুল। সে জোরকদমে ভূত নিয়ে গবেষণা করতে পারবে। হঠাৎ সে একটা ভূতের গল্পের বইও পেয়ে গেল। তাতে অনেক রকম ভূতের নাম

ও তাদের বিবরণ আছে। মণিকাঞ্চন যোগাযোগ হলো।

কদিন ধরে গদাই আসছে না। তার জ্বর। তাই একাই গবেষণা করতে থাকে হাবুল। যন্ত্রটা কাছে এনে ভূত ধরার মন্ত্র আওড়ায় সে। রাত্রিবেলা খোলা বারান্দায় ওটা রেখে দিয়ে মন্ত্র বলতে থাকে। যদি উড়ুক্কু কোনো ভূত ধরা পড়ে।

কেটে গেল প্রায় সাত দিন। একদিন মামী বললেন, হ্যাঁরে, তোর মামার দেখি ফিরে আসার নাম নেই। কোনো খবরাখবরও পাঠায় না। কি ব্যাপার!

হাবুল বলে, কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না। ছোটমামার অসুখটা হয়তো খুব বেড়ে গেছে, তাই বড়মামাও আসতে পারছে না।

মামী বললেন, এদিকে যে রাত্রিবেলা আমার খুব ভয় করে।

—কিসের ভয়?

—ভূতেব মতন কি যেন ঘুরে বেড়ায়, ঘরে আর বারান্দায়। হাবুল বলল, তুমি ভুল দেখেছ মামী। চোখে তো ভালো দেখতে পাও না।

মামী বললেন, আগে তো কোনোদিন এরকম দেখিনি। এখন দেখছি কেন?

—কবে থেকে দেখছ?

—তিন-চার দিন ধরে দেখছি।

হাবুল মনে মনে ভাবল, ভূত ধবার বাক্সটা বারান্দায় রাখার পরই হয়তো এই অবস্থা হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো ভূত ধরা পড়বে এবার।

আবও দুদিন কেটে গেল। মামীমা প্রথম দিন কিছু বললেন না। পরের দিন আবাব বললেন, কাল রাত্রে আমি ঘুমের ঘোরে শুনতে পেয়েছি কে যেন আমায় বৌদি বৌদি বলে ডাকছে। মনে হলো যেন তোর ছোটমামার গলা।

চমকে উঠল হাবুল। জিজ্ঞেস করল, তুমি ঠিক শুনেছো মামী?

—হ্যাঁ ঠিক শুনেছি। তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কে যেন পাশের ঘবে ঘোবাঘুরি করছে। ভূত না চোর কে জানে? কয়েক মাস আগে তো তোর ছোটমামা কিছু টাকা বেখে গিয়েছিল তোর বড়মামার কাছে। কেউ হয়তো তার খবর পেয়েছে।

মামী যেন ভয়ে কুঁকড়ে যেতে লাগলেন। আর হাবুলের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। সে বলে উঠল, ইউবেকা! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা খটকাও লেগে গেল তার। কচুবেড়িয়ার ছোটমামা মারা যায়নি তো?

সেদিন রাত্রেই যন্ত্রটা পরখ করতে লেগে গেল হাবুল। কিছু ছেঁড়া টুকরো কাগজ বাক্সের মধ্যে ভরে দূরে দাঁড়িয়ে ভূত ধরার মন্ত্রটা আওড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বাক্সের কাগজগুলি যেন নড়ছে। হাবুল বুঝতে পারল ভূত ঠিক যন্ত্রের ভেতর ঢুকে পড়েছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাক্সের মুখটা বন্ধ করে দিল।

ব্যস, বন্দী হয়েছে ভূত বাবাজী। আর মামদোবাজি করতে পারবে না। এবার দড়ি দিয়ে বাক্সটা ভালভাবে বেঁধে ঘরের ভেতরে চৌকির তলায় লুকিয়ে রাখল। ভূতটা কোনো কথা

বলে কিনা তা শোনবার জন্য বাক্সটার খুব কাছে গিয়ে কান পেতে রইল। কিন্তু কোনো কথা শুনতে পেল না। মনে মনে ঠিক করল পরদিন সন্ধ্যাবেলা ভূতটাকে অনেক দূরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। মামীমাকে বড্ড জ্বালিয়েছে ভূতটা। আর জ্বালাতে পারবে না।

সকাল হবার পর সারাটা দিন খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে লাগল হাবুল। গদাই একবারও এল না। নিশ্চয় ওর জ্বরটা খুব বেড়েছে। হাবুল ভাবল, যাক, একপক্ষে ভালই হলো। ভূত ধরার ও দূরে ছেড়ে দিয়ে আসার বাহাদুরিটা সে একাই পাবে। জীবনে একটা বিরাট সুযোগ এসেছে তার।

একটু বেলা হতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল হাবুলের। সে মামীকে জিজ্ঞেস করল, মামী, কাল রাত্রে ভূতটা তোমাকে জ্বালায়নি তো?

মামী বললেন, না।

হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল হাবুল, কেল্লা ফতে!

মামী হাবুলের এই অদ্ভুত আচবণের কোনো কারণ বুঝতে পারলেন না। বললেন, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না বাপু। তোর মামা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো স্বস্তি নেই।

সেদিনও বড়মামা ফিরলেন না। সন্ধ্যা হতে না হতেই বাক্সবন্দী ভূতটা নিয়ে হাবুল রওনা হলো। মামীকে বলে গেল, মামী, আমি একটা বিশেষ কাজে এক জায়গায় যাচ্ছি। ফিরতে হয়তো একটু রাত হবে।

মামী আঁতকে উঠে বললেন, সে কি, একা আমার ভয় করবে যে।

—ভয়ের কিচ্ছু নেই মামী। ভূত-তাড়ানো মন্ত্র আমি শিখে নিয়েছি। সেই মন্ত্র তুমিও আওড়াতে পারো। তা হলে ভূত তোমার ধারেকাছেও আসবে না।

—মন্ত্রটা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যা।

হাবুল বলল, ভূতের কোনো আভাস পেলেই বলবে, ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?

মামী একটু শান্ত হলেন। হাবুলও বাক্সটা একটা ঝোলায় পুরে বেরিয়ে গেল।

পথের পর পথ হাঁটতে লাগল হাবুল। তবুও মনেব মতো একটি জায়গা পেল না। ভাবল, আবও একটু দূরে নিয়ে গেলে ভাল হয়।

তুবড়িলাল বলেছিল ভূতের একটা মোটামুটি চেহাবা মনে মনে কল্পনা করে নিলে কাজের খুব সুবিধা হবে। কিন্তু কোন ভূতের চেহারা সে মনে মনে কল্পনা করবে? যে ভূতটাকে সে ধরেছে সে কোন মরে যাওয়া মানুষের ভূত তাও সে জানে না। আন্দাজে কি কল্পনা করবে সে?

হাবুল পথ চলছে আর চিন্তা করছে। জানাশোনা ভূত আর কে আছে? মামীমা বলেছিলেন, ছোটমামার মতো একটা লোককে নাকি তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। সেই অসুস্থ ছোটমামা পটল তোলেনি তো? ছোটমামার তো বড়মামার বাড়িতেই আসবার কথা ছিল তার রেখে যাওয়া টাকাগুলি নিয়ে যাবার জন্য।

হাবুল পথ চলছে আর নানা আজগুবি কথা ভাবছে। যদি ছোটমামা মরে গিয়ে থাকে তবে ভূত হয়ে গেছে নিশ্চয়। টাকার মায়া নাকি ভূতেরাও ভুলতে পারে না। এসে এখানেও উৎপাত করবে। ভূতের কথা ভাবতে ভাবতে ছোটমামার মুখটাই শুধু হাবুলের চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

কতটা পথ হেঁটেছে তা নিজেই জানে না হাবুল। কোন পথ দিয়ে কিভাবে এসেছে তাও ভুলে গেছে। অচেনা জায়গা। তাকে ভূতেই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। অন্ধকারে একটু দূরেই ঝাপসা দেখতে পেল একটা জঙ্গল। তার সামনেই একটা জলা জায়গা, তাতে জল নেই বলেই মনে হয়। ঐ জলাটা পেরিয়ে গেলেই জঙ্গলটা। ওখানে ভূতটাকে ছেড়ে দিলে ভূতবাবাজী আর ফিরে যেতে পারবে না। ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটা তো পড়তেই হবে।

এদিকে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসছে। আর দেরি করলে চলবে না। তা হলে নিজেও বাড়ি ফিরতে পারবে না হাবুল।

জলাটা খুব চওড়া নয়। জলও তাতে নেই বলে মনে হচ্ছে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই কাদায় হাবুলের পা আটকে গেল। পা টেনে তুলতে গিয়ে বাক্সসুদ্ধ ঝোলাটা পড়ে গেল হাত থেকে। কোনোরকমে সেটা তুলে নিয়ে হাবুল আবার চলতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

কয়েক পা যেতেই কিন্তু আবাব পড়ে গেল সে। একেবারে হুমড়ি খেয়ে। মনে হলো কোনো ভূতই বুঝি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। পড়ল আবার কাদার মধ্যেই। এবার যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন সে এক কাদামাখা কদাকার ভূত।

এবার ভযানক ভয় হতে লাগল হাবুলের। ভূতের ভয় তার ঘাড়ে চাপল। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ভূত আমাব পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?

কোনোরকমে জলাটা পেরিয়ে ওপরে উঠল হাবুল। জঙ্গলটা এখন একেবাবে কাছে। ভাবল, অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে কাজ নেই। এখানেই একটা গাছতলায় ছেড়ে দিই ভূতটাকে।

ছাড়ার সময় মন্ত্রটা তো পড়তে হবে। চারদিকে কেমন যেন একটা ভয় ভায ভাব। তবু মনে সাহস এনে একটু জোব গলাতেই মন্ত্র আওড়াতে লাগল—

হিং টিং রিং রিং ভূতভুতুর ছানা,
ছেলে ভূত, মেয়ে ভূত দূর হয়ে যা না।
মেছো ভূত, গেছো ভূত,
মামদো ভূত, হামদো ভূত,
ব্রহ্মদত্যি, শাঁকচুন্নি সব হয়ে যা কানা।
হিং টিং ছট
পালা চটপট।

বলেই হাবলু বাক্সের মুখটা খুলে দিল। তার মনে হলো যেন কি একটা হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল বাক্সের ভেতর থেকে।

ভূতটা নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেল। এবার যে মন্ত্রটা আওড়ালে ভূত আর ফিরে যেতে পারবে না, সেই ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটা বলতে হবে—

ভূত ভূত ভূতং ভূতং

যাবি আর কুতং কুতং—

তারপর? তারপর আর কিছুই মনে নেই হাবুলের। জলে কাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে সবকিছু তার গুলিয়ে গেছে।

মাথা ঘুরে যেতে লাগল হাবুলের। কান দুটো দিয়ে যেন গরম বাতাস বের হতে লাগল। হায়! হায! গদাই থাকলে সেই মন্ত্রটা জেনে নিতে পারত এই সময়ে! তার কোনো উপায় নেই। এখন সেই ভূতটাই যে তার ঘাড়ে এসে চাপবে!

ভয়ে কাঁপতে লাগল বুক! তার মনে হতে লাগল ভূত এবার তার সামনেই এসে দাঁড়াবে। কেমন সেই ভূতের চেহার হবে কে জানে? ছোটমামা মরে গিয়ে যদি ভূত হয়ে আসে!

ভাবতে ভাবতেই তার কাছে এসে দাঁড়াল একটা ছায়মূর্তি। আবছা অন্ধকাবেও হাবুল বুঝতে পারল তার চেহারাটা ঠিক ছোটমামাব মতো। ভযে ভয়ে সে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বইল।

ছোটামামা কথা বলল, কিরে হাবুল, তুই এখানে কেন?

হাবুল সত্যি কথা গোপন করে জবাব দিল, মা-মা, ছো-ছোটমামা গো, আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

—এখানে এত দূরে কেউ বেড়াতে আসে নাকি সন্ধ্যাব পরে?

—এই ...এই....বিশেষ একটা কাজ.

—বুঝতে পেবেছি। কিন্তু এখন ফিববি কিভাবে?

হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে হাবুলের। কোনোমতে একটু সাহস যুগিযে বলল, ছোটমামা, তুমি এখানে এলে কেন?

কালুচাঁদ বলল, আমি তো তোদেব বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। তোকে এখানে দেখে দাঁডিযে পড়লাম। তুই পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি?

—হ্যাঁ, মামা। প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো হাবুলের।

—আয়, আমার সঙ্গে চল।

হাবুল বাক্সটা হাতে নিযে বলল, চলো মামা।

আগে আগে চলল কালুচাঁদ, পেছনে পেছনে হাবুল। হাজাব প্রশ্ন মনে জাগলেও কোনো কিছু সে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না। শান্তশিষ্ট ছেলের মতো চলতে লাগল।

অনেক পথ। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে আসে। রাত্রের কালো আঁধার যেন আরও জমকালো হয়ে উঠছে।

এবার বাড়ির অনেকটা কাছে এসে পড়েছে তাবা। ছোটমামা না থাকলে আজ যে কি দশা হতো হাবুলের!

দূর থেকে দেখা যায় বাড়িটা। ঘরে আলো জ্বলছে। এখনও জেগে আছেন বড় মামী।

ছোটমামা বলল, হাবুল, ঐ তো বাড়ির কাছেই এসে গেছিস। তুই যা। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। বলে পাশের একটি ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে আব দেখা গেল না তাকে।

হাবুলের যেন কি হয়েছে। সে কোনো কথাই ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারল না ছোটমামাকে। নীরবে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়িতে এসেই দেখল বডমামা কচুবেড়িয়া থেকে ফিরে এসেছেন। এত বাতেও হাবুল বাড়ি নেই দেখে মামা-মামী দুজনেই চিন্তা করছেন খুব। হাবুলকে দেখে তাঁরা আঁতকে উঠলেন! প্রায় চিৎকার কবে বললেন, এ কিরে, তোর এই ভূতের মতো চেহাবা হলো কেমন করে? কোথায় গিয়েছিলি? এত রাতে ফিরলিই বা কার সঙ্গে?

হাবুল বলল, ছোটমামার সঙ্গে ফিরলাম। ভাগ্যিস দেখা হলো!

চমকে উঠে বললেন বডমামা, কি বলছিস? কালুব সঙ্গে ফিরলি? তাকে পেলি কোথায়? সে তো মাবা গেছে গত শনিবার বাববেলায়। সেজন্যই তো আমাব ফিরতে দেরি হলো।

হাবুলের সব গুলিয়ে যাচ্ছে....ছোটমামা. ..শনিবাবের বাববেলায. .তাহলে জলাব ধারে ও কে ..ভূত ..বাক্স ... হিং টিং রিং বিং. তার মানে. . তার মানে ...

বডমামার দিকে বিস্ফাবিত চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পডল হাবুল।

জীবন্ত পুতুল

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের মানুষের চোখে ঘুম নেই। একটা অজানা আশঙ্কায় তারা সবসময়ই কাঁপছে। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি, কখন যে কি হয় কিছুই বলা যায় না। সেদিনটা গোটাই কেটে গেছে ঝড়-বৃষ্টিতে, রাতও অনেক হয়েছে, সোমার কাকু তার ঘরে বসে লেখাপড়া করছে, হঠাৎই তার মনে হলো, সোমা যেখানে পুতুল রাখে, সেখান থেকে কে যেন চলে গেল বাবান্দাব দিকে। চোখের ভুল মনে করে আবার পড়ায় মন দিল, কিন্তু তার মনে হলো বারান্দার দিক থেকে বাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল। সুতরাং দেখতেই হয়। পড়া ছেড়ে উঠে বারান্দায় গেল সোমার কাকু। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন ফিরে আসছে, তখন ওর নজরে এল নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকটা মশালের আলো। খুব ভয়ে পেয়ে গেল সোমার কাকু। নিশ্চয় খান সেনারা টের পেয়েছে তাদের গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা লুকিয়ে আছে। রাতের অন্ধকারে তাই তারা আসছে আক্রমণ করতে। মুহূর্তমাত্র আর দেরি না করে

সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

খবরটা গ্রামময় রটে গেল। সবাই তৈরি হয়ে নিল আক্রমণকারীদের রুখতে। ঘরের চালে, বাড়ির বারান্দায়, গাছের ওপর উঠে সকলেই সেই মশালের আলোগুলোকে দেখে নিয়ে সংকেত দিল। কিন্তু আলোগুলো যেদিক দিয়ে আসছিল সেদিক দিয়ে আর না এগিয়ে পিছন দিকে দৌড় দিল। দেখে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো বটে তবু তারা অপেক্ষা করতে লাগলো। কারণ অনেকে ভাবলো এটা ওদের কোনো ফন্দি হতে পারে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, যে-যার ঘরে চলে গেল।

ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। বারান্দার দিকের জানলা দুটো খুলে দিয়ে, আলো নিভিয়ে শুতে যাবে ঠিক তখনি সোমার কাকু লক্ষ্য করলো বারান্দায় নেমে কে যেন সোজা বাড়ির ভেতর চলে গেল। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে সোমার কাকু ঘুমিয়ে পড়লো। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলো নদীর ধারে বেশ কিছু পোড়া মশাল আর দুটো লাশ পাওয়া গেছে, গলা টিপে তাদের মারা হয়েছে। সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে তারা কেউ নদীর ধারে যায়নি, খান সেনারাও আক্রমণ করেনি, তাহলে দুজন লোককে গলা টিপে মারলো কে? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সারাদিন কেটে গেল।

সন্ধ্যে হতে না হতেই খবর এল আক্রমণকারীরা দলে আরো ভারী হয়ে আসছে দুজনের মৃত্যুর বদলা নিতে। আজ অন্য পথ দিয়ে তাদের আসার সম্ভাবনা বেশি। যে কোনো সময়ে গ্রাম আক্রমণ করতে পারে। সমস্ত মানুষ শলাপরামর্শ করে মেয়েদেরও বঁটি, কাটারি নিয়ে তৈরি থাকতে বললো। পুরুষরা সড়কি, লাঠি, বল্লম নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সারা রাত তারা পালা করে পাহারা দিল কিন্তু আক্রমণকারীদের পাত্তা নেই। দেখেশুনে গ্রামবাসীরা আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলো কারণ তাদের কাছে সঠিক খবর ছিল যে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হবেই। তবে কি ওরা অন্য ফন্দি আঁটছে!

রাত ফুরিয়ে সকাল হতেই জানা গেল বউদীঘির পাড়ে পাঁচ-ছটা লাশ পড়ে আছে সকলে যত না অবাক হলো তার চেয়ে ভয় পেল আরো বেশি। এবার আর তাদের রক্ষে নেই। খবর আসতেও দেরি হলো না। খান সেনারা দ্বিগুণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে। ঠিক হলো, সন্ধ্যের পরই, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের গ্রাম থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গের হিলি সীমান্তে। সঙ্গে যাবে শক্তসমর্থ কিছু যুবক।

অমাবস্যার রাত। তাই জঙ্গলের মধ্যে, অন্ধকার আরও বেশি। এগিয়ে চলেছে শঙ্কিত ভয়ার্ত মানুগুলো। ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসার জন্যে সকলেরই চোখ জল। সশস্ত্র পুরুষরা পেছনে ও আগে। এই জঙ্গলের পথটাকে আগেও দেখে গেছে তারা। সেই চিহ্নিত করা পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে ছোট্ট দলটা। মাঝে-মাঝে খুবই সন্তর্পণে টর্চের আলো ফেলে ওরা পথের নিশানা ঠিক করে নিচ্ছে। সোমা কিন্তু তার প্রিয় ডল পুতুলকে আনতে ভোলেনি। এই পুতুল সোমার প্রাণ। ওর প্রাণের বন্ধু সাকিলা জলে ডুবে মারা যাওয়ার পর থেকে এই পুতুলটাকেই সোমা আঁকড়ে ধরেছে। এখন পুতুলই ওর বন্ধু। সেটা তার নিজের কাছে

রেখেছে।

পথে ময়নাঘাটের শ্মশান, মিয়াবিবির কবর, জবাইদীঘি ও পুঁটেকালীর মন্দির পড়বে, আর এই মন্দির থেকে মাইল চারেক হাঁটতে পারলেই পশ্চিমবঙ্গের হিলি সীমান্ত। অনেকটা পথ পেরিয়ে প্রায় শ্মশানের কাছাকাছি পৌঁছে গোটা দলটা একটু বিশ্রাম নিতে বসলো। সোমার কাকু, পুতুলটাকে মাটিতে তার পাশেই নামিয়ে রাখলো। তারপর একটুর জন্য সে অন্যমনস্ক হতেই হঠাৎ তার মনে হলো, গা ঘেঁষে কেউ যেন উঠে চলে গেল সামনের দিকে। আলো জ্বালার উপায় নেই, তাই সে বসে রইলো। বিশ্রামের পরে আবার হাঁটার পালা। ওঠবার সময় কাকু পুতুলটাকে নিতে গিয়ে দেখলো সেটা নেই। এবার আলো জ্বালতেই হলো, কিন্তু কোথাও পুতুলটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পুতুলের দুঃখে সোমা চিৎকার করে কাঁদতেও পারলো না পাছে তার কান্না সীমান্তরক্ষীদের কানে যায়। তাব মা সোমার মুখটা চেপে ধরে অনেক কষ্টে সামলিয়ে ও বুঝিয়ে সকলের সঙ্গে এগিয়ে চললো। সোমা তার মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সামনেই শ্মশান, জোনাকির আলোগুলো শুধু ছোটাছুটি করছে। হঠাৎই ওদের কানে এল বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে কারা যেন ওদেবই সঙ্গে হেঁটে চলেছে। ভয়ে সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাহলে কি সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওদের আসা টের পেয়েছে' নিঝুম নিস্তব্ধ বাত, কোথাও আর কোনো সাড়া নেই কিন্তু অতগুলো আলো তাদের সামনে এল কোথা থেকে! আলোগুলো যেন বাতাসে ভাসছে এবং নিভছে আর জ্বলছে। কর্কশস্বরে একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে ওদের মাথার ওপব দিয়ে উড়ে চলে গেল। আলোগুলো কি কোনো জন্তু-জানোয়ারের জ্বলন্ত চোখ! আচমকা একটা অট্টহাসিতে সমস্ত জঙ্গলটা কেমন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠলো। ওদের মনে হলো চারধারেই যেন অট্টহাসি আছড়ে পড়ছে। ছোট্ট দলটার কারোর মধ্যে যেন প্রাণ নেই, এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা গ্রাস করেছে সবাইকে।

অন্ধকাবের মধ্যে সেই আলোগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। সোমা তার মাকে আঁকড়ে ধরে মা বলে চিৎকার করে উঠতেই সোমার কাকু মরিয়া হয়ে টর্চ জ্বেলে ফেললো। সবাই দেখলো কতকগুলো ছায়ামূর্তি হাওয়ায় দোল খাচ্ছে আর তাদের চোখগুলো বীভৎসভাবে জ্বলছে। ভূত, প্রেত, দৈত্য কি দানব বোঝার উপায় নেই। ওরা এগিয়ে আসছে...চলৎশক্তিহীন কতকগুলো মানুষ চেয়ে আছে অসহায় চোখে....

হঠাৎ একটা মিষ্টি হাসির শব্দে সম্বিৎ ফিরলো সকলের। এ হাসির মধ্যে তো ভয়ের কোনো লক্ষণ নেই, কে হাসছে এমন করে?

অদৃশ্য কারুর কণ্ঠস্বব ভেসে এল, কোনো ভয় নেই, এগিয়ে যাও। কতকগুলো প্রেতাত্মা কিছুতেই তোমাদের জীবন্ত রাখবে না বলে ঠিক করেছিল কিন্তু আমি তাদের আটকেছি। তোমরা এগিয়ে যাও।

এ-কি তবে ঈশ্বরের করুণা! সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরকে প্রণাম জানিয়ে আবার শুরু হলো যাত্রা।

দলের সকলেই খুব ভয় পেয়ে গেছে। একমাত্র হীরু আর সোমার কাকু ছাড়া। তারাই সাহস দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দলটাকে। নির্বিঘ্নে মিয়াবিবির কবরস্থান পেরিয়ে, জবাইদীঘির কাছে পৌঁছে কয়েক পা এগোতেই একটা দমকা হাওয়ায় ওরা ছিটকে পড়লো জঙ্গলের মধ্যে। হাওয়াটা যেন ওদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। একাট চাপা আর্তনাদ এবং সেইসঙ্গে বাঁচাও— বাঁচাও বলে করুণ আবেদন আছড়ে পড়লো এদের চারপাশে। কেউ কোথাও নেই। গাছের পাতাও নড়ছে না। এ কী বিভীষিকা ঘিরে ফেললো আবার। তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার, তারপর আবার সেই মিষ্টি গলা, ভয় নেই এগিয়ে যাও। একদল খুনীর প্রেতাত্মা নিজেদের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল। তোমাদের দেখে ওরা ভেবেছিল তোমাদেরও নির্মমভাবে খুন করবে ওদের দলবৃদ্ধির জন্যে। আমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। ভয় নেই এগিয়ে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

দৈবশক্তির আশ্বাসে আবার শুরু হলো এগিয়ে চলা।

পুঁটেকালীর মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই একদল শিয়াল চিৎকার করে ছুটে এল এদের দিকে। টর্চের আলো ফেলতেই কোথায় হারিয়ে গেল তারা। ঠাণ্ডা ববফেব মতো হাওয়ায় সকলেরই ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। বারবাব ভয় পেযেও এইবার কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে দলটা। আবার জ্বলে উঠলো টর্চের আলো আর সেই আলোয় সবাই দেখলো কয়েকটা ছায়া ছায়া কবন্ধ ওদের পথ আগলে দাঁড়িযে আছে। তারা কেউ চীৎকাবও করছে না বা অট্টহাসিও হাসছে না। শুধুমাত্র তাদের দিক থেকে ভেসে আসছে বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া। আবাব সেই আগেকার হাসি এবং হঠাৎই সেই কবন্ধগুলো যেন ছুটতে লাগলো। এবা বুঝলো সেই দৈবশক্তির আগমন ঘটেছে।

ওরা আবার চলতে শুরু করলো সীমান্তের দিকে।

মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সোমা বলে উঠলো, মা, আমার সেই পুতুলটাকে আমরা কি আর ফিরে পাবো না?

মা কিছু বলার আগেই কে যেন খুব কাছ থেকেই বলে উঠলো, সাকিলাকে আর খুঁজে পাবে না।

সোমা বললো, সাকিলা, তুই কোথায় রে?

আমি তোদের সঙ্গেই আছি। নদীতে ডুবে গিয়ে মারা গিয়েছিলাম, নদীর ধারেই থাকতাম একদল প্রেতাত্মার সঙ্গে। একদিন দেখলাম তুই একটা পুতুল কিনে নদীর ধার দিয়ে তোর কাকুর সঙ্গে ফিরছিস। বুঝলাম মেলা থেকে পুতুলটা কিনেছিস। তোকে তো আমি খুব ভালবাসতাম তাই ইচ্ছে হলো, তোর কাছে যাই, তোর কাছে থাকি। অন্য প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি সেই পুতুলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তোদের গ্রাম যতবারই আক্রমণ হবে জেনেছি, ততবারই আমি পুতুল থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে অন্য প্রেতাত্মাদের সঙ্গে নিয়ে আক্রমণকারীদের মেরেছি। নদীর ধারে বা দীঘির পাড়ে যারা মরেছে— আমরাই তাদের মেরেছিলাম। নইলে তোরা কেউ বাঁচতিস না। রাত শেষ হয়ে আসছে, তোরা তাড়াতাড়ি

এগিয়ে যা, আমি এখন চলি।

দূরের সূর্যটা তখনও লাল আবীরের রং আকাশে ছড়ায়নি, পুঁটেকালীর মন্দির ছাড়িয়ে আরও চার মাইল পথ পেরিয়ে ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত দলটা দূরে হিলি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়াটা দেখতে পেল। আনন্দে সবাই চিৎকার করে উঠলো, আমরা পৌঁছে গেছি। ওইতো সামনে দেখা যাচ্ছে সীমান্ত, চল সবাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো।

গোটা দলটা সাকিলার ভালবাসার শক্তি নিয়ে হিলি সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় যখন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখলো, তখন প্রিয় বান্ধবী ও প্রিয় পুতুলের শোকে কেঁদে উঠে সোমা মাকে জড়িয়ে ধরলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো, দূর থেকে আরও দূরে হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রিয় পুতুলটা।

সিঁড়ি

শাহেদ ইকবাল

বাড়িটা সুরভির খুব পছন্দ হয়ে গেল।

চমৎকার রেলিং ঘেরা টানা বারান্দা। মেঝে পর্যন্ত লোহার গ্রিল দেয়া জানালা। ছাদে ওঠার ঝকঝকে সিঁড়ি। ছবির মত ব্যালকনি। জানালার কাছে দাঁড়ালে বিশাল দীঘি চোখে পড়ে। ফুরফুরে বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সুরভি বলেই ফেলল, 'বাড়িটা খুব চমৎকার।'

জয়নাল একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়িটা তার পছন্দ হয়নি। জানালার গ্রিল থাকলেও ছাদে কোন রেলিং নেই। রেলিং নেই সিঁড়িতেও। বাড়ির একপাশে বিশাল পুকুর। অন্যপাশে রাস্তা। সারাক্ষণ গাড়ি ঘোড়া চলছে। বাচ্চা দুটোর জন্যে বাড়িটা উপযুক্ত নয়। সুরভি তা বুঝতে পারছে না।

বাড়িওয়ালা অবশ্য বারবার বলেছে, আগামী মাসের মধ্যে সিঁড়ি ও ছাদের রেলিং হয়ে যাবে। জয়নাল তার কথায় আশ্বস্ত হতে পারেনি। আশ্বস্ত হবার কথাও নয়। পার্শ্ববর্তী লোকজনের কাছে শুনেছে বাড়িওয়ালা গত তিন বছর ধরে এই আশ্বাস দিয়ে আসছে সবাইকে।

বাড়িওয়ালার কথায় সুরভির কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। কারণ, বাড়িওয়ালার কথা তার কানেই ঢোকেনি। সে বারান্দায় ফুলের টবগুলো সাজানোয় ব্যস্ত। ওর চারপাশে ঘুরঘুর করছে পপি ও রিমি। জয়নাল আরেকবার নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়ে দুটো মায়ের মতই হয়েছে। একবার কোনকিছু মাথায় ঢুকলে আর হুঁশ থাকে না। ভোগাবে, এরা তাকে প্রচুর ভোগাবে।

রাতে সবগুলো জানালা খুলে দিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার অন করল সুরভি। জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর বেজে উঠল। খোলা হাওয়ায় সুরভির চুল উড়ছে। সুরভি দাঁড়িয়ে আছে জানালার সামনে। জয়নাল বুঝতে পারছে না আশপাশের লোকজনকে জোর করে হিন্দী গান শুনিয়ে কি লাভ। সে কোন কিছু না বলে চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করল। সারাদিন খুব ধকল গেছে।

জয়নালকে অবাক করে দিয়ে পরের মাসে বাড়িওয়ালা ছাদেব রেলিং-এর কাজ শুরু করল। সিঁড়ির কাজেও হাত দেয়া হলো। কাজ শেষ হতে হতে একমাসের কিছু বেশি সময় লেগে গেল। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল অবিশ্বাস্য সব ঘটনা।

দিন তারিখ মনে নেই কারও। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার পর একটুখানি ধরে এসেছিল কেবল। মেঘলা আকাশের কারণে বিকেলটাকে মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা। অফিসের কাজে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিল জয়নাল। ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার সময় হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। তার মনে হলো কেউ একজন তাব সাথে সাথে উপরে উঠছে। সে জানতে চাইল, 'কে ওখানে?'

কেউ কোন জবাব দিল না। জয়নাল পকেট থেকে লাইটার বের করল। জায়গাটা বেশি সুবিধার নয়। দিনে দুপুরেও চুরি ডাকাতি হয়ে থাকে। গত সপ্তাহেই পাশের বাড়ির ইসমাইল সাহেবের টু-ইন-ওয়ান চুরি গেছে।

লাইটাব জ্বালিয়ে কোন কিছু পাওয়া গেল না। জয়নাল লাইটার নিভিয়ে ফেলল। তার মনের অস্বস্তি দূব হলো না। কালকেই বাড়িওয়ালাকে বলতে হবে সিঁড়িতে বাতি লাগানোর জন্যে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার উঠতে শুরু করল সে। সাথে সাথে সেই শব্দটাও শুনতে পেল আবাব। একজোড়া পায়ের শব্দ। যেন কেউ সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে তার পেছনে পেছনে। একটা নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পেল। জয়নাল গলা চড়িয়ে দ্বিতীয়বারের মত জানতে চাইল, 'কে ওখানে?'

এবারও কেউ কোন জবাব দিল না।

পরের দিন বাড়িওয়ালাকে সবকিছু খুলে বলল জয়নাল। বাড়িওয়ালা হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, 'এ বাড়ির ত্রিসীমানায় কারও ঢোকার সাহস নেই। হয়তো অন্ধকারে কোন বেড়াল-টেড়াল হাঁটতে শুনেছেন। আমি এখনই সিঁড়িতে বাতি লাগানোর ব্যবস্থা করছি।'

বাড়িওয়ালা সত্যি সত্যি সিঁড়িতে একশো পাওয়াবের একটি বাতি লাগিয়ে দিল। কিন্তু জয়নাল পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারল না। তার মনে হতে লাগল, বাড়িওয়ালা কিছু একটা

চেপে যাচ্ছে।

সেদিন দুপুরের কথা। জয়নাল বাসায় ছিল না। বাচ্চা দুটো গেছে স্কুলে। সুরভি একা একা শোবার ঘরে উপন্যাস পড়ছিল। দুপুরবেলার এই সময়টা ওর সহজে কাটতে চায় না। কেমন যেন একঘেয়েমি লাগে।

পড়তে পড়তেই সুরভি টের পেল ঘরের ভেতর আলো কমে আসছে। চট্ করে ঘড়ির দিকে তাকাল ও। বেলা দুটো বেজে দশ। এ সময় আলো কমে আসার কোন কারণ নেই। জানালা দিয়ে আকাশ চোখে পড়ছে। ঝকঝকে আকাশ। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। তাহলে?

আলো কমতে কমতে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল কামরা। বইয়ের অক্ষর তো দূরের কথা, নিজের হাতও আর দেখা যাচ্ছে না। হতবাক সুরভি বাতি জ্বালানোর জন্য সুইচ টিপল। কিন্তু বাতি জ্বলল না। সম্ভবত কারেন্ট ফেইলিওর। সুরভি দরজা ঠেলে বাইরে বেবিযে এল।

বারান্দায ঘুটঘুটে অন্ধকাব। ডানে বাঁয়ে কোন কিছু নজবে আসছে না। অনুমানেব ওপব সামনে এগলো সুরভি। উদ্দেশ্য ড্রইংরুম। বির্চাজেবল ল্যাম্পটা ওখানেই।

এক ঝলক গরম বাতাস লাগল সুরভির চোখে মুখে সেই সাথে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেল। গোঙানির শব্দ। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল সুরভির।

কাজের ছেলে লিযাকত বাজাবে গিযেছিল। ফিবে এসে দেখে সিঁডিব কাছে হাত পা ছডিযে পডে আছে সুবভি। নাক মুখ দিযে বক্ত গডাচ্ছে।

'চোখেব ভুল, নিশ্চযই চোখের ভুল,' জোব দিযে বলল বাডিওযালা।

'কিন্তু দিনের বেলায আলো কমে যাওযা '

'আকাশে মেঘ ছিল হযতো।'

'ও যে বলল .. '

'তিনি জানালা দিযে একদিকেব আকাশ দেখেছেন, অন্য দিকেব আকাশ দেখেননি।'

'গোঙানিব শব্দ.... .' হাল ছাড়ল না জযনাল।

'নিশ্চযই কোন বাচ্চাব কান্না।'

'অসম্ভব। বাচ্চা দুটো ছিল স্কুলে।'

বাডিওয়ালা হাসল। 'আপনার বাচ্চা দুটো ছিল স্কুলে। কিন্তু আশেপাশেব সবগুলো বাচ্চা স্কুলে ছিল না। তাদের মধ্যেই কেউ....।'

'আমার মিসেস সুইচ টিপল, অথচ বাতি জ্বলল না।'

'কারেন্ট ফেইলিওর,' বলল বাড়িওয়ালা। 'ইদানীং প্রায়ই হচ্ছে।'

'সিঁড়ির গোড়ায় ছায়ামূর্তি দেখা.....।'

'আপনাদের কাজের লোক, কি যেন নাম, মনে পড়েছে. .... লিয়াকত, ও-ই হতে পারে। আপনিই তো বললেন, ঘটনার পবপরই লিয়াকত এসে ঢোকে।'

'কিন্তু পেছন থেকে ধাক্কা দেয়া....।'

'ওনার ব্রেইন উত্তেজিত ছিল। এ অবস্থায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।' পানের পিক ফেলল বাড়িওয়ালা।

বাড়ীওয়ালার স্ত্রীর নাম নাসিমা আকতার। শ্যামলা, মোটাসোটা মহিলা। সারাক্ষণ পান খেয়ে মুখ লাল করে থাকে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বাড়িওয়ালার স্ত্রীরা খুব অহংকারী হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। কথাটা ঠিক নয়। নাসিমা আকতার বেশ মিশুকে ও হাসিখুশি মহিলা। প্রথম পরিচয়েই তাকে ভাল লেগে গেল সুরভির।

বাড়িওয়ালার তিন মেয়ে। কোন ছেলে নেই। দু'মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সেই দু'জন স্বামীসহ বাহরাইনে থাকে। প্রতি মাসে চিঠি লেখে। সবচেয়ে ছোট মেয়ে নীপা ইডেন কলেজে পড়ে। সেকেণ্ড ইয়ার।

কথায় কথায় নাসিমা আকতার জানাল, একটি ছেলের খুব শখ ছিল তাদের। প্রচণ্ড শখ।

'সময় তো চলে যায়নি,' কিছু না ভেবেই বলল সুরভি।

নাসিমা আকতারের চেহারা কালো হয়ে গেল। এই পরিবর্তন সুরভির দৃষ্টি এড়াল না।

'কি হয়েছে, ভাবী?'

'না, কিছু হয়নি।' নাসিমা আকতার উঠে গেল।

সেদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে হঠাৎ ইলিয়াসের সাথে দেখা। জয়নাল প্রথমে চিনতে পারেনি। ইলিয়াসের মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। সাইজেও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। পেছন থেকে জয়নালকে ঝাপটে ধরল ইলিয়াস।

'আরে, দোস্ত তুই?'

জয়নালের মুখ দিয়ে কথা সরল না। ইলিয়াস তার স্কুল জীবনের বন্ধু। দেখা হয় নাই প্রায় এক যুগ। মাঝখানে শুনেছিল ব্যাটা জার্মানি চলে গেছে।

'কোথায় আছিস এখন?' জানতে চাইল ইলিয়াস।

'একটা কনস্ট্রাকসন ফার্মে আছি। ফকিরাপুল। তুই?'

'বাসার ঠিকানা দে,' প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল ইলিয়াস।

ছোট্ট একটা কাগজে বাসার ঠিকানা লিখে দিল জয়নাল। কাগজটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল ইলিয়াসের।

'বাড়ির নাম কি তাহেরা মঞ্জিল?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'বাড়িওয়ালার নাম কি মুসা?'

মাথা ঝাঁকাল জয়নাল। 'এ টি এম. মুসা।'

'কতদিন ধরে আছিস ওখানে?'

'প্রায় দু'মাস। কেন?'

গলা খাদে নামিয়ে ফেলল ইলিয়াস। জয়নালের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'পালা। পালিয়ে যা ওখান থেকে।'

ইলিয়াসের গলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, গায়ের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে গেল জয়নালের। নিজেকে সামলে উঠতে সময় লাগল তার।

'এ কথা বলছিস কেন?' জানতে চাইল সে।

অনেকক্ষণ ধরে হর্ন দিচ্ছিল একটা গাড়ি। ওদের পেছন থেকে। এবার গাড়ির দরজা খুলে গেল। অল্প বয়সী একটা ছেলের চেহারা উঁকি দিল ভেতর থেকে। ব্যস্ত হয়ে উঠল ইলিয়াস।

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, দোস্ত। আমি যাই।' গাড়ির দিকে রওনা হলো সে।

খপ করে ইলিয়াসের একটা হাত চেপে ধরল জয়নাল। 'ফুটানির জায়গা পাও না, না? কেবল অন্যের বাসার ঠিকানা নিয়েই খালাস?'

দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল ইলিয়াস। বাড়িয়ে ধরল জয়নালের দিকে। বলল, 'সময় করে আসিস।'

'গাড়িতে ওরা কারা?'

'বিজনেস পার্টনার।'

'অল্পবয়েসী ওটা কে?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল ইলিয়াস। কিন্তু বলল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল গাড়ির দিকে। যেতে যেতে বলল, 'বাসায় আসিস। তোর বউকেও নিয়ে আসিস। তখন কথা হবে।'

সাঁই করে নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ইলিয়াসেব মিটসুবিসি জিএক্স। ভিজিটিং কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে বোকা বনে গেল জয়নাল।

কার্ডটা ইলিয়াসের নয়, অন্য কারও। নিশানাথ চক্রবর্তী নামক একজন ভাবতীয় আইনজীবীর নাম লেখা আছে। ঠিকানাটাও পশ্চিমবঙ্গের : ৪১ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা। কোন সন্দেহ নেই, ভুল করে অন্য লোকের কার্ড ধরিয়ে দিয়েছে ব্যাটা।

হাঁটতে শুরু করল জয়নাল। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজটা দ্রুত সেরে ফেলতে হবে।

সপ্তাহে দু'দিন পপি-রিমেদের স্কুল থাকে না। সুরভির ভোগান্তি তখন বেড়ে যায়। বাচ্চা দুটোকে চোখে চোখে রাখাও একটা ভোগান্তি। যদিও সিঁড়িতে-ছাদে রেলিং লাগানো হয়েছে, কিন্তু বিপদের কি কোন বাপ-মা আছে?

সমস্যা হলো লিয়াকত বাচ্চা দুটোকে একদম সামলাতে পারে না। ওদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে। গতকাল মেয়ে দুটো লিয়াকতকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ছাদে চলে গিয়েছিল। সুরভি এখনও শিউরে ওঠে ভাবলে। ভাগ্যিস ছাদে গিয়েছিল। যদি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেত।

ছুটির দিনগুলোতে জয়নাল বাচ্চাদের সাথে নাস্তা করে। দুপুরেও একসাথে খায়। আজকের দিনটি ব্যতিক্রম। সে আগেভাগে বলে দিয়েছে দুপুরে ফিরবে না। তাই পপি-রিমি সকাল সকাল লাঞ্চ করতে বসেছে। সকাল সকাল লাঞ্চ করার পেছনে অন্য কারণও আছে। আজকে

সুরভি ওদের নেপচুন থিয়েটারে নিয়ে যাবে। বাচ্চাদের জন্য একটা কমেডি ছবি এসেছে, খুব নাকি মজার।

ওদের জামা পাল্টে দিয়ে ইস্ত্রি করা নতুন জামা পরাল সুরভি। চুল আঁচড়ে দিল। তারপর নিজে কাপড় পাল্টানোর জন্য শোবার ঘরে ঢুকল। লিয়াকতকে বলল, ওদের নিয়ে ড্রইং রুমে খেলতে।

ড্রইং রুমে যেতে হলে সিঁড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। জায়গাটা পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ পপি লিয়াকতের কানে কানে বলল, 'আমি তোমাকে ধাক্কা দিই?'

পপির বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, রীতিমত চমকে উঠল লিয়াকত। ঢোক গিলে বলল, 'ধাক্কা দিলে পড়ে যাব তো, সোনামণি।'

'পড়ে গেলে অসুবিধা কি?' আহ্লাদী গলায় বলল পপি।

পড়ে গেলে অসুবিধা কি মানে? লিয়াকতের হাত পা-ঠাণ্ডা হয়ে এল। বলে কি হারামজাদী? লাফ দিয়ে সিঁড়ির কাছ থেকে সরে যেতে চাইল সে। কিন্তু পারল না। মনে হলো, কেউ তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে ওখানে।

'পড়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই,' সুর করে বলল পপি। ওকে সমর্থন করল রিমি। সেও তোতাপাখির মত বলল, 'পড়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই।' লিয়াকতের পেছনে এসে দাঁড়াল ওরা দু'জন। আছড়ে-পাছড়ে নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল লিয়াকত। কিন্তু একচুল নড়তে পারল না। সাঁড়াশীর মত একজোড়া হাত পেছন থেকে ঝাপটে ধরল ওকে। এই হাত কার? পপির? রিমির? অসম্ভব।

লিয়াকত আয়তোল কুরসী পড়তে লাগল।

পেছন থেকে ফিসফিস করে কেউ বলল, 'কোন অসুবিধে নেই। তোমাকে ধরার জন্য নিচে একজন দাঁড়িয়ে আছে, দেখো।'

সিঁড়ির দিকে তাকাল লিয়াকত। ঘাড়ের কাছে সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে গেল ওর। ইযা মাবুদো ইয়া রাববুল আলামিনা ওটা কি? ওপরের দিকে উঠে আসছে ওটা কি?

পেছন থেকে একজোড়া হাত লিয়াকতকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল নিচে।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছাড়ল সুরভি।

'পপি! রিমি! তোমরা কোথায়?'

কেউ কোন জবাব দিল না। মনে মনে লিয়াকতের মুণ্ডুপাত করল সুরভি। নিশ্চয়ই মেয়ে দুটোকে নিয়ে ছাদে চলে গেছে।

শোবার ঘরের ব্যালকনি থেকে ছাদের প্রায় সবটুকু দেখা যায়। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখল না সুরভি। তবুও গলা চড়িয়ে আরেকবার ডাকল। প্রতিধ্বনি যেন ব্যঙ্গ করল তাকে।

কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছল সুরভি। বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করছে। কেউ কোন সাড়া দিচ্ছে না কেন? লুকোচুরি খেলছে ড্রইং রুমে?

সিঁড়ি

ড্রইং রুমে যাওয়ার পথে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল ওব। দেখল, পপি ও রিমি সিঁড়ির গোড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। মাথা দুটো ঈষৎ ঝুঁকে আছে সামনে। কি দেখছে ওরা? অমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? লিয়াকত কোথায়?

'এই, কি দেখছিস?' মেয়ে দুটোর কাঁধে হাত রাখল সুরভি।

কেউ কোন জবাব দিল না। সুরভির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। মেয়ে দুটোর শরীর অমন শক্ত কেন? মনে হচ্ছে পাথরের গা। পলকহীন চোখে কি দেখছে ওরা সিঁড়িতে?

সুইচ টিপে সিঁড়ির বাতি জ্বালাল সুরভি।

নিশানাথ চক্রবর্তীর ভিজিটিং কার্ডের ওপর হাতে লেখা একটি টেলিফোন নম্বর পেল জয়নাল। অকুল সমুদ্রে যেন খড়কুটো পেল। হাতের লেখাটা ইলিয়াসের। কাজেই ফোন নম্বরটাও হয়তো ওর পরিচিত কারও। ভাগ্য-সুপ্রসন্ন হলে ওর নিজেরও হতে পারে।

টেলিফোন নম্বরটা ইলিয়াসের নয়। ইলিয়াসের কোন বন্ধুরও নয়। একটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির। তবে কোম্পানিটি ইলিয়াসের সুপরিচিত। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গড়গড় করে ইলিয়াসের টেলিফোন নম্বর জয়নালকে জানিয়ে দিল।

টেলিফোন পেয়ে অনেকক্ষণ হো-হো করে হাসল ইলিয়াস। হাসি যেন থামতেই চায় না।

'তোব হাসি অসহ্য লাগছে,' ধমকে উঠল জয়নাল। 'দয়া করে থাম।'

'বিলিভ ইট অর নট, আজকে সন্ধ্যায় তোর বাসায় যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিলাম।'

'ধাপ্পাবাজি রাখ।'

'ধানমণ্ডি গিযে টের পেলাম, তোকে ভুল করে অন্য কার্ড দিয়ে দিয়েছি।' আবার হাসতে শুরু কবল ইলিয়াস।

'আমি রিসিভার নামিয়ে রাখছি,' বলল জয়নাল। 'তোর কথা অনুযায়ী তুই সন্ধ্যায় আমাব বাসায় আসছিস। বউসহ। তখন বিস্তারিত আলাপ হবে।'

'জাস্ট এ মিনিট,' বলল ইলিয়াস। 'তুই যে বিষয়ে আলাপ করতে চাইছিস, তা ওই বাসায কবা যাবে না।'

'কেন?'

'পবে বলব'।

'কোথায় করা যাবে তাহলে?'

'তুই সোজা ধানমণ্ডি ২৮ নং রোড ধরে আয়। একদম সোজা। আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি....।'

লিয়াকত মারা গেল একদিন পরে। ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। ডাক্তারী রিপোর্টে বলা হলো: মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত মৃত্যু।

পুলিশ কয়েক দফা জেরা করল সুরভিকে। জেরা করল জয়নালকেও। কিন্তু কোন কিছু

উদ্ধার করতে পারল না। ছোট ছোট দুটি বাচ্চা ধাক্কা দিয়ে লিয়াকতকে ফেলে দিয়েছে—এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। পুলিশ তাদের ডায়েরীতে একটা ইউ. ডি. কেস লিখে রাখল।

'পুলিশ কিছু করতে পারবে না।' চায়ের কাপে চুমুক দিল ইলিয়াস। 'খামোকা সময় নষ্ট করবে।'

'কেন পারবে না?' জানতে চাইল জয়নাল।

'কারণ, এটা পুলিশের কেস নয়।'

'তাহলে? এটা কার কেস?'

'কার কেস বলতে বলতে পারব না। ভূতপ্রেত নিয়ে কারা ডিল করে আমি জানি না।'

'তুই কি আমার সাথে ইয়ার্কি করছিস?'

'ইয়ার্কি করব কেন?'

'ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিস নাকি?

'না।'

'তাহলে?'

'তোকে যতক্ষণ ধাক্কা দেয়নি, ততক্ষণ তুই ব্যাপারটা বুঝবি না। একবার ধাক্কা খেলেই বুঝবি ভূত-প্রেত বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করার জন্য হাতে সময় কত কম থাকে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' জোর গলায় সমর্থন জানাল সুরভি। 'একদম সময় দেয় না।'

'কারা সময় দেয় না?' মহা বিরক্ত হলো জয়নাল।

'ওই...মানে...ওরা আর কি।' ইলিয়াসের দিকে আঙুল দেখাল সুরভি। 'উনি যাদের কথা বললেন।'

'বোকার মত কথা বোলো না। ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই।'

'আমাকে ধাক্কা দিল কে তাহলে?'

'তোমাকে কেউ ধাক্কা দেয়নি। তুমি এমনি এমনি পড়ে গেছ।'

'বাহ্! এমনি এমনি পড়ে যাব কেন?

'কারণ, তোমার ব্রেইন উত্তেজিত ছিল।'

'জাস্ট এ মিনিট,' বলল ইলিযাস। 'দেখা যাচ্ছে ওই সিঁড়ির কাছে এলেই সবার ব্রেইন উত্তেজিত হয়। বিষয়টা কি?'

'সবার কথা আসছে কেন?' ভুরু কুঁচকে তাকাল জয়নাল।

'তুই যখন সিঁড়িতে অশরীরী পায়ের আওয়াজ শুনেছিলি, তখন কি তোর ব্রেইন ঠিক ছিল?

'ঠিক থাকবে না কেন?'

গলা ছেড়ে হাসল ইলিয়াস। 'তোর লজিক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একটু আগেই বলেছিস, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই।'

সিঁড়ি

কপালের ঘাম মুছল জয়নাল। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে বয়স বেড়ে গেছে।

ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে বসেছে ওরা। ডিনার সেরেছে একটু আগে। খোলা বাতাসে চুল উড়ছে তিনজনেরই। আকাশে গোল থালার মত চাঁদ। পুর্ণিমা না হলেও তার কাছাকাছি কিছু একটা হবে। কারেন্ট চলে যাওয়ায় বেশ ভাল লাগছে পরিবেশটা। একটা গ্রাম-গ্রাম ভাব চলে এসেছে। ধানমণ্ডির এই এলাকায় কারেন্ট চলে গেছে পনেরো মিনিট আগে।

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল জয়নাল। তোর কি ধারণা, ওই সিঁড়িতে কিছু একটা আছে?'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল ইলিয়াস। 'ওসব বাদ দে। অন্য কিছু বল। তোদের বিয়ের গল্প বল। ভাবীর সাথে কি পূর্ব পরিচয় ছিল?'

'তুই সেদিন আমাকে ওই বাসা থেকে পালিয়ে যেতে বললি কেন?' হিস হিস করে বলল জয়নাল।

'এমনি বলেছিলাম।'

'মিথ্যে কথা। তুই কিছু একটা চেপে যাচ্ছিস।' ইলিয়াসেব দিকে তর্জনী তাক করল জয়নাল। 'ওই সিঁড়ি সম্পর্কে কি জানিস বল।'

'ওই সিঁড়ি সম্পর্কে কিছুই জানি না। বিলিভ ইট অর নট।' জয়নালকে রেগে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল ইলিয়াস, 'তবে আমি একটা গল্প জানি। অদ্ভুত গল্প। তোর সিঁড়ির সাথে এটার কোন সম্পর্ক থাকতেও পারে। শুনবি নাকি?'

'বল।'

ইলিযাস পায়ের ওপর পা তুলে বসল। 'তখন মাত্র বিয়ে কবেছি। মেহেদীর আমেজ পুবোপুরি কাটেনি। ওই অবস্থায় চাকরি পেয়ে গেলাম একটা এনজিও-তে। অফিস ঢাকায়। বউ ফেলে রেখে জয়েন কবতে চলে এলাম। সময়টা ছিল ১৯৮১ সাল।

ইলিযাসকে থামিযে দিল জয়নাল। 'এ-ই তোর গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'এটা তোর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। গল্প হবে কেন?'

'গল্প বলছি এ কারণে যে, আজ পর্যন্ত বহু লোকের কাছে এই ঘটনা বলেছি। পুলিশকেও বলেছি। কাউকে বিশ্বাস করাতে পারিনি। সবার ধারণা এটা গল্প। একটু পরে তোদেরও এই ধারণা হবে।'

'ঠিক আছে বল।'

'নতুন নতুন বিয়ে করলে ছেলেরা বাসা থেকে বের-টের হয় না। সন্ধ্যা সাতটার পরে বাসায় মেহমান এলে বিরক্ত হয়। একটু পর পর ঘড়িতে সময় দেখে। হাই তোলে। অফিসের টেলিফোন ঘনঘন এনগেজড পাওয়া যায়। আমার বেলায় সেরকম কিছু হলো না। সদ্য বিবাহিত একজন লোকের চাকরি জীবন শুরু হলো ব্যাচেলারের মত।'

সুরভি হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেল। জয়নাল বলল, 'তারপর? বউ নিয়ে এলি?'

ইলিয়াস হাসল। 'বউ নিয়ে এলে কি আজ তোদের বাবুর্চির রান্না খাওয়াই?'

'তাহলে?'

'সবকিছু ঠিকঠাক করে ওকে নিয়ে আসব, এ সময় ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনাই হলো আমার গল্প।'

'এর সাথে সিঁড়ির কি সম্পর্ক?' জানতে চাইল জয়নাল।

'আছে, সম্পর্ক আছে। গল্প শুনলে বুঝতে পারবি। সিগারেট চলবে?'

'দে।'

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল ইলিয়াস। নিজেও একটা নিল।

'ঢাকায় বাসা পাওয়া যে কি ঝক্কি তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। সস্তা দামের হোটেলে থাকি, সারাদিন অফিস করি আর সন্ধ্যাবেলায় বাসা খুঁজে বেড়াই। এরকম ঘুরতে ঘুরতে একদিন স্টেডিয়াম মার্কেটে নাসিমা আপার সাথে দেখা।'

'কার সাথে?' নড়ে চড়ে বসল সুরভি।

'নাসিমা আপার সাথে। ভাল নাম নাসিমা আকতার। আপনাদের বাড়িওয়ালার স্ত্রী।'

'আগে থেকে চিনতেন?'

ইলিয়াস হাসল। 'নাসিমা আপা আমার দূর-সম্পর্কীয় কাজিন। বযসে দু'বছরের বড়। শৈশবের খেলার সাথী।'

'তাবপর?'

নাসিমা আপার সাথে আপনাদের বাড়িওযালা ..কি যেন নাম. .এ, টি, এম, মুসাও ছিল। লোকটাকে আগে দেখিনি।

আমি থাকাব জন্য বাসা খুঁজছি জানতে পেরে সে নিজেই জানাল সে বাসা ভাড়া দেবে। আমি বোকাব মত বাজি হয়ে গেলাম।

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল ইলিয়াস। দু'নম্বর ভুলটা করলাম নাসিমা আপার সাথে মাখামাখি কবে। নাসিমা আপা ছিল আমাব বড় বোনেব মত। আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি যে এ টি. এম. মুসা আমাকে সন্দেহ করছে।

জয়নালের চোখের দৃষ্টি আরেকটু তীক্ষ্ণ হলো।

'একদিনের ঘটনা বলি। এ. টি. এম. মুসা গেছে টাঙ্গাইল। বাসায় নাসিমা আপা একা। কাজের ছেলেটি এসে খবর দিল নাসিমা আপার খুব জ্বর। আমি কোন কিছু না ভেবেই সিঁড়ি ভেঙে ওপরের দিকে ছুটলাম।'

সিগারেটে লম্বা করে টান দিল ইলিয়াস।

'জ্বর ছিল ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি ছিল না। আমি কাজের ছেলেটিকে ডাক্তারের কাছে পাঠিযে নাসিমা আপার পাশে বসলাম। একটা হাত রাখলাম কপালে। এই সময় এ. টি. এম. মুসা এসে ঢুকল।'

ব্যালকনিতে পিনপতন নিঃস্তব্ধতা। কারও মুখে কোন কথা নেই।

'পরের মাসে নাসিমা আপার একটি ছেলে হলো। চাঁদের মত ফুটফুটে ছেলে। বেচারির

'খুব শখ ছিল ছেলের। বাড়িওয়ালারও। কিন্তু খুশি হতে পাবল না কেউ। বাড়িওয়ালার চেহারা আবলুস কাঠের মত হলেও এই ছেলের গায়েব বঙ হলো ফবসা। চিবুকের কাছে একটি তিল।'

অন্ধকারে নিঃশ্বাস নিল সুরভি। চাঁদের আলোয় ইলিয়াসের ফর্সা চেহারা চিকচিক করছে। তিলটাও।

'বছর না ঘুরতেই ছেলেটা মারা গেল। কিভাবে মারা গেল বলতে পারি না। শুনেছি হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে গেছে।'

'তুই তখন কোথায়?' জানতে চাইল জয়নাল।

'অফিসে।'

'আর তোর বউ?'

'লালমনিরহাট।'

'লালমনিরহাট কেন?'

'ও তখন চাকরি করছে একটা স্কুলে। বেসরকারী স্কুল। চাকরির খুব শখ ছিল জোবেদার। আমিও না করিনি।'

সিগারেট নিভিয়ে ফেলল ইলিয়াস। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

'তাবপব?' ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সুরভি।

'তাবপর কি হলো?' জানতে চাইল জয়নাল।

ঘড়ি দেখল ইলিয়াস। বাসায় যাবি না? রাত এগারোটা বাজে।'

'বাসাব গোষ্ঠী উদ্ধার করি,' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জয়নাল। 'তারপর কি হলো বল।'

'তারপর আর কি হবে? পরের সপ্তাহে অফিসের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাটে চলে এলাম। ফ্ল্যাট খালি হয়েছিল আগেই। কিন্তু তাহেরা মঞ্জিল ছেড়ে যাব কি-না সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না।'

ইলিয়াস জগ থেকে পানি ঢেলে ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেলো। কারেন্ট চলে এল এ সময়।

'তাহেরা মঞ্জিলের সাথে ওটাই আমার শেষ সাক্ষাৎ।'

'নাসিমা আপার সাথেও?' জানতে চাইল সুরভি।

'নাসিমা আপার সাথেও।'

জয়নাল তীক্ষ্ণ চোখে ইলিয়াসের দিকে তাকাল। 'তোর কি মনে হয় না এটা একটা মার্ডার কেস?'

'মনে না হওয়ার কি আছে? এটা তো পানির মত পরিষ্কার।' ইলিয়াস আরেকটা সিগারেট ধরাল। 'মজার কথা কি জানিস?' বাড়িওয়ালা আজ পর্যন্ত একবারও ছেলের কবর দেখতে যায়নি।'

'বলিস কি?'

'হ্যাঁ।'

'পুলিশকে জানিয়েছিলি?

'না।'

'কেন?'

'ওখানেই তো সমস্যা। আমি যখনই পুলিশকে জানানোর জন্য থানায় যাই, আমার সাথে সাথে ওই ছেলেটাও যায়। পা জড়িয়ে থামানোর চেষ্টা করে।'

'কোন্ ছেলেটা?' চমকে উঠল জয়নাল।

'বাড়িওয়ালার সেই ছেলেটা!'

'মরা ছেলেটা?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব।'

'একটা কথা তখন বলা হয়নি। আমি যেদিন ওই বাসা ছেড়ে চলে আসি, আমার সাথে সাথে সেই ছেলেটাও চলে আসে।'

'অসম্ভব।'

'দিনের বেলায় মাঝে মাঝে ও বাড়ির সিঁড়িতে খেলতে যায়। লোকজনের সাথে মজা করে,' বলল ইলিযাস। যেন জয়নালের কথা তার কানেই ঢোকেনি। 'আবার রাতের বেলায় ফিরে আসে।'

'তোকে থানায় যেতে বাধা দেয় কেন?'

'ওব বিশ্বাস, মামলা হলে বাবার ফাঁসি হয়ে যাবে। তখন মা-কে কে দেখবে?'

জয়নাল স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইলিয়াসের মাথা যে পুরোপুবি খারাপ হয়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ রইল না।

'সে কি রোজ রাতেই এখানে আসে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'আজ আর আসবে না, তাই না?' জয়নালের গলায় বিদ্রূপ।

ইলিয়াস শব্দ করে হাসল। 'আমি গোড়াতেই বলেছি আমার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করে না। তোরাও করবি না। যদি ছেলেটিকে এনে হাজির করি, তাহলেও না।'

'কেন?'

'আগেও বহু লোকের সামনে তাকে হাজির করেছি। কোন লাভ হয়নি। ওরা তো বাড়িওয়ালার মরা ছেলেটাকে দেখেনি। কি প্রমাণ আছে এই ছেলেই সেই ছেলে?'

সুরভি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। 'আমি দেখেছি। আমি চিনতে পারব। তাকে হাজির করুন।'

জয়নাল আশ্চর্য হয়ে গেল। 'কোথায় দেখেছ।'

'নাসিমা আপার কামরায়', বলল সুরভি। 'দেয়ালে টাঙানো ছবিতে।'

ইলিয়াস আবারও হাসল। যেন খুব মজা পেয়েছে।

'তাকে তো আপনি একটু আগেই দেখেছেন। চিনলেন না কেন?'

'কোথায়?' চমকে উঠল সুরভি।

'একটু আগে যে সিগারেট দিয়ে গেল?'

খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

'অন্ধকার ছিল,' অবশেষে বলল সুরভি। 'এখন কারেন্ট এসেছে। ব্যালকনির বাতিটা জ্বালান। তারপর ডাকুন।'

ব্যালকনির বাতিটা জ্বালাল ইলিয়াস। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাকে যেন ডাকল।

সময় দাঁড়িয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে।

সিঁড়ি বেয়ে একজোড়া কচি পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

মাচলামগিরির বাঘ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি জেলায় মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব অনেক দিনের। রাজধানী ভবানী পাটনার বন-দপ্তরে বাঘের হাতে মানুষ মারা পড়ার খবর যা এসে পৌঁছায়— তা শতকরা তিরিশ ভাগেরও বেশি নয়। অনুন্নত, জঙ্গলাকীর্ণ দূরবর্তী গ্রাম বা বস্তিতে যে সব মানুষ বাঘের কবলে পড়ে— বা আহত হয়ে পড়ে মারা যায়, সে সব খবর সাধারণত সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হয় না। যে সব অঞ্চলে বাঘের অত্যাচার বেশি তাদের মধ্যে কাশীপুরের স্থান দ্বিতীয়।

আমি যখন কাশীপুরে এসে পৌঁছলাম, তখন নতুন বাংলোটি তৈরি হয়নি। ভৈরবের একখানা খড়ে-ছাওয়া ঘরে আমরা ভাগাভাগি করে থাকতাম। কাশীপুরের পুরানো ফরেস্ট বাংলোটির তখন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। পুরানো পরিত্যক্ত বাংলোর জীর্ণ জানালা দরজা কবে উধাও হয়ে গেছে। খড়ের ছাদ ভেঙে ভিতরে ঝুলে পড়েছে। ঘন ঝোপ-জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে, বড় বড় ঘাস আর বুনো লতাপাতার আড়ালে ফাটল ধরা দেয়ালের বিবর্ণ সাদা রং

দৈবাৎ চোখে পড়ে। বনের দমকা বাতাস যখন সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন দূর থেকে মনে হয়— কে যেন ওখানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

স্থানীয় অধিবাসীরা বলে, ভূতের বাংলো— ওটা প্রেতাত্মার নির্জন আস্তানা। ঝড়ের রাতে অলৌকিক ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে পরিত্যক্ত ঘরটা, ঝুপড়ির আড়াল থেকে ওরা শোনে সেই শব্দ। ওরা বলে— নিশুতি রাতে বাঘ ওখানে আশ্রয় নেয় চুপিসাড়ে। বাঘের সঙ্গে ভূতের নাকি দোস্তি আছে। এবং কোন এক দুর্যোগের রাতে সে কাহিনীর চমকপ্রদ অভিনবত্বে আমার মত হয়তো আপনিও অভিভূত হয়ে পড়তেন। আমার মত নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাশীপুরের জঙ্গলে যদি কখনও একা একা ঘুরে বেড়াতেন, তাহলে বুঝতেন কেমন করে জঙ্গলের প্রভাব ধীরে ধীরে মনের অবচেতন কোণে দানা বাঁধে।

তখনকার দিনে কালাহাণ্ডি জেলায় ঠিকাদাররা বিশেষ সুবিধে করতে পারত না। বাঘের ভয়ে কাঠুরেরা বনে ঢুকতে ভয় পেত। মুনাফার ঘরের ফাঁকটা ভরাতে ছুটতে হত অন্য অঞ্চলে ঠিকাদারের দলকে। অসংখ্য বিশাল প্রাচীন বন-বৃক্ষ লতা-পাতায় জড়িয়ে আকাশের আলো ঢেকে রাখত। সেই নিবিড় পত্র-ছাতার নিচে দুর্ভেদ্য বনে অনায়াসে জঙ্গল পরিক্রমায় সমস্ত প্রয়াসকেই যেন ব্যর্থ করে দেয়। পায়ে চলা সুঁড়ি পথ ছাড়া ঘন বনে প্রবেশ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। বুনো কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে, লতা-পাতার নাগপাশ আর মাকড়সার নোংরা জালে আপনার শিকারের অফুরন্ত উদ্যম যে কখন জল ঢালা উনুনের মত নিভে গেছে বুঝতেও পারবেন না। এহেন পরিস্থিতিতে দিনের শেষে ক্লান্ত পবিশ্রান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে ধূমপানের গভীর আমেজে যখন চোখের পাতা নেমে আসে, তখন বস্তির অর্ধ-নগ্ন সবল মানুষগুলো গুটি গুটি করে এসে বসবে, আপনার সান্নিধ্য বাঁচিয়ে। আর আপনার হয়বানির জন্য চুকচুক করে আফসোস করে চুট্টা ধরাবে।

আপনি যদি ভালবেসে ওদের কাছে টেনে নেন, দেখবেন আপনার নিঃসঙ্গ দিনগুলোকে ভাবিয়ে তুলতে ওরা কত পটু। মানুষখেকোর পিছনে ঘুরতে ঘুরতে যখন দুর্ভাবনা আর ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বেন, আপনার শোনা গল্প আর পুঁথিপড়া বিদ্যা যখন অচল হয়ে পড়বে— ওরাই তখন আপনার জঙ্গলের গুরু। আপনাব মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার এমন সঙ্গী আব জীবনে পাবেন না।

অরণ্যের কোলে যখন ঝিমিয়ে পড়া আগুনের কুণ্ডের পাশে বাতের আঁধার থমকে চেয়ে থাকবে, তখন শুরু করবে ওরা একের পর এক জঙ্গলের কাহিনী। যা ওরা শুনিয়ে এসেছে আপনার মত আরও অনেককে, এবং কোনদিনই ওদের সে কাহিনী শেষ হবে না। চুট্টার কটু গন্ধে হয়তো মহুয়া গাছের ডালে কোন ঘুমন্ত পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উঠবে, হয়তো আচমকা ককিয়ে উঠবে রাতচরা কোন শিকারী পাখি। নতুবা কোন কৌতূহলী শৃগাল আপনাকে চুপি চুপি নিরীক্ষণ করবে অন্ধকারের আড়াল থেকে, কুণ্ডের আভায় দেখবেন ওর চোখ দুটো জ্বলছে,— গা আড়াল দেবে আরও কত রাতের প্রাণী। আপনার ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন থাকে, হয়তো সেই মুহূর্তেই শুনতে পাবেন হায়নার হাসি। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হায়না হাসে,

হা-হা-হা....। তৃণ মুখে হরিণ নিথর হয়ে শোনে দুর্বোধ্য হাসি। রাতের অরণ্য এক অপার বিস্ময়, আপনি-আমি এখানে কত তুচ্ছ! মনে হবে এ অন্য জগৎ, আমাদের চেনাজানার বাইরে। কোন কিছু দিয়েই যেন এর সীমা ছুঁতে পারা যায় না। সেই বিচিত্র বিরাটত্বের কাছে মনে হবে— আমরা কত অজ্ঞ, কত অসহায়, আর কি অকিঞ্চিৎকর!

নিরক্ষর— মিশকালো জংলী মানুষগুলোর কাহিনী আপনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠবে, মনে হবে আপনি যেন হাজার বছর পিছিয়ে গেছেন। ওদের বর্ণিত কাহিনীগুলো যখন রূপ ধরে আপনার মনের পর্দায় ফুটে উঠবে, তখন কোন কেতাবী বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন না। যে ভাঙা বাংলোর কথা একটু আগেই বলেছি, সেটা যখন ভাল ছিল— তখন শিকারীরা আসত। সাহেব শিকারীরা আসত, আর দেশীয় শিকারীরা আসত রায়পুর, ভিজিয়ানা গ্রাম থেকে। অন্ধকার পক্ষের এক গভীর রাতে বাংলোর অর্গলবদ্ধ দরজার খিল কেমন করে আপনা হতেই খুলে গেল। হাওয়া নেই, বাতাস নেই তবু খিল খুলে গেল নিঃশব্দে। ঘরে শিকারী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কেউ জানল না, কেউ বুঝল না কেমন করে মানুষখেকো বাংলোর ঘুমন্ত শিকাবীকে তুলে নিয়ে গেল। শুধু ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আর মানুষখেকোর পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশ পর্যন্ত এর কিনারা করতে পারেনি। নিয়ন লাইটের নিচে বসে এইসব কাহিনী অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে...!

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর স্টেশন থেকে অন্ধ্রপ্রদেশেব ভিজিয়ানাগ্রাম পর্যন্ত যে ব্রাঞ্চলাইনটা কালাহাণ্ডির গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গেছে, তাবই মাঝপথে নেমে বাসে চাব-পাঁচ মাইল পাড়ি দিলেই বন অফিসের সামনে পৌঁছে যাবেন। ওখান থেকেই হাঁটা পথ। পথ হারাবার কোন ভয় নেই, ধুলো-রাস্তাটাব দু'পাশের গভীব জঙ্গল ধীবে ধীরে আপনাকে কাছে টেনে নেবে। পথ সঙ্কীর্ণ হতে হতে কখন যে আপনি কাশীপুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছেন জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত জানতেও পারবেন না। কোরাপুট জেলার বাযগাড়া থেকে কাশীপুবের জঙ্গলে আসার একটা মোটর রাস্তা আছে, আমি এ পথ দিয়েও গিযেছি— অনেক সময় লাগে। ভবানী-পাটনা থেকেও মোটরে কাশীপুর যাওয়া যায়। মানুষ খেকোর ভয়ে এইসব পথে সন্ধ্যার পর কোন মানুষ হাঁটে না। দিনেব বেলায়ও আমি কোন একলা মানুষকে দেখিনি, যখনই দেখা হযেছে তিন-চাব জনেব দল পথের মাঝখান দিয়ে ভয়ে ভয়ে হাঁটছে।

আমি যে সময়ের কথা লিখছি— তখন কালাহাণ্ডি জেলায় মানুখেকো বাঘ মারবার জন্য কোন পারমিশনের দরকার হত না। প্রত্যেক বাঘের উপর দু'শো টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। রামপুর মদনপুরের এক শিকারী এই রকম একটা বাঘ মাববার জন্য রাতের পর বাত খাঁচায কাটিয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার মতলব করলেন, ঠিক শেষের সেই রাতে একটা বাঘ তার খাঁচার তলা দিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ছিল। বাঘটার দুর্দিন ঘনিয়ে আসায় শিকারীর ভাগ্য হঠাৎ খুলে গেল। পাঁচশো বোরের ভারী বাইফেলটা তুলেই ঘোড়া টিপে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দ করে গুলিটা বাঘটার বাঁ কাঁধ বরাবর ছুটে গেল। তারপর মোটা

হাড় ভেঙে হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করবার পূর্বেই হঠাৎ স্কীড করে নিচের দিকে নেমে যাওয়ার দরুনই সে যাত্রায় বেঁচে গেল বাঘটা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আছড়ে পড়ল পাশের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে, তারপর মুহুর্মুহু গর্জন করে বনের গাছপালা ভেঙে তছনছ করে ফেলল। শিকারী হয়তো এরূপ পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিলেন না, বাঘটার আক্রোশ দেখে কাঠ হয়ে বসে রইলেন খাঁচার আড়ালে। বাঘটা যে কত ক্ষেপে গিয়েছিল তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলেন সকাল বেলায় গাছ থেকে নেমে। মোটা মোটা ঝোপগুলো শেকড়-সুদ্ধ টেনে তুলে ফেলেছে, একটা মোটা গাছের ডাল প্রচণ্ড রাগে কামড়ে কামড়ে সব ছাল তুলে ফেলেছে, আর মাটি আঁচড়ে জায়গাটা একবিঘত সমান গভীর গর্ত করে রেখে গেছে। তারপর সেই চষামাটির উপর রক্তের ফোঁটা ফেলতে ফেলতে নেমে গেছে নালায় জল খেতে। জল খেয়ে ওপারের ঘন জঙ্গলে উঠে গেছে। নালা পর্যন্ত বাঘটার পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। বাঁ-দিকের আহত পায়ের ছাপ কোথাও পড়েনি, বরাবর তিন পায়েই হেঁটেছে। খ্যাপা বাঘটার পিছনে আর না যাওয়াই ভাল বিবেচনা করে শিকারী রামপুর মদনপুরে ফিরে গেলেন।

এই ঘটনার পর বাঘটাকে আর দেখা যায়নি। সবাই ধরে নিয়েছিল আঘাতের যন্ত্রণা নিয়ে বাঘটা মারা পড়েছে। এর কয়েকদিন বাদেই গভীর জঙ্গলে শকুনদের উড়তে দেখা গেল। তখন আহত বাঘটার পরিণতির শেষ সিদ্ধান্ত টানা হলো এই বলে যে— সে এখন ক্ষুধার্ত শকুনদের দ্বারা উদরস্থ হচ্ছে। বাঘটা যে সব পরিবারের মানুষ ধরেছিল বা গরু মেরেছিল, তারা সবাই ফাঁকায় বেরিয়ে এসে শকুনের ওড়া দেখল। এবং সেই সভায় স্থির হলো, এরপর যে কোন একসময় রামপুর মদনপুরের শিকারীদের নিকট খবর পৌঁছে দিতে হবে।

তারপর আরও তিন মাস কেটে গেছে, বাঘটার আর কোন অস্তিত্ব নেই— শুধু আছে গল্প। জঙ্গলের কোন গল্পই ওরা ভোলে না। যখনই সময় সুযোগ হয়, লোক জমে উঠলেই ওদের গল্প উঠে পড়ে। বেশির ভাগই পুরানো গল্প। খোঁড়া বাঘটার গল্পও হয়, গুলি খাওযার পর বাঘটা কী রকম গর্জন করে উঠেছিল, তার তুলনা করবার ভাষা ঠিক যোগায না। কেউ বলে, দেয়ালে টাঙানো ছবিখানা ঝনঝন করে পড়ে গিয়েছিল, কেউ বলে কানের তালা ছাড়াতে এক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। ভৈরব সকলকে ঠেলে এগিয়ে এসে চোখ নাচিয়ে বলত— বংশীর দুঃসাহসী ডাঁটালো বউটার ঘোমটা পর্যন্ত খসে পড়েছিল, এই কথা শুনে সকলেই হেসে উঠতাম। বেচারার ছেলেপুলে না হওয়ায় অফুরন্ত যৌবন ছিল যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি। সব থেকে বড় খবর, পিলুর গর্ভবতী গাইটার স্রাব শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রচণ্ড গর্জন শুনে আতঙ্কগ্রস্ত গরুটা ছটফট করে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়তেই স্রাব শুরু হয়ে গেল। বাঘটা মরবার সময় পর্যন্ত ওদের এইসব ক্ষতি করায়, ওরা তার কথা সহজে ভুলতে পারল না।

গ্রামের জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে যাওয়ায় একদিন মেয়ে পুরুষের একটা মস্ত দল জঙ্গলে গিয়েছিল কাঠ সংগ্রহ করবার জন্য। সমস্ত দুপুর ধরে ওরা জ্বালানী সংগ্রহ করল, তারপর

মস্ত মস্ত বোঝাগুলো মাথায় চাপিয়ে প্রায় দিন কাবার করেই ঘরে ফিরল। মস্ত বোঝাটা নামিয়ে রাখতেই বংশীর খেয়াল হলো কুড়ুলটা নেই। মনে পড়ল, আম গাছটার গোড়ায় যেখানে বসে বোঝাটা শক্ত করে বেঁধেছিল— সেই খানেই কুড়ুল ফেলে এসেছে। কুড়ুলটা যদি সারা রাত ওখানে পড়ে থাকত কেউ চুরি করত না, কিন্তু খোঁড়া বাঘটা মারা পড়বার পর লোকের সাহস বেড়েছে। বউকে খবরটা শুনিয়েই বংশী ছুটল কুড়ুলটা আনতে। জঙ্গলে পৌঁছে চার ধারটা একবার দেখে নিয়েই হনহন করে চলল আমগাছের দিকে। তখনও সূর্যের আলো গাছের মাথায় চিক চিক করছিল। কুড়ুলটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। বংশী সবিস্ময়ে দেখল, একটা বাঘ ওর ফেরার পথ আগলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঘটার দিকে চোখ রেখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারছিল ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে। বাঘটা মাড়ি বার করে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

সেই দৃশ্য দেখে বংশীর মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। সামনের আম গাছটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে মরীয়ার মত দৌড় শুরু করল। আতঙ্কে পাগলের মত বন-বাদাড় ভেঙে ছুটছে তো ছুটছেই। শরীরের সব শক্তি নিঃশেষিত প্রায়, বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে— চোখ ফেটে রক্ত বের হওয়ার উপক্রম। বাঘ তবুও ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েনি, বংশীর আশা হলো— হয়তো বাঘটা ওকে তাড়া করেনি। মুখ ফিরিয়েই দেখে বাঘ ওর পিছনে, তিন পায়ে ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। বংশী পড়েই যেত, যদি না গাছটা হাতের গোড়ায় থাকত। গাছটাকে জাপটে ধরে টাল সামলাল, তারপর কাঠবেড়ালীর মত সরসর করে উঠে পড়ল একেবারে মগডালে। গাঁছের ডালটা ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর কাঁপুনি যখন একটু থামল নিচে তাকিয়ে দেখে, খোঁড়া বাঘটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে মাড়ি বার করে চেয়ে রয়েছে।

এতক্ষণে বংশীর হুঁশ হলো, তাহলে রামপুর-মদনপুরের শিকারীর গুলিতে বাঘটা মরেনি! বাঘটা কুকুরের মত বসে হাঁফাচ্ছিল, ঝুলে পড়া জিহ্বা দিয়ে লালা ঝরছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় বাঘটাকে আর দেখা গেল না। বংশী কোমরের গামছাখানা খুলে গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে ভাল করে বেঁধে ফেলল, তারপর অভুক্ত অবস্থায়— দুর্ভাবনায় আর ভয়ে সারা রাত জেগে রইল ভোরের আশায়।

এদিকে রাত হয়ে গেল— তবু বংশী বাড়ি ফিরল না দেখে, ওর বউ লোক জড়ো করবার জন্য ভৈরবের বাড়ি গেল। তারপর পিলুর বাড়ি গেল। ওদের উত্তেজিত কথাবার্তা ও হট্টগোল শুনে আরও অনেকে এসে জড় হলো, কিন্তু রাতে জঙ্গলে যেতে কেউ সাহস করল না। অগত্যা ঠিক হলো সকাল হলেই ওরা বংশীর সন্ধানে বের হবে।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই বংশী দেখল গাছতলায় বাঘ নেই, তবু গাছ থেকে নামতে ওর সাহসে কুললো না। মরা বাঘটা আবার বেঁচে ওঠায় ওর আশ্চর্য হওয়ার আর সীমা ছিল না। এমন সময়ই ভৈরবরা দল বেঁধে ওকে খুঁজতে এল। মরা বাঘটার আবার বেঁচে ওঠার

খবর শুনে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল।

খোঁড়া বাঘটার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে দিনের শেষে যখন ডেরায় ফিরতাম, ভৈরবের বউ আমায় গরম এক কাপ চা এনে দিত। তখন ক্লান্তিতে আর আরামে আমার চোখ বুঁজে আসত। ঠিক সেই সময় ভৈরবরা এক এক করে এসে হাজির হত। অনেক রাত পর্যন্ত এইসব গল্প শুনতাম— যতক্ষণ না রাতের খাবারের ডাক পড়ত।

আমার এখানে আসার পর বাঘটার কোন শিকার জোটেনি। বড় গরু ধরবার ক্ষমতা ওর ছিল না। টোপ দেয়ার জন্য মহিষের বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারলাম না, কাশীপুরের গ্রামে মহিষের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সুতবাং গাছের ডালে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কত নিষ্ফল রাত গাছের ডালে বসে কেটে গেল— বাঘটার কোন পাত্তা নেই। সারাদিন জঙ্গলে ঘুরেও ওর কোন হদিস পাইনি, সব পরিশ্রমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে লাগল। বংশীকে ধরতে গিয়ে সেই যে ব্যর্থ হয়েছে, তারপর থেকে আর কোন সন্ধান নেই। আমি বাঘের আশা ত্যাগ করে ফিরে আসবার মতলব করলাম। ভৈরবদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ওদের গ্রামের খোঁড়া বাঘটার মৃত্যু আমার হাতে নেই।

রায়গাডা থেকে যে রাস্তাটা কাশীপুরে এসে শেষ হয়েছে, তার দৈর্ঘ্য নয় মাইলের মত। প্রথম পাঁচ মাইল পাহাড়ী রাস্তা, পায়ে হেঁটে, পাহাড় ডিঙিয়ে গেলে চার মাইল। আর মোটরে ঘুরে ঘুরে গেলে পাঁচ মাইল। পাহাড়টা পার হয়েই পথটা সোজা নেমে গেছে সমতল ভূমিব উপর দিয়ে উরী-গ্রামে। উরী-গ্রাম থেকে কাশীপুরের দূরত্ব চার মাইল। পাঁচ মাইল পাহাড়ী রাস্তাটা খুব বিপজ্জনক, লোক চলাচল নেই বললেই হয়। রায়গাডা থেকে দুই মাইল, আর উরী থেকে তিন মাইলের মাথায় আট-দশ ঘরের একটা বস্তি বাঘের ভয় থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে টিকে আছে জানি না। বস্তিটার নাম মাচলাম। মোটর রাস্তা থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে একটা অগভীর নালার ধারে, যে ক'খানা কুঁড়ে ঘর দৈবাৎ চোখে পড়বে— ওটাই মাচলাম। তখন ওখানে একটা চোলাই মদের ভাঁটি ছিল। বাঘের ভয় থাকা সত্ত্বেও কারা ওখানে মদ খেতে আসত জানি না, তবে মাঝে মাঝে পুলিসের হাঙ্গামা হত। ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাস্তা থেকে চিৎকার করে ডাকলেই মাচলামের লোক সাড়া দেবে, কিন্তু খাকী পোশাক পরা কোন লোক চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও মাচলামের বস্তি থেকে একটা টুঁ-শব্দও মিলবে না। মনেই হবে না ওই রকম ভুতুড়ে জায়গায় কোন লোক বাস করতে পারে।

আমি যখন কাশীপুরের ক্যাম্প তুলে দেয়ার মতলব করলাম, তখনই মাচলামের রাখাল বাঘের কবলে পড়ল। মাচলামের খবরটা উরীতে এসে পৌঁছল বেলা আটটায়, আর আমাদের গ্রামে সাড়ে নটায়। এইসব অঞ্চলে কী ভাবে সংবাদ আদানপ্রদান হয়, সে ভারী মজার— পরে বলব। এখন বাঘের খবর শুনে আমি দোটানায় পড়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম— মাচলামে যাব। ওখানে কিছু সুবিধা করতে না পারলে রায়গাডা হয়ে বাড়ি ফিরব। ভৈরব ও বংশীর সাহায্য না পেলে আমাকে অবশ্য এ মতলব ত্যাগ করে ভবানী পাটনা হয়েই

ফিরতে হত। ওরা মহা উৎসাহে আমার জিনিসপত্তর বেঁধে ফেলল। জিনিসপত্তর বলতে একটা বেডিং আর একটা কীট-ব্যাগ, রাইফেল তো আমার কাঁধেই রইল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা রওনা দিলাম। যখন কাশীপুরের সীমানা ছেড়ে গেলাম, তখন বেলা দশটা।

সাত মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে আমাদেব সময় লাগল তিন ঘণ্টার উপর। মাচলামের গাঁয়ে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা একটা বেজে গেছে। পথ-শ্রমের ক্লান্তি দূর করে খাওয়া-দাওয়া সারতে আরও এক ঘণ্টা লাগল। বেলা দুটোর পর ঘটনাস্থলে এলাম খোঁজখবর করতে। মাচলামের মাত্র একজন স্ত্রীলোকই শুধু এই ঘটনাটি দেখেছিল, অর্থাৎ রাখালের মা। বেচারী শোকে ও লজ্জায় আমাদের সামনে বের না হওয়ায়, একজন মুখপাত্রের মারফৎ খবরটা শোনা গেল। রাখালের বয়স মাত্র চোদ্দ-পনেরো বৎসর। গত দু'দিন ধরে সে আমাশায় ভুগছিল। গত রাতে হঠাৎ পায়খানার বেগ আসায় রাত দশটা নাগদ নালার ধারে গিয়ে বসল। ওর মা আলোর কুপিটা দোরগোড়ায় রেখে ঘুম চোখে দাঁড়িয়েছিল। নালার দূরত্ব মাত্র দশ-বারো হাত। ছেলেটি পেট চাপড়ে আমাশার যন্ত্রণায় কোঁৎ পাড়ছিল। সে শব্দ ওর মা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছিল। ওদের গাঁয়ে তখনও পর্যন্ত কোন মানুষ বাঘের কবলে পড়েনি বলেই মানুষ খেকোটার কথা সেই মুহূর্তে মনে আসেনি। সারাদিনের পরিশ্রমে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল বলে মা কেবলই হাই তুলতে লাগল। দবজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই কখন ঘুম এসেছিল বেচারীর— চটক ভাঙতেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখল, নালার ধারে যেখানে ছেলে বসেছিল, সে জায়গাটা শূন্য— ছেলে নেই। মা ভাবল— ছেলে জলসোচ করতে নালায় নেমেছে। ছেলেব নাম ধবে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেল। সেখানেও নেই, তখন চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ঘরে ফিবে এল— সেখানেও নেই, গেল কোথায়, তখন পাগলিনী মা সেই অন্ধকারে বেরুল ছেলেকে খুঁজতে। চিৎকাব, ডাকাডাকি তারপর কান্নার শব্দে বস্তির সব লোক উঠে পড়ল। সমস্ত বাত ওরা মাকে আটকে রাখে, তারপর সকাল হতেই নালাব ধাবে দেখে রক্ত আব বাঘেব পায়ের ছাপ। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়েছে রাযগাডাব পুলিস ক্যাম্পে আব উরীতে।

বস্তির অন্যান্য স্ত্রীলোকেবা বাখালের মাকে ঘিরে বসেছিল। আমরা নালার ধারে এসে দেখলাম, খানিকটা বক্ত শুকিযে কালো হযে গেছে। ধস্তাধস্তিব কোন চিহ্ন নেই। নালার পাডে পাথবে ভবা শক্ত জমিতে বাঘেব পাযের ছাপ নেই। পাঁচ-ছয় হাত দূরে কিছু একটা টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নের পাশেই নরম মাটিতে একটা পুরুষ বাঘের পাযের ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। দরজায় ঠেস দিযে দাঁড়িয়ে থাকার সময়— রাখালের মাব চোখে যখন তন্দ্রা নেমে এসেছিল, সেই সময়ই বাঘ চুপিসাডে এসে যেন আলগোছে তুলে নিযে গেছে ছেলেটাকে। রুগ্ন ছেলেটা টুঁ-শব্দ করবাবও সুযোগ পায়নি।

যাই হোক— নরম মাটিতে যেখানে পায়েব ছাপ রয়েছে, সেখানেও কোন রক্ত নেই, শুধু টেনে নিয়ে যাওযাব দাগ ছাড়া। বাঘটা রাখালকে ধরবাব পর মাত্র পাঁচ ছ'হাত পথ শূন্যে তুলে বেখেছিল, তাবপব বরাববই টানতে টানতে নিয়ে গেছে। আমি সেই মুহূর্তে যে বাঘটার

তল্লাসি চালাচ্ছিলাম— সেইটাই কাশীপুরের খোঁড়া বাঘ কিনা, জানবার জন্য পায়ের চিহ্নগুলো ভালভাবে দেখতে লাগলাম। ঝোপ-জঙ্গলেব জন্য অনেক দূর অনুসরণ করেও পাযেব চারটে দাগ কোথাও পরিষ্কার দেখতে পেলাম না। স্থানে স্থানে টেনে নিয়ে যাওয়াব দরুন দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এটা অপর কোন বাঘের কীর্তিও হতে পারে।

আধ ঘণ্টা চলার পর জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। ডান দিকে দেখলাম, একটা চষা খেত। খেতটার পাশেই খানিকটা জংলা জায়গা, যেটা গিয়ে মিশেছে উঁচু মোটর রাস্তাটার গায়ে। মোটর রাস্তাটা সমতল ভূমি থেকে প্রায় সাত-আট হাত উঁচু পাহাড় কেটে বার করা হয়েছে। আর বাঁ দিকের হালকা জঙ্গল নেমে গেছে চওড়া নালায়, যার ওপর থেকেই আবার শুরু হয়েছে টানা জঙ্গল মাচলাম পাহাড়ের কোল পর্যন্ত। এইখানেই ভৈবব ওকে প্রথম সনাক্ত কবল, কাছে গিয়ে দেখি মৃতদেহ নামিয়ে রেখে বাঘ কী কারণে দাঁড়িয়েছিল। তিনটে পায়ের দাগ ধুলোয় ফুটে রয়েছে। সামনের বাঁ-পায়েব চিহ্ন নেই— শুধু একটা খোঁচেব মত দাগ রয়েছে। ভৈরব নিঃশব্দে দেখিয়ে দিল খোঁচার মত দাগটা, আব ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল— আমবা খোঁড়া বাঘটার পিছনেই যাচ্ছি। আমি ৪০০/৫০০ বোরের দো-নলা রাইফেলটার ব্রীচ ভেঙে আবার দেখে নিলাম গুলি দুটোকে, তাবপর ব্রীচ বন্ধ করে সন্তর্পণে অগ্রসব হতে লাগলাম। আমার পিছনে ভৈবব, বংশী ও মাচলামের একজন লোক ছিল।

এতক্ষণে আমার সব সন্দেহেব অবসান হলো। চোদ্দ পনেরো বছরের একটা ছেলেকে বাঘ সমানে টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তার একমাত্র কারণ দৈহিক অক্ষমতা। এই অক্ষমতার দরুন আমাদেরও ভোগান্তির শেষ হলো। চষা খেতটাব বাঁ-দিকেব হালকা জঙ্গলে একটা বড ল্যাণ্টানা-ঝোপের নিচে মৃতদেহ লুকিয়ে রেখে গেছে, দূব থেকেই তা নজবে পড়ল। রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল বেখে ঝোপটাব চারধার ঘুরে দেখলাম। কাছে পিঠে কোথাও বাঘ নেই। ছোট্ট মড়িটার প্রায় অর্ধেকের বেশি খেয়ে গেছে। আমি আশা কবলাম— নালাব ওপারের বনে বাঘটা তখন বিশ্রাম করছে, যেখানে নালাব অনেকটা জল জমে একটা গভীর খাদেব সৃষ্টি হয়েছে গত বর্ষায়।

কাছে পিঠে এমন কোন বড় গাছ ছিল না, যে মাচা বাঁধব। কোথায় অপেক্ষা কবব ভৈরবের সঙ্গে যুক্তি করেও ঠিক করে উঠতে পারলাম না। কোন ব্যবস্থাই পছন্দ হচ্ছিল না। আবার মড়িব আশেপাশে বেশি ঘোরাফেরা করলে বা শব্দ করলে বাঘটা টের পেয়ে যেতে পারে, সে ভাবনাও ছিল। মড়িটাকে সব থেকে ভাল দেখা যায় চষা খেতটার মাঝখান থেকে। সেই সময় আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। খেতটার মাঝখানে এক হাত উঁচু যে আল রয়েছে, তার আড়ালে বসে দেখলাম— সব থেকে ভাল জায়গা, যদি ঠিকমত ঘেরা দিয়ে লুকিয়ে বসা যায়। ভৈরবকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। নিরাপত্তাব প্রশ্নটাই ও আগে তুলল, কিন্তু উপায়ান্তর নেই দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। তখন আলের পিছনের একটা চৌকো গর্ত খুঁড়ে আমাদের চারজনের মত জায়গা করা হলো। তারপব কাঁটাঝোপ কেটে এনে বেশ ভাল কবে চারধার ঘেরা দেয়া হলো। আমরা এক এক করে

মড়ির কাছে গিয়ে দেখতে লাগলাম। কাঁটাঝোপটা সন্দেহের উদ্রেক করে কিনা। যেটুকু অসুবিধা ছিল ঠিকঠাক করে নেয়া হলো। মোটামুটি কাজ শেষ হতেই ঘড়ি দেখলাম, বিকাল সাড়ে চারটে বেজে গেছে। শুক্লপক্ষ, আকাশে চাঁদ থাকবে— অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে আমরা চারজন সেই গর্তের মধ্যে আড়াল নিলাম। মড়িটা আমাদের কাছ থেকে কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে পড়ে রইল। এমন সময় লক্ষ্য করলাম, কতগুলো কাঁটাযুক্ত শুকনো ডাল আমার দৃষ্টিপথের উপর পড়ছে। ডালগুলোকে না ভেঙে বোকার মত বেঁকিয়ে আলের গায়ে গুঁজে দিলাম। তারপর শুরু হলো আমাদের অপেক্ষা করার পালা। বাঘটার আবার কতক্ষণ পরে ক্ষুধার উদ্রেক হবে, সেই আশায় স্থির হয়ে বসে রইলাম জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে।

বাঘটা যদি দিনের আলো থাকতে থাকতেই মড়িতে ফিরে আসে, তাহলেই সবথেকে ভাল হয়। যে রকম শান্ত নির্জন পরিবেশ তাতে বাঘটা ইচ্ছা করলেই আসতে পারে। আধ ঘণ্টা সময় কেটে গেল, বাঘটার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। জঙ্গল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। মড়ির কাছে বনের কোন প্রাণী এমন কী একটা পাখিও আসেনি।

সাড়ে পাঁচটার সময় বাঘটার ঘুম ভাঙল, ধীরে ধীরে নালার ওধারের জঙ্গলে এসে দাঁড়াল। প্রায় এক মিনিট ধরে দেখল চষা খেত, খেতের ওপারে মোটর রাস্তা আর মাচলামের পথ। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে নালায় নেমে খানিকটা জল খেয়ে এপারে উঠে এল। ঝোপগুলোকে ঘুরে ঘুরে এসে দাঁড়াল ল্যাণ্টানা-ঝোপটার ঠিক পিছনে। সূর্যের তেজ কমে এসেছে। আলোও ফুরিয়ে আসছে। বাঘটা তখনও ল্যাণ্টানা ঝোপের পিছনে — তাকে আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি, এমন সময় চলা আরম্ভ করল। ঝোপটাকে বেড় দিয়ে এসে দাঁড়াল মড়ির সামনে। মড়ির গা-টা একবার চেটে সোজা তাকাল আমাদের কাঁটাঝোপটার উপর দিয়ে, তখনও গুলি করবার সুযোগ আসেনি— কেন না, বাঘটা দাঁড়িয়েছিল সোজা আমাদের মুখোমুখি।

আমরা পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইলাম, যতক্ষণ না ও চোখ সরিয়ে নিল। তারপর মড়ি তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে আড় হয়ে। হালকা মড়ি নিয়ে নালার ওপারের জঙ্গলে যাওয়াই ছিল ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু তার আগেই ওর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে আমি রাইফেলের ট্রিগার চেপে দিলাম। প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই মড়িটা মুখ থেকে খসে পড়ল, আর বাঘটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। আমি খালি ব্যারেলটা ভরে নেয়ার আর সুযোগ পেলাম না, যে কাঁটাযুক্ত ডালগুলোকে তখন আলের গায়ে গুঁজে দিয়েছিলাম— রাইফেলের ঝটকায় সেগুলো স্প্রীং-এর মত সোজা হয়ে গেল। ফলে— একরাশ শুকনো ধুলো ছিটকে এসে পড়ল আমার চোখে। বাঁ-হাত দিয়ে চোখ দুটো ডলতেই যন্ত্রণায় কড়কড় করে উঠল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেও চোখের পাতা আর খুলে রাখতে পারলাম না।

ঠিক সেই সময়েই বাঘের গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বের হতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল, বাঘটা নিশ্চয় আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চোখ বোজা অবস্থাতেই রাইফেলের ব্রীচ ভেঙে ডানদিকের শূন্য ব্যারেলে গুলি ভরে নিলাম। কিন্তু ফায়ার করব কী করে! চোখে

তখন তাল-তাল অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমি পাগলের মত চিৎকার করে উঠলাম, ভৈরব-ভৈরব...

ভৈরব আমার পিঠে শুধু হাত রাখল বুঝতে পারলাম, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তারপরেই শুনলাম, কাঁটাঝোপ সরিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। আমাকে একলা ফেলে ওরা চলে যেতেই, আমি ভয়ে যন্ত্রণায় পাগলের মত চিৎকার করে বেরুবার পথ খুঁজতে লাগলাম। কাঁটা— কাঁটা, চতুর্দিকেই আমার কাঁটা! সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার থরথর করে কাঁপতে লাগল, চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল, রাইফেলটা তখনও দু'হাতে ধরা। আমি কী রকম যেন গুম হয়ে গেলাম। আমার সব চিন্তা শক্তি যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে, আমার গলা দিয়ে আর আওয়াজ বের হলো না। মনে হলো— আমি যেন তিলতিল করে মারা যাচ্ছি, এক অদ্ভুত হিম অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যেন কোন অন্ধকারে নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছি...!

সেই আধা-ঘোর আধা-জ্ঞান অবস্থায় যেন অনেক দূর থেকে মানুষের অস্পষ্ট কলরব শুনতে পেলুম। অনেক দূর থেকে সেই ক্ষীণ মনুষ্য কণ্ঠস্বর যেন আমার চেতনাকে নাড়া দিতে লাগল। কারা কথা বলছে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। কী বলছে তাও উপলব্ধি হচ্ছে না। কতক্ষণ— কতক্ষণ পরে ভৈরবরা আমার কাছে ফিরে এল, গর্তটা থেকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। তারপর বোতল খুলে জলের ঝাপটা দিয়ে আমার চোখ পরিষ্কার করে দিল। লাল টকটকে চোখ অসম্ভব ফুলে উঠেছে, বেশিক্ষণ চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছিলাম না— তখনও যন্ত্রণা হচ্ছিল।

ভৈরব কানের কাছে মুখ এনে বলল— বাঘ মরে গেছে। তারপর আমার হাত ধরে নিয়ে গেল বাঘটার কাছে। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, কোন রকমে দেখলাম— টাঙ্গির ঘায়ে বাঘটা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে।

পরে শুনেছিলাম, আমার রাইফেলের গুলি খেয়ে বাঘটা পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেনি। ঘড় ঘড আওয়াজ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। যদি বাঘটা আবার উঠে পড়ে— তখন আমি কিছুই করতে পারব না বিবেচনা করে, ওরা পিছন দিকে গিয়ে ধারাল টাঙ্গির কোপে ওকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। রাখালের মৃতদেহের অবশিষ্ট একটা গাছের ডালে বেঁধে, বাঘের খণ্ডগুলো কুড়িয়ে— আমরা সে রাতের মত মাচলামের গাঁয়ে ফিরে এলাম।

রামপুর-মদনপুরের শিকারীর গুলি খেয়ে বাঘটা যে যন্ত্রণা ভোগ করছিল, সেই দুর্বিষহ জীবনের অবসান ঘটাতে গিয়ে আমি চরম বিপর্যয়ের মধ্যে সাময়িক অন্ধ হয়ে গেলাম। আর চোদ্দ বছরের একটা রুগ্ন ছেলে অকালে প্রাণ হারাল। এ-কাহিনীর নেপথ্য নায়ক ভৈরব ও বংশী, বাঘটার খণ্ডগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে গেল কাশীপুরের বাসিন্দাদের দেখাতে— যে খোঁড়া বাঘটা এবার সত্য সত্যই মরেছে...। আমি রায়গাডার পথে রওনা দিলাম।

পর্যটক রহস্য

অজেয় রায়

গ্রাম থেকে বেরিয়ে দীপক যখন বাসরাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন শেষ বিকেল। স্টপেজে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করেও কিন্তু বোলপুরগামী বাসের দর্শন মিলল না। দীপক অস্থির হয়ে উঠল। কি ব্যাপার?

রাত নেমে গেছে। বোলপুর শহর অন্তত মাইল পাঁচেক পথ। একজন সাইকেল চালিয়ে এল উল্টো দিক থেকে। ওই গ্রামের আর একটি লোকও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল বাস স্টপেজে। বোঝা যায় বোলপুরের দিকে যাবে। সাইকেল-আরোহী গ্রামের লোকটিকে চেঁচিয়ে বলল, 'কি কত্তা, বাসের অপেক্ষায়? দেখুন কখন আসে? আসবে কিনা তাই ঠিক নেই।'

'কেন কি হয়েছে?' গ্রামের লোকটি জিজ্ঞেস করে।

সাইকেল চালক গতি কমিয়ে জবাব দেয়, 'খুব গণ্ডগোল। শুনলেম, রাস্তা অবরোধ করছে নানুরে। অ্যাকসিডেন্ট করেছে বাস। ধাক্কা মেরেছে সাইকেলকে। বাস আটকে দিচ্ছে পাবলিক।' বলতে বলতে সে এগিয়ে যায় স্টপেজ ছাড়িয়ে।

'ধুত্তেরি। কাজটা মাটি হলো। কাল যাব'— বকবক করতে করতে গাঁয়ের লোকটি ফিরে গেল।

রীতিমতো ভাবনায় পড়ল দীপক। সত্যি আর বাস না এলে কি করবে? এই অচেনা গ্রামে সে কোথায় রাত কাটাবে? নিরুপায় হয়ে আশ্রয় চাইলে এখানে যাহোক কিছু হয়তো মিলে যাবে কিন্তু নিজের বাড়িতে চিন্তা করবে খুব। আজই ফিরে আসবে বলে এসেছে। তার চেয়ে বরং হেঁটেই যাওযা যাক। বেশি বাত হবার আগেই পৌঁছে যাবে বোলপুর। লম্বা হাঁটা অভ্যেস আছে তার। সঙ্গে টর্চ নেই বটে। তবে পিচরাস্তা। মেঘহীন আকাশে অজস্র তারা আর ফালি চাঁদের আবছা আলোয় চলতে অসুবিধা হবার কথা নয়। বাসের প্রতীক্ষায় আব না থেকে দীপক বোলপুরের উদ্দেশে পা চালাল।

কিছুক্ষণ বাদেই দীপকের মনে হলো যে সে ভুল করেছে। রাতটা ওই গ্রামে কাটিয়ে দিলেই ভাল হতো।

চারপাশ কি ভীষণ নিঝুম, জনমানবহীন! পথেব দু পাশে খোলা মাঠ। ধানখেত। দুধাবে অনেক গ্রাম আছে বটে কিন্তু বসতিগুলি বেশির ভাগই বাসরাস্তা থেকে তফাতে। কিছু দূবেব মাঠ-ঘাট গ্রাম সব বাতের আঁধারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পথেব ধাবে ধারে ঝাঁকড়া গাছগুলো যেন জমাট অন্ধকারের স্তূপ। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। নানান কীট-পতঙ্গেব বিদঘুটে আওয়াজে গা ছমছম করে। এই পথে ইদানীং প্রায়ই ছিনতাই ডাকাতি হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় হাঁটা দেবার আগে মনে ছিল না দীপকেব। এখন আপসোস হচ্ছে। সঙ্গে অবিশ্যি টাকাকড়ি আছে সামান্যই। তবে হাতঘড়ি আর ক্যামেবাটা মোটামুটি দামী। ওই গ্রামে একটা প্রাচীন বিশাল জমিদারবাড়ি আছে। দীপক গিয়েছিল সেই বাড়ি আব পবিবাবেব ইতিহাস জানতে। ভগ্নপ্রায অট্টালিকাটিব বর্তমান বাসিন্দাদের ইন্টারভিউ নিতে। কিছু ফোটো তুলতে বাড়িটাব।

দীপকের চলার গতি কমে। রাস্তায় প্রচুব গর্ত। মেরামতি হয়নি বহুকাল। একবার হোঁচট খাবার পবেই সে সাবধান হয়ে যায়। এখন পা মচকালেই চিত্তির। খুঁড়িয়ে খুঁড়িযে বোলপুর অবধি পৌঁছনো অসম্ভব।

মাইলখানেক পেরিয়েছে দীপক। এতক্ষণ রাস্তায় একটিও লোকের দেখা মেলেনি। তিনটে ট্রাক শুধু পেরিয়ে গেছে— একটা নানুরেব দিকে, আর দুটো উল্টো দিক থেকে। তীব্র হেডলাইট জ্বেলে গর্জন করতে করতে দৈত্যের মতন ছুটে গেছে পাশ দিয়ে।

চলতে চলতে একবার পিছনে তাকিয়ে চমকে ওঠে দীপক। একজন হেঁটে আসছে হাত কুড়ি-পঁচিশ তফাতে। বেশ লম্বা। বড় বড় পা ফেলে এগুচ্ছে। হঠাৎ কখন ও দীপকের পিছু নিয়েছে খেয়াল হয়নি তো? একেবারে নিঃশব্দ চরণ। যেন হাওয়ায় ভেসে আসছে।

দীপক দ্রুত চিন্তা করে। লোকটাব মতলব কি? বদলোক নাকি? তক্কে তক্কে আছে। হযতো সুযোগমতো ঝাঁপিয়ে পডবে। কাছে অস্ত্র আছে নিশ্চয়। পেছন থেকে আচমকা

আক্রমণ করলে আত্মরক্ষা করা কঠিন। লোকটাকে এগিয়ে যেতে দিই। দীপক রাস্তার কিনারে সরে গিয়ে অল্প ঝুঁকে পায়ে হাত রাখে। তার সারা শরীর টানটান। বেগতিক বুঝলেই পাল্টা আঘাত হানবে।

পিছনের লোকটি হনহন করে এসে দীপকের কাছে থেমে যায়। মৃদু গলায় প্রশ্ন হয়, 'কি হলো?'

সেই আবছায়ায় পিছু নেওয়া লোকটিকে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে দীপক জবাব দেয়, 'জুতোটায় লাগছে। বোধহয় কাঁকর ঢুকেছে।'

লোকটি বলল, 'শক্ত চামড়ার জুতো বুঝি? বেশি হাঁটতে রবারসোল, ক্যাম্বিসের জুতো ভাল। এই আমার মতন।'

ওর কথা শুনে আর একটুক্ষণ দেখে নিয়ে লোকটি সম্বন্ধে দীপকের ধারণাটা কিন্তু পাল্টে যায়। ভয় কেটে যায়। একে তো মোটেই ছিনতাইবাজ দুষ্টুলোক মনে হচ্ছে না। বরং তারই মতন এক ভদ্র যুবক। তারই বয়সী মনে হয়। পরনে ফুলপ্যান্ট-শার্ট। পিঠে ঝোলানো হ্যাভারস্যাক জাতীয় বড়সড় একটা ব্যাগ। কথার ভঙ্গি ও স্বর মার্জিত। যদ্দূর বোঝা গেল কাটা কাটা মুখ।

খানিক ভরসা পেয়ে দীপক খাড়া হয়ে সহজ সুরে বলে, 'বোলপুর যাব। বাসের অপেক্ষায় ছিলাম। আসছে না অনেকক্ষণ। পাবলিক নাকি বাস আটকাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে হাঁটা দিয়েছি। আপনি কদ্দূর?'

'আমিও বোলপুর।' জানায় যুবকটি।

'আমার মতো বাস পাননি বুঝি?'

যুবকটি বলল, 'নাঃ! আমি গাড়ি চড়ি না। হেঁটে ঘুরি।'

'এ্যাঁ, হেঁটে!' দীপক তাজ্জব, 'কোত্থেকে আসছেন?'

'লাভপুর।'

'হেঁটে হেঁটে?'

'হুঁ।'

'উরি ব্বাস!'

চাপা হাসে যুবক। বোধহয় দীপকের বিস্ময় উপভোগ করে।

যুবকটির পোশাক, কাঁদের ব্যাগ, চলার ধরন, কথা ইত্যাদি বিচার করে একটা সম্ভাবনা চকিতে উদয় হয় দীপকের মনে। তবু নিশ্চিত হতে প্রশ্ন করে, 'আপনার বাড়ি বোলপুর?'

'না।'

'কোথায় তবে?'

'বজবজ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়।'

'বোলপুরে কদ্দিন থাকবেন?'

'থাকব না। আজ রাতে শুধু হল্ট করব।'

এবার অনুমানটা বলে ফেলে দীপক, 'আপনি কি পর্যটক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সবিনয়ে নিবেদন করে যুবক।

'বাঃ!'

এই নির্জন পথে এমন সঙ্গী পেলে খাসা হয়। দীপক যুবককে বলে, 'চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক গল্প করতে করতে। আপত্তি নেই তো?'

'না না। চলুন যাই। খুব ভাল লাগবে।' যুবকের কণ্ঠে খুশির ছোঁয়া।

দু কদম হেঁটেই দীপক বলল, 'আমি কিন্তু আপনার স্পিডে চলতে পারব না। জুতোটা বাগড়া দিচ্ছে।' এবার ভণিতা নয়, সত্যি কথাই জানিয়েছিল দীপক।

'ঠিক আছে, আমি আপনার স্পিডেই হাঁটছি।' যুবক সানন্দে রাজী।

হালকা মনে চলতে চলতে দীপক প্রশ্ন করে, 'আপনি কত দেশ ঘুরেছেন?'

'অনেক। ইন্ডিয়ার সব রাজ্য। তাছাড়া গেছি শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা।'

'সমুদ্র পেরোলেন কি পায়ে হেঁটে?'

'না না', হেসে ফেলে যুবক, 'জল পেরিয়েছি জাহাজে-নৌকোয। তবে ডাঙায় গাড়ি চড়িনি এ পর্যন্ত। পায়ে হেঁটেই ঘুরেছি।'

'আপনার নাম?' জানতে চায় দীপক।

'মানিকলাল মণ্ডল।'

নামটা দীপকের অচেনা। তা হতেই পারে। দীপক জানে এ জগতে কত লোকের কত বিচিত্র শখ, কত বিচিত্র পেশা, কত বিচিত্র গুণ আছে। তাদের ক'জনেরই বা নাম প্রচার হয তেমন! অন্যেরা জানতেই পারে না তাদের গুণ, তাদের বিচিত্র সব পেশা বা নেশা। পারে জানতে, যদি তাদের নিয়ে প্রচার হয় খবরের কাগজে, পত্রপত্রিকায়, রেডিও, টিভিতে। তখন তাদের নাম ছড়ায়। কিন্তু বিচিত্র মানুষগুলির ক'জনের আর সে সৌভাগ্য ঘটে। হয়তো সারা জীবনই তারা অখ্যাত থেকে যায়। কখনো কখনো মৃত্যুর পরে তাদের কারো কারো বিষয়ে প্রচার হয বটে। তখন তাদেব নিয়ে হৈচৈ-ও হয়।

দীপক হাতজোড়া করে বলে, 'নমস্কার। আমি দীপক রায়। বোলপুব শহর থেকে পাবলিশড্ 'বঙ্গবার্তা' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার একজন রিপোর্টাব।'

ও, রিপোর্টার। মানিকলাল উৎসুক ভাব দেখায়।

'আপনি কদ্দিন ধরে ঘুরছেন?' জানতে চায় দীপক।

'তা ছ'-সাত বছর। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে একা একা পায়ে হেঁটে মাস দুই ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। তখনই নেশাটা ধরে। তারপর থেকেই লম্বা লম্বা পাড়ি দিচ্ছি বারবার।'

'এত দেশ ঘুরেছেন, নিশ্চয় অনেক ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

'তা হয়েছে বৈকি।'

ঝট করে দীপকের মাথায় একটা আইডিয়া খেলে। পর্যটক মানিকলালের অভিজ্ঞতার ঝুলিটা যদি সত্যি সত্যি চমকপ্রদ হয় তাহলে বঙ্গবার্তায় ছাপা যায় ধারাবাহিকভাবে। কিছুদিন ধরে বঙ্গবার্তার সম্পাদক দীপককে খোঁচাচ্ছেন নতুন ধরনের কোনো ইন্টারেস্টিং স্টোরির জন্যে। দেখা যাক—

দীপক বলল, 'আপনার ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা শোনাবেন একটা?'

মানিকলাল একটুক্ষণ চুপ। বুঝি স্মৃতি হাতড়ায়। তারপর শুরু করে—

'বছর চারেক আগে। গ্রীষ্মকাল। দুপুর বেলা। মধ্যপ্রদেশে একটা জঙ্গলের ধার ঘেঁষে চলেছি। একেবারে নিরালা পথ। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে চারটে লোক আমায় ঘিরে ধরল। বাপরে কি চেহারা তাদের! ইয়া লম্বা-চওড়া। ইয়া মোচ আর গালপাট্টা। বাবরি চুলের ওপর কারো টুপি, কারো পাগড়ি। ফুলপ্যান্ট-শার্ট পরা। দুজনের গায়ে শার্টের ওপর হাতকাটা জ্যাকেট। সবারই পায়ে বুট জুতো। সবচেয়ে পিলে চমকানো ব্যাপার হলো, প্রত্যেকের হাতে বন্দুক আর বুকে ঝুলছে কার্তুজের মালা। হিংস্র চোখগুলো যেন জ্বলছে।

'বুঝলাম যে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি। ওই বনে ডাকাতের আস্তানা আছে শুনেছিলাম। তা আমার থেকে নেবার মতো আছে কি? পকেটে তো মাত্র গোটা দশেক টাকা সম্বল। বেশি টাকাকিড়ি নিয়ে আমি ঘুরি না কক্ষনো। যেখানে যাই নিজের পরিচয় দিয়ে আতিথ্য ভিক্ষা করি। আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনাই। তাতে খুশি হয়ে যেখানে যেমন খেতে দেয়, শুতে দেয়, মানে ফ্রি-তে, তাতেই সন্তুষ্ট। কোথাও দারুণ খানাপিনা, বিছানা জোটে। কোথাও হরিমটর খেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ি, চাদর বা কম্বল মুড়ি দিয়ে, কোথাও লোকে দু-চার টাকা চাঁদা তুলে হাতে দেয় পথখরচা হিসেবে। সেই রকমই দশটা টাকা ছিল সঙ্গে। ক্যামেরা বা কোনো দামী জিনিস রাখি না কাছে। রিস্টওয়াচটাও নেহাতই কমদামী। আর এই ব্যাগে থাকে অতি সাধারণ জামাকাপড় গামছা চাদর কম্বল ইত্যাদি তুচ্ছ কটা জিনিস। এসব নিলে ডাকাতদের খাটুনি পোষাবে না। আমারও তেমন গায়ে লাগবে না।

'তবে অন্য একটা কারণে ভয় পেলাম। এসব ডাকাত বড় নিষ্ঠুর। বেশি টাকাকড়ি বা দামী জিনিস না মিললে সেই রাগেই আমায় না খুন করে।

লোকগুলো ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ক্রমাগত প্রশ্ন করছিল। তাদের ভাষাটা হিন্দী কিন্তু সে হিন্দী ঠিক ধরতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে বুঝলাম যে জিজ্ঞেস করছে আমি কে? কোথায় যাচ্ছি, কি উদ্দেশ্যে?

'দেশ থেকে বেরুনোর সময় আমার একটা ফোটোসুদ্ধ পরিচয়পত্র নিয়েছিলাম পুলিসের থেকে। সেটা সবসময় কাছে রাখি। আর একটা খাতা থাকে সঙ্গে। যেখানেই যাই সেখানকার কোনো মাতব্বর লোক, উঁচুদরের সরকারি কর্মচারী বা পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে দু-এক ছত্র লিখিয়ে নিই খাতাটায়, তাঁর সীল লাগিয়ে। যাতে প্রমাণ থাকে, আমি ওই সব জায়গায় সত্যি গিয়েছি।

'ব্যাগ থেকে সেই আইডেন্টিটি কার্ড আর খাতাখানা বের করে ডাকাতদের হাতে দিলাম। তারা আমার ছবি মেলালো। গম্ভীর বদনে খাতাটা উল্টেপাল্টে দেখল। ভাব দেখে মনে হলো যে তারা পড়তে জানে না। খাতায় নানা ভাষায় লেখা। তবে হিন্দী আর ইংরেজিতেই বেশি।

'এরপর এক ডাকাত খপ করে পেছন থেকে আমার কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরল। অন্যরা মোটা কাপড় দিয়ে আমার চোখ বাঁধল। দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধল। তারপর হেঁচকা টানে আমায় মাটি থেকে সটান তুলে কাঁধে ফেলল। একজন আমার পায়ের দিকে আর একজন আমার মাথার দিকে বয়ে নিয়ে বনবন করে হাঁটা দিল।

অমনি অনেকক্ষণ চলে এক জায়গায় আমায় নামাল। দাঁড় করিয়ে চোখ খুলে দিল। চারপাশে চেয়ে আমি অবাক!

বনের ভেতর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে পাঁচটা তাঁবু পড়েছে। অন্তত জনা পঞ্চাশ লোক রয়েছে সেখানে। বেশির ভাগই পুরুষ, তবে তিন-চারজন এই পঁচিশ-তিরিশ বয়েসের মেয়েকেও দেখলাম। দুটো ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউ নেই।

পুরুষগুলোর চেহারা সাংঘাতিক। অনেকের পিঠেই বন্দুক ঝুলছে। কিছু গরু-ভেড়াও রয়েছে আশেপাশে।

'পা খুলে দিয়ে চার ডাকাত আমায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল এক জবরদস্ত দেখতে মাঝবয়সী লোকের সামনে। মনে হলো সে সর্দার। একটা পাথরের ওপর বসেছিল সে। দলের লোকদের কাছে আমার কথা শুনে সর্দার লালচে চোখে আমার আপাদমস্তক নজর করে আমার আইডেন্টিটি কার্ড আর খাতাখানা খুঁটিয়ে দেখল। মনে হলো লোকটি পড়তে পারে। এরপর সে আমায় একগাদা প্রশ্ন করল কর্কশ মোটা গলায়—কোথায় বাড়ি? কেন এসেছি এ তল্লাটে ? এই সব। ওরা আমায় পুলিশের গুপ্তচর ঠাউরেছিল । যাহোক আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে সর্দারের মুখ প্রসন্ন হলো। সে গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে তারিফ জানাল, 'হাঁ, তুমহারা বাত তো সাচ্চা মালুম হোতা। স্রিফ পায়দলসে দেশ ঘুমনা, আজিব শখ! ঠিক হ্যায়, আজ ইঁহা থোড়া আরাম করো।'

'এরপর ডাকাতদের কাছে যা আতিথ্য জুটল না, দারুণ। রাতে খেতে দিল গরম গরম চাপাটি ডাল সব্জি দুধ। ঘিরে বসে অনেকে আমার দেশ ভ্রমণের গল্প শুনল। সর্দারের আগ্রহটাই ছিল বেশি। মাটিতে খোলা আকাশের নিচেই বেশির ভাগ লোক চাদর পেতে শুয়ে পড়ল। আমিও তেমনি ঘুমলাম। পরদিন সকালে চোখ বেঁধে, কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে ওরা আমায় আবার রেখে এল বনের বাইরে। বিদায় নেবার আগে সর্দার আমায় সাবধান করে দিল, খবরদার যেন পুলিশকে এই গোপন ডেরার হদিস না দিই। বেইমানি করলে, তার লোক যেখানেই থাকি গিয়ে আমায় খতম করে আসবে। ওই পথে আর যাওয়া হয়নি।'

মানিকলালের গল্প শেষ হয়।

'বাঃ, গ্রান্ড!' দীপক মুগ্ধ। এরকম গল্প কয়েকটা ছাপালে বঙ্গবার্তার কাটতি বাড়বে, মানিকলালও বিখ্যাত হয়ে যাবে। সে জিজ্ঞেস করে, 'এরকম অভিজ্ঞতা আরও হয়েছে?'

'তা হয়েছে।'

'লিখে ফেলুন!'

'লিখেছি কিছু,' জানায় মানিকলাল, 'এক খাতা ভর্তি। তবে আরও ঢের আছে এমনি ঘটনা।'

'সেগুলোও লিখে ফেলুন।'

'ইচ্ছে তো হয়, হচ্ছে না।'

'কেন?'

'সুস্থির হয়ে বসতেই পারি না যে।'

'কেন?'

'এই ঘোরার নেশায়।'

পিছনে অনেক দূরে একটা গাড়ির জ্বলন্ত হেডলাইট দেখা যায়। দীপক নজর করে বলে, 'বাস মনে হচ্ছে। যদি প্যাসেঞ্জার নেয় আমি কিন্তু উঠে পড়ব। পায়ে লাগছে। আর হেঁটে পৌঁছতে বড্ড দেরি হবে। বাড়িতে ভাববে। কিছু মনে করবেন না। এই গ্রামটার মুখে একটু দাঁড়াই। এটাই স্টপেজ।'

'ঠিক আছে, চলে যান বাসে। আমার ধর্ম তো হন্টন।' মানিকলালের সরস কণ্ঠ শুনে দীপক নিশ্চিন্ত হয় যে ও কিছু মনে করবে না ফেলে গেলে।

বাসরাস্তার খানিক তফাতে মস্ত গ্রামটা তখন একেবারে নিঝুম, অন্ধকারে লেপা। রাস্তার গায়ে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। তার ঝাঁপ পড়ে গেছে বটে কিন্তু ভিতরে মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে দরমার ফাঁক দিয়ে। হয় দোকানী একাই কোনো কাজ করছে অথবা তাসের আসর বসেছে।

দীপক চটপট কাজের কথা সারে। মানিকলালকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা যেটুকু লিখেছেন সেই খাতাটা কোথায়?'

'বোলপুর শহরে আছে।'

'বোলপুরে!'

'হ্যাঁ, মডার্ন প্রেসে। রেলব্রিজের কাছে। লেখাগুলো বই করে ছাপালে কেমন খরচ লাগবে হিসেব করতে দিয়েছিলাম। আর ফেরত নেওয়া হয়নি।'

'তা লেখাটা দিন না আমায়। বঙ্গবার্তায় ছাপব কয়েক সংখ্যায়। তারপর বই করতে পারেন। কী, রাজী আছেন?'

'পত্রিকায় ছাপা হবে? এ তো খুব ভাল কথা। অনেকে পড়বে, জানবে আমার এক্সপিরিয়েন্স। তাই তো ইচ্ছে। চেনাশুনা তো নেই। ভাবতাম কে বা ছাপবে? আপনি

অফার করছেন—এ আমার সৌভাগ্য।' মানিকলাল রীতিমতো উৎফুল্ল।

বুদ্ধিটা লেগেছে ; তাই মহাখুশি দীপক বলল, 'তাহলে কাল প্রেস থেকে খাতাটা নিয়ে নিন। আপনি কোথায় উঠেছেন? যাব দেখা করতে। তখন নেব লেখাটা।'

মানিকলাল বিব্রতভাবে বলল, 'সরি। বলেছি তো কাল খুব ভোরে বোলপুর ছাড়ছি। খাতা নেবার সময় পাব না। ও খাতা আপনি মডার্ন প্রেস থেকে নিয়ে নেবেন।'

'আমায় দেবে কেন?'

'দেবে, দেবে। আমার নাম করে চাইলেই দেবে। পড়ে দেখুন। পছন্দ হলে ছাপুন। সত্যি কৃতজ্ঞ হব।'

বাসটা কাছে এসে গেছে। দীপক হাত তুলল বাস থামাতে। হেডলাইটের আলোয় মানিকলালকেও ভাল করে দেখে নিল। তারপর মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাতে থাকছেন কোথায়?'

উত্তর হলো, 'ঠিক নেই। আমার ভরসা করবেন না।'

হুডমুড় করে এসে বাসটা থামল।

কন্ডাকটার চেঁচাল, 'বোলপুর। বোলপুর।'

বাসের পাদানিতে উঠে দীপক ফের কথা কইবার চেষ্টায় ঝুঁকে দেখে যে মানিকলাল হনহন করে এগোচ্ছে। সে একবারও মুখ ঘোরায় না বাসের দিকে।

চলন্ত বাসের সিটে বসে দীপক বেজায় ধন্দে পড়ে। মানিকলাল যেন জোর করে এড়িয়ে গেল তাকে! খাতাটার ব্যাপারে যেন কি রহস্য লুকিয়ে আছে। ওর রাতের আস্তানা জানাতে এত আপত্তি কিসের? আর মোটে দেখা করতে চাইছে নাই বা কেন?

পরদিন সকালে মডার্ন প্রেস খুলতেই দীপক হাজির। ছাপাখানার মালিক দীপকের পূর্বপরিচিত। মানিকলালের খাতা চাইতেই প্রেসমালিক রেগে বললেন, 'নিয়ে যান মশাই খাতা। দু বছর হলো দিয়ে গেছে আর পাত্তাই নেই। আচ্ছা লোক। এরপর হারিয়ে যাবে। একটা আলাদা কাগজে বই ছাপার খরচ এস্টিমেট করে রেখেছি। খাতার ভেতর আছে, দিয়ে দেবেন তাকে। তবে বলবেন যে এই দু বছরে আরও ফিফটিন পারসেন্ট মতো খরচা বেড়ে গেছে।'

মানিকলালের খাতাখানা নিয়ে বিকেলবেলা দীপক বঙ্গবার্তা অফিসে হাজির হলো। বঙ্গবার্তার সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি তখন নিজের কুঠুরিতে বসে প্রুফ দেখছিলেন। দীপক কামরায় ঢুকতে আড়চোখে চেয়ে নিজের কাজে মন দিলেন।

দীপক সামনের চেয়ারে বসে একবার গলাখাঁকারি দিয়ে কথা শুরু করল, 'একটা খাতা পেয়েছি, একজন বাঙালী পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত। পায়ে হেঁটে ঘুরেছে গোটা ইন্ডিয়া। আফ্রিকা-সিলোনেও গেছে। দারুন সব অভিজ্ঞতা। বঙ্গবার্তায় ছাপালে বেশ হয়। তারও খুব ইচ্ছে ছাপানো।

লেকিন—'

'কি?' প্রুফ থেকে নজর না তুলেই প্রশ্ন করেন সম্পাদক।

'মানে কেস থোড়া গড়বড় লাগতা।'

'কেন?' একইভাবে বলেন।

কুঞ্জবিহারী।

'মানে লেখাগুলো সত্যি এক্সপিরিয়েন্স না বানানো গপ্পো? মায় পর্যটকটি স্বয়ং আসল না মেকি? বড্ড অল্পক্ষণের আলাপে ঠিক যাচাই করার সুযোগ পাইনি। শেষে কেমন এড়িয়ে গেল। ওর পরিচয়পত্র দেখাল না। বোলপুবের ঠিকানাও চেপে গেল। যদিও লেখাটা ছাপাতে খুব আগ্রহ।'

'কি নাম পর্যটকটির?' মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে জানতে চান সম্পাদক।

'মানিকলাল মন্ডল। বাড়ি বজবজ।'

'এ্যাঁ! মানিকলাল মণ্ডল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কুঞ্জবিহারী খাড়া হয়ে বসেন। তাঁর ছাঁটা গোঁফ ফুলে উঠেছে। মুখ থমথমে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'ওব সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল?'

কাল সন্ধ্যায়। মানে তখন প্রায় রাত হয়ে গেছে।'

'কথা হলো?'

'হ্যাঁ।'

'দেখতে কেমন?'

কুঞ্জবিহারীব হাবভাবে এক গোপন বহস্যেব আঁচ পায দীপক। বলে, 'বেশ লম্বা। আমার চেযেও। ছিপছিপে। বং ফর্সা। বযস বছব তিরিশ। মুখ কাটা কাটা সুশ্রী। চোখা নাক। শার্ট-প্যান্ট পরেছিল।'

কুঞ্জবিহাবী গোল গোল বক্তাভ চোখে একটুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঘডঘড়ে গলায বললেন, 'মানিকলাল মণ্ডল মেকি নয়, সাচ্চা পর্যটক। ও বছর দুই আগে একবার বঙ্গ বার্তা অফিসে এসেছিল। আমি নিজেব চোখে ওব পবিচযপত্র এবং নানা দেশ ঘোরাব বেকর্ড দেখেছি। কিন্‌-তু—'

কুঞ্জবিহারী চেযার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পাশেব তাকে রাখা পুরনো বঙ্গবার্তার বাঁধানো ফাইল একটার পব একটা টেবিলে নামিয়ে পাতা উল্টিয়ে কি জানি খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ গর্জন ছাড়লেন, 'এইদেখ।' একটা খোলাপাতা তিনি এগিযে দেন দীপকের সামনে।

দীপক পড়ল, প্রায় দু বছর আগেকার বঙ্গবার্তার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটা নিউজ হেডলাইন— দুর্ঘটনায পর্যটক মৃত। এরপর পাঁচ-ছয় লাইন। সংবাদটির সারমর্ম হচ্ছে—গত বুধবার দুপুবে ঝডবৃষ্টির পব দুর্গাপুরের কাছাকাছি পিচরাস্তার ধাবে ফাঁকা মাঠে তরুণ বাঙালী

পর্যটক মানিকলাল মণ্ডলের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঝলসানো দেহ দেখে মনে হয় যে বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটেছে। তিনি পায়ে হেঁটে বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। আপাতত বোলপুর থেকে বর্ধমান যাচ্ছিলেন।

খবরটা পড়ে দীপক খানিকক্ষণ থ হয়ে থেকে বলল, 'এ নিউজটা তো আমি আগে দেখিনি!'

'কারণ তখন তুমি ছুটিতে ছিলে। দিল্লী গেছলে বেড়াতে।' জানালেন কুঞ্জবিহারী। তারপর তিনি বারকয়েক চোখ পিটপিট করে নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'বলছ, ওর ভ্রমণকাহিনীগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং?'

'হ্যাঁ।' দীপক কেমন ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ে।

'গুড। তাহলে ছাপা যাবে,' বললেন সম্পাদক, 'ওর বাড়ির একটা পারমিশন দরকার। সে আনিযে নেব। আমার কাছে ওর ঠিকানা আছে। তুমি লেখাগুলো এডিট করে দিও। বেচাবির একান্ত ইচ্ছেটা পূরণ হোক।'

নীল শাড়িপরা সেই মেয়েটি

নাখশাব আফরিন

কার রিপেয়ারিং গ্যারেজের মেকানিক আবদুর বউফ কাজ শেষে গভীব রাতে বাড়ি ফিরছিল। সুন্দর পোষাক পরা এক যুবতীকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তাব স্কুটার থামাল। এতরাতে একা মেয়েটিকে দেখে সে ভাবল, দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রঘরেব মেয়েই। হয়তো কোন কাজে আটকে পড়েছিল, এখন কোন যানবাহন না পেয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

মেয়েটিকে লিফ্‌ট দিল তার স্কুটারে। কিছু দূর গিয়ে রাস্তায় কাছের এক ক্রসিঙের কাছে নেমে পড়ল মেয়েটি। এরপর যে দৃশ্য দেখল রউফ মিয়া তাতে নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস হলো না তার। কযেক পা এগিয়েই তার চোখের সামনে অদৃশ্য হযে গেল

মেয়েটি! পরদিন সকালে গ্যারেজে গিয়ে সহকর্মী বন্ধুদেরকে ব্যাপারটা বলল। কিন্তু কেউ তোর কথা বিশ্বাস করল না। এই ঘটনার ঠিক চারদিন পর ১৯৭৯'র ২২ জুলাই প্রচণ্ড জ্বরে মারা গেল রউফ মিয়া।

ব্যাপারটা পুলিশের কানে যেতেই তদন্ত শুরু হয়েগেল। আর এই তদন্ত করতে গিয়েই ফাঁস হয়ে গেল এক ভয়াবহ চক্রান্তের ঘটনা।

রউফ মিয়া মারা যাওয়ার দুই বছর আগের একটা ঘটনা। তাহিরা নামে একটা মেয়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরছিল। গাড়ি ড্রাইভ করছিল তার ভাই। হঠাৎ ব্রেক ফেল করে এক ইলেক্ট্রিকের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল তাহিরা।

মনে করা হয়, তাহিরার মৃত্যুর পেছনে এক প্রেমিক শিল্পপতির হাত ছিল। এই অ্যাকসিডেন্টের নীল নক্সাটা সে করেছিল তার এক পুলিস বন্ধু ও একজন মেকানিকের সহায়তায়। ষড়যন্ত্রকারীরা ভেবেছিল, দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে মারা যাবে তাহিবার ভাই। ফলে একেবারে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়বে তাহিবা। কারণ এই ভাইটি ছাড়া আর কোন আপনজন তার ছিল না। আর এই পরিস্থিতিতে তাহিরাকে ফাঁদে ফেলা তাদের জন্য কোন ব্যাপারই হবে না। কিন্তু তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে ঘটনা ঘটে গেল অন্যভাবে। নিয়তির খেলা বুঝি একেই বলে।

তাহিরার মৃত্যুর পর এক বৎসর পর প্রধান চক্রান্তকারী শিল্পপতিটি ঠিক একইভাবে কার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলল, শিল্পপতিব গাড়ি বিদ্যুতের খুঁটিতে সংঘর্ষের সময় রাস্তাব পাশে নীল শাড়ি পরা এক সুন্দরী মেয়েকে দেখেছিল তাবা। অন্যদিকে কয়েকজন পুলিসও ওই সময়টাতেই শিল্পপতির গাড়ির মধ্যে বসা একই মেয়েকে দেখেছিল, তাবা ভেবেছিল, গভীর রাতে সিনেমা দেখে ফিরছে দুজনে।

একই মেয়ে একই সময় গাড়ির ভেতরে এবং বাইরে কি করে থাকতে পারে! এটা কি করে সম্ভব? শিল্পপতিও নিশ্চয় একই মেয়েকে দুই জায়গায় দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ফলে গাড়ি থামানোর জন্য ব্রেকের বদলে অ্যাকসিলারেটরে বেশি চাপ দিয়ে ফেলেছিল ভুল করে।

নৈশ ক্লাব থেকে গভীর রাতে বাড়ি ফিরছিল শিল্পপতি। তার বন্ধুবা দেখেছিল গাড়ি থামিয়ে রাস্তাব পাশ থেকে নীল শাড়ি পরা একটা মেয়েকে তুলে নিয়েছিল সে। মেয়েটির মুখ অবশ্য তারা দেখতে পায়নি। সম্ভবত শিল্পপতিও প্রথমে খেয়াল করেনি মেয়েটিকে। কিন্তু গাড়ির বাইরেও ওই একই মেয়েকে দেখে পিলে চমকে গিয়েছিল তার। হয়তো বুঝে গিয়েছিল, সাংঘাতিক খারাপ কিছু ঘটছে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এক বছর আগে যে সময় এবং যে তারিখটাতে অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিল তাহিরা, ঠিক এক বছর পর ওই একই তারিখে একই সময় একইভাবে মারা গেল শিল্পপতিও। এমন কি দুর্ঘটনার স্থানটা পর্যন্ত একই।

তারপরের বৎসরে রউফ মিয়া একই তারিখে মরল। এই রউফ মিয়া নাকি স্বাভাবিক জ্বরে মারা যায়নি। সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল সে। অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধারের পর আর জ্ঞান ফেরেনি। তার মৃত্যু সম্পর্কে বিশেষ কিছু আর জানা যায়নি।

এই ঘটনার ঠিক এক বৎসর পর, জুলাইয়ের ১৭/১৮'র গভীর রাতে কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জড়িত এক সিনিয়র পুলিস অফিসারও এই নীল শাড়ি-যুবতীর পাল্লায় পড়েছিলেন। কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে এই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। হাত তুলে অফিসারের গাড়িটি থামিয়েছিল সে। আশেপাশে তখন কেউ ছিল না। মেয়েটি জানাল, দুর্ঘটনায় সে আহত হয়েছে। দয়া করে তিনি কি তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন?

অফিসার স্বচক্ষে দেখলেন মেয়েটির গলায় সদ্য আঘাতের চিহ্ন। তিনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু রাজি হলো না সে। বরং বাসায় পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ জানাল। কিন্তু আশ্চর্য, অফিসার তাকে তার বাংলোর সামনে নামিয়ে দিতেই সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন, বাড়ির মধ্যে না ঢুকেই অদৃশ্য হয়ে গেল আহত মেয়েটি! এই ঘটনার তিন দিন পর ওপিয়াম স্মাগলারদের গুলিতে আহত হন পুলিস অফিসাব। এবং সেই আঘাতেই পরে মারা যান তিনি।

এই সমস্ত ঘটনাব পর নীল শাড়ি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল পাকিস্তানে। নীল শাড়ি পরা কোন মেয়েকে দেখলে কোন গাড়ির চালক গাড়ি থামানো তো দূরে থাক উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচে। এরপব জুলাই মাসে সারা পাকিস্তানের কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলেই দোষ পড়ত তাহিবাব ঘাড়ে।

জুলাই মাসের সমস্ত দুর্ঘটনাব সাথে তাহিবা জড়িত না হলেও ওই তিন দুর্ঘটনার সঙ্গে নীল শাড়ি পরা রহস্যময একটি মেয়ে যে জড়িত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারও কাবও মতে তাব হত্যাকারীদেব ওপব প্রতিশোধ নিয়েছে তাহিরা।

ভূতেরা আজো আছে

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ফিবছব যেমনটি হয়, এবাবও ঠিক তেমনটিই হলো। ক্লাসেব লাস্ট বেঞ্চে মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ফটিক, হেডমাস্টারমশাই প্রায় সক্কলের নাম ডেকে পাঠিয়ে দিলেন উঁচু ক্লাসে, বেরিয়ে যাবার সময় নাকের ওপর চশমা তুলে কটমট করে একবাব দেখে গেলেন ফটিককে। ভাবখানা এই যে, এ বছরও তুমি রযে গেলে এক ক্লাসে। আব কেন? এইবাব ক্ষ্যামা দাও। বাপের জমিজমা তো বিস্তর, লাঙল কাঁধে নেমে পড়ো।

তা, শুধু হেডমাস্টার কেন, সব স্যারেরই মনের কথা এই রকমই, সে আর ফটিকেব জানতে বাকি নেই। খেলার মাস্টারমশাই-ই কেবল ভালো কথা একটু বলেন-টলেন। এবারও দেখতে পেয়ে বললেন, 'কী যে করিস ফটকে! স্পোর্টসে সব কটা আইটেমে ফার্স্ট, আর লেখাপড়ার বেলাতেই গাড্ডু? একটু বসলে তো পারিস বইপত্তর নিয়ে!

হ্যাঁ. বসলে যে হয় সে তো ফটিকও জানে। কিন্তু বসতে ইচ্ছেই যে হয় না ছাই একটুও। যদি বা বসলো, মাথায় হাজার রকমের চিন্তা গিজগিজ করতে থাকে, বইয়ের পাতায় কি আর মন থাকে নাকি!

আসল ফাঁড়াটা যে সন্ধ্যেবেলায় অপেক্ষা করছে, বাড়ির সকলের মতো ফটিকও সে কথা জানতো। বাবা বাড়ি ফিরতে মা তাড়াতাড়ি জলের বালতি গামছা-টামছা এগিয়ে দিয়েছিল। সেসবের দিকে ফিরে না তাকিয়ে বাবা বললেন, 'ফটকে কোথায়?'

ফটিক কাছেই ছিল, গুটিগুটি এগিয়ে এলো সামনে। চোখ পিটপিট, হাত কচলানো আর মাথা নিচু দেখেই বাবা বুঝতে পেরেছিলেন, বললেন, 'এবারও ফেল মেরেছিস?'

ফটিক ভয়ে ভয়ে একদিকে ঘাড় হেলালো, অর্থাৎ সে আর বলতে! এবার 'কিস্সু হবে না' বা 'ঘোড়ার ঘাস কাটো গে এখন' গোছের একটা কিছু বলে ছেড়ে দিলেই বাঁচি। কিন্তু বাঁচাবার বিশেষ লক্ষণ বাবার দেখা গেল না, বললেন, 'ইংরিজিতে কতো পেয়েছিস?'

'তেরো!' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছে ফটিক, কারণ ওর ধারণা বলবার মতো নম্বর এই একটাই পেয়েছে। কিন্তু তাতে বাবা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হলো না। দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খোঁটাতে খোঁচাতে বললেন, 'গবেট কোথাকার! ইস্টুপিড! অঙ্কে কতো?'

এ উত্তরটা অতো চটপট দেবার নয়, কাজেই যতোক্ষণ পারে গোঁত্তা মেরে পড়ে রইলো। বার তিনেক জিজ্ঞেস করার পর মিন মিন করে বললো, 'জিরো।'

'জিরো? মানে শুন্যি!' ডাম্বেলের মতো করে চোখ নাচালেন বাবা, বললেন, 'তার চে সাদা খাতা দিয়ে এলে তো পারতি! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে দু নম্বর পেতিস। বলদা কোথাকার।'

'গাল দিচ্ছো কেন', সহ্য করতে না পেরে ফটিক বলেছে, 'আর্টসে যারা স্ট্রং হয়, অঙ্কে তারা একটু উইকই হয়। নন্দ স্যার বলেছে।'

'থাক থাক, ঢং করিস না', বাবা বলেছিলেন, 'স্ট্রং দেখাচ্ছে আমাকে। স্ট্রং মানে ফেলু! যমের পাঁচন কোথাকার।'

তারপরে আরো তিন মিনিট চিৎকার, এবং তার এক ঘণ্টা পরে ফটিক বাড়ির পেছন দিকের শুনশান বাগানে অন্ধকারে গাবগাছের নিচে। সেই যে খিড়কি-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে চুপটি করে বসেছে, ওঠবার কোনো লক্ষণ নেই। ভয়ডর কোনো কালেই নেই ফটিকের, কাজেই ভয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। গালে হাত দিয়ে ভাবছিলো বসে আকাশ-পাতাল। ঠিক এই সময়েই ঘটে গেল সেই ব্যাপারটা।

যাকে বলে রোমহর্ষক এবং চাঞ্চল্যকর! একেবারে গা শিরশিব করার মতো ঘটনা। ফটিকের মতো ছেলেকেও ভুরু কুঁচকে খানিক চেয়ে থাকেত হলো সেদিকে।

অবশ্যি প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারেনি। মুখ গোঁজ করে বসেছিল, আর হাতের কাছে ঢিলটা পাটকেলটা যা পাচ্ছিল তাই আনমনে ফেলছিল পুকুরের জলে। জলে ঢিল পড়লে যে 'গুব' কিংবা 'টুব' করে আওয়াজটা হয়, তার বদলে আওয়াজগুলো যে হচ্ছে 'ফোঁস'— মানে কারো নিশ্বাস ফেলার মতো, সেটা খেয়াল করতেই ওর বেশ খানিকক্ষণ লেগে গিয়েছিল। প্রথম যখন বুঝলো তখন অবাক হয়ে পরপর আরো দুটো ঢিল ফেলেছিল। এবং অবাক কাণ্ড— টুব টুব-এর বদলে একেবারে স্পষ্ট ফোঁস ফোঁস।

ব্যাপারটা কী, ভাবতে ভাবতেই ফটিক একাট খোলামকুচি হাতে নিয়ে পুকুরের জলে ব্যাঙবাজি করার মতো সজোরে ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেটা দু-তিনবার জল খামচে একেবারে ওপারের বেলগাছের গায়ে ধাক্কা খেয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গাবগাছের মাথার ওপর থেকে—

হ্যাঁ, ফোঁস ফাঁস নয়, একেবারে গাঁক গাঁক করে হেঁড়ে গলায় কে যেন বলে উঠেছিল, 'কে র‍্যা! ভর সন্ধ্যেবেলা এমন উৎপাত করে কে?'

ফটিক ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল ওপরে। তাকে বেশিক্ষণ সেভাবে তাকাবার সুযোগ না দিয়ে ধপ করে যে জীবটা ওর সামনে লাফিয়ে পড়লো তাকে দেখেই ফটিকের চক্ষু ছানাবড়া।

না, মাথায় সেটা ফটিকের চেয়ে বড়ো হবে না, কিন্তু চওড়ায় ফটিকের চার গুণ। রং একেবারে এই গাবগাছের আটার মতো, মুখ-চোখের কোনো ছিরিছাঁদ নেই। দাঁতগুলো শুঁড়ের মতো। কান দুটো যেন হাতির কানের মতো ঝালর দোলাচ্ছে। আর নাকখানা! যেন একতাল গোবর, ঘুঁটে দেবে বলে কেউ থেবড়ে দিয়ে গেছে। চোখ একেবারে হোঁদল কুৎকুত। গলার আওয়াজ বেরুচ্ছে, না বিরাট জালার মধ্যে কেউ কালিপটকা ফাটাচ্ছে বোঝা ভার।

প্রথমটা সত্যিই বেজায় হকচকিয়ে গিয়েছিল ফটিক। হাঁটু দুটো কাঁপছিল ঠকঠক করে। মালাইচাকিতে ধাক্কা লেগে খটখট আওয়াজ হচ্ছিল, সেটা পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল ও। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করছিল ওই অদ্ভুত জীবটা কী বলছে! সেটা তখন গাঁক গাঁক করে বলছি, 'ভারি বেআক্কেলে হুমদো ছোঁড়া তো! অমাবস্যার রাতে এই পুকুরের জলে একটু পিঠে উঁচিয়ে ভাসি— তা সেটুকু সহ্যি হলো না? কে রে তুই উজবুক?'

ফটিক ততোক্ষণে যা সামলে নেবার সামলে নিয়েছে, বুক টানটান করে বললে, 'তুমি কে সেটা বলো দিকি আগে, আমাদের গাছে দিব্যি বাসা বেঁধে আছো!'

কুৎকুতে চোখে দুটো ছোট্ট আগুনের ভাঁটা দুবার বাঁই বাঁই করে চক্কর খেয়ে গেল বললে, 'ওমা! এ যে আমাকেই তড়পায় দেখি! আমি হলুম গে ভূতেশ্বর মামদো, আমার ওপর চোটপাট!

'চোটপাট তো তুমিই করছো! মন খারাপ বলে চুপচাপ বসে আছি এখানে, আমার পেছনে লাগতে এসেছো কেন?

'না, এলেম আছে দেখছি!' খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ভূতেশ্বর বললে, 'চালতাবাগানের গোপেশ্বর দেড়ে, তিন ফুট লম্বা মানুষ, চার ফুট দাড়ি, সে সবচেয়ে বেশি ওই পৌনে দুই মিনিটটাক তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। তারপরই ভিরমি খেয়ে পড়লো, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠতে লাগলো। কিন্তু কথা হচ্ছে, তোমার মন আবার খারাপ কেন?'

'মন খারাপ হবে না? রেজাল্ট খারাপ করে ক্লাসে উঠতে না পারলে কার মন ভালো হয় শুনি?'

'কেলাসে উঠতে পারোনি? এই কথা! কোনো চিন্তা নেই', ভূতেশ্বর মামদো বললে, 'আমায় দেখে যখন ভয় পাওনি, সমানে তক্কো করছো, তখন তুমি আমার বন্ধু। তোমার

কোনো দুঃখু আমি রাখবো না। কিন্তু আগে বন্ধুর নামটা তো শুনতে হবে!'

'আমার নাম ফটিক, তুমি আমায় ফটকে বলতে পারো।'

'না না, ফটকে নয়, ফটকে বললেই আমার কেমন ঘাড়টাড় মটকে দেবার কথা মনে হয়, মুণ্ডুগুলো চটকে দিতে ইচ্ছে করে। তার চেয়ে তোমায় শুধু বন্ধুই বলবো। বলো বন্ধু, কী করতে পারি আমি তোমার জন্যে?'

'কী কবতে পারো! তাই তো', ফটিক চিন্তায় পড়ে গেল। ভূতেশ্বর মামদো ওর ঘাড় মটকে দেবে না, মুণ্ডু চটকাবে না, তার ওপর আবার কিছু করতেও চাইছে, এ কি চটপট বিশ্বাস হয় নাকি! কোনোরকমে আমতা আমতা করে বললো, 'কোশ্চেনগুলো আগেভাগে দেখিয়ে দিতে পাবো আমায়, নিদেনপক্ষে অঙ্কটা' তাহলে মনে হয় কাউকে দিয়ে করিয়ে টরিয়ে নিয়ে—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেখিয়ে দেবার আর দবকার কি! তুমি নিজেই তো দেখে নিতে পারো।'

'মানে? মামদোবাজি নাকি'— বলে ফেলেই সামলে নিল ফটিক নিজেকে, ভূতেশ্বর মামদোর এ কথাটা আবার ভালো না লাগতেও পারে ভেবে তাড়াতাড়ি বললে, 'দেখতে পেলে তো গোবর্ধন স্যার চামড়া ছাড়িয়ে নেবে আমার।'

'দেখতে পাবেটা কী করে! তুমি তো তখন অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

'অদৃশ্য! সেকী!'

'এই যো'— গাছের ডালের মতো একাট হাত ওপবে তুলে ঝুবঝুর করে নাড়তেই এইটুকু একটা শুকনো ফল পায়ের কাছে পড়লো ফটিকের। তুলে নিয়ে দেখলো সুপুরির চেয়েও ছোট দেখতে, তবে কী ফল সেটা চেনা যাচ্ছে না। মুখ তুলতেই শুনলো ভূতেশ্বর বলছে, 'ওটা শুধু মুখের ভেতব পুবতে যা দেবি, তারপবই তুমি হাওয়া। অঙ্কেব স্যার কেন, হেডস্যারও তোমায দেখতে পাবে না। তবে হ্যাঁ, ওটা যেন আবার গিলে ফেলো না কপাৎ করে। তাহলে কিন্তু আবার যে-কে সেই।'

বিশ্বাস হচ্ছিল না ফটিকের। মুখে পুরতে যাচ্ছিল ফটিক, ভূতেশ্বর ডালের মতো হাত নেড়ে বললে, 'থাক থাক, আমরা ভূতেরা সব দেখতে পাই। ওটা মুখে পুরলেও দেখবো, না পুরলেও দেখবো। তোমাব অন্য কোনো সমিস্যে আছে কিনা বলো।'

'নেই আবার!' ফটিক বললো, 'প্রশ্নটা আমায় টুকতে হবে তো! আমি আবার যে বিদ্যেধর দুপাতা টুকতেই তো আমার পাঁচ ঘণ্টা লেগে যাবে। তার মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে ফেলে যদি গোবর্ধন স্যার আমায় জাপটে ধরে?'

'যা ব্বাবা! অতো কষ্ট করে টোকাটুকির দরকার কী? পাতাগুলো উঠিয়ে নিয়ে এলেই তো হয়!'

'এই না হলে মামদো!' কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, তাড়াতাড়ি বলে ফেললো, 'আরে বাবা, কাগজটা না থাকলে তো বুঝে যাবে ওটা চুরি করেছে কেউ।'

'ঠিক, ঠিক, এটা একাট সমিস্যে বটে!' ঘাড় দোলালো ভূতেশ্বর। তারপর বিজ্ঞের মতো

বললো, 'তোমায় আর একাট জিনিসও দিতে হয তাহলে— চটজলদি চটেশ্বব!'

'সেটা আবার কী?'

'দেখতে একটা ছেঁড়াখোঁড়া থলি, কিন্তু সেটার ওপর উঠে যেখানে যেতে চাইবে, একেবারে নিমেষে পৌঁছে দেবে। শুধু বলবে চটজলদি পৌঁছে দে।'

'সত্যি?'

'ভূতের কথা মিথ্যে হয় না, বুয়েচো!' কথাব সঙ্গে ঝপাৎ করে একটা চটেব থলি এসে পড়ল সামনে। পুবনো ধড়ধড়ে জিনিস, ওদের রান্নাঘরেই কোথাও ছিল কিনা কে জানে! সেটা নেবে কিনা ভুরু কুঁচকে ভাবছিল, ভূতেশ্বর বললে, 'সন্দ কবো না, নিযে সবে পড়ো মানে মানে, আমি এখন পুকুরের জলে উপুড হয়ে ভাসবো। ভালো কথা, আরো দুটো জিনিস দিযে দিই তোমায় নে যাও।'

টপাটপ রসোগোল্লার মতো জিনিস দুটো সামনে গডাগড়ি খেতেই ফটিক আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললে, 'আরে। এ যে বাজি দেখছি—চকোলেট বোম।

'উঁহু, ভুঁইপটকা। মাটিতে ছুঁড়ে মারলেই দড়াম কবে ফেটে যাবে।'

'কী হবে ভুঁইপটকা?'

'বিপদে পড়লে দরকাব হবে। এব পরও যদি ঝামেলায পড়ো, ফাটিযে দেবে একটা, তোমাব বন্ধু হাজিব হযে যাবে।'

'সত্যি?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যে নাকি?' এবাব রেগে গেল ভূতেশ্বব মামদো। গাঁক গাঁক করে বললো, 'চটপট সবে পড়ো, নইলে পুকুরসুদ্ধ তোমায উড়িযে নিয়ে যাবো ভূশণ্ডীব মাঠে।'

ভয়ে চোখ বন্ধ কবে ফেলেছিল ফটিক। চোখ যখন খুললো তখন আগের মতোই শুনশান জাযগাটা। কেউ কোথাও নেই, মানে সেই ডালপালাওয়ালা কিম্ভূতকিমাকাব ভূতেশ্বর মামদো। বাঁ হাতের মুঠো খুলে দেখল ফটিক, ফলটা কিন্তু তখনও আছে। আব ডান হাতে ধবা দুটো ভুঁইপটকা। নিচে চোখ পডতে ছেঁড়া সেই পুবনো চটের থলিটাকেও দেখা গেল। তাব মানে গোটা ব্যাপাবটা স্বপ্ন নয়? সত্যি সত্যিই ভূতেশ্বর মামদো বলে কেউ আছে।

দু হাত জোড়া না থাকলে ফটিক চোখ কচলে একবাব দেখে নিতো। তাব উপায় নেই দেখে ভাবলে, পবীক্ষা করেই দেখা যাক একবাব ছেঁড়া থলিটাকে কী যেন বলেছিল ভূতেশ্বর! ভুরু কুঁচকে একটু ভাবতেই মনে পড়লো, হাসি পেয়ে গেল নামটা ভাবতে। চটজলদি চটেশ্বর! এরকম আবার নাম হয় নাকি চটের! যাক গে, হয কিনা হয় সে পরে দেখা যাবে, মামদো উল্টোপাল্টা বকে গেল কিনা সেটাই দেখা যাক না আগে।

ভয়ে ভয়ে চটের থলিটার ওপর এসে দাঁড়াল ফটিক, তারপর কিছু না ভেবেই বললে, 'চটজলদি ইস্কুলে চল।'

সঙ্গে সঙ্গে কী যে একটা হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলো না ফটিক। কানের পাশ দিয়ে হুস করে যেন খানিকটা হাওয়া বেরিয়ে গেল, তারপরেই দেখলো ও দাঁড়িয়ে আছে ইস্কুলের

ফাঁকা মাঠে, একেবারে একা।

অবাক লাগছিল খুবই, খারাপ লাগছিল আরো বেশি। সবসময়ই বন্ধুবান্ধবে গমগম করে যে মাঠ, সেই মাঠ এখন শুনশান, নিঝ্‌ঝুম। মাঠের দুই কোণে দুটো আলো জ্বলে, নইলে আরো খারাপ লাগতো।

অবশ্যি ভূতেশ্বর মিথ্যে বলেনি দেখে ভালোও লাগছিল ফটিকের। পায়ের নিচে চটজলদি চটেশ্বর তো ছিলই, তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, 'চল দেখি আমার বাড়ি।'

ঠিক সেই আগের মতোই ব্যাপার— হুস করে কানের পাশ দিয়ে হাওযা বেরিয়ে যাওয়া, এবং বাড়ি! একেবারে নিজের ঘরের ভেতর, মানে যে ঘরে ফটিক বেশিব ভাগ সময় কাটায় আর কি! আয়নাটা সামনেই ছিল। ভুঁইপটকা আর সুপুরির মতো ফলটা ঢুকিয়ে ফেলেছিল পকেটের ভেতর। ফলটাকে বার করে এখন মুখে পুরে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অবাক কাণ্ড! আয়নাব সামনে থেকে জলজ্যান্তো ফটিক হাওয়া।

আরে, এ তো ভাবি আজব কাণ্ড! গাযে চিমটি কেটে দেখল ফটিক, নাঃ, লাগছে তো বেশ। মানে ওখানেই তো আছে ও এখনও। অথচ কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না? এ আবার কী ব্যাপার! আস্তে আস্তে এগিয়ে আবার সামনে থেকে চিরুনিটা তুলে নিলো ফটিক। আয়নায় ছবিটা দেখে নিজেরই হাসি পেল, দিব্যি একটা চিরুনি টেবিল থেকে উঠে হাওয়ায় খেলা কবছে— মজা মন্দ নয় তো!

এতোক্ষণ এইসব ব্যাপাবট্যাপার দেখে গলাটা শুকিয়ে গিযেছিল ফটিকের, এক গ্লাস জল নিয়ে সবে মুখে তুলেছে, বাবা ঢুকে পড়লেন গজগজ কবতে কবতে, 'মায়ের আদবেই ছেলেটা গোল্লায় গেল। পডাশুনোয় আষ্টরম্ভা, ফেল মেরে দেখো গিযে কোথায় আড্ডা মারতে বসে গেছেন। একটু লজ্জা নেই, শরম নেই, এরকম কবে কি কেউ পাশ করতে পারে নাকি'— বলেই তীব্র এক হুঙ্কার, 'ফটকে—'

সাড়া প্রায় দিয়ে ফেলেছিল আর একটু হলে, বোধহয় কুঁক কবে একটা শব্দও বেবিযে গিয়েছিল মুখ দিয়ে। সেই আওয়াজেই ভুরু কুঁচকে তাকালেন সামনে। তখনই সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা নজেব পড়ে গেল তাঁর। এক গ্লাস জল শূন্যে ভাসছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। 'আরে! গেলাসটা ওখানে কেন?' অভ্যেসমতোই বলে ফেলেছিলেন বোধহয়। আর সঙ্গে সঙ্গে আবো অবাক কাণ্ড, গ্লাসসুদ্ধ জল হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এলো টেবিলের কাছে। ঠক করে সেটা দাঁড়িয়ে গেল টেবিলের ওপর।

বিশ্বাস কবতে পারছিলেন না নিজের চোখকেই যেন। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলেন গ্লাসটার দিকে। তুলে দেখলেন একবার সেটা। হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিট খানেক, তারপর গ্লাসটা ফের টেবিলের ওপর রেখে হাঁক মারলেন, 'শুনছো? শুনে যাও তো একবার এদিকে।'

বাবাকে দেখে তেষ্টা আরো বেড়ে উঠেছিল ফটিকের, গলাফলা শুকিয়ে কাঠ। থাকতে না পেরে গ্লাসটা ধরে চোঁ-চাঁ করে জলটা শেষ করে দিল। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পডলো তাতে তো চোখ ছানাবড়া।

বাবা হাঁ করে তাকিয়ে আছেন গ্লাসটার দিকে। আর মা যে কখন ঢুকে পড়েছে খেয়াল করেনি। খেয়াল যখন হলো মা তখন মুখ দিয়ে একটা গোঙানির মতো আওয়াজ করে পড়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মাকে ধরতে যাচ্ছিল ফটিক, কিন্তু তাতে বিপত্তি বাড়লো বই কমলো না। তাড়াহুড়োতে গ্লাসটা হাত ফসকে পড়লো গিয়ে মেঝেয়। কাচের টুকরো ছড়িয়ে ঘরে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড। তারপর মাকে ধরতে গিয়ে বাবার সঙ্গে ধাক্কা। বাবার প্রবল ভয়ার্ত চিৎকার। মার গোঙানি তাতে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া। সব মিলিয়ে একটা ভয়াবহ অবস্থা। আর সেটাকে সামাল দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি সুপুরির মতো ফলটা মুখ থেকে বার করে ফেলতেই আর এক চিত্তির।

বাবার চোখের ভুরু আরো বেঁকে গেল, মিনিটখানেক ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে বললেন, 'তুই! এ ঘরে কখন ঢুকলি?'

'আমি তো ছিলামই এ ঘরে।'

'মানে? ঘরে একটা টিকটিকি পর্যন্ত ছিল না তখন, আর তুই বলছিস আমি ছিলাম?'

'ছিলামই তো'— ফটিক মনে সাহস আনার চেষ্টা করছিল, 'একটু জল খেতে যাচ্ছিলাম, তখনই তো তুমি এলে।'

'মানে! পেজোমি করার আর জায়গা পাসনি। গেলাস তো হাওয়ায় ভাসবেই তো! আমি টেবিলে না রাখলে ওখানে যাবে কী করে!'

'বটে!'

'হ্যাঁগো'— ফটিক মুখে এবাব হাসি এনে বললো, 'জলটা খেলামও তো আমি, তুমি বুঝতে পারোনি?'

'বোঝাচ্ছি তোমায়!' মুখচোখের ভাব হিংস্র হচ্ছিল বাবার, বেশ বুঝতে পাবছিল ফটিক। মাকে ছেড়ে এবার ওকে নিয়ে পডবে, এটাও বোঝা যাচ্ছিল, কারণ মার গোঙানি তখন বন্ধ হয়েছে, দিব্যি চোখ পিটপিট করতে শুরু করেছে। বাবা বোধহয় সেটা দেখতে পেয়েছিলেন, তাই ওর দিকে ফিরেই বললেন, 'এসব মস্করা তাহলে তুইই করছিলি বলতে চাস?'

'মস্করা না বাবা, ম্যাজিক—' নিজেকে বাঁচাবার ক্ষীণ চেষ্টায় ফটিক বলতে চেষ্টা করলো, 'ভূতেশ্বর মামদো এটা আমায়—'

'চোপ!' বাবার নিজমূর্তি এবার প্রকাশিত হলো, এতোক্ষণ মেঘের আড়ালে সূর্যের তেজ চাপা পড়েছিল। বললেন, 'মামদো দেখাচ্ছো আমায়? হুমদো কোথাকার! বছর বছর ফেল মারছো আর বসে বসে ম্যাজিক বানাচ্ছো!'

'না, বাবা—' শেষ চেষ্টা করে দেখলো ফটিক, 'ম্যাজিক আমি বানাইনি, ওই ভূতেশ্বরই তো আমায় দিয়েছে, দেখো!'

সুপুরির মতো ফলটা আস্তে আস্তে এগিয়ে দিয়েছিল ফটিক বাবার দিকে, কিন্তু বাবা যে এই কাণ্ড করবে ভাবতেই পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে সেটা হাতে নিয়ে বাবা একেবারে ছুঁড়ে

ফেলে দিয়েছেন জানলা দিয়ে। ফটিক ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, খপ করে চেপে ধরেছেন ওর হাত, বলেছেন, 'পড়াশুনো তো ডকে উঠেছে, লুকিয়ে-চুরিয়ে কি এবার নেশা-ভাং-ও ধরা হয়েছে? নইলে এতো সব উর্বর চিন্তা—'

এর পরে কী হতে পাবে ফটিকের জানা। খুব ভালোভাবেই জানা। পরশুই এক প্রস্থ হয়ে গিয়েছে, গাল এখনও চড়চড় করছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক এটা কখনই ওর মনঃপূত নয়। তাই হ্যাঁচকা টান মেরে বাবার হাতটা এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়িয়ে নিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে চটজলদি চটেশ্বরের ওপর। বোধহয় অজান্তেই বলে ফেলেছে, 'চল দেখি বাবার নাগালের বাইরে।'

তারপর যা হলো সেটা বোধহয় ভূতেশ্বব মামদো নিজেও ভাবতে পারেনি। চটেশ্বর চটপট ফটিককে নিযে উঠে পড়লো বেশ খানিকটা ওপরে, মানে যতোটা উঠলে বাবার নাগাল এড়ানো যায় আর কি! সঙ্গে সঙ্গে বসে না পড়লে ওর মাথাটাই ঠুকে যেতো ছাদে। এর পর শুরু হলো, যাকে বলে চোব-পুলিশ খেলা। বাবা যতো হাঁই হাঁই কবে তেড়ে আসছেন, চটেশ্বর ততো সটাসট পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। একেবারে সেই ঠাকুবঘরে ঢুকে-পড়া ভীমরুলটার মতো, ছাদে দেওয়ালে গোঁত্তা খাচ্ছে কিন্তু একবাবও ঝাঁটা দিয়ে মা আছড়ে ফেলতে পারেনি সেটাকে মাটিতে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই দৃশ্যটা যা হয়ে দাঁড়াল, দেখবার মতো। বাবা দৌড়োদৌড়ি করে প্রায় ক্লান্ত, হাঁফাচ্ছেন জিভ বার কবে। ফিল্ডে নেমে পড়েছে মা-ও, বাতের ব্যথার পবোয়া না করে সমানে লড়ে যাচ্ছে। তবে লডার চেয়ে চিৎকারটাই বেশি— 'ওই যে ওদিক দিযে', 'অঃ, বাঁদিকটা চেপে যাও না', 'দূব, একলাফে জাপটে ধরো না গো'— এইরকম সব আর্তনাদ। দশ মিনিটেব বেশি লাফালাফি করা অবশ্য বাবার ধাতে সয না, ফটিক যখন ভাবতে শুরু করেছে বাবা রণে ক্ষান্ত দিয়েছেন তখনই দেখতে পেল বাবা গলি থেকে টেনে নিয়ে এসেছেন ঝুলঝাড়াখানা। অর্থাৎ শুধু হাতে নয়, অস্ত্র দিযেই এবাব মোকাবিলা করা হবে সমস্যার।

'দোহাই বাবা চটেশ্বর!' মনে মনেই বললো ফটিক, কারণ চটেশ্বরের খেলা দেখা ছাড়া কিছু করবারও ছিল না তখন। তা খেল দেখালো বটে চটেশ্বর। যে মুহূর্তে ঝুলঝাড়াটা বাঁই করে কানের পাশ দিয়ে বেরিযে গেছে, সেই মুহূর্তে প্রায় মারাদোনার মতো ডজ করাব ভঙ্গিতে মা, বাবা আর ঝুলঝড়াকে কাটিয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে ফুড়ুৎ করে গলে একেবারে ভেতরের বিশাল উঠোনে। উঠোনে মানে অবশ্য চাতালে, ফুট দশ-বারো ওপরে।

বিরাট একান্নবর্তী সংসার। দেখতে দেখতে হাঁকডাক এবং 'দলে দলে যোগ দিন' গোছের ব্যাপারে উঠোন ভরে গেল! বাবা লাফাচ্ছেন তিড়িংবিড়িং করে, না, ঝুলঝাড়া এখন আর হাতে নেই। মা গলায় আঁচল দিয়ে আকাশপানে মুখ চিতিয়ে বলছে, 'দোহাই বাবা চটেশ্বর, ছেলেটাকে ফিরিয়ে দাও আমায়, জোড়া পাঁঠা মানত করছি।'

জ্যাঠাইমা বলছে, 'ওমা, চটেশ্বর আবার কি! ওর কাছে বলে কিছু হবে না, মনে মনে

আদ্যাস্তোত্র জপ কর!'

জ্যাঠামশাই গোঁফ পাকিয়ে বলছেন, 'দূর, কিছু করেই কিছু হবে না, ওকে পেঁচোয় পেয়েছে। রাধু কামারকে খবর পাঠা, কোনো ভালো ওঝা-টোঝা আছে কিনা ধরে নিয়ে আসুক।'

এমনি যখন টালমাটাল অবস্থা, তখন রঙ্গমঞ্চে ছোটকাকুর উদয় হলো। একমাত্র এই মানুষটাকেই ভালো লাগে ফটিকের। আজ পর্যন্ত যে কটা ভালো বই পড়েছে, ভালো ভালো জায়গায় গেছে সব ওই ছোটকাকুর জন্যেই। বলতে কি, বাবার হাত থেকে বাঁচায় ওই ছোটকাকুই, বাবাকে আড়ালে ডেকে বলে, 'বাচ্চাবেলায় সবাই ওরকম থাকে, তুমি ছিলে না? বাবা কতো গল্প করেছে তোমার দুষ্টুমির! একটু বড়ো হতে দাও না, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সেই ছোটকাকু! এসেই দু-মিনিটের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিলে, তারপর চিৎকার করে বললে, 'এই, সব যাও তো বাড়ির ভেতরে, যাও, যাও! আমি দেখছি।'

ছোটরা চটপট সরে পড়লো ছোটকাকুর কথাই ওদের সরাবার পক্ষে যথেষ্ট। বাবা একটু গাঁইগুঁই করছিলেন, শেষ পর্যন্ত জ্যেঠামশাই-ই বাবাকে টেনে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'আয় আয়, খোকা কী করে দেখাই যাক না একবার।'

উঠোনটা বড় ম্যাচ শেষ হওয়া মাঠের মতো ফাঁকা হয়ে গেলে ছোটকাকু বললে, 'এই ফটকে, কী ব্যাপার বল দেখি।'

'বলছি—' ভরসা পেয়ে ফটিক এবার ফিসফিস করে বললে, 'নামিয়ে দাও তো বাবা চটেশ্বর।'

হুকুম তামিল করতে একটুও ক্লান্তি নেই চটেশ্বরের। স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামার পর ছোটকাকু বললে, 'কী হয়েছিল বল দেখি এবার ব্যাপারটা।'

বললো ফটিক, আদ্যোপান্ত সব খুলে বললো, একটুও বাদ না দিয়ে। ভেবেছিল কাকু হয়তো রেগে যাবে শুনে। বিজ্ঞানের জাঁদরেল ছাত্র কাকু, কাজ করে পুলিশের সি. আই. ডি. দপ্তরে। এসব গল্প শুনে হয়তো বলবে, 'কি আবোল-তাবোল ভাবিস বসে সারাদিন। তোকে তখনই তো বলেছিলাম এরকম গাঁজাখুরি ভাবনা ছেড়ে দিতে।' কিন্তু কি আশ্চর্য, কিছুই বললো না ছোটকাকু সেরকম। গোটা গল্পটাই শুনলো বেশ মন দিয়ে। শেষ হবার পর চোখ পিটপিট করলো কবার, তারপর পিঠে আলতো একটা চাপড় দিয়ে বললো, 'ঠিক বন্ধুই খুঁজে পেয়েছিস এতোদিন।'

'মানে?'

'ভূতেশ্বর মামদোর বন্ধু বোকেশ্বর হুমদো।'

'সে আবার কী?'

'আরে বাবা, ওরকম হুমদোপানা না হলে কারো বুদ্ধি এরকম হয়। ভূতেশ্বর তোকে প্রায় যা খুশি করার একটা বর দিয়ে দিয়েছে, আর তুই কিনা চাইলি প্রশ্নগুলো জেনে নিতে?'

'তা নইলে পাশ করবো কী করে?'

'দূর ব্যাটা বোকেশ্বর! ভূতেশ্বরকে বললি না কেন মাথায় বুদ্ধিটা একটু ভালো করে দিতে, পড়াশুনোয় মনটা আর একটু ঢুকিয়ে দিতে, তাহলেই তো সবকিছু সহজ হয়ে যেতো তোর পক্ষে!'

'তাই তো!' চোখ দুটো তিন টাকা সাইজের রসগোল্লার মতো করে ফটিক বললে, 'এ কথাটা তো একেবারে খেয়াল হয়নি!'

'হলে আর বোকেশ্বর বলবো কেন তোকে?'

'কী করা যায় এখন?'

'খুব সহজ। দু-দুটো ভুঁইপটকা তো আছেই তোর কাছে, একটা ফাটিয়ে ফেল, তোর বন্ধুকে বল এবার ওই দুটো জিনিস দিতে।'

'ঠিক বলেছো, এখুনি ফাটাই তাহলে, কেমন?'

'উঁহু কাল সকালে! আজ আর এতোটা সবাই সহ্য করতে পারবে না। অবশ্যি বোম যে তুই ফাটিয়েছিস সেটা সকলে জানবে আরো অনেকদিন পরে।'

'কবে?'

'যেদিন তোর রেজল্টটা বেরুবে। সবাই বুঝবে খেলাধুলো, বদমাইশি দুষ্টুবুদ্ধির শিরোমণি এখন লেখাপড়াতেও চ্যাম্পিয়ন।'

হাসতে গিয়েও কি জানি কেন চোখে জল এসে গেল ফটিকের। সেটা লক্ষ্য করলো ছোটকাকু, পিঠে এবার বিরাশি সিক্কার একটা থাপ্পড় মেরে বললো, 'দূর ব্যাটা বোকেশ্বর!'

এবার দুজনেই হেসে উঠলো বাড়ি কাঁপিয়ে।

ভুলো ভূত

মহাশ্বেতা দেবী

তপন বাবু জীবনে কিছু ভোলেন নি। ওঁর জন্ম ১৯১২ সালে। এ গল্প যখন লেখা হচ্ছে, তখন তিনি সত্তর পেবিয়েছেন। কিন্তু ক্লাস ফাইভে পড়াব সময়ে কোন বইয়েব কোন পাতায় কোন কবিতা পড়েছিলেন, সব বলে দিতে পারেন।

সারা জীবনে উনি একবারও ছাতা ট্রামে বেখে নেমে পড়েন নি, বাজার থেকে কি কি আনতে হবে তা ভোলেন নি। এসব খুবই ভালো গুণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই তাঁকে যথেষ্ট ভয় করে।

কেননা, কেউ কিছু ভুলে গেলে তপনবাবু বেজায় চটে যান। ভুলে যাওয়াটা ওঁর মতে সবচেয়ে বড় দোষ। এ হেন তপনবাবু সেদিন এক ভীষণ বিপদে পড়লেন। ওঁর নাতি বাবুয়াব বযস এগারো। সে আবার বেজায় রকম ভুলো। এই নিয়ে যথেষ্ট বকাবকি করে একশো আটবার বাবুয়াকে দিয়ে "হে বাম। আর ভুলব না" বলিয়ে উনি যেই নিজের ঘরে ঢুকেছেন, সেই আলো নিভল।

যা হোক, রাতটা চাঁদনী ছিল। ঘরে বেশ স্বচ্ছ একটা আলোও আসছিল। হঠাৎ তপনবাবু দেখলেন, ওঁর ঘরে চেয়ারের ওপর একটা মাথা ভেসে আছে, এবং মাথাটি কাঁদছে। যথেষ্ট, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে।

—এর মানে কি?

তপনবাবু যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন। লোডশেডিং হোক বা না হোক, এখন উনি বজ্রাসন করবেন, জল খাবেন, তারপর শোবেন। রুটিনে বাগড়া পড়লে ওঁর মেজাজ ঠিক থাকে না।

—আমার ঘরে একটা মুণ্ডু কেন?

—সার! আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—তুমি কে হে?

—আজ্ঞে আমি এখন ভূত।

—আহা হা! কান জুড়িয়ে গেল।

—আমি ভূত, সার!

—বলি ধড়টা কোথায়?

—মনে করতে পারছি না।

—তাব মানে?

—সার! একটু শুনবেন?

—বলো। শুনে ধন্য হই।

—আমি. .মানে .আমার মাথা তো কাটা গিয়েছিল কি না! মানে ডাকাতরা আমার মাথা কেটে ফেলেছিল।

—কেমন করে?

—আমি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলাম তো।

—কেন? জঙ্গল ছাড়া যাবাব পথ ছিল না?

—ছিল .তবুও. .

—বেশ! মাথা কেটেছিল, বুঝলাম।

—সেই থেকে যখনি মানুষকে...মানে আপনাদের ভয় দেখাতে যাই, ধড়ের একটু উপরে মাথাটা .. ভাসতে থাকে।

—- আজই বা এমন মূর্তিতে এলে কেন বাপু ?

— সেই তো বলতে চাইছি সার। আজ আমি ধড়টা ভুলে চলে এসেছি।

— কি বললে?

—অত ধমকে কথা বলবেন না সার। আমার ভীষণ ভয় করে।

— ভয় করে! লজ্জা করে না?

— লজ্জা?

—আবার জিগ্যেস করছ? মানুষের মধ্যে রাতদিন দেখছি ভুলো স্বভাব। অপদার্থ সব! ভূতের মধ্যেও সেই স্বভাব? ধড়টা ভুলে চলে এসেছে?

— হ্যাঁ সার।

— তার মানে, যখন জ্যান্ত ছিলে তখনো এমনি ভুলোই ছিলে? নিশ্চয় তাই হবে।

— হ্যাঁ সার!

মুণ্ডটি গভীর অনুশোচনায় কাঁদতে থাকে। সে এর দৃশ্যেই বটে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলে, কিছু মনে করতে পারছি না সার! কোথায় রেখে এলাম ধড়টা। আসলে, আজ যে আমার মানুষকে ভয় দেখাবার কথা, তাই ভুলে গিয়েছিলাম।

— বটে!

এতক্ষণে তপনবাবুর গভীর কৌতূহল হল। বলতে কি, এই প্রথম তাঁর মনে হল যে ভূতদের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। সন্ধেবেলা লেকে হাঁটতে যান। তাঁর কয়েকজন বন্ধুও আছেন। তাঁদের এ সব কথা বললে তাঁরা অবাক হয়ে যাবেন।

— ভয় দেখাবার কি দিনক্ষণ থাকে না কি? গভীর দুঃখে মুণ্ডটি বলতে লাগল, মানুষকে ভয় দেখাতে আসা তো নিয়ম স্যর! তা আমি মানুষদের বেজায় ভয় পাই তো। বার তিনেক ভয় দেখাবার চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেদিন তা নিয়ে খুব গণ্ডগোল হল।

— ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?

—মানুষ আজকাল ভালো নেই সার। ভয় পাবে কি, তারাই উলটে ভয় দেখায়। এই দেখুন না, কত দেখেশুনে ঢুকেছিলাম একটা এঁদোপড়া বাড়িতে। সেখানে দেখি তিনটে ভয়ানক চেহারার ছোকরা বসে তাড়া তাড়া নোট ভাগ করছে। আমি তো কথাবার্তায় বুঝলাম যে ওরা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে এখন নোট ভাগ করছে। আমাকে দেখে তাবা ছোরা নাচিয়ে বলে কি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব আমরা আর তুমি বেটো ভূত সেজে তাতে বখরা বসাতে এসেছ? কত বললাম যে আমি ভূত। আমি টাকা চাইনা, আমি ভয় দেখাতে চাই।

— ওরা শুনল না?

— না না। এমন খেঁকাল যে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। তারপর দেখুন না, ক'দিন বাদে পুলিস অফিসারের ঘরে গিছলাম। যথেষ্ট বন্ধুভাবেই বললাম, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা কিন্তু অমুক জায়গায় আছে।

— সে কি বলল?

— আমলই দিল না। সেকি জঘন্য ভাষা। "ফোটো ফোটো" বলে চেঁচাতে থাকল। বলল, ধড়ে মাথা বসানো নেই, কোন আক্কেলে থানায় ঢুকেছ? নাম কি? নিবাস কোথায়? ঠিকানা কি? ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ঠিকানা তুমি কোথায় পেলে?

— তখন?

— তখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলাম। আচ্ছা, "ফোটো" বলছিল কেন? আমি কি ফুল, যে ফুটব?

— ওটা এখনকার বুলি। ওর মানে সরে পড়ো, চলে যাও।

— দু-বার দু-বার এ রকম হল যখন, তখন আমি বেজায় মুষড়ে পড়লাম। কিন্তু আমাদের ইউনিয়ানে এখন সব চ্যাংড়া ভূত।

— ইউনিয়ানও করা হয়?

— করাকরির কি আছে সার? ভূত হলেন যখন, তখনি আপনিও ইউনিয়ানের লোক।

— একটা ইউনিয়ান, না অনেক?

— একটাই। চ্যাংড়গুলো অসম্ভব গোলমাল করে। তারা বলল, তুমি ভয় দেখাতে যাবে না, মজা পেয়েছ? যত বলি, মানুষ আজকাল ভয় পায় না। কে কার কথা শোনে।

— তাবপর কোথায় গেলে?

— আপনার বাড়ির উলটো দিকে। ওই তেতলা বাড়িতে। সে এক দজ্জাল মেয়েমানুষ বটে। ভয় পাওয়া দূরস্থান। সে বঁটি নিয়ে আমায় তাড়া করল।

— ওখানে গিছলে কেন বাপু? বোসবাবুর গিন্নি নামকরা দজ্জাল।

— তাবপর আমি একেবারে বেঁকে বসেছিলাম। আর আমি ভয় দেখাতে যাব না। মানুষ এখন খুব খারাপ হয়ে গেছে। ছোট ছেলেরাও ভূত দেখলে ভয় পায় না। কিন্তু আজ শুনলাম, ভয় দেখাতে না বেরোলে আমাকে একঘরে করা হবে।

— তাতে কি?

— ভূত হযে ভূতেব সমাজে থাকতে পাব না, এটা তো খুবই অপমানজনক। না কি বলুন? ওরা সব বলেও দিল অমুক জায়গায় যাও, ওই ঠিকানায়। সেখানে যাবার পথেই ধডটা ফেলে গেলাম, না সেখানে গিয়ে তবে ফেলে এলাম, কিছু মনে করতে পাবছি না। সব ভুলে গেছি।

— সেখানে গিয়েছিলে?

— মনে হচ্ছে, গিয়েছিলাম।

— সে কোথায়?

— মনে নেই সাব।

— তা আমার মনে হয়, তোমার এখন ফুটে যাওয়াই ভালো। তোমার সমস্যা খুবই জটিল। কিন্তু এ সমস্যাব বিষযে আমার কিছুই করার নেই।

শান্তির গল্প

কবিতা সিংহ

কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পর তিনটে বাড়ি বদল হ'ল। যদি একটাও বাড়ি বাবা আর মা দুজনের পছন্দ হয়। বাবার হলে মায়ের হয় না, মায়ের হলে বাবার হয় না। শেষ পর্যন্ত ওল্ড বালিগঞ্জ -এ একটা চমৎকার গড়নের বহু পুরোনো আমলের একতলা খোলামেলা মফস্বলের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি পেয়ে মা বাবা দুজনেই খুশি আর মিলু-পলি খুশি চমৎকার গাছপালায় ঝুপ্‌সি পড়ো বাগান পেয়ে। বাড়ির চিলেকোঠায় ছোট্ট একটি ঘরে কেবল মরচে পড়া একটা তালা আটকানো।

বাবা কথা দিলেন বড় আমগাছটায় দুটি চওড়া হ্যামক বেঁধে দেবেন। যাতে পরীক্ষার পর—দুই ভাইবোন বাগানে রোদে ছায়ায় আরাম করে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে পারে।

বাবা অফিসে বেরিয়ে পড়ার পর মা মাঝে মাঝে রাঙা পিসিকে নিয়ে বাজারে বেরোন। তখন শুধু—আয়া চুম্‌কি আর কাজ করার লোকেরা আর রাঁধুনী শ্যামা মাসীর রাজত্ব।

খুব কড়াকড়ি।

সেদিন কি একটা উপলক্ষ্যে মিলু-পলির ছুটি ছিল। বাগানে মাটি খুঁড়ে উনুন বানিয়ে, লুচিপাতার তরকারি আর লাল কাঁকরের ডাল বানিয়ে মিলু-পলি পুতুলের পিক্‌নিক করছিল। হঠাৎ দেখে নীচু ঝুপ্‌সি ফণিমনসার ঝোপের পাশ থেকে তাদের সমবয়সী একটি মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। কি সুন্দর মায়া মাখানো বড় বড় চোখ, লম্বা লম্বা নরম পল্লবে ঘেরা। ফ্যাকাশে ফরসা মুখ। পাতলা দুটি ঠোঁট! গালে একটি তিল, ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ওর খুব খেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। মিলু-পলি ডাকলেই আসে। মিলু আর পলিও খুব খুশি। বলল, —এসোনা ভাই আমাদের পিক্‌নিকে।

মেয়েটি এগিয়ে এল।

—তোমার নাম কি ভাই?

—আমার নাম শান্তি—

—কোথায় থাকো ভাই?

—এই তো, কাছেই—

খুব কেতাদুরস্ত পোশাক পরা মেয়ে শান্তি। পরনে ফুলহাতা সাদা সিল্কের গাউন। জুতোয় ঝক্‌ঝকে বখলশ লাগানো। হাঁটু পর্যন্ত মোজা। ফ্রকের কোমরে বেল্ট লাগানো। ওপরে ভেলভেটের জ্যাকেট্ পরা। চুলে মস্ত ফুল করা সাটিনের রিবন বাঁধা। শান্তি ওদের পাশেই বসে পড়ল। তারপর চলল পুরোদমে পুতুলের পিক্‌নিক্।

শান্তি একদিনেই মিলু-পলির প্রাণের বন্ধু হয়ে গেল।

সবচেয়ে মুস্কিল হল বাবা মা আর রাঙা পিসির। বাবাকে খবরের কাগজ পড়া ফেলে, মাকে সেলাই ফোঁড়াই ফেলে, এক নাগাড়ে ওই শান্তির গল্প শুনতে হ'ত। রাঙা পিসির তো কলেজের পড়াই বন্ধ। শান্তি কি ভালো মেয়ে। শান্তি কি মজার মজার গল্প করে। শান্তিদের বাড়িটা কি ভালো। শান্তিদের খুব সুন্দর রোলস্ রয়েস্ গাড়ি আছে, খুব বড় ফিটন গাড়ি আছে। সেই গাড়িতে ওয়েলার ঘোড়া লাগানো। ঘোড়ার গায়ে ঝক্‌মকে পেতলের গযনা। মাথায় পালক দেওয়া টায়রা।

বাবা ভুরু তুলে বলেছিলেন সত্যি!

মিলু-পলি সমস্বরে বলল, হ্যাঁ বাবা। তারপর পলি বলল, —আমি শব্দ শুনেছি ঘোড়ার গাড়ির। ঘোড়ার গলার ঝুমুরগুলো কেমন ঝুম ঝুম শব্দ করে।

মিলু বলল— একদিন শান্তি রোলস্-রয়েস্‌টায় চেপেও এসেছিল। রূপোলি রঙের গাড়ি। গাড়ির ফুটবোর্ডের ওপব একটা শোয়ানো পেতলের সাপ সেই আগা থেকে গোড়া মার্ড গার্ডের উপর পর্যন্ত চলে গেছে। তার হাঁ করা মুখে একটা আলোর বাল্‌ব লাগানো।

এবার মা অবাক! —ভিনটেজ কার? তোদের শান্তিকে একবার আনিস না এখানে। বলিস মা আলাপ করতে চেয়েছে।

রাঙা পিসি বলল, —হ্যাঁ গল্প শুনে কৌতূহল হচ্ছে দেখবার জন্যে।

মিলু বলল,—আমরা তো কতবার বলেছি, বাগানে কেন ভাই, আযনা বাড়ির ভিতর খেলব! ও কিছুতেই আসতে চায়না। ওর ভারী লজ্জা!

মা বললেন, —বেশ। ও যখন আসবে তোদের মধ্যেকার একজন এসে চুপিচুপি আমায় খবর দিস, আমি গিয়ে আলাপ করে আসব।

মিলু-পলি বলল, —আচ্ছা!

বাজার থেকে ফিরে এসে মা সেদিন মিলু-পলিকে ডাকলেন।

—আচ্ছা, তোদের শান্তি ও পাড়ায় কোন্ বাড়িতে থাকে?

মিলু শুধালো, কেন মা?

—এ পাড়ায় পুরোনো আমলের বাসিন্দা মাধুরী দেবীর সঙ্গে আলাপ হল মনিহারী স্টোরে, উনি বললেন, এ পাড়ায় কারো রোলস্ রয়েস্ গাড়ি নেই। ওয়েলার লাগানো ফিটন গাড়িও নয়।

পলি বলল, —হতেই পারেনা। শান্তি তো বলেইছে ওর বাড়ি হল ফিরোজা মঞ্জিল। ওদের বাড়ির রঙ হাল্‌কা ফিরোজা, আর জানালার রঙ গাঢ় গোলাপী। মা বললেন,—এ পাড়ায় এমনি দেখতে বাড়ি কোথায়? আমি তো দেখিনি।

পলি বলল, —ঠিক আছে, আজ বিকেলে শান্তি এলে আমরা ওর সঙ্গে গিয়ে ওর বাড়ি দেখে আসব!

মা বললেন, —তার আগে তোমরা আমাকে ওর সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিও।

কিন্তু সেদিন বিকেলে শান্তি এল না।

পবদিন বিকেলে মিলু-পলি ছুটতে ছুটতে ওপরে এলো। তাদের হাতে গরম গরম সদ্য ভাজা আনন্দ নাড়ু কয়েকটি।

—মা, মা, দ্যাখো,টাটায় আমাদের সোনা পিসি এখন আনন্দ-নাড়ু ভাজছেন এই সেই নাড়ু!

মা বাবা রাঙা পিসি তো হতবাক। তোমরা কি করে নাড়ু পেলে?

—শান্তি এনে দিল। ও ম্যাজিক জানে। ওকে বলছিলাম টাটায় আমাদের একজন পিসি আছেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসেন। কথাটা শুনেই শান্তি বলল দাঁড়াও খবর এনে দিচ্ছি তোমাদের সোনাপিসির! তারপর এই নাড়ু এনে দিল! বাবার হাত থেকে খবরের কাগজটা ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তিনি বললেন, ডেট্ আর টাইম দিয়ে আমি এক্ষুনি সোনাকে চিঠি লিখছি যে সত্যিই সে এখন আনন্দ-নাড়ু ভাজছে কিনা! চাপা গলায় মা বললেন, —তোমরা আর শান্তির সঙ্গে মিশবে না!

পরদিন বাবা মা রাঙা পিসি আর মিলু-পলি বড় বসবার ঘরটায় বসে আছে হঠাৎ টেবিলে রাখা ভিজিটার্স প্যাডের উপর সুতোয় বাঁধা পেনসিলটা গড়গড় করে গড়াতে লাগল। মা কাঁপা হাতে পেনসিলটা তুলে নিতেই কে যেন প্যাডে তাঁর হাতটা আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিল। আঁকাবাঁকা কাঁচা হাতের লেখায় ফুটল, "মাসীমা, মিলু-পলিকে আমার সঙ্গে খেলতে দেবেন।

আমি বড় একা, আমি কখনো কারো ক্ষতি করিনি। করবও না। শান্তি।

এরপর মা পাতার পর পাতা লিখে যেতে লাগলেন। প্রশ্ন মা-ই করছিলেন শান্তি কেবল উত্তর দিচ্ছিল। আমার নাম শান্তি। আমি সত্তর বছর আগে এই পাড়ায় এই বাড়িতেই থাকতাম। এই বাড়ির ভাঙা গেটের থামটা উল্টে ফেললে দেখবেন পাথরের ট্যাবলেটে বাড়ির নাম লেখা আছে। আমার বাবা আর মা ছিলেন। ছোট্ট একটি ভাই-ও ছিল। আমার কালাজ্বর হয়। এগারো বছর বয়সে আমি মারা যাই। সব বেচে দিয়ে আমার বাবা মা চলে যান সিমলা পাহাড়ে। আমার বাবা মা আরো দশবারো বছর বেঁচেছিলেন। ভাইটি এখন অতি বৃদ্ধ। ও থাকে বিদেশে। আমি বাবা মাকে দেখতে পাইনা। ভাইকে কখনো কখনো দেখে আসি। সবার সঙ্গে কথাও বলতে পারিনা। শরীরও ধরতে পারিনা। মিলু-পলির বয়সী কারো কারো সামনে পারি।

মা প্যাড রেখে দিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মিলু-পলি, যাও, শান্তির সঙ্গে খেলো গিয়ে। মিলু-পলি চলে যাবার পর বাবা মাকে বললেন, —এ তুমি কি বললে বীণা? মা বললেন, আহা, মেয়েটার কষ্টের কথা ভাবো তো?

রাঙা পিসি বলল, তা বলে জেনে শুনে—

মা বললেন,—বেশতো, তোমার দাদার যদি এতই ভয় হয় গয়ায় যাক না, ভূতকুণ্ডে পিণ্ডটা দিয়ে আসুক। মেয়েটা উদ্ধার পাক।

তিনদিন বাদে বাবা প্রেতকুণ্ড থেকে পিণ্ড দিয়ে ফিরলেন। ইতিমধ্যে টাটা থেকে বাঙাপিসির চিঠিও এসেছে। হ্যাঁ ওই তারিখে, ওই সময়ে সোনা পিসি আনন্দ নাড়ু ভাজছিলেন।

মিলু পলির কিন্তু খুব দুঃখ। আর শান্তি আসেনা। ঘোড়ার গাড়িব ঝুমুর ঝুমুর নেই। রোলস্ রয়েসের শব্দ নেই। শেষপর্যন্ত বাড়িটি মা বাবার এত পছন্দ হয়ে গেল যে বাড়িটা কিনেই নেওয়া হ'ল। বাড়ি সারানোর আগে চিলেকোঠায় সেই মরচেপড়া তালা ভাঙা হল। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে মা বাবা আবিষ্কার করলেন অনেক পুরোনো ছবি, কিছু ভাঙা খেলনা আর একটি পুতুলের বাক্স। পুরোনো ছবির মধ্যে চোখে পড়ল শান্তির একটি ছবি যে পোশাক পবে সে মিলু-পলির কাছে আসত অবিকল সেই পোশাক।

এখনও তোমরা যদি মিলু-পলিদের বাড়ি যাও, তাহলে ওদের ঘরের দেয়ালে টাঙানো শান্তির ছবিখানি দেখতে পাবে। ছবির মধ্যে থেকে হাসছে শান্তি। মিলু-পলির সত্তর বছর আগেরবেঁচে থাকা প্রাণের বন্ধু।

অবুঝ ভূতের গল্প

বাণী রায়

সবুজ সাহিত্যের পাতায় নানা অবুঝ ভূতের গল্প পড়ে পড়ে আমার মনেও অবুঝ ভূতেব গল্প দানা বাঁধে। 'অবুঝ' মানে ঠিক বুঝেছ, পাঠক-পাঠিকা? এমন গল্প, যার কোন যুক্তিগত অর্থ খোঁজা শক্ত।

এমনি একটি শোনা ভূতের গল্প লিখছি আজ। প্রথমেই বলে নিচ্ছি সত্যমিথ্যা প্রমাণের দায়িত্ব আমার নয়। পশ্চিমে বহুদিন প্রবাসিনী আমার জ্যাঠাইমা সম্পর্কিতা এক চমৎকার মজলিসী মহিলার মুখে গল্পটি শুনেছিলাম। বিচিত্র গল্পটি মনেও রেখেছি, বহুবার বহু লোককে শোনানোর পরেও।

পশ্চিমের কোনও একটা শহরে কোনও এক ভদ্রলোকের কথা।

লোকটি অফিসে চাকরি করত। বাড়ীতে একমাত্র স্ত্রী ছিল। অফিস থেকে একদিন ফেরার পর বড় গরম বোধ হতে লাগল ওর। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

সে স্ত্রীকে ডেকে বলল, "ওগো, আমি একটু বাইরে ঘুরে ঠাণ্ডা হয়ে আসি গে। তুমি

রুটি বানাও, ফিরে এসেই একেবারে রাতের খাওয়াটা সেরে নেব।" স্ত্রী গজ্ গজ্ করতে লাগল, "অফিস থেকে ফিরে মাত্র এককাপ চা খেয়ে আবার বার হচ্ছ? তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু। আমি এক্ষুনি রান্নাবান্না সেরে রাখছি।"

লোকটি রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা দুরেই চলে এল। রাস্তা তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ও অঞ্চলের টিম্‌টিমে গ্যাসবাতি তখনও জ্বলেনি।

রাস্তার পাশে মাঠ। দুদিকে রাস্তায় বড়-বড় গাছ লাগানো। আধো-অন্ধকারে এক ঝাঁকড়া ঝুরি-ঝোলানো বটগাছের তলায় চানাচুরওলাকে দেখা গেল।

লোকটি ভাবল ঃ পায়ে-পায়ে অনেকটা দূরই এসেছি। আবার অনেকটা দূবই ফিরতে হবে। একঠোঙা চানাচুর কিনে খেতে খেতে যাই। খালি পেটে খিদের জ্বালা এখন বোঝা যাচ্ছে। বউ-এর কথা শুনে নিলেই হ'ত।

চানাচুরওলার কাঠের বারকোষে ঠকাস্ করে একটা দোয়ানী রেখে (তখন দোয়ানী ছিল, হালের পয়সার আমল নয়) লোকটি চাইল একঠোঙা চানাচুর।

চানাচুরওলার গায়ে ময়লা জামায় গা-ঢাকা, মাথায় সাদা ময়লা কান-ঢাকা টুপি। মাথা নামিয়ে একমনে গরম চালায় ঝাল-ঝাল মসলা মাখছে। গাছের ঝুরি-ঝোলা আবছা অন্ধকারে লোকটির দিকে দেখছি। মুখে কোনও কথা নেই।

গরম গরম লাল্‌চে মটরের দানা অন্ধকারেও দেখা যায়। লোকটি ক্ষুধার্ত ও লোভার্ত হয়ে হাত বাড়িয়েই চমকে উঠল।

চানাওলা দু'হাতে ঠোঙা ধরেছে। তখন দু'আনার চানা বেশ অনেকটা হ'ত। যে হাত দু'খানি টোঙাধরে এগিয়ে দিচ্ছে, চানাওলার সেই হাত দু'খানি মোটেই মানুষের হাত নয়।

ওরে বাবা '

আগাগোড়া মানুষের চেহারা চানাওলার। হাত দু'খানি কব্জী পর্যন্ত মানুষের।

তারপরেই গলদ!

কব্জী থেকে হাতের পাতা আর হাত নয়। ঘোড়ার ক্ষুর দু'খানা!!

লোকটি ভয়ে-বিস্ময়ে পাগল হয়ে বাড়ীর পথে ছুটে ফিরতে লাগল। চানার ঠোঙা যেমন তেমনি পড়ে রইল।

খানিকটা পথ এসে দেখল এক পাহারাওলা চারিদিকে দৃষ্টি বেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গদাইলস্করী চাল। হাত প্যান্টের পকেটে পোরা। যেন পুরো সাহেব।

পাহারাওলাকে দেখে লোকটির দেহে প্রাণ এল ফিরে। এইবার একটা ভরসা পেলাম, বাবা!

সে তাড়াতাড়ি পাহারাওলার কাছে এগিয়ে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ও দাদা, এক কাণ্ড হয়েছে।"

লোকটি সমস্ত খুলে বলল যা দেখেছে।

পাহারাওলার মুখে হাসি।

লোকটি অধীর হয়ে বলল, "না দাদা, হাসবেন না। আমি মোটেই ভুল দেখিনি। চোখ রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে দেখেছি। প্রথমটা চোখকে বিশ্বাস করিনি কিনা।"

এবার পাহারাওলার অট্টহাসি। হাসতে হাসতে সে ধীরে-সুস্থে প্যান্টের পকেট থেকে নিজেই হাত দু'খানা বার করে লোকটির নাকের ডগায় ধরে জিজ্ঞাসা করল, "ভায়া, দেখতো এই হাত নাকি?"

সেই ঘোড়ার ক্ষুর!

পাহারাওলার কব্জীতে বসানো সেই একজোড়া নালবাঁধা ঘোড়ার ক্ষুর!

"ওরে বাবা, গেছি, মরেছি!"

লোকটি ছুটতে ছুটতে বাড়ীর দরজায় এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "খোলো, দরজা খোলো।"

লোকটি পাগলের মত দরজায় ঘা দিতে দিতে চীৎকার করতে লাগল। যদিও চানাওলা বা পাহারাওলা একবারও তাকে তাড়া দেয়নি, তবু সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। কী জানি ধরে ফেলে যদি?

তার বাড়ীটি শুধু নিরাপদ। এখানে স্ত্রী আছে, গরম খাবার আছে। আর সে বাড়ী থেকে বেরোবে না। কালই সে এ শহর ছেড়ে বউকে নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও।

স্ত্রী চট্ করেই দরজা খুলে দিল। বেচারী বোধহয় স্বামীর পায়ের শব্দের আশায় বসেছিল।

লোকটির তখন কথা বলার সাধ্য নেই। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে সে হাঁ করে। মোটা মানুষ, তার বয়স চল্লিশ হয়েছে। এক ছুটে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে এতটা পথ ঠেঙিয়ে ছুটে এসে বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে।

মুখে কথা সরছে না। তবু বউকে দেখে লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, "জানো, কি হয়েছে? কী ভয়ানক সব পথে দেখলাম!"

কোন মতে গল্পটা সে বলে দিল।

স্ত্রী তখন কাপড়ের মধ্যে থেকে নিজের দু'খানা হাত বা'র করে তার চোখের সম্মুখে মেলে ধরল।

"দেখ তো, এই হাত নাকি?"

লোকটির আর কথা বলার ক্ষমতা হ'ল না। এক চীৎকার দিয়ে সে ধরাস্ করে পড়ে গেল দরজায়।

শব্দ শুনে তার আসল স্ত্রী রান্নাঘর থেকে এসে দেখল, সে আর নেই, সে মরে গেছে। একা পড়ে আছে দরজায়।

এখানেই গল্পটা শেষ। যে-কোন ভূতের গল্পে নাই। কিন্তু 'অবুঝ' অংশটা যে, লোকটির অভিজ্ঞতার কথা অন্য কেউ জানল কেমন করে? চানাওয়ালার হাতে ক্ষুর দেখে সে বলল পাহারাওলাকে। পাহারাওলা তো ভূত। আবার পাহারাওলার হাতে ঘোড়ার ক্ষুর দেখে সে বলল কাকে? স্ত্রীকে। যে-স্ত্রী সেজে এসেছে আবার ওই ভূতই।

আসল স্ত্রী যখন এল, তখন সে তো বলাকওয়ার অতীত হয়ে গেছে।

তবে এটা নিছক গল্প? যে লেখক সমস্ত অদেখা জিনিস দেখতে পান, সমস্ত অজানা জিনিস জানতে চান, তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু, বিজ্ঞানের যুগে তোমরা মেনে নেবে? 'অবুঝ' অংশ থেকেই যায় তাহলে।

যুক্তি দিয়ে বোঝা যাক।

লোকটির শরীর সারাদিন অফিসের পরিশ্রমে ও গরমে খারাপ হয়েছিল। তাই সে বিকালের জলখাবার না খেয়েই ঠাণ্ডা হতে গেল মাঠেঘাটে।

অসুস্থ শরীরে আবছা আলোয় সে ভুল দেখেছিল যে চানাওলার হাতে ঘোড়ার ক্ষুর বসানো। ভয় পেয়ে এসে আরও মাথা গুলিয়ে গেল। ওর পাহারাওলা হেসে হেসে ঠাট্টা করে নিজের হাত দেখাল। সে হাতে নিশ্চয় নূতন ধরনের দস্তানা আঁটা ছিল। চল্লিশ বছরে চোখে চাল্‌সে পড়ে কিনা।

আরও ভয় পেয়ে যখন সে বাড়ী এল তখন তার অবস্থা চরমে। আধ-বুড়ো লোকটা অসুস্থ মোটা দেহ নিয়ে গরমে অতটা ছুটেছে। স্ত্রীও ঠাট্টা করে নিজের হাত দেখিয়েছিল নির্ঘাত। আজগুবী কথা শুনলে সবাই তাই করে থাকে। আসল স্ত্রীই দরজা খুলেছিল। তখন লোকটা চোখে-কানে দেখছিল না ভয়ে আর অসুস্থতায়। যা দেখছে তাতেই ঘোড়ার ক্ষুর আঁকা দেখছে। একে বিকার বলে।

মোটা প্রৌঢ় লোক ছুটে বেদম হয়ে ভয় পেয়ে হার্টফেল্ করে মরল।

এর মধ্যে ভূত কোথায়?

যাইহোক শৈশবে শোনা আমার জ্যাঠাইমা 'নেবুর মা' নামে খ্যাত তরুলতা রায়ের মুখে শোনা গল্পটার এমনি এক যুক্তি ভিত্তি নিজের মনে খাড়া করলাম।

তোমরা যা ইচ্ছা ভেবে নাও।

ভূতের মাসী ভূতের পিসি

পূর্ণেন্দু পত্রী

পুকুরের রোয়াকে বসে দাঁত মাজছি। মা-ও ঘাটে এসেছে ঠাকুর পুজোব বাসন মাজতে। বাসন মাজতে মাজতেই মা কথা বলে চলেছে নন্দী পিসির সঙ্গে। নন্দী পিসি আমাদের নিজেদের পিসি নয়। গোটা গ্রামের পিসি। বাবা-কাকা-মা-জেঠীরাও পিসি বলে। আমরাও বলি। বিধবা। বয়স প্রায় ষাট-সত্তর। ছিবড়ে পাকানো একবত্তি চেহারা। কিন্তু কথা বলতে পারে বটে। দিন রাত খই ফুটছে মুখে। পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে রাজ্যের যত খবর পৌঁছে দেওয়াটাই তার সারাদিনের কাজ।

দাঁত মাজতে মাজতে শুনতে পাচ্ছি নন্দী পিসি মাকে বলছে—

—শাশুড়ি বৌয়ে কি ঝগড়া মা, কি ঝগড়া। আর ছেলেটাও হয়েছে তেমনি বৌ-আঁচলে। লেখাপড়া শিখে কি করে যে এমন স্বার্থপর হয় মানুষ বুঝিনে মা।

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে আমি বলে ফেলি।

—কাদের কথা বলছ গো পিসি?

আমি কথাগুলো শুনে ফেলেছি দেখে নন্দী পিসি আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে

একটু ঘুরে বসে।

—সে তুই জানবিনি। অন্য গাঁয়ের কথা বলতেছি।

সেদিন আর চেপে রাখতে পারিনি জিভের ডগায় উঠে এসেও প্রশ্নটাকে গিলে ফেলতে হয়েছে আগের দিনগুলোয়।

—আচ্ছা পিসি, তুমি দশ গাঁয়ের এত হাঁড়ির খবর পাও কি করে গো?

পিসির মুখে এক গাল হাসি। অর্ধেক দাঁত পড়ে গেছে। যেগুলো আছে, পান-দোক্তার কষে মিশমিশে কালো। হাসলেও, মড়া খুলির হাসির মত বিকট হয়ে ওঠে মুখটা।

—সে তোকে বলব কেনরে ছোঁড়া? আমার এক মাসী আছে। তার কাছ থেকে পাই।

—তোমার মাসী? তাহলে তার বয়স কত?

—তার বয়স? তা ধর এখন হবে ছ কুড়ি পাঁচ।

—ছ কুড়ি পাঁচ। মানে একশ পঁচিশ। একশ পঁচিশেও বেঁচে আছে? তাই আবার হয় নাকি? আর হলে তো আমরা জানতাম। সাড়া পড়ে যেত তাকে দেখার।

—বিশ্বাস হল নি তোর। তাহলে তোর মাকে জিজ্ঞেস কর। ও বৌ তোর বেটাকে বলে দে তো আমার মাসীর কথা। আমি মায়ের দিকে তাকাই।

—হ্যাঁগো মা, সত্যি?

মা ধমকে দেয়।

—তোর ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারটা কি শুনি? শুনলি তো আছে, ব্যস হয়ে গেল।

—আছে যদি তো কোথায় আছে? আমরা দেখতে পাই না কেন?

নন্দী পিসির কোটরে ঢোকা চোখ দুটা এবার আমার দিকে।

—দেখতে না পেলেই বুঝি নেই? ভগবানকে তো চোখে দেখতে পায় না কেউ। তাহলে কি ভগবান নেই?

— ভগবানের কথা আলাদা। তুমি তো বলছ জ্যান্ত মাসীর কথা। তাহলে দেখাও একদিন।

আবার ধমকানি মায়ের গলায়।

—নন্তু, দাঁত মাজা হয়ে গেছে। পড়তে বোস তো।

আমি ঘাট থেকে উঠে আসি। মাথার মধ্যে কিন্তু পেরেক সাঁটা হয়ে যায় একশ পঁচিশ বছরের মাসীর রহস্যটা। যখন পড়ছি, স্কুলে যাচ্ছি, স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলছি, সাইকেলে চেপে দোকানে যাচ্ছি, সব সময়েই মনের মধ্যে ঐ ধাঁধাটার ঘুরঘুরোনি।

দিন পাঁচেক পরে হঠাৎ একদিন ফাঁকা রাস্তায় একা পেয়ে যাই নন্দী পিসিকে।

তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে টিপ করে এক প্রণাম।

—ভালো থাকো বাবা।

তখনই ছুঁড়ে দিই মোক্ষম প্রশ্নটা।

—আচ্ছা পিসি, মাসীর মারফৎ তুমি যদি রাজ্যের খবর পেয়ে যাও, তাহলে আমাদের

স্কুলের খবর পাবে না কেন?

—তোদের ইস্কুলের খবর? কি খবর?

—এই ধরো, আর দশদিন পরে হাফ ইয়ার্লির রেজাল্ট বেরবে। বেরবার আগে জানাতে পার না, কে ফার্স্ট, কে সেকেণ্ড, কে থার্ড এইসব খবর?

—আঃ, এই সব খবর? আচ্ছা মাসীকে জিজ্ঞেস করবোখন। জিজ্ঞেস করে তোকে জানিয়ে দুবো।

মনে মনে জানি, মাসী তো মাসী, মাসীর ঠাকুর্দার ও সাধ্য নেই পরীক্ষার খবর আগে জেনে ফেলার।

তিন দিন পরে পায়ের তলায় মাটিতে ভূমিকম্পের কাঁপুনি।

পুকুরে খেলার মাঠের কাদা পা কাদা হাত ধুয়ে বাড়িতে ঢুকেছি কি ঢুকিনি, মায়ের গলায় স্কুলের ইংরেজি স্যারের গর্জন।

—হ্যারে হতভাগা, ট্যাং ট্যাং করেখেলে বেড়াচ্ছিস দিনরাত। এদিকে হাফ ইয়ার্লিতে যে পটল তুলে বসে আছিস, খেয়াল আছে সেদিকে?

—হাফ ইয়ার্লি? এখনো তো রেজাল্ট বেরোয়নি। বেরোলে দেখো, ফার্স্ট যদি হতে নাও পারি, সেকেণ্ড তো হবোই।

—আব তোমাকে সেকেণ্ড হতে হবে না। অঙ্কে ডিগবাজী খেয়ে সেকেণ্ড হবে?

—অঙ্কে জিগবাজী খেয়েছি? কে বললে তোমাকে?

—কে বলবে আবার! যাকে জানতে চেয়েছিলি। এই তো খানিক আগে নন্দীপিসি এসেছিল তোর খোঁজে। তোকে না পেয়ে আমাকে বলে গেল সব।

—কি বলে চলে গেল?

—কে ফার্স্ট, কে সেকেণ্ড এই সব।

—কে ফার্স্ট?

—সন্তোষ জানা।

—আর সেকেণ্ড?

—মহিম সাঁতরা।

—থার্ড?

—দেবাশিষ পুরকায়স্থ।

—আমি?

—অঙ্কে কচুপোড়া।

—বাজে কথা।

ভিতরে ভিতরে ফুটো বেলুনের মত চুপসে গিয়েও মায়ের কাছে বুকের ছাতি ফুলিয়ে বলি।

—নন্দী পিসির ওসব আর্জগুবি গল্পে তোমাদের মত আমি কান দিই না। সত্যিকাবের

রেজাল্ট বেরোক তখন দেখে নিও।

সংস্কৃত-স্যারের মত মায়ের টিপ্পনি।

—থাক। তোমার বিদ্যের দৌড় আরদেখাতে হবে না আমাদের। না পড়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্ট বেরোয় যথাসময়ে। আর সেটা শুনতে শুনতে আমার চোখ দুটো অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের রাজভোগের সাইজ। সত্যি সত্যি ফার্স্ট হয়েছে সন্তোষ, সেকেণ্ড মহিম, থার্ড দেবাশিস। আর আমি অঙ্কে ফেল।

চোখের জলে নাক মুখ বুক ভিজিয়ে বাড়ি ফিরি। রাত্রে ঘুমোতে পারি না। ফেল করার দুঃখে নয়। নন্দী পিসির মাসী কি করে জেনে গেল এমন দুঃসাধ্য খবর সেটাই হাত-লাট্টুর মত ঘুরে চলেছে মগজে।

দিন দশেক পরের কথা। অঝোরে বৃষ্টি নামল বিকেলবেলায়। খেলার মাঠ থেকে ফিরছি। একটা জায়গায় রাস্তায় বাঁধ কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বানের জলকে মাঠ থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দিতে। আমি লাফিয়ে নালাটা পার হযেই চমকে উঠি। নন্দী পিসি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে।

—কি পিসি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

—কে তুই বাবা?

—সে কি গো, চিনতে পাবলেনি আমাকে। বাড়িতে পবীক্ষাব রেজাল্ট জানিয়ে দিযে বকুনি খাওযালে আমাকে।

—অঃ নন্তু এই বৃষ্টিতে কি দেখা যায় কিছু! আমার নজব কি তোদের মত বাবা। দে বাবা, আমাকে নালাটা পার করিযে।

—সে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে একটা কথা।

—কি কথা, বল।

—পরীক্ষার বেজাল্ট কি কবে জানলে তুমি?

—আরে বাবা, সে কি আমি জেনেছি নাকি? মাসীকে গিয়ে বললুম। মাসী জেনে আমাকে বলল, আমি তোকে না পেয়ে তোর বাড়িতে জানিযে দিয়ে এলুম।

—মাসীই বা জানলে কি করে?

—ও মা, কি বলিস তুই? মাসি জানতে পারবে না এমন কিছু আছে নাকি ভূভারতে?

—একশ পঁচিশ বছরের বুড়ি। তার তো নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। ভূভারতেব কথা জানবে কি করে শুনি?

—তোর সন্দেহ হচ্ছে বুঝি!

—হচ্ছেই তো।

—বেশ, তাহলে বৃষ্টি বাদলা থামুক। তোকে একদিন নিয়ে যাবো মাসীর কাছে। আমি কোল-পাঁজা কবে নন্দী পিসিকে পৌঁছে দিই নালার ওপারে।

ভূতের মাসী, ভূতের পিসি

ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন। এসে গেল দুর্গাপুজো। নেচে কুঁদে দিনগুলো কেটে গেল যেন রং মশালের আলো। সামনে কালী পুজো। একদিন বাজি তৈরির মশলা কিনে ফিরছি বাজার থেকে। সামনে নন্দী পিসি। সাইকেল থেকে নেমে পড়ি।

—কি গো মাসী, মনে আছে তো।

—মনে থাকবেনি কেন? কাল সন্ধেবেলায় কামারশালায় টিপির তলায় এসে দাঁড়াবি, তোকে নিয়ে যাব মাসীর কাছে। আনন্দে আমার পিঠে যেন প্রজাপতির ডানা।

পরের দিন ঠিক সময়ে কামারশালার টিপির তলায়। সন্ধে হয়ে গেছে। জায়গাটা নির্জন। শুধু টিপির পিছনের কামারশালা থেকে লোহা পেটানোর দুম্‌দাম শব্দ। আর মাথার উপরে ঘরে ফেরা পাখিদের ডানার ঝটপটানি।

খানিক পরেই এসে গেল নন্দী পিসি।

—চল্।

নন্দী পিসি সামনে। আমি পিছনে। মল্লিকদের পুকুর পেরিয়ে, অধিকারী পাড়াব পর প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়ের রাস্তাটা যেন গুহার মত। সেই গুহার ভিতর দিয়ে জানাপাড়াব পান - বরোজকে ডাইনে রেখে নন্দী পিসি বাঁদিকে বাঁকতেই আমি বলে উঠি—

—ও পিসি, কোথায় যাচ্ছ? ওদিকে তো শুধু বন-জঙ্গল।

—ভয় কবছে নাকি তোর? এই তো এসে গেছি। আর একটুখানি।

আমি ভেবেছিলাম কোনো বাড়িতে যাচ্ছি। বাড়িতে গিয়ে দেখবো চৌকিতে শুয়ে থাকা হাড়সাব এক বৃদ্ধাকে। কিন্তু এ কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে নন্দী পিসি? তখুনিই গাযেব লোম জুতোর বরুসের মত খাড়া। বুকেব মধ্যে টিপটিপোনির শুরু। আমি বাঁ হাতে জাপটে ধরি নন্দী পিসির আঁচল। অন্ধকার পেরিয়ে পেরিয়ে নন্দী পিসি এসে থামল জঙ্গলের ধারেব একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের তলায়। ছেলেবেলায় দু-একবার এদিকের ঝোপ-ঝাড়ে কুল পাড়তে এসেছি বলেই আন্দাজ করে নিতে পাবি, ওটা তেঁতুল গাছ। চারপাশে এমন ঘুবঘুট্টি অন্ধকার যে কোনো গাছকেই আলাদা করে চেনাব উপায় নেই। আকাশ মাটি গাছপালা সব একাকার হয়ে গিয়ে যেন একটা অন্ধকারের পাহাড় খাড়া কবে তুলেছে চোখেব সামনে। বুঝতে পারি শুকিয়ে আসছে গলা। টের পাই হাত-পায়ের কাঁপুনি। আবো শক্ত করে চেপে ধরি নন্দী পিসির আঁচল। তক্ষক ডেকে চলেছে কোথাও। তাব প্রত্যেকটা ডাকে কেঁপে ওঠে বুকের রক্ত!

এবার নন্দী পিসিব গলা—

—অ মাসী, বাড়ি আছো?

প্রশ্নটা শেষ হতেই তেঁতুল গাছের ভিতরে খড়খড় ঝর ঝর শব্দের একটা মিহি ঝড় বয়ে গেল যেন। অনেক উঁচু থেকে কেউ যেন নেমে এল নীচে। তারপই খিলখিলে গলায়—

—কে? ভবতাবিণী?

—হ্যাঁ গো, মাসী।

—তোর কথাই ভাবতেছিন্। সঙ্গে কে?

—দেখো তো, একে চিনতে পারো কিনা।

—দাঁড়া দেখি।

দিশেহারা ভয়েও আমি উপর দিকে তাকাই এক ঝলক। আর তখনই চোখে পড়ে তেঁতুল গাছের নিরেট অন্ধকারের ভিতরে দুটো টুনি বাল্‌বের মত আলোর বিন্দু। চোখ নামিয়ে বুজিয়ে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে।

—অ মা, এ তো মুখুজ্যেদের বাড়ির ছেলে, খুব দুষ্টু। দুপুরবেলা ভাঁড়ার ঘরের আচার চুরি করে খায়। তালগাছে উঠে শালিক পেড়ে এনে খাঁচায় পোষে। ইস্কুল থেকে বাড়ির ফেরার সময় অধিকারীদের বাগানের আমলকি পাড়ে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। পড়ার বইয়ের আড়াল দিয়ে ডিকেটটিভ বই পড়ে।

—তাহলে চিনতে পারছো। ওর খুব শখ তোমাকে দেখার। তোমার বয়স যে ছ কুড়ি পাঁচ সেটা বিশ্বাস হয় নি ওর।

নন্দী পিসীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য হাসির ঝাপটা। অমন হাসি জীবনে শুনিনি কখনো। ঠিক মনে হল এক সঙ্গে শ খানেক চামচিকের চিমসে হাসির লুটোপুটি। হাসি থামলে—

—ওর কি দোষ বল। ও কি জানে আমাকে। না দেখেছে কখনো। ওর মা জানে। ওর মা যখন নতুন বৌ হয়ে শ্বশুর বাড়িতে এল হপ্তায় হপ্তায় গিয়ে ঝামা দিয়ে পায়ের তলা ঘসে আলতা পরিয়ে দিয়েছি। হাত পায়ের নখ কেটে দিয়েছি। সোহাগী নাপতেনির কত খাতির ছিল ওদের বাড়িতে। ওর মায়ের পেটের বাচ্চা হল প্রথম। তার নাড়ি কেটেছি আমি। আঁতুর ঘর পাহারা দিয়েছি রাত জেগে। তার বদলে পেট পুরে খেয়েছি দুবেলা। শাড়ি পেয়েছি। প্রথম ছেলের পব ওর মা আবার গভ্যোবতী হল যখন, আমারই নাড়ি কাটার কথা। কিন্তু তার আগেই আমাকে খুন করলো মুখুপোড়া সোয়ামীটা। গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দিল কড়িকাঠে। স্বর্গে যাওয়া হল নি আমার অপোঘাতে মিত্যু বলে। তো সেই থেকে এই তেঁতুল গাছেই........

এই পরের কথাগুলো শুনতে পাইনি আর। অজ্ঞান হয়ে গেছি ততক্ষণে।

লোকসান না লাভ

আশাপূর্ণা দেবী

একেই বলে ললাটলিপি।

কবে থেকে ঠিক হয়েছিল এবার পুজোয় গ্যাংটক। পরপর দুবছর সমতলে বেড়াতে যাওয়া হয়েছে, এবারে পাহাড় চাই।

এই চাওয়াটি অবশ্য নীতু আর পিতু দুই ভাইবোনের। ক'বছর আগে একবাব দার্জিলিঙে যাওয়া হয়েছিল তখনই ওরা গ্যাংটক গ্যাংটক করেছিল। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। বাবার ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল।

এবার ওরা নাছোড়।

সমস্ত ঠিক। হোটেল বুক করা, টিকিট কেনা সব প্রস্তুত, হঠাৎ বাবা অফিস থেকে ফিরে বলে উঠলেন, গ্যাংটক যাওয়া হবে না।

নীতুর মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল আর পিতু বসেই পড়ল।

—ও বাপী হবে না মানে?

—হবে না মানে হবে না। ওদিকে এখন দারুণ গোলমাল চলছে।

নীতু— পিতুর মাও প্রায় বসে পড়ে বললেন, অফিসের লোক বলেছে বুঝি? তাই একেবারে বেদবাক্য।

— শুধু অফিসের লোক কেন, দেশসুদ্ধ সবাই বলবে। কাগজ পড়ছ না? দেখছ না কী হচ্ছে ওদিকে।

— কাগজে অমন বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। যাবার জন্যে পা বাড়ানো আর এখন বলে বসলে যাওয়া হবে না। গেলে দেখবে তেমন কিছুই গোলমাল নেই।

নীতু— পিতু অবশ্যই মায়ের সমর্থক।

কিন্তু ভাগ্য ওদের সমর্থক নয়।

পরদিনই ওদের সেই সিট বুক করে রাখা গ্যাংটকের হোটেল থেকে একটি টেলিগ্রাম এসে হাজির ঃ 'খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি— অনিশ্চিতকালের জন্যে আমাদের হোটেল বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছি। অতএব আপনারা...

অর্থাৎ পৌঁছে গেলে যাতে না অসুবিধেয় পড়তে হয় খদ্দেরকে, তাই এই অগাধ বিবেচনা।

নীতুদের বাবা বললেন, বলতেই হবে লোকটা খুব ভদ্র।

নীতু— পিতু আড়ালে এসে বলল, বলতেই হবে লোকটা অতি অভদ্র।

কিন্তু সে তো হল! এখন কিংকর্তব্য?

ছুটি শুরু হতে তো মাত্র আর তিনটি দিন। এর মধ্যে নতুন আর একটা জায়গায় যাওয়ার কথাই ওঠে না। টিকিট কোথায়? গিয়ে ওঠা হবে কোথায়? বলে দেড় দুমাস আগে থেকে এসব ব্যবস্থা করতে হয়। এখন নো হোপ।

বিজয়বাবু, মানে নীতুদের বাবা বললেন, তবে আর কী হবে তোমরা চন্দননগরে গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে এস— আমি যা হোক করে চালিয়ে নেব।

চন্দননগরে নীতুদের মামার বাড়ি।

নীতুদের মা রেগে বললেন, আহা, মা, বাবা, পিসিমা..., আগে থেকে বেনারসে গিয়ে বসে আছেন না। চন্দননগরে কার কাছে যাব?

ওহো তাও তো বটে।

মিনিট খানেক টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা মেরে বিজয়বাবু বলে উঠলেন, তাহলে এক কাজ করা যাক, ছুটিটা গালুডিতে কাটিয়ে আসা হোক।

— গালুডি!

— হ্যাঁ গালুডিই। কেন নয়? ওখানে যেতে ট্রেনের টিকিট, রিজার্ভেশান এত সব চিন্তা করতে হবে না, গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। আর কোথায় গিয়ে ওঠা হবে তারও চিন্তা নেই। নিজেদের বাড়ি রয়েছে। যাওয়া তো হয় না সাতজন্মে। তোরা তো জীবনে দেখিস নি।

হ্যাঁ, নিজেদের বাড়িই!

নীতু— পিতুর পরলোকগত ঠাকুর্দা না কি ওই 'গালুডি' নামের একটা দেহাতি জায়গায় একদা একখানা বিরাট বাড়ি বানিয়ে বসেছিলেন মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাতে যাবেন বলে। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাগ্যে বেশিবার আর হাওয়া বদলাতে যাওয়া হয়নি সেখানে। অনেক

দূরে চলে যেতে হল।

শেষে যখন গিয়েছিলেন সবাই মিলে, পিতু তখন বছর চারেকের আর নীতু এক বছরের। নীতুদের ঠাকুমা বহুকাল আগেই চন্দ্রবিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন।

বিজয়গিন্নী রেগে বললেন, সেই বাড়িতে এখন হঠাৎ গিয়ে থাকা যাবে? সাপ খোপ কী চোর ডাকাতের আড্ডা হয়ে বসে আছে কিনা কে জানে!

বিজয়বাবু বললেন, কেন সাপখোপের আড্ডাই বা হবে কেন? মালি নেই? বাবা তাকে ঘরবাড়ি করে দিয়ে চিরকালের জন্যে পুষে যাননি? আর দরাজ হুকুম দিয়ে যাননি ওই বাগানে সে যত ফল-ফুল ফলাতে পারবে সব নেবে। তাই থেকেই তার খাওয়া-দাওয়া চলবে। মস্ত বাগান তো। চেষ্টা করলে কত কী ফল তরকারি ফলানো যায়।

পিতু হেসে বলল, তা সে সব হয়তো ঠিকই চলছে, তবে বাড়িটা থাকার যোগ্য করে রেখেছে কিনা সন্দেহ।

গ্যাংটকের বদলে গালুডি। ধুস! একদম মার্ডার কেস! সেই নাকের বদলে নরুণের মতো।

মনমেজাজ খারাপ ওদের মায়েরও। প্রতি বছর কোন না কোন ভাল জায়গায় যাওয়া হয়। ভাল ভাল হোটেলে ওঠা হয়, আরাম— আয়েস— বিশ্রাম আর এ কিনা একটা দেহাতি গ্রামে পোড়ো বাড়িতে গিয়ে পড়া। জলের কল বলে কিছু নেই। ইঁদারা থেকে তোলা জলে যা কিছু কাজ!

— আর নিজেকে রান্না-বান্নাও করতে হবে।

পিতু বলল, তা শশীদাকে নিয়ে চল না মা?

—চমৎকার। এখানের বাড়িটি আগলাবে কে অ্যাঁ? আমার কান্না পাচ্ছে!

বেচারী বিজয়বাবুর অবস্থা যেন চোরের মত।

যেন গ্যাংটকে গোলমালটি তিনিই বাধিয়েছিলেন। সেখানকার 'সোনালী উপত্যকা' হোটেলটি তিনিই বন্ধ করে দিয়েছেন। আর এখন বৌ আর ছেলেমেয়েদের দুর্গতি ঘটাবার জন্যেই তাঁর বাবার রেখে যাওয়া একটা পোড়ো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে যাচ্ছেন। সেখানে নাকি সাপখোপ আর ডাকাতের আড্ডা।

একরাশ বেজায় বিরক্তি, আর একগাদা বেডিং সুটকেস ব্যাগ টিফিন কৌটো বেতের টুকরি ওয়াটার বটল ফ্লাস্ক এবং ক্যামেরা টেপ রেকর্ডার আর গাদাগুচ্ছের গানের ক্যাসেট নিয়ে গাড়িতে চেপে বসা হল। কিন্তু সত্যি বলতে—খানিকক্ষণ চলার পর মনটা বেশ ভালই হয়ে গেল দুই ভাইবোনের। বাবার ওপর একটু কৃপা করুণাও এল।

মাঝে মাঝেই বলতে লাগল, বাপী এতক্ষণ গাড়ি চালাতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? বাপী ঠিক রাস্তা চিনে যেতে পারছ তো? ভুলে গিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে না তো?

এই সবের মাঝখানে ক্ষণে ক্ষণেই খাওয়া চলছে। কলা কমলালেবু কেক, ফাইভ স্টার, সল্টেড কাজু, পটেটো চিপস্ আরো কত কী!

বিচ্ছিরি একটা গাঁইয়া জায়গায় যাচ্ছেন বলে ওদের মা 'টুকটাক' সঙ্গে নিয়েছেন বিস্তর। ডালমুটই তো এক বস্তা।

এই সবেতেই মনটা কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাল হয়ে উঠেছিল। তবে এমন একটা ভয়ঙ্কর আহ্লাদের ঘটনা যে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, সেটা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। এক মিনিট আগেও নয়। আবিষ্কারের গৌরব পিতুর।

বাড়ির কাছ বরাবর আসা মাত্রই হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল পিতু, পল্টু কাকা!

পল্টুকাকা! মানে পল্টু।

পল্টু। সে কী? আরে? অ্যাঁ। তুই কোথা থেকে?— বলতে বলতে গাড়ির স্পীড কমিয়ে ফেলে বিজয়বাবু ডাক দেন, আয় আয় উঠে আয়।

পল্টু হেসে হাত নেড়ে বলল, এই তো বাড়ি এসেই গেছি।

সত্যিই এসে গেছে বাড়ি।

বুড়ো মালি ব্যাসদেও ব্যস্ত হয়ে গেট-এর দুটো পাল্লায় দুহাট করে খুলে ধরে পিঠ গোল করে 'সালাম' জানায়।

কিন্তু সেদিকে কে তাকাচ্ছে? এখন আর কেউ নয় শুধু পল্টু।

পল্টুকাকা।

মানে গ্যাংটকে যেতে না পারার দুঃখটা মোচন তো বটেই বরং মনে হল ভাগ্যিস গ্যাংটকে যাওয়া হয়নি। ভাগ্যিস গালুডিতে আসা হয়েছে। তো নইলে পল্টুকাকাকে মিস করা হত!

পল্টুকাকা যে কি নিধি সে তো এরা ভালই জানে।

আর বিজয়বাবু?

প্রায় বছর দু-তিন পরে হঠাৎ এই চিরদিনের স্নেহ আদরের মামাতো ছোটভাইটিকে দেখে আহ্লাদে বিহ্বল। যেন হাতে আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে।

পল্টু সেই যে সেবার বললি 'ম্যাজিক শো' দিতে না কি জাভা না বোর্ণিও কোথায় যাচ্ছিস তারপর একেবারে নো পাত্তা হয়ে গেলি কেন? অ্যাঁ, নিখোঁজ নিরুদ্দেশ হয়ে ছিলি কোথায় এতদিন? চেহারাখানিতো ঠিকই রেখেছিস দেখছি। যেমনটি ছিল তেমনটি। তা এখানে হঠাৎ? মানে এই গাঁইয়া গালুডিতে।—বলে ছেলেমেয়েদের দিকে একবার নজর ফেললেন বিজয়বাবু।

পল্টু বলল, কেন গালুডিটা কি খারাপ জায়গা? আমার তো এই কদিনেই স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠেছে।

ভাল ভাল। তা কোথায় আছিস?

বা! কোথায় আর। তোমাদের এই 'চারুকুটিরেই।' আফটার অল আমার নিজের পিসিরই বাড়ি তো? নিজের পিসের তৈরি! থাকাটা দোষ হয়েছে? হা হা হা।

বিজয়বাবু অপ্রতিভ হয়ে বলেন, ছি ছি! কী যে বলিস, মানে বলছিলাম, এখানে একা, খাওয়া দাওয়ার কী করছিস?

কেন, ব্যাসদেও তো রয়েছে। ও আমায় চেনেনা না কী? আমায় দেখে তো আহ্লাদে কেঁদেই ফেলল। বলে কেউ তো আসে না। আমি বুড়োবাবুর এই বাড়ি বাগিচা আগলে পড়ে আছি। ওঃ কী যত্ন যে করছে। আর যা ফার্স্টক্লাস রান্না। হা হা হা! মুখ ছেড়ে যায়।

—তো এতদিন ছিলি কোথায়?

—কোথায় নয়?

—মানে খুব ঘুরেছিস?

—হুঁ!

—এখানে ম্যাজিক দেখাস?

—বা। ওটাই তো আমার পেশা। পেশা আর নেশা এও হচ্ছে স্বভাবের মত। মরলেও ছাড়ে না।

মায়ের তাড়নায় এতক্ষণে পিতু আর নীতু হাত মুখ ধোয়া সেরে ছুটে চলে এসেছে। এখন দুজনে পল্টুকাকার দুদিকে।

—ও বাপী তুমি আর কতক্ষণ পল্টুকাকাকে নিয়ে আটকে রাখবে। ও পল্টুকাকা সব গপ্‌পো তোমার প্রাণের বিজুদার সঙ্গে করে ফেলেছো? ইসঃ, আমরা বলে তোমার জন্যে—ইঃ। তোমায় দেখে না আমাদের— জান পল্টুকাকা, আমাদের গ্যাংটকে যাওয়ার কথা ছিল...

পল্টু চমকে বলল, কেন গ্যাংটকে কেন?

—বাঃ। কেন আবার এমনি তো সেখানে যাওয়া হল না।

—ভালই হয়েছে।

—তা সত্যি। ভাগ্যিস যাওয়া হয়নি—

দুই ভাইবোনে একযোগে কথা বলে চলেছে, তাই না বাপীর বাবার এই গালুডিতে আসা হল। আর তোমাকে পেয়ে যাওয়া হল। ও পল্টুকাকা কী মজা! নাচতে ইচ্ছে করছে আমাদের।

—ও পল্টুকাকা। তার্স আছে তোমার সঙ্গে? ম্যাজিক দেখাবে তো? ইস। আমরা যে তাসগুলো কেন আনলাম না!... ও বাপী তোমার এই গালুডিতে তাস পাওয়া যায় না? যদি না পাওয়া যায়? যদি পল্টু কাকার কাছে না থাকে—

পল্টু বলে ওঠে, আরে বাবা, আগে থেকেই হতাশ হচ্ছিস কেন? আছে আছে। ভানুমতীর খেলের অনেক কিছুই আছে সঙ্গে। ভেবেছিলাম আর ম্যাজিক ফ্যাজিক নয়। কিন্তু আমি ছাড়তে চাইলেও ম্যাজিক আমায় ছাড়তে চায় না।

—বাঃ। ছাড়তে চাইছিলে কেন?

পল্টু একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'সে অনেক কথা। গিয়েছিলাম জাভায়।' সেখানে ম্যাজিক দেখে একটা দল হঠাৎ আমায় যাদুকর ভেবে—

—ওমা! ম্যাজিক দেখানোওয়ালারা তো যাদুকরই। পি সি সরকার, জুনিয়র পি সি সরকার এঁরা সব 'যাদুসম্রাট' 'যাদুরাজা' এই সব নয়?

—আরে সে তো আমরা জানি। ওরা ভাবে জাদুকর মানে ডাইনী।

—হি হি! পুরুষ মানুষ আবার ডাইনী হয়?

পল্টু গম্ভীরভাবে বলে, 'বোকাদের কাছে এমন কত হয়। সে যাকগে,' তোরা খাওয়া দাওয়া করবি না? সেই কখন ভোরবেলা বেরিয়েছিস।

পিতুর মা হেসে গড়িয়ে পড়েন, আহা, পল্টু ঠাকুরপো, ওরা যেন সারা রাস্তা নির্জলা উপোসে এসেছে। সারাক্ষণ মুখ চলেছে—

সঙ্গে সঙ্গে নীতু হৈ চৈ করে ওঠে, 'ও পল্টুকাকা সল্টেড কাজু খাবে? মুখরোচক মুড়মুড় ভাজা'?... পটেটো চিপস? মা, বেতের সেই টুকরিটা?

পল্টু বলল, হবে হবে। এখন দেখ গিয়ে— ব্যাসদেও তোদের জন্য কী ব্যবস্থা করে উঠতে পেরেছে।

নীতুদের মা কতই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, বাড়িটা সাপখোপের আড্ডা হয়ে আছে, হয়তো গিয়ে নিজেকে রান্নাবান্না করতে হবে, বেড়ানোর বারোটা বেজে যাবে, মনের কষ্ট আরো কত কী!

কিন্তু দেখে লজ্জাতেই পড়ে গেলেন।

এতবড় বাড়ি, অথচ বাগান সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট। কোথাও নেই একটু ধুলোবালি। তবে বাগানের মাঝখানের সেই আস্ত মানুষের মাপে কংক্রিটের তৈরি সেই পরী পুতুলটার যদি এতদিনের রোদে-জলে নাক খেঁদিয়ে যায়, আর সর্বাগ্রে ফাটল ধরে, তাহলে ব্যাসদেও কী করবে? আর গেটের লোহার রেলিংগুলো মরচে পড়ে খসে খসে পড়তে চাইলেই বা বেচারী বুড়োমানুষ কী করবে? বাড়ির আসবাবপত্রও জীর্ণ হয়ে গেলে উপায় কী? তবুতো সব ঝেড়ে মুছে রেখেছে।

আর রান্না!

এরা আসামাত্রই কি করে যে সব বানিয়ে ফেলল।

ভোরবেলা বেরিয়ে বেলা একটা নাগাদ এখানে পৌঁছনো গেছে, আর বেলা দুটোর মধ্যে সব রেডি। টেবিলে খাবার সাজানো।

এরা তো হাঁ।

—ও ব্যাসদেও—! তুমি তো জানতে না আমরা আসব। কি করে এতসব করলে?

ব্যাসদেও চিরকালই অল্পভাষী। এখন আরো বেশি। কাজেই তার উত্তর শুধু দাড়ির খাঁজে একটু হাসির মত।

নীতুদের বাবার এখন আর 'চোর' ভাব নেই। বরং রাজার ভাব। যেন, কী? এখানে আনাটা খুব খারাপ হয়েছে।

—একী! শুধু আমাদের থালা? পল্টু তুই খাবি না?

—আরে আমায় তো ব্যাসদেও সেই বারোটার আগে খাইয়ে দিয়েছে।

—আচ্ছা পল্টু তোরা কি করে জানলি আমরা আসছি।

—মনে মনে!

—তাজ্জব। আসা মাত্রই চা! গোসলখানার চৌবাচ্চা ভর্তি জল। আর এই সব রান্না। নীতু দেখেছিস? গোবিন্দভোগ চালের ভাত, ভাজা মুগের ডাল, আলুভাজা, কপি কড়াইশুঁটির তরকারি, মুরগি, টমেটোর চাটনি। ভাবা যায় না। বল? পল্টু, বাজার করল কে? আর কখনই বা? এখানে তো মাত্র হাটবার-এর ওপরই নির্ভর।

—সব বাগানের?

—জী হাঁ।

—আর মুরগি? সেও গাছে ফলে? হা-হা-হা!

—ও-ওতো পোষা আছে।

বিজয়বাবু বললেন, 'পল্টু দেখছিস। বাবা কত বুদ্ধির কাজ করে রেখে গেছেন। আর আমার পুত্রকন্যা বাড়ি দেখে বলছিল কিনা এইরকম একটা অজ জায়গায় এতবড় একখানা বাড়ি বানানোর কোনো মানে হয় না। দাদুর বাপু বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন ছিল না।'

পল্টু তার স্বভাবগতভাবে হেসে ওঠে।—বলেছে বুঝি? হা-হা-হা! ওদের বুদ্ধি হো হো হো!

অনেকদিন পড়ে থাকা বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে যেন সেই হাসিটা ধাক্কা মেরে মেরে আরো অনেকক্ষণ আওয়াজ তুলতে থাকে।

নীতু আর পিতুর গা ছমছম করে উঠে!

মায়ের দিকে তাকায়। দেখে মা-ও কেমন ভয় ভয় চোখে দেওয়ালগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন।

খেয়ে উঠে তো অনেকক্ষণ গল্প, বাগানে গিয়ে ফটো তোলা, পল্টু কাকাকে ক্যাসেট শোনানো হল। আর তার ফাঁকে ফাঁকে জোর আবদার—'ও পল্টুকাকা, কখন তাস বের করবে, কখন ম্যাজিক দেখাবে?

—হবে হবে। একেবারে বিকেলের চা খেয়ে দোতলায় ওঠা হবে। অতঃপর পিসেমশাইয়ের বড় ঘরটায় বসে—সব ঘরে তো তালাচাবি লাগানো। শুধু ওই ঘরটা আমি খুলিয়ে নিয়েছি।

—বাপী কটা ফিল্ম এনেছ?

—চারটে।

—বেশ বেশ। পল্টুকাকা কাল ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়ে ছবি তোলা হবে কী বল?

—আরে আজ তো তুললি কতগুলো?

—ওতো বাড়ির লোকের। কাল প্রাকৃতিক দৃশ্যের তোলা হবে। ব্যাসদেও তুমি কিন্তু আজ ফাঁকি দিয়েছ। গ্রুপ ফটো তোলার সময় 'কাজ আছে' বলে পালিয়েছ। কাল সকালে তোমার লম্বা দাড়ির একটি ফটো তোলা হবে। হি হি হি!

বিকেলে চা খেতে খেতে নীতুদের মা বললেন, 'একটা আশ্চর্য! এত বছর কেবল মাত্র নিজেব ডাল-রুটি পাকিয়ে চালিয়ে এসেও ব্যাসদেওয়ের রান্নার হাত কী চোস্ত রয়েছে।'

বিজয়বাবু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। বললেন, 'বাবা ওকে নিজে তালিম দিয়ে ভাল ভাল রান্না শিখিয়েছিলেন।'

'রাত্রে কী খাওয়াবে ব্যাসদেও।'—বলল নীতু ।

—যা আপনাদের মর্জি।

পিতু হি হি করে হেসে উঠে বলে 'যা আমাদের মর্জি—যদি বলি বিগ বিগ চিংড়ির মালাইকারি, মটন রোল, আর মোগলাই পরোটা?

ব্যাসদেও দাড়ির ফাঁকে একটু হাসি দেখায়, 'হোবে। সব হোবে।'

হো হো হাসির রোল উঠল অর্থাৎ ব্যাসদেও-ও ঠাট্টা তামাসা করতে জানে।

কিন্তু শুধুই হাসি গল্প চালালে চলবে কেন?

—ও পল্টুকাকা, তাস বের কর!

—বলছিস?

—বলছিই তো। আর দেরি করলে কিন্তু আমরা গিয়ে তোমার বাক্স হাতড়ে বের করে আনব। পল্টু বলে ওঠে, 'আনবি কী এনেই তো ফেলেছিস।'

—অ্যাঁ। কই? কোথায়?

হঠাৎ দেখা গেল ঝড়ের সময় শুকনো পাতা ছিটকে আসার মত জানলা দিয়ে বাইরে থেকে সাহেব বিবি গোলামরা ছটাছট ছিটকে চলে আসছে ঘরের মধ্যে।

দারুণ! তার মানে শুরু হয়ে গেছে পল্টুকাকার ম্যাজিক।

এটি যে পল্টুর 'নতুন অবদান' তাতে সন্দেহ নেই। এরকমটি আগে কখনো দেখেনি এরা।

কিন্তু কী মুশকিল! এ যে এসেই চলেছে। ঘরের মেঝে খাট বিছানা টেবিল চেয়ার আলমারির মাথা সব বোঝাই হয়ে গেল তাসে।

ওরেব্বাস।—বিজয়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ও পল্টু এবার থামা। একী খেলা শিখে এসেছিস বাবা জাভা থেকে না কোথা থেকে? কশো জোড়া তাস এনেছিস বাবা?'

নীতুদের মাও কোলের ওপর থেকে সাহেব বিবি টেক্কা দশদের ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, সত্যিই বাবা। ও পল্টু ঠাকুরপো এগুলো তাস না আমাদের চোখের ভ্রম? স্রেফ ইন্দ্রজাল?'

নীতু আর পিতু কোন কথাই বলতে পারছে না। দুজনে দুজনের সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে।

তারা সেই চিরাচরিত খেলাই দেখতে চেয়েছিল। যেমন ম্যাজিক দেখানেওয়ালার হাতের ছড়ানো তাস থেকে মনে ভাবা একটি তাস, দশ হাত দূর থেকে এল তার নিজের পকেটে। কিম্বা প্যাকেটের বাহান্নখানা তাসই হয়ে গেল নীতুর ভাবা তাসটি। অর্থাৎ সবগুলোই চিড়িতনের টেক্কা বা ইস্কাবনের বিবি।

অথবা নীতু নিজে সাফাই করে কোনো একটি তাস বেছে নিজের হাতের মধ্যে রেখে প্যাকেট ফেরত দিয়ে, দেখল সেই তাস পল্টুকাকার সেই প্যাকেটের মধ্যে।

আর নীতুর কাছে রাখা তাসটা? সেটা একটা তাসই নয়। একখানা তাসের মাপের সাদা কার্ড।

এই সমস্তই দেখেছে নীতুরা আগে। তাতেই মোহিত হয়েছে, হৈ চৈ করেছে, চোখ গোল করেছে। এটা আবার কেমন বাবা।

আজ তো ওরা দুই ভাইবোন পরামর্শ করে রেখেছিল ভীষণভাবে চোখ ঠিকরে লক্ষ্য করে হাত সাফাই দেখবে পল্টুকাকার। এ খেলা সেদিক দিয়েই গেল না। গেল না মানে কী? যাচ্ছে না। ঘরের শিলিং থেকে বালি চাপড়া খসে পড়ার মতো এখন তাস ঝরছে।

পিতু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কেবল তাস জমে জমে পাহাড় হচ্ছে, ম্যাজিক দেখব কখন?'

'কী মুশকিল, এটা ম্যাজিক নয়।' হো হো করে হেসে উঠল পল্টু।

আবার সেই পুরনো বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে হাসির প্রতিধ্বনি।

এখন বেলা পড়ে গিয়ে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

পল্টু বলল, 'তো দেখ বাবা বাহান্নখানার খেলাই দেখ।' বলে হুশ করে একবার কাক তাড়ানোর মত হাত নাড়ল পল্টু। আর সেই তাসের পাহাড় এক পলকে গুছিয়ে একটি

ছিমছাম প্যাকেট হয়ে পল্টুর বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে। ঘরে আর কোথাও নেই একখানিও তাসের চিহ্ন।

এখন হাততালির ধুম।

বিজয়বাবু বললেন, 'নাঃ অনেক নতুন খেল্ শিখে ফেলেছিস দেখছি এই দুতিন বছরে। এসব খেলা কোথা থেকে শেখা রে পল্টু?'

পল্টু হেসে ওঠে, কেন? তুমি সেখানে গিয়ে শিখে নেবে? অমন কাজটি করোনা।

নীতুর মা হেসে ওঠেন, হ্যাঁ তোমার দাদাটি নইলে আর কে তাসের ম্যাজিক শিখবে। কোনটা কী তাস তাই জানে কিনা সন্দেহ।

এই সময় হঠাৎ কে যেন ঘরে একটা পেট্রোম্যাক্স বসিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু কে ও? ও তো ব্যাসদেও নয়। দাড়ি কই ওর?

বিজয়বাবু একটু চমকালেন, কে লোকটা?

পল্টু বলল, 'আরে ব্যাসদেওয়ের একটা ভাইপো আছে কাছাকাছি। কাকার সাহায্য করতে আসে। কাল ও আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল। আসলে বুড়ো এই আলোটা জ্বালাতে জানে না।

হেসে ওঠে পিতু—এত ভাল ভাল রান্না করতে পারে আর একটা হ্যাজাক জ্বালতে পারে না?

—সবাই কি সব পারে?

পল্টু আবার হেসে ওঠে, আর বলে এই যে বিজুদা এত মটরগাড়ি চালাতে পারে, আমি একটা গরুর গাড়িও চালাতে পারিনা।

এই রকমই কথাবার্তা পল্টুর। না হাসিয়ে ছাড়ে না। বিয়েটিয়ে করেনি, কেবল বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায় আর ম্যাজিক শেখে এবং দেখায়।

ম্যাজিকের একটা দলও আছে তার।

তবে সে সব তো জগঝম্প আসবাব পত্র নিয়ে। এমন ঘরোয়া আসরে চলে না। তাসই বেস্ট। সর্বত্র চলে।

সেই তাসের পাহাড়কে বাহান্নখানায় দাঁড় করিয়ে পল্টু এবার তার সেই পুরনো খেলা দেখাল কিছু কিছু। যাতে সকলের আনন্দ। তবে সঙ্গে নতুন কিছুও জুড়ল, রীতিমত রোমাঞ্চকর।

যেমন নীতুর পকেটে রাখা হরতনের নহলাকে একশো টাকার নোট করে দেওয়া।

আবার তাসকে দোকানের ক্যাশমেমো, লণ্ড্রির বিল, ওষুধের পেসক্রিপসান, বাসের টিকিট ছেঁড়া, শালপাতা বানানো এই রকম সব অনেক খেলা!

নিথর পাথর হয়ে বসে দেখতে দেখতে কখন যে রাত দশটা বেজে গেছে কেউ টের পায়নি। সিঁড়ির সামনে একটা গলা খাঁকারির। দরজার কাছে সাদা দাড়ির আভাস।

বিজয়বাবু বলে উঠলেন, 'ছি ছি কত রাত হয়ে গেল। চল চল খেয়ে নেওয়া যাক। বেচারা বুড়োমানুষ এতক্ষণ বসে আছে।'

কিন্তু খাবার টেবিলে বসে গা ছমছমানি!

টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছে ব্যাসদেও।

ফুটখানেক করে লম্বা সাইজের গলদা চিংড়ি কারি, মটনরোল, মোগলাই পরোটা।

নীতু বলল, 'আমার খেতে ভয় করছে।'

পিতু বলল, 'লোকটা ভূত না ভগবান?'

ওদের মা বললেন, 'ওকেও কি ম্যাজিক শিখিয়ে ফেলেছ পল্টু ঠাকুরপো? তাসের মত কারবার। ডালরুটিকে এইসব দেখছি। যেমন বাহান্নখানা তাস বারোশো হয়ে যাওয়া।'

শুধু বিজয়বাবুই তারিফ করে খেতে লাগলেন। এবং রাত্রে তিনি আর পল্টু একটা ঘরে এবং বাকিরা আর একটা ঘরে শুয়ে পড়ল।

কথা হল পরদিন ভোরে সবাই মিলে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরুনো হবে।

বারান্দার ওধারে হাতমুখ ধোবার জন্যে দু বালতি ভর্তি জল।

মা বললেন, 'লোকটা মহাদানব না কী রে বাবা?'

—ওমা, এ সেই সিনেমার 'গল্প হলেও সত্যি'র কাজ করার লোকের মত।

—যা বলেছিস।

—ব্যাসদেও। আমাদের কিন্তু পাঁচটার সময় চা চাই।

—জী হাঁ। সেলাম ঠুকে চলে গেল ব্যাসদেও।

আর বলব কী পাঁচটার আগে উঠে পড়েও নীতুরা দেখল দোতলায় বারান্দায় বেতের টেবিলের ওপর টিকোজি ঢাকা দিয়ে চা আর কাপ ডিশ চিনি-টিনি ইত্যাদি সাজানো।

বিজয়বাবু বললেন, 'হোটেল বলে আক্ষেপ করছিলে, কটা ভাল হোটেলে তুমি এমন সার্ভিস পাবে? কোন একটা জিনিস চাইলে তো ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। যাক চটপট রেডি হও।'

—কিন্তু পল্টুকাকা?

—বাপী পল্টুকাকা কই?

বিজয়বাবু বললেন, 'সে তো বাপু কখন উঠে পড়েছে জানি না। ঘুম ভেঙে তো দেখছি না।'

—বাঃ চা খাবেন না? দেখ কোথায়?

—সে হয়তো ব্যাসদেওর সঙ্গে চা খেতে লেগে গেছে। পল্টু দাদাবাবুর ওপর ভারি ভক্তি ব্যাসদেওর।

বিজয়বাবু সিঁড়ির ধারে এসে গলা তুলে হাঁক পাড়লেন, 'পল্টু! পল্টু! ব্যাসদেও। ব্যাসদেও।'

তারপর সিড়ি দিয়ে নেমে এলেন। কোথায় বা পল্টু কোথায় বা ব্যাসদেও। রান্নাঘরের দরজায় শুধু শেকল তোলাই নয়, তাতে একটা মরচে-পড়া তালাও লাগানো। এই ভোর সকালে দুটোতে গেল কোথায়!

—আর কোথায়! এতজনের 'ভোজ'-এর রসদ জোগাড় করতে।

—এত ভোরে এখানে বাজার বসে?

—আরে না না, এসব বলে দেহাতি জায়গায় চাষীদের বাড়ি থেকে জিনিস নিয়ে আসা যায়। সব্জি, ফল, ডিম, দুধ. মাখন। দেখেছি আগে।

পিতু হি হি করে হেসে বলে ওঠে, ' আর চুপি চুপি এনে রেখে বলা যায়, বাগানে ফলেছে।'

—কিন্তু কই রে বাবা আসছে কই?

—নাঃ বেড়ানোটা মাটি করলো দুটোয়।

—নাঃ মার্ডার কেস। রোদ উঠে গেল! দেখা নেই ওদের।

এদের সাজা গোজা রেডি। গাড়িতে ক্যামেরা তোলা হয়ে গেছে। কিছু খাবার দাবারও।

—ও বাপী, কী হবে? জমিতে চাষ টাষ করিয়ে সব্জি টব্জি আনছে না কি তোমার ব্যাসদেও?

বাপী বললেন, 'সত্যি এত দেরি করছে কেন? যাক এক কাজ করা যাক গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া হোক। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে যেতে হবে। নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে।'

তবে তাই! ছটফটানিটা তো কাটুক! কোথাও বেরবার সময় যদি কারো জন্য অপেক্ষা করতে হয় তার থেকে যন্ত্রণা আর নেই।

বেরনো হলো। এবং চারজনের চার দুগুণে আটটা চোখ রাস্তার আশপাশ সামনে পেছনে তদন্ত করতে করতে চলল। কিন্তু কোথায় কী? নো পাত্তা দু দুটো মানুষ যুক্তি করে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। অন্য কোন রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেনি তো? দূর আবার রাস্তা কোথায়? আচ্ছা বাগানে ছিল না তো? দূর! অত চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করা হলো।

এইসব বলাবলির মধ্যে হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেল। বিজয়বাবুর গাড়িকে 'ভুলভুলাইয়া' পেয়ে বসল। যেদিকে দিয়েই এগোতে যান ঘুরে ফিরে সেই একই রাস্তা।

—কী হল বাপী?

বুঝতে পারছি না তো। বিজয়বাবু বললেন, 'গাড়িটার ওপর কন্ট্রোল রাখতে পারছি না। মনে হচ্ছে —যেন নিজের ইচ্ছেয় চলছে।'

—বাপী কোনো কিছু না ভেবে কোনো একদিকে সোজা বেরিয়ে যাও।

—তাতে কী হবে?

—এই গোলকধাঁধাটা থেকে বেরিয়ে পড়া যাবে।

—কিন্তু তারপর? রাস্তাটা চেনাবে কে?

—চেনাবে রাস্তার লোক। জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।

—কিন্তু জিজ্ঞেস করার মতো লোকই বা কোথায়? এমনিতেই তো ফাঁকা মেঠো রাস্তা। যাও বা দু একজন যাচ্ছে, তারা নেহাৎই বোবা মত।

দেখতে দেখতে অনেক দূর আসা হয়ে গেল। কী ভাগ্যি হঠাৎ একটি ভব্যি যুক্ত লোককে দেখতে পাওয়া গেল। মধ্য বয়সি। বোধহয় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এই অক্টোবরেও গলায় কম্ফর্টার মাথায় টুপি। গায়ে ধুতির ওপর লম্বাকোট। বিজয়বাবুর প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে পড়লেন।

—গালুডি এখান থেকে কতদূর? গালুডিতেই তো রয়েছেন মশাই।

বিজয়বাবু নিজে মনে মনে অবাক হন। এতখানি গাড়ি চালিয়ে এসেও—চটপট সামলে নিয়ে বলেন, না মানে গালুডির চারুকুটিরের রাস্তাটা—

—চারুকুটির! ভদ্রলোক আরও অবাক হয়ে বলেন, চারুকুটির কোন চারুকুটির?

বিজয়বাবু বিরক্ত হয়ে বলে, চারুকুটির এখানে কটা আছে মশাই আমার জানা নেই। আমি খাসনবীশদের চারুকুটিরের কথা বলছি। স্বর্গীয় অজয় খাসনবীশের বাড়ি।

—মাই গড্! অজয় খাসনবীশের চারুকুটির। সেইখানে আপনারা উঠতে যাচ্ছেন?

নীতু আর পারে না। টনটনে গলায় বলে ওঠে, 'উঠতে যাব কেন? সেই খানেই তো আছি। শুধু সকালে বেড়াতে বেরিয়ে একটু রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি...

—সেই খানে আছো? মানে চারুকুটিরে? মানে খাসনবীশের চারুকুটিরে?

নীতু গলা আরো টনটনে করে বলে, ' তা এত অবাক হচ্ছেন কেন? থাকব না কেন বাড়িটা তো আমাদের নিজেদেরই। ওই অজয় খাসনবীশ তো আমার দাদু ছিলেন।'

ভদ্রলোক মুখটা পাথুরে করে বলেন, কতদিন পরে এসেছ এখানে?'

—অনেকদিন পরে।

—হ্যাঁ সে তো বুঝতেই পারছি। তো কবে এসেছ? ওই বাড়িতেই ছিলে নাকি?

—ছিলামই তো।

ভদ্রলোক যেন একদল পাগলকে দেখছেন, এইভাবে এদের দলের দিকে তাকিয়ে বলেন, ছিলে, কোথায় শুয়েছিলে?

—কেন, দোতলার ঘরে। কত ঘর। খাটবিছানা সবই আছে।

—বটে। তো খাওয়া দাওয়া কোথায় করেছিলে?

বিজয়বাবু, বিজযগিন্নী এবং পিতু তিনজনেই বুঝে ফেলেছেন লোকটা সুবিধের নয়। নীতুর সঙ্গে চালাকি খেলছে। পিতু অলক্ষ্যে নীতুকে একটা চিমটি কাটল। কিন্তু নীতু এখন মরীয়া। রাগের গলায় বলল, কোথায় আবাব বাড়িতেই। বুড়ো মালি রান্নাবান্না করে দিল। সে যা ফার্স্টক্লাশ রান্না।

—বুড়ো মালি? ব্যাসদেও? পাকা দাড়ি?

—হ্যাঁ। চেনেন তাকে?

—চিনতাম।

ভদ্রলোক নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, সে তোমাদের রান্না করে খাইয়েছে! সে তো অনেকদিন হলো মারা গেছে।

বিজয়বাবু এখন হাল ধরেন। বলেন, এ কী তামাসা মশাই ব্যাসদেও কাল দুবেলা আমাদের চব্যচোষ্য খাইয়েছে। আজও সকালে চা বানিয়ে...

ভদ্রলোক শিউরে উঠে বলেন, 'এখনো আপনারা টিকে আছেন? খুব লাকের জোর বলতে হবে। যে লোক আজ সাত আট বছর, কি দশ বছর আগে বাগানে কাজ করতে করতে ইঁদারায় পড়ে মারা গিয়েছিল। পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও আসেনি। পাড়ার কেউ ওমুখো হতে যায়নি। কাজেই লাশ উদ্ধার হয়নি। ইঁদারার মধ্যে সলিল সমাধি। এবং এতবধি ওইখানেই তার প্রেতাত্মা বসবাস করছে।

—কী?

কী আর? সোজা বাঙলায় ভূত হয়ে রয়ে গেছে। ইদানিং নাকি আবার রাতের দিকে খুব

হা হা হাসির শব্দ শোনা যায়। অবশ্য বাড়ি বলতে আর তেমন কিছু নেই। বিশাল বাগান শুকিয়ে যাওয়ায় জঙ্গলে ভরে গেছে। বাড়িটা গাছপালা আর জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য। লোকেও ও রাস্তা দিয়ে বড় একটা হাঁটে না!

রাগে মাথা জ্বলে যায় নীতুর। তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'আপনি বোধহয় অন্য কোন চারুকুটিরের কথা বলছেন।'

ভদ্রলোকও কড়া গলায় বলেন, ' তা হবে, আমরা মানে এখানের সবাই অজয় খাসনবীশের চারুকুটিরের হিস্ট্রি জানি।' ইচ্ছে করলেই আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন। ওই ভাঙা মসজিদের মোড়টা ঘুরলেই ...

হতভম্ব বিজয়বাবু আস্তে আস্তে বলেন, 'আমাদের বোধ হয় ভুল হচ্ছে। আমাদের সেই চারুকুটির তো অনেক দূরে। আধঘন্টা গাড়ি চালিয়ে এসেছি।... কিন্তু বাড়ির নাম, মালিকের নাম দুই মিলে যাবে! স্ট্রেঞ্জ! কাইণ্ডলি যদি গাড়িটায় উঠে এসে আমায় দেখিয়ে দেন। বড় ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছি।'

আসলে কিন্তু বিজয়বাবু এই লোকটাকেই সন্দেহ করছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে লোকটা ভাঁওতাবাজ। অকারণ বিভ্রান্ত করতে চায়। এ রোগ থাকে অনেকেরই ।

ভদ্রলোক উঠে এলেন গাড়িতে। তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন, 'শুধু ধাঁধা! সে তো রক্ষে। মারা যে পড়েননি এই ঢের। চারুকুটিরে থেকেছেন, রাত কাটিয়েছেন, বুড়ো মালির হাতের রান্না খেয়েছেন। ওরেব্ বাপ! শুনেই মাথা ঘুরছে মশাই। ... ওইতো ওইতো সামনে। ওই ঝোপঝাড় জঙ্গল গজানোর মধ্যে সামনের গেট। আমায় এখানেই নামিয়ে দিন মশাই আর যাচ্ছি না।'

প্রায় চলন্ত গাড়িটা থেকে নেমে পড়ে ভদ্রলোক উল্টোমুখো চোঁ চোঁ দৌড়তে থাকেন।

আর সপরিবারে বিজয়বাবু? নীতু পিতু আর তাদের মা?

স্তম্ভিত হয়ে দেখতে পান পোড়োবাড়ির লতাগুল্ম গাছগাছালির আড়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কব্জাভাঙা গেটটার ঝুলে পড়া একটা পাল্লায় কোণ ছিঁড়ে বাঁকা হয়ে ঝুলছে কাঠের নেমপ্লেটটা। কালো জমিতে সাদা দিয়ে লেখা—

'চারুকুটির'।

এ কে খাসনবীশ!

নিচে একটা তারিখ রয়েছে যেটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এবং এই খানিক আগে যেটা নীতু বলেছে বাপী উনিশশো কত? গেটের ফাঁক থেকে সেই নাক খ্যাঁদা হাত ভাঙা ফাটাচটা পরী-পুতুলটা দেখা যাচ্ছে। সকালের রোদে ভরা আকাশ। দেখে বুঝতে ভুল হয় না এ বাড়িতে বহুকাল মানুষের পা পড়েনি।

নীতু মাথা উঁচু করে ওপর দিকে তাকাল। দোতলার ঘরটা দেখা যাচ্ছে। আগাছার জঙ্গল অতটা পর্যন্ত উঠতে পারেনি। কার্নিশ ভাঙা, খড়খড়িটার একটা জানালার পাল্লা হাট করে খোলা। ওই ঘরটায় বসেই না তারা কাল রাত্রে তাসের ম্যাজিক দেখছিল।

—দিদি! দেখছিস—

—কী দেখবে দিদি?

আচমকা একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠল। আর সাঁই সাঁই করে মুঠো মুঠো শুকনো পাতারা সেই জানলা দিয়ে ঢুকতে লাগল। কিন্তু ওগুলো কী গাছের শুকনো পাতা? না তাসের সাহেব বিবি গোলাম টেক্কার দল?

কিভাবে কোন পথে গাড়ি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফিরে আসতে পেরেছেন বিজয়বাবু তা তিনিই জানেন। বিজয়গিন্নী তো সারা রাস্তা কপাল চাপড়েছেন, তাঁর রাশিরাশি শাড়ি ভরা সুটকেসটা আর গাদা জিনিস সেই ভূতের বাড়িতে পড়ে রইল। আর পিতু নীতু মাঝে মাঝেই ডুকরে উঠেছে, 'ও বাপী! আমরা যে ভূতের হাতে খেলাম। আমাদের কী হবে? ও বাপী সেই মোগলাই পরটা চিংড়ির কারি যে আমাদের পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে।'

বাপী বললেন, 'রাতদিন কত ভুতুড়ে জিনিস আমাদের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে তার হিসেব জানিস? এই যে লোকজন সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে কে মানুষ আর কে ভূত কে জানে?

যাক একটা জিনিস বেঁচেছে। সেটা হচ্ছে ক্যামেরা। গাড়িতেই ছিল। কিন্তু গাড়ির পেছনে এসব কোথা থেকে এল? নীতুদের মার সেই শাড়ির সুটকেস বাক্স বিছানা ব্যাগ ব্যাগেজ।...... কে কখন রেখেছিল এর মধ্যে?

একটা জিনিসও খোয়া যায়নি। এমন কি বিজয়বাবুর সিগারেট কেসটা পর্যন্ত! সব কিছু সযত্নে রাখা হয়েছে।

সেসব নামাতে নামাতে বিজয়বাবু গম্ভীরভাবে বলেন, 'বুঝতে পারছ জগতে কে মানুষ আর কে ভূত বোঝা শক্ত। যার মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' থাকে সে মরে ভূত হয়ে গিয়েও মনুষ্যত্ব বজায় রাখে। এখন বল গ্যাংটকেব বদলে গালুডি গিয়ে তোমাদের লোকসান হল? না লাভ হল?

নীতুরা দু ভাইবোনেই চেঁচিয়ে উঠল, 'লাভ লাভ! আর কেউ কখনো আমাদের মত ভূতের সঙ্গে থেকেছে? ভূতের হাতে খেয়েছে? কপালে লেখা না থাকলে এমন হয়? আহা—বন্ধুরা কি বিশ্বাস করবে?'

কিন্তু পল্টুকাকাও কী?

না কি ওঁর চলে যাওয়াটা ওঁর স্বভাবগত খেয়ালীপনা? কে বলতে পারে আবাব হঠাৎ কোথাও উদয় হয়ে বলে উঠবেন, 'কি রে নীতু চিনতে পারিস?'

ভূতের সঙ্গে খেলা

শক্তিপদ রাজগুরু

প্রথমে যেতেই চাইনি আমরা।

কিন্তু শেষ অবধি পটলার কথাতে রাজী হতে হলো। তবু হোঁৎকা বলে—হেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের শীল্ড ফাইনালে খেলতে যামু?

পটলা বলে—ওদের ক—কথা দিয়েছি। দুতিনটে খেলা—জিতবোই। ইয়া শিল্ড পাবি। নগদ ক-ক্যাশ পাবি হাজার আর খাওয়াবেও খুউব।

হোঁৎকার টাকার চেয়ে, খাওযার দিকেই নজর বেশী। এমনিতেই পেটুক সে। বলে—খাওয়াইব?

পটলা শোনায—খাসির মাংস করছি। ভেড়ির ইয়াস-সাই্ জের গ-গলদা-

হোঁৎকা কি ভেবে বলে—এই চল!

পটলার পিসেমশাইদের গাঁ, হাসনাবাদ লাইনের একটা ছোট্ট কি স্টেশনে নেমে পথ আছে ইট বিছানো পথ, চারদিকে ফাঁকা মাঠ, দু'একটা গ্রামও পড়ে একেবারে যেন বনে

ঢাকা, নিঝঝুম। ওই পথে ভ্যান রিক্সায় উঠে আছাড় খেতে খেতে যেতে হয়।

প্রথমবার গিয়েই ওই ভ্যানে চড়ে মনে হয় কাঠখোলায় যেন খই ভাজা হচ্ছে, ওলটপালট খেতে থাকি আছাড়ের চোটে। হাতপায়ের হাড় গোড় যেন ছিটকে যাবে।

ফটিক বলে— এর চেয়ে হেঁটেই চল।

ফুলটিম নিয়েই গেছি। অবশ্য প্রথম দিন থেকে ওই গোবিন্দপুরের লোকরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা পটলার ফর্মমত তেমন না রাখলেও খারাপ রাখেনি।

এবার ফাইন্যাল খেলা—তারপর ওখানে নাকি জোর খাবার ব্যবস্থা আর রাতেও অন্য অনুষ্ঠান হবে। রাতে থাকতে হবে।

হোঁৎকা বলল—শিল্ডও নিতি হইব সিওর।

অন্যদিকে ফাইন্যালে উঠেছে শ্যামনগরেব কোন টিম। আমাদের ফুটবলের ক্যাপটেন গোবর্ধন ওরফে গোবরার চেহারাটা দশাশই। ব্যাকে খেলে। বল যায় যাক, কোন প্লেয়ারকে সে গলতে দেবে না। গোবরা বলে—জিতেই গেছি ধর।

মহাসমারোহ শুরু হয়েছে ওই বনে ঢাকা দূর ওই গোবিন্দপুরে।

এবার আমাদের ও বিশেষ খাতির করে স্টেশন থেকে গোটা পাঁচেক ভ্যানে করে নিয়ে যায়। আর সকালে গিয়ে, গ্রামখানাকেও দেখি।

সরু ইটফেলা পথ—অনেক পথ একেবারে মাটিরই। বর্ষাকাল, চারিদিকে আকাশমণি, চটকা-দেওদার-আমড়া নানা গাছের ঘন জঙ্গল । আর বর্ষার জলে নীচে গজিয়েছে কালকাশিন্দা, বন ধুধুল—তেলাকুচা নানা লতাগাছের জঙ্গল। ওই বনের মধ্যেই বাড়িখানা।

এককালে বিশালই ছিল। এই অঞ্চলে তখন নীলের চাষ হতো প্রচুর। বিস্তীর্ণ এলাকার নীলচাষের তদাবকি করার জন্য সাহেবরা এখানেই তাদের আস্তানা গেড়েছিল। বিশা এলাকা সাজানো বাগান, বিশাল বাড়ি—লাগোয়া অফিস ঘর, আস্তাবল এসব তো ছিলই আর পাশেই ছিল কুঠি। চিমনিটা এখনও বনজঙ্গল ভেদ করে আকাশে মাথা তুলে রয়েছে। তাতে গজিয়েছে বট অশ্বত্থের গাছ।

সামনের বাগান এর শেষ চিহ্ন হিসাবে মাথা তুলে রয়েছে দুতিনটে বইল পাম—আর একটা প্রাচীন বকুল গাছ। বাকী সব ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি। মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ গেছে ওই বাড়ির দিকে।

পিছনদিকটার অধিকাংশই ভেঙে পড়েছে। এই সামনের দিকে কিছুটা রয়েছে। কোন মতে মেরামত করে কয়েকখানা ঘর ব্যবহারের যোগ্য করা আছে, দোতলার সাবেক আমলের কাঠের সিঁড়ি।

এটাতে ওই ক্লাবই একটা প্রাইমারী স্কুল চালায়, নীচের একটা ঘরে দাতব্য চিকিৎসালয়ও চলে।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ওই বাড়ির দোতলায় একটা বড় হলঘরেই, বিশাল সাবেকী আমলের দরজা জানলাগুলোই বেশ বড় বড় । ঘরের মেজেতে টানা গদি বিছিয়ে

চাদর পেতে শয়নের ব্যবস্থা হয়েছে।

নীচের একটা চালায় রান্নার আয়োজন চলছে। হোঁৎকা এমনিতে সাহসী, আর ওর মাথায় নানা ফন্দী ফিকিরও বের হয়। ফটিক এসে ফরাসে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, —বাব্বাঃ—এ যে সিনেমার হলঘর রে!

আমাদের গোলকিপার নন্দ বলে—কোথায় আনলো ফটিকদা, এযে একেবারে বনস্পুরী। চারিদিকে পেল্লায় জঙ্গল, সাপখোপের রাজ্যি—ভয় আমারও হয়।

এতকালের পুরোনো বাড়ি—পিছনের দিকটাতো প্রায় ধ্বংস্তূপের মতই। হোঁৎকার মত সাহসীরও যেন বুক কাঁপে। বলে সে,—

—সাপটাপ ছাড়া ইয়ে ত্যানারা নাই ত?

—মানে! আমার কথায় নন্দ বলে—ভূত-টুত নাইত!

গোবরা গর্জে ওঠে —সব কাওয়ার্ড তোরা। এখন খেলার কথা ভাব। আর ত্যানাদের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিন গোলে জিততে পারি—

হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে চমকে চাইলাম। যেন বর্ষার জরাজীর্ণ বাড়ির কিছু ধ্বসে পড়লো। নাহ—দমকা হাওয়ায় ভারি দরজাটা আছড়ে পড়ছে, সারা বাড়ি যেন ওই শব্দেকেঁপে ওঠে। আমরা অবাক হই, ঝড় ও নাই। ভারি পাল্লাটা আছড়ে পড়ছে।

গোবরা বলে—খেলার ছকটা কষে নে! ওদের বাঁদিকের প্লেয়ারগুলো একটু কমজোরী—এ্যাটাক ওদিক থেকেই করতে হবে।

খেলার জন্য গোবিন্দপুর যেন ভরে উঠেছে।

মাঠেব ওদিকে বিরাট মঞ্চ, খেলার পর ওখানে অনুষ্ঠান হবে। খেলাও শুরু হয।

শ্যামনগরের টিম তো দশমিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে দিল, কি উল্লাস দর্শকদের। আমবা যেন জলকাদার মাঠে মিইয়ে গেছি। তারপর আর একখানা গোল।

আমাদের দফা রফা হয়ে গেল। হাফটাইমের আগেই আমরা যে হেরেইগেছি ধবে নিয়েছে সবাই।

হোঁৎকা বলে—শ্যাষ ম্যাষ ছিল এই কপালে? ওই অপয়া বাড়িতে উঠছি তাই গেল গিয়া শীল্ডখান্—গোবরা কি ভাবছে।

হঠাৎ মনে হয় ওই গাছগুলো যেন নড়ছে, ঝড়ো হাওয়া এসে পড়ে কোথা থেকে—মেঘ ও জমেছে। আর গোবরা হঠাৎ যেন হুঙ্কার দিয়ে বলে—জিতবোই। নাম এবার।

কি যেন এক প্রত্যাদেশই পেয়েছে সে। খেলা শুরু হলো। আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের এগারোজন প্লেয়ার হঠাৎ যেন এগারোটা আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছে। গতিবেগও বেড়ে গেছে দলের।

আর ব্যাক থেকে গোবরা ব্যাককিক্ করছে বল এসে পড়ছে ওদের গোলপোস্টে। আমিও বুঝতে পারছি না যেন হাওয়ায় উড়ছি। বল আমি মারার আগেই কে যেন আগেই

মারছে আর পড়ছে গিয়ে ওই কোণে আমাদের প্লেয়ারের পায়েই। সেও আকাশে লাফিয়ে উঠে হেড দেয় বলটা ফিরে আসে আমার কাছে, মনে হয় কে আমাকে শূন্যে তুলে দেয়, বলটা মাথায় লেগে বাঁদিক দিয়েই গোলে ঢোকে।

সকলেই হতভম্ব। এভাবে গোল হয়, তা ভাবতেও পারে না। রেফারির বাঁশী বাজে। গোওল— এবার আকাশ ফাটানো শব্দ ওঠে। সেন্টার থেকে বল আর আমাদের দিকে আসে না। মনে হয় আমাদের পাশে পাশে আর কোনও দলই খেলছে। শ্যামনগরের টিমের ব্যাক হেড করার আগেই নিজের পায়ে লেগে নিজেই ছিটকে পড়ে। সেই ফাঁকে ফটিক সেকেণ্ড গোল করে।

এবার শ্যামনগরও লড়ছে, কিন্তু নিজেরাই ছিটকে পড়ে— কি যেন তাদের ঠেলে ফেলছে— তাদের বল নিয়ে আমরাই পরপর আর দুখানা গোল ঠেসে দিলাম।

শীল্ড জেতাও হল।

শ্যামনগরের দল রানার্স কাপ নিয়ে চলে গেল। গোপালপুর আমাদের নিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সারা গাঁয়ের কাদাপথে হাঁটালো।

হৈ চৈ চুকতে প্রায় রাত নটা বেজে গেল। তারপর এলাহি ভোজ। হ্যাঁ। হোঁৎকা নিজে প্রায় গোটা ছয়েক ইয়া সাইজের গলদার মালাই কারি খেল। মাংসও খেল তেমনি। গোবরা বলে,—

—এত খাসনে।

হোঁৎকা বলে—কমই খাইছি। নাঃ মাছ ত ভালোই—চমচমও খাসা করছে।

রাতেব অন্ধকাবেই বৃষ্টি নেমেছে। আর সারা গ্রাম এখন নিশুতি। এদিকে জনমানবও নাই। বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয়েছে ঝড়, উথলপাতাল ঝড়। বিশাল গাছগুলোব ঝুঁটি ধরে কে যেন নাড়া দিচ্ছে। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানলাগুলো খুলে যায়।

বিজলিবাতি এখানে নেই। দুটো হ্যারিকেন দিয়েছিল—একটাব তেল নাই, অন্যটা এক কোণে টিম টিম করে জ্বলছে। হঠাৎ ওই ঝড়ের রাতে কার আর্তনাদ শোনা যায়।

যেন কার গলা টিপে ধরেছে কেউ—আর সে প্রাণপণে চিৎকার করছে। জেগে উঠেছি আমরা।

হোঁৎকা বলে— মার্ডার করছে না তো? ওই—একটা মাত্র টর্চ, পটলা বলে ওঠে—যাস নে—যা—যাস্ নি—নে—উত্তেজিত হয়ে ওর তোতলামি আরও বেড়ে যায়। ওদিকে ঘরে যেন তাণ্ডব চলেছে। দরজা জানলাগুলো দুমদাম শব্দে আছড়ে পড়ছে। সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ ওঠে। কারা যেন একযোগে তেড়ে আসছে। সারা বাড়ি—ঘরগুলোয় যেন কাদের আনাগোনা—দাপাদাপি শুরু হয়েছে।

হোঁৎকাও ঘাবড়ে যায়। বলে—ভূত—ভূতই হইবে।

রাম নাম—

আর কথা বলতে পারে না সে। কে যেন তার মুখ টিপে ধরেছে, যাতে ও রাম নামও

উচ্চারণ করতে না পারে।

আর পিছন দিক থেকে ওই ধ্বংসস্তূপ ফুড়ে যেন কয়েকজন ঘোড়সওয়ার বের হয়ে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে বাগানে দাপাদাপি করছে।

গোবরা আমি—নন্দ—অন্যরা হতচকিত হয়ে দেখছি ওই বিচিত্র দৃশ্য। চারিদিকে আর্তনাদই ওঠে। ওই ঘোড়সওয়ারের দল দড়ি দিয়ে বেঁধে অনেক মানুষজনকে এনেছে, আর সেই হাত-পা বাঁধা লোকগুলোকে কয়েকজন বিদেশী পোশাক পরা—টুপি পরা লোক চাবুক দিয়ে মারছে নির্দয়ভাবে। কেউ আর্তনাদ করে—কেউ ছিটকে পড়ে। তবু সেই লোকগুলো সমানে চাবুক মেরে চলেছে নির্দয় ভাবে।

আমরা কেউ কথাই বলতে পারছি না। জড়াজড়ি করে এককোণে সমবেত হয়েছি। ওদের ওই তাণ্ডব দেখছি।

হঠাৎ দরজাটায় ধাক্কা মেরে কে যেন ঢোকার চেষ্টা করছে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ঢোকার উপায় নেই। কিন্তু লোকটা দেখে অবাক হই। দীর্ঘদেহ—মজবুত স্বাস্থ্য। পরনে হাফপ্যাণ্ট—জারসী, পায়ে হোস—বুট। একেবারে ফুটবল খেলোয়াড়ের পোশাক, পিছনে আর দুতিনজন প্লেয়ার।

একজন বলে— খেললাম আমরাই। তোরা তো দুগোল খেয়েছিলি আগেই, পরেও আরও দুতিনখানা গোল দিয়ে তোদেব গোহারাণ করে দিত। আমারই এখানে আছিস জেনে দযা করে খেলে তোদের জিতোলাম। তোবা তো নডতেই পারছিলি না। তাই তোদের হয়ে খেলে শিল্ড পাইয়ে দিলাম।

ওদের কথায় অবাক হই। মনে হয় আমবা তো হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। জিতবো ভাবিনি। কিন্তু জিতেছি, আর মনে হয় মাঠে আমরা দৌড়েছিলাম, প্রতিপক্ষের প্লেয়ারদের আর কেউ যেন চার্জ করে ছিটকে ফেলেছে— আর বলগুলো গোলের মুখে এসে পড়তে যেন যাদুবলে গোলে ঢুকেছে। জিতেছি আমরা।

ওই লোকটা বিজাতীয় ভাষায় বলে— তোরা বেইমান। শীল্ড নিয়ে নাচনকোঁদন করলি, ওই হোঁৎকা হাফডজন ইয়া গলদা চিংড়ি—এত এত মাংস খেল, রসগোল্লা খেল আমাদের কিছুই দিলি না।

গোবরা বলার চেষ্টা করে— তোমরা কে? কোথায় থাকো?

—সাট আপ্। বেইমানের দল। সবকটাকে ঘরে বন্ধ করে চাবকে সিধে করবো।

ভয়ে কাঁপছি। একটু আগেই ওদের চাবকানোর ব্যাপারটা দেখেছি। ওই কাজ ওরা ভালোই করে। গোবর্ধন বলে, ওরে বাবা! বাঁচাও ভূত বাবাজী।

—ভূত! আমরা ভূত?

হোঁৎকা জীবনে এমন পাল্লায় পড়েনি। বলে সে— ভূত কইছে না, পোলাপান ওগোর কথা ছাড়ান দ্যান।

গর্জে ওঠে লোকটা—তোমার ওই কিচিবমিচিব কথা বুঝিনি।

ইউ সাট আপ।

মনে হয় এসব ভূত বাঙ্গাল কথা বোঝে নি। তাই বলি।—আমরা দেখিনি তোমাদের আগে। তোমরাও কিছু বলনি, তাহলে খাবার সময় নিশ্চয়ই ডাকতাম।

একটা ভূত বলে— সব খেলি তোরা। পড়ে আছে মাংসের হাড় আর গলদা চিংড়ির খোলা।

পটলা বলে— তোমাদের ভ-ভরপেট মাংস—গ—গ—গলদা চি—চি—

গর্জে ওঠে লোকটা— কি চিঁ চিঁ করছ ইউ বয়েজ—মশাই—ওর জিবটা আলটাকরায় মাঝে মাঝে সেট হয়ে যায় সাহেব। ও বলছে তোমাদের ভরপেট মাংস ইয়া সাইজের গলদা চিংড়ি খাওয়াবে। এবারের মত ছেড়ে দাও আমাদের।

ওরা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে। বলে,—ঠিক তো?

পটলা বলে—আপন্ গড বলছি।

গর্জে ওঠে লম্বা ভূত— সাট আপ। ওসব অপবিত্র নাম কদাপি আমাদের সামনে বলবে না। আর মাংস মাছ না খাওয়ালে তোমাদের সব কটার ঘাড়ই মটকে খাবো। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

পটলা বলে—সিওর খাওয়াবো।

—হ্যাঁ। সাতদিনের মধ্যে। সেভেন ডেজ। মনে থাকে যেন। তারপরই দেখি আমাদের সাধেব শিল্ডখানা খোলা জানালা দিয়ে যেন ডানা মেলে বের হয়ে গেল।

আব ওই অন্ধকার বাগানে তখন ব্যাণ্ড বাজছে—ঝড় বৃষ্টির মাঝেই আলো জ্বলছে—ওই শিল্ডখানা যেন কোন অদৃশ্য কেউ মাথায় নিয়ে ঘুরছে। ওই ভূতের দলই এবার তাদের জয়ের পরিচয় হিসাবে শীল্ডটা নিয়ে শোভাযাত্রা কবছে বাদ্যভাণ্ডসহকাবে। আর নাচন কোঁদনও চলছে সমানে।

আমবা ভয়ে কাঁপছি—

এরপর আবার কি কাণ্ড কবে ওই অশবীরীব দল কে জানে। হোঁৎকা বলে— শিল্ড লই গেছে যাউক— চল পবাণটা থাকলি এমন শিল্ড অনেক পামু।

— কি করবি? আমিও বুঝতে পারছি না এসময় কি করা উচিত। গোবরা শীল্ডের মায়া ছাড়তে পারে না।

বলে সে— আমাদের শীল্ড। এত কষ্টে পেয়েছি— এমনিই ফেলে যাবো!

ফটিক বলে—তুই যা। তোকেও ভূত বানিয়ে, দলে নেবে। শীল্ড নিয়ে পড়ে থাক তুই।

হোঁৎকা বলে— চল, কাইটা পড়ি পিছন দিই।

মালপত্র রইল পড়ে। চাচা আপন পরাণ বাঁচা, সেই কথামতই ওই ঘর থেকে বের হলাম।

পিছনে সবই ভাঙ্গা চোরা, বৃষ্টিব জলে কাদা—পিছল।

কিন্তু প্রাণের দায়ে মানুষ করতে পারে না হেন কাজ নেই। ওই ভাঙ্গা বাড়ি— সাপখোপের রাজ্য, তবু কোনমতে পাঁচিল বেয়ে— বেড়া টপকে কোনমতে বাঁশবনে এসে পড়লাম।

অন্ধকার চারদিক— জোনাকি জ্বলে। তখনও বৃষ্টি কমলেও ঝড় সমানে চলেছে। কোনমতে ওই ভূতের এলাকা থেকে বের হয়ে এলাম গ্রামের পথে।

কোনদিকে যাবো জানি না—। হোঁৎকা বলে—বড় রাস্তা ধইর‍্যা চল। উঃ—কোনখানে আইছিরে। পটলাও পথ চেনে না।

বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছি—হঠাৎ কার ডাকে থমকে দাঁড়াই। এ আবার কোন ভূত কে জানে!

ভূত নয়—টর্চের আলো পড়ে।

ওদিকে ক্লাবের ঘর, কিছু ছেলেও বের হয়ে আসে। তাবা আমাদের ওই অবস্থা দেখে অবাক। ভোর হয়ে আসছে— লোকজন জেগে ওঠে। দু'একজন বয়স্ক লোকও এসে পড়ে। তারা সব শুনে বলে— ওখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলি? ওই ভূতুড়ে সাহেব কুঠিতে! ইস্—জোর বেঁচে গেছ তোমরা।

সকালে দলবল নিয়ে যাই, দেখি কুঠি শুনশান। তখন বৃষ্টিও থেমেছে। জনমানব নেই, দোতলার ঘরে আমাদের মালপত্র-মায় ফুলের মালা পরানো শীল্ডটা অবধি যথাস্থানেই রয়েছে। কোথাও সেই হৈ চৈ হুঙ্কার-আর্তনাদও শোনা যায় না।

তবু কেমন গা ছম ছম করে। তখনই মালপত্র নিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। পটলা বলে-- ব্যাটা ভূতদের খাওয়াবো বলেছি।

হোঁৎকা বলে—সাতদিন যাইতে দে। তাবপব আমরাই খামু ওই মাংস উইথ গলদা চিংড়ি।

—সেকি।

আমার কথায় হোঁৎকা বলে— ওই অজপাড়াগাঁযেব ভূতবা কলকাতায আইসা তম্বি হাম্বি করতি পাববে না। এখানেব ভূতগোর সাথে ওগোর ফাইট বাইধা যাবে।

সাতদিন কেন সাতাশদিন কেটে গেছে আব কোন অঘটন ঘটেনি। সেই বাতের কথা ভুলিনি।

অদৃশ্য হাত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বাজহাটি গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি ছিটেবেড়ার ঘরে বুড়ি থাকত। বুড়ির কেউ কোথাও নেই। সারাদিন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে সন্ধ্যের পর ঘরে ফিরত। আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামগুলোর যে কি চেহারা ছিল তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। গ্রাম তখন গ্রাম ছিল। গ্রামের বাইরে মাঠ ছিল, বন ছিল, জঙ্গল ছিল— দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল। এই ছিল তখনকার প্রকৃতি। সে যাক। বুড়ির ঘরের কাছে মস্ত একটি বটগাছ ছিল। আর সেই বটগাছের ছায়ার নিচে ছিল বুড়ির কুঁড়ে ঘর। খুবই দুঃখে দিন কাটত তার। ভোরবেলা উঠে মাঠে গোবর কুড়োত। কাঠ কুড়োত। তারপর দুটো শুকনো মুড়ি জল দিয়ে ভিজিয়ে খেয়ে ভিক্ষেয় বেরতো। ভিক্ষেয় বেরিয়ে দোরে দোরে ঘুরে যা জুটত তাই খেত। আর সারাদিনের ভিক্ষার সামগ্রী যা জুটল রাত্রে ঘরে ফিরে সেগুলো কাঠ কুটো জ্বেলে ফুটিয়ে ফাটিয়ে খেত। চাল ডাল আলু বেগুন সব একসঙ্গে খিচুড়ির মতো করে রেঁধে পেট ভরে খেয়ে মাটির দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোত বুড়ি।

অদৃশ্য হাত

হঠাৎ একদিন বুড়ির মনে হ'ল সে যা কিছুই খায়, খেয়ে তার পেট আর ভরে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে এক ঘুম দেবার পরই খিদেয় চন চন করে পেটের ভেতরটা। এই না দেখে বুড়ি ক্রমশ তার খাওয়া বাড়িয়ে যেতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য! সে যত খেতে লাগল ততই তার খিদে বাড়তে লাগল। ক্রমে ভাতের হাঁড়ির চেহারাও বদল হতে লাগল। কিন্তু না। তাতেও কোন সুরাহা হ'ল না। চারজনের রান্না একসঙ্গে রেঁধে খেয়েও পেট ভরাতে পারল না বুড়ি। তাই মনের দুঃখে একদিন গ্রামের দু'চারজন লোকের কাছে কথাটা বলেই ফেলল। সবাই শুনে অবাক হয়ে বলল—বলো কি! চারজনের রান্না একজনে খেয়েও পেট ভরাতে পার না? তার ওপর তোমার মতো বুড়ি মানুষ। এ হতে পারে না।

নিরাপদ মাষ্টার এই গ্রামেরই পাঠশালার গুরুমশাই ছিলেন। বললেন—বেশ, দেখব বুড়ি তুমি কত বড় খাইয়ে। আজ তুমি ভিক্ষেয় বেরিও না। আমার ঘরে এসো। আজ তোমার নেমন্তন্ন। দেখব তুমি কত খাও।

বুড়ির তো আনন্দ আর ধরে না।

সে রাতে নিরাপদ মাষ্টারের বাড়িতে খেতে এলো বুড়ি। কিন্তু কি আশ্চর্য! চারজন কেন, একজন মানুষের খাবারও খেতে পারল না বুড়ি। সামান্য দু'চার গ্রাস মুখে দিতেই পেট ভরে গেল।

নিরাপদ মাষ্টার বললেন— আসলে কি জান? তোমার এবার মতিভ্রম হয়েছে। বয়স কত হল?

—তা ধরো না কেন, তিন কুড়ি আর দশ।

—তা হলে এমন আর কি? সত্তর বছর। চোখে দেখতে পাও?

—একেবারে কানা নই, তবে ঠাওর হয় কখনো হয় না। কিন্তু বাবা, বিশ্বাস করো আমার কিচ্ছু হয়নি। ঘরে আমার খেয়ে পেট ভরে না।

—ভরবে ভবরে। আসলে তুমি বুড়ি মানুষ নিজের ঘোরে থাকো। চাল ডাল ঠিক মতো নাও না।

—সে কি বাবা! আমার সারাদিনের ভিক্ষের চাল, সে বড় কম নয়। এত বড় একটা হাঁড়িতে করে সব রেঁধেও খেয়ে আমি পেট ভরাতে পাবি না।

—কিন্তু এই তো, আমার এখানে পোয়াটাক চালের ভাতও তুমি খেতে পারলে না।

বুড়ি আর কি করে, ঘরে ফিরে এসে মাটির দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে নানা রকম চিন্তা ভাবনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে আবার মাঠে গিয়ে গোবর কুড়িয়ে বাগান থেকে কাঠ কুড়িয়ে দু'মুঠো শুকনো মুড়ি চিবিয়ে ভিক্ষেয় চলল বুড়ি। সারাদিন ভিক্ষে করে দিন শেষে ঘরে ফিরে ভিক্ষার সমস্ত চাল ডাল আলু বেগুন একসঙ্গে বড় হাঁড়িতে ফুটিয়ে নিয়ে খেতে বসল। কিন্তু আশ্চর্য! দু এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই খাবারও ফুরিয়ে গেল, পেটও ভরল না তার—। আর যা ঘটল তা ভারি মজার।

বুড়ি যখন খাচ্ছিল আর মনে মনে কাঁদছিল তখন তার মনে হ'ল একটা অদৃশ্য হাত যেন

তার পাত থেকে মুঠো মুঠো করে খাবারগুলো তুলে খেয়ে নিচ্ছে। বুড়ি যতবার হাতটা ঠেলে দিতে লাগল হাতটা ততবারই ওর পাত থেকে খাবার তুলে নিতে লাগল।

বুড়ি বুঝতেও পারল না কেন এমন হ'ল আর কেই বা সব খেল।

এই কথাটা বুড়ি পবদিন গিয়ে বলল নিরাপদ মাষ্টারকে।

নিরাপদ মাষ্টার চোখ কপালে তুলে বললেন—বলো কি! একটা হাত তোমাব পাত থেকে খাবার তুলে খেয়ে নিতে লাগল, আব তুমি বসে বসে তাই দেখলে?

—কি করব বাবা?

—তা কে সে? চিনতে পাবলে তাকে?

—কি করে চিনব? অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়, আমার ঘরে লম্ফপিদিম কিছুই নেই।

—বুঝেছি। এ নিশ্চয়ই কোন চোর ছ্যাঁচড়ের কাজ।

—তা যদি হয় বাবা তাহলে তো তাব আসা যাওয়ার বা মুখ নেড়ে নেড়ে খাবাব শব্দ শুনতে পেতুম। কিন্তু শুধু একটা হাত ছাড়া আব কিছুই তো টের পেলুম না অন্ধকারে। হাতটাকে যত ঠেলে দিই সেটা ততই এগিয়ে আসে।

নিবাপদ মাষ্টার বললেন— দেখ বুড়ি, তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তোমাব খাবার সত্যিই কেউ খেয়ে নিচ্ছে। হয় কোন চোর নয়তো হনুমানে। তোমাব বাড়ির পাশেই যে বট গাছটা আছে সেই বটগাছে নিশ্চয়ই একদল হনুমান আছে। এ তাদেরই কাজ।

—না বাবা। হনুমান নয়। ও গাছে বাঁদর হনুমান মাঝে মধ্যে আসে বটে তবে সন্ধ্যে হলেই দীঘির পাবে চলে যায়। এখানে থাকে না। তাছাড়া আমি নিজে হাত দিয়ে ঠেলে দেখেছি ও মানুষেব হাত।

—বেশ। তবে তুমি এক কাজ কবো, আমাব চিমনিটা নিয়ে যাও। ওটা জ্বেলে বেখে আজ বাত্রে খেতে বসে দেখো দেখি কে কিভাবে আসে।

বুড়ি তাই করল।

নিরাপদ মাষ্টারেব কথা মতো সে রাতে চিমনি লণ্ঠনটা জ্বেলেই খেতে বসল।

কিন্তু কই? কেউ তো এলো না। না কোন মানুষ, না বাঁদর হনুমান এমন কি একটা কুকুরকেও আসতে দেখা গেল না। আর বুড়ি যা রান্না করেছিল তার প্রায় সবই ফেলা গেল। কেন না আলো জ্বেলে রাখার ফলে কেউই না আসায় যেমনকার খাবার তেমনিই রইল। বুড়ি আগে যেমন খেত তেমনই খেতেই পেট ভরে গেল তার। সে আর কত? সামান্য দু'এক মুঠো।

এর পর থেকে বুড়ি রোজই কম করে রাঁধতে লাগল। আর আলো জ্বেলে খেতে থাকল। ফলে কাউকেই আসতে দেখা গেল না।

তবে মুশকিল হ'ল এই তেলের অভাবে বুড়ি যেদিনই আলো জ্বালতে পারত না সেদিনই অনুভব করত একটা অদৃশ্য হাত তার পাত থেকে খাবার তুলে খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু যেদিন আলো জ্বেলে খেত সেদিন কিছুই হোত না। বুড়ি তাই নিরাপদ মাষ্টারের কথা মতো রোজই

আলো জ্বেলে খেতে লাগল।

এইভাবে প্রায় দিন দশেক কাটবার পব একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক গভীর রাতে সবাই শুনতে পেল একটি করুণ কান্নার সুর। কে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে গ্রামের পথে ঘাটে আনাচে কানাচে কেঁদে বেড়াচ্ছে এই কথা বলে 'বুড়িকে এমন বুদ্ধি কে দিলিরে? খিদেয় আমি মরে গেলুম। তার সর্বনাশ হোক—তার সর্বনাশ হোক—তার সর্বনাশ হোক।'

গ্রামের লোকেরা সবাই তখন সচকিত হয়ে উঠল। কে! কে কাঁদে? কে ঐ কেঁদে কেঁদে অভিশাপ দেয়। বিলাপ করে আর অমঙ্গলের কথা বলে?

এই জ্যোৎস্না রাতে নিরাপদ মাষ্টার নিজেই দেখলেন দৃশ্যটা। রাত তখন একটা। কি একটা কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন একটা প্রকাণ্ড সাইজের কুলোর ওপব কালো কিম্ভুতকিমাকার বিচ্ছিরি চেহারার মানবাকৃতি কি যেন একটা বসে আছে। চেহারার তুলনায় হাতদুটো তার বিশাল। কুলোটা বাতাসে ভেসে ভেসে গ্রামের পথ পরিক্রমা করছে। আর সেই কিম্ভুতকিমাকার তার হাত দুটো দুলিয়ে কখনো নৌকো বাওয়ার মতো করে, কখনো কপাল চাপড়ে সুর করে কেঁদে কেঁদে বলচে বুড়িকে 'এমন বুদ্ধি কে দিলিরে? খিদেয় আমি মরে গেলুম। তার সর্বনাশ হোক—তার...।'

এই দৃশ্য শুধু নিরাপদ মাষ্টার নয় ঐ গ্রামের আরো অনেকেই প্রত্যক্ষ করল। নিরাপদ মাষ্টাবেব বউ অনেক ঠাকুর দেবতা ওঝা বদ্যি করতে লাগলেন যাতে তাঁদের সংসারে কোন অমঙ্গল না হয়। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হ'ল না। শাপ শাপান্তও কমল না। তাই দেখে অনেকেই অবশ্য বলল, ওর কথায় কান দিও না। আসলে ওটা একটা উজবুক তাই ঐ সব বলে বেড়াচ্ছে। তোমরা তো ওব কোন ক্ষতি করো নি। তবে ভয় কি। শকুনির শাপে গরু মবে না। ওব যা ইচ্ছে বলুক।

এইভাবে আরো দু'তিন মাস কেটে যাবাব পর এক ঝড় জলের রাতে বট গাছের একটি ডাল ভেঙে পড়ল বুড়ির কুঁড়ে ঘরের ওপব। ঘুমন্ত বুড়ি ঘর চাপা পড়ে মরে গেল। আর বলতে নেই সে বাত থেকেই সেই বিচ্ছিরি চেহারার কিম্ভুতকিমাকারটাকে কুলোয় চেপে গ্রামের আনাচে কানাচে ভেসে বেড়াতে দেখা গেল না। এমন কি তার শাপ সাপান্ত কান্নাকাটি সব কিছুই থেমে গেল চিরতরে। তবে সেই ঘটনার পর থেকে রাজহাটি গ্রামের লোকেরা আজ পর্যন্ত সন্ধ্যের পর আলো না জ্বেলে কখনো খেতে বসে না কেউ।

আলো জ্বালিয়ে গিয়েছিল
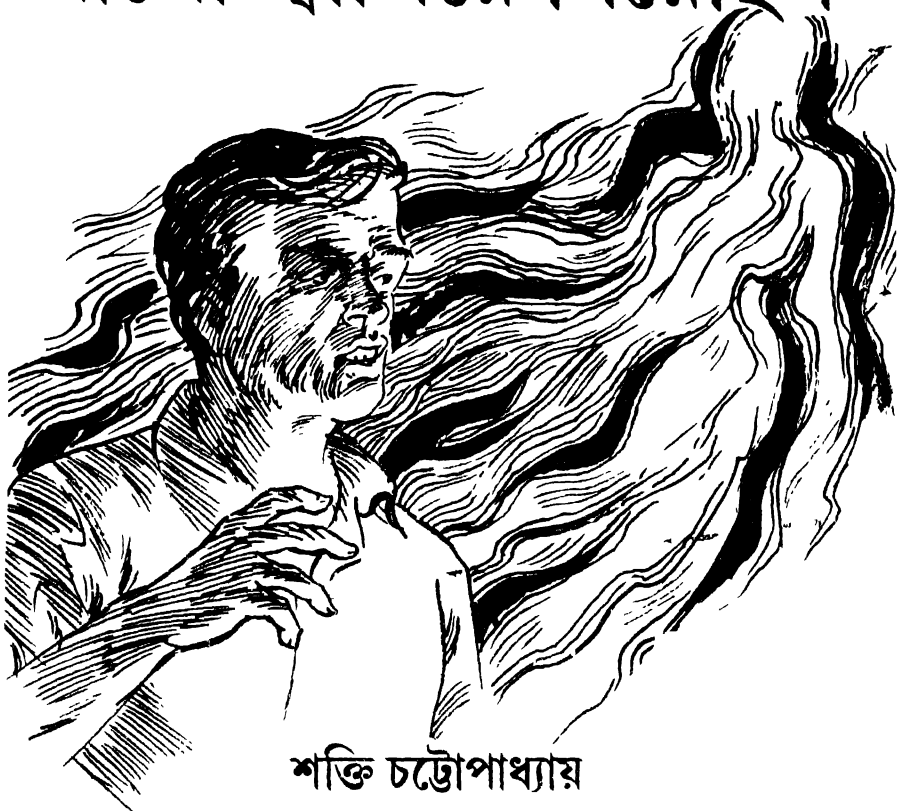
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সবাসবি ভূত দেখাব দুর্ভাগ্য আমাব না থাকলেও আমি খুব ভূতের ভয় পাই। যে ঘটনার কথা বলছি সেটা এই কয়েকদিন আগের। আমার বাড়িতে একজন কাজের মেয়ে ছিল— তিন চাব মাস কাজ কথার পরে সে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা যায়। তারপর রাত্তিরে আমি একেবারেই একলা থাকতে পারতাম না। মনে হতো ওকে ঠিক দেখতে পাবো। আগেই বলেছি আমি একদমই একলা শুতে পারি না। গত কয়েকদিন আগে আমি আমার মেয়ের ঘবে একটা ক্যাম্প খাট পেতে শুয়েছিলাম, ঠিক সেই জায়গায় যেখানে ওই কাজের মেয়েটি শুতো। পাশের খাটে মেয়ে ঘুমোচ্ছে। রাতে হঠাৎই ঘরের আলোটা আপনা-আপনি জ্বলে উঠল। আমার মনে হতে লাগল ঘরে আমি ছাড়াও অন্য কেউ আছে। এরপর আমার স্ত্রী এসে আলোটা নিভিয়ে দেন। ভেবেছিলেন আমি বোধহয় ভয় পেয়ে আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাব স্ত্রী চলে যাওয়ার পরে আবার আলোটা জ্বলে ওঠে— , পাখাটা বন্ধ

হয়ে যায়। আমি উঠে গিয়ে আলোটা নেভাবার সময় দেখি সুইচটা লুজ হয়ে গেছে কিনা। অথচ বেশ শক্তই ছিল— গায়ের জোরে জ্বালাতে হচ্ছিল। এরপর আমি ওই ঘর ছেড়ে চলে যাই। আমার বিশ্বাস ওই মেয়েটির আত্মা বা ভূত যাই বলি না কেন, ওই সময়ে ওই জায়গায় এসেছিল। ওর জায়গায় আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে— নানাভাবে আমাকে বিরক্ত করছিল যাতে জায়গাটা ছেড়ে দিই। তবে ওই ঘরে শোওয়ার কথা ভাবতেই পারিনি।
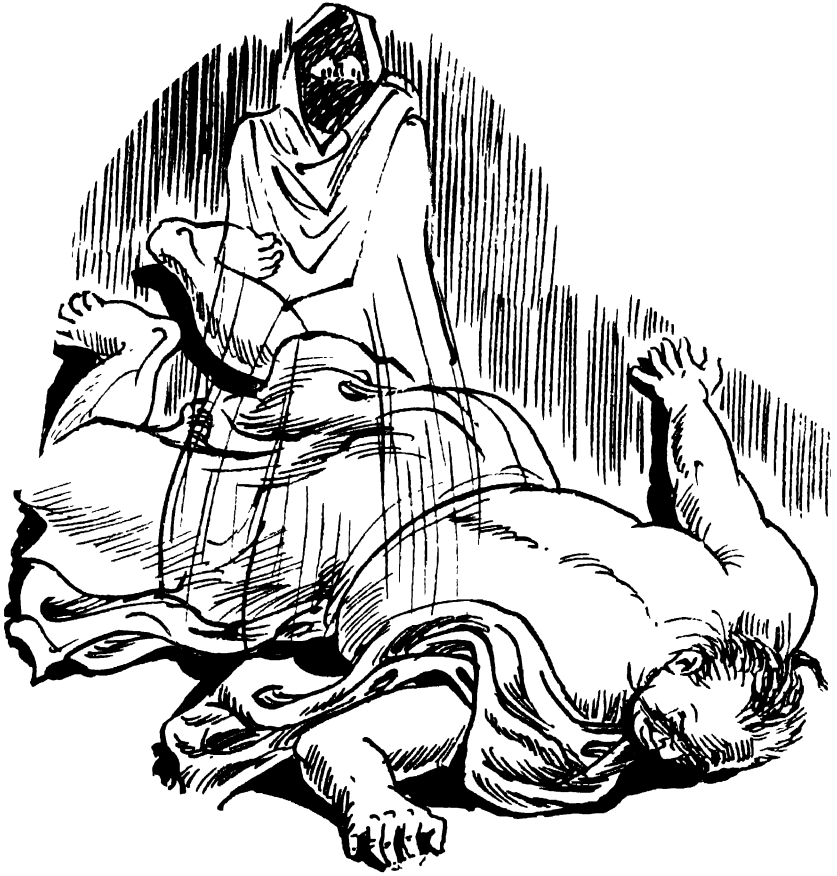
হুড়কো ভূত

অমিতাভ চৌধুরী

আমার মেজ পিসিমার বাড়িতে একবার ভূতের উপদ্রব হয়েছিল। ঠিক ভূত নয়, শিবের চ্যালা নন্দী-ভৃঙ্গীর উৎপাত। এই উৎপাতে সারা গাঁ যেমন ভীত, তেমনি বিস্মিত।

ছেলেবেলার কথা বলছি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা। আমি তখন আছি মামাবাড়িতে। গ্রামের নাম শ্রীগৌরী। ওখানকার ইস্কুলে পড়ি। আমাব মামাবাড়িব ঠিক পিছনটাতে ফার্লংখানেক দূরে মেজ পিসিমার বাড়ি। পিসিমা সাদা-সিধে ভালো মানুষ। দেব-দেবী ভূত-প্রেত সাধু সন্ন্যাসীতে অগাধ বিশ্বাস। পিসেমশাই আরও ভালো মানুষ। গ্রামের পাঠশালার গরীব মাষ্টার। মাস মাইনে বারো টাকা। ছোট্ট বাড়ি অল্প জমি সামান্য চাকরি নিয়ে কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে।

তাঁদের একমাত্র ছেলে আমার চাইতে আড়াই বছরের বড়। পড়াশোনার নাম নেই, টো টো করে ঘুরে বেড়ান, গুলতি দিয়ে পাখি মারেন, অদ্ভুত সব গল্প বলেন এবং চক-খড়ি দিয়ে বাড়ির যত্রতত্র ছবি আঁকেন।

হুড়কো ভূত

ছোট্ট একতলা বাড়ি। টিনের চাল, একটি ঘরকেই দরমার বেড়া দিয়ে তিন ঘর। সামনে দুটি ঘরের একটিতে রাঙাদা, অন্যটিতে পিসিমা-পিসেমশাই এবং পেছনের তিনদিক খোলা টানা লম্বা ঘরে রান্নাবান্না। রান্নাঘর দরমার বেড়া দিয়ে আলাদা করা। বাড়ির গাছপালা আগাছার জঙ্গল। ছোট্ট একটা মজা পুকুরও সেই জঙ্গলের গায়ে।

টানাটানির সংসার, কিন্তু এক ছেলে বলে রাঙাদার আদরের শেষ নেই। তার আবদারেরও শেষ নেই। 'অমুকটা চাই' বলামাত্র এনে দিতে হবে। বেচারা পিসেমশাই। যে সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে আদুরে ছেলের আবদার মেটাতে গিয়ে তিনি জেরবার।

মেজ পিসিমার বাড়িতে হঠাৎ হাজির হলেন এক সন্ন্যাসী। গায়ে লাল কাপড়, মাথায় জটা হাতে ত্রিশুল। সাক্ষাৎ শিব। পিসিমা তো তাই ভেবে বসলেন। সাধুবাবা বললেন, এইমাত্র কৈলাস থেকে তিনি আসছেন। একটু আশ্রয় দরকার। এই গ্রামে পাপ ঢুকেছে। পাপ তাড়াতে কিছুদিন থাকতে হবে।

পিসিমা তো বিশ্বাস কবার জন্যে বরাবরই প্রস্তুত। লম্বা প্রণাম ঠুকে সাধুবাবাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁকে শাক ভাত ডাল খাইয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

সাধুবাবা ওই বাড়িতে থেকে গেলেন। খান-দান, মাঝে মাঝে 'দেহি ভবতি ভিক্ষাং' বলে গাঁয়ে ঘোরেন এবং কেউ কটু কথা বললে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করেন। গাঁয়ের অবিশ্বাসীরা সন্দেহেব চোখে তাকায়, ভাবে কোন ফেরারী আসামী নয় তো? সাধু সেজে গা ঢাকা দিয়ে আছে? আব বিশ্বাসীরা তো শিব জ্ঞানে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করতে লাগলো।

সাধুবাবার কাছে আমিও যাই। তিনি আমাদের প্রায়ই কৈলাসের কথা শোনান। তোফা জায়গা। ওযেদার ভাল, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নেই। নেহাৎ এক কঠিন প্রয়োজনে তাঁকে কৈলাস ছেড়ে আসতে হল। পিসিমার ভাইপো বলে আমাকে অধিক স্নেহ কবেন, বলেন, কিছু ভাবিস না, তোর হবে। আমার কী যে হবে। আমাব কী যে হবে আমি নিজেই জানি না। তবে সাধুবাবাকে পুরো অবিশ্বাসও কবি না। বলা যায় না, হয়ত শিবই। নইলে সেদিন রূপসী গাছেব তলা থেকে সাপ ধরে আনলেন কী করে?

সাধুবাবা মেজ পিসিমার বাড়িতে থেকে গেলেন। তাঁর আনা ভিক্ষের চাল সংসারে লাগে। তিনি নানা রকম গল্প শোনান এবং মাঝে মাঝে 'বোম বোম' বলে কৈলাসের স্মৃতি বোমন্থন কবেন। সাধুবাবা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, একদিন তিনি আমাকে কৈলাস দেখিয়ে আনবেন।

আমার সোনা মামা থাকতেন বাইরে। সেবার পুজোর সময় বাড়িতে এসে সাধুবাবার খবব পেলেন। তিনি দেখেই বললেন, ভণ্ড প্রতারক। সাধুবাবাকে একদিন বাড়িতে ডেকে এনে বেশ দু-চাব কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি তো ভয়ে মরি, যদি শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন সোনা মামাকে।

সাধুবাবা কিছু মনে করলেন না, স্মিত হেসে চলে যান। সোনামামাও ভস্ম হন না। বিশ্বাস অবিশ্বাস মিলিয়ে সাধুবাবা গ্রামে থেকে গেলেন। আর আমার মেজ পিসিমা ও

পিসেমশাই শিব ঠাকুরের দয়ায় অচিরে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকেন। আগের জন্মে কী কী অপরাধের জন্য তাঁদের আর্থিক দুর্দশা, একথা সাধুবাবা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আশ্বাস দেন, এত বছর এত দণ্ড এত পল পেরিয়ে গেলে সব দুঃখ মোচন হয়ে যাবে।

ইস্কুল ফেরত আমি মাঝে মাঝে সাধুবাবার কাছে যাই। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন, আমি যেন শাপভ্রষ্ট দেবশিশু। সাধুবাবা কথা বলতে বলতে কী যেন বিড়বিড় করেন। পিসিমা বলেন, মা দুর্গার সঙ্গে কথা বলছেন। হতেও পারে। প্রলাপেই সংলাপ।

রাঙাদার দুষ্টুমিতে গ্রামের লোকজনেরা তিতিবিরক্ত হলেও সাধুবাবা ক্ষমাশীল। বলেন, ওটা হনুমান ছিল ত্রেতাযুগে। বাঁদরামি করলেও ভক্ত মানুষ। একথায় আমারও বিশ্বাস হয়েছিল। কেননা, দেখতাম রাঙাদা হনুমানের ছবি খুব ভালো আঁকতে পারেন।

রাঙাদা আমায় খুব ভালবাসেন। অনেক সময় আমাকে তাঁর দুঃসাহসী অভিযানের সঙ্গী করতে চান। অন্যের নৌকা নিয়ে নদী পাড়ি কিংবা আম গাছের ডগায় উঠে পাখির ছানা ধরে আনা কিংবা পানাপুকুর সাঁতরে এপার ওপার হওয়া তার কাছে নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি ভীতু মানুষ, কোনটাতেই রাজি হই না। আর যদিও বা সাহস করে সঙ্গী হতে চাই, জানি তাহলে দিদিমা ও সোনামামা বকবেন। ওদের ধারণা বেণুলাল বকাটে ছেলে।

রাঙাদার উপর মাঝে মাঝে ভর হত। ঘুমের মধ্যে কী সব বিড়বিড় করতেন। সাধুবাবা মন্ত্র পড়ে ঠাণ্ডা করতেন। একবার রাঙাদা মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে সামনের বড় পুকুরে ঝাঁপ দেন। পেছন পেছন ছোটেন পিসেমশাই ও সাধুবাবা। পিসেমশাই জলে নেমে তাকে ধরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারবেন কেন। বাকি রাত জলের মধ্যে দাপাদাপি চলল। বেচারা পিসেমশাই। রাঙাদা যখন পাড়ে উঠলেন, তখন চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লেন ঘাটে। যেন ঘুমের মধ্যেই সব কিছু হয়েছে। অনেক দিন পরে রাঙাদা আমার কানে কানে বলেন, মজা করার জন্যে রাতভোর সাঁতার কেটেছিলেন।

সেই রাঙাদার বাড়িতে হঠাৎ শোনা গেল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। রোজ রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, ঠিক তখন শোবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝের দরমার দরজা ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা হয়। এ পাশের লম্বা বাঁশের হুড়কো নড়তে থাকে এবং হাতে হুড়কো চেপে না ধরলে ভূত হুড়মুড় করে শোবার ঘরে ঢুকে যেতে পারে। ওই লম্বা বাঁশের হুড়কো এমনিতেই নড়বড়ে।চোর আটকাবার জন্যে নয়, শেয়াল কুকুর যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্যেই।

সারা গ্রামে আতঙ্ক। এমনিতে ভূত-প্রেতরা সব গ্রামের রাস্তাতেই ঘুরে বেড়ায়। বেম্মদত্যি বেলগাছের ডালে বসে থাকে, শাঁকচুন্নি বোয়াল মাছ ভাজা খাবার জন্য লম্বা হাত বাড়ায়, পেত্নী বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে ভয় দেখায়। অন্ধকার, ঝোপঝাড়, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, হুতোম প্যাঁচার ডানা ঝটপটানি—সব মিলিয়ে সব রাত্রেই এক ভৌতিক পরিবেশ। তার মধ্যে দু-চারজন ভূতের ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী পিসিমার বাড়িতে প্রবেশ বিচিত্র নয়।

গ্রামের লোকেদের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে গেল ওই ভূতের উপদ্রব। হাটে মাঠে

বাজারে পুকুর ঘাটে রেল স্টেশন আরও রঙ চড়িয়ে ও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওই ভূতের কাহিনী বলা হতে লাগল। মেজ পিসিমা কিঞ্চিৎ ভীতু, তবে তার ভরসা সাধুবাবা। শ্মশানচারী শিব যখন বাড়িতে, তখন দু-চারটে ভূতের উপদ্রব তো হবেই। ভূতের হাত থেকে বাঁচাবেনও সাধুবাবা। সুতরাং ভয় কিসের। বেচারা ভালোমানুষ পিসেমশাই, তার হয়েছে মুশকিল। রোজ মাঝরাত্তিরে ওই হুড়কো ধরে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একদিকে ভূত, অন্যদিকে পিসেমশাই। সাধুবাবা অবশ্য বলেন, নন্দী ভৃঙ্গী বড় জ্বালাচ্ছে। কৈলাসে নিয়ে যাবার জন্য রাত্তিরে এসে হামলা করছে। আরে বাবা, বললেই তো আর যাওয়া যায় না। কাজ ফুরোক তবে তো—বোম্ বোম্!

সরল বিশ্বাসী পিসিমা এসব কথা শুনে আরও নির্ভয় হয়ে গেলেন। স্বামী পুত্র সাধুবাবা ও নন্দী ভৃঙ্গীর হামলা নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে লাগলেন।

গ্রামের লোকদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। রোজ রাত্রে পালা করে অনেকে ওই বাড়িতে আসতে লাগলেন স্বচক্ষে ভূতের হুড়কো টানার ঘটনাটা দেখার জন্যে। প্রথমে একটু একটু নড়ে। শব্দ পাওয়া মাত্র ছুটে গিয়ে হুড়কো ধরে ফেলতে হয়। তারপর চলে লড়াই। খুব জোরে ধরে না রাখতে পারলে কেলেংকারি। ভূত দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়বে। যেন ভূতেরা অন্য কোন রাস্তা দিয়ে বা দেয়াল ফুঁড়ে আসতে পারে না।

এসব ব্যাপারে নির্বিকার কেবল রাঙাদা। ভূত টুত নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। যখন পাশের ঘরে তুলকালাম কাণ্ড চলছে, তখন তিনি গভীর ঘুমে। পিসিমা বলেন, 'আমার বেণুলাল বড় ঘুম কাতুরে। ভূত দূরের কথা, বাড়িতে ডাকাত পড়লেও তার ঘুম ভাঙে না।'

হবেও বা। রাঙাদা যে রকম অদ্ভুত লোক, কোন কিছু কেয়ার না করে ঘুমিয়ে থাকতেই পারে।

তবে আর একটা ব্যাপারে সবাই ভূতের আগমন সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়ে গেল। যখন হুড়কো নড়ে না, তখন বাড়ির টিনের চালে দুম দাম ঢিল পড়ে। এও যে রাগী ভূতের বা শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নন্দী ভৃঙ্গীর কাণ্ড, তাতে কোন সন্দেহ রইল না। সাধুবাবা শোন সামনের একফালি বারান্দায়। তিনি সব শুনে মুচকি হাসেন এবং হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার পাড়েন—'বোম্ বোম্।' বাড়ির চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, পেছনের বাঁশ গাছের ক্যাচ ক্যাচ এবং তারই মাঝখানে বোম-বোম আওয়াজ— সব মিলিয়ে গা ছমছম ব্যাপার। এমন অবস্থায় ভূত আসতেই পারে।

এক রাত্তিরে সাহস সঞ্চয় করে আমিও হাজির হলাম ভূতের আসরে। আমার তখন বয়সই বা কত, আট নয়, সব কিছু বিশ্বাস করার সময়। শুধু ভয়, যদি সত্যি সত্যি ভূত ঘরে ঢুকে পড়ে? পরক্ষণে ভরসা পাই সাধুবাবাকে দেখে। তিনি নিশ্চয়ই একটা কিছু বিহিত করবেন।

আমি প্রথমে বললাম, রাঙাদার বিছানায় থাকব। রাঙাদা বললেন, 'না না, তুই যা অন্য ঘরে। এখানে আমার অসুবিধা হবে।'

আমার একটু খটকা লাগল, রাঙাদা ভূতের ব্যাপারে এতো নিরুত্তাপ কেন? কিন্তু সবাই ভূতের নড়াচড়া নিয়ে এতো ব্যস্ত যে রাঙাদাকে নিয়ে তত মাথা ঘামায় না।

আমি যেদিন গেলাম, সেদিন একটু বাড়াবাড়ি হল। আমার মতো আরও কয়েকজন গ্রামবাসী ছিলেন ঘরে। সেদিনও হুড়কো নড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই ছুটে গেলেন। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি যে পিসেমশাই আচমকা মাটিতে পড়ে গেলেন। পিসিমা সাধুবাবাকে হাঁক পেড়ে ডাকলেন। সাধুবাবা তাঁর বিছানা ছাড়লেন না। গাঁয়েরই আর একজন ছুটে গিয়ে হুড়কো ধরলেন। ভাগ্যিস ধরলেন, নইলে ভূত দেখে মূর্চ্ছা যেতাম।

এইভাবে চলছে। সাধুবাবা ভূত হুড়কো টানাটানি নিয়ে গ্রামের মানুষ মেতে রইলেন। মেজ পিসিমার বাড়িতে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া হল। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে। শুধু রাঙাদা যেন গম্ভীর। দিনের বেলা ভূত নিয়ে নানা রকম কথা তিনিও বলেন, কিন্তু রাত্রে চুপচাপ। পিসেমশাই হুড়কো ধরার জন্য তাকে ডেকেও ভূতের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারেন নি। মেজ পিসিমা অবাধ্য ছেলের ঘুম ভাঙাতে নারাজ। সব ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে পিসেমশাইকে।

ভূতের খবর রটে গেল গ্রামেব বাইরেও। অবশ্যই পল্লবিত হয়ে। সেই খবর শুনে শিলচব থেকে একদিন আমার বড় কাকাবাবু এসে হাজির। আমার বড় কাকাবাবু মানে রাঙাদাব মামাবাবু। তিনি পিসিমা পিসিমশাইয়ের কাছে সব কথা শুনে গুম মেরে রইলেন। প্রথমেই পিসিমাকে বললেন, 'বুঝলে দিদি, যত গণ্ডগোলের মূল ওই সাধুবাবা। ওকে বাড়ি থেকে তাড়াও, নইলে উপদ্রব কমবে না।'

পিসিমা জিভ কেটে বলেন, 'ওরে ভূপেন্দ্র, এমন কথা বলিস না। বাবা সাক্ষাৎ শিব।'

বড কাকাবাবু ঃ 'শিব তো এখানে কেন? ওকে শ্মশানে পাঠিয়ে দাও।'

পিসিমা ঃ 'শ্মশানে যেতেই পারেন, কিন্তু আমার কত সৌভাগ্য বল দিকিনি, তিনি আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করেছেন।'

বড় কাকাবাবু ঃ 'নিজের অন্ন জোটে না, আবার অন্যকে অন্নদান। হু! তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি কোন দিনই হবে না।'

রাত্রে বড কাকাবাবুর উপস্থিতিতে আবার ভূতের আবির্ভাব হলো। সেই হুড়কো নড়া, পিসেমশাইযের ছুটে গিয়ে ধস্তাধস্তি, নিস্তব্ধতার মাঝখানে সাধুবাবার 'বোম্ বোম্' চিৎকার। বড় কাকাবাবু সব ভালো করে দেখলেন। তিনি বরাবরই সাহসী মানুষ, ভূতপ্রেতকে মনে করেন বুজরুকি। তিনি হুড়কো খুলে নিজে যেতে চাইলেন রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু পিসিমার মিনতিতে নিরস্ত হলেন।

বড় কাকাবাবু দেখলেন সবাই ব্যতিব্যস্ত,কেবল তাঁর ভাগনে শ্রীমান বেণুলাল কোন কথাটি না বলে নিজের ঘরে শুয়ে আছে। তিনি 'বেণু বেণু' বলে ডাকলেন, কিন্তু পিসিমা বললেন, ওকে ডাকিস না, বড় ঘুমকাতুরে। আর ভূতের ভয় ভীষণ। কেন মিছিমিছি বেচারাকে কষ্ট দেওয়া।

বড় কাকাবাবু কী যেন আন্দাজ করলেন, পরের রাত্তিরে তিনি বললেন, বেণুর সঙ্গে এক বিছানায় আমি শোব। রাঙাদা খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু বড়কাকাবাবুর তিন ধমকে রাজি হতে হল।

দু'জনে একসঙ্গে শুলেন, তবু যে কে সেই। আবার একইভাবে হুড়কোর হামলা। তবে সেই রাত্তিরে টিনের চালে ঢিল পড়ল না।

বড় কাকাবাবু একটু চিন্তিত হলেন। তাহলে? ব্যাপারটা কী? তাঁর সন্দেহ কি ঠিক নয়? সাধুবাবার ওপর কড়া নজর রাখলেন এবং রান্নাঘর, দরমার বেড়া, হুড়কো, রাঙাদার ঘর, তার ঘরের বেড়া ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। পিসিমা এসব দেখে একটু বিরক্ত হলেন, কিন্তু ছোটভাইকে কড়া কিছু বলতেও পারলেন না।

ওদিকে বড় কাকাবাবু রাঙাদাকে বললেন, চল আমার সঙ্গে শিলচরে। কয়েকদিন থেকে আসবি।

বাঙাদা কিছুতেই রাজি না। বলেন, 'অনেক কাজ আছে মামাবাবু, পবে যাব'খন।'

বড় কাকাবাবু আর কিছু বললেন না, শুধু রাত্রে বাঙাদার সঙ্গে এক বিছানাতেই শুতে গেলেন। আগেব দিনের চেয়ে একটু তফাৎ করলেন। রাঙাদাকে অন্যপাশে দিয়ে নিজে শুলেন দরজার বেড়ার দিকটায়। তক্তপোষটা বেড়ার গা ঘেষেই। ওপাশে রান্নাঘর এবং তিন চার হাত দূরে অন্য শোবার ঘরে যাওয়ার জন্যে বান্নাঘরেব সেই দবজা।

বড় কাকাবাবু লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঠায় বসে রইলেন বিছানায়। কডা নজর রাঙাদার দিকে। মাঝবাত্তিব আসে। ও ঘরে পিসিমা পিসেমশাই ও গাঁয়ের দু'চার জন লোক বসে। কিন্তু আশ্চর্য, হুডকো নডল না। আরও অপেক্ষা। তবু নড়াচড়া নেই। সবাই কেমন হতাশ হয়ে গেলেন। একটু বাদে গাঁয়ের লোকেরা চলে গেলেন যে যার বাড়ি। পিসিমা পিসেমশাই বসে বইলেন হুড়কোব দিকে তাকিয়ে। যদি নড়ে।

নডলো না। এবং রাতও পুইযে আকাশ ফর্সা হলো। বড় কাকাবাবু বাঙাদাব কান ধবে টেনে এনে হাজিব করলেন পিসিমা পিসেমশাইয়ের কাছে, তাবপর দুই গালে বড দুই চড।

সবাই হতভম্ব। রাঙাদা ভেউভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। বড় কাকাবাবু তাঁকে তখনও ধমকে চলেছেন।

আরও অবাক কাণ্ড। পিসিমা পিসেমশাইকে রান্নাঘরে নিয়ে দেখালেন, হুড়কোব সঙ্গে বাঁধা একটা শক্ত কালো গুলি সুতো। সেই সুতো দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাঙাদার বিছানার পাশে এক খুঁটিতে বাঁধা।

বড় কাকাবাবু বললেন, 'এবার বুঝলে তো দিদি, ভূতটা কে? তোমার গুণধর পুত্র। আমি তো বলি, সারা বাড়ি তোলপাড় আর বেণু কী করে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তোমরা যখন ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকো, তখন সে শুয়ে শুয়ে ওই কালো সুতো ধবে টান মারে। মারলেই হুড়কো নড়ে। বুড়ো বাপ ওর গায়ের জোরের সঙ্গে পারবে কেন? তোমরা তো বিশ্বাস করাব জন্য বসেই আছ, আর ওই পাজিটা শুয়ে শুয়ে তোমাদেব নাকাল করছে। আর

তোমরা যখন হুড়কো টানাটানিতে ব্যস্ত তখন একবার অন্ধকারে বাইরে গিয়ে চালে ঢিল, মেরে আবার এসে শুয়ে পড়ে এবং আবার ওর সুতোর কেরদানি দেখায়। দেখো, আজ রাত থেকে আর কিছু হবে না। এই দেখো সেই সুতো। যত বদ বুদ্ধি সব মাথায়। কোথায় গেল সেই হতভাগা।

হতভাগা ততক্ষণে বাড়িতে নেই। ছুটে বাইরে। বড় কাকাবাবু সকালের ট্রেনেই শিলচরে ফিরে গেলেন। রাঙাদা হেলতে দুলতে তারপর বাড়ি এলেন মুখের ভাবখানা এমনই যেন কিছুই হয়নি।

তবে সত্যি সত্যিই সেদিন রাত থেকে মেজ পিসিমার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব থেমে গেল। মেজ পিসিমা বললেন, ভূপেন্দ্র বললো বটে, সুতোটাও দেখাল, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না, আমার বেণুলাল এইসব করেছে।

সাধুবাবা বললেন, অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কথা? বিশ্বেস রাখতে নেই। নন্দীভৃঙ্গীই এসেছিল। না, আর এখানে নয়, কালই কৈলাসে ফিরে যেতে হবে দেখছি।

কোন কথা বললেন না শুধু পিসেমশাই। বহুদিন পব তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও পারলেন।

ভূত নেই, ভূত আছে

প্রফুল্ল রায়

বাজু একসঙ্গে মাথা আর হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'না দাদাই, ভূত-টুত বলে কিস্‌সু নেই! স্রেফ গাঁজা।

বাজুর বন্ধু বিট্টুও ঠোঁট উল্টে দিয়ে বলে, 'একদম বোগাস।'

ফি বছর বাজু পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি আসে। পুরো ছুটিটা কাটিয়ে একেবারে ভাইফোঁটার পর নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়।

বাজুর অবশ্য আপন মামা নেই। তবে মাসি আছে, দাদাই আছেন, দিদন আছেন। বেড়িয়ে, গল্প করে, মজার মজার বই পড়ে ছুটিটা তোফা কেটে যায়।

এ বছর বাজুর সঙ্গে এসেছে তার প্রাণের বন্ধু বিট্টু। দু'জনের গলায় গলায় ভাব। একই স্কুলে তারা ক্লাস ফোরে পড়ে। দু'জনেরই বয়স দশ।

দুই বন্ধুই লেখাপড়ায় দারুণ। হাফ ইয়ারলিতে বাজু ফার্স্ট হলে, অ্যানুয়েলে বিট্টু। দু'জনেরই দারুণ বুদ্ধি আর সাহস।

বাজু মামাবাড়িতে এলে সন্ধের পর রোজ ছাদে আলো নিভিয়ে শতরঞ্জিতে আরাম করে বসে গল্পের আসর জমানো হয়। গল্প বলেন অবশ্য দাদাই অর্থাৎ দাদামশাই। মামাবাড়িতে অজস্র বই, আট দশটা আলমাবি একেবারে বোঝাই। তবু প্রতি মাসেই দাদাই প্রচুর বই কেনেন। কত রকমের বই তার ঠিক নেই। দেশবিদেশের ইতিহাস, সায়েন্স ফিকশান, কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই সব বইয়ের প্রতিটি পাতা দাদাইয়ের মুখস্ত। ছুটিতে বাজু মামাবাড়ি এলে তিনি তাকে এই বইগুলোর গল্প শোনান।

গল্পের আসরে শ্রোতা শুধু একা বাজুই নয়—মাসি, দিদন এবং মামাবাড়ির চাবপাশে যাবা থাকে যেমন বুম্বা, পাপাই, বুবলা—এরাও। বুম্বাদের সঙ্গেও খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে বাজুর। দিন তিনেক আগে এবার পুজোর ছুটি পড়েছে আর আজই দুপুরে বাজু বিট্টুকে সঙ্গে করে মামাবাড়ি চলে এসেছে। বাজুর মা-ই তাদের পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

দিনের বেলাটা হৈ হৈ করে কাটিযে এখন এই সন্ধেবেলায ছাদে গল্পের আসর বসিয়েছে বাজুরা। এতদিন যারা গল্প শুনে আসছিল বিট্টু আসায় এবাব তাদেব সংখ্যাটি বেড়েছে।

এবাব মামাবাড়িতে পা দিয়েই বাজু খবর পেয়েছে, ইদানীং কিছুদিন ধরে দাদাইকে ভূতে পেযেছে, ইংবেজি আব বাংলায় ভূতপ্রেত নিযে যত বই বেরিয়েছে, সবই কিনে ফেলেছেন। এগুলো রাখাব জন্য নতুন আলমারিও করতে হযেছে।

কাজেই দাদাইয়ের গল্পে ভূত যে এসে পডবে তাতে আব আশ্চর্য কী। বেশ জমিয়ে খাস বিলেতেব এক ঢ্যাঙা সাহেব ভূতেব কীর্তিকলাপ যখন তিনি বলতে শুরু করেছেন সেই সময বাজু আর বিট্টু প্রবল চেঁচামেচি জুড়ে দেয়।

তাদেব দেখাদেখি শিয়ালের পালেব মতো পাপাইবা কোরাসে বলে ওঠে, বাজে, বাজে, বাজে। আমবা ভূত বিশ্বাস কবি না।'

দাদাই চোখ কুঁচকে সবাইকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করেন, 'কব না তো?

'না, না, না।'

'কেন কব না?'

'আমবা কেউ ভূত দেখিনি, তাই।'

দাদাই কী একটু ভাবেন। তারপর বলেন, 'যদি তোমাদের ভূত দেখিয়ে দিতে পাবি, তাহলে কববে?'

সবাই গলা মিলিয়ে বলে, 'করব, করব।'

এদের মধ্যে বাজু এবং বিট্টুর উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। তারা বলে, 'কবে দেখাবে? কখন দেখাবে?' তাদেব আব তর সইছে না যেন।

দাদাই বলেন, দু-একদিনেব ভেতব দেখতে পাবে।'

'দিনেব বেলা, না রাত্তিরে?'

'রাত্তিরে।'

'কোথায় দেখাবে?'

দাদাইদের বাড়ির পেছনে অনেকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠটা ঝোপঝাড় আগাছায় ভর্তি। তারপর রেললাইন চলে গেছে। আর রেললাইনের ধারে একটা প্রকাণ্ড পুরনো ভাঙাচোরা জমিদার বাড়ি কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটায় লোকজন থাকে না, আলোটালো নেই। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ওটাকে ভুতুড়ে দেখায়। বাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দাদাই বললেন 'ঐ বাড়িটায় রাত বারোটায় সময় দোতলার দক্ষিণের শেষ ঘরটায় পরশু যদি যাও, ভূত দেখতে পাবে।' তারপর ক্ষুদে শ্রোতাদের দিকে ফিরে পরপর সবাইকে দেখতে দেখতে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে কে যেতে চাও, বল।'

পাপাই, বুম্বা আর বুবলার মুখ চুপসে গেছে।

তাদের বুকের ভিতরটা ভীষণ টিব টিব করছিল।

বুম্বা ঢোক গিলে বলে, 'আমাদের বাড়ির গেটে রাত দশটায় তালা লাগানো হয়। আমি যে বেরুতে পারব না।'

পাপাই বলে, 'কাল সকালে চন্দননগরে পিসির বাড়ি যাচ্ছি। ফিরব চারিদিন বাদে। পরশু ভূত দেখতে যাব কী করে?'

বুবলা বলে, 'ন'টা বাজলেই আমার ঘুম পেয়ে যায়। বারোটা পর্যন্ত আমি বাবা জেগে থাকতে পারব না।'

মুচকি হেসে দাদাই বলেন, 'বুঝেছি তোমরা কেমন বীরপুরুষ'। তারপর বাজুদের জিজ্ঞেস করেন, 'কী, তোমরাও বুবলাদের দলে নাকি?'

বাজু এবং বিট্টু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বুক ফুলিয়ে মোটা গলায় বলে, 'নেভার।'

নিতান্ত ভালোমানুষের মতো দাদাই জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে তোমরা পরশু রাতে ওখানে যাচ্ছ?'

বাজু বলে, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু—'

'কী?

'পরশু রাত বারোটায় ওখানে গেলে ভূত দেখতে পাব, কী করে জানলে?'

'আমি জানি, পরশু হলো বুধবার। প্রতি বুধবার রাত বারোটায় ওখানে গেলে তাকে দেখা যায়'।

বিট্টু বলে, 'তুমি দেখেছ দাদাই?'

দাদাই বলেন, 'নিশ্চয়ই। না হলে তোমাদের অত জোর দিয়ে বলছি কী করে?'

বাজু আর বিট্টু এবার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে গাদা গাদা প্রশ্ন করে যায়। তাকে দেখতে কেমন? কথা-টথা বলেছে কিনা? বললে কী বলেছে? ইত্যাদি।

দাদাই বলেন, 'আমি কিছু বলব না। সাহস থাকলে নিজেরা গিয়ে দেখবে।'

'ঠিক আছে। আমরা পরশু যাচ্ছি।'

দিদন কিন্তু খুব রেগে যান। দাদাইকে বলেন, 'কেন বাচ্চা দুটোকে ঐ হানাবাড়িতে পাঠাচ্ছ? শেষে ভয়টয় পেয়ে যদি কিছু হয়ে যায়?'

বাজু আর বিট্টুর ওপর দাদাইয়ের দারুণ বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'ওরা ভয় পাবার ছেলে নয়। তুমি ভেবো না। দু'জনে ঠিক পরশু রাত বারোটায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারবে।'

দিদনের দুশ্চিন্তা কাটে না। তিনি বলতে থাকেন, 'কী যে তোমার অলুক্ষুণে কাণ্ড বুঝতে পারি না। এই বাচ্চাদের কেউ অমন করে উসকে দেয়!'

দিদন এবং মাসির ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও বুধবার রাত বারোটায় মাঠ পেরিয়ে দুই বন্ধু পোড়ো জমিদার বাড়িতে চলে আসে। তাদের দু'জনের হাতে রয়েছে বড় টর্চ আর লাঠি। পিঠে বাঁধা আছে এয়ারগান।

বাড়িটার সামনে বাজুরা থমকে যায়। কেউ কোথাও নেই, চারিদিক একেবারে সুনসান। এধারে ওধারে ঝিঁঝিরা একটানা ডেকে চলেছে।

অনেক দূরে, রেললাইনের ওপারে কোথায় যেন মিহি, মোটা, নানা সুরে ঝাঁকে ঝাঁকে কুকুর ডেকে ওঠে। এছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

এ লাইনে লাস্ট ট্রেন চলে যায় পৌনে বারোটায়। তারপর এদিকটা একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে।

সব দেখেশুনে বিট্টু একটু দমে যায়। বলে, 'কি রে বাজু, ভেতরে যাবি?'

বাজু বলে, 'নিশ্চয়ই। এই পর্যন্ত এসে যদি ফিরে যাই, দাদাই ঠাট্টা করে করে আমাদেব জ্বালিয়ে মারবে।' বলে টর্চ জ্বালে।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দশ বারো ফিট দূবে ভাঙা লোহার গেট। সেটার একটা পাল্লা নেই, অন্য পাল্লাটাও ভেঙে হেলে পড়েছে। গেটটাকে ঘিরে প্রচুর বুনো ঘাস আর কাঁটার ঝাড়।

বাজু বলে, 'চল, ভেতরে ঢুকি।'

টর্চ জ্বেলে রেখেই দু'জনে ঘাস এবং ঝোপঝাড় ঠেলে বাড়ির ভেতরে চলে আসে।

গেটের পর মস্ত বাঁধানো চাতাল। তারপর দশ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে মোটা মোটা থামের ভেতর টানা বারান্দা। থামে এবং বারান্দায় ফাটল ধরে ভেতরের ইট বেরিযে পড়েছে। ফাঁকে ফাঁকে বট অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠেছে।

দোতলায় উঠে দক্ষিণের শেষ ঘরখানায় যেতে হবে বাজুদের। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিঁড়িটা বের করে তারা ওপরে উঠতে থাকে। হঠাৎ নাকে ভক করে একটা বোঁটকা দুর্গন্ধ এসে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ফর ফর করে অগুণতি চামচিকে মাথার ওপর উড়তে থাকে। এদের দু-একটা আবার বাজু এবং বিট্টুর নাকে মুখে নখের আঁচড় বসিয়ে যায়।

দু'হাতে লাঠি আর টর্চ ঘোরাতে ঘোরাতে চামচিকেদের আক্রমণ ঠেকিয়ে কোনোরকমে দোতলায় উঠে আসে বাজু আর বিট্টু। চারপাশে আলো ফেলে ফেলে দক্ষিণ দিকটা ঠিক

করে নেয়। টানা একটা বারান্দা সোজা ওদিকে চলে গেছে, যার শেষ মাথার ঘরটায় যাবার কথা বলে দিয়েছেন দাদাই।

বাজুরা পা বাড়াতে যাবে, কোথায় কোন অদৃশ্য ঘুলঘুলির ভেতর থেকে আওয়াজ ওঠে, 'তক্‌খো-তক্‌খো-' অর্থাৎ তক্ষক ডাকছে।

তক্ষকটাকে ভেংচি কেটে বাঁ পাশের সিলিংয়ের কোন থেকে কারা যেন ভারী গম্ভীর গলায় হুমকে ওঠে, 'ভুতুম-ভুতুম-ভুতুম-'

অমন যে দুর্জয়ী সাহসী বাজু, তার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ছমছম করে ওঠে। হাত-পা তার ভীষণ কাঁপছে। আরেকটু হলে তার হাত থেকে টর্চ আর লাঠি খসে পড়ত। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নেয় সে।

বিট্টুর বুকটাও গুরগুর করছিল। বাজুর গা ঘেষে দাঁড়িয়ে সে কাঁপা গলায় বলে, 'কী ব্যাপার রে?'

বাজু বলে, 'দাঁড়া, দেখছি।'

সীলিংয়ের যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে, আন্দাজ করে মুখ তুলে সেখানে তাকায় বাজু। আর তখনই দেখতে পায় চারজোড়া জ্বলন্ত চোখ সেখানে স্থির হয়ে আছে। বিট্টু 'বাবা গো' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে বসে পড়ে। বাজুও পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে পডতে সেই চোখগুলোর ওপর টর্চের আলো ফেলে। তখনই দেখা যায়, সীলিংয়ে লোহার বীমেব ওপর সারি সারি চাবটে পেঁচা বসে আছে।

বাজু হাত ধরে বন্ধুকে টেনে তুলতে তুলতে বলে, 'ভয় নেই বিট্টু, ওগুলো পেঁচা রে। ওঠ।'

বিট্টু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। পেঁচাগুলোকে দেখে তার ভয় অনেকটা কেটে যায়। বলে, 'আর দাঁড়াস না। চল—'

পা টিপে টিপে বারান্দা ধরে দুই বন্ধু এগিয়ে যায়। তাদের বাঁ পাশে সারি সারি ঘর। বেশিরভাগ ঘরেরই দরজা-জানালা লোপাট হয়ে গেছে। বিরাট বিরাট ফোকরগুলো দিয়ে বাইরের ঝাপসা আলো ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সেদিকে তাকালে মনে হয়, কারা যেন ঘরগুলোর মধ্যে ওত পেতে বসে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তারা ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত দক্ষিণের শেষ ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ায় বাজুরা। এ ঘরের দরজার পাল্লা নেই, তবে জানালাগুলো আস্তই আছে।

বিট্টু ফিসফিসিয়ে বলে, 'কি রে, ভেতরে ঢুকবি?'

বাজু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ঘরের ভেতর থেকে খোনা গলায় কেউ বলে ওঠে, 'ঢুঁকবে বৈঁকি, অ্যাঁদ্দুর এঁসে নাঁ ঢুঁকলে চঁলে? এঁসো, এঁসো, তোঁমাদের সঙ্গে এঁকটু গঁল্প-টঁল্প কঁরি।'

দুই বন্ধুর হৃৎপিণ্ড বলের মতো লাফাতে থাকে, তারা কী করবে, ভেবে পায় না।

ঘর থেকে সেই গলাটা আবার ভেসে আসে, 'কী হঁলো, দাঁড়িয়ে রঁইলে কেঁন? তোঁমাদের তোঁ দাঁরুণ সাঁহস। চঁলে এঁসো। আঁমি দেঁখতে পাঁচ্ছি, তোঁমাদের সঁঙ্গে টর্চ, লাঁঠি আঁর এঁয়ারগাঁন রঁয়েছে। ওঁগুলো বাঁইরে রেঁখে এঁসো।

অন্ধকারে দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর 'দেখাই যাক না, কী হয়'—এমন একখানা ভাব করে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ে।

বাইরের থেকে ঘরের ভেতরটা অনেক বেশি অন্ধকার। একটা দেওয়ালের কাছে সেই অন্ধকারে যেন আরো জমাট বেঁধে আছে। মনে হয় লম্বা কালো কোট পরে বেজায় ঢ্যাঙা কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে। কম করে সে আট ন' ফিট লম্বা তো হবেই, মাথা প্রায় সীলিংয়ে গিয়ে ঠেকেছে। সেটার গায়ে দুটো জ্বলন্ত চোখ আটকানো। আর যা চোখে পড়ে তা হলো দশ বারো ইঞ্চি মাপের বিরাট বিরাট ধবধবে ক'টা দাঁত।

দাঁত এবং চোখ দেখে দুই বন্ধুর দাঁতকপাটি লেগে যাবার অবস্থা। তাদের গলার ভেতর থেকে 'আঁক' করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

সেই গলাটা আবার শোনা যায়, 'কী নাঁম তোঁমাদের?'

ম্যালেরিয়া হলে যেমন হয়, ভয়ে তেমনি ঠকঠক করে কাঁপছিল বাজুরা। তারই মধ্যে কোনোরকমে দু'জনে নাম বলে।

'তোঁমরা কোঁথায় থাঁকো?'

বাজু বলে, 'সেলিমপুরে।' বিট্টু বলে, 'ট্রাঙ্গুলার পার্কেব কাছে।'

'এখানে কোঁথায় এসেছিলে?'

কোথায় এসেছে, বাজুরা জানায়।

'ওঁ মাঁমাবাঁড়িতে বেঁড়াতে এঁসেছ?

'হ্যাঁ।'

'রাঁত দুঁ পুরে এঁই হাঁনাবাঁড়িতে ঢুঁকেছিলে কেঁন?'

'এই—মানে, মানে—'

'বুঁঝতে পেঁরেছি। ভূঁত দেঁখতে এঁসেছ।

তোঁমাদের মঁতো সাঁহসী ছেঁলে আঁর দেঁখিনিঁ। আঁলাপ কঁরে ভাঁরী খুঁশি হঁলাম।

কাঁপতে কাঁপতে বাজুরা বলে 'আমরাও।'

সেই গলাটি শোনা যায়, 'তোঁমাদের সাঁহসের জঁন্যে কিঁছু উঁপহার দিঁচ্ছি। এঁই নাঁও।

দুটো বেজায় লম্বা কালো হাত বাজু আর বিটুর দিকে এগিয়ে আসে। সেই হাতে কাজু বাদামের প্যাকেট, বড়-চকোলেট বার ইত্যাদি রয়েছে।

বাজুরা নেবে কি নেবে না যখন ভাবছে, সেই সময় গলাটা ফের কানে আসে, 'নাঁও, নাঁও—

কাঁপতে কাঁপতে বাজু আর বিট্টু কাজু বাদাম আর চকোলেট তুলে নিয়ে বলে 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'থ্যাঙ্কস তোঁ আঁমার দেঁবার কঁথা। আঁচ্ছা, এঁবার তোঁমরা বাঁড়ি যাঁও। নঁইলে দাঁদাই দিঁদন আঁর মাঁসি ভাঁববে।

পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজুরা আবার সেই ফাঁকা নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে ফিরে আসে।

মাসি আর দিদন গেটের কাছে দুটো জোরালো আলো জ্বেলে বসেছিলেন। বাজুদের দেখে দৌড়ে আসেন। দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বলেন, 'তোদের জন্যে ভেবে ভেবে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিছু হয়নি তো তোদের?'

বাজু এবং বিট্টু একসঙ্গে জানায়, 'কী আবার হবে?'

মাসি বলে, 'ভয়-টয় পাসনি তো?'

ভয় যে যথেষ্টই পেয়েছে তা কি আর বাজুরা স্বীকার করে? তারা বলে, 'কিসের ভয়? ধুস—'

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল মাসির। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখলি ওখানে?'

দিদন চান না পোড়ো বাড়ির ব্যাপারে আজ কোনো কথা হোক। তিনি মাসিকে বলেন, 'যা শোনার কাল শুনিস। রাত দেড়টা বাজে। ওদের ঘুমনো দরকার। আর বিট্টু, আয় বাজু—' দুজনকে তাদের ঘরে নিয়ে যান তিনি।

ওরা যখন হাত পা-ধুয়ে জামা প্যান্ট পাল্টে শুয়ে পড়েছে আর দিদন ওদের মশারি গুঁজে দিচ্ছেন সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে দাদাই এসে হাজির। তিনি বলেন, 'কি বাজুদাদা, বিট্টুদাদা— মোলাকাত হলো?'

দুই বন্ধু বলে, 'তা হয়েছে। আমরা ভালো ভালো প্রেজেন্টও পেয়েছি, কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কোন খটকা লাগছে?'

'হুঁ।'

'কী?'

একটু চিন্তা করে বাজু বলে, 'কাল বলব।'

'ও. কে.। কালই শুনব। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

দাদাই দিদন আর মাসিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ভোরবেলা, তখনও রোদ ওঠেনি, আকাশটা আবছা মতো, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় বাজুর। রাত্তিরে ভালো করে ঘুমোতে পারেনি সে। বার বার পোড়ো বাড়ির ঘটনাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। পোড়ো বাড়িতে তারা যা দেখেছে তার মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে. গোলমালটা কী ধরনের সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দুই বন্ধু একটা প্রকাণ্ড খাটে পাশাপাশি শুয়েছিল। আস্তে আস্তে বাজু বাঁদিকে কাত

হতেই দেখতে পায় বিট্টু মশারির চালের দিকে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে আছে। সে ডাকে, 'এই—'

বিট্টু সাড়া দেয়, 'কী বলছিস?'

তক্ষুণি উত্তর দেয় না বাজু। কী যেন ভেবে কিছুক্ষণ বাদে বলে, 'আচ্ছা, ভূতেরা তো শুনেছি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে খালি ভয় দেখায়।'

'হুঁ।'

'কিন্তু কাল রাত্তিরে কী হলো? আমাদের সঙ্গে ভালো ভালো কথা বলল, কাজু চকোলেট দিল। জানিস, আমার কিরকম যেন মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি, খালি এইসব কথা ভেবেছি।'

'খানিকক্ষণ চুপচাপ।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কিছু চিন্তা করে বাজু। তারপর বলে, 'এক কাজ করি চল—'

বিট্টু বলে, 'কী রে?'

'কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি এখন একবার ঐ পোড়ো বাড়িটায় যাই চল। আমার মনে হয কোনো একটা ক্লু-টু পেযে যাব।'

দুই বন্ধু অজস্র ডিটেকটিভ গল্প পড়েছে। তাদের ধারণা, শার্লক হোমস, কিরীটী রায়, ফেলুদাব মতো তারাও একেকটি দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা। পোড়ো বাড়ির ভূতটিকে মেনে নিতে তাদের আটকাচ্ছে। নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো রহস্য আছে।

'আমিও তাই ভাবছিলাম। চল, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি।' বিট্টু প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে।

মামাবাড়িতে এখনও কেউ ওঠেনি। বিট্টু আর বাজু নিঃশব্দে গেট খুলে বেরিয়ে পড়ে। পোড়ো বাড়ির দোতলায় সেই ঘরটিতে এসে দেখতে পায়, দেওয়ালের কাছে যেখানে কাল দুটো জ্বলন্ত চোখ আর লম্বা লম্বা সাদা দাঁত দেখেছিল সেখানে অনেকগুলো ইট থাকে থাকে সাজিয়ে উঁচু বেদির মতো করা হয়েছে। তার ওপর কালো কাপড়ের বিরাট এক আলখাল্লা পড়ে আছে। সেটা তুলে ধরতে দেখা যায়, দু'জায়গায় গোল করে কী যেন লাগানো বয়েছে। আবছা অন্ধকারে সে দুটো যেন জ্বলছে।

বাজু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলে, 'ফসফরাস। কাল রাত্তিরে এই দেখে মনে হয়েছিল ভূতের চোখ।'

এদিকে বিট্টু সাদা শোলার তৈরি দাঁতের পাটি আবিষ্কার করে ফেলে। বলে, 'এই দ্যাখ, ভূতের দাঁত। কাল এগুলো চোখের নিচে আটকে আমাদের ভয় দেখানো হয়েছিল।'

'হ্যাঁ।' বাজু বলে, 'দ্যাখ তো আর কিছু ক্লু পাওয়া যায় কিনা।'

খোঁজাখুঁজি করতে করতে দুই বন্ধুর চোখে পড়ে ঘরের মেঝের ধূলোতে তাদের জুতোর ছাপ ছাড়াও বড় কেডসের দাগ পড়ে আছে।

দাগগুলোর পাশে বসে দুই বন্ধু অনেকক্ষণ ঝুঁকে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ উঠে

দাঁড়িয়ে ভীষণ ব্যস্তভাবে বাজু বলে, 'তুই এখানে থাক, আমি দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি।' বলে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে যায়।

দশ মিনিটও লাগে না, তার অনেক আগেই একজোড়া কেডস নিয়ে ফিরে আসে বাজু। তারপর পুরনো দাগগুলোর পাশে কেডস রেখে চাপ দিতেই নতুন দাগ হয়ে যায়। আগের দাগ আর এই দাগ হুবহু এক। অর্থাৎ বাজু যে কেডস নিয়ে এসেছে সেটা পরে কাল কেউ এখানে এসেছিল।

বাজু দাগগুলো দেখিয়ে বলে, 'বুঝতে পারছিস তো?'

বিট্টু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'হুঁ।'

'চল, এবার ফেরা যাক।'

কালো আলখাল্লা, দাঁত, কেডস ইত্যাদি নিয়ে যখন বাজুরা মামাবাড়িতে ফিরে আসে, দাদাই আর দিদন সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। মাসিকে অবশ্য দেখা যায় না। সে একেবারে লেট লতিফ, সাড়ে আটটার আগে কোনোদিনই তার ঘুম ভাঙে না।

বাজুদের দেখে অবাক হয়ে যান দাদাই আর দিদন। দাদাই বলেন, 'এ কী, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?'

বিট্টু বলে, 'ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল, তাই ভাবলাম ঐ পোড়ো বাড়িটায় একবার ঘুরে আসি।'

দাদাই চমকে ওঠেন,' গিয়েছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ, গেলাম। ভাবলাম দেখি যদি কালকের সেই মক্কেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

'কী সর্বনাশ।'

বাজু বলে, 'দেখা হলো না। তবে তার জার্সিটা নিয়ে এসেছি।' বলে সেই আলখাল্লাটা এবং দাঁতগুলো তুলে ধরে।

তারপর সেগুলো নামিয়ে রেখে সেই কেডস দুটো দেখিয়ে বলে, 'পোড়ো বাড়ির এ ঘরটার ধুলোর ওপর এগুলোর অনেক ছাপ রয়েছে।' চোখের কোণ দিয়ে দাদাইকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এই কেডস দুটো তোমার। এ দুটো পরে তুমি বিকেলে লেকের দিকে বেড়াতে যাও না?'

ঢোক গিলেই দাদাই বলেন, 'হ্যাঁ, আমারই তো। কিন্তু—'

'আমরা কোত্থেকে নিয়ে এলাম, জানতে চাইছ কি?'

'হ্যাঁ'।

'ছাপের সঙ্গে মেলাবার জন্যে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বাজু বলতে থাকে, 'দিস ইজ ব্যাড দাদাই। আমাদের বিশ্বাস করাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ভূত সাজতে হলো!'

দিদন হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে দাদাইকে বলেন, 'ছি ছি, এ কী করেছ তুমি! যদি কিছু একটা হয়ে যেত! তোমার কি আক্কেল নেই!'

দাদাই কাঁচুমাচু মুখে বলেন, 'ওদের সাহস কতখানি সেটাই পরখ করছিলাম। ওখানে গিয়ে তো ক্ষতি হয়নি, কাজু বাদাম পেয়েছে, চকোবার পেয়েছে।'

বাজু বলে, 'ভূত যে আছে, তা কিন্তু প্রমাণ করতে পারনি দাদাই। আমাদের স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছ।'

দাদাই বলেন, 'তা হয়তো দিয়েছি। কিন্তু একটা কথার জবাব দাও তো দাদারা—'

'কী?'

'কাল জ্বলন্ত চোখ আর লম্বা লম্বা দাঁত দেখে তোমরা ভয় পাওনি?'

বাজু, বিট্টু দু'জনেই হকচকিয়ে যায়। বলে, 'মিথ্যে কথা বলব না, সত্যি ভয় পেয়েছিলাম।'

দাদাই এবার হেসে হেসে বলেন, 'ভূত-টুত নেই, আবার আছেও। কোথায় আছে জানো? আমাদের মনের ভেতর। ভয় পেলেই সে তোমাকে চেপে ধরবে, যেমন কাল ধরেছিল। ভয় না পেলে তোমাদের একশ' মাইলের ভেতর সে ঘেঁষবে না।'

তেত্রিশ নাম্বার ঘর

দিব্যেন্দু পালিত

ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। আশেপাশে সামনে পিছনে জ্যান্ত মানুষজন নিয়েই এতো ব্যস্ত ও কখনো বা বিব্রত থাকতে হয় যে বুঝতেই পারি না দিনের চব্বিশটা ঘণ্টা কেটে যায় কীভাবে। এর ফলে ক্লান্তও থাকতে হয় এবং দয়া করে ঈর্ষা করবেন না আমাকে, বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি কম বেশি, তিন মিনিট সতেরো সেকেণ্ডের মধ্যে। এইভাবেই চলছে বছরের পর বছর। তবে রোজই কি আর এরকম হয়! মাঝে মাঝে অফিসের কাজে এখানে ওখানে গেলে হোটেলের বিছানায় শুয়ে দেখেছি চট করে ঘুম আসে না চোখে। হয় বেশি ঝরঝরে লাগে, না হয় ক্লান্ত। তবে দুটোর ফলই এক। ঘুম ডেকে আনার জন্যে সত্যিই সাধ্যসাধনা করতে হয় তখন।

এ হেন ব্যক্তির পক্ষে ভূতের সান্নিধ্য লাভ সত্যিই কঠিন। ভূতে বিশ্বাস করাও। তবে ভূতে বিশ্বাস না করলেও ভূত নিয়ে গল্প আমি কম শুনিনি বা পড়িনি। ছোটবেলায়, স্কুলে আমাদের সহপাঠী গোবিন্দর নতুন বউদিকে যে ভূতে পেয়েছিল এবং সেই ভূত ছাড়াতে

ওঝা ডাকতে হয়েছিল। এবং তারপর ভূত নামাবার কয়েকমাসের মধ্যেই একটি ফুটফুটে বাচ্চা হলো নতুন বউদির এবং আড়ালে অনেকেই সেই শিশুটিকে ভূতের বাচ্চা বলে ডাকত, সে-গল্প তো করেছি আপনাদের কাছে! আর একবার, দুষ্টুমি করে কবরের গায়ে হিসি করতে গিয়ে মাঝপথে হিসি আটকে যায় আমাদের কলেজ টীমের রেগুলার হাফব্যাক নিতাই দত্তর— তাকে নিয়ে বিস্তর ঝামেলায় পড়তে হয় সকলকে এবং দেড়দিন পরে ক্যাথেটিয়ার দিয়ে হিসি করানোর পরে ডাক্তার বলেছিল, ভূতেরও অপমানবোধ থাকে— এবার থেকে হিসি করার সময় জায়গাটা দেখে নিও। সেই থেকে কবর দেখলেই মুখ শুকিয়ে যেত নিতাইয়ের, প্রণামের ভঙ্গিতে হাতদুটো উঠে যেত কপালে।

এইরকম আরও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা শুধু আমার কেন, আরও অনেকেরই থাকবে। তাছাড়া ভূতে আমার বিশ্বাস নেই বললেই যে ভূতের অস্তিত্ব নেই এ-কথা কে বলবে! যারা ভূত দেখে এবং দেখার বর্ণনা করে, তাদের সকলকেই মিথ্যাবাদী বলে উড়িয়ে দেবার সঙ্গত কারণ নেই কোনো। ভূতবিদ্যা সম্পর্কে একটি বইয়ে পড়েছিলাম ভূত তারাই দেখে যারা ভূতে বিশ্বাস করে। এমনকি এ-কথাও শুনেছি যে ভূতে যাদের বিশ্বাস নেই তারাও ভূত দেখেন, কিন্তু ঘটনাটাকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে এড়িয়ে যেতে চান ভূতের অস্তিত্ব।

ঠিক জানি না, আমিও হয়তো ওই শেষের দলে পড়ি। তা না হলে সে-বছর শীতে দিল্লীতে যা ঘটেছিল তার পরেও ভূতে অবিশ্বাস করব কী করে!

ঘটনাটা খুলেই বলি।

সেদিন দিনটাই বোধহয় ছিল গোলমেলে। কোনো এক রবিবার। পরের দিন সকাল নটায় এক বড়োসড়ো সরকারী আমলার সঙ্গে জরুরী মিটিং। রাতের প্লেনে গেলেই হতো; কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লী যাবার ইভনিং ফ্লাইট প্রায়ই দেরী করে বলে, ভোরের ফ্লাইটেই যাবো ঠিক করেছিলুম। আর কিছু না হোক, তাতে হাতে থাকত পুরো একটি দিন, সময়টা কাজে লাগানো যেত অন্যভাবে— তারপর ধীরেসুস্থে পরের দিন যাওয়া যেত মিটিংয়ে।

কিন্তু, গোড়াতেই হয়ে গেল গণ্ডগোল। ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল ঘড়িতে। ঘুম যখন ভাঙল দেখি সাড়ে পাঁচটা। তার মানে অ্যালার্ম বাজে নি! ডিসেম্বরের ভোর সাড়ে পাঁচটায় অন্ধকার ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে চারদিক— সেটা সান্ত্বনার বিষয় নয় কোনো; ছ'টা পনেরোর ফ্লাইট কাঁটায় কাঁটায় উড়ে যাবে ঠিকই। ফাঁকা রাস্তায় তীব্র গতিতে ট্যাক্সি ছুটলেও আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে কম করেও আধঘণ্টা লাগবে। যাই হোক, এইসব ভাবনা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখলুম যা ভয় পেয়েছিলাম তাই; চেক-ইন কাউণ্টার ফাঁকা। একজন অফিসার বললেন, দশ মিনিট আগে এলেও উপায় ছিল। প্লেন টেক-অফের জন্যে রওনা হয়েগেছে, মিনিট খানেকের মধ্যেই উড়ে যাবে আকাশে।

টিকিটটা যাতে বাতিল হয়ে না যায় এবং সীট পাওয়া যায় সন্ধ্যার ফ্লাইটে, সেই ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরতে হলো অগত্যা। তবু ভাবনা গেল না। আর কিছু নয়, হোটেল বুক করা

আছে সকাল থেকে; অন্তত সেখানে জানিয়ে দেওয়া দরকার বুকিংটা যাতে ক্যানসেল না করে। ছোটোখাটো কোম্পানী আমাদের; দিল্লীতে ব্র্যাঞ্চ নেই কোনো। ওখানকার কাজকর্ম দেখার জন্যে আছে একজন লিয়াঁজ অফিসার সদাশিব রায়! দিন তিনেক আগে কোনো কথা বলার সময় সদাশিব বলেছিল দিল্লীতে এখন হোটেলে জায়গা পাওয়া মুশকিল— একে ট্যুরিস্টদের মরশুম, তার ওপর একই সঙ্গে চলেছে ট্রেড ফেয়ার, কমন-ওয়েল্থ্ কনফারেন্স আর টেস্ট ক্রিকেট। যাই হোক, লোধি এষ্টেটের কাছাকাছি একটা মাঝারি হোটেলে আমার জন্যে রুম বুক করে সদাশিব বলল পালামে আসবে। ফ্লাইট মিস করে ঘণ্টা দেড়েক পরে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শুধুই মনে হতে লাগল, হয়রানি আমার চেয়ে বেশী সদাশিবের— ফ্লাইট ল্যাণ্ড করার সময় হয়ে এলো প্রায়; বেচারা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে এয়ারপোর্টে পৌঁছে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে! তখনই ঠিক করে নিলুম, আরও কিছুক্ষণ পরে, অর্থাৎ সদাশিবকে বাড়িতে ফেরার সময় দিয়ে ট্রাঙ্ককল করব দিল্লীতে। উদ্দেশ্য দুটো। এক, ব্যাপারটা বিস্তারিত জানানো এবং হোটেল বুকিংটা যাতে ক্যানসেল না হয় তা দেখা। অবশ্য ক্যানসেল হলেই যে রাস্তায় ঘুরতে হবে তার কোনো মানে নেই। সদাশিব ওর বাড়িতেই উঠতে বলেছিল। তা ছাড়া দিল্লীতে থাকে আমার এক জ্যেঠতুতো দাদা এবং এক মাসীও; ঠিকানা জানা আছে, তেমন দরকার হলে দুটো জায়গার যে কোনো একটিতে ওঠা যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। তবে কিনা অফিসের কাজে গিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠা আমার ঠিক পোষায় না।

ট্রাঙ্ককল করতে গিয়েই পড়লুম ঝামেলায়। বলেছি না, দিনটাই ছিল গোলমেলে— হঠাৎ একেকটা দিন যেমন হয় আর কী, নিজের ইচ্ছে, পছন্দ ও প্রয়োজন মতো যা করতে যাওয়া হয় তাতেই পড়ে বাগড়া! ঘণ্টা তিনেক ট্রাঙ্ক লাইনে সদাশিবকে পাবার অপেক্ষা করে যখন আবার তাগাদা দিলুম, ওদিক থেকে ট্রাঙ্ক অপারেটর মিষ্ট গলায় জানিয়ে দিল, লাইন পাওয়া যাচ্ছে না— দিল্লীর সমস্ত লাইন ডাউন!

আপনারা যাঁরা ভূতের গল্প মনে করে পড়তে শুরু করেছিলেন এই গল্প, এরই মধ্যে তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছেন এসব ঘটনার সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক কী? যে কোনো সিজনড্ এয়ার ট্র্যাভেলারই এক আধবার ফ্লাইট মিস করার অভিজ্ঞতায় ভুগেছেন— কলকাতার রাস্তার ভয়াবহ জ্যাম যে-কোনো দিনই যে-কারুর সামনে ঘটিয়ে তুলতে পারে এই ধরনের পরিস্থিতি! আর টেলিফোনের লাইন না-পাওয়া নিয়েও এতো হা-হুতাশ করার মানে হয় না কোনো— না পাওয়াটাই বরং অনেক বেশি ন্যাচারাল। এই সব ঘটনার সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক নেই কোনো। কিন্তু আপনাদের অবগতির জন্যে সবিনয়ে নিবেদন করি, সবকিছু জেনেশুনেও ভূতের গল্পে ফ্লাইট মিস করা এবং টেলিফোন না-পাওয়ার প্রসঙ্গ অবতারণার কারণ আছে। অসুবিধে হলো, ভূত সম্পর্কে আমাদের ধৈর্যের অভাব এতোই প্রকট যে ভূত বলার সঙ্গে সঙ্গেই যদি না শুরু হয়ে যায় ভূতের নৃত্য, তাহলেই ধরে নিই ভূতের আবির্ভাবজনিত সমস্ত ভূমিকাই আজগুবি। এটা ঠিক নয়। ধৈর্য্য ধরে এবং একটু

মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোঝবার চেষ্টা করলেই আমরা বুঝতে পারব, ভূতকে অবহেলার চোখে দেখার যুক্তি নেই কোনো। বয়স ও অভিজ্ঞতায় ভূত মানুষের চেয়েও প্রাচীন— কে না জানে, ভূতে পরিণত হবার আগে ভূতকে পেরোতে হয় মানুষের আয়ুষ্কাল। তাহলে ধরেই নেওয়া যেতে পারে মানুষকে মানুষের চেয়ে বেশি চেনে ভূত। তাহলে— এতোদূর প্রাজ্ঞতা অর্জন করার পরও ভূতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মধ্যে আমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। আমার তো ধারণা, এই পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে তার মধ্যে সত্যিই আছে কিংবা ছিল, একটা ভুতুড়ে ব্যাপার।

যাইহোক সেদিন দিনটা ছিল গোলমেলে এবং সেই কারণেই, হাজার চেষ্টাতেও যোগাযোগ করা গেল না সদাশিবের সঙ্গে। ভাবলুম, যা থাকে কপালে, সন্ধ্যের ফ্লাইটে দিল্লী না পৌঁছুলেই নয়। আগামীকালের মিটিংটা খুবই জরুরী। চাকরির স্বার্থে অনেক অসুবিধে ও হতাশাই মেনে নিতে হয়।

দিনটা যে গোলমেলে তার আর একটি প্রমাণও পেয়ে গেলুম। সকালে আমার দেরিতে পৌঁছানোর জন্যে এক মিনিটও অপেক্ষা করেনি ফ্লাইট। কিন্তু সন্ধ্যায়, রিপোর্টিং টাইমের আধঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনলুম, বোম্বের ফ্লাইট আসছে দু ঘণ্টারও বেশি দেরিতে— সেই এয়াবক্র্যাফট'ই কলকাতার যাত্রী নামিয়ে ও তুলে দিল্লী যাবে; সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত আড়াই তিন ঘণ্টার পরে ছাড়বে দিল্লীর ফ্লাইট। হতাশ বোধ করলেও হাল ছাড়লুম না আমি। বুকশপ থেকে নিক কার্টারের একটা সস্তা থ্রিলার কিনে জড় হয়ে বসলুম লাউঞ্জে। তখনই ভাবলুম সদাশিব নিতান্তই বোকা লোক নয়। কাজটা কতো জরুরী বুঝলে এটাও বুঝতে পারবে কোনো কারণে সকালে না এলেই রাত্রে ঠিকই পৌঁছে যাবো। কর্মী লোকেরা চান্‌স ও রিস্‌ক্‌ দুটোই নিতে ভালোবাসে।

অবশেষে সত্যি সত্যিই যখন প্লেন থেকে নামলুম দিল্লীতে, রাত তখন প্রায় দেড়টা। ল্যাণ্ড কবার পরই হোস্টেসের ঘোষণা শুনে বুঝেছিলুম জব্বর শীত পাবো বাইরে। প্লেনের বাইরে আসতেই টের পেলুম শীত কাকে বলে। হঠাৎই যেন কেউ একটা বরফের মুখোশ এঁটে দিল মুখে। অবশ হয়ে আসছে চামড়া, হাত, পা। অবশ্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না তা নয়। গলা-উঁচু পুলওভারটা কানের কাছে টানাটানি কবে যতোটা সম্ভব ঢেকে ফেললুম ঘাড়ের পিছনটা। কনকন কবে উঠল স্যুটকেস-ধরা বাঁ হাতের আঙুলগুলো। এমনিতে ব্যস্ত দিল্লী এয়ারপোর্টে সম্ভবত ঘুমিয়ে ছিল এতোক্ষণ— এই মাত্র এসে পৌঁছুনো কলকাতার যাত্রীদের তাড়াহুড়ো ও খাপছাড়া কথাবার্তার শব্দে জেগে উঠতে না উঠতেই শান্ত হয়ে গেল আবার। এতো রাতে, এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে নির্দিষ্ট খবর না পেয়েও সদাশিব অপেক্ষা করবে আমার জন্যে এমন আশা করি নি। তবু এয়ারপোর্টের বাইরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলুম কিছুক্ষণ। আশেপাশে দাঁড়ানো যাত্রীদের ভিড় কমতে লাগল ক্রমশ। মনঃস্থির করে নিলুম আমি। এত রাতে খবর না দিয়ে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে ধাওয়া করা উচিত হবে না। হোটেলেই যাবো। যতোই ভিড় থাকুক, রাত কাটাবার জায়গা পাবো না এমন হতে

পারে না। একান্তই যদি কোনো কারণে বুকিং ক্যানসেল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হোটেল থেকেই বরং ফোন করা যাবে সদাশিবকে।

এইসব ভেবে স্যুটকেসটা হাতে চেপে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলুম। হোটেলের নাম বলতে মাফলারে কান-মাথা-মুখ ঢাকা বেঁটেখাটো চেহারার ড্রাইভারটি একবাব তাকাল আমার দিকে। তারপর আর কিছু না বলে কুয়াশার ভিতর দিয়ে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল গাড়িটা।

অল্প গা ছমছম করলেও ভয় কেটে গেল যখন মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যেই আমাকে হোটেলের সামনে পৌঁছে দিল ট্যাক্সিওয়ালা! কিছু বাড়তি সমেত ভাড়া মিটাতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো আমার, সকাল থেকে যতোগুলি যাত্রার মধ্যে ছুটোছুটি করতে হযেছে আমাকে তার মধ্যে এই ট্যাক্সি চড়ার ব্যাপারটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। এমনও হতে পারে, ভাবলুম, ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরোবার পরই শুরু হয়ে গেছে আর একটা দিন। গতকালের দিনটি গোলমেলে ছিল বলে আজকের দিনটাও যে একই রকম হবে তার মানে নেই কোনো। বোধ হয় ফাঁড়া কেটে গেল। এখন একটা রুম পেলেই হলো।। একবার ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারলেই বিছানায় ছুঁড়ে দেওয়া নিজেকে। তারপর ঘুম। ঘুম। ঘুম। ভাবতে ভাবতেই শরীর কাঁপিয়ে উঠে এলো লম্বা এক হাই।

সদাশিবের ঠিক-করা হোটেলটা যে মাঝারি ধরনের তা আগেই বলেছি। পাঁচ-তারা হোটেলের রমরমা নেই এখানে। যেটুকু না জ্বাললেই নয় তার বেশি আলো নেই কোথাও। আলো অন্ধকারে নিঃশব্দ পড়ে আছে লবি— একটিও লোক নেই সেখানে। শুধু লম্বা একটি সোফায পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বলে ডেকে ঘুমোচ্ছে একটি লোক। ঢাকা বলেই মুখ চোখ দেখা যায় না কিছু। এইসব দেখতে দেখতেই রিসেপশন কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেলুম আমি।

কাউণ্টারের ভিতর দিয়ে চেয়াবে বসে গল্প করছিল দুটি যুবক। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

'ইয়েস স্যার, হোয়াট ক্যান উই ডু ফর ইউ?'

দু জনের মধ্যে এই যুবকটি লম্বা ও বেশ স্বাস্থ্যবান। অন্যজন বেঁটে ও বোগা— হাতের মুঠোয় আড়াল করে ধরা সিগারেট। গাল ভাঙা ও চোখের নিচে ক্লান্তির ছায়া। এক পলক দুজনকেই দেখে নিয়ে নিজের পবিচয় দিলুম আমি, বললুম 'বুকিং আছে আমার নামে— একটা রুম চাই—'

লম্বা যুবকটি বলল, 'দুঃখিত। কোনো রুম খালি নেই।'

'তা কী করে হবে!' চিন্তিত গলায় বললুম আমি, 'আমার নামে বুকিং কনফার্ম করা আছে!'

'কনফার্ম করা আছে!' যুবকটি অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর কাউণ্টারের পিছনে র‍্যাকের ওপর রাখা বড়ো মাপের একাট বাঁধানো খাতা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে

লাগল। বুঝলুম বুকিং রেজিস্টার। খানিক পরে বলল, 'আপনার বুকিং ছিল সকালে। না আসার জন্য ক্যানসেল হয়ে গেছে। উই হ্যাড নো ফারদার ইনফরমেশন!'

'ক্যানসেল হয়ে গেছে!' দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলুম নিশ্চিত শুকিয়ে গেছে আমার মুখ। বললুম, 'ফ্লাইট মিস করেছিলুম বলেই আসতে পারি নি। অন্তত রাতটা কাটানোর জন্যে কোনো ব্যবস্থা করতে পাবেন না আপনারা?'

'রুম খালি থাকলে নিশ্চয়ই করতাম, স্যার। উই আর হিয়ার টু হেল্‌প ইউ!'

বাঁধা বুলি। প্রত্যাখানেও মিশে আছে সৌজন্যের হাসি। আমার রাগ হলো; সঙ্গে সঙ্গে ছেঁকে ধরল এক ধরনেব অসহায়তা। কী করব বুঝতে পারছি না। একটা ট্যাক্সি পেলে অবশ্য চলে যাওয়া যায় জ্যেঠতুতো দাদা কিংবা মাসীর বাড়ি। একটা চাণক্যপুরী এবং অন্যটা চিত্তরঞ্জন পার্কে; সে জায়গাগুলোও কম দূর নয় এখান থেকে। ট্যাক্সি অবশ্য ফোন করলেই পাওয়া যায় দিল্লীতে। কিন্তু, এতো রাতে? না, সদাশিবের ওখানেও যাওয়া যায় না। ভাবতে ভাবতেই আমি তাকালুম প্রায়ান্ধকার লবির দিকে। ওইখানেই শুয়ে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যায় কি না ভাবলুম। বন্ধ কাচের দরজা দিয়ে বাইরে তাকালেই কুয়াশার দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। লম্বা যুবকটি রিসিভারে কান লাগিয়ে কী শুনল যেন, তারপর বলল, 'সরি। উই আর ফুল্‌লি বুকড।'

মনঃস্থির কবতে না পেবে আমি বললুম, 'একটা ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে?'

'দেখছি—!' লম্বা যুবকটি বলল, 'আপনি বসুন লবিতে—'

আমি লবিতে গিয়ে বসলুম। এতোক্ষণে কানে এলো ঘুমন্ত লোকটির মৃদু নাক ডাকার শব্দ। কান পর্যন্ত ঢাকা পুলওভাবেব নিচে ঘামতে লাগলুম আমি।

ইতিমধ্যে কাউন্টাবের বেঁটে যুবকটির সঙ্গে লম্বা যুবকটি নিজেদের— সম্ভবত পাঞ্জাবি— ভাষায় কী বলাবলি করল বুঝতে পারি নি। লম্বা যুবকটি হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'সকাল আটটার আগে ছেড়ে দিলে এখন আপনাকে একটা ঘর দিতে পারি—'

'ও-কে।' আমি উঠে দাঁড়ালুম, 'সকাল হলে আমি অন্য হোটেল খুঁজে নিতে পারি—'

'এখানেও কোনো গেস্ট চলে যেতে পারে, তখন আপনাকে অন্য রুম দেওয়া যাবে। তবে আটটার মধ্যে বোম্বে থেকে আসবে একজন। তার জন্যে একটা রুম কনফার্ম করা আছে—'

তখনকার যা অবস্থা তাতে যে-কোনো শর্তেই আমি রাজী। পিছনের কী হোলের গায়ে লাগানো হুক থেকে একটা চাবি নিয়ে বেঁটে যুবকটির হাতে দিল লম্বা যুবকটি। বেঁটে যুবকটি কাউন্টারের ভিতব থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে—'

ঘরটা দোতলায়। নাম্বার তেত্রিশ। বেঁটে যুবকটি দরজায় চাবি লাগিয়ে তালা খুলে জ্বাললো। তারপর আমার হাতে চাবিটি দিয়ে 'গুড নাইট' বলে চলে গেল। দেখলুম, সিঁড়ির বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে বেঁটে ও রোগা একটি চেহারা। যেমনই ব্যবহার করুক, শেষ পর্যন্ত আমাব জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দেবাব জন্যে যুবক দুটিব প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলুম আমি।

ঘরটা খারাপ নয়। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলুম দরজাটা। স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখলুম লাগেজ বক্সের ওপর। ঘুম পাচ্ছে। অবশ্যই ঘুম ছাড়া আর কোনো কাজ নেই এখন। তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে গেলুম টয়লেটে। ব্র্যাকেটে ঝুলছে একাট ব্যবহার-করা তোয়ালে, সাবানটাও ব্যবহৃত। বাথটাবের মাথা থেকে অগত্যা টেনে নিতে হলো ভাঁজ-করা বাথ টাওয়েলটা। তেষ্টা পেয়েছিল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে ফ্লাসক্ থেকে গ্লাসে জল ঢালতে গিয়ে দেখি ফ্লাস্কটা ভর্তি নয় পুরোপুরি। তখন মনে হলো, হয়তো কিছুক্ষণ আগেও এই তেত্রিশ নাম্বার রুমে আর কেউ ছিল। চলে যাবার পর বিছানা ইত্যাদি পরিপাটি করে রাখা হলেও যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি ঘরটা— নতুন আগন্তুকের জন্যে নতুন জিনিসপত্রও দেওয়া হয় নি। রিসেপশনের যুবকটি অবশ্য বলেছিল সকালে কেউ আসবে বম্বে থেকে, তার জন্যেই আলাদা করে রাখা আছে ঘরটি। হয়তো সকালেই পরিষ্কার করত! আমি তো উটকো লোক! ঘরটা যে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এটাই ভাঁগ্যের ব্যাপার।

বেড স্যুইচ জ্বেলে, নিভিয়ে দিলুম বড়ো আলোটা। তখনই চোখে পড়ল কাচের জানলার পর্দা টানা নেই। এগিয়ে গিয়ে পর্দা টানার আগে কাচে মুখ চেপে বাইরেটা দেখে নিলুম আমি। অন্ধকারে ঘন গাছগাছালি নিয়ে থমকে আছে লোধি গার্ডেনস্— দৃষ্টি ছড়ানো যায় না। রিল দেওয়া পর্দাটা টানতে টানতে গভীর ক্লান্তিতে হাই উঠে এলো আমার। বিছানায় এসে চাদর জড়ানো কম্বলের ভিতর শরীরটা সেঁদিয়ে দিলুম আমি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে ভাবে শুরু হয়েছিল দিনটি, শেষ অন্তত সেভাবে হয়নি। তিনটে বাজে প্রায়। শীতের দিল্লীতে সাতটা সাড়ে-সাতটার আগে সকাল হয় না। তার মানে ঘণ্টা চারেক ঘুমোতে পারব অন্তত। হাত বাড়িয়ে বেড স্যুইচ টিপতেই অন্ধকার ছেয়ে গেল ঘরে। মনে হলো ঘুম আসছে। জ্বর আসার মতো— হু হু করে, সারা শরীরে ঘুমের আবির্ভাব টের পেলুম আমি!

কতোক্ষণ জানি না। ঘুম না তন্দ্রা, কোন ঘোরে ছিলুম তাও বুঝতে পারলুম না ঠিক ঠিক। চমকে উঠে বসলুম বিছানায়। না, ভুল হয়নি। আমারই ঘরের টয়লেটে ঘটাং করে ফ্ল্যাশ টানার শব্দ পেয়েছিলুম। তারই জেরে এখনো পাচ্ছি কমোডে জল গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। অদ্ভুত! শব্দটায় ধাতস্থ হতে যেটুকু সময় লাগে, তার আগেই বেড স্যুইচ্ টিপে আলো জ্বাললাম আমি। উঠে গিয়ে টয়লেটের দরজা খুলতে চোখে পড়ল না কিছুই। ঝিরঝির শব্দটাও মিলিয়ে গেছে তখন। বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো রাতের নৈঃশব্দ্যে দূরের শব্দও অনেক সময় চলে আসে কাছে— হয়তো পাশের রুমের ফ্ল্যাশ টানার শব্দটাকেই ঘুমের ঘোরে ভুল করেছি। মাঝ থেকে ঘুমটা ভেঙে গেল!

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম আবার। এবং ঘুমিয়েও পড়েছিলুম।

কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না। আচ্ছন্নতার মধ্যেই মনে হলো জানলার পর্দাটা বেশ জোর দিয়ে টেনে সরিয়ে দিল কেউ— ঘড়ঘড় শব্দ হলো রীলের। মনে হলেও গা করলুম না তেমন ; ঘুমের আগ্রহে পাশ ফিরলুম। শীতে জুড়িয়ে আসছে সারা শরীর। কিন্তু, এইভাবে কিছুক্ষণ আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতেই টের পেলুম, সিগারেটের

ধোঁয়ার গন্ধ জড়িয়ে পড়ছে নিঃশ্বাসে। অস্বস্তি বেশি হওয়ায় পরিষ্কার ঘুম থেকে জেগে উঠলুম আমি। আর তখনই বিস্ময় আর আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে এলো আমার। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলুম, জানলার পর্দাটা সত্যিই সরানো। আর রাইটিং টেবিলের সংলগ্ন চেয়ারটিতে বসে জানলার দিকে মুখ করে সিগারেট টানছে কেউ। অন্ধকার বলেই আদল স্পষ্ট হয় না কোনো। কিন্তু লাল জ্বলজ্বলে এক টুকরো সিগারেটের আগুন চোখে পড়ছে ঠিকই। পোড়া সিগারেটের গন্ধ ক্রমশ আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে।

সম্ভবত চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিলুম আমি! গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না কোনো। আতঙ্কের শেষ অবস্থায় পৌঁছে বেড স্যুইচটা টিপে আলো জ্বালতে পারলুম শুধু। আশ্চর্য! সব ঠিকঠাক আছে। জানলার পর্দাটা যেমন টানা ছিল তেমনিই টানা— চেয়ারটা চেয়ারের জায়গায়। সিগারেটের ধোঁয়ারও নামগন্ধ নেই কোনোখানে!

ঘামছিলুম। সেই অবস্থাতেই মনঃস্থির করে ফেললুম, আর ঘুমোবার দরকার নেই। আলোটা জ্বলুক। অন্তত ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই জেগে থাকতে হবে আমাকে।

ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। শব্দহীন চারিদিকে ঘুমের নিশুতি। আমি জেগে আছি।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সদাশিবকে ফোন করে বললুম সব। সদাশিব বলল, 'কী আশ্চর্য, ওই তেত্রিশ নাম্বার ঘরটাই দিয়েছিল আপনাকে।'

'কেন!'

সদাশিব বলল, 'পরশু রাত্রে ওই ঘরে মোহিনী চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেছেন। আজকের কাগজেই আছে খবরটা—'

ভূত ও বিজ্ঞান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সন্ধে হয়ে আসছে। পটলবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন বলে বেশ জোবেই হাঁটছেন, জোবে হাঁটার আরও একটা কারণ হলো আকাশে বেশ ঘন কলো মেঘ জমেছে, ঝড়বৃষ্টি এলে একটু মুশকিল হবে। তিনি আজ আবার ছাতাটা নিয়ে বেরোননি।

পায়েব হাওয়াই চপ্পলজোড়ার দিকে একবার চাইলেন পটলবাবু, দুখানা ছোটো ডিঙি নৌকোর সাইজের জিনিস, দেখতে সুন্দর নয় ঠিকই, কিন্তু ভারি কাজের জুতো। মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধক ব্যবস্থা থাকার ফলে আকাশের অনেকটা ওপর দিয়ে দিব্যি হাঁটাচলা করা যায়। জুতোর ভিতরে ছোটো মোটর লাগানো আছে। সেটা চালু করলে আর পা নাড়ারও দরকার হয় না। ক্ষুদে বুস্টার রকেট তীব্রগতিতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। কিন্তু পটলবাবুর ইদানীং খুব বেশি গতিবেগ সহ্য হয় না, মাথা ঘোরে। স্ক্যান করে দেখা গেছে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রে একটা গণ্ডগোল আছে। বেশি গতিবেগে গেলেই তাঁর মাথা ঘোরে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সুতরাং পটলবাবু ভেসে ভেসে হেঁটে চলেছেন। বৃষ্টি-বাদলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা

বেলুন ছাতা হালে আবিষ্কার হয়েছে। ফোল্ডিং জিনিস, ভাঁজ খুলে জামার মতো পরে নিতে হয়, তারপর একটা বোতাম টিপলেই সেটা বেলুনের মতো ফুলে চারদিকে একলা ঘেরাটোপ তৈরি করে, ঝড়বৃষ্টিতে সেই বেলুনের কিছুই হয় না। সেই ছাতাটা না আনায় পটলবাবুর একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই তিন হাজার সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দেও জলে ভিজলে মানুষের সর্দিকাশি হয় এবং সর্দিকাশির কোনো ওষুধে পটলবাবুর তেমন কাজ হয় না।

পকেটে টেলিফোনটা বিপ বিপ করছিল, পটলবাবু টেলিফোনটা কানে দিয়ে বললেন, কে?

কে, পটলভায়া নাকি? আমি বিষ্ণুপদ বলছি।

বলো ভায়া।

বলি, তুমি এখন কোথায়?

আমি এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার ওপরে, দু হাজার সাতশো ফুট অল্টিচুডে রয়েছি। আকাশে কালবোশেখীর মেঘ এবং সঙ্গে ছাতা নেই।

বাঁচালে ভায়া। ঈশ্বরেরই ইচ্ছে বলতে হবে, আমি নবগ্রামে রয়েছি। এই উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই।

বলো কী? তুমি তো ক'দিন আগেও হিউস্টনে ছিলে!

তারও আগে ছিলুম মঙ্গলগ্রহে, তার আগে নেপচুনে। আমার কি এক জায়গায় থাকলে চলে?

তা নবগ্রামে কী মনে করে?

একটা সমস্যায় পড়েই আসা। তুমি নবগ্রামে নেমে পড়ো, কথা আছে।

প্রস্তাবটা পটলবাবুর খারাপ লাগল না, ঝড়বৃষ্টিতে পড়ার চেয়ে নবগ্রামে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাওয়া বরং অনেক ভাল।

পটলবাবু বললেন, ঠিক আছে, কোথায় আছো সেটা বলো।

স্ক্যানার ছেষট্টি ক-তে জিরো ইন করো।

পটলবাবু স্ক্যানার বের করে নবগ্রামের দিক নির্ণয় করে নিয়ে নম্বরটা সেট করলেন, তারপর স্ক্যানারের নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। নবগ্রাম সামনেই, কালবোশেখীর বাতাসটা শুরু হওয়ায় আগেই নেমে পড়তে পারবেন বলে আশা হতে লাগল তাঁর।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পশ্চিম দিককার আকাশে যে কালো কুচকুচে মেঘে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ যেন একটা কালো গোল মেঘের বল কামানের গোলার মতোই তার দিকে ছুটে আসতে লাগল। এরকম অতি প্রকৃত ব্যাপার তিনি কস্মিনকালেও দেখেননি। পটলবাবু ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি হাওয়াই চপ্পলের ভাসমানতা কমিয়ে দিয়ে দ্রুত নিচে নামতে লাগলেন।

কিন্তু শেষরক্ষে হলো না। মেঘেব বলটা হুড়ুম করে এসে যেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পটলবাবুর চারদিক একেবারে ঘুটঘুট্টে অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ে তিনি সিঁটিয়ে

গেলেন। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টেলিফোনটা বের করলেন। অন্ধকারেও টেলিফোন করতে অসুবিধে নেই। ডায়ালের বোতামগুলো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে।

কিন্তু টেলিফোন করার সুযোগটাই পেলেন না তিনি। কে যেন হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে গেল।

তারপর যা হতে লাগল তা পটলবাবুর সুদূর কল্পনারও বাইরে। মেঘের গোলটা তাঁকে যেন খানিক লোফালুফি করে হু-হু করে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পটলবাবু চেঁচাতে লাগলেন, বাঁচাও! বাঁচাও!

কানের কাছে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলল, চোপ!

ভয়ে পটলবাবু বাক্যহারা হলেন, কিন্তু ধমকটা কে দিলে তা বুঝতে পারলেন না।

মেঘের বলটা তাঁকে নিয়ে এত ওপরে উঠে যাচ্ছে যে পটলবাবুর ভয় হতে লাগল, আরও ওপরে উঠলে তিনি নির্ঘাৎ কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন। সেক্ষেত্রে হাওয়াই চপ্পল কাজ করবে না। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর মৃতদেহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে।

আচমকাই মেঘের বলটা থেমে গেল। এবং ধীরে ধীরে চারদিককার অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। মেঘ কেটে যাওয়ার পর পটলবাবু যা দেখলেন তাতে ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। পৃথিবী থেকে অন্তত দুশো মাইল ওপরে তিনি নিরালা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, একদম একা।

কে যেন বলে উঠল, এই যে পটল!

পটলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে যাকে দেখলেন তাতে তাঁর হৃদকম্প হতে লাগল।

বৈজ্ঞানিক হরিহর সর্বজ্ঞ। কিন্তু সমস্যা হলো হরিহর এই গত জানুয়ারি মাসে একশো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন।

কাঁপা গলায় পটলবাবু বললেন, আ— আপনি?

শূন্যে দুখানা চেয়ার পাতলেন হরিহর। তারপর বললেন, বোসো হে পটল, কথা আছে।

পটলবাবু কম্পিত বক্ষে বসলেন, দুশো মাইল উচ্চতায় হাওয়ার কোনোও ঘন স্তর নেই। তাঁর হাওয়াই চপ্পল কাজ করছে না, তবু চেয়ার দুটো দিব্যি ভেসে রয়েছে। আর শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না।

হরিহর বললেন, ভয় পেও না। আমাদের চারদিকে একটা বলয় রয়েছে। তোমার শ্বাসকষ্ট হবে না, ঠাণ্ডাও লাগবে না, পড়েও যাবে না। নিচে এখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তার চেয়ে এ জায়গাটা অনেক নিরাপদ, কী বলো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু আপনি তো—

মারা গেছি? হাঃ হাঃ হাঃ। আমি মরায় তোমাদের খুব সুবিধে হয়েছে, না? শোনো বাপু, আমি ভূতপ্রেত নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতুম বলে কেউ আমাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, প্রকাশ্যেই আমাকে পাগল আর উন্মাদ বলা হতো। সেই দুঃখে আমি নবগ্রামে একটা নির্জন

বাড়িতে ল্যাবরেটারি বানিয়ে নিজের মনে গবেষণা করতে থাকি। একদিকে যখন তোমরা জড়বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করছ, অন্যদিকে তখন আমি এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান করতে থাকি, তাতে যথেষ্ট কাজও হয়। ধীরে ধীরে দেহাতীত জগতের রহস্য ধরা পড়তে থাকে। আমার নানারকম কিম্ভুত যন্ত্রে আত্মাদের অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে রেকর্ড হতে থাকে। তারপর একদিন আমি তাদের পরম বন্ধু হয়ে উঠি। আমার গবেষণায় শেষে তারাও সাহায্য করতে থাকে।

পটলবাবু সচকিত হয়ে বলেন, ভূত? কিন্তু ভূত তো—

কী বলবে জানি। ভূত একটা বোগাস ব্যাপার, এই তো! বাপু হে এই যে মহাশূন্যে ভেসে আছো, কোনো স্পেসস্যুট বা অক্সিজেন বা যন্ত্রপাতি ছাড়া— এটা কি তোমার বিজ্ঞান ভাবতে পারে?

মাথা নেড়ে পটলবাবু বললেন, আজ্ঞে না।

তবে? বিজ্ঞান শিখে এ সব না-মানার অভ্যাস মোটেই ভাল নয়, বুঝলে!

যে আজ্ঞে।

এখন যা বলছি শোনো। তোমার বন্ধু বিষ্ণুপদ সাঁতরা আমাব গোপন ল্যাবরেটারির সন্ধান পেয়েছে। সেইখান থেকেই তোমাকে টেলিফোনে ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সে জড়বাদী বিজ্ঞানী, অবিশ্বাসী। সে আমার ল্যাবরেটারিতে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে সব তছনছ করছে। সে আমাকে সত্যিকারের পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বুঝেছো?

যে আজ্ঞে।

আমি জানি তুমি তেমন খারাপ লোক নও। তাই তোমাকে একটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি বিষ্ণুপদকে আটকাও।

যে আজ্ঞে।

তারপব তুমি নিজে আমার ল্যাবরেটারিতে ভূত আর বিজ্ঞান মেশাতে থাকো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ভূত আর বিজ্ঞান কি মিশ খাবে হরিহর কাকা?

খুব খাবে, খুব খাবে। খাচ্ছে যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আমি কি পারব? আমার তো নিজের গবেষণা—

উহুঁ, নিজের গবেষণা তোমাকে ছাড়তে হবে। আমার ভূত-বিজ্ঞান রসায়ন গবেষণাগারের ভার তোমাকেই নিতে হবে। নইলে—

পটলবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল, রাজী না হলে কী হবে তা ভাবতেও পারছিলেন না। ঘাড় কাৎ করে বললেন, আজ্ঞে তাই হবে।

তাহলে চলো, নামা যাক।

চেয়ার দুটো দিব্যি সোঁ সোঁ করে নামতে লাগল। বায়ুস্তরে নেমে হরিহর বললেন, এবার নিজে নিজেই নামো, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে।

যে আজ্ঞে, বলে পটলবাবু নামতে লাগলেন।

রাতটা ছিল দুর্যোগের

সমরেশ মজুমদার

দিনটা ছিল দুর্যোগের। আকাশে আলো ছিল না একফোঁটা। ঠাণ্ডা বাড়ছিল হু-হু করে। পোড়া কাঠের মতো মেঘগুলো চাপ হয়ে ঝুলছিল, যেন টোকা মারলেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। দিন ফুরোবার আগেই রাত নামল। সেইসঙ্গে দাঁতালো হাওয়ারা নেমে এল খোলা পৃথিবীতে। এখনও বৃষ্টি নামেনি, এই রক্ষে!

রাস্তায় এই আবহাওয়ায় মানুষ থাকার কথা নয় বলেই নেই। স্ট্রীট ল্যাম্পগুলো ডাইনির চোখ হয়ে জ্বলার চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল দ্রুত হাঁটতে। তাঁর বয়স চল্লিশের ওপরেই, একটু মোটাসোটা ভালমানুষ গোছের চেহারা। হনহনিয়ে হাঁটছেন আর বারংবার পেছন ফিরে দেখছেন। যেন কে তাঁকে অনুসরণ করছে।

স্ট্রীটল্যাম্পের নীচ দিয়ে তিনি যখন হেঁটে গেলেন, তখন তাঁর মুখটা চকখড়ির মতো সাদা দেখাল। সেটা ঠাণ্ডায় যতটা নয়, আতঙ্কে ঢের বেশি। ওঁর শরীরে শীতের পোশাক আছে। তার ওপর একটা কালো চাদরে মাথা-গলা ঢেকে রেখেছেন। সম্ভবত কানে যাতে

হাওয়া না ঢোকে, তাই সতর্কতা। হাতে একটা ব্যাগ। যেসব ব্যাগ নিয়ে মহিলারা অফিসে যান, সেইরকমের। পায়ে মোজা এবং পাম্প-শু গোছের জুতো।

দ্রুত চলার জন্যই ভদ্রমহিলা হাঁপাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যে-কোনও মুহূর্তেই বসে পড়বেন। দু' পাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। একটুও আলো চোখে পড়ছিল না। বাঁক ঘুরতেই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনে একটা বাড়ির দোতলার জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। কাচের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে কথাও বলছে। ভদ্রমহিলা আর দেরি না করে ছুটে গেলেন একতলার দরজায়। প্রাণপণে বেলের বোতাম টিপে ধরলেন। সেই মুহূর্তেও তাঁর চোখ পেছন দিকে চলে গেল। দূরে কুয়াশায় কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে গলা ভেসে এল, "কে?" দয়া করে দরজা খুলুন। প্লিজ। আমাকে বাঁচান।" ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করলেন।

দরজাটা খুলে যেতেই একদঙ্গল আলো রাস্তায় ভদ্রমহিলার শরীর ভাসিয়ে লাফিয়ে নামল। একজন মধ্যবয়সী মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "একটু যদি ভেতরে আসতে দেন, তা হলে বলছি।"

ভদ্রলোকের স্ত্রী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আসুন, নিশ্চযই আসবেন।"

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে ভেতবে ঢুকতেই ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করলেন। ওঁবা ভদ্রমহিলাকে ওপরে নিয়ে এসে বসতে বললেন। সেটা খুবই প্রয়োজন ছিল ওঁর। একটা চেয়ারে বসে বড়-বড় নিশ্বাস ফেললেন তিনি। ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি অসুস্থ?"

"অ্যাঁ? না, ঠিক, আসলে দৌড়ে আসছিলাম বলে, অভ্যেস তো নেই।" ওঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

"দৌডচ্ছিলেন কেন?"

"মনে হচ্ছিল, হচ্ছিল বলব কেন, স্পষ্ট দেখেছি, কেউ যেন আমাকে ফলো করছিল। রাস্তায় তো আজ একটাও লোক নেই তাই ভয়ে—" ভদ্রমহিলা কথা শেষ করতে না পেরে দু' হাতে মুখ ঢাকলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "সে কী! এ-পাড়ায় কে অমন কাজ করার সাহস পাবে?" তিনি সোজা জানলার কাছে গিয়ে রাস্তাটা দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "নাঃ কেউ নেই।"

"কিন্তু ছিল!" ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করলেন।

"বেশ, থাকেও যদি, তা হলে আর আপনার ভয় নেই। আমার স্বামী সরকারি অফিসার। সবাই ওঁকে চেনেন।" স্ত্রী পরিচয় দিতেই স্বামী এগিয়ে এলেন, "শোনো, আমার মনে হয় ওঁকে এককাপ গরম দুধ দিলে ভাল হয়।"

ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেন, "না, না, দুধ আমি খাই না।"

ভদ্রমহিলা আরও সঙ্কুচিত হলেন, "না না। আমার এসব লাগবে না।"

ভদ্রলোকের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?"

ভদ্রমহিলা মুখ নিচু করে মাথা নাড়লেন, "কাজে। আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে অনুপস্থিত হলেই মাইনে কাটে। টাকার প্রয়োজন বলেই এই আবহাওয়াতেও সকালে বেরিয়েছিলাম।"

ভদ্রলোক সমব্যথীর গলায় বললেন, "সকালে অবশ্য আবহাওয়া এত খারাপ ছিল না।"

ওঁর স্ত্রী বললেন, "তা হলে আপনি চাকরি করেন। বাড়িতে আর যাঁরা আছেন...।"

"আর কেউ নেই ভাই।" ভদ্রমহিলা মুখ তুলছিলেন না। তিনি রুমালে চোখ মুছলেন।

ভদ্রলোক ইশারায় স্ত্রীকে নিষেধ করলেন এ-বিষয়ে কথা চালাতে। স্ত্রীর সেটা ভাল লাগল না। একটু সময় যেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

"আপনার স্বামী...." প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই শেষ করলেন না।

তিনি মারা গিয়েছেন অ্যাক্সিডেন্টে। এইরকম খারাপ আবহাওয়ার সন্ধে ছিল সেদিন।

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন "তারপর?"

"উনি অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন, এই সময় একটি কালো গাড়ি এসে ওঁকে চাপা দেয়।

"ইস্।"

"কিন্তু আমি জানি, উনি কখনও অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তায় হাঁটতেন না।"

""আমার কথা পুলিশ বিশ্বাস করেনি। কালো গাড়িটাকেও ধরতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখেছি।" "দেখেছেন মানে?"

"যখনই আমি একা-একা এই রাস্তায় হেঁটে যাই, তখনই দেখি একটা কালো গাড়ি আমার পেছন-পেছন আসছে। যতক্ষণ না সেটা বেরিয়ে যায়, ততক্ষণ আমি রাস্তা পাব হই না।"

"গাড়িতে কে থাকে দেখেছেন?"

"না। মুখ দেখতে পাইনি।"

"আজও কি গাড়িটা পেছনে ছিল ?"

'হ্যাঁ। প্রথমে গাড়িটাকে দেখলাম। একবার। তারপর মনে হল, কেউ যেন দরজা খুলে নেমে আমার পেছন-পেছন আসতে লাগল।"

ভদ্রলোক আবার জানালায় চলে গেলেন। ভাল করে রাস্তাটা দেখে ফিরে এলেন তিনি, "আচ্ছা, আপনি কতদূরে থাকেন?"

"সামনের রাস্তা ধরে মিনিটচারেক গেলে বাঁ দিকের তিনতলা কাঠের বাড়িটায় থাকি আমি।"

"ও। সামান্যই পথ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।"

'"না, না। আপনি কেন যাবেন। ছি ছি, এসেই বিব্রত করেছি, তার ওপর।"

"মোটেই বিব্রত করেননি।" ভদ্রলোক বড় গলায় বললেন।

"প্রতিবেশীকে যদি সাহায্য না করি, অন্যের প্রয়োজনে যদি না লাগি, তা হলে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?"

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, "আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।"

"কর্তব্য বুঝলেন, এসব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।" ভদ্রলোক উদার গলায় বললেন।

ওঁরা উঠে দাঁড়াতেই স্ত্রী স্বামীকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে, চাপা গলায় বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?"

স্বামী অবাক হলেন, "কেন? কী করেছি?"

"তুমি ওঁকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছ! এই আবহাওয়ায় একটা কুকুরও রাস্তায় নেই।"

ভদ্রলোক আড়চোখে বাইরের দিক দেখলেন, "তোমার কিস্‌সু মনে নেই।"

"মানে?"

"আমার একটা কালো গাড়ি ছিল এবং আমিও একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম।"

"কিন্তু তুমি তো বলেছিলে লোকটা মরেনি।"

"তাই মনে হয়েছিল, পরে তো দেখতে যাইনি, খবরও নিইনি।"

"তার মানে, তোমার গাড়িতেই..."

'নাও হতে পারে। এখনও সেই কালো গাড়িটা ওঁকে ফলো করে।"

স্ত্রীর উত্তেজনা কমল। তিনি মনে করে বললেন, "তুমি তখন বলতে, গাড়িটা যেন কীরকম!"

"হ্যাঁ। সবসময় ড্রাইভারের কথা শুনত না। তাই তো বিক্রি করে দিলাম।" ভদ্রলোক বললেন, "চলি। উনি অনেকক্ষণ বসে আছেন"

"শোনো যে-জন্যে তোমাকে ডাকলাম, রিভলভারটা নিয়ে যাও।"

"রিভলভার?"

"হ্যাঁ। যাচ্ছই যখন, তখন সাবধান হয়ে যাওয়াই ভাল।"

"বেশ।" ভদ্রলোক আলমারির দিকে এগোলেন।

ভদ্রমহিলা দরজার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, "আপনার কোনও ভয় নেই। উনি পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আচ্ছা, আপনার বাড়ির ফোন নম্বর কত?"

"আমার বাড়ীতে তো ফোন নেই।"

"ওঃ! বাড়ি পৌঁছে একটা ফোন করলে নিশ্চিন্ত হতাম, তাই বললাম।

ওই অ্যাক্সিডেন্টটা কতদিন আগে ঘটেছিল?" খুব সাধারণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী।

"বছর দুই আগে।"

ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ওঁরা নীচে নেমে গেলে ভদ্রলোকের স্ত্রী দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এখন রাস্তায় ঘন কুয়াশা। স্ট্রীট ল্যাম্পগুলোকে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। ভদ্রমহিলা লজ্জিত গলায় বললেন, "দেখুন তো, আমার জন্যে আপনার কি কষ্ট হচ্ছে!"

"কষ্ট কেন বলছেন! এটা কর্তব্য।"

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রমহিলা পেছন ফিরে তাকালেন। সেটা লক্ষ্য করে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। তাঁর কোটের পকেটে রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে লক্ষ্য করলেন, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। না পেয়ে বললেন, "কেউ নেই তো!"

"পায়ের আওয়াজ শুনলাম।"

"ঠিক আছে, আপনি এগোন, আমি একটু পিছিয়ে আপনাকে ফলো করবো। কেউ যদি কাছে এসে পড়ে, তা হলে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না।"

"না, না। তা দরকার হবে না। ওই যে জুতোর দোকানটা এসে গেছে, আমি ঠিক যেতে পারব। আপনি চলে যান।" ভদ্রমহিলা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বললেন।

এই সময় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই দুটো হেডলাইটকে কুয়াশা চিরে এগিয়ে আসতে দেখলেন ওঁরা। ভদ্রলোক রিভলভার বের করে তৈরি হলেন। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়াল না। সমান গতিতে তাঁদের পেরিয়ে চলে গেল। দু'জনেই দেখতে পেলেন গাড়িটার রং সাদা।

ভদ্রমহিলা স্বস্তিতে বলে উঠলেন, "নাঃ।"

"হ্যাঁ, আমিও...।" ভদ্রলোক রিভলভার আর ঢোকালেন না, "চলুন আপনাকে পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরব না।"

কয়েক পা হেঁটে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার স্বামী কী করতেন?"

"মাস্টারমশাই ছিলেন।"

"কীরকম বয়স ছিল?"

"এই, আপনারই বয়সী।"

ভদ্রলোক ঢোক গিললেন, "ও। উনি কি দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। পুলিশ তাই বলেছিল।"

কিছুদূর যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি এসে গিয়েছি। আর চিন্তা নেই।"

"ও। বাড়িটায় আলো জ্বলছে না।"

"পুরনো বাড়ি। দোতলায় আমি ছাড়া কেউ থাকে না।"

"চলুন, আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, না। কোনও দরকার নেই! আমি ওই সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেই ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে যাব। আর আমার কোনও ভয় নেই।"

"বেশ! তা হলে চলি।"

"হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ!" বলেই ভদ্রমহিলা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তিনি যতক্ষণ চোখের আড়ালে না গেলেন, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ির পথ ধরলেন।

কয়েক পা হাঁটার পরই মনে হল, কেউ যেন তাঁর পেছনে পেছনে আসছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছেন তিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন। কুয়াশা এখন এমন ঘন হচ্ছে যে, কাউকে দেখতে পেলেন না। রিভলভারটা উঁচিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই গাড়ির শব্দ কানে এল। একটা গাড়ি যেন আসছে, কিন্তু তার হেডলাইট নেভানো। সেটা জ্বললে তিনি দেখতে পেতেন। দ্রুত ফুটপাতের শেষপ্রান্তে চলে এলেন তিনি। গাড়িটা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাক, তারপর তিনি যাবেন। কিন্তু সরে আসামাত্র শব্দটা থেমে গেল। কুয়াশারা এখন পাক খাচ্ছে সর্বত্র। স্ট্রীট ল্যাম্পগুলোকেও গিলে ফেলেছে তারা। তিনি আবার পা ফেলতেই গাড়ির শব্দ শুনলেন। যেন গাড়িটা ওত পেতে ছিল একপাশে, তাঁকে চলতে দেখেই সক্রিয় হয়েছে।

ভদ্রলোকের সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ওই ঠাণ্ডায় কুয়াশায় দাঁড়িয়েও হাতেব মুঠোয় ধরা রিভলভারটা ভিজে উঠল। তাঁর মনে হল, এগোনোটা বুদ্ধিমানেব কাজ হবে না। তিনি এক দৌড়ে পেছন দিকে চলে এলেন। ভদ্রমহিলার বাড়ির কাঠের সিঁড়িটা দেখতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। না, কেউ নেই। তার মনে হল একা ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। তিনি দ্রুত কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, দোতলায় উনি একা থাকেন। অতএব ওকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। দোতলায় উঠে পা বাড়াতে গিয়ে কোনও মতে নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক। সিঁড়ির সামনে বারান্দা বা করিডোর বলে কিছু নেই। কাঠগুলো অনেক, অনেক আগেই খসে পড়ে গিয়েছে। তবে কি ওপাশের দরজাটা ভাঙা এবং অন্ধকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভদ্রমহিলা এই শূন্য দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন!....

পানিমুড়ার কবলে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদেব বাড়ির পেছনে একটা বড় পুকুরের ওপাশে একটু একটু জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবরখানা। তারপর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল।

সে বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ার। আমাদের বাড়ি পাওয়া গেল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হলো বলে এখানকার স্কুলে আমি ভর্তি হতে পারলাম না। নতুন বছরে ভর্তি হতে হবে।

তাই দুপুরবেলা আমার কিছুই করার থাকে না। বাবা অফিস চলে যান, মা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছে করে না দুপুরে। একটাও নতুন গল্পের বই নেই, আর পড়ার বই তো বেশীক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে। তাই আমি চুপি চুপি বাড়ির পেছনে পুকুরটার পারে চলে যাই।

একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না। এখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে, কিন্তু

আমার তো বন্দুক নেই। আমার তীর ধনুক আছে অবশ্য, তা দিয়ে বাঘ মারা যায় না। তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দু-একবার। কিন্তু ঐ কবরখানাটার পাশ দিয়ে যেতেই বেশি গা ছমছম করে। বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ বলেছিল, ঐ কবরখানায় নাকি ভূত আছে। আমি এদিক ওদিক তাকাই, কখনো ভূত দেখতে পাই না। কিন্তু কী রকম যেন একটা বোঁটকা গন্ধ পাই। আর থাকতে ইচ্ছে করে না, এক ছুটে ফিরে আসি। আমার যদি আর একটা বন্ধু থাকতো, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা দুজনে মিলে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখানে এসে এখনো যে আমার কোনো নতুন বন্ধু হয়নি। একা একা ভূত দেখতে যেতে বড্ড খারাপ লাগে।

আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ছোট ছোট ইঁটের টুকরো বা পাথর ছুঁড়ে মারি জলের মধ্যে।

পুকুরটা বিরাট বড়, আর এখন বর্ষাকাল বলে কানায় কানায় ভরা। দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গভীর মনে হয়। কোথাও কোন লোকজন নেই, আমি শুধু একা। এক এক সময় আমার মনে হয়, আমাকে যেন কেউ দেখছে। যদিও কোথাও আর কেউ নেই, তবু যেন মনে হয়, আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক চেয়ে দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।

এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে, অমনি জলের উপরে গোল গোল ঢেউ ওঠে। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখলাম, পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে। যেন ঠিক ঐখানটায় কোনো বিরাট কিছু প্রাণী দাপাদাপি করছে। এত বড় তো মাছ হতে পারে না। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

তারপব থেকে আমি সব সময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি। কিন্তু আর কিছু দেখা যায় না। আবার পুকুরটা শান্ত আর গম্ভীর!

পুকুরের ঘাটটা অনেক দিনের পুরোনো। পাথর দিয়ে তৈরী, কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা জায়গাগুলোয় গর্ত হয়ে সেখানে জল জমে থাকে, সেই জলেও ছোট ছোট মাছ দেখা যায়।

আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি। আমার তো বঁড়শী নেই, আর বঁড়শী দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি না। তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি। এক ধরনের মাছ, জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ওগুলোর নাম বেলে মাছ। সেই মাছগুলো আমাকে কাছাকাছি দেখেও ভয় পায় না। মাছগুলো অবশ্য দারুণ চালাক। আমি আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করি, ওদের একেবারে গায়ের কাছে হাত দেবার পর সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়। পাথরের তলার মধ্যেও অনেকখানি গর্ত আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়ে।

মাছ ধরার ঝোঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় কে যেন ডাকলো, এই বাবলু!

আমি চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো! তাহলে আমায় কে ডাকলো? স্পষ্ট শুনলাম. অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা। মা তো ঘুমোচ্ছেন, তাহলে কে ডাকলো। খুব কাছ থেকে! মা-ই কি আমাকে ডেকে চট্ করে কোথাও লুকিয়ে পড়লেন।

জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম। কেউ নেই। কাছেই একটা মস্ত কদম ফুলের গাছ, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাও নেই। অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগলো। কেউ কোথাও নেই, তাহলে আমায় ডাকলো কে? আমি যে স্পষ্ট শুনেছি! দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে। দোতলায় এসে দেখলাম, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি তবু মাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি কি এই মাত্র পুকুর ঘাটে গিয়েছিলে?

মা তো অবাক। বিছানার উপরে উঠে বসে বললেন, কেন, পুকুরঘাটে যাবো কেন? তুই বুঝি গিয়েছিলি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি সেখানে খেলা করছিলাম, মনে হলো পেছন থেকে কে আমাকে ডাকলো। ঠিক তোমার মতন গলা।

মা বললেন, তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস!

—না, মা! আমি স্পষ্ট শুনলাম।

মা রেগে গিয়ে বললেন, তুই কেন পুকুর ঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা? দুপুরবেলা কেউ একলা যায়?

—কেন, কী হয় তাতে?

—না, কক্ষনো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই! আর কোনদিন যাবি না। তোর পড়াশুনো নেই?

—পড়াশুনো তো হয়ে গেছে।

—তা হলেও যাবি না! খবরদার।

মা আমাকে টেনে নিয়ে তার পাশে শুইয়ে দিলেন। পুকুর ধারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে, মা একথা বিশ্বাসই করলেন না।

বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ প্রায়ই সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসে কী সব অফিসের কাজ নিয়ে। মুনাব্বর খাঁ খুব দারুণ দারুণ গল্প বলতে পারে। সে-ই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল।

সেদিন সন্ধেবেলা আমি মুনাব্বর খাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। এই পুকুরটার মধ্যে কত বড় মাছ আছে বলো তো? তুমি জানো?

মুনাব্বর খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, কেন বলো তো খোকাবাবু আমি বললাম, একদিন দুপুরবেলা আমি দেখেছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জিনিস জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। সেটা যদি মাছ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে।

মুনাব্বর খাঁ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বললো, খোকাবাবু, দুপুরবেলা পুকুরের

ধারে কক্ষনো একলা যেও না। যেতে নেই।

—কেন, গেলে কী হয়?

—অনেক রকম বিপদ হয়। তুমি জানো না, এই সব পুরোনো পুকুরে পানিমুড়া থাকে?

—পানিমুড়া কী?

—পানিমুড়া জানো না? পানিমুড়া হচ্ছে জলের ভূত!

—ধ্যাৎ! জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি?

—ওমা, তুমি পানিমুড়ার কথা শোনো নি? এতো সবাই জানে। পানিমুড়া বড়দের কিছু বলে না। কিন্তু ছোটদের জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়।

—মুনাব্বর খাঁ, তুমি পানিমুড়া দেখেছ?

—হ্যাঁ, তিনবার দেখেছি। তাদের মাথাটা হয় কুমীরের মতন, আর গা-টা মানুষের মতন। এই সব পুকুর জানো তো, খুব পুরোনো, আগেকার দিনের রাজাদের আমলের। এই সব পুকুরেব মাঝখানে গাদ্দি থাকে।

—গাদ্দি কী?

—গাদ্দি মানে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত। যারা পানিতে ডুবে মরে, পানিমুড়া ভূত হয়ে যায়, ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে ওপরে উঠে আসে। পানিমুড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতদের খুব ঝগড়া। পানিমুড়ারা ওপরে উঠে এলেই কবরখানাব ভূতরা তাদের তাড়া করে যায়। আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানিমুড়া আর একটা কবরখানার ভূত খুব ঝটাপটি করে লড়াই করছে!

এই সময় মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গল্প হচ্ছে?

আমি বললাম, মা, তুমি পানিমুড়া ভূত দেখেছো কখনো? মুনাব্বর খাঁ দেখেছে!

মা বললেন, বসে বসে বুঝি ভূতের গল্প হচ্ছে এই সন্ধেবেলা! মুনাব্বর তুমি বাবলুকে বানিয়ে বানিয়ে ওসব গল্প বলো না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? কিচ্ছু নেই! ভূত হচ্ছে মানুষের কল্পনা।

মুনাব্বর বললো, না, মেমসাব! আমি নিজের চক্ষে দেখেছি।

মা হেসে বললেন, ছাই দেখেছো!

আমার মায়ের খুব সাহস। মা একদিন রাত্তিরবেলা একা একা কবরখানায় গিয়েছিলেন ভূত দেখার জন্য। কিচ্ছু দেখতে পাননি। মাকে দেখে ভূতেরা ভয় পেয়েছিল। বাবা বলেছিলেন তোমার হাতে টর্চ ছিল তো, সেই আলো দেখে ভূতেরা পালিয়ে গেছে। তুমি অন্ধকারে একবার গিয়ে দেখো তো!

মা বলেছিলেন, ওখানে অনেক সাপখোপ আছে। অন্ধকারে গেলে যদি সাপে কামড়ায়? আমি ভূতের ভয় পাই না, কিন্তু সাপকে ভয় করি।

দু'তিন দিন আমি আর পুকুর ধারে যাইনি। কিন্তু আমার মন ছটফট করে। দুপুরবেলা কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে কারুব। মা ঘুমিয়ে পড়েন, আমার যে ঘুম আসে না! পড়া গল্পের

বইগুলিই আরও কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম।

তারপর আবার একদিন, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম আবার। আজ আমার সঙ্গে একটা ছোট লাঠি। যদি ভূত-টুত আসে তাহলে লাঠি দিয়ে মারবো।

পুকুরের কাছে এসে দেখি, ঘাটের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের ডোরাকাটা গেঞ্জি আর মাথায় এমন টাক যে একটাও চুল নেই। লোকটা জলেব মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে। সারা গা ভেজা। লোকটা এলো কোথা থেকে? আমাদের এই পুকুরে তো বাইরের কোনো লোক স্নান করতে আসে না!

আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখলো। দেখেই যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফ মেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। তারপর ডুবে গেল।

আমিও খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখে ওরকম ভয় পেল কেন? আমার হাতের লাঠিটা দেখে? চোর-টোর নয় তো? যদি চোর হয়, লোকটা তাহলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জঙ্গল দিয়ে পালাবে। আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে, আর উঠছে না। এতক্ষণ কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে! আমি মনে মনে এক দুই তিন করে পাঁচশো পর্যন্ত গুণে ফেললাম, তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না। এই রে, লোকটা মরে গেল না তো? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না।

তা হলে কি এক্ষুনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত? কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? আরও একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তখন আমার মনে হলো, ওটা ভূত নয় তো? ও-ই কি পানিমুড়া? কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে। মুনাব্বর খাঁ যে বলেছিল, পানিমুড়ার মুখটা কুমীরের মতন! এ যে একদম মানুষের মতন। শুধু টাক মাথা। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন আমাব দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল তখন দেখেছি, ওর চোখের ওপর ভুরুও নেই। সারা গায়ে কোনো লোমও নেই। মুনাব্বর নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছিল। সে পানিমুড়া কোনদিন দেখেনি।

তক্ষুণি ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেবো ভাবছি, এক সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠলো। শুধু একটা হাত। আমি ভাবলাম, লোকটা এবার উঠে আসবে। তা হলে পানিমুড়া নয়। কোনো চোরই নিশ্চয়ই।

শুধু হাতটাই উঁচু হয়ে রইলো, আর কিছু না। লোকটার মাথাও দেখা গেল না। তারপর মনে হলো, সেই হাতটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতে লম্বা লম্বা আঙুল, তাতে বিচ্ছিরি নোখ। হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগলো। ঠিক যেন আমায় ডাকছে।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

তখন দেখলাম, জলের মধ্যে দুটো চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। চোখ

দুটো মাছের মতন, পলক পড়ে না। কিন্তু মাছের নয়, চোখ দুটো সেই লোকটার! আমার একবার ইচ্ছে হলো, পালিয়ে যাই।

আবার ভাবলাম, দেখি না শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমার তো হাতে লাঠি আছে।

এবার সেই হাতটা খুব কাছে চলে এলো। মনে হলো যেন আমার পা চেপে ধরবে। এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু! বাবলু!

কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার ওপর। ঠিক লাগলো কিনা বুঝতে পারলাম না, হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

আবার কেউ আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু বাবলু!

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সামনে জলের ওপর সেই হাতটা আবার উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম, অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল, আমি ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম!

জলে পড়েই মনে হলো, আমি আর বাঁচবো না। আমি যে সাঁতার জানি না! পানিমুড়া আমার পা ধরে সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, ওমা—! মা!

জলের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম। দম আটকে আসছে। পানিমুড়া এখনো আমার পা ধরেনি। আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে পাচ্ছে না বোধ হয়।

এরই মধ্যে একবার কোনো রকমে জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম, মাঠ দিয়ে ছুটে আসছেন আমার মা। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, মা— কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম। মা পাড় থেকেই এক লাফ দিয়ে জলে পড়লেন।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে শুয়ে আছি। মা আর আমাদের রাঁধুনি আমার গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। আমি চোখ মেলতেই মা বললেন, আমি বলেছিলাম না, ওর পেটে বেশি জল ঢোকেনি। এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে!

মা ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কী যে হত, ভাবতেও আমার আজও গা কাঁপে। মা ওখানে গেছেন কি করে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পরে শুনেছি সে কথা। মা ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানের কাছে কে যেন ডাকলো, মা, মা! ঠিক আমার গলা। মা চোখ মেলে দেখলেন, কেউ নেই। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন।

তখন বাইরে থেকে আবার সেই মা মা ডাক শোনা গেল। তারপর পুকুর ঘাট থেকে।

আমি জলে পড়ার সময় মা মা বলে ডেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এত দূর থেকে মায়ের তো সেটা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন।

মা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাবলু, তোকে আমি একা একা পুকুর ঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম, তবু গেলি কেন? কেন জলে নেমেছিলি?

আমি বললাম, মা, আমাকে পানিমুড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মা বললেন, বাজে কথা।

আমি বললাম, না সত্যি!

মা বললেন, মোটেই না! তুই পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলি!

মা কিছুতেই পানিমুড়ার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমাদের রাঁধুনি বললো হ্যাঁ গো দিদি, এসব পুরোনো পুকুরে অনেক ভয়ের জিনিস থাকে!

মা বললেন, সাঁতার না জানলে লোকে জল দেখে ওরকম অনেক ভয়ের জিনিস বানায়। আমি কাল থেকেই বাবলুকে সাঁতার শেখাবো।

এরপর সাতদিনের মধ্যে আমি সাঁতার শিখে গেলাম। পানিমুড়াকে আর কখনো দেখিনি। তবে আমি সাঁতার কাটতে যেতাম নদীতে, ঐ পুকুরে আর নয়।

সেই রাত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

একটা কথা আছে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। আমার ঠিক তাই হল। একে শীতকাল, তায় থাকার জায়গার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। অফিসের এক অর্ডারে চলে এসেছি অযোধ্যা পাহাড়ের ধারে পাণ্ডববর্জিত এই জায়গায়। এখানে সব আছে। সুন্দর সমান্তরাল একটি পাহাড়। সুন্দর একটি বন, যদিও পত্রশূন্য গাছপালা, কারণ সময়টা শীতের, বিশাল-বিশাল প্রান্তর, ছোট-ছোট আদিবাসী গ্রাম, অজস্র তুঁত গাছ। প্রতিটি গাছে লাক্ষা পোকা সব পাতা খেয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত আকৃতির জমাট জটলা তৈরি করেছে। পরে এর থেকে তৈরি হবে গালা। সন্ধ্যার আকাশপটে এই গাছগুলোকে দেখে গা আরও ছমছম করছে। একটি-দুটি সাঁওতাল পরিবার এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তা ছাড়া সবই নির্জন। একটু পরে বাঘ না বেরোক, দস্যু, তস্করের আসতে কোনও আপত্তি নেই। যথাসর্বস্ব কেড়ে তো নেবেই, মেরে ফেলতেও পারে।

কী করব ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে আছি একটা পাথরখণ্ডে। পাশ দিয়ে চলে গেছে

পথ। যা হয় হবে। দেখাই যাক না ভগবান কী করেন। সন্ন্যাসীরাতো এর চেয়ে অনেক দুর্গম স্থানে ভগবান ভরসা করে চলে যান। আমি সন্ন্যাসী না হলেও আত্মসমর্পণ তো করতে পারি!

দূর থেকে একটা ঝকঝকে সাদা মোটরগাড়ি আসছে। পেছনে তাড়া করে আসছে শীত, শুকনো পথের ধুলো। গাড়িটা হুস করে আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়ে কিছুটা দূরে থামল। দেখি ব্যাক করে আমার দিকেই আসছে। আমি বসে আছি। এতই পরিশ্রান্ত যে, ওঠার ক্ষমতা নেই।

চালকের আসন থেকে মুখ বাড়িয়ে সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "আপনার নাম কী পলাশ!"

এইবার উঠে দাঁড়ালুম "হ্যাঁ, আমার নাম পলাশ!"

"আশ্চর্য! চিনতে পারছিস না! আমি সত্যেন!"

"সত্যেন! স্কটিশের সত্যেন!"

"স্কটিশের। মনে আছে, আমরা দু'জনে দশহরার দিন সাঁতরে গঙ্গা পার হয়েছিলুম!"

"খুব মনে আছে, তবে তুই আগেব চেয়ে অনেক মোটা হয়েছিস।"

"তুই কিন্তু যেমন ছিলি তেমনই আছিস। এখানে কী করছিস! নিশ্চিন্তে বসে আছিস! যেন, তোব বাড়ির বৈঠকখানা!"

"কিছুই না, সামান্যই সমস্যা, বাতটা কোথায় কাটাব ভাবছি! এখানে হোটেল, গেস্টহাউস, বেস্টহাউস কিছুই নেই।"

"উঠে আয় আমাব গড়িতে। ভাগ্যিস, এলুম এই পথে, নইলে হয় তোকে বাঘে খেত, নয় মানুষে টুকরো করত। এটা ডাকাতে-অঞ্চল! আর একনজরে তোকে আমি ঠিক চিনতেও পেরেছি, একই রকম আছিস বলে।একটুও পালটাসনি!"

গাড়িটা একেবারে ব্র্যাণ্ড নিউ। সত্যেন মনে হয় বড় মাপের ডাক্তার হয়েছে। ও লাইন চেঞ্জ কবেছিল, এইটুকু খবর আমি রাখতুম। গাড়ি চালাতে-চালাতে আমাকে প্রশ্ন করলে, "কী কাজে এসেছিস এখানে?"

"গালার চাষ দেখতে। যারা চাষ করে তাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বিক্রির কাজে সাহায্য করতে। একটা প্রোজেক্ট।"

"আমি কী করছি জানিস!"

"এইটুকু বুঝেছি, এমন একটা কিছু করছিস, যাতে মানুষ মোটা হয়, আর ঝকঝকে নতুন গাড়ি হয়।"

"আজ্ঞে না, এই গাড়িটা আমাদের ফাউন্ডেশনের। এখানে বিদেশী টাকায় আমরা একটা হাসপাতাল করছি। আমি তার চার্জে আছি। এখনও অনেক কাজ বাকি। একটু একটু করে সব হচ্ছে। বিল্ডিংটা হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি অনেক এসেছে, আরও অনেক আসবে।"

কথা বলতে-বলতেই আমরা এসে গেছি। বিশাল একটা জায়গায়, শেষ বিকেলের আলোয়

ঝকঝকে একটা বাড়ি। আর কোথাও কিছু নেই। লোকজনের বসবাস, দোকানপাট সব আমরা ছেড়ে চলে এসেছি। রুক্ষ জায়গা। গাছপালা তেমন কিছুই নেই। এই একটা অঞ্চল, যেখানে খুব জলকষ্ট। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম।

সত্যেন বলল, "আগে চা খাওয়া যাক, তারপর সব দেখাব। আমার লোকজন এখনও খুবই কম। সব আসবে একে-একে।এখানে একটা টাউনশিপ হবে। স্কুল হবে, রাস্তা হবে, পোস্টাফিস হবে। সব হতে আরও বছর পাঁচেক।"

চা এল। সঙ্গে একটা করে রোল, খুবই সুস্বাদু। তারিফ করতেই সত্যেন বলল "মোটা হওয়ার কারণটা বুঝলি! এর জন্যে দায়ী আমাদের এই গজেন্দ্র!"

গজেন্দ্র নিতান্তই যুবক। ফরসা সুন্দর চেহারা। সে হাসছে। সত্যেন বলল, "হাসিস না। এত সাঙ্ঘাতিক ভাল রান্নার হাত, মোটেই ভাল নয়। হেল্‌থ সেন্টারের হেল্‌থ খারাপ করার তালে আছ! তোমার জন্যে আমার খাওয়া ডবল হয়ে গেছে। অন্য কোথাও গিয়ে খেতে পারি না। স্বাদ পাই না। শোনো, আমার অনেক দিনের দোস্ত এসেছে। কী খাওয়াবে!"

"জব্বর শীত পড়েছে। ভাবছি খিচুড়ি করব, সঙ্গে কিছু ফ্রাই।"

"তোমার সেই অসাধারণ খিচুড়ি! ও ওয়ান্ডারফুল! ওটার কোনও জবাব নেই গজেন।"

সত্যেন আমাকে বলল, "এখানের জল মানুষের শত্রু! অ্যায়সা খিদে হয়! এই খাও, এই হজম! বিরক্তিকর ব্যাপার। পাশেই বিহার বেল্ট তো! তা গজেন, আব-একটা করে রোল হবে!"

"না, সার' হলেও দেব না। এখন আর লোভ করবেন না। রাতেরটা আজ একটু হেভি হবে।"

"দ্যাট্‌স রাইট, দ্যাট্‌স রাইট।"

সোয়েটার, শাল জড়িয়ে, হনুমান টুপি চড়িয়ে, গোটা এলাকাটা ঘুরে এলুম। একরের পর একর জমি! মেন বিল্ডিং ছাড়া সবই আন্ডার কনস্ট্রাকশন। জায়গায়-জায়গায় লোহালক্কড়, বালি, পাথর ডাঁই হয়ে আছে। ফটফটে চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার। দূরে বাঘমুন্ডি পাহাড়! দু-একটা বহু পুরনো কনস্ট্রাকশন, একটা পুরনো শেডও রয়েছে। কোনওকালে হয়তো এখানে একটা কিছু ছিল! এত নির্জন, এত ফাঁকা, আমাদের মতো শহরের লোকদের ভাল লাগে না। ভয়-ভয় করে।

রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চুটিয়ে গল্প হল। পুরনো দিনের, পুরনো বন্ধুদের কলেজ জীবনের কথা। মাঝে একবার কফি হল। তারপর খাওয়া। কিমা, কড়াইশুঁটি দিয়ে এইরকম সুস্বাদু খিচুড়ি, এই আমার প্রথম খাওয়া, এই আমার শেষ খাওয়া। সঙ্গে ফিশফ্রাই। সেটাই মার-মার, কাট-কাট। গজেনটাকে মেরে ফেলা উচিত। একটু পরেই জানতে পারলুম—গজেন একজন জুনিয়ার ডাক্তার। রান্নাটা তার হবি।

সত্যেন বলল, "তোর শয়নের ব্যবস্থা আমাদের নতুন সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে করেছি। নতুন খাট, বালিশ, বিছানা, মশারি। অ্যাটাচ্‌ড বাথ। সব নতুন।"

সত্যিই তাই। আমার ঘুমের অপারেশন দিয়ে কেবিনের উদ্বোধন। দেওয়াল নেই বললেই চলে। চারদিকে বড়-বড় কাচের জানলা। ঝকঝক করছে। নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। নেটের মশারি গুঁজে আলো নিভিয়ে, দুর্গা বলে শুয়ে পড়লুম। সবই কাচ, চাঁদের আলোয় পানসির মতো ভাসছি। বাঁ পাশে খাট ঘেঁষে বিশাল জানলা। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। গ্রিল, গরাদে, কিছুই নেই। শুয়ে-শুয়েই দেখছি, ফাঁকা মাঠ, চাঁদের আলো, আর বহু দূরে সেই প্রাচীনকালের শেডটা। যত অন্ধকার ঘাপটি মেরে আছে সেখানে।

সারাদিনের ছোটাছুটি, ঘুম এসে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। অদ্ভুত একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, বাঁ পাশের জানলাটা খুব কাঁপছে। ঝড় উঠল না কী! ফটফটে চাঁদের আলো, ঝড় এল কোথা থেকে! শুয়ে-শুয়েই দেখছি। জানলাটা ছটফট করছে। তাকিয়ে আছি সেইদিকে। হঠাৎ দেখি, জানালার নীচের টাওয়ার বোল্টটা হঠাৎ ওপরদিকে উঠে, ডান দিকে ঘুরে গেল। জানলার একটা পাল্লা অক্লেশে খুলে গেল। মশারির ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি হাত বের করে পাল্লাটা বন্ধ করে দিলুম।

শুয়ে আছি। ঘুম চটকে গেছে। জানলার কাঁপুনি আবার। আড় হয়ে শুয়ে-শুয়েই দেখছি। নড়তে নড়তে তলার ছিটকিনিটা ওপর দিকে উঠেছে। ডানপাশে নিজের থেকে ঘুরে গেল, পাল্লাটা ধড়াস করে খুলে গেল।

ভূতের ভয় আমার নেই, তবে বদমাশ লোককে আমি সাজা দিতে চাই। উঠে পড়লুম। দুটো পাল্লাই খুলে দিলুম। কই, হাওয়া-বাতাস তো কিছুই নেই। নিস্তব্ধ রাত, চাঁদের আলো, গোটা দুই বড়-বড় তারা। দূরে-দূরে শীতকাতুরে কুকুরের ডাক।

কোনও বদমাশের কাজ! ভয় দেখাতে এসেছে। পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। উঁচু ভিতের ওপর বাড়ি। ফুট চারেক নীচে জমি। কিছু ঘাস, কিছু কাঁকর। মারলুম লাফ।

কোথায় কী! কেউ নেই। আমি আর আমার এই রাত। চারপাশ চাঁদের আলোয় ফটফট করছে। কোথাও একটা কুকুরও নেই। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—লুক বিফোর ইউ লিপ। উত্তেজনায় সেই উপদেশ ভুলেছি। যে পথে নেমেছি, সে-পথে আর ফেরা যাবে না। এখন আমাকে ঘুরে ফ্রন্ট এনট্রান্সে যেতে হবে, ডাকাডাকি করে ওদের ঘুম ভাঙাতে হবে।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই আমার কেমন একটা ঘোর লেগে গেল, চাঁদের আলো ভরে গেল কুয়াশার মতো। জেগে আছি, ঘুমোচ্ছি না স্বপ্ন দেখছি! বোধের বাইরে। কেউ আমাকে চালাচ্ছে, হাঁটাচ্ছে। চলেছি সেই বিধ্বস্ত শেডটির দিকে। ক্রমশ অন্ধকার, আরও অন্ধকার। শেড্‌টার ভেতর চলে গেছি। ফাটাফুটো দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে। একপাশে অনেক ব্যারেল। কাঠকুটো। একটা কংক্রিট মিক্সার। ভাঙা ফার্নিচার। কোনও কিছুই মানছি না আমি। কলের পুতুলের মতো এগোচ্ছি। কেউ যেন আমাকে দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। গেঞ্জি আর পাজামা পরে আছি, তাও আমার শীত নেই।

হঠাৎ দেখি, সামনে কেউ ঝুলছে।

ওপরের কাঠের বিম থেকে ঝুলে আছে কেউ।

তার মাথা থেকে গলা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা। শরীরটা অল্প-অল্প ঘুরছে। আলো-অন্ধকারে।

কে?

আর মনে নেই। যখন জ্ঞান এল, সকাল রোদ। সত্যেনের বিছানায় আমি। গায়ে কম্বল পায়ে হট ব্যাগ। গজেন আমাকে গরম দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। টেবিলের ওপর টোস্ট ওমলেট।

ইতিহাসটা পাওয়া গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা ছিল আমেরিকান আর্মিদের বেস ক্যাম্প। তখন এখানে এক অফিসারকে জার্মান স্পাই সন্দেহে 'কোর্টমার্শাল' করা হয়েছিল। পরে এখানকার অ্যামুনিশন ডাম্পে আগুন লেগে অনেক সৈনিক মারা গিয়েছিল, ছাউনি পুড়ে গিয়েছিল।

সত্যেন বলল, "এখন কেমন ফিল করছিস।"

"একটু ঘোর আছে।"

"ঠিক হয়ে যাবে। খুব বাঁচা বেঁচে গেছিস। নে, টোস্ট খা, গজেনের ডবল ডেকার ওমলেটেই চাঙ্গা হয়ে যাবি। তোর কী ভাগ্য পলাশ! আমি শুধু শুনেইছি, তুই কেমন অতীতটা বর্তমানে দেখে ফেললি! গজেন্দ্র।"

"ইয়েস স্যার!"

"আজ আমার ফ্রেন্ডের অনারে।"

"চেপে গেছে সাব। কড়া মেনু।"

"গজেন্দ্র! তোমার তুলনা শুধু তুমিই।"
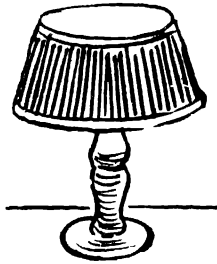
ভুতুরা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার বুঝি লেগেছে। রুমি, ঝুমি—দু-জনে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে রাধামোহন খুবই ফাঁপরে পড়ে যান। তিনি দোতলায়, দৌড়ে নীচে নামতেও পারছেন না। বয়স হয়েছে। সিঁড়িতে পা হড়কে গিয়ে গেল বছর টানা একমাস বিছানায়। তিনি জানেন, রুমি, ঝুমি খেপে গেলে তাদের আয়াটি আরও দিশেহারা হয়ে যায়।

যমজ হলে বোধ হয় এই হয়! এই ভাব, এই মারামারি। এর পুতুল ও ধরলেই হাত কামড়ে, চুল টেনে ধুন্ধুমার কাণ্ড!

ঝুমিটাই মার খায় বেশি। তবে পেছনে লাগার স্বভাব ঝুমিরই বেশি। রুমি পুঁটিমাছ, রুমির নাক খাচ্ছি, মচমচ করে যেন নাক চিবোচ্ছে! ঝুমি, আর যায় কোথায়! লেগে গেল। রুমিটা দিন দিন একগুঁয়ে জেদি হয়ে উঠছে। যত আক্রোশ ঝুমির ওপর। সে তার কিছুতেই ঝুমিকে হাত দিতে দেবে না। একটা বড় গামলায় সব খেলনা—পুতুল, রেলগাড়ি, টিয়াপাখি, খরগোস, ব্যাঙ—সবই জোড়ায় জোড়ায়। জেদ চেপে গেলে রুমি, ঝুমিকে কিছুই ধরতে

দেয় না। ধরলে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেয়।

তিনি সিঁড়ির মুখে এসে ডাকলেন, "এই আরতি, তুমি কোথায়!"

আরতির সাড়া নেই। ঘুমোতেও পারে। ঠিক মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে, আর খাটে দুটো মারামারি শুরু করেছে।

তিনি সিঁড়ি ধরে নামছেন—কী পড়ল, কীসের শব্দ! তিনি আর পারলেন না, "কী হচ্ছে রুমি!"

ঝুমির আর্ত চিৎকার, "দাদুমণি, আমাকে ভুতুরা বলছে।"

"কে ভুতুরা বলছে তোমাকে?

"আমি ভুতুরা, দাদুমণি?"

"না, কখনওই না।"

নীচে নেমে দেখলেন, বিছানা লণ্ডভণ্ড। আরতি নেই, বাথরুমে থাকতে পারে, অথবা কলতলায়। কলতলায় চান করলে এ-ঘরের চেঁচামেচি শোনা যায় না। রান্নার মেয়েটিই বা কোথায়!

তাঁকে দেখেই বুঝি এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রুমিও। রুমির অভিযোগ, "আমি পুঁটিমাছ দাদুমণি!"

"তোরা ঘুমোসনি। মারামারি করছিস!"

"আমি ভুতুরা দাদুমণি?" ঝুমির অভিযোগ।

"না, কখনওই নয়।"

এতে রুমি খেপে গেল, অভিমান, দাদুমণি তাকে ভালবাসেন না। ঝুমিকে বুকে নিয়ে আদর করছেন, সহ্য হবে কেন। ঝুমি ভুতুরা নয় তবে কে ভুতুরা? দাদুমণি ভুতুরা। দাদুমণি, তুমি ভুতুরা।'

"ঠিক আছে, আমি ভুতুরা। এবাব শুয়ে পড়ো। না, না, তুমি ঝুমির বালিশ ধরে টানছ কেন? ঝুমি এখানে শোবে। ঝুমি কত ভাল, কথা শোনে। ঝুমি, চোখ বোজো। এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে। রুমিও খুব ভাল। রুমি অবাধ্য হয় না, পেট ভরে খায়! রুমি পুঁটিমাছ হতেই পারে না।"

"আমি পেট ভরে খাই, না দাদুমণি?" রুমি দাদুমণির দিকে তাকিয়ে আছে।

ঝুমি বলল, "আমিও পেট ভরে খাই, না দাদুমণি!"

"সবাই খাও, এখন আর কথা না। চোখ বোজো। দরজা-জানলায় পরদা টেনে দিলাম।তোমরা দু'জনেই খুব ভাল। ঘুম থেকে উঠে আমরা পার্কে বেড়াতে যাব। খালধারের জঙ্গলটায় হরিণগুলো আছে, তারা কী বলছে জানো, রুমি, ঝুমি দাদুমণির হাত ধরে বেড়াতে আসবে। কী মজা। হরিণগুলোকে ঘাস খেতে দেবে না! বাচ্চা হরিণটা কেমন লাফায়।"

রুমি বলল, "আমাকে হরিণ দেবে দাদুমণি?"

"দেব।"

ঝুমিও উঠে বসল, "আমাকে হরিণ দেবে দাদুমণি?

"ওঠে না। উঠতে নেই। এখন সবাই ঘুমোয়। দুপুরে খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোয়। না ঘুমোলে হরিণের দেখাই পাওয়া যাবে না।"

সঙ্গে-সঙ্গে রুমি, ঝুমি দু'জনেই মুখে আঙুল দিয়ে শুয়ে পড়ল।

"এই তো, কত ভাল মেয়ে। কথা শোনে।"

তারপর ঘুমিয়ে পড়লে তিনি রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। আরতি খেতে বসেছে।

"ওরা ঘুমিয়েছে মেসোমশাই!"

"তোমাদের এত দেরি কেন বলো তো, চান করতে, খেতে। জেগে গেলে ঘরে একা থাকতে বাচ্চারা ভয় পায়, জানো! এত করে বলি, চানটান সকালেই সেরে নেবে।"

রাধামোহন জানেন, আয়াটি জবাব দেবে না। সকালে তার এত কাজ, কখন চান করে নেবে! কিছু না বললেও রাধামোহনবাবুর বুঝতে কষ্ট হয় না চুপচাপ থেকে কী বলতে চায় আবতি।

সকাল ন'টার পর বাড়ি ফাঁকা। সবাই অফিস, না হয় স্কুলে। বাড়িটায় তিনি আর তাঁর দুই যমজ নাতনি। আয়ার ওপর ভরসা রাখা যায় না, রাধামোহনবাবুর কানখাড়া থাকে। বাচ্চাদের মা, বাবাও বোঝেন, তিনি তো আছেনই, নিশ্চিন্তে অফিসকাছারি করে রাত করে ফিরলেও অসুবিধে থাকে না।

দুই সাধের নাতনিকে নিয়ে তিনি ভাল আছেন কি মন্দ আছেন, বুঝতে পারেন না। তবে নাতনিদের বাহানার শেষ নেই। কিছুই মুখে দিতে চায় না। উঠতে-বসতে গল্প শোনা চাই। তিনি রাম-রাবণের গল্প বলেন, শূর্পনখার গল্প বলেন, দুষ্টু খেঁকশিয়ালের গল্প যখন বলেন, বড-বড় চোখে তারা শোনে। দু'পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে যায়— যেন দুটো ডলপুতুল, চোখমুখ অতি সজীব। তখন লাফায় না, দৌড়য় না, দু'জন সত্যি খুব ভাল মেয়ে হয়ে যায়। আজগুবি যা কিছুই তিনি বলেন, রুমি, ঝুমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে।

স্কন্ধ কাটার গল্প বললে দু'জনই তাঁকে জড়িয়ে ধরে, "তারপর দাদু?"

"তারপর সেই রাজপুত্র কী করে! বরফ পড়ছে।"

"বরফ কী দাদু?"

"বরফ—দেখাচ্ছি।" ফ্রীজ থেকে আইসক্রিমের ট্রে বের করে দেখান।

"আমাকে বরফ দেবে?"

"না, না, ঠাণ্ডা লাগবে। ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি-জ্বর হয় জানো—তারপর না, পাইনগাছগুলোর পাতা ঝরে যাচ্ছে। বাগানে রাজপুত্রের কত গোলাপগাছ। চাই একটা গোলাপফুল। কিন্তু পাবে কোথায়। এত শীতে গোলাপগাছ বলল, ফুল দেব কী করে? দেখছ না, কী ঠাণ্ডা!"

"গোলাপফুল কেন দাদুমণি?"

"রাজপুত্র যে রাজকন্যার সঙ্গে নাচবে। রাজকন্যাকে গোলাপফুল যে দিতে পারবে, তার সঙ্গেই নাচবে।"

"আমি নাচব দাদুমণি।"

"গোলাপফুল ফুটুক। নাও এবারে হাঁ করো। হাঁ করলে গোলাপফুল ফুটবে।"

আরতি দুধ, ভাত, কলা চটকে চামচে ধরে আছে। হাঁ করতেই চামচ মুখে ঢুকে গেল।

"তারপর না সেই গুপি গায়েন বাঘা বায়েন ঢোল বাজাতে লাগল।"

'আমাকে ঢোল দেবে দাদুমণি?"

"দেব।"

"আমি ঢোল বাজাব।"

"বাজাবে। আবার হাঁ করো। হাঁ না করলে ঢোল বাজবে কেন?"

আরতি আর-এক চামচ মুখে দিলে বললেন, "দেখিতো পেট দু'খানা তোমাদের কতটা ঢোল হল!" দু'জনই জামা তুলে পেট দেখালে বলেন, "এবারে ঢোল বাজবে। আব দু' চামচ খেলেই বাজবে।"

ঢোল বাজবে শুনেই দু'জনে যত দ্রুত পারল মুখের ভাত গিলে ফেলল। কাবটা আগে বাজে! দু'বোনের রেষারেষি, কে আগে কতটা বেশি খাবে । কার আগে ঢোল বাজবে।

এই করে দুপুরের খাওয়া। আরতি দু'থালায় ভাত, ডাল, মাছ, শাক এবং দুধের বাটিতে দুধ নিযে খাওয়াতে বসলেই দু'জন দু'দিকে পালায়। একজন দরজার দিকে ছুটে গেল তো আর-একজন কলপাড়ে। ভাত খাওযানোটা বোজকার বিড়ম্বনা। তাই যত অসম্ভব আজগুবি গল্প বানিযে-বানিয়ে বলতে হয। কখনও বাজপুত্র, কোটালপুত্র, কখনও অজগবেব, হাতিব গল্প, টিভি চালিয়েও খাওয়ানো হয়। বাঘ, হরিণ, ভোঁদড়, খেঁকশিয়াল কিছুই বাদ যায না, গল্পের গোরু গাছে ওঠে। হাতির পাখা গজায়, "ওই দ্যাখ আকাশে একটা হাতি উড়ে যাচ্ছে।"

"কোথায়, কোথায়?"

"আগে হাঁ কর, তবে দেখাব।"

রাধামোহন আব পারেন না, আজগুবিবও শেষ আছে, তবে ইদানিং দুই বোনই বলছে, "ওই গল্পটা বলো দাদুমণি।"

"কোন গল্প?"

"রাজপুত্র নাচবে।"

তিনি বুঝতে পারেন, রাজপুত্র নাচলে তারাও নাচবে। গল্পটার মুশকিল, তাঁর সব ঠিকঠাক মনে নেই। বিদেশি গল্প কবে কোথায় পড়েছিলেন আবছামতো তার কিছুটা মনে আছে। বিশেষ করে একটি নাইটিঙ্গেল পাখি সারারাত হিমের মধ্যে বুকে গোলাপ গাছের কাঁটা বিঁধিয়ে গান গেয়েছিল। রাজপুত্রের জন্য গোলাপগাছে ফুল ফুটিয়েছিল। শীতের ঠাণ্ডায়

গোলাপগাছে ফুল না ফুটলে কী করা!

রাজার বাগানে এত গোলাপগাছ, অথচ ফুল নেই গাছে। গাছগুলোর পাতা ঝরে গেছে। বরফে গাছপালা-নদী জমে গেছে, অথচ চাই একটি গোলাপফুল। রাজপুত্র ফুলটি না পেলে রাজকন্যার সঙ্গে নাচতে পারবে না। এই পর্যন্ত তিনি মনে করতে পারেন। রাজকন্যার চাই গোলাপফুল।

হঠাৎ কী হল, এক দুপুরে দুই বোনেরই বায়না, "দাদুমণি, গোলাপফুল দেবে না! রাজপুত্র দেবে না?"

"ফুটুক। ফুল ফুটলে রাজপুত্রও চলে আসবে।"

"কবে ফুটবে!"

"এই ফুটবে। তোমরা না খেলে ফুটবে না। খাও।"

রোজ-রোজ এক কথা শুনবে কেন! কিছুতেই খাওয়ানো যাচ্ছে না। পালাচ্ছে, মুখে দিলে উগরে দিচ্ছে। শাসন করলে বাটি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আচ্ছা বিপদে পড়া গেল!

"গোলাপগাছ কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

"আছে। খাও। খাওয়া হলেই গোলাপ গাছের কাছে নিয়ে যাব।" আসলে ঠিক ওদের অন্যমনস্ক না করে দিতে পারলে রক্ষা নেই।

"আমরা ফুল দেখব।"

জানলার পাশে একটি করবীফুলের গাছ। করবীফুলের গাছটা দেখালেন, "এই তো ফুল, খাও।"

"ওটা তো করবীফুলেব গাছ।"

বাড়ির গাছপালা তাদের চেনা হয়ে গেছে। পেয়ারাগাছ দেখিয়েও বলার উপায় নেই, ওটা গোলাপগাছ। তারা সত্যিকারের গোলাপগাছ না দেখতে পেলে কিছুতেই খাবে না। এখন তিনি কোথা থেকে যে গোলাপগাছ দেখান! টবের গোলাপ কিনে আনলে হয়। তিনি আব পারছেন না। আরতিও দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে কাহিল। তাঁর আজগুবি কথাবার্তা নাতনিবা আর মোটেও গ্রাহ্য করছে না।

শেষে বললেন, "চলো তো দেখি, গোলাপ গাছ খুঁজে পাওয়া যায় কি না!"

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে দাদুর পায়ে-পায়ে সিঁড়িতে উঠে এল। ভাবলেন, ইস, বাজার থেকে একটা গোলাপগাছ কিনে রেখে দিলে পারতেন! তিনি সিঁড়িতে উঠছেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর হাত ধরে উঠছে। বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। একটু কিছু মুখে দেওয়া গেল না, অন্য কিছু দেখিয়ে তারপরই মনে হল দোতলায় তাদের কাঠের ঘোড়াটি পড়ে আছে। তিনি বললেন, "আগে ঘোড়ায় চাপো। ঘোড়াটা আকাশে উড়লে গোলাপগাছটা দেখা যেতে পারে।"

"না, না, ঘোড়াটা নড়ে না।"

"না, না, ঘোড়াটা ওড়ে না।"

"কোথায় পাই তবে বল! তোরা খেয়ে নে, তারপর না হয় সবাই মিলে গাছটা খুঁজব।"

"ফুল কোথায়?"

"গাছ কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

কী করেন রাধামোহন! বৃষ্টি নেই, বাদলা নেই, বাড়িতে একটা টবও নেই, টবে গাছও কেউ লাগায় না, কিন্তু চাই একটা গোলাপফুল। একটা গোলাপগাছ। তিনি এখন পান কোথায়!

ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি গাছের মোহ কাটানো যায়। তিনি দোতলার একটা জানলা খুলে দিলেন, দু'নাতনিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন জানলায়। তারা গ্রিল ধরে ঝুলছে। গ্রিল বেয়ে ওপরে উঠছে। গাছের কথা ভুলে গেলে তিনি রক্ষা পান। তিনি বললেন, "ওই যে স্কুলবাড়িটা দেখছ, সেখানে কিন্তু ভুতুরা থাকে। না খেলে ভুতুরা রাগ করবে।"

এরা ভুতুরা, স্কন্ধকাটা, রাক্ষস-খোক্কসের নামে জড়সড় হয়ে থাকে। ভুতুরার ভয় দেখিয়ে যদি খাওয়াতে পারেন! হাতে থালা নিয়ে আরতি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেদ্ধ ডিম, মাখন, ভাতে চটকে গোল্লা তৈরি করে রেখেছে। হাঁ করলেই মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

দুজনেই মুখ ফিরিয়ে নিল। খেল না।

আবার সেই এক কথা।

"গাছ কোথায়? ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

নাও, এবার বোঝো ঠ্যালা। ভবি ভুলছে না। রেগেমেগে রাধামোহন বললেন, "যাও, ভাত খেতে হবে না। আরতি, ভাত নিয়ে চলে যাও। খাবে না। কতক্ষণ তোরা না খেয়ে থাকতে পারিস দেখি!"

দু'জনেই অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলল। গ্রিল বেয়ে নীচে নেমে দু'জনেই ঘরের দু'কোনায় মাথা নিচু করে বসে রইল। টসটস করে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

"গাছ কোথায়? ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

"কাল নিয়ে আসব। বাজার থেকে নিয়ে আসব। লক্ষ্মী মেয়ে, খাও। তোমাদের মা এসে কষ্ট পাবে না, দুপুরে কিছু খাওনি শুনলে খারাপ ভাববে। জেঠু তোমাদের কত কিছু নিয়ে আসে। বড় মা তোমাদের কী ভালবাসে! রাইদিদি স্কুল থেকে ফিরে তোমরা খাওনি শুনলে মুখ ব্যাজার করে ফেলবে। খাও লক্ষ্মীটি।"

"গাছ কোথায়! ফুল কোথায়! রাজপুত্র কোথায়!"

"গাছ আমার পেটের ভেতর। শয়তান হচ্ছে দিন-দিন! এ কে রে বাবা, কিছুতেই গোঁ ছাড়বে না। এবারে কিন্তু মারব।" এতে রুমি, ঝুমি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দাদুমণি বকেছেন, দাদুমণি তো সবসময় আদর করেন, দাদুমণিকে তারা রাগতেই দেখেনি। জোরে ধমক দিলে তারা না কেঁদে পারে! দু' বোনই জড়াজড়ি করে কাঁদতে বসে গেল। আর তখনই তিনি দেখলেন, দোতলায় খোলা বারান্দায় একটা ফুলের গাছ। কারুকাজ-করা সুন্দর টবে একটি গোলাপফুলের গাছ। অবাক বিস্ময়ে গাছটি দেখতে-দেখতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই তো

গোলাপগাছ। শিগ্‌গির আয় রুমি, ঝুমি।" দরজা খুলে বাবান্দায় ছুটে গেলেন। রুমি, ঝুমিও দাদুর পায়ে পায়ে দৌড়ে গেল।

কাছে যেতেই দেখতে পেলেন, টবটির গায়ে চিত্রবিচিত্র কিছু ছবি, টবটি পেতলের হতে পারে, তামারও হতে পারে, মিনা-করা প্রাচীন ধাতুর সিলমোহর, ফারাওয়ের মুখ, পিবামিডের ছবি এবং কোনও নদীর অববাহিকা টবের গায়ে আঁকা। চটাওঠা, প্রাচীন মুদ্রার মতো বর্ণহীন টবটা এখানে কে রাখল? কে নিয়ে এল? গাছটা খুবই নির্জীব, পাতা নেই বিশেষ, যেন বরফের দেশ থেকে কেউ তুলে রেখে দিয়েছে। শীতে পাতা ঝরে গেছে। দুটো-একটা যাও-বা আছে তারও রং হলুদ। গাছেব কাঁটায় যেন শ্যাওলা জমে আছে। গাছটা দেখতে-দেখতে তিনি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই তো সেই গাছ!"

ততক্ষণে রুমি, ঝুমিরও কৌতূহল বেড়ে গেল।

"এটা কী দাদুমণি?"

"এটা গোলাপগাছ।"

"এটা কী?"

"এটা পাতা।"

রুমি, ঝুমির স্বভাব এরকম। নতুন কিছু দেখলেই এটা কী, এটা কী করা?

"এটা কী?"

"এটা টব। ফুলের টব।"

"এটা কী?"

"এটা মাটি। এটা কাঁটা, এটা গাছ। গোলাপ গাছ।"

"পাতায় হাত দিয়ে ঝুমি বলল, ফুল কোথায়? রাজপুত্র, কোথায়!"

গাছটাব পাতা ধরে রুমি বলল, "দাদু, ছিঁড়ব।"

"না, ছিঁড়বে না। গাছটার কষ্ট হবে।" রুমি, ঝুমি গাছটাব কাছ থেকে নড়তে চাইছে না। লাফাচ্ছে আব গাছটাকে দেখছে। রাধামোহন ভাবলেন, গাছটা এখানে কে নিয়ে এল! ভৌতিক কাণ্ড নয় তো! টবটাও বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। তিনিই-বা চেঁচিয়ে উঠলেন কেন, এই তো সেই গাছ! বড়ই ধন্ধে পড়ে গেলেন রাধামোহন।

"ফুল কোথায়? রাজপুত্র কোথায়?"

তখনই মনে হল, আরতি ওদের খাবারের থালা হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। জোব কবেও খাওয়ানো যায় না। নিজে না খেলে কে খাওয়াতে পারে! দুধ অবশ্য জোব কবেই খাওযানো হয়। তবে ইদানীং জোর করতে গেলেই রুমি, ঝুমি চেঁচাবে, "নিজে-নিজে খাব।"

"তবে খাও।" দুধের গ্লাস হাতে তুলে দিলে খায়, একটু খায়, আবার রেখে দেয়, পালায়, ছোটাছুটি, নিজে-নিজে খাব, খায় ঠিক, বড় সময় নেয়। কিন্তু দুপুরেব ভাত তো আর গেলানো যায় না। না খেতে চাইলে কী করা!

ঝুমি, রুমি চঞ্চল হয়ে পড়ছে। ঝুঁকে গাছটা দেখছে। টবের চারপাশে গোল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু।

"ফুল কোথায়?"

"ফুটবে। তোমরা খাও, খেলেই ফুল ফুটবে।"

দৌড়ে আরতির কাছে চলে গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এক গ্রাস মুখে নিয়ে ছুটে এসে বলল, "ফুল কোথায়?"

"সবটা শেষ করো, না হলে ফুল ফুটবে না।"

রুমি, ঝুমি দৌড়ে গেল আরতিব কাছে। গবগব করে খেল। জল খেল, আবার দৌড়ে এল, "ফুল কোথায়! আমরা খেয়েছি দাদুমণি।"

"গাছটাকে বলো, তোমবা খেয়েছ।"

"আমরা খেয়েছি।" গাছটাব কাছে মুখ নিয়ে দু'বোনই চেঁচিয়ে কথাটা বলল।

বাচ্চা ভূতের খপ্পরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গল্পটা শুনেছিলুম বাজপেয়ীদার কাছে। পুরো নাম জগদানন্দ বাজপেয়ী। তবে পদবী থেকে যা মনে হয, তা নন। কয়েক পুরুষ ধবেই এঁবা একেবারে আদ্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষ। বাজপেযীদা নিজে তো অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন, পরাধীনতার আমলে বহু বছব জেলে কাটান, সেই সময়ে ইংরেজদেব হাতে শারীরিক নির্যাতনও কম ভোগ করেননি। তবে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে দেশ স্বাধীন হবার পরে। তখন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকাব সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন, আর আমি একজন উঠতি সাংবাদিক, ওই একই কাগজের ববিবাসরীয় বিভাগে কাজ করি।

কাজেব ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের রবিবাসরীয় বিভাগে তখন খুব আড্ডা জমত। বাজপেযীদাও সেই আড্ডায় এসে যোগ দিতেন। মুড়ি, তেলেভাজা আর চায়ের সঙ্গে চলত নানা রকমের গল্পগুজব। বাজপেয়ীদাকে সেই আসরেই আমি প্রথম দেখি। মুরশিদাবাদের মানুষ, যেমন টকটকে গায়ের রং, তেমন ছ'ফুট লম্বা চেহারা, বয়েস হয়েছে, কিন্তু পেটানো

স্বাস্থ্য, শরীর এতটুকু টসকায়নি, তার উপরে আবার মুখে সবসময় এমন নির্মল একটুকরো হাসি খেলে বেড়াত যে, বয়েসের ভার যেন তাঁকে ছুঁতেই পারত না।

মজলিশি মানুষ ছিলেন, আর গল্প বলতেন চমৎকার। বেশির ভাগই ভূতের গল্প। এমন সব ভূতের গল্প, যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। আমি তো ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু বাজপেয়ীদা এমনভাবে গল্পগুলো বলতেন যে, শুনে মনে হতো, কী জানি বাবা, হবেও বা! তা এখানে যে গল্পটা তোমাদের শোনাব, সেটা তাঁরই কাছে শুনেছিলুম, তাই তাঁরই জবানিতে সেটা বলা যাক।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে, পেয়ালাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাজপেয়ীদা বললেন :

"আপনারা যে ভূতপ্রেত মানেন না, সে আমি খুব ভালই জানি। কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানেন, আমার জীবনে অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটেছে, যার কোনও ব্যাখ্যা আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। যেমন ধরুন, আমাকে যখন জেলের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের বাইরের বারান্দায় একজন লোক এসে দাঁড়ায়। আমার খুব চেনা লোক, মুরশিদাবাদের মানুষ, এক সময়ে আমাদের দলের হয়ে কাজকর্মও নেহাত কম করেনি। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বলে, 'তোর তো ছাড়া পাবার সময় হয়ে এল।' বলে সে আর দাঁড়ায় না, বারান্দা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দূরে চলে যায়। খানিক বাদে তাকে আর দেখতে পাইনি।

"সত্যি বলি, লোকটিকে দেখে আমার মুখে কোনো কথাই সরছিল না। আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। সে তো আমাদের মতো পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। তা হলে এই সন্ধ্যারাতে সে এখানে এল কী করে? এখন তো ভিজিটার আসার সময় নয়, জেল-ফাটক তো বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে? কিন্তু আমার অবাক হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল। পরদিনই জানতে পারি যে, আমার রিলিজ-অর্ডার এসে গেছে। অর্থাৎ লোকটি আমাকে মিথ্যে কথা বলেনি।

"তবে কিনা আসল ধাক্কাটা খাই দেশের বাড়িতে ফিরে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনি, মাত্র দু'দিন আগে জেলের বারান্দায় যাকে দেখেছি, শুধু দেখেছি নয়, আমাকে বারান্দা থেকেই জানিয়েছিল যে, আমার ছাড়া পাবার সময় হয়ে এল, সে নাকি হপ্তাখানেক আগে মারা গেছে।

"এখন বলুন, এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনারা। আরে মশাই, এর কি কোনও ব্যাখ্যা হয়? ব্যাখ্যা হয় না। আসল কথা আত্মা আছে। তেমন ভূতও আছে। জেলখানায় যাকে দেখেছিলুম, সে কি রক্তমাংসের মানুষ? মোটেই না। সে হলো আত্মা। তবে হ্যাঁ, যেমন ভাল আত্মা আছে, তেমন মন্দ আত্মাও আছে বই কী। আমি যাকে দেখা পেয়েছিলুম, সে হলো ভাল লোকের ভাল আত্মা। তাই জেলখানায় ঢুকে মানুষের রূপ ধারণ করে আমাকে

একটা খবর দিয়ে গেল। কী, আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না?"

বাজপেয়ীদার কথা শুনে বুঝলুম যে, আমরা যদি বলি, না, বিশ্বাস হচ্ছে না, তা হলে এক্ষুণি তিনি থামিয়ে দেবেন তাঁর গল্প। তাই হামলে পড়ে বললুম, "খুব বিশ্বাস হচ্ছে, খুব বিশ্বাস হচ্ছে। তবে কিনা ভাল আত্মার কথা তো শুনলুম, এবারে একটা খারাপ আত্মার গল্প শুনব। নাকি কখনও কোনও খারাপ আত্মার খপ্পরে আপনি পড়েননি?"

"তাও পড়েছি বই কী," বাজপেয়ীদা বললেন, "অনেকবার পড়েছি। একবার তো হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গার ধারেই অতি বিচ্ছিবি এক আত্মার পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলুম। সেবারে যে কী ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলুম, সে আর কহতব্য নয়। নেহাত ভাগ্যেব জোব, তাই তাব হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরতে পারি।"

"কী হয়েছিল?"

আর এক প্রস্থ চা এসে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। বাজপেয়ীদা চায়েব পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "বলছি।"

গল্পটা এবারেও তাঁরই জবানিতে শোনা যাক। চা শেষ করে, রুমালে মুখ মুছে, বাজপেয়ীদা বললেন .

"আমাদের দেশের বাড়ি থেকে মাইল তিন-চার দূরে একটা হাট বসে। মস্ত হাট, নানা রকমের বিস্তব জিনিস আসে সেখানে। আনাজপত্র, মাছ ইত্যাদি তো আসেই, শৌখিন মনোহাবি জিনিসও নেহাত কম আসে না। তা ছাড়া আসে দা কুড়ুল খন্তা কোদাল মায লাঙল পর্যন্ত। অর্থাৎ গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছুই সেখানে মেলে। আমার অবশ্য এত সব জিনিসের দরকাব নেই, স্রেফ হপ্তাখানেক চলতে পারে এইবকম আনাজপাতি কিনব। আব হ্যাঁ, হাট যেখানে বসে, তার আধমাইলটাকের মধ্যেই আমাব এক বন্ধুব বাড়ি, তার সঙ্গে এই ফাঁকে একবাব দেখাও করব, তাবপব সন্ধ্যে লাগার আগেই রওনা হব বাড়িব দিকে। অন্ধকারের ভয় নেই, শুক্লপক্ষের নবমী, আকাশে জ্যোৎস্নাব আলো থাকবে, গ্রামেব রাস্তা হলেও খানাখন্দে ভরা নয়, ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে চেনা বাস্তা ধরে বাড়ি ফেবা মোটেই শক্ত হবে না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন বাজপেয়ীদা। তারপর বললেন, "রওনা হয়েছিলুম চারটে নাগাদ, স'পাঁচটার মধ্যে হাটে পৌঁছে যাই। পশ্চিমা যে ভৃত্যটি সঙ্গে ছিল, আনাজপাতি কিনে তার মাথার ধামায় তুলে দিলুম। সে বলল, যা দিয়ে সে বাগানের মাটি কোপায়, সেই কোদালের লোহার ফলায় মরচে ধরে গেছে, নতুন একটা ফলা কেনা দবকার। বন্ধুটির সঙ্গে দেখাও করে এলুম তার বাড়িতে গিয়ে। তার কাছে শ'তিনেক টাকা পাওনা ছিল, তাও মিটিয়ে দিল সে। তবে তার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বেরিয়ে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছল। তাই সন্ধ্যে লাগার আগে আর ফেরার পথ ধরা গেল না, পথে নেমে দেখি, সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। ভাবলুম, তা হোক, আকাশে দিব্যি চাঁদ উঠেছে, তখন আর ভাবনা কীসের।

সঙ্গে অবশ্য কিছু টাকা রয়েছে, কিন্তু পথে তো আর চোর-ডাকাতের ভয় নেই, আর থাকলেই বা কী, আমি তো আর স্রেফ আমাদের ভৃত্যটিকে নিয়ে পথটা পাড়ি দেব না, হাট-ফেরতা আরও বিস্তর লোকজনকে নিশ্চয় সঙ্গে পেয়ে যাব। গ্রীষ্মকাল, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, হাটুরে লোকজনদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে-করতে নিশ্চিন্তে এই তিন-চার মাইল পথ চলে যাওয়া যাবে।

"কিন্তু খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েই ঠাহর হলো যে, পথ একেবারে নির্জন, আমাদের ওদিক থেকে যারা হাটে এসেছিল, কেনাকাটা শেষ করে তারা ফিরে গেছে। নেহাতই দু'চারজন লোক আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল বটে, কিন্তু তারা কাছাকাছি থাকে, খানিকটা গিয়েই তারা ডাইনে-বাঁয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যে-যার গ্রামের পথ ধরল। ব্যস্, আমরা একদম একা। সামনের আর পিছনে একটাও লোক নেই। সঙ্গী বলতে স্রেফ পশ্চিমা ভৃত্যটি, ওকে নিয়েই এখন বাদবাকি পথ আমাকে পাড়ি দিতে হবে।"

বাজপেয়ীদা আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপব বললেন, "সত্যি কথাই বলি, এতক্ষণ যে ভয়টাকে একদম আমল দিইনি, এইবারে সেটা হঠাৎ ফিরে এল। আরকিছু না, ডাকাতের ভয়। সঙ্গে তিনশো টাকা রয়েছে, এ যখনকার কথা বলছি, তিনশো টাকার দাম তো তখন নেহাত কম ছিল না। হঠাৎ যদি এই ফাঁকা পথে একদল লোক হঠাৎ রে-রে করে সামনে এসে দাঁড়ায় তো কী করব। শুনেছি এদিকে ডাকাতি বড-একটা হয় না, কিন্তু হতে কতক্ষণ! হাতে একটা লাঠিও তো নেই। আশেপাশে নেহাতই কিছু কাঁটাঝোপ আর বাবলা গাছ ছাড়া বড় রকমের কোনও গাছ পর্যন্ত নেই যে, তার ডাল ভেঙে মজবুত একটা লাঠির কাজ চালানো যাবে! তা হলে?

"এই সব ভাবছি, এমন সময় একটা বাঁকেব মুখে খুবই মিহি গলাব একটা কান্নার শব্দ কানে এল। একবার মনে হলো, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায়, তখন অমন একটা শব্দ হয় বটে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলুম যে, না, এটা বাতাসের শব্দ নয়। ভৃত্যটিকে বললুম, 'শুনছিস?' দাঁড়িয়ে গিয়ে, শব্দটা ভাল করে শুনে নিয়ে সে বলল, 'কোই বাচ্চা রোতা হ্যায়।' অর্থাৎ কোনও বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। বাঁকটা ঘুরে গিয়ে আর-একটু এগিয়ে দেখলুম, ঠিক তা-ই। রাস্তার ধাবে ধুলোর মধ্যে বসে একটা তিন-চার বছরের ছোট্ট ছেলে হাপুস নয়নে কাঁদছে। গায়ে জামা নেই, পরনে ইজের নেই, একেবারে উদোম বাচ্চা, শুধু গলায় একটা ধুকধুকি।

"এদিকে, মানে মুরশিদাবাদ জেলার এই এলাকায়, বিহার থেকে আসা দেহাতি মিস্ত্রি-মজুর, কুলি-কামিন কিছু কম থাকেন না, বাচ্চাটার গলার ধুকধুকি দেখে মনে হলো, তাদেরই কারও ছেলে হবে, কিন্তু ছেলেটাকে এইভাবে পথের মধ্যে ফেলে রেখে তারা গেল কোথায়? এ তো বড় বেখেয়ালি বাপ-মা, সম্ভবত হাটে এসেছিল, তারপর সওদাপত্র করে সামনে এগিয়ে গেছে, এদিকে বাচ্চা ছেলেটা যে পিছনে পড়ে রইল, সেই খেয়ালই নেই! গলা

উঁচিয়ে দু'চার বার হাঁক ছাড়লুম, কিন্তু সামনে থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বাচ্চাটাকে পথের মধ্যে এইভাবে ফেলে রেখে আমরাই বা এখন বাড়ি ফিরি কী করে? ফেলে রেখে গেলে তো মাঝরাত্তিরে শেয়াল কিংবা হেড়োলই একে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলুম যে, সঙ্গে করে একে আমাদেব বাড়ি নিয়ে যাব, রাত্তিরটা সেখানে থাকুক, তারপর কাল সকালবেলায় এর বাপ-মায়ের খোঁজে বেরোনো যাবে।

"কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেকে এতটা পথ হাঁটিয়েই বা নিয়ে যাই কী করে? পশ্চিমা ভৃত্যটিকে বললুম, 'এই, তুই তোর ধামাটা আমায় দে, তাবপব এই বাচ্চাটাকে তোর কাঁধে তোল্।'

তো তাই হলো। ধামাটা আমি আমার মাথায় তুলে নিলুম, আর বাচ্চাটাকে কাঁধে নিয়ে ভৃত্যটি আমার পিছনে-পিছনে আসতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিলুম। দেখলুম, ভৃত্যের ঘাড় থেকে তার গলার দু দিকে পা ঝুলিয়ে বাচ্চাটি বেশ জুত কবে বসেছে। এখন আর কাঁদছে না। মুখে যে হাসি ফুটেছে, চাঁদের আলোয় তাও চোখে পড়ল।

কিন্তু খানিকটা পথ গিয়েই খটকা লাগল একটা। ভৃত্যটি বারবার পিছিয়ে পড়ছে কেন? ওর তো ঠিক আমার পিছন-পিছনই আসার কথা। তা হলে? একবার জিজ্ঞেসও করলুম, হ্যাঁ বে ব্যাপাব কী? যে-ভাবে হাঁটছিস,তাতে তো বাড়ি পৌঁছতে রাত্ কাবার হয়ে যাবে। তাতে সে বলল, বাচ্চাটা নাকি দারুণ ভারী। শুনে হেসে বললুম, 'আমার ধামার মধ্যে পাঁচ সের আলু, দশ সেরি একটা কাঁঠাল, সের কয়েক বেগুন আর মস্ত একটা কুমড়ো বয়েছে। বাচ্চাটাব ভার কি তাব চেয়েও বেশি নাকি রে?'

"এব পরে আর খানিকক্ষণ কোনও কথা হলো না। কিন্তু তার পরে যা হলো, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। পিছন থেকে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাক শুনলুম, 'বাবু!' ভৃত্যটিব গলা, মনে হলো সে খুব ভয় পেয়েছে। পিছন না ফিরেই বললুম, 'কেন রে, আবাব কী হলো?'

"তাতে ওই কাঁপা-কাঁপা গলাতেই সে বলল, 'বাবু, ইসকা টেংরি তো বাড়্হত্ চলি!'

"অর্থাৎ, এর পা ক্রমেই বেড়ে চলেছে!

"এব পরে আর পিছন না ফিরে উপায় কী! কিন্তু পিছন ফিরে যা দেখলুম, তাতে আর আমার বাকস্ফূর্তি হলো না, একেবারে ভির্মি খাওয়ার যোগাড়।"

বাজপেয়ীদা আবারও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা এদিকে অস্থির হয়ে উঠেছি। বললুম, "কী হলো বাজপেয়ীদা, চুপ করে গেলেন কেন, পিছন ফিরে কী দেখলেন?"

'যা দেখলুম, তা আপনারা বিশ্বাস করবেন না ভাই।'

"বিশ্বাস করি বা না-করি, সে আমরা বুঝব। আপনি কী দেখলেন, সেইটে বলুন দেখি।"

"দেখলুম," বাজপেয়ীদা বললেন, "উঃ, সে-কথা ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়!"

"যাচ্চলে, কী দেখলেন, সেইটে বলুন না।"

"দেখলুম যে, ছেলেটা তো আমাদের বাড়ির চাকরের গলার দু'পাশ দিয়ে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ছিল, সেই ঠ্যাং দুটো লম্বা হয়ে গিয়ে একেবারে মাটিতে এসে ঠেকেছে।"

"তারপব ?"

"তারপরেই চাকরের ঘাড় থেকে মস্ত একটা লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পাশের মাঠের ভিতর দিয়ে ছুট লাগিয়ে কোথায় যে সে মিলিয়ে গেল, কিচ্ছু বুঝলুম না।"

"আর আপনারা ?"

"সঙ্গে-সঙ্গে মাথাব ধামা মাটিতে নামিয়ে আমিও ছুট লাগালুম। চাকবটিও দৌড় লাগাল আমার পিছনে পিছনে। দৌড়তে-দৌড়তে একবারও আর পিছন ফিরে তাকাইনি। একেবারে বাড়িতে পৌঁছে তবে থামি।"

গল্প শেষ করে বাজপেয়ীদা বললেন, "আছে রে ভাই ভাল-মন্দ সব রকমের আত্মাই আছে, তা আপনারা বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন।"

হ্যাংলা ভূতের গল্প

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যাংলা ভূতেব দিনরাত খাইখাই। ওকে নিয়ে অন্য ভূতেরা আর পারে না। হয়তো কোন বাড়িতে ভাল বান্না হচ্ছে। খবর পেলে হ্যাংলা ভূত সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে সেই বাড়ির দিকে। বান্নাঘবের বাইরে কোনো ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থেকে রান্নার সুবাস নেবে প্রাণ ভরে আর বিযেবাড়ি হলে তো কথাই নেই। ম্যারাপ বেঁধে রান্নার জোগাড়যন্ত্র শুরু করা থেকে শেষ লোকটির খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আশেপাশেই ঘুরঘুর করবে হ্যাংলা ভূত। নেহাৎ হ্যাংলা ভূত, তাই চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। না হলে মানুষজন দেখত, রান্নার গন্ধে হ্যাংলা ভূতের জিভ থেকে অঝোরে লালা ঝরছে। কিন্তু, ভূতকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে কে?

ইচ্ছে করলে হ্যাংলা ভূত নেমন্তন্ন বাড়ির রান্না থেকে নিজের অদৃশ্য হাত দিয়ে দু-চারটে লুচি মাছ কি রসগোল্লা সরাতে পারে। কিন্তু ভূত হওয়া সত্ত্বেও ওর মনে এখনো সংকোচ লজ্জা ভয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলো থেকে গেছে। তাছাড়া বিয়ে বাড়িতে বড় রোশনাই, মানুষজনেব ভিড়। তাই হ্যাংলা ভূতের সব সময় ভয়, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। হ্যাংলা ভূতের কিছুতেই খেয়াল থাকে না, মানুষের চোখ দিয়ে ওকে আর দেখা যাবে না।

অন্য ভূতেরা হ্যাংলা ভূতকে বলে, 'ভূত হয়েছিস। তবু খাবার দেখলে রাতদিন অত ছোঁক-ছোঁক করিস কেন রে? আমাদের দেখ না। আমাদের তো লুচি, মাংস, রাজভোগ

দেখলে বমি ঠেলে আসে—'

লুচি মাংস বাজভোগের কথায় হ্যাংলা ভূতের জিভে জল আসে। চুক করে জিভের জলটাকে ভেতর টেনে নিয়ে জবাব দেয় হ্যাংলা ভূত, 'ঠিকই বলেছ ভাই। বুঝি, এত লোভ ভালো নয়। কিন্তু কী করব বলো। রান্নার গন্ধ নাকে গেলে আর নিজেকে সামলাতে পারি না।'

অন্য ভূত ঘাড় নেড়ে বলে, 'বুঝেছি, বুঝেছি। তোর শরীরের মধ্যে মানুষ ঢুকেছে। ওঝা ডেকে মানুষ তাড়াতে হবে। চলি তবে ওঝা ডাকতে—'

হ্যাংলা ভূত আকুল স্বরে ডাকতে থাকে 'না ভাই, না ভাই—' কিন্তু কে কার কথা শোনে। তালগাছের মাথার ওপর দিয়ে অন্য ভূত হনহন করে ছোটে মানুষ তাড়ানো ওঝার খোঁজে।

ওঝা আসে। সঙ্গে অন্য ভূতের দল। সকলের চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। হ্যাংলা ভূতের কী হবে কে জানে। মানুষ তাড়ানো ওঝা মন্ত্র পড়ে, হুং পুং ভূতং মানুষং...হুং...পুং?

মন্ত্র পড়তে পড়তে গাবগাছের পাতায় তৈরী ঝাঁটা দিয়ে মাটিতে দাবড়ায় তিন বার। তারপর প্রশ্ন করে হ্যাংলা ভূতকে, 'বল, তোর আগের জন্মের কথা। বল শিগগিব বল।'

হ্যাংলা ভূত কান চুলকোয়, চোখ উলটোয়!

সরু খনখনে গলায় চিৎকার করে ওঝা, 'বল ব্যাটা বল। কী করেছিলি আগের জন্মে? নইলে—'। এই বলে গাবগাছের ঝাঁটা হাওয়ায় সপাং করে মারে তিনবার।

কান্না-কান্না নাঁকি সুবে বলতে শুরু করে হ্যাংলা ভূত, 'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে! চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, খরা। কোনো খাবার নেই। তিন দিন কিছু খাইনি। বড় খিদে পেয়েছিল। তারপর—'

ওরাং ওটাংয়ের মতো লাফাতে থাকে ওঝা, 'হ্যাঁ বল বল, বলে যা—'

'কাঁদা-পাঁক ঘেঁটে কী সব মুখ দিয়েছিলাম। ওসব ছাইপাশ খেয়ে ধুম জ্বব। তারপবই এখানে। তোমাদের এখানে সেই খিদেটা এখানো থেকে গেছে। খাবাব গন্ধ নাকে গেলে আর স্থিব থাকতে পারি না।'

'পেয়েছি পেয়েছি—' উল্লাসে চল্লিশ হাত উঁচুতে বিকট লাফ দেয় ভূতের ওঝা!

'হ্যাংলা ভূতের শরীবে আছে একটা হ্যাংলা মানুষ। ওটাকে তাডাতে হবে। ঝাঁটা পেটালে যাবে না। মানুষ তো। তাই ওটাকে পেট পুরে শুধু খাওয়াতে হবে একবার।'

একটু পবেই খাই-ভূতের কাছে খবর চলে যায়। হ্যাংলা ভূতের জন্য একবাব ভূরিভোজেব আয়োজন কবতে হবে। খবর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু। কর্মী ভূতেরা কোথা থেকে আনে ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি, রেকাব ভর্তি মাছ, মালসা ভর্তি দই আর হাঁড়ি ভর্তি রসগোল্লা।

অত খাবাব দেখে হ্যাংলা ভূতের চোখ মুখ মানুষের মতো চকচকে করতে থাকে। মালকোঁচা মেরে আসনপিঁড়ি হয়ে খেতে বসে হ্যাংলা ভূত। অন্য ভূতেরা সার দিয়ে বসে যায় হ্যাংলা ভূতের খাওয়া দেখতে।

ম্যাজিকের মতো নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায় ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি, রেকাব ভর্তি মাছ, মালসা ভর্তি দই আর হাঁড়ি ভর্তি রসগোল্লা। কিন্তু শেষ রসগোল্লার হাঁড়িটা আর সাবাড় করতে পাবে না হ্যাংলা ভূত।

পেল্লায় এক ঢেঁকুর তুলে হ্যাংলা ভূত বলে, 'যা সরিয়ে নিয়ে যা রসগোল্লার হাঁড়িটা। ওটা দেখলেই বমি পাচ্ছে।'

হ্যাংলা ভূতের ভেতর থেকে হ্যাংলা মানুষ বেরিয়ে যায়।

ভূত-প্রেতিনীর খপ্পরে

অসীমানন্দ মহারাজ

বৃষ্টি জোরেই পড়ছিল। তবে ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন তেমন ছিল না। তবু আমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গন্তব্যস্থলের দিকে না এগিয়ে বৃষ্টি আসাব অপেক্ষায় এক জীর্ণ চালা ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে-ঘরের চেহারাই বুঝিয়ে দিল, দীর্ঘকাল তা ব্যবহৃত হয় না। তাই গৃহস্থের দেখা পাওয়ার আশা করা বৃথা। সে-আশা আমি করছিলামও না। তবে আমারই মত আর এক পথচারী এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে।

আমাকে দেখে বলেছিলেন, আমার হাতে তবু লেডিজ ছাতা, আপনার হাতে তা-ও দেখছি না।

বলেছিলাম, তা ঠিক। বৃষ্টিটা হঠাৎ-ই এল। আর এমন বৃষ্টি, থামেও না। আপনার অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

একটু হেসেই বলেছিলাম, আপনি অপেক্ষা করার জন্য এলেন কেন? কিই বা শুকনা রাখতে পেরেছেন মাথাটি ছাড়া? খুব সত্যিকথা। এখন ভিজে জামা কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ শরীরের আরও ক্ষতি করা। তাহলে চলেই যাই। অভ্যাস বসত এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম

আর কি।

বলতে বলতে পথচারী আবার ছাতা মেলে যতই সম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

আমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির গান গাইছিলাম। না গাইলেই বুঝি ভাল হত। আরও কালো কালো মেঘ এসে জুটেছিল আকাশে। আর সে কী বৃষ্টি! রাত নামার আগেই চবাচর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল।

আমি সাহসী বলেই বরাবর সুবিদিত। তবু যেন কিসের আক্রমণে শরীবে একটা কম্পন অনুভব করেছিলাম।

চারদিকে ম্যালেরিয়ার দাপট ঠিকই, তাহলেও ভয়েই আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম।

চেমাগুড়ি আমার কাছে নতুন গ্রাম। তার পথ ঘাট, ঘরবাড়ি, মানুষজন সবই আমার কাছে নতুন। যে-পথচারীর সঙ্গে কথা হয়েছিল, তিনিও আমার কাছে অপরিচিত। সম্প্রতি সেখানে আমার চাকরি উপলক্ষে বদলি হযে আসা। কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ তখনও অনাগত।

এমন অবস্থায় তুমুল বৃষ্টিপাতের মধ্যে অন্ধকার বলে জনশূন্য পথে নির্জন চালাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকাটা মোটেই স্বস্তিকর মনে হচ্ছিল না।

দিন কয়েক আগে সর্দ্দিজ্বরে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে না থাকলে সুস্থ হয়ে ওঠা তো দূরের কথা, শরীরে হয়তো অন্য কোনও জটিল উপসর্গ দেখা দিত। তাই বৃষ্টিতে ভেজাটা পরিহার করতে চেয়েছিলাম।

দেড় কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে আসার ছযেরঘেরি যাওয়ার কথা। সেখান থেকে বাস ধবে বা তিন চাকার ভ্যানে ন কিলোমিটার গেলেই সাগরে আমাদের দপ্তরের ইন্সপেকশন বাংলো। কপিল মুনির আশ্রমের কাছেই। বৃষ্টিটা ঝেঁপে না এলে যাওয়াটা কোনও সমস্যা ছিল না।

মহামুশকিলেই পড়ে গিয়েছিলাম। ভিজতে ভিজতে যাওয়ার অর্থ গন্তব্যস্থানে না পৌঁছন পর্যন্ত ভিজে জামা কাপড়েই থাকা। ফিরে গেলে অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে ফেলা সম্ভব। তবে ফিরে গেলে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা পড়ায় সরকারের প্রচুর ক্ষতি।

যাব কি ফিরব ভাবতে ভাবতে আমি অস্থির হয়ে বারান্দায় পায়চারী করছিলাম। এতক্ষণে বৃষ্টি থামলেও তো পারত। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণই ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ফেরাটাই স্থির করেছিলাম। গিয়ে যদি কঠিন অসুখে পড়ে মারা যাই, তাতেও সরকারের ক্ষতি কম নয়। গ্রুপ ইন্সুরেন্স স্কীম থেকে আমার পরিবারকে দিতে হবে আশি হাজার টাকা। তাছাড়া আমার পরিবারের একজনকে চাকরিও দিতে হবে। আমার অনুপস্থিতিতে ক্ষতিটা নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি দাঁড়াবে না।

ফেরার জন্য পা বাড়াতেই একটা কঠিন কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম, যেও না। কথা

আছে।

কে-কে তুমি?

সবই বলব। আগে তুমি স্থির হয়ে বস।

বসতে পারলে তো ভালই হত। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা করছে।

বসার জন্য কিছু চাও?

অবশ্যই। মাটিতে বসতে আমি অভ্যস্থ নই।

ঠক করে একটা শব্দ হয়েছিল পায়ের কাছে।

বুঝতে পেরেছিলাম, বসার জন্য কিছু দেওয়া হয়েছে আমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে তাতে বসে পড়ে বলেছিলাম, এবার বল, তুমি কে? আগে তো ছিলে না। কখন এলে! কোথা থেকে ঢুকলে? পেছনে যে দরজা নেই, তা আমি জানি। দরজা এই একটাই, আর এখানেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখতে না পাওয়ার কারণ কি?

বাবা, এক সঙ্গে এত প্রশ্ন! অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল।

বলছিলাম, প্রশ্ন ধরে ধরে তোমাকে উত্তর দিতে হবে না। তুমি শুধু বলে যাও তোমার কথা। তাতেই আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব।

শোন তবে।

খানিকক্ষণ তবু নিঃশব্দে কেটেছিল। তারপরেই অন্ধকার থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে শোনা যাচ্ছিল রহস্যময় কারও অতীত কথা, আমার নাম কুঁদরু মালী। ফুলের চাষ করতাম আর ফুল বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করতাম। মোটা ভাত কাপড়ের অভাব ছিল না। বিয়ে করেছিলাম। তিনটি সন্তানের বাপও হয়েছিলাম। আমার বাপ মা মারা যাওয়ার পর তাদের পারলৌকিক কাজেও কৃপণতা করিনি। গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দেওয়াও বাকি রাখিনি। সন্তানদের ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয়, সে-চিন্তাও করতাম। তারা স্কুলে পড়ত। আর তাদের বই নিয়ে আমি ঘরে পড়তাম। অভিভাবকেরও যে মূর্খ থাকা উচিত নয়, তা বুঝতাম। দেশের খবরাখবরও রাখতাম। কোন্ দলকে ভোট দেওয়া উচিত, তা নিয়ে নিজের মধ্যে একটা মতাদর্শও গড়ে উঠেছিল। কারও কথায় অপাত্রে আমি ভোট দিতাম না। ব্যাপারটা যদিও গোপন রাখার কথা,কিন্তু কথায় কথায় প্রকাশ হয়েই পড়ে। আমার কথাবার্তা শুনে চতুর লোকেরা বুঝেই নিয়েছিল, আমি কোন্ দলের সমর্থক। আমি কোন্ দিকে ছাপ দিই। আমার সমর্থিত দল হেরে যেতেই আমার উপর নেমে এসেছিল কঠিন শাস্তি। আমাকে সপরিবারে ভিটেছাড়া করা হয়েছিল। আমাদের পাঁচজনকে ঠাঁই দিতে পারে, এমন আত্মীয় কেউ ছিল না। তাই দুরে গিয়ে ঘরভাড়া করেই আসতে হয়েছিল। কিন্তু আয় না থাকায় অল্প দিনেই সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল অর্ধাহার আর অনাহার। ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িওয়ালার গালমন্দও শুনতে হচ্ছিল। একটা অপদার্থ স্বামীকে গিন্নিও সহ্য করতে পারছিল না। ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় কান্নাকাটি করছিল। আরও ভয়াবহ দিন এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যাওয়াই ভাল মনে করেছিলাম। একা নয়,

সপরিবারে। বিষ সংগ্রহ করে পানীয় জলে মিশিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, এস সবাই মিলে জলই পান করি। খিদে না হোক, তেষ্টা তো মিটবে। একই সঙ্গে পাঁচজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলাম। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি কে। আমার ঢোকা কেন তুমি দেখতে পাওনি।

আমি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে বলেছিলাম, আমি তা অনেক আগেই অনুমান করেছিলাম। প্রকৃতির এখন ভয়াল রূপ। এর মধ্যে তুমি এবং তোমার মত যারা, তারাই তো রহস্যজনক ভাবে দেখা দেবে। তোমাদের কথা আমি গল্পে লিখব, কুঁদরু। একদলের সমর্থকেরা যদি আর একদলের সমর্থকদের সহ্য করতে না পারে, তাহলে কিসের গণতন্ত্র?

কুঁদরুর কণ্ঠস্বব ভেসে এসেছিল, বলেছ ভাল কথাই। কিন্তু গল্প লেখার সময় তুমি পাবে না যে!

আমি আরও ভয় পেযে বলে উঠেছিলাম, একথা কেন বলছ? তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে? মানুষের হিংস্রতা তোমাব মধ্যেও কেন থাকবে. কুঁদরু? তোমার তো লোভ লালসা থেকে মুক্ত থাকারই কথা। তোমাদেব আশ্রযের দরকাব হয় না, অবস্থানেব দবকাব হয না, বায়ুই তোমাদেব খাদ্য।

অন্ধকার ঘর থেকে কুঁদরুর কণ্ঠস্বরে আবার ভেসে এসেছিল, তা ঠিক। তবে আমাদেব দিক থেকে একটা অসুবিধে দেখা দিয়েছে। খিদে তেষ্টা দুটো নিযেই মরতে হয়েছিল সেদিন। বিষ মেশানো জল মুখে দেবাব সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হযেছিল মৃত্যু যন্ত্রণা। তেষ্টা মেটাবার সুযোগ পাওযা যায়নি। সেই তেষ্টা সর্বক্ষণেই অনুভব কবি। ভূতেব ক্ষিদে থাকে না, কিন্তু তেষ্টা থাকে। সেই তেষ্টা মেটে কেবল বক্ত পানে। বাববাব প্রয়োজন হয না। একবাবই। তাবপর তার খিদে তেষ্টা কিছুই থাকে না। তাব মুক্তিব পথ সুগম হয়।

প্রশ্ন কবেছিলাম, তোমাব স্ত্রী ও ছেলেমেযেদের খবর কি? তারাও কি তোমার মত তেষ্টায় কাতর!

অবশ্যই। একটু বাদেই তাবা আসবে এখানে। এটাই তো আমাদেব বাড়ি। বিরোধী দলেব লোকেবা আমাদের ভিটে ছাড়া করলেও এই আসাটা বন্ধ কবতে পারেনি।

কুঁদরু! আমি আর্তনাদ করে বলে উঠেছিলাম, তারপর বুঝি তোমরা পাঁচজনে মিলে আমার শরীরের রক্ত চুষতে থাকবে?

বুঝতে তোমার ভুল হয় নি। ভূতের আর মৃত্যু হয় না, কিন্তু তার কষ্ঠ থাকে। সে-কষ্ট থেকে অব্যাহতি সে নেবেই।

কুদরুর কথাগুলি আমার কানের কাছে যেন বিষধর সাপের মত হিস হিস করছিল।

ভয়ে আমি কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। তবে বুঝতে পারছিলাম, এত ভয় পেলে আমার চলবে না। মনে সাহস রেখে সে চেষ্টাই আমার করতে হবে, যাতে মৃত্যুকে রোখা যায়।

অনেকটা স্বাভাবিক স্বরেই বলেছিলাম, কুঁদরু, তোমাদের যারা ভিটে ছাড়া অনাহারে মরে যেতে বাধ্য করেছে, তাদের রক্তে তেষ্টা মেটাও। কোনও নিরীহ পথচারীর দিকে

লোলুপ দৃষ্টি দিয়ো না।

কুঁদরুর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, বাবু, বাঘ যেমন, আগে যাকে পায়, তাকেই খায়, আমরাও তেমনই। কার রক্তে তেষ্টা মেটাব। তাই নিয়ে শত্রুমিত্র বাছাই চলে না। আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা এলেই বুঝতে পারবে, তেষ্টায় তারা কী কষ্টটাই না পাচ্ছে! শত্রু ধরাব জন্য অপেক্ষা তারা করবেই না।

আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলাম, এই মুহূর্তে আমাকে পালাতে হবে। আর বৃষ্টিতে ভেজা না ভেজা, মরণ বাঁচন যেখানে সমস্যা!

আমি পা বাড়াতে যেতেই কুঁদরুর কণ্ঠস্বর এসে কাল ছোবল মেরেছিল, পারবে না। সাপ যেমন পালাতে না দিয়ে টেনে নেয় তার খাদ্যকে, আমরাও তেমন ভাবেই তোমাকে টেনে নেব। ধীরে ধীরে রাস্তায় নয়, এই অন্ধকাব ঘরেই তোমাকে প্রবেশ করতে হবে।

আমি কোঁকিয়ে উঠেছিলাম, কুঁদরু! আমাকে মেরো না। আমি একা নই। আমার সংসার আছে। আমি মরে গেলে আমার সাজানো বাগানও শুকিয়ে যাবে। শোনো কোনও বিচারক যখন তাঁর আসনে বসেন, তখন একটা কথা তিনি কখনও ভোলেন না, বিনা দোষে কেউ যেন সাজা না পায়। আমি নির্দোষ, কুঁদরু। আমাকে কেন সাজা দেবে?

সে-মুহূর্তে অন্ধকার ঘরে আরও কারও কাবও উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল।

কুঁদরুব কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল, আমাব স্ত্রী ও ছেলেমেয়েবা এসে গেছে।

আমি বড মিনতিব সুবে বলেছিলাম, তাদেব তুমি জিজ্ঞেস কব, কুঁদরু, নিশ্চযই তাবা আমাব বক্তে তেষ্টা মেটাতে চাইবে না। দুঃশাসনের বক্ত পান কবেছিল ভীম। তোমবাও এ যুগেব দুঃশাসনেব বক্তই পান কববে। তোমবা কযেকজনেব নাম বল আমাকে। তাদের মধ্যে অন্তত একজনকে আমি ধরে নিয়ে আসবই।

না না। আব একেবারেই অপেক্ষা করা যাবে না। আমরা আর সহ্য কবতে পাবছি না তেষ্টার কষ্ট। মেযেলি কণ্ঠস্ববও বড় নির্মমভাবে আঘাত করেছিল আমাকে। বুঝতে পেবেছিলাম তা কুঁদরুব গিন্নিবই কণ্ঠস্বর। তাদেব ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বরও শুনে ছিলাম, বক্ত চাই, রক্ত। বক্ত চাই, বক্ত।

যেন পিপাসায় ভেঙে পড়া মানুষের জল চাই, জল। জল চাই, জল—এরই করুণ অনুরণন।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার বাঁচার আর কোনও পথ নেই। আপনজনদের মুখ একে-একে মনের চোখে ভেসে উঠছিল। জীবিত মৃত সকল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কথাও ভাবছিলাম। স্মরণ করছিলাম আমার পরলোকগত বাবা-মাকে। দেবদেবীদের উদ্দেশেও প্রণাম নিবেদন করে চলছিলাম যেন শেষ বিদায়ের আগে। রণে বনে জলে জঙ্গলে বিপদে পড়লে যাঁকে স্মরণ করলে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাঁকেও স্মরণ করছিলাম বই কী!

তারপর তাকিয়ে ছিলাম ঘরের নিবিড় অন্ধকারের দিকে। পাঁচ জোড়া চোখ সত্যিই জ্বলছিল লোভী জানোয়ারের চোখের মত।

আর দেরি নয়। শুভস্য শীঘ্রম্। এস। এস।

হা-হা-হা! হা-হা-হা! সে কী বিকট হাসি।

আমি টলছিলাম। ঘেমে জল হয়ে যাচ্ছিলাম। তবু উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঘরের দিকে আমার না এগিয়ে উপায় ছিল না।

আমাকে ঘিরে ধরে তারা পাঁচজন উল্লাসে ফেটে পড়েছিল।

ভয়াল মৃত্যুকে আমি যেন প্রত্যক্ষ করছিলাম।

সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেব কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু কাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করব, তারা যে ছায়া! ছায়া কিনা তা ও পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। সজোরে ঘুষি চালিয়ে দিলাম। কিন্তু কিছুকে আঘাত করার অনুভূতি হচ্ছিল না।

শুধু তাদের খিল খিল হাসি আরও যেন উচ্চগ্রামে বেজে উঠেছিল।

আমি ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকে শেষ বারের মত স্মরণ করেছিলাম।

আকাশে তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাতের মত মুহুর্মুহুঃ সে-চমকানি। বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই অন্ধকার ঘর। দশটি ভূত প্রেতিনীর চোখ একই সঙ্গে নিভে গিয়েছিল। তাদের ছায়া শরীরও অদৃশ্য হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আমি তাদের কবল মুক্ত। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? মধুসূদনের কবিতার লাইন মনে হয়েছিল,

ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে।

তবে বিদ্যুতালোকে একটি বস্তু আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। সেটি করতাল। হয়তো কোনও বৈরাগী পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল পরিত্যক্ত ঘরে। জেগে উঠে চলে যাওয়ার সময়ে নিতে মনে ছিল না।

আমি একলাফে সরে এসে হাতে করতাল তুলে নিয়েছিলাম।

ঘর তখন আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শুধু ভূত প্রেতিনীর চোখ গুলিতেই লোভের আগুন। সে-আগুনে তাদের ছায়া শরীরও ঈষৎ দৃশ্যমান।

কুঁদরুর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠেছিল, করতাল লোহার হলে রেহাই পেতে। পেতলকে আমরা গ্রাহ্য করি না। তোমার রক্তই আমাদেব তেষ্টা মেটাবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

আমার ওপর তাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই আমি করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে উঠেছিলাম,

হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, রাম, রাম, হবে হরে।

হরে রাম, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।

সে গান গাইতে গাইতে আমি ঘর থেকে বারান্দায় এবং বারান্দা থেকে পথে বেরিয়ে এসেছিলাম।

আমাকে টেনে রাখবে, সাধ্য কি?

সত্যি ভূতের গল্প

মনিরা কায়েস

আমাদেব এই বাড়িটার ভাবী বদনাম আছে। পাড়ার লোকেরা বলে ভুতুড়ে বাড়ি। সন্ধ্যেব পব কোন রিকশাওয়ালা পর্যন্ত আসতে চায় না এদিকে। বেশি ভাড়া দিলেও না। কী যে ঝামেলা হয় তখন : বাস স্টপেজ থেকে বাবাকে প্রতিদিন সেই কোন মুলুক থেকে হেঁটে আসতে হয। সেদিন হয়েছে কী, দেশের বাড়ি থেকে এলেন দাদু, দাদীমা। আমাদের আগে কিছু জানাননি! সন্ধ্যেব সময় দেখি কী কাণ্ড! দাদু-দাদীমা মোড় থেকে বাকসো প্যাটরা টানতে টানতে নিয়ে আসছেন। মুড়ির টিনের মুখ খুলে পড়ে গেছে রাস্তায, দাদীমা মুড়ি ছিটাতে ছিটাতে এসেছেন। সেই মুড়ি খেতে খেতে পেছন পেছন এক রোঁয়া ওঠা নেড়ি কুকুর পর্যন্ত এসে হাজির। সেদিন আবার লোডশেডিং ছিল। দাদীমা যেই শুনলেন, রিকশাওয়ালা কেন এই বাড়িতে আসেনি— অমনি হ্যারিকেনের আলোর সামনে আমাদেব সবাইকে দাঁড করালেন। এমন কি পিচ্চির মা বুযাকেও ছাড়লেন না। ব্যাপার কী?— দাদীমা দেখবেন মাটিতে সবাব ছাযা পড়ে কিনা। শেষমেষ অবশ্যি আমাদের পোষা বেড়াল টুসী সেই ছাযাভুতো পবীক্ষা থেকে বাঁচালো। তাকে কোলে নিযে রিনি এসেছিল হ্যারিকেনেব

সামনে। আব টুসীটাব আবাব ভাবী বাগ হ্যাবিকেনেব ওপব। সে দিলো এক লাফ। এক মিনিটেই দাবাব ছকেব মতো সব উল্টেপাল্টে গেলো।

তো এই বাড়িটাব বদনাম আছে ঠিকই কিন্তু আমাদেব কিছু চোখে পডেনি তেমন। আমবা প্রথমে ছিলাম যে পাড়ায, সে পাড়ায ছিল বটে ভূতেব মতো ভূত। একদিন জজ সাহেবেব বাসাব ছাদে আমি আব মেজ আপা সত্যি সত্যি ভূত দেখেছিলাম। লম্বা, ধোঁযা ধোঁযা কেমন যেন প্যাকাটি মার্কা একটা ভূত দাঁড়িযেছিল সন্ধেব সময। আমি মেজপাকে নিযে আসছিলাম গানেব স্কুল থেকে। ভূত দেখে তো আমাদেব অবস্থা কাহিল, দু'ভাইবোন দিলাম ছুট। বাসায ফিবে তো মেজপা দিলে চোখ উল্টিযে আব আমি যাও বা বললাম, ভাইযা শুনে দিলো কান মলে।

এ পাড়ায এতো সস্তায এতো বড বাড়িটা বাবা পেলেন কেমন কবে এ নিযে অনেক জল্পনা-কল্পনা হযেছিল আমাদেব মধ্যে। কিন্তু 'ভূত' প্রসঙ্গ আসেনি কখনো। আমবা যেদিন পুবো লটবহব নিযে উঠলাম এখানে— তখন দেখলাম এ পাড়াব লোকজন বড্ডো অসামাজিক। কেউ একটু চোখেব দেখাও দেখতে এলো না আমাদেব। কেমন যেন দূবে দূবে গা বাঁচিযে থাকে সবাই। পবে অবশ্যি জানা গেলো ঘটনা। তখন বাড়ি বদলানোব কোন পথ ছিল না। কেননা, বাবা ছ'মাসেব অগ্রিম দিযে ভাডা নিযেছেন।

বিশাল বাড়ি। চতুর্দিকে বড বড গাছেব পাঁচিল। আব সামনে, পেছনে অঢেল জাযগা। আমবা তো মহা উৎসাহে সবজী বাগান, মৌসুমী ফুলেব চাষ কবতে লাগলাম। বাবা মাঝে মাঝে খুবপি দিযে গাছেব গোডাব মাটি চেলে দেন। মাও ঝাঁঝবি দিযে জল দেন বিকেল বেলা।

একদিন হযেছে কী, ছুটিব দিন। আবামসে ঘুমোচ্ছি দুপুব বেলা। হঠাৎ শুনি মা'ব চিৎকাব।

মা বলছেন, খোকা এই খোকা, এই ভব দুপুব গাছে পানি দিচ্ছিস কেন? শিগ্‌গিব ঘবে আয়। ঘবে আয বলছি।

আমি তো হাঁ। মা'ব মাথা টাথা খাবাপ হলো নাকি! আমি তো দোতলাব এই ঘবে ঘুমোচ্ছি। জানালা দিযে বাইবে তাকালাম। দেখি, একি কাণ্ড! ফুল বাগানে সত্যি সত্যিই তো আমি পানি দিচ্ছি! আমাব মতোই সে। তবে এ ঘবে কে? সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ উঠলো, মা এসেছেন। হাতে তালপাতা, ফবসা মুখ বাগে লালচে দেখাচ্ছে।

মা বললেন, বটে, এখন শুযে ঘুমোনোব ভান কবা হচ্ছে। এই টকটকে দুপুবে পানি দিতে গেছিলি কেন? বল, কেন গেছিলি?

আমি বললাম, আমি নাতো!

মা বললেন, ফেব মিথ্যে কথা! ভূতে পানি দিচ্ছিল তবে?

আমি আবাব বাইবে তাকালাম। দেখলাম, কেউ নেই সেখানে। তবে কী আমি পানি দিচ্ছিলাম! তাহলে ঘুমোচ্ছিল কে! মাঝে মধ্যেই এবকম গণ্ডগোল হতে লাগলো, শুধু বাড়িতে নয। স্কুলে, খেলাব মাঠে— সব জাযগায ঝামেলা লেগে থাকলো। স্কুলে আমি

হয়তো টিফিন পিরিয়ডে কমিক্স পড়ছি ক্লাশে বসে, দেখা গেল অন্যদিকে মাঠে ফুটবল খেলে এলো আরেক আমি। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার হলে একদিন ঝক্কর বেঁধে গেল। বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। ছেলেরা একটু পরপরই পানি খাবার ছল করে, বাথরুমে যাবার নাম করে কারক, বিভক্তি না হয় সমাসের সমস্যা দেখে আসছে বাইরে থেকে। আমি খারাপ ছাত্র হলেও টুকলি ফাইং এ নাম ছিল না আমার। অথচ এবার তাও হলো। আমাদের ঘরে গার্ড দিচ্ছিলেন পেশকার আলী স্যার। হঠাৎ তিনি আমার কান ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা না পড়িলে ধরা।

বলেই আমার শার্টের পকেট থেকে বের করলেন এক তাড়া কাগজ। তাতে ব্যাকরণের উত্তর লেখা এবং বলাবাহুল্য সেগুলো আমার হাতেরই লেখা।

আমি যতই বলি, স্যার বিশ্বাস করুন ওগুলো আমি আনিনি। স্যার ততোই আমার কান টেনে লম্বা করেন। বলেন, তবে ভূতে এনেছে?

মনে মনে বলি, হ্যাঁ স্যার আমার ভূতে। কিন্তু বলতে পারি না। আমার বিরুদ্ধে বাবার কাছে কড়া রিপোর্ট যায়। তারপর তো বুঝতেই পারছো আমার কী দশা হয়।

তবে এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটে যায়। দাদীমা সেদিন বিকেল বেলা হামানদিস্তায় পান ঘুটছিলেন। ঘুটুর ঘুট ঘুটুর ঘুট শব্দ হচ্ছিল বেশ। হঠাৎ উঠে এলেন মায়ের কাছে। বললেন, বাছা আলম যে এলো তো গেলো কোথায়? দেখতে পাচ্ছিনে যে!

মা বললেন, কখন এলো?

দাদীমা তো অবাক। গালে হাত দিয়ে বললেন, কেন তোমরা দেখোনি।

মা বললেন, না তো!

দাদীমা বললেন, বলো কী, আলম এসে আমার কাছ থেকে রিকশা ভাড়া নিয়ে গেলো!

মা বললেন, বোধহয় ভুল দেখেছেন মা। খোকনের বাবা তো সেই সন্ধ্যেয় ফেরে!

আমি বুঝলাম, এ তাহলে ঠিক বাবার ভূত। কিন্তু কাউকে বলা যাবে না। এমন কী দাদীমাকেও না। বললেই কেলেংকারী হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে প্রায় বছর খানেক হয়ে গেলো। এ বাড়িতে তেমন কোন ঝামেলা-টামেলা হয়নি। যা নিয়ে গল্প ফাঁদা যায়। তবে একদিক থেকে সবাই আরামেই আছি বলা যায়। মেহমান... টেহমান আসেটাসে না। চা-নাস্তার অত খরচাপাতি নেই। এমনকি বড় আপা-দুলাভাই কিংবা মামা মামী, ছোটকা কাকীমারা আগে যেমন কিছুদিন পরপরই একবার করে দেখাসাক্ষাৎ করতে আসতো— তারাও এ বাড়ির বদনামের কারণে কাছে ঘেঁষে না।

বড় আপা প্রায়ই রাগ করে অভিমানের চিঠি লেখে, মা তোমরা তো খুব সুখেই আছো ভূতের বাড়িতে। জামাই আদর করতে হয় না। খরচ বেঁচে যাচ্ছে তোমাদের।

বাবা-মা হাসেন। কিন্তু এই হাসি বেশিদিন থাকলো না। একদিন বাড়িওয়ালা এসে হাজির। তাঁর কথায় জানা গেলো, এ বাড়িতে নাকি ভূতের জ্বালায় কেউ এক মাসও টিকতে পারে না। আমরা যখন টিকে গেছি, তখন নিশ্চয়ই এ বাড়ির দোষ কেটে গেছে। সুতরাং এখন

বাড়িভাড়া বাড়ানো যেতে পারে।

শুনে বাবা তো রেগে অস্থির। মা-ও। আবার আমাদের নতুন বাসা দেখা চললো দিনের পর দিন। শেষে পাওয়াও গেলো। সাগরপাড়ায়। ভালোই বাসাটা। তবে এ বাড়ির মতো এতো বিশাল নয়। যাবার দিন আমি চালাকী করে ছাদে লুকিয়ে থাকলাম। দেখলাম যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ঘটলো। আরেক আমি দিব্যি মালপত্তর ওঠাতে লাগলো সবার সঙ্গে। দৌড়ে দৌড়ে ওপর-নীচ করতে থাকলো। আমি কিচ্ছু বললাম না। করো কাজ। কিন্তু একটু বাদে মা যখন সবাইকে ফালুদা খেতে ডাকলেন, তখন না নেমে পারলাম না। বিনা পরিশ্রমেই ফালুদা খেলাম। কিন্তু ততো মজা লাগলো না।

নতুন বাড়িটা, নতুন পাড়াটা আগের মতোই জমজমাট। সকাল-বিকেল লোক আসছে তো আসছেই। মিনিটে মিনিটে চা বানাতে বানাতে মা'র মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ভূতের বাড়িটাই ভালো ছিল। লোকজনের ঝামেলা ছিল না।

কয়েকদিনের মধ্যেই বড় আপা উইথ হোল ফ্যামেলি এসে হাজির। দেশ থেকে মামা-মামী, মামাতো ভাইবোনদের মিছিলও যথা নিয়মে আসতে থাকলো একের পর এক। মেঝেতে পা ফেলার জায়গা নেই। সবখানেই বিছানা পাতা। পড়াশুনো করবার নির্জন ঘর পাওয়া দায়। অথচ সামনে পরীক্ষা।

স্কুলে যাই। সেখানেও ভালো লাগে না। কেবল মনে হয়, কোথাও চলে যাই। কোথায় কে জানে। রিনিরও সেই দশা। এ বাড়িতে যেন কারুর মন টিকছে না। নির্জন পাহাড় থেকে হঠাৎ যেন আমাদেরকে মাছের বাজারে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

স্কুল ছুটির পর সেদিন শিহাব বললো, খোকন, যাবি নাকি একটা জায়গায়?

ঃ কোথায়?

ঃ অরুণদার বাসায়।

আমি লাফিয়ে উঠলাম। অরুণদার বাসাকে আমরা বলি বই-এর বাসা। বসবার ঘর থেকে শুরু হয়েছে বই-এর সারি। শোবার ঘর, করিডোর, বারান্দা-এমনকি রান্না ঘরের উঁচু তাকেও রয়েছে জায়গা না পাওয়া পুরোনো পত্রিকার স্তূপ। আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয়, না খেয়ে না দেয়ে ওখানে কেবল বই পড়ি। কেবল বই।

কিন্তু অরুণদাকে পেলাম না। সদর দরজার বিশাল তালাটা দূর থেকে আমাদের জিভ ভেংচালো। সন্ধ্যো হয়ে আসছে। শিহাব চলে গেলো। আমিও কী করি। বাসায় ফিরে আসি। দেখি কী কাণ্ড। এখানেও তালা মারা। ব্যাপার কী পঙ্গপালসহ বাড়ির লোকজন গেল কোথায়! উঠোনের দিকে আরেকটা দরজা আছে। দড়াম দড়াম করে দরজা ঝাঁকালাম। পিচ্চির মা বুয়া নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে!

না, দরজা খুললো পিচ্চির মা বুয়া, খুলেই সুড়ুৎ করে সরে গেল। নিশ্চয় চুপ করে কিছু খাচ্ছিল। একদিন বাসায় কেউ ছিল না। আমি ঘুমোচ্ছিলাম। তারপর ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে গেছি পানি খাবার জন্য। গিয়ে দেখি বুয়া মহা আনন্দে দুধ দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। আমাকে দেখে

তো পড়িমরি করে লুকিয়ে ফেললো বাটিটা। আর গলায় আটকে ফেললো মুড়ি। আমি অবশ্যি মাকে কিছু বলিনি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাঁক ছাড়লাম, কারেন্ট নেই নাকি! তো মোমবাতি জ্বালাও। আর আমাকে কিছু খেতে দিয়ে যাও। ভারী খিদে পেয়েছে।

দোতলার সব ঘর বন্ধ। মা'টা আশ্চর্য তো! সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গেছিল, ভালো কথা। কিন্তু আমি যে স্কুল থেকে ফিরে আসবো— এ কথা মনে নেই! কী করবো, বইখাতাগুলো হাতে নিয়েই ছাতে গেলাম। ছাতে গিয়ে দেখি, মেজ'আপা আর রিনি এক্কাদোক্কা খেলছে, এই সন্ধ্যাতেও তাদের খেলা শেষ হয় না। আমি এক লাফে ওদের মধ্যে গিয়ে হামলে পড়লাম।

মেজ'আপা ওঁরে বাঁবারে, মাঁনুষ রেঁ, বলতে বলতে ছিটকে পালালো। রিনিও। আমি ওদের পেছনে পেছনে দৌড়ুলাম। নীচে এসে দেখি, এই যা, কোথায় পালালো! পিচ্চির মা বুয়াকে পেলাম কলতলায়। বললাম, চালাকী পেয়েছো না? আমার খাবার কই?

পিচ্চির মা বুয়া হি হি করে হাসলো। বললো, আঁমরা তোঁ কিছু খাঁইনা গোঁ ছোঁট বাঁবু। দেঁবো কোঁথা থেঁকে?

আমি চমকে উঠলাম। একি! পিচ্চির মা বুয়া হাওয়া হয়ে গেল কোথায়! চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখি, কী সর্বনাশ। এটা তো আমাদের বাসা নয়! আমি ভুল করে অরুণদার বাসা থেকে আমাদের আগের বাসায় চলে এসেছি। আমি চোখমুখ বুঁজে দিলাম সোজা দৌড়। বাবারে, ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম আজ!

সাগরপাড়ায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঘোর সন্ধ্যে হয়ে গেলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়িতে ফিরে মাকে বললাম, মা শিগগির খেতে দাও। পেটে আগুন জ্বলছে।

মা অবাক হয়ে বললেন, কেন একটু আগে যে বললি খিদে নেই!

আমি বুঝলাম, সে এসেছিল। কিন্তু কিছু খেয়ে যায়নি।

ভূতেরা তো মানুষ নয় যে খাবে!

পাহাড়তলীর ভূত

শওকত ওসমান

সুদুর হিমালয়ের একটেরে নাইনিতাল।

ঐ জায়গার মায়া আমাকে আজ তিরিশ বছর বেঁধে রেখেছে। কেমন করে নদীর স্রোতে-ভাষা খড়কুটোর মত এইখানে পাহাড়তলীতে আটকে গেলাম, তা ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি।

অনেক দিন বাংলাদেশের কোন খোঁজ-খবর রাখিনি। খবরের কাগজের মারফত যেটুকু ছাপ আসে সেইটুকু পর্যন্ত। ব্যস? এর বেশি নয়।

বর্ষাকালের এক সকালে হঠাৎ আমার বাসায় স্কুল-জীবনের এক বন্ধু এসে হাজির। পাঁচ-সাত বছর আগে পর্যন্ত সে আমাকে চিঠি লিখত। এখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তারপর আর কোন খবর রাখিনি, আজ তাকে সশরীরে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম।

এমন অসময়ে— ???

চুপ কর। ছুটি কাটাতে এসেছি। আজ সাত-সাতটা বছর একটা চিঠি পর্যন্ত লিখিসনি।

একটু ঘাবড়ে গেলুম।

—তুই কি লিখেছিলি?

—সেদিকে আমার দোষ নেই, বুঝলি। আমার চিঠির উত্তর না পেলে আমি উত্তর দেব কেন?

আমার বন্ধুর নাম মোস্তাক। অভিমান তার সত্যি সঙ্গত। আমিও তাকে চিঠির উত্তর দিইনি।

—কুলীর কাছ থেকে মালপত্র বুঝে নে। রাখ বাজে কথা। সারা রাত ট্রেনে ঘুম হয়নি, কিছু খাওয়া আর ঘুমোবার ব্যবস্থা কর।

—সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খুব খুশি হলুম অনেক বছর পরে আজ বাংলা বলতে পেয়ে। হিন্দী আর আর পাহাড়ী ভাষায় জাবর কেটে, রুটি আর গোশ্‌ত খেয়ে আমার বাঙালি ছাঁট্‌কাট কিছু নেই। হঠাৎ দেখে বোঝাও মুশকিল।

বিকেলে বন্ধুকে নিয়ে শিকারে বেরুলুম।

ম্যাজিস্ট্রেট মানুষ। শিকারীর সাজ-পোশাক পরা, হাতে রাইফেল। পাহাড়-তলীতে আমার সুনাম যে আরো বেড়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। সবাই ভাববে আমার সাথে এমন সব লোকের আলাপ, যারা সাহেব। বন্ধুর সাথে হাঁটতে আমারও খুব ভাল লাগছিল। আজ কত বছর বাঙালি আদ্‌মী দেখিনি—উঃ।

সেদিন কিছু শিকার পাওয়া গেল না একটা ছোট হরিণ ছাড়া। পাহাড়তলী ছেড়ে বনের ভেতর বেশি দূরে যাইনি। কারণ বর্ষাকালে বড় সাপের ভয়।

প্রহব রাত্রির পর পাহাড়তলীর এদিক-ওদিক ঘুরে বাড়ি ফিরলুম। আমার উঠানের সামনেই একটা চেনাবের গাছ ডালপালা ফেলে তলাটাকে ছায়াঘন করে রেখেছে। সেখানে দুটো চেয়ারে দুই জনে মুখোমুখি হয়ে বসলুম। অনেক গল্প হলো। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল। আশ্বিনের ছুটিতে পোটলাপুঁটলি হাতে, গাঁয়ে-ঢোকার পথে ভিজে বাঁশ পাতার মর্মর আর কটু গন্ধ, মায়ের হঠাৎ হেসে ওঠা ডাক "ক'টার ট্রেনে এলি"—সব আজ মোস্তাককে দেখে মনে পড়তে লাগল। কতদূরে বাংলাদেশ!

গল্প করতে করতে অনেক হোয়ে গেল। দুই বন্ধু ঘুমোতে গেলুম।

আকাশে ভয়ানক মেঘ করেছিল। রাত্রে ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি হতে পারে, মনে হলো।

রাত দুপুর হবে টিক্‌টিক করে ঘড়িটা বেজে বেজে সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা গিলছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। জানালা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হল, ভয়ানক ঝড় উঠেছে।

আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি।

দুরন্ত বাতাসের গর্জন শোনা গেল দূরে। এক মিনিটে সে শব্দের আঘাত এসে লাগল আমার কাঠের ঘরে। জানালাগুলোও যেন উড়ে যেতে চায় আজ বাতাসের সাথে। থরথর কাঁপছে জানালা আর শার্সি আর সমস্ত ঘর। এমন ঝড়ের রাতে ইচ্ছা হয় জানালা খুলে বাইরের পৃথিবী দেখি, কিন্তু সাহস হয় না। একবার জানালা খোলা পেলে ঘরের কোন

সামগ্রী আস্ত থাকবে না।

ঝড়ের আক্রোশ ক্রমশ বেশি হতে লাগল। আমি বিছানায় ফিরে এলুম।

চোখ একটু জড়িয়েছে, হঠাৎ দরজায় জোর কড়া-নাড়া শুনতে পেলুম।

শুয়ে শুয়ে বললাম, কে?

—খোল। শিগ্গির দরজা—

—মোস্তাক? ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুললুম।

—কি-রে!

—শুনতে পাচ্ছিস না?

—কি?

—ঐ যে শব্দ।

আমি বললুম,—ও ত ঝড়ের শব্দ।

ঝড়ের শব্দ না হাতি। কোথাও ডাকাতি হচ্ছে। কত মানুষ গোঙাচ্ছে। চল বেরিয়ে পড়ি।

মোস্তাকের হাতে রাইফেল, পায়ে বুট। বন্ধুর সারা শরীরে অতি-ব্যস্ততা উপছে উঠছিল।

বললুম, 'আরে না—ঝড়ের দিন পাহাড়তলীর ওপার থেকে এমনি শব্দ শোনা যায়। আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। এত জোর শব্দ, মনে হয় সত্যি যেন ভূতেরা হাজার হাজার লোকের গলা টিপে ধরেছে আর তারা গোঙাচ্ছে।"

—সত্যি—তাই?

—আমি তোকে মিথ্যে কথা বলছি?

—কোথা থেকে শব্দটা আসে?

—পাহাড়তলীর ওপার থেকে মনে হয়। সেদিকে কেউ যায় না। আর পাহাড়ীরা বলে কি জানিস? ওখানের এক রাজার মানুষ বলি দেওয়ার শখ ছিল। পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষ ধরে ঝড়ের বাতে বলি দেওয়া হত। এই শব্দ তাদেরই গোঙানি। বর্ষা রাতে এখনো তাদের প্রেতরা চিৎকার করে।

পাহাড়তলীর ঐ দিকে কেউ যায় না?

—ভয়ে যায় না কেউ। আব শব্দটা কিসের হয় তাও ভাল করে জানা যায়নি। কেউ গেলে ভূতে তার গলা টিপে ধরে।

—তুই কোন দিন গিয়ে দেখিসনি কেন?

—ভয় করে। কেউ ফেরে না শুনেছি ওখান থেকে।

—ভয় করে—তোর মুখে এমন কথা শুনতে হল! তুই এইসব ভূত-পেরেত বিশ্বাস করিস?

—করি, না হলে ভয় লাগে কেন?

এখানে জংলীদের মাঝখানে থেকে থেকে তুইও জংলী হোয়ে গেছিস। মোস্তাক একটু

থেমে আবার বললে,—"কাল আমি যাব, যদি ঝড় হয়।"

—না, সে হয় না। জানিস ওদিকে পথ বড় খারাপ। বাঘ থাকে না যদিও। পাহাড়ীরা—যাদের এত সাহস, তারাও যায় না।

—রাখ বাজে কথা। ভেতো বাঙালি কিনা। নাঙ্গা অভিযানের কথা ত শুনেছিস—প্রাণ ঐ সাহেব জাতটার। আমাদের দেশের হিমালয়। আর তার অভিযানে যাবে সাহেবরা। এ দেশের লোকদের লজ্জাও হয় না।

লজ্জা না পেয়েই আমি ঘুমোতে গেলুম সে রাত্রির মতো।

পরদিন সন্ধ্যায় সত্যি ঝড় এলো খুব ঘনঘটা করে। তার সাথে সেই গর্জন আব গোঙানি।

মোস্তাক আর আমি ঘরের বারান্দায় বসে আছি। তাব সাথে অনেক তর্ক চলছিল ভূত আর প্রেত নিয়ে। সে নাছোড়বান্দা, আজ সে পাহাড়তলীর ওপাবে যাবেই আর প্রমাণ করবে কোন বিশেষ কারণের জন্য এই গোঙানিব শব্দ ভেসে আসছে। ভূতের গোঙানি নয়। তাকে অনেক বারণ করলুম। নানা অজুহাত দেখালুম, এ দেশেব জংলীরা পর্যন্ত ঐ দিকে যেতে ভয করে।

বন্ধু বললে,—আমি ত জংলী নই। তুই সুদ্ধ চল। ক' মাইল উৎরাই পার হয়ে যেতে হবে?

—বেশি দূর নয়, দেড় মাইল।

—কতক্ষণ আর লাগবে। ভেতো বাঙালি কিনা তাই এত ভয়। লজ্জা হয না?

আজ সত্যি লজ্জা পেলুম। কথামত তৈরি হতে হলো। পাযে পুরোনো বুট জোড়া লাগালুম। গায়ে খাকি সার্ট আর ওয়াটার প্রুফটা নিতে হলো যদি বৃষ্টি আসে। বন্ধুরও সেই বেশ। দু জনেব হাতেই রাইফেল।

তাড়াতাড়ি কোন বকমে খাওয়া সেবে বেবিয়ে পড়লুম। মাত্র দেড় মাইলেব পথ পাহাডতলী। তার পরেই ঘন বনে ভরা উৎবাইয়েব সরু পথ। এই দেড মাইল পথ হাঁটতে অবশ্যি কোন ভয় নেই। কারণ চারদিকে জংলীদের বস্তি। সকলেই আমাকে চেনে। বিপদ-আপদে ডাকলেই সাড়া পাওয়া যাবে। তারপরেই কিন্তু বসতহীন ঘন অরণ্য প্রদেশ। পাহাড় আর পাহাড়। তার বুকে সরু পথ-রেখা। পথ চলতে পদে পদে বিপদ।

বাড়ি ছেড়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, ঝম্‌ঝম করে বৃষ্টি এলো। তাড়াতাড়ি ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিলুম। আমি আগে আগে চলেছি, হাতে বড় লণ্ঠন। বেশ উজ্জ্বল আলো। চারদিকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরঝর ঝরছে আর ছিট্‌কে পড়ছে লণ্ঠনের কাচে।

একটা লণ্ঠন নেওয়া অন্যায় হয়েছে। একজনের পথ চলার জন্য বিশেষ সুবিধে। আমরা দুজন। এ তো আর বাংলাদেশের মাটির পথ নয়। এখানে পদে পদে খাদ খোন্দল। পা একটু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষে নেই। একদম খাদে।

পাহাড়ের ধারগুলো জায়গায় জায়গায় তীরের ফলার মত উঁচিয়ে রয়েছে, বুট না হলে পা ছিঁড়ে রক্ত বেরুতো। অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ প্রথমেই বুঝেছিলাম, না হলে হঠাৎ এমন বৃষ্টি

নামবে কেন। প্রায় এক মাইল গিয়েছি, এমন সময় বন্ধুর কানে একটা শব্দ গেল, আমাকে বললে দাঁড়াও, শোনো।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

বললে,—ঐ যে কিসের আওয়াজ হে। বাজানার মনে হচ্ছে।

বৃষ্টির ঝরঝর গান আর পাহাড়ের বাতাসের চিৎকার—দুই ভেদ করে আমারও কানে এলো অদ্ভুত বাজনার শব্দ;

টম্ ডাম্ ডিম্ বং টম্‌টম্ ডং
টম্ ডাম্ ডিম্ বং টম্‌টম্ ডং

ওঃ, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, জংলীরা পুজো করছে আর বাজনা বাজাচ্ছে।

বন্ধুর দিকে ফিরে বল্‌লুম, ও বাজনা পাহাড়ীদের এক রকম যন্ত্রের। ওরা বর্ষার দিনে ঐ রকম বাজনা বাজায়। হৈ হৈ শব্দ করে, ভাবে এতে রোগ-বালাইয়ের দেবতারা পালিয়ে যাবে। বর্ষার সময় জংলীদের ভেতর বড্ড অসুখ হয় কিনা!"

—তাই নাকি রে, বাজনাটা ত বেশ! চল্ না দেখে আসি।

—না, যেযে কাজ নেই এত রাতে। আর তুমি যে পাহাড়তলীব ওপারে যাবে। যেখান থেকে গোঙানি শব্দ আসে দেখবার জন্য!

"ঠিক বলেছিস্, আগে সেই কাজ।"

টম্ ডাম্ ডিম বং টম্‌টম্ ডং
টম্ ডাম্ ডিম্ বং টম্‌টম্ ডং

শব্দটা বেশ রে! মোস্তাক আবার বললে।

জংলীদের গানের শব্দ আরো কাছে মনে হলো। আমরা পাহাড়তলীর এক নির্জন পথ দিয়ে চলেছি। যে বস্তি থেকে শব্দ আস্‌ছিল তা অনেকটা নিচে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বন্ধুকে বললুম,

—দ্যাখ, ওরা কেমনে করে পুজো করে।

মোস্তাক আর আমি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। একটা আগুনের কুণ্ডু জ্বলছে দাউ দাউ করে, তার পাশে গোল হয়ে একদল জংলী মেয়ে আর পুরুষ হাত ধরাধরি করে নাচছে আর গান করছে—তার সাথে ঐ অদ্ভুত বাজনা।

টম্ ডাম্ ডিম্ বং টিম্‌টম ডং
টম্ ডাম্ ডিম্ বং টম্‌টম্ ডং

মাঝে মাঝে তারা থামছে তখন বাজনাটাও থামাচ্ছে। এই ফাঁকে তারা আগুনে কি যেন ছুঁড়ে ফেলছে, তারপর আবার তালে তালে নাচে। বেশ মজার ব্যাপার।

মোস্তাকই বললে, চল এখানে দাঁড়ানো আর চলে না। ফিরতে কত রাত হবে কে জানে।

দুই বন্ধু এগিয়ে চললুম। টম্ ডাম্ ডিম্ বং টম্‌টম্ ডং সুর ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল। শেষে আর কিছু শোনা গেল না। আমরা জংলীদের বস্তি ছাড়িয়ে বহু দূর এসেছি। বুঝতে

পারলাম।

এদিকে পথ-ঘাট আমার চেনা নয়। কিন্তু জংলীদের মুখে শুনেছিলুম পথ বেশ ভালই। তবে ওপথে কেউ যায় না। যখন তখন যাওয়া উচিত নয় কারো। দুজন সাহেব গিয়েছিল বহুদিন আগে ঐ শব্দের সন্ধানে। একজন ফেরেনি। আর একজন ফিরেছিল বোবা হয়ে। এ গল্পও শুনেছি। তবে বিশ্বাস হয়নি।

কিছুদুর হেঁটে ভালই লাগল। কারণ পথ খুব খারাপ নয়। মাথার উপর বৃষ্টি পড়ছে, তবে বেশি ঠাণ্ডা লাগছে না, তাই পথ হাঁটছিলুম বেশ স্বচ্ছন্দে। কিন্তু বেশি দূর এই আরাম সইল না আমাদের ভাগ্যে। বিঘে দশ পথ পার হওয়ার পর বড় বিপদে পড়লাম পথ নিয়ে। পথ অত্যন্ত সরু আর বুনো কাঁটা গাছে ভরা। গায়ে ওয়াটার-প্রুফ ছিল বলে সে যাত্রা রক্ষা। নচেৎ আর এগিয়ে যেতে হত না। কিন্তু খুব সাবধানে চলতে হয়। লণ্ঠনের আলো এখানে বেশিদূর পৌঁছায় না। চারদিকে পাহাড়ের-দেয়ালে আলো আটকে যায়। মোস্তাককে কয়েকবার বারণ করলুম। তাব বাড়াবাড়ির জিদে আমি সত্যি ব্যথিত হলুম।

এই কাঁটা গাছের জুলুম আমাদের বেশিক্ষণ সহ্য করতে হল না।

একটু উৎরাই পেরিয়ে আমরা যেখানে পৌঁছলুম, সেখানকার ভূমি সমতল। শাল আর নানা বনজ গাছে ভরা। তাবই তলা দিয়ে পাহাড়িয়া পথ এঁকে-বেঁকে দুরে এগিয়ে গেছে। পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝর্ণা। ঝর্ণা পার হয়ে তবে ঐ পথের রেখায় উঠতে হয়। লণ্ঠনের আলোয় ঝর্ণায় তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

মোস্তাক বললে, হ্যাঁ পানি বটে, এমন না হলে পানি।

স্রোতে কিন্তু আমরা পা ঠিক রাখতে পারছিলুম না। আর তলার কাঁকব সে অসুবিধা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। ঝর্ণাটা হাত পাঁচেক চওড়া। তার বেশি হবে না।

ওপারে পৌঁছতে, মোস্তাক বললে, তোর বুটের উপর কি যেন বেড় দিচ্ছে, দ্যাখ শিগগির।

লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম সরু লিকলিকে এক নীল সাপ।

সাপ—সাপ—সাপ—মোস্তাক। আমার চিৎকার।

বুট দিয়ে দু লাথি দে, বাছাধন টের পাবে।

মোস্তাকের কথা মত কাজ করলুম, বুটের দুটো লাথিতে সাপটা লতিয়ে পড়ল। লণ্ঠনের আলোয় দেখলুম কি সুন্দর সাপ! হাত দুই হবে, সরু নীল, সারা গায়ে সিন্দুরের দাগ। ফুটফুট দাগ মাথায়। বুটের চোটে জিভ বেরিয়ে পড়েছিলো, জিভটা রক্তের মত লাল।

আচ্ছা এ সাপের বিষ আছে? মোস্তাক জিজ্ঞেস করলে।

বিষ নেই, কি বলিস্! বারেক দেখেছিলি। জংলী সাপ। এক কামড়ে ভব নদী পার।

এক দম ভব নদী পার—অক্কা! মোস্তাক হেসে উঠল। আমরা আবার পাহাড়িয়া পথ ধরেছি। শাল অরণ্যানীর গর্জন, দুরাগত মনুষ্য গোঙানি আর বৃষ্টির ঝর্ঝর গান। আমরা একে অপরের কথা পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি না। আর যে ঘুটঘুটি অন্ধকার। এই পথটা সমতল এইটুকুই যা সুবিধে। আর সেই গোঙানির শব্দ খুব নিকটে মনে হয়।

কড়—কড়—কড়াৎ।

আকাশেব অন্ধকার চিবে এদিক থেকে ওদিকে পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ চমকে গেলো। তার সাথে সাথেই বজ্রপাতের শব্দ।

সামনের শালবনের মাথা হঠাৎ আলোয় আলোয় ভরে গোলো।

একি—আগুন ধরে গেছে। মোস্তাক দ্যাখ, চিৎকার করে বললুম।

ওর তলা দিয়ে আমাদের পার হতে হবে।

বর্ষাকালে বনে আগুন ধরে না, এমনি ঠাণ্ডা হযে যাবে, ছোটখাট বাজ, বেশি শব্দ ত হয়নি। চল এগিয়ে মোস্তাক মন্তব্য করল।

আবার জোরে বৃষ্টি এলো। তীরের ফলাব মত ঝরে পড়েছে মাটির বুকে, বনের গাছে, পাতায় পাতায়। না আর না।

মোস্তাককে বললুম, এখনো অনেক দূর যেতে হবে আর পারব না, তুমি পার যাও।

দে আমাকে লণ্ঠন, তুই আমাব টর্চটা নিযে ফিরে যা। গলায় তাব বিরক্তির ছায়া.

কি কুক্ষণে বের হয়েছিলুম! সামান্য জিদকে কেন্দ্র করে আজ বহু দিনের পর পাওয়া এক বন্ধুকে এমন কষ্ট দিতে হবে কে জানত।

লজ্জা করে না? বন্ধুর সেই তীক্ষ্ণ স্বর। আমার কানে বাজতে লাগল 'লজ্জা করে না?'

বাড়ি ফিরে আলো টিম করে শুয়ে পড়লুম।

ঘুম আসছিল না। নানা উৎকণ্ঠা বাইরে যে দুর্যোগের রাত্রি আব সেই বনভূমিতে মোস্তাক একা। কাজটা ভাল করিনি। না হয় কিছু কষ্ট হত আমার।

দূরে মহারাজার বাড়িতে বারোটার ঘণ্টা বেজে গেল, ঢং ঢং...। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

—বাবু—বাবু—

হঠাৎ আমাব ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার চাকব দুটো চেঁচাচ্ছে আব জোরে দবজাব শিকল নাড়ছে।

ঘুমে তখনও আমি ঢুলছি। চোখ কচলাতে কচলাতে জবাব দিলুম, কি হযেছে বে?

—বাবু, শিগগির আসুন—আপনার বন্ধু বাগানে পড়ে রযেছে।

আঁৎকে উঠলুম। বাড়ির বাগানে পড়ে রয়েছে? এক নিমেষে আমার সব মনে হতে লাগল। পাহাড়তলীর কথা, মোস্তাককে একা ফেলে আসার কথা।

কি হয়েছে বল, কোন দিকে। এগো তোরা।

ছুটতে ছুটতে আমার চাকরের কাছে খবরটা শুনলুম।

—বাবু, এত রাত্রে হঠাৎ চিৎকার শুনে আমাদেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে।—"ভূতে আমার গলা টিপে ধরেছে—মরে গেলাম— তোমরা বেরোও—তোমরা বেরোও।" আপনার বন্ধুব গলা আমরা চিনি। তাই তাড়াতাড়ি আলো হাতে বাইরে এলুম।

কেউ নেই। শুধু একটা গোঙানির শব্দ কানে এল। ভাগ্য ভাল, লণ্ঠনের আলোয় বেশী

খুঁজতে হয়নি। বাড়ির বার-বারান্দা থেকে আমার বাগানের দিকে নজর পড়ল।

—ওই যে আপনার বন্ধু মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। চলুন—শিগগির।

তিন জনে গিয়ে দেখলুম, মোস্তাক মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করছে।

কী করা উচিত এখন। আমাব একটা চাকব বললে, বাবু, আমি ওঝা ডাকতে যাই। পাহাড়তলীতে অনেককেই এমন ভূতে ধবে। তবে এমন শক্ত ভূত কাউকে ধরে না, এটা ঠিক।

তাই যা, বললাম।

মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। আমার বাগান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, ডাক্তারের বাড়ি। একব'র ডাক্তারকে ডাক দিলে হয়।

আমার কাছে যে চাকর ছিল সে বাধা দিলে। বললে বাবু, ডাক্তারে এসব রোগের কী কববে।

সতিাই ত। এইসব ভৌতিক রোগের ওষুধ ত ডাক্তার জানে না।

আচ্ছা, এক কাজ কর। বাবুকে ধর। এখানে ঠাণ্ডায় ফেলে বাখলে চলবে না। ধরে নিয়ে যেতে হবে। মোস্তাককে চ্যাংদোলা করে আমার কামবায নিযে এলুম।

না, ডাক্তার ডাকা উচিত। মন মানে না। তাই চাকরটাকে অবশেষে ডাক্তাবের বাড়ি পাঠালুম।

একটা ওঝা এলো। পাহাড়ী। স্থানীয লোক। তাব হাতে ঝুলি। তার ভেতর থেকে মাথার খুলি, ভল্লুকের বোঁয়া, বড শামুক ইত্যাদি বেব করে আমাব ঘবেব মেঝেয বসে মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

সে বললে, খুব বড ভূতে ধরেছে বাবু।

মোস্তাকেব গাযেব ওযাটাব-প্রুফ খুলে গবম কম্বলে জড়িযে দিলুম।

মোস্তাকেব শবীব ক্রমশ নিথব হতে লাগল। ভযে কাঁদতে লাগলুম।

খানিক মন্ত্র আওডানোব পব ওঝা বললে, বাবু এব গাযে একটা দাগ দিতে হবে একটু আগুন ককন। লোহার শিক গবম কবা চাই। বাবু, খুব বড ভূতে ধরেছে।

চাকব উনান ধবাতে গেলো।

কযেক মিনিট পবে এলো ডাক্তাব। তিনি ওঝাকে দেখে বললেন, এসব কী? তা হলে ডাক্তার ডাকাব কী দবকার ছিল।

আমি বললুম, দেখুন ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি। তাই ওঝা ডেকেছিলাম।

ইতিমধ্যে লোহার শিক দগদগে লাল করে পুড়িয়ে আনা হযেছে।

ডাক্তাববাবু বললেন, ওটা কী হবে?

ওঝা উত্তব দিলে, খুব বড দু-মাথাওলা ভূতে ধরেছে বাবু—গায়ে একটু ঘা করে ছ্যাঁকা দিতে হবে।

ডাক্তার বাবু ভযানক চটে গিয়ে বললেন, দরকাব নেই আমাব বোগী দেখবার। কী বুদ্ধি

আপনাদের! কী হয়েছে আমাকে দেখতে দিন আগে। এই ব্যাটা ওঝা, হাট্ যাও।

ওঝা ক্ষেপে উঠল।

ডাক্তারে ওঝায় দাঙ্গা বাধে আর কী।

আমি থামিয়ে দিলুম। পরে বললাম, মাপ করবেন ডাক্তার বাবু, আচ্ছা একবার শরীরটা পরীক্ষা করে দেখুন ত। ও মূর্ছা যাওয়ার আগে খুব চিৎকার করেছিল, আমার চাকররা শুনেছে।

স্টেথিশ্‌কোপ নিয়ে ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এক মিনিট পরেই জিজ্ঞেস করলেন, কী বলে চিৎকার করেছিলেন?

গেলাম-গো ভূতে আমার গলা টিপে ধরেছে—বেরোও, তোমরা বেরোও।

ডাক্তারবাবু মুখ হাঁড়ি করে আবার রোগী পরীক্ষায় মন দিলেন।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বাবু বললেন, ডিপ্‌থেরিয়া হয়েছে। খুব সিরিয়াস টাইপ। ভয়ানক জল-কাদা ঘেঁটে বোধ হয় খুব ঠাণ্ডা লাগিয়েছে।

ডিপ্‌থেরিয়া রোগ।

আমি অবাক হয়ে বললুম, ডিপ্‌থেরিয়াতে ত গলা বুঁজে যায়।কে যেন দুদিক থেকে টিপে ধরে, মনে হয়। তা হলে ভূত-টূত ওসব বাজে কথা।

ডাক্তারবাবু আমাকে মুখ ভেঙ্‌চে বললেন, আজ্ঞে—হ্যাঁ—। রাগ করবেন না, এই কালেও আপনারা ভূত মানেন। জংলী দেশে এসে আর কী আপনারা মানুষ আছেন? ঐ ডিপ্‌থেরিয়া রোগীটার গায়ে ছেঁকা দিলে কী হত বলুন ত, খোদা কেন আপনাদের মানুষ তৈরি করেছিল। লেখা-পড়া শিখেছেন! লেজ দিলে বনে চরে খেতেন।

চড়া কথাগুলো হজম করে ওঝাটাকে তখনই তাড়িয়ে দিলুম।

ডাক্তারবাবুর ভরসায় আমার মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল।

তিনি বললেন, উনি ভাল হবেন, সে আশা আমার খুবই আছে।

খোদার দয়া বলতে হবে।

কয়েকদিন পরে মোস্তাকের রোগ কমতে লাগল। একটা মজা করবার জন্য, তার কী রোগ হয়েছিল সে কথা জানালুম না—চাকরদেরও বারণ করে দিলুম। রোগের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতাম, ভূতে ধরেছিল। ওঝা ডাক্তার আসে, তবে রক্ষা।

আরো এক সপ্তাহ পরে বন্ধু চাঙ্গা হয়ে উঠল।

যেদিন মোস্তাক পথ্য পায় সেদিন বললুম, কি ভায়া তবে যে বলো ভূত নেই?

মোস্তাক ম্লান হেসে বললে, আর লজ্জা দিসনে, ভাই। সত্যি গোঁয়ারতুমির ফল পেলুম। ভূত আছে—ও শুধু মুখের কথা নয়। সত্যি ভূত আছে।

আমি হেসে বললুম, কী করে জানলি?

ঠকে শিখলুম। তবে শোন:

তুই ত আমাকে একা রেখে পালিয়ে এলি! আমি এগিয়ে চল্‌লুম। গোঙানি শব্দটা

ক্রমশ কাছে মনে হল। সেই শালবনের ভেতর দিয়ে কতক্ষণ হেঁটেছি মনে নেই, যখন শালবন শেষ হল তখন শব্দটা অত্যন্ত নিকটে। আরো তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগলুম। আমার জানা চাই কোথা থেকে ঝড়ের রাতে এই শব্দ আসে? শালবন পার হয়ে দেখি কয়েক শ' বিঘা জমি জুড়ে পানি থৈ থৈ করছে। পুকুর বোধ হয়। কত গভীর কে জানে। কিন্তু আসলে তা নয়। মাঠে বৃষ্টির পানি জমেছে। লণ্ঠন হাতে চবাং চবাং শব্দে পানি ভেঙে হাঁটতে লাগলুম। যেখানে জলাভূমি শেষ হল তার পরেই দেখি পাহাড়ের মাথায় এক ঝর্ণা আর পাশে অনেক বুনো লম্বা গাছের সারি। এত জোরে ঝর্ণা থেকে পানি লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে, তার গতি ঠিক করা দায়। আর গাছগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ঠিক তার উপরে। তাই এত শব্দ—মনে হবে যেন মানুষের গোঙানি। দূর থেকে অমন অদ্ভুত শোনায়।

তাবপর?

তারপর ফেরার পালা। পথে এত বিপদ। জংলী বস্তির মুখে আসার একটু আগে আবার ঝড় আর বৃষ্টি নামল। চারদিক থেকে গাছের ডালপালা বাতাসে উড়ে আসছে, ভয় হল পাছে মাথায় লাগে। মাথায় লাগল না সত্য, কিন্তু একটা মোটা ডাল এসে লাগল লণ্ঠনের কাচে। এক নিমেষে লণ্ঠনের কাচ গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল। আলো নেই আকাশে। ঘোর অন্ধকার। হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে লাগলুম। জংলী বস্তির কাছে এসে কত চিৎকার কবলুম, সাড়া পাওয়া গেল না। যে বাঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে আমরা জংলীদের গান শুনি সেখানে আসতে আমার মনে হল কে যেন আমার গলার দু-দিকে আস্তে আস্তে চাপ দিচ্ছে। হাত দিয়ে দেখলুম, কই কারো হাত নেই ত! চাপ আরো বাড়তে লাগল। প্রথমে ভয় পাইনি পবে তোর ভূত আর গলা টেপার কথা মনে পড়তে লাগল। সত্যিই ত ভূত না হলে অদৃশ্য হয়ে আর কারা এ কাজ করতে পারে। তখন প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলুম। আমার গলা কে যেন ক্রমশ জোরে টিপে ধরেছে। ভয়ে কী চিৎকার না করেছি—কে সাড়া দেবে অত রাত্রে? বাগানে এসে আর দৌড়াতে পারলুম না, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

আমি হেসে বললুম, তা হলে ভূত আছে মানিস ত?

মানি। তবে সন্দেহও হয়। মোস্তাকের জবাব।

আবার ভূতে ধরলে তবে বুঝি পুরো বিশ্বাস করবি?

ঐ কথা আর মুখে আনিস না ভাই। এখনো আমার গা শিউরে ওঠে।

সেই দিন বিকেলে আমাদের ডাক্তারবাবুকে চায়ের নেমন্তন্ন করলুম।

বিকেলে আমার বাগানে চা খাওয়ার বন্দোবস্ত হল।

যথাসময়ে ডাক্তারবাবু এলেন।

চা খেতে বসে আবার ভূতের কথা উঠল।

আমি বললুম, ভূত বলে কিছু নেই। আমাদের ভয় থেকে এই ভূতের জন্ম।

মোস্তাক প্রতিবাদ করে, ঠকে যদি শেখো তবে মানবে। আমি ত আর সন্দেহ করিনে।

এখনো গলায় ব্যথা রয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, কি হয়েছিল আপনার?

ভূতে ধরেছিল। শেষে ওঝা আর আপনি দুজনে মিলে ত সারান। ভুলে গেলেন এই ক'দিনে?

তখন ডাক্তারবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'ভূত কোথা, মশাই? আপনার ত ডিপ্‌থেরিয়া হয়েছিল খুব ঠাণ্ডা লাগার ফলে। তাই এই অবস্থা। আর—।

ডাক্তারবাবু আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে চোখ টিপে বারণ করলুম।

কিন্তু মোস্তাকের কাছে ধরা পড়তে হলো সঙ্গে সঙ্গে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার পিঠে এক কিল বসিয়ে বলল, স্টুপিড, আবার চোখ টেপা হচ্ছে। তবে যে বলিস, আমাকে ভূতে ধরেছিল। ডাক্তারবাবু আর জংলী ওঝা আসাতে রোগ ভাল হয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, মশাই সত্যিই ভয় থেকে ভূতের জন্ম। হয়েছে ডিপ্‌থেরিয়া, ভাবলেন ভূতে গলা টিপছে। এমনি ভয়।

তিন জনে হো হো করে হেসে উঠলাম।

এই ঘটনার পর ভূতের ভয় আমার চিরদিনের জন্য ঘুচে গেছে।

তোমরা ভূতে বিশ্বাস করো নাকি?

ভূতের কবলে ভূত

সাব্বিরুল হক

ব্যাটাদেব জ্বালায আর থাকা যাচ্ছে না এখানে। দুয়েকদিনেব ভেতব একটা ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে...শেষ না করা কথাটা বলে ন্যাকা তার নাকহাঁচি দিতে না দিতেই ক্যাক কবে ওকে চেপে ধরি আমবা; মানে ট্যারা, কানা, গেছো, মেছো, উটকো, শুঁটকো এবং আমি মামদো ভূত।

জম্পেশ একখানা আড্ডা হচ্ছিল। কি করা যায়, তা নাহলে কি কববো আর কিছুক্ষণ পর কি করতে যাচ্ছি এসব নিয়ে তক্কাতক্কি আর কি। একেকজন একেক বুদ্ধি দিচ্ছিলো, অন্য সবাই সেটার খুঁত ধরে সাথে সাথেই বাতিল করে দিয়ে নিজেরটাকে অনেক ভালো প্রমাণের জোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। এমন সময় ন্যাকার বেফাঁস কথা আমাদের সবাইকে নিভিয়ে দিল এক ফুঁয়ে।

আর সময় পেলি না। ট্যারা কানা গেছো আর মেছো একদম ক্ষেপে উঠল, এসব ঝামেলার কথা এখন কেন?

আমি হাত তুলে ওদের থামাই। শুঁটকোটা ড্যাবড্যাবে চোখে সবার দিকে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে আমার পক্ষ নিল। তাই না দেখে ন্যাকা ছাড়া আর সবাই রাগে চোখ লাল করে ফেলল।

তুই কাদের কথা বলছিস্ ন্যাকা? নরম করে জানতে চাই। ন্যাকা জোরে হ্যাচ্চো দিয়ে ওঠে। এতে পবিবেশটা আরো ঘোবালো আকার ধারণ করল। ন্যাকার হাঁচি একবার শুরু হলে নির্দিষ্ট সময় পরপর চলতেই থাকে। উপস্থিত জনতা মানে আমরা ভূতেরা বিরক্ত না হয়ে পারি না।

ন্যাকা দ্বিতীয় হাঁচিটা নাকে এনেও সামলে নিলো, দেখিসনি? ওদের একজনকেও দেখিস্নি?

কাদের একজনকে?

নতুন ভূত! একদল...নতুন ভূ...ভূ...হ্যাচ্চো...ভূত! গেছো মেছো দুই ভাই ঝাঁপিয়ে পড়ল ন্যাকা ভূতের উপর, ন্যাকা তোর ন্যাকামী রেখে ভালো চাস্তো খুলে বল্ সব।

ভূতের কিরে, আমি দেখেছি।

কবে থেকে দেখেছিস?

প্রথম দেখেছি তিন রাত আগে। তোরা তো জানিস রাতে আমার ঘুম হয় না। ঘুরতে বেরিয়েছিলাম দেখি কি ..

শুঁটকো এবাব চোখ উল্টে ফেলে প্রায়, ন্যাকা, গুলবাজী করেছিস তো নাক ভেঙে দেবো তোর।

তা দিস। আগে আমার কথা শোন আর ওদের ভাগাবার প্ল্যান কর। তো ওদের দলটা দেখে আমি থমকে যাই। মণ্ডপের সামনে বসে দিব্যি গোলমিটিং কবছিল। হঠাৎ দেখে ফেলে আমাকে।

তারপব?

সবাই জানতে চাই। গেছো মেছো একজন আরেকজনের কাঁধ চেপে ধরে। উটকো এমনিতেই কিছু বোঝে না; এই মুহূর্তে আরো ঠেস ধরে গেল।

তারপর?

তারপর আর কি, সবগুলো উড়ো ভূত মিলে এমন তাড়া লাগাল আমাকে! হ্যাচ্চো দেয়ার জন্য আবার নাক মুখ কোঁচকালো ন্যাকা।

তা তুই কি করলি?

এক দৌড়ে না.. না... হ্যাচ্চো—নানার বাড়ি চলে গেলাম।

এই জন্যই, খুব বুঝে ফেলেছে ভঙ্গিতে বলল গেছো মেছো ভ্রাতৃদ্বয়, গত দুদিন পাত্তাই নেই তোর।

হ্যাঁ। এই কথাটা এতক্ষণ ধরে বলতে চাচ্ছি কিন্তু তোদের জন্য পারছি না।

দেখতে কেমন ওগুলো?

একেকটা একেক রকম। কোনোটা বাদুড়ের মতো, কোনোটা পাখাঅলা ড্রাগন আর

কোনোটা কেশরের বদলে ডানা লাগানো সিংহ। আর রূপ পালটায় কতক্ষণ পর পর।

বলিস কি?

নিজের চোখে দেখতে চাসতো রাত্রে চলিস আমার সঙ্গে।

আজ রাতেই?

বিষয়টা আমাদের আলোচনায় প্রাণ জাগালো। ন্যাকার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে বিরাট একটা সমস্যা শুরু হলো বলে। হ্যাঁরে মামদো, তুই কি আমার কথা বিশ্বাস করছিস না? আমি ভাব দেখালাম যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন, আসলে মনে মনে ধরেই নিয়েছি ওসব ন্যাকার ন্যাকামো ছাড়া আর কিছু না। তুই তো ভূতের কিরে কেটে বললি, এখন অবিশ্বাস করি কি করে বল? তোর কথা সত্যি হলে ভূতের রাজ্যে ভূতের হামলা হচ্ছে বলতে হবে। মানে...

মনে উটকো আর শুঁটকো একযোগে জানালো, 'মানে ভূতের খপ্পরে পড়তে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু ওগুলো সত্যিই কি ভূত? ভূত না, ভূতেরও ভূত ওস্তাদের ওস্তাদ। আমাদের এতদিনকার আড্ডাখানা ওরা দখল করে নিচ্ছে।

ওরা যে আমাদের এলাকা দখল করতে যাচ্ছে। এটা তুই ধরে নিচ্ছিস কেন?

তাহলে কি জন্যে এসেছে?

অন্য কাবণ থাকতে পাবে। হয়তো বেড়াতে এসেছে।

ভীষণ জোরে দুবার হাঁচি দিল ন্যাকা। তার কথা শুনে এমনিতেই সবই গেছে বিগড়ে তাব ওপর ক্রমাগত হাঁচি দেয়ায় পারলে ন্যাকার নাকের ফুটোটাই বন্ধ করে দেয় এমন একটা ভাব। সবাইকে লক্ষ্য করে আমি বলি, তোরা কি যাচাই করতে চাস ওর কথা সত্যি কিনা?

তা তো বটেই। একমত সকলে। কিন্তু তারপরই উটকো শুঁটকোকে গররাজী মনে হলো। আমাদের কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ভালো মনে হচ্ছে না।

তার মানে তোরা থাকছিস না?

না মনে হয়।

গেছো, মেছোও পিঠ দেখলো। আমরাও খুব সম্ভব থাকছি না। ট্যারা, কানা এতক্ষণ পর কথা বললো, কোথাকার কোন্ ভূত এসে ন্যাকাকে তাড়া দেবে আমরা বসে থাকবো? মোটকথা ন্যাকার কথা সত্যি কি না কে কে পরীক্ষা করতে চাস?

শুধু ট্যারা আর কানাকে হাত তুলতে দেখা গেল। উটকো শুঁটকো ঠাঠা করে হেসে উঠল, কিরে কানা, তুই কি দিয়ে ভূত দেখবি। গেছো মেছো দ্বিগুণ জোরে হাসে, কেন ওতো কান দিয়ে দেখতে পায়।

তোদের ফাজলামী রাখ্ তো থামিয়ে দিলাম ওদের। কাজের কথা বল। আমি কানা আর ট্যারা রাজী, কানা শব্দ শুনে বুঝতে পারে। এখন কথা হলো কবে যাচ্ছি?

এরপব অনেক তর্কবিতর্ক হলো। ন্যাকার কথাকে আদৌ গুরুত্ব দেয়া যায় কি না এ

নিয়ে তুমুল হট্টগোল হয়ে গেল একদফা। তারপর ঠিক হলো আমি, ট্যারা আর কানা ন্যাকাব সাথে যাব। বাকীরা আমাদের আড্ডাখানায় অর্থাৎ এই পুরনো মন্দিরের বটগাছটার নিচে বসে অপেক্ষা করবে। আমরা কোনো ঝামেলায় পড়লে তারা সাহায্য করতে ছুটে যাবে।

দিনের বেলায় চলতে ফিরতে অসুবিধে হয় আমাদের, রাতের বেলায় হয় না। মানুষের দিন আর আমাদের রাত। ন্যাকার কথা মতো আমরা প্রস্তুত হয়ে এলাম মন্দিরের বটতলায়।

ঝিঁঝিঁ ডাকা রাত। ন্যাকা কিছুক্ষণ পরপর হ্যাচ্চো দিচ্ছে। এ দেখে ক্ষেপে উঠেছে কানা আর ট্যারা। গেছো, মেছো উটকো আর শুঁটকো বসে রইল বটগাছের নিচে। কয়েক দফা হাসি ঠাট্টা করে নিয়ে বিশেষ করে আমাকে নিয়ে।

ন্যাকা বলল, মণ্ডপেব পেছন দিক দিয়ে যাচ্ছি আমি। তোরা লুকিয়ে থাকবি এ এ হ্যাচ্চো এ পাশে। মন্দিবের মণ্ডপ ভবনেব কাছাকাছি আসতেই বিকট একটা শব্দ কানে এলো। মনে হলো সিংহের গর্জন। কিন্তু এদিকে সিংহের গর্জন শোনা যাওয়ার তো কোনো কথা নয়। মণ্ডপেব চাবপাশে ঘন জঙ্গল। তাবপর পুজো বেদী। বিকট শব্দ শুনে আমি গেলাম চমকে। কানা লাফ দিলো পাঁচ হাত শূন্যে। ট্যারার চোখ দুটো দুদিকে এতবেশি সরে গেল মনে হল যে, মাথার দুপাশে বসানো হয়েছে এগুলো। ন্যাকা ততক্ষণে ঘুবে চলে গেছে মণ্ডপের পেছন দিকে। তাব কথা মতো আরো খানিকটা সামনে গিযে আড়াল নেয়ার চেষ্টা কবতেই আবারও শোনা গেল মিলিত গর্জন। বলতে কি ভয় খেয়ে কেঁপে উঠলাম আমিও। ট্যাবা, কানাব ঠকঠক কম্পন টের পেলাম।

এবার সামনের কাঁটা ঝোপের ওপাশে পুজো বেদীব দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমরা আরেকটা ভূতের রাজ্যে এসে পড়েছি। আমার মুখটা এতবড় হা হলো যে দুহাতে ঠেলেও বন্ধ করতে পারলাম না।

দৃশ্যটা পিলে চমকানো। ন্যাকা যে রকম বলেছিল ঠিক সে বকমের একটা ব্যাপার। পুজো বেদী ঘিরে বসে আছে ওবা। একেকটা একেক রকম। কোনোটার শরীর সিংহেব মতো কিন্তু ঘাড়ে পাখা, আবাব কোনোটা অর্ধেক শকুন অর্ধেক গরু; একটা দেখা গেল লেজেব কাছে পেখম লাগানো ঘোড়াব মতো, আপন মনে গর্জন করে নিজেদেব ভেতর কি যেন বলাবলি কবছে। ও মা। একি, চট করে বদলে যাচ্ছে যে একেকটা। পাখাওলা সিংহটা হযে গেছে বানব, পেখমওলা ঘোড়া হয়ে গেল গরিলা, শূন্যে উড়তে লাগলো; শকুন গরুটা মনে হলো দশ হাত শূন্যে উঠে ধ্যানে বসেছে।

ঝিঁঝিঁব ডাকটা আর শোনা যাচ্ছে না। উড়ো ভূতের মেলা বসেছে যেন। আমার চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও বুঝতে পারছি এসবই দেখছি। কানা কাঁপা গলায় জানতে চায় এসব কিসের শব্দ বে? চুপ। নিচু করে ধমক মারলাম।

তাহলে ঠিক কথাই বলেছে ন্যাকা? কানার কথায় হা হওয়া মুখ বন্ধ হলেও আবার হা হতে বাধ্য হলো। পুজো বেদীর উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত ভূতগুলো। চক্কর মারছে।

আমার পেছন থেকে ট্যারা ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে প্রবলভাবে চমক খেলো একটা। কি একটা বিদঘুটে শব্দের একটুখানি বেরুতেই নিজের মুখ চেপে ধরলো দুহাতে।

বেদীর ওপাশে কি হচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করলাম আমি। এই শিবমন্দিরে ছোট থেকে এতবড়টি হয়েছি আমরা অথচ এমন কাণ্ড তো দেখিনি। রাত পোহালেই তো মানুষ আসতে শুরু করে, প্রসাদ দেয় দেবতার, মণ্ডপে পুজো করে। এই দেখে আসছি আমরা।

ন্যাকা ওপাশে গিয়ে করছেটা কি? আমার চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। উড়ো ভূতগুলো ঘুরে ঘুরে উড়ছেই। একটা হাঁচির শব্দ শুনলাম না? হ্যাঁ তাইতো আবার শুনতে পেলাম, এবার বেশ জোরে। ন্যাকার হাঁচি।

মাথার ওপরে ভয়ানক জোরে গর্জন শুনলাম কয়েকটা।

সঙ্গে সঙ্গেই উড়ো ভূতগুলো সাংঘাতিক দ্রুত নেমে এসে দাঁড়ালো বেদীর কাছে। তখনই ঝোপের কাছ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিলো ন্যাকা। কিন্তু না, এদিকে আসার আগেই ধরে ফেলল তাকে উড়ো ভূতগুলো। পরক্ষণে প্রাণছাড়া চিৎকারে মাটিতে পড়ে গেলো ন্যাকা। ভূতগুলো ঘিরে ধরেছে ওকে।

আমি নড়তে চাইছি, সরে যেতে চাচ্ছি কিন্তু পারছি না। এভাবে কতক্ষণ কাটলো বুঝতে পারিনি। হঠাৎ দেখলাম ন্যাকাকে। একি। ন্যাকার মুখের সাথে হাতির মতো শরীরটা কোথা থেকে এলো। ওরে বাবা ভূতরে! সবগুলো এবার উড়তে শুরু করেছে, এমনকি ন্যাকাও। কানা ফুঁপিয়ে উঠলো তখনই। আমি দেখি সবগুলি এবার উড়ে আসছে আমাদের দিকে। আমি প্রকাণ্ড চিৎকার দিয়ে দৌড় লাগালাম বটতলার দিকে। একবার ঘাড় ঘোরাতেই উড়ো ভূতের দলটা চোখে পড়লো; সবার আগে ন্যাকা। আমাদের মাথার উপরে চলে এলো ওরা। তখনই কানে এলো ন্যাকার বিকট গলা কিরে মামাদো পালাবি কো ..কো হ্যাচ্চো...কোথায়। প...প .. পড়েছিস...হ্যাচ্চো উড়ো ভূতের পা ..পা...হ্যাচ্চো পাল্লায়, এবার বু.. বু.. হ্যাচ্চো বুঝবিঠ্যা...ঠ্যা...হ্যাহ্...ঠ্যালা...হ্যা..চ্চো।

ছায়ামায়া

সিরাজুল ইসলাম

মাখনের সাংঘাতিক একটা অসুখ ছিল। হাঁপানি মারাত্মক রোগ। রহস্যভরা একটা রোগ। এই অসুখ কেন হয় মানুষ তা জানে না। মানুষের হাতে এই রোগ নিদানের কোনো জারিজুরি নেই।

গরীব মানুষ মাখন। তাই এই একটা অসুখে খুব ভুগত। হাঁপানিতে। পোড়ার দেশের বেশি বেশি বৃষ্টি, ভ্যাপসা গা চিটচিটে গরম, কনকনে পৌষ মাসের ঠাণ্ডা। তার ওপর ছিল গরীব দেশের খুবই ময়লা দূষিত ধুলা। রিকন্ডিশন্ড ট্রাক বাসের পেছনের পাইপ দিয়ে বের হওয়া গলগল ধোঁয়া। এর সমস্তই হাঁপানি রোগীর কষ্ট বাড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাই উপায় যখন হলো এই দেশটাই ছেড়ে গেল মাখন। চলে গেল জাপান। এশিয়ার সব চাইতে ধনী দেশ। আহা নয়ন জুড়িয়ে যায় এই দেশ দেখে। পচা সাবান না, এ দেশের সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে দামী কাপড় ধোয়া সাবানে এই দেশের আগাপাশতলা ঘষে ঘষে এই মাত্র ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে কেউ।

ঝকঝকে আকাশ তকতকে আমসত্ত্বের মতো লম্বা চওড়া কালো কালো রাস্তা, জিহ্বা

দিয়ে চেটে নিলে পর্যন্ত কোনো ঘেন্নাপিত্তি হবে না। খেলনার মতো সুন্দর সব বাড়ি। টয়োটা, নিশান, হোন্ডা কোম্পানীর মেশিনের পেট থেকে পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে রাস্তায় নেমেছে কার ট্রাক বাস। মাখন বেশ নজর করে দেখেছে ওই সমস্ত গাড়ির পেছন দিকে ধোঁয়া বেরুনোর পাইপ তো না যেন দামী ফিল্টার টিপড সিগারেট আয়েশ করে টানছে ধীরে সুস্থে কোনো সাহেব। খুবই ফিনফিনে হালকা সাদা রঙের চোখে দেখা যায় কি দেখা যায় না এরকম অস্পষ্ট ধোঁয়া। অন্য মানুষের এই ধোঁয়া দৃষ্টিগ্রাহ্য হবার কথা না। মাখন যে মাখন, তাই সে এই অস্পষ্ট ধোঁয়াটাও দেখতে পায়।

মাখনের এই মারাত্মক রোগটা এখন নেই। তাকে এখন ভুগতে হয় না। দিব্যি সুস্থ ভাল মানুষ। কিভাবে সেরে গেল আল্লাহ মালুম। কিন্তু মাখনের একটা কাজ বাকি ছিল বাংলাদেশে। সে আজ যায় কাল যায় করছে। হিরোতিকে বলে মাখন, 'চল তুমিও যাবে আমার দেশে, আমাদের দেশটা দেখে আসবে। সবুজ শ্যামলিমা একটা দেশ। সাদা ফিতার মতো ছড়ানো ছিটানো শান্ত নদী। সহজ সরল মানুষ।'

মিষ্টি করে হাসে নরম মনের হিরোতি। 'আমাদের আবার দেশ কি? আমাদের কোনো দেশ থাকতে নেই। আমাদের আর কোনো কিছু থাকবার উপায় নেই। কোনো কিছু না।'

ভারী মন খারাপ হয়ে যায় মাখনের এ কথায়। আমিও তোমার কেউ না। এ কথাটা হিরোতিকে বলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু বলে না। কোনো মানে নেই। মাখনরা হিরোতিদের থেকে অন্য আকৃতি প্রকৃতির মানুষ। গায়ের রং আলাদা। হিরোতিদের বোজা বোজা ঘুম ঘুম চোখ। মুখের ভাষাটাও আলাদা। কিন্তু এসব কোনো সমস্যা না। হিরোতি যা বলছে সেসব এই সমস্ত কথা ভেবে নয়। অন্যকিছু। সে কথা মাখনের চেয়ে ভাল কে জানে, মাখন বেশ ভাল জানে হিরোতি তার কত আপনজন। মন খারাপ হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবু এতদিনকার অভ্যাস, মাখনেরও মনে হয়, মনটা খারাপ হয়ে গেল। মাখন কোথাও গেলে হিরোতিকে বলে আসবার কিছু নেই। হিরোতি নিজে নিজেই বুঝে যাবে। মাখনদের সমস্ত কিছুই কাচের মতো স্বচ্ছ। হিরোতি বেশ ভালভাবে জানে। কেন একেবারের জন্য যেতে চায় মাখন নিজের দেশে।

হিরোতি বলে, 'এর কোনো মানে নেই। আমাদের কোনো স্মৃতি থাকলে চলে না। আমাদের রাগও নেই, হিংসাও নেই। কোনো কিছুরই কোনো মানে নেই।'

আপন মনে বলে মাখন, 'অভ্যাস হিরোতি অভ্যাস। তুমি বুঝবে না হিরোতি। কিন্তু হিরোতি বোঝে। হিরোতি জানে মাখন যাবে, আজ কিংবা আগামীকাল। নয়া পল্টনের একটা পাঁচতলা বাড়ির ওপরতলার পূর্ব দিককার ফ্লাটে চশমা পরা বাবার কোলে উঠে। বসেছিল ছয় বছরের একটা মেয়ে। যে যাই বলুক এই মেয়েটাই শুধুমাত্র জানে বাবার কোলে চড়ে বসে থাকবার সুখ। সুযোগ পেলেই সে এ কাজটা করে। অন্য মানুষেরা বলে, 'ছিঃ এত বড় একটা মেয়ে। বুড়ি মেয়ে।' এমন কি মাও বলে। কিন্তু সবার কথায় কান দিলে তো আর চলে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে মেয়েটাকে বেশ লাগে, বালিশ থেকে মাথা

তুলে বাবার বুকটাকে বালিশ বানিয়ে নিতে। তখন বাকি রাতটা সে আয়েশ করে ঘুমায়। বাবাকে নতুন করে দেখলেই মনে হয়, হয়ত অফিস থেকে ফিরে এসেছে বাবা বা গোসল করে বাথরুম থেকে বেরুলো, মেয়েটির মনে হয় বাবার এখন উচিত ওকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে দোকান থেকে তাকে একটা কিছু কিনে দেয়া। একটা কিছু। কিন্তু এই সামান্য চাওয়ার জবাবেও মেয়েটির মা বলে, 'ছিঃ! তুমি সব সময় তোমার বাবাকে বিরক্ত কর।'

মেয়েটি ভাবে, নিজের বাবা কখনো বিরক্ত হয় না, এই কথা এই ভদ্রমহিলা জানেন না। মেয়েটি বলে, এটা করে দাও। ওটা করে দাও। আমার এই ছবিটায় তুমি কমলা রঙটা দিয়ে দাও। বঙ ছবির বাইরে চলে যাচ্ছে। গল্প পড়ে শোনাও।

রেণু রেণু কদম ফুলের মতো গোল একটা কিছু বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল পাঁচতাল ফ্লাটের বারান্দার গ্রিলের কিছুটা বাইরে দিয়ে। মেয়েটি বলল, 'বাবা ওটা কি, উড়ে যাচ্ছে।' নাকের ডগায় চশমাটা ভালভাবে ঠেকিয়ে মেয়েটির বাবা খর চোখে দেখল তুলোর মতো গোল বলটিকে। অত্যন্ত জ্ঞানী এই লোকটি নির্দ্বিধায় তার মেয়ের কাছে সমস্ত বিদ্যা জাহির করতে পারে। কেননা এই মেয়ে সমস্ত কিছুই মেনে নেবে, চ্যালেঞ্জ করতে যাবে না। লোকটি বলল, 'শিমুল গাছের ফুল।'

মেয়েটির পরের নির্দেশ, বাবা ওটা আমাকে ধবে দাও। লোকটি বড় অলস। গল্পেব বই পড়া ছাড়া পৃথিবীর যে কোনো কাজ করায় তার আলসেমি। কিন্তু মেযেব কথা সে ফেলতে পারে না। মেয়েটি কোল থেকে নামল, লোকটি গ্রিলের ফাঁক দিয়ে একটা হাত বাড়াল, শিমূল তুলোর বলটি ধরতে। একটা ড্রাইভ মেরে বলটি দুই হাত নিচে নেমে গেল। বোকার মতো মুখ করে লোকটি মেয়ের দিকে তাকাল, আবাব তিন হাত দূর দিয়ে ওপরে ভেসে উঠল বলটি। 'বাবা ওই যে ওই যে বাবা, ধর।'

লোকটির হাত অতদূর দিয়ে যায় না। তবু হাত চালাল সে। চেষ্টা।

বলটি অনেক ওপব দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি এবার তাঁর নিজেব কচি হাতটা বাড়ালো সামনে।

'আয় আয়।'

বলটি নেমে আসছে। নেমে আসছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। বলটি এগিয়ে এসে মেয়েটিব একটি আঙুলেব ডগা স্পর্শ করল। তারপর আবার সরে গেল। কদমফুল না, বিড়াল ছানাব গায়ের মতো লোম লোম টেনিসবল না, শিমুল গাছের তুলা না। সেটা ছিল মাখন।

জীবন্ত একটা মানুষের ছোঁয়া পেতে, মাখনের একটা সুখের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কিন্তু মায়া মায়া। মাখন আবার সরে গেল দূরে, দূরে।

আঙ্গুলের ডগায় ছোঁয়াটুকু অনুভব করতে করতে মেয়েটি বলল, 'বাবা ওটা শিমুল তুলা না।'

চশমাপরা জ্ঞানী লোকটি বলল, 'তুমি জাননা, ওটা শিমুলই।'

এটি এখন পনিরের বাড়ি। আগে ছিল মাখন ও পনির দুই ভাইয়ের বাড়ি। তার আগে ওদের বাবার বাড়ি। তার আগে শুধু জল জঙ্গল। বড়সড়ো বুড়োসড়ো এক বটগাছ। তার খোঁড়লে প্যাঁচার বাসা। অন্ধকারের জীব।

একদিন সেই বটগাছটা কাটা পড়ল, বুনো গাছ লতাপাতা। তার বদলে নিকানো জায়গায় উঠল মানুষের বসতি। গৃহস্থালি গাছপালা। ছোট দুই ভাই খেলত নিকানো উঠোনে। শাকসব্জীর বাগান ফুলের গাছ, পেয়ারা গাছ, ডালিম পাতা। ভুল করে এসব গাছের ফাঁকে একটা হিংসার বীজও পোঁতা হয়ে গিয়েছিল। মাখন পনির বড় হলো সাথে সাথে হিংসার গাছটাও বাড়ল।

দুই ভাই দিব্যি থাকতে পারত বড়সড়ো এই বাড়িতে। ঘর সংসার করতে পারত ছেলেপুলে নিয়ে কিন্তু কিছু কিছু মানুষ থাকে, যে নিজের মাপের থেকে বেশি জায়গা জুড়ে থাকতে চায়। পনির হলো সেরকমের একটা মানুষ। অন্য মানুষও থাকে, যেমন মাখন নিজের দখলটুকু ছেড়ে দিলে বাঁচে।

হাঁপানির টান নিয়ে একরাত্রিতে বাইরে বেরুলো মাখন। খোলা আকাশের নিচে মুক্তি। ভরা গাছপালার ভেতর মুক্তি। অন্ধকাব রাত্রির সে সুযোগে মাখন যখন ফুসফুসের ভেতর একটু বাতাস টেনে নেবার চেষ্টায় মরছে, তখন পেছন থেকে এক ভূত গলা চেপে ধরল মাখনের। ফুস করে ফুসফুসের বাতাস ভরবাব ব্লাডারটা ফেঁসে গেল। মাখনের আর বাতাস নেবার দরকার নেই। ভূত না সেটা পনির। মাখন বেশ জানে, ভূত সেজে যে এসেছিল সে পনিব।

ওই অপমানটাই এখনো বুকে বাজে মাখনের। আপন ভাই, অথচ কাজটা করল কিনা একটা লাজ লজ্জাহীন ভূতের মতো। বড় ভাইকে মারতে যাবার মতো সাহসই নেই যখন ওই কাজটা করতে যাবার দরকার কি ভাই। এমনিতেই চলে যেত মাখন। পনিরের লোভের কথাটুকু তো জানতো। পনির মুখ ফুটে বললেই পারত, 'তুমি চলে যাও ভাই। তোমাকে আমার সহ্য হয় না। অসুবিধা হয়। হাজারো অসুবিধা।' শুধুই অপমান? একটু কষ্টও কি ছিল না, এই সুন্দব পৃথিবীটা ছেড়ে যাবার কষ্ট? অভ্যাস মতো একটু প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাও কি জমেছিল না মাখনের ভেতরে? একেবারেই অন্যায়ভাবে তাকে খুন করে ফেলল পনির। মাখনের এখন কোনো দয়ামায়া নেই। সে সবই পারে। কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। ওই একই ভাবে ভূতের মতো সে পনিরের গলাটা চেপে ধরবে। নিয়ে যাবে পনিরকে সাথে করে। পনিরের আর তখন লোভ করার কোনো কথা মনেই হবে না। পনিরের এই লোভ আবার নতুন করে কি ক্ষতি করে ফেলে আল্লাহ মালুম।

মাখনের এখন বিস্তর সুবিধা। কোনো ঘরে ঢুকতে এখন দরজা ধাক্কাতে হয় না। ডাকাডাকি করতে হয় না। সে দিব্যি ঢুকে পড়ল পনিরের ঘরে। রাত্রিবেলা। পনির নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। কাজটা সহজ হবে মাখনের জন্য। কেউ কিছু টের পাবার আগেই পনিরকে ঘুমের ভেতর রেখে পনিরকে নিয়ে চলে যাবে মাখন।

একটা প্রজাপতির মতো বিছানার চারপাশে কিছুক্ষণ উড়াউড়ি করল মাখন।

কিন্তু পনিরের গলাটা খুঁজে পায় না। পনিরের হাত দেখা যায় পা দেখা যায় মাথা দেখা যায়। গলা না। ওর গলা নিয়েই যে মাখনের কাজ।

মগজ ছাড়া মাখনের বুঝতে বেশ সময় লাগে, পনিরের গলার ওপর মাখনের ভাইঝির হাত। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে পনিরের মেয়ে। এত বড় হয়ে গেছে পনিরের মেয়ে!

মাখনের এত উড়াউড়ির শব্দেই কিনা কে জানে, মেয়ে আরো বাপের কোল ঘেঁষে শুলো।

এখন উপায়টা করে কি মাখন?

ফন্দি ফিকির করে সে ভাইঝিকে জাগাল। ভয় দেখাবার চেষ্টা করল। ভূতের ভয় কি সোজা? পালোয়ান পালোয়ান লোক ভূত দেখে ভিরমি খায়। কিন্তু ভাইঝির কিছু হলো না। সোজা চোখে তাকাল। 'জেঠু এখানে তোমার কোনো সুবিধা হবে না। আমি যে জানতাম তুমি আসবে। আত্মা এরকম ভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিশোধ নিতে আসে। তুমি আমার বাবাকে মাফ করে দাও গো জেঠু।' ঝরঝর করে কাঁদছে ভাইঝি। তুমিতো আব ফিরে আসতে পারবে না গো জেঠু। আমার বাবার গলা চেপে ধরলেই কি আর ফিরে আসতে পারবে তুমি? ওই সব পুরনো কথা ভুলে যাওগো জেঠু, আমার এখন অনেক কাজ। আমার বাবাটাকে তোমাদের থেকেও অনেক বড় মানুষ বানাব জেঠু। তুমিতো একটা মস্ত মানুষ। তোমার থেকেও ভাল অনেক ভাল।' মাখন তার এই কাজটার জন্য ছোট মেয়েটার কাছে একটু একটু লজ্জা পায়। বলে, 'ওসব কিছু না। তোদেব একটু দেখতে এলাম মা। ভাইটাকে।'

'সত্যি বলছো জেঠু।' চোখ মোছে ভাইঝি।

বড় ক্লান্ত বে মা। কত দূব থেকে এসেছি। একটু শুই।

বা। শোও না, শোও।

একটা লোভেব কথা বলিরে মা।

ভাইঝি চোখ বড় বড করে বলে, লোভ! আবাব লোভ কেন জেঠু।

'তুই তোর বাবার গলা জড়িযে যেভাবে শুয়েছিলি, আমার গলা ধরে তুই একবাব শো। এখানে আসতে আসতে দেখলাম, চশমাপবা একটা লোকের কোলে বসে আছে একটা মেযে। হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে চাইছিল। তোদের কি মায়ারে।'

ভাইঝি বলে এইটা এমন কি শক্ত কি গো। শোওনা। শোও। তোমার বুকের ভেতর ঢুকে কত আমি ঘুমাতাম।

মাখন শুলো।

ভাইঝি তখন তার নরম কচি হাতে খুঁজছে, জেঠুর স্নেহ, ভালবাসা আদর ; জেঠুর গলা হাত পা পাখির বাসার মতো একটা বুক। নেই।

ভাইঝি তখন হাউমাউ করে কাঁদছে, জেঠু, জেঠু গো।

ছায়াসঙ্গী

হুমায়ুন আহমেদ

প্রতি বছব শীতের ছুটির সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব—হৈচৈ করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনো গ্রাম দেখে নি—তারা খুশি হবে। পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলেব সামনেই ফোটে না অন্যান্য জায়গাতেও ফোটে তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশিরভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজ বললেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌঁছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা, তবে মাঝখানে একটা হাঁওড় পড়ে বলে সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মতো।

অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে ভালো লাগল। দেখলাম আমার বাচ্চাদেব আনন্দ বর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোত্থেকে যেন একটা হাড-জিরজিরে বেতো ঘোড়া জোগাড় কবা হয়েছে। এই ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত

হলে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এত বড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি, দু-তিনজন একসঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধুবান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা তাদের যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল—কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মতো লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে। প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনোটাই নিযে বসা গেল না। সাবাক্ষণই লোকজন আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানান জটিল নিযম নিয়ে আলোচনায উৎসাহী। এসেই বলবে—'দেশের অবস্থাডা কী কন দেহি ছোড মিযা। বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশেব হইলডা কী? কী দেশ ছিল আর কী হইল।'

দিন চাব-পাঁচেকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্পগুজবও তেমন করতে পাবি না। তাবা আমাকে বেহাই দিল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পবিবেশের কাবণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক আমি লেখালেখির প্রবল আগ্রহ বোধ করলাম। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিযে বসলাম, সারাদিন লেখালেখি কাটাকুটি করি। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে কবেবেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দুজন কবে 'গায়ক' আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান কবে—

"ও মনা
ওই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।
না না না আমি প্রাণে বাঁচতাম না।"

সময়টা বড চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সাবাদিনই লিখি।

এক দুপুরেব কথা—একমনে লিখছি। জানলাব ওপাশে খুট্ করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি খালি গায়ে রোগামতো দশ-এগারো বছবেব একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম—'কি রে?'

সে মাথাটা চট্ করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম—'চলে গেলি নাকি?'

ও আড়াল থেকে বলল—'না।'

'নাম কি রে তোর?'

'মন্তাজ মিয়া।'

'আয় ভেতরে আয়।'

'না।'

আর কোনো কথাবার্তা হল না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘুডাকা শ্রান্ত দুপুরে লেখালেখির আনন্দই অন্য রকম। মন্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার এই ব্যাপার। জানলার ওপাশে মন্তাজ মিয়া। বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম—'কী ব্যাপার মন্তাজ মিয়া? আয় ভেতরে।'

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম, 'থাকিস কোথায়?'

উত্তরে পোকা-খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

'স্কুলে যাস না?'

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কী করবে বুঝতে পারছে না। কাগজটাব গন্ধ শুঁকল। গালের উপর খানিকক্ষণ চেপে ধরে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

বাতে খেতে খেতে আমাব ছোট চাচা বললেন—'মন্তাজ হারামজাদা তোমাব কাছে নাকি আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।'

'কেন?'

'বিবাট চোব। যাই দেখে তুলে নিয়ে যায। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুই দিন পবপব মাব খায় তাতেও হুঁশ হয না। তোমার এখানে এসে কী কবে?'

'কিছু কবে না।'

'চুবিব সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হযতো কলমটলম নিয়ে নিযেছে।'

'না কিছু নেয় নি।'

'ভালো করে খুঁজেটুজে দেখ। কিছুই বলা যায না। ঐ ছেলের ঘটনা আছে।'

'কী ঘটনা?'

'আছে অনেক ঘটনা। বলব একসময়।'

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালেখি শুরু করেছি। হৈ চৈ শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি মন্তাজ মিয়াকে তিন-চারজন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফোঁপাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকের গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

শাস্তিদাতার একজন বলল, 'দেখেন তো এই কলমটা আপনের কিনা। মন্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল'।

দেখলাম কলমটা আমারই চার-পাঁচ টাকা দামের বল পয়েন্ট। এমন কোনো মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হল। বাচ্চা ছেলেটা চুরি শিখল কেন? বড় হয়ে এ করবে কি?

'ভাইসাব, কলমটা আপনার?'

'হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে এত মারধর করেছেন কেন? মারধর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না?'

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা ওর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে ওর ভাত হজম হয় না।'

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হল সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথম একজনকে দেখছে যে চুরি করার পরও তাকে চোর বলে নি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলি আজ একটা কথাও বলা হল না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচির কাছে। চুরির ঘটনারও দুদিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা তুচ্ছ তা এরা বুঝতে পারে না। মন্তাজ মিয়ার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলে নি অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই—

তিন বছর আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মন্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মন্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খানিকক্ষণ—'আমার পুত কই গেলরে' বলে চেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রাম তাদের লেগে থাকতে হয়। পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি সোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মাঘরের পাশে বাদ আছর মন্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সবকিছুই ঘটল খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা শুরু হল দুপুর রাতের পর। যখন মন্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হল। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এল এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা করছ কী? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তাকে বাহির কর। দিরং করবা না।'

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দিয়ে দেয়ার পর নিকটআত্মীয়স্বজনরা সবসময় বলে,'ও মরে নাই।' কিন্তু মন্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হৈ চৈ শুরু করল যে সবাই বাধ্য হল মওলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মওলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে—আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুঁড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না।' মওলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্র আঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মওলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন—'বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে?'

রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি জানি।'

গ্রামের মওলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মওলানা সাহেব বললেন—প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্যে এটা করা যায়। হাদিস শরীফে আছে......

কবর খোঁড়া হল।

ভয়াবহ দৃশ্য!

মন্তাজ মিয়া কবরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা। অন্য দুটি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ কবা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোনো কথা সরল না।

মওলানা সাহেব বললেন—'কি রে মন্তাজ?'

মন্তাজ মৃদুস্বরে বলল, 'পানিব পিয়াস লাগছে।'

মওলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

এই হচ্ছে মন্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প অনেক শুনেছি। এরকম কখনো শুনি নি।

ছোট চাচাকে বললাম, 'মন্তাজ তারপর কিছু বলে নি? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কী দেখল না দেখল এইসব?

ছোট চাচা বললেন—'না। কিচ্ছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।'

'জিজ্ঞেস করেন কি কিছু?'

'কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও এসেছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল—একটা শব্দ করে না। হারামজাদা বদের হাড্ডি।'

আমি বললাম, 'কবর থেকে ফিরে এসেছে—লোকজন তাকে ভয়টয় পেত না?'

'প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহতায়ালার খুদরত। আল্লাহতায়ালার কেরামতি

আমরা সামান্য মানুষ কী বুঝব কও?

'তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেন নি সে কী করে বুঝতে পারল মন্তাজ বেঁচে আছে?'

'জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহর খুদরত। উনার কেরামতি।

ধর্মকর্ম করুক বা না করুক গ্রামের মানুষদের আল্লাহতায়ালার 'কুদরত এবং কেরামতির' উপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকের মতো গলায় বলে 'আল্লাহর খুদরত।'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, 'রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না?'

ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

'কথা বলতাম।'

'খবর দেওযাব দরকার নাই। এমনেই আসব।'

'এমনিতেই আসবে কেন?'

ছোট চাচা বললেন—'তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গেরামের যত মেয়ের বিয়া হইয়াছে সব অখন নাইওর আসব। এইটাই নিয়ম।'

আমি অবাকই হলাম। সত্যি সত্যি এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোনো বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষ্যে গ্রামের সব মেয়ে নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না।

আমি আগ্রহ নিযে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ কি এসেছে?'

'আসব না মানে? গেরামের একটা নিযমশৃঙ্খলা আছে না?'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, 'আমাদের উপলক্ষে যে সব মেযে নাইওর আসবে তাদে প্রত্যেককে যেন একটা করে দামি শাড়ি উপহার হিসেবে দেযা হয। একদিন খুব যত্ন করে দাওযাত খাওয়ানো হয়।'

ছোট চাচা পছন্দ করলেন না তবে তাঁর রাজি না হয়েও কোনো উপায় ছিল না। আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামেব নিযমমতো একসময় রহিমাও এল। সঙ্গে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হতদরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার জন্যে দুটা ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ারশেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হল। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। এরকম একটা উপহার বোধহয় তার কল্পনাতেও ছিল না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোমল গলায় বললাম, 'কেমন আছ রহিমা?'

রহিমা ফিসফিস করে বলল, 'ভালো আছি ভাইজান।'

'শাড়ি পছন্দ হয়েছে?'

'পছন্দ হইব না। কী কন ভাইজন? অত দামি জিনিস কি আমরা কোনোদিন চউক্ষে দেখছি।'

'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কী করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে?'

রহিমা অনেকটা চুপ করে থেকে বলল, 'কী কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা দৌড়াতেই দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই মনে হইল মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে।'

'কী জন্যে মনে হল?'

'জানি না ভাইজান। মনে হইল।'

'এই রকম কি তোমার আগেও হয়েছে? মানে কোনো ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পার?'

'জি না।'

'মন্তাজ তোমাকে কিছু বলে নি? জ্ঞান ফিরলে সে কী দেখল বা তার কী মনে হল।'

'জি না।'

'জিজ্ঞেস কর নি?'

'করছি। হারামজাদা কথা কয় না।'

রহিমা আরো খানিকক্ষণ বসে পানটান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আর লিখতে পারি না। সবসময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলে কবরের বিকট অন্ধকারে জেগে উঠে কী ভাবল? কী সে দেখল? তখন তার মনে অনুভূতি কেমন ছিল?

মন্তাজ মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আবার মনে হয় জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। সবসময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যায় কাজ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতূহলের হাতে পরাজিত হলাম।

দুপুরবেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়াগাঁর ঝিমধরা দুপুর। একটু যেন ঘুম ঘুম আসছে। জানালার বাইরে খুট্ করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি মন্তাজ। আমি বললাম—'কী খবর রে মন্তাজ?'

'ভালো।'

'বোন আছে না চলে গেছে?'

'গেছে গা।'

'আয় ভেতরে আয়'।

মন্তাজ ভেতরে চলে এল। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্পগুজব হয়। মনে হয় আমাকে সে খানিকটা পছন্দও করে। এইসব ছেলে ভালবাসার খুব কাঙাল হয়। অল্প কিছু মিষ্টি কথা, সামান্য একটু আদর এতেই তারা অভিভূত

হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মন্তাজ এসে খাটের এক প্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম—'তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি, কেমন?'

'আইচ্ছা।'

'ঠিকমতো জবাব দিবি তো?'

'হ।'

'আচ্ছা মন্তাজ কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে?'

'আছে।'

'যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি?'

'না।'

'না কেন?'

মন্তাজ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, 'কী দেখলি—চারদিক অন্ধকার?'

'হ।'

'কেমন অন্ধকার?'

মন্তাজ এবারো জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

আমি বললাম— 'কবর তো খুব অন্ধকার তবু ভয় লাগল না?'

মন্তাজ নিচু স্বরে বলল, 'আরেকজন আমার সাথে আছিল সেই জন্যে ভয় লাগে নাই।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আরেকজন ছিল মানে? আবেকজন কে ছিল?'

'চিনি না। আন্ধাইরে কিচ্ছু দেখা যায় না।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'জানি না।'

'সে কী করল?'

'আমারে আদর করল। আর কইল কোনো ভয় নাই।'

'কীভাবে আদর করল?'

'মনে নাই।'

'কী কী কথা সে বলল?'

'মজাব মজার কথা— খালি হাসি আসে।'

বলতে বলতে মন্তাজ মিয়া ফিক্ করে হেসে ফেলল।

আমি বললাম, 'কী রকম মজার কথা? দু-একটা বল তো শুনি?'

'মনে নাই।'

'কিছুই মনে নাই? সে কে এটা কি বলেছে?'

'জি না।'

'ভালো করে ভেবেটেবে বল তো কোনোকিছু কি মনে পড়ে?'

'উনার গায়ে শ্যাওলার মতো গন্ধ ছিল।'

'আর কিছু?'

মন্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।

আমি বললাম, 'ভালো করে ভেবেটেবে বল তো। কিছুই মনে নেই?'

মন্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'একটা কথা মনে আসছে।'

'সেটা কী?'

'বলতাম না। কথাডা গোপন।'

'বলবি না কেন?'

মন্তাজ জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম— 'বল মন্তাজ, আঁমার খুব শুনতে ইচ্ছা কবছে।'

মন্তাজ উঠে চলে গেল।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে কদিন গ্রামে ছিলাম সে কোনোদিন আমার কাছে আসে নি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি তবু আসে নি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূব থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকাব। এই অধিকাব অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলাগন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীব কথা আমবা যদি কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে আসবে না।

ভূতের পাতা

বাণী বসু

মাসিক 'গালগপ্পো' পত্রিকার সম্পাদক বীরেশচন্দ্র মুস্তাফিমশাই মহা বিপদে পড়েছেন। বিপদটা এবারের শারদীয় সংখ্যা নিয়ে। ভাল-ভাল গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, ছড়া কবিতা, কমিক্স্, ধাঁধা সব জোগাড় হয়েছে। হয়নি শুধু ভূতের গল্প। তা-বড় তা-বড় ভূতেব গল্পের লেখকরা সব ধানাইপানাই করছেন। লেখার ফরমাশ নিয়ে যেতেই হেঁহেঁ ক রে সব বলছেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনার কাগজে লিখব, সে তো আমার সৌভাগ্য বীরেশবাবু।' কিন্তু যেই বীরেশবাবু তাঁর ফরমাশের পরবর্তী অংশটি পেশ করছেন অর্থাৎ ভূতের গল্পের আবদারটি তুলে ধরছেন, অমনি কেউ-কেউ বেজায় অন্যমনস্ক হয়ে কান চুলকোতে থাকছেন, কেউ কেমন থতমত খেয়ে উদাস বোম্‌ভোলা মেরে যাচ্ছেন। জাঁদরেল লেখক কালীকিঙ্কর কয়াল তো ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেললেন। বীরেশবাবু অপ্রস্তুত হয়ে যেই বলেছেন, 'আহা-হা-হা করেন কী? করেন কী? কাঁদেন কেন?' অমনি কয়ালমশাই ধুতির কোঁচাটি পকেট থেকে বার করে চোখ মুছতে মুছতে সেই যে বাড়ির ভেতর দিকে চলে গেলেন, আর এলেনই না। অনেকক্ষণ বসে থেকে-থেকে ব্যাজার হয়ে বীরেশবাবু কালীকিঙ্করের ছোট নাতনিটিকে

দেখতে পেয়ে অবশেষে বললেন, 'দাদুকে বলে এসো তো খুকি, আমি এখনও বসে আছি। যাও তো লক্ষ্মীটি, ল্যাবেঞ্চুস দেব।' খুকি ভেতর থেকে এসে বলল, 'তুমি আমার ল্যাবেঞ্চুসটা দিয়ে বাড়ি চলে যাও। দাদু এখনও কাঁদছে।' যা ব্বাবা! এরকম ভুতুড়ে কাণ্ড বীরেশ মুস্তাফি তাঁর সতেরো বছর সাত মাস সাড়ে সাতাশ দিনের সম্পাদক জীবনে কখনও দ্যাখেননি!

গত বছর শারদীয়া ফাঁদতে গিয়ে তাঁকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল। তেমন ভাল ভুতুড়ে গল্প মেলেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই 'ভয়ঙ্কর গুপ্ত' ছদ্মনাম নিয়ে 'কঙ্কালের কারসাজি' নামে এক ভয়ানক রোমহর্ষক ভূতের গল্প লিখে ফেলেন। তা সেই গল্প বার করার পর তিনি নানারকম চিঠি পেতে থাকেন। দুটো চিঠি উদ্ধৃত করলেই মুস্তাফিমশাইয়ের মুশকিলটি সবাইকার বোধগম্য হবে। শ্যামবাজার থেকে লেখেন বামাচরণ দাঁ, রামগতি ভড় আর গোলগোবিন্দ ঢ্যাং। এই সব বুড়োরাও মাসিক গালগপ্পো'র নিয়মিত পাঠক। বলতে কী, এঁরাই হলেন গিয়ে আসল পাঠক। কারণ, ছোটদের এখন অনেক কাজ বেড়ে গেছে। সায়েন্স এগজিবিশনের মডেল তৈরি করো রে, রক্ষেকালী পুজোর শিকলি কাটো রে, বসে-আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করো রে! তারও ওপর আছে আবৃত্তির আসরে 'পঞ্চনদীর তীরে', গানের আসরে 'দারু...চিনি...র দেশে'। বিস্তর পড়াশোনার পর এতকিছু করে তারা আর গালগপ্পো পড়ার সময় পায় না। যদি বা পায়, পড়ে না ঠিক, কপ করে গিলে ফেলে। সে নিয়ে আবার সম্পাদকমশাইকে চিঠি দিতে তাদের ভারী বয়েই গেছে।

তা সে যাই হোক,'এই তিন বুড়ো খোকা তাঁদের যৌথ চিঠিতে, "মহাশয়, আপনার কাগজটির নাম বদলাইয়া 'গুলগাপ্পা' রাখিলেই যথাযথ হইত। সারা জীবন অনেক কঙ্কাল চরাইয়াছি। কঙ্কাল চরাইয়া চরাইয়া আমরা নিজেরাই এখন কঙ্কালসার। দয়া করিয়া আমাদের আর কঙ্কাল দেখাইবেন না। সে ভয়ঙ্করই হউক, আর গুপ্তই হউক।"

দ্বিতীয় চিঠিটি ৭১ নং গ্রাহিকা সাত বছরের কুমারী ঝিমলির। ঝিমলি লেখে : "ছম্পাদককাকু, ছারদীয়া গালগপ্পে এত ভাল হয়েছে যে আর কী বলব! যেমনি ছবির রং, তেমনি পাতার গন্ধ। কিন্তু ছবচেয়ে ভাল 'কঙ্কালের কারছাজি' বলে হাছির গপ্পটা। পড়ে আমি আর দাদা দু'জনেই হেছে-হেছে খুন হয়ে গেছি। দু'জনেরই পেটে ব্যথা হয়ে গেছে।"

খুব ভাল চিঠি, সন্দেহ কী! উৎসাহিত হবারই কথা। কিন্তু লিখলেন ভূতের গল্প, আর হয়ে গেল হাসির গল্প? ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল? যাব্বা!

কাজে-কাজেই কার্তিক যখন একমুখ আহ্লাদে হাসি হেসে ঘোষণা করল, ভূতের গল্পের একজন ভাল লেখক জোগাড় হয়েছে, তখন বীরেশবাবু খুশি না হয়ে করেন কী? নাকি প্রবাসী লেখক। ভোজপুরের দিকে নাকি ফাটিয়ে দিচ্ছে। একটি গল্প বাজারে ছাড়লেই বাজারটি মাত্ হবে। বলা বাহুল্য, এই সব ভাষা ও আশ্বাস কার্তিকেরই, যে কিনা বীরেশবাবুব সহকারী।

যথাসময়ে প্রবাসী লেখকটি বীরেশবাবুর টেবিলে হাজিরা দিলেন। দেখে তো বীরেশবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। ভোজপুরী স্বাস্থ্য তো নয়, টোপাকুলের মতো চেহারা, গিলে-করা পাঞ্জাবি,

মিহি করে কুঁচনো ধুতির ফুলকোঁচাটি দু' আঙুলে ধরা, গোল-গোল চশমা। নেমন্তন্ন খেতে এসেছে না মাসিক গালগপ্পো'র আপিসে এসেছে, বোঝা দায়। এ-রকম নাড়ুগোপাল চেহারা নিয়ে ভূতের গল্প হয়? ভূতের গল্পের লেখকের দাড়ি হবে খোঁচা-খোঁচা, চোখ হবে গর্তে-ঢোকা, গাল হবে তুবড়োনো, হাত শিরা-ওঠা, গলা কণ্ঠা-জাগা, কান লটপটে, নাক চুলঝুলো, পা ঠ্যাঙঠেঙে, গলা খনখনে। হাঁটবে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে, দেখবে নুকিয়ে-চুরিয়ে, হাসবে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে, আর রেগে গেলে মস্ত একখানা কালো বেড়ালের মতো মুখ না ঘুরিয়ে, গোঁফ না ফুলিয়ে ফ্যাঁচ্ করে উঠবে।

নিরাশ হলেও বীরেশবাবু হাত বাড়িয়ে দিলেন। "কই, এনেছেন লেখা?" তাঁর এখন শিরে সংক্রান্তি কি না! "বাঃ! নামখানা তো জব্বর দিয়েছেন মশাই! ভূতের পাতা। খেলার পাতা, মজার পাতা, তেমনি ভূতের পাতা? পাতায়-পাতায় ভূতের নেত্য, কী বলেন, অ্যাঁ?" বীরেশবাবুর মুখে মুচকি-মুচকি হাসি উপচে উপচে পড়ে।

লেখকের মুখখানাও হাসিতে ভরে যায়। খাস কলকাতার পত্রিকা গালগপ্পো'র সম্পাদকের কাছে প্রথম রাউণ্ডে এমন হাততালি পেয়ে তিনি গদগদ।

কিন্তু পরক্ষণেই বীরেশবাবুর ভুরু কুঁচকে, যায়। ঠোঁট টান-টান নাক খাড়া-খাড়া। "এ-হে-হে-হে, করেছেন কী মশাই? এ কী আরম্ভ? এক যে ছিল ভূত? এ কি রূপকথার গপ্পো পেয়েছেন না কি?" পাণ্ডুলিপিটা তিনি প্রায় ছুঁড়েই ফেলে দ্যান।

"কেন? কেন ? কী হল তাতে?" ভূতের গল্পের লেখকের ফুলো মুখখানা ঝুলে পড়ে, "ক্ষতিটা কী?"

"আরে মশাই, দেখেই বুঝেছিলুম।" বীরেশবাবু হাত নেড়ে বলেন, "এরকম সুখী-শৌখিন লোক দিয়ে, আর যাই হোক, ভূতের গপ্পো হয না। যান যান মশাই, আমার এখন বিস্তর কাজ, ঝামেলা বাড়াবেন না। আর।"

মেজাজটা একেবারে তিরিক্ষি হযে গেছে বীবেশবাবুব।

লেখক বেচারা কাঁচুমাচু মুখ করে বলেন, "শেষ পর্যন্ত পড়েই দেখুন না দাদা গপ্পোখানা, অত করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-টতা দিয়ে লিখলুম!"

বীরেশবাবু গম্ভীর চালে বলেন, "সাড়ে সতেরো বচ্ছর সম্পাদকি করছি, বুঝলেন? একটা ভাত টিপলেই বুঝতে পারি। এক যে ছিল ভূত ? এ কি একখানা স্টাইল হল? ছোঃ! ভূতের গল্প লিখতে হয় বেশ জম্পেশ করে, বুঝলেন? যেমন..."

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফিচেল হেসে লেখক বললেন, "যেমন 'ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাত। ঝিরঝির করে বিষ্টি পড়ছে। থেকে থেকে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় সে-রাত্রির সীমাহীন অন্ধকার কিছু মাত্র দূরীভূত হচ্ছে না'..."

বীরেশবাবু লেখকের দুঃসাহস দেখে অবাক। কঙ্কালের কারসাজি থেকে উদ্ধৃত করছে. এত বড় আস্পর্দা! "আপনি...আ-আ-আপনি..." রাগে বীরেশবাবু তোতলাতে থাকেন। আর সেই ফাঁকে লেখকমশাই তাঁর ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যান।

কার্তিককে অবিলম্বে ডেকে পাঠান বীরেশবাবু। "কী হে কাত্তিকে, বলি কোত্থেকে জোগাড় হল তোমার ভূতের গপ্পের লেখক? বন্ধুবান্ধব? না শ্যালক-ট্যালক?"

কার্তিক খুব লজ্জা পেয়ে যায়। "আজ্ঞে না, মানে, মানে..."

"ঠিক্‌ঠাক বলো।" হুমকি দেন বীরেশবাবু।

"মানে আমার বন্ধু সনাতনের বউদির বোনঝির ভাগ্নের পিসেমশাইয়ের জামাইবাবুর..."

"আচ্ছা আচ্ছা, খুব হয়েছে!" বীরেশবাবুর রাগ পড়ে যায়, "লেখাটা ফেলে গেছে দেখছি। ধাঁ করে ফেরত পাঠিয়ে দাও দেখি! এমন যেন আর কক্ষনো না হয়। নইলে তোমারই ঘাড়ে ভূত নাচাব, মনে থাকে যেন।"

ভড়কে গিয়ে কার্তিক তৎক্ষণাৎ বীরেশবাবুর টেবিল থেকে ভো-কাট্টা হয়ে যায়।

যাই হোক, বীরেশবাবু বসে থাকলেও সময় তো আর ভূতের গপ্পের জন্যে বসে থাকবে না। মাথার সামান্য ক'টি অবশিষ্ট চুল শারদীয় গালগপ্পোও ছাপাখানায় যাবার সময় হয়ে এল। গল্প, উপন্যাস, কমিক্‌স্‌, ছড়া, পদ্যে ঠাসা দপ্তরখানা গুছিয়ে নিয়ে দেখতে দেখতে বীরেশবাবু চমকে ওঠেন, "কাত্তিক, কাত্তিক!"

"যাই আজ্ঞে স্যার," মাথা চুলকোতে চুলকোতে কার্তিক এসে দাঁড়ায়।

"সেই 'ভূতের পাতা' ফেরত দাওনি?"

"দিয়েছি বলেই তো মনে হচ্ছে স্যার!"

"উঁহু। তোমার সেই ভোজপুরী লেখকের পাণ্ডুলিপি আদপেই ভাগেনি। আমার শারদীয়ার দপ্তরে গোছা করে গোঁজা রয়েছে এখনও।"

বলতে বলতে কার্তিকের কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন সন্দেহ হয় বীরেশবাবুর। ইদানীং মাঝে-মাঝেই ছোকরার হাব-ভাব খুব সন্দেহজনক মনে হচ্ছে তাঁর। সর্বদাই কেমন যেন চোর-চোর! উঁকিঝুঁকি! না ডাকতেই একপায়ে খাড়া একেবারে। এই দেখছেন বেরিয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই টেবিলে হাজির।

"কে যেন হয় বলছিলে তোমার?"

"আজ্ঞে আমার বন্ধু সনাতনের বউদির বোনঝির ভাগ্নের পিসেমশাইয়ের জামাইবাবুর..."

বলো, বলো, থামলে কেন? চালিয়ে যাও!"

"পিসেমশাইয়ের জামাইবাবুর আপন শালার শালার ছেলের মামির..."

"হুঁ। বুঝেছি। তুমিই ওটাকে গুঁজে রেখেছ দপ্তরে। এত আপনজন যখন! আত্মীয়-স্বজনের উপকার করার আর জায়গা পেলে না হে ছোকরা?" রাগ করে বীরেশবাবু পাণ্ডুলিপিখানা কুচিকুচি করতে থাকেন। তারপর বাজে-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন। "এক যে ছিল ভূত! হুঃ! ছিঃ! ছোঃ!" কীভাবে যে ছিছিক্কার করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি!

যথাসময়ে শারদীয় গালগপ্পো বেরিয়ে গেল। ভূতের গল্প ছাড়াই। কার্তিকই শেষটায় বোঝাল বীরেশবাবুকে। "কানামামার চেয়ে নেই-মামাই কিন্তু আসলে ভাল স্যার। আপনি আর খুঁতখুঁত করবেন না। তা ছাড়া ভূতেরা সব অনেক অনেকদিন মরে ভূত হয়ে গেছে।

মরা-ঝরা তাদের টেনে-টেনে কাঁহাতক আর ভূতের গল্প লিখবেন লেখকরা? দু'চার বছর না বেরোলেই ছেলেরা ভূতের কথা ভুলে মেরে দেবে এখন।"

তা কার্তিক তার সাধ্যমতো যতই সান্ত্বনা দিক, বাজারে পত্রিকাটি বার করে দিয়েই বীরেশবাবু আস্ত একখানা চোদ্দ দিনের ছুটি নিয়ে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে ডুব মেরেছেন। কামস্কাটকা কিংবা কিলিমাঞ্জারোয় যেতে পারলে ভাল হত। ভারখোয়ানস্ক, কিংবা মাডাগাস্কার কিম্বা হোক্কাইডো হলে আরও ভাল। সেইরকমই ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের মিসেস ম্যাকলাউড ছাড়া আর কোনও হোটেলওয়ালা হোটেলওয়ালিকে চেনেন না তিনি। বিশ্বাস করে যাবেন কী করে তবে? কিন্তু ছুটির যেমন শুরু আছে, তেমনি আবার শেষও তো আছে? অতএব, দু' হপ্তা পরে বীরেশবাবুকে আবার ফেরত আসতেই হয়। যথাসময়ে চোরের মতো আপিসে ঢুকে নিজের টেবিল-পত্তর ঝাড়ছেন তিনি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে তাঁর সহকারী কার্তিকের প্রবেশ। এটাই ভয় করছিলেন বীরেশচন্দ্র। বিক্রি হচ্ছে না! বিক্রি হবে না এ-পত্রিকার! উলটেপালটে যেই দেখবে ভূতের গল্প নেই, অমনি আর কাগজ ছোঁবে না খোকাখুকুরা, বা তাদের দাদা দিদি মামা মামিরা, বা পিসি পিসে মামি খুড়িরা। ব্যাপারটা টের পেতে পেতে দোকানিদের হপ্তাখানেক বা বড়জোর দিন দশেক লাগবে। তারপর ঘরের ছেলে সব ঝাঁকে-ঝাঁকে ঘরে ফিরে আসতে থাকবে।

কার্তিক বলল, "সর্বনাশ হয়েছে স্যার!"

"সে তো আমি অনেক আগেই বুঝেছি কাত্তিক।" হতাশ মুখে বলেন বীরেশবাবু।

"না স্যার, বোঝেননি মোটেই। সাঙ্ঘাতিক সেল। আমাদের স্টকে যা ছিল সব শেষ, মায় আমার পার্সোন্যাল কপিখানা সুদ্ধু। আপনি ছিলেন না বলে অনুমতি ছাড়াই আরও দশ হাজার কপি ছাপতে দিয়েছিলুম। তাও শেষ। এখনও সব হুমড়ি খেয়ে আছে। বিদেশে যাচ্ছে নাকি। কিন্তু এদিকে বাজারে কাগজ শর্ট। কাগজ না পেলে স্যার এমন সুযোগটা মাঠে মারা যাবে।"

হতভম্ব হয়ে যান বীরেশবাবু। "বলো কী হে? তা গ্রাহকদের চিঠিপত্র কিছু এসেছে না কি? কী বলছে তারা?"

"ওসব দপ্তর আমি এখনও খুলতে সময় পাইনি স্যার, আপনি দেখুন।" বলে কার্তিকচন্দ্র চিঠির তাড়া বীরেশবাবুর সামনে ফেলে দেয়। চিঠিগুলো এক-এক করে খুলতে থাকেন দু'জনে। 'চমৎকার!' 'অপূর্ব!'...'বাঃ!'...'ওহো-হো-হো!' 'কী সাঙ্ঘাতিক!'...'এমনটা হতে পারে চিন্তাও করতে পারিনি।' কয়েকটা চিঠি পড়ে বীরেশবাবু হতাশ হয়ে কার্তিকের দিকে তাকান। "কোনও বিশেষ লেখাটেখার কথা বলছে না তো হে?"

বীরেশবাবু নিজে ব্যাচিলর মানুষ। মেসে থাকেন। কার্তিকেরও ছেলেপুলে নেই যে, তাদের কাছ থেকে রহস্যের কোনও সূত্র পাওয়া যাবে। কেন এই সব খোকাখুকু হঠাৎ শারদীয় 'গালগপ্পো'র জন্যে এমন হন্যে হয়ে উঠল, দু'জনের কেউই তার হদিস করতে পারেন না। আসল কথা, শারদীয় সংখ্যা বেরোবার পর কেউই আর সেটাকে উলটেপালটে

দেখেননি। দেখেন না। ভেতরের গল্পগাছাগুলোর বানান ঠিক করতে করতে, অভিধান দেখতে দেখতে, ছোটদের অযুগ্যি জিনিস তাদের আনাচকানাচ থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে ফেলতে ফেলতে সব কিছুই তাঁদের এতবার পড়া হয়ে যায় যে, কাগজ যখন বেরোয়, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক দু'জনকারই তখন তার ছায়া দেখলেও বিরক্ত লাগে।

কার্তিককে সঙ্গে করে বীরেশ মুস্তাফি আনমনার মতো কলেজ স্ট্রিটের দিকে বেরোন। ডিপোতে-ডিপোতে খুঁজেপেতে যেখানে যত কাগজ লুকনো-ছুপোনো ছিল, যত আরও পাওয়া সম্ভব ছিল, কতক নিয়ে, কতক অর্ডার দিয়ে ট্যাকসি নিয়ে ফিরছেন, অবাক হয়ে দেখেন, পথে আট-দশটি ছেলেমেয়ের একটা দঙ্গল চলেছে। প্রত্যেকের দু'বগলে দুটো করে শারদীয় গালগপ্পো।

"এই খোকা, এই খুকু। দাঁড়াও দেখি..." বীরেশবাবুরই প্রথম উপস্থিতবুদ্ধি খোলে, ট্যাকসিটা দাঁড় করান হুট্ করে।

"আমাদের এখন সময় নেই মোটে। তাড়া আছে।"

"আহা, দাঁড়াওই না ভাই একটু। একটা বই দুটো করে কপি কিনে নিয়ে যাচ্ছ যে বড় ?"

"কিনবই তো! আপনি পড়লে আপনিও কিনবেন। কিনেই দেখুন না..." বলতে বলতে ছেলেমেয়েগুলি রাস্তা পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আপিসে ফিরে আসেন বীরেশবাবু। টেবিলের ওপর কনুই রেখে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকেন। কার্তিক প্রেসে গেছে। সে না ফেরা পর্যন্ত যেতে পারছেন না।

হঠাৎ খেয়াল হয়। শেষ চেহারাটা তো দেখাই হয়নি কাগজের। খুলে আবার ভাল করে পড়ে নিজেই দেখেন না কেন কোথায়, কোন লেখার এমন মজা পেল তাঁর পাঠক-পাঠিকারা! শুধু খুদে নয়, বুড়োরাও তো খুব খুশি দেখা যাচ্ছে। বামাচরণ দাঁ, রামগতি ভড় আর গোলগোবিন্দ ঢ্যাঙের চিঠিও পেয়েছেন। 'শাবাশ, মুস্তাফিভায়া, এবারের কাগজে যা ম্যাজিক দেখিয়েছেন না, জবাব নেই!'

কার্তিকচন্দ্রও প্রেস থেকে ফিরে সেই প্রস্তাবই করে। পড়েই দেখা যাক না কাগজখানা। দু'জনে মিলে র‍্যাক থেকে বইখানা নামান। এই একখানাই পড়ে আছে মোট আপিসে। আর সব ফর্সা।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে পাতা ওলটান দু'জনে। জুতোর বিজ্ঞাপন, আচারের বিজ্ঞাপন, কোনও জমিদারবাড়ির দুর্গাপ্রতিমার ছবি। চকচকে ঝকঝকে দিব্যি হয়েছে কাগজটি। অতঃপর পাতা ওলটাতেই দু'জনে থ। এদিক ওদিক দুটি পৃষ্ঠা জুড়ে লাল কালো ছাই-ছাই অক্ষরে বড়-বড় করে ছাপা—'ভূতের পাতা'।

"এ কী হে কাত্তিক? সেই তেনার লেখাটি ভোগা দিয়ে এখানে কী করে সেঁধিয়ে গেল? অ্যাঁ?" সাঙ্ঘাতিক থতিয়ে যান বীরেশবাবু। "শিগগিরই ফোন করো তো দেখি প্রেসকে! এ কী জুয়াচুরি!" রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন তিনি।

শশব্যস্ত হয়ে ফোন করে কার্তিক। এনকোয়ারির পর এনকোয়ারি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও, হ্যাঁ। আপনাদের কাছ থেকেই এসেছিল তো! ...উঁহু, না, অন্য কেউ তো দিয়ে যায়নি। ...নিশ্চয়, আপনাদের পরামর্শ মতোই তো..."

কার্তিক ফোন করছে আর বীরেশবাবু তাকে দেখছেন। দেখতে দেখতে বীরেশবাবুর মাথার মধ্যে খুট করে কিসের সঙ্গে কী যেন একটা লেগে যায়, তিনি হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠতে থাকেন, আসল কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়ে তিনি নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকেন কার্তিকচন্দ্রকে। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি! গর্তে-ঢোকা চোখ! তুবড়োনো গাল! শির-ওটা হাত! কী আশ্চর্য! এতদিন খেয়াল করে দেখেননি তো, ভূতের গল্পের এমন মার্কামারা লেখক তাঁর এমন হাতের কাছে! কোনও সন্দেহ নেই, ওরই কীর্তি এটা কিন্তু এত কারচুপি করার দরকারটা ছিল কী ওর? গল্পটা বাজে, তাই? লজ্জা? তাই একটা বন্ধুকে ভোজপুরী সাজিয়ে তাঁর কাছে ভজিয়ে দিয়ে গেছিল? তা যাক। এ ছেলেকে দিয়ে বর্তমানে না হোক, ভবিষ্যতে ভূতের গপ্পো হবে। হতেই হবে। বীরেশচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে এবার পড়তে শুরু করেন:

"এক যে ছিল ভূত।" সেই অভূতপূর্ব, অনবদ্য ভূমিকা, "ভূতের নাম..." এ কী ? এ কী এ? অক্ষরগুলো এরকম ঝাপসা মেরে যাচ্ছে কেন হঠাৎ? আলোটা ঝিমিয়ে যাচ্ছে যে? পাওয়ার কাট?...ফেজ্ গেল? হঠাৎ দুম্ ফটাশ করে একটা বোমা ফাটার মতো আওয়াজ হল। ঘরের দুটো বাল্ব একসঙ্গে ফেটে গেছে। ব্র্যাকেট থেকে খসে ঝনঝন করে মেঝেয় ভেঙে পড়ল টিউবলাইটটা। ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে হু-হু করে কনকনে একটা ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে পড়ে দমাস করে বন্ধ করে দিল দবজাটা। খটাস্ দুম্ দড়াম্ করে সব হুড়কো পড়ে গেল। আবছায়ার মধ্যে বীরেশবাবু দেখলেন টেবিলের অপর প্রান্তে সেই লেখক এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতি, পাঞ্জাবি, চশমা, কোনও ভুল নেই।

হাতের ওপর বইখানা ক্রমশই অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা আর ভারী হয়ে উঠছে। শুকনো মুখে ঢোক গিলে বীরেশবাবু কাঁপা গলায় চেঁচালেন, "কাত্তিক, অ কাত্তিক!"

অমনি ভোজপুরী লেখক ঠিক গেঞ্জি খোলার মতো চড়চড় করে তার শরীবের ওপরেব চামডাখানা খুলে নিল। তারপর শূন্যে হাত বাডিয়ে একখানা কালচেমতো চামড়া নতুন গেঞ্জি পবার মতো মাথা গলিযে পরে,অবিকল কার্তিকটি হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে খলখল কবে হাসতে লাগল। হাসে আর শারদীয়ার পাতাগুলো সে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঘরময় উড়িয়ে দেয়। ঘরের রাক্ষুসে ঘূর্ণি হাওয়ায় পাতাগুলো পড়ে আর হুসহাস করে বেমালুম উবে যায়। পাতাগুলো উবে যায়, আর বীরেশবাবুও একটু একটু করে জ্ঞান হারাতে থাকেন।

ঈগলের নখ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঘটনাটা ঠিক এইভাবে ঘটেছিল। কলকাতার চাব পাঁচটি ব্যাঙ্ক-ডাকাতিব আসামি শবদিন্দু বায গত ১৫-ই এপ্রিল পুলিশের সঙ্গে ববিনসন বোডের প্যারাডাইস অ্যাপার্টমেন্টেব পঁচিশতলার ফ্ল্যাটটিতে আসে। পুলিশকে সে বলেছিল, এই ফ্ল্যাটটির মালিক এক সিন্ধি ব্যবসায়ী। তিনি অধিকাংশ সময় বম্বে থাকেন। ফ্ল্যাটে থাকে নেপালী দারোযান নরবাহাদুর।

ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল দুপুরবেলা লালবাজারের ডাকাতি নিবোধ শাখাব সাব-ইন্সপেক্টর সমীর প্রধান, শরদিন্দুকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটে আসেন। সমীরেব সঙ্গে ছিল দুজন আমর্ড কনস্টেবল আর দুজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল।

শরদিন্দু রায় দুর্ধর্ষ আসামি। এর আগেও তিনটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ তার নামে ওয়ারেন্ট বার করে। কিন্তু চার পাঁচ বছর সে দেশে ছিল না। বাংলাদেশ হয়ে বার্মার মধ্য দিযে সে থাইল্যান্ডে যায় ও সেখানে চোরাকারবারের ব্যবসায়ে যোগ দেয়। সেখান থেকে শরদিন্দু হংকং যায়। হংকং-এর নাথন রোডে সে একটি হোটেলের ম্যানেজার হয়ে কিছুদিন কাজ করেছিল। কিন্তু ওই হেটেলেব মালিককে খুন করে সে সরে পড়ে। নেপাল

থেকে সে আবার ভারতে ঢোকে। এরপর কলকাতার ব্যাঙ্ক-ডাকাতির সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে।

পুলিশরা খুব ভাগ্যে বিশ্বাস করে। তারা বলে, ভাগ্য প্রসন্ন না হলে দাগি আসামিদের ধরা মুশকিল। সমীর প্রধান ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। চারমাস ধরে সে তন্ন-তন্ন করে আসামিদের খুঁজছিল। কিন্তু কোথাও কোনো ক্লু পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে নেহাত এক দৈববশে ধরা পড়ে।

আমি সমীরের বস। ডি.ডি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। সমীর দশবছর ধরেই ডি.ডি-তে। আমি দশবছর পরে সদ্য ডি.ডি-র চার্জ পেয়েছি।

আমাদের এই লাইনে সবাই নিজের নিজের সোর্স ও কাজকর্ম সম্পর্কে মন্ত্রগুপ্তি রাখে। কিন্তু সমীর আমাকে সব কথা খুলে বলত। শরদিন্দুর গ্রেফতারের ব্যাপারে সে আমাকে এক অদ্ভুত কাহিনী শোনায়।

সমীরের জবানিতেই বলি ঃ

ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারে কিনারা করার জন্য হন্যে হয়ে যখন সারা ভাবত ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন একদিন রাত্তিরবেলা আমার দরজায় টোকা পড়ে। রাত তখন বড়জোর নটা হবে। লোডশেডিং। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে পাশের ঘরে শুয়ে। আমি মোমবাতি জ্বেলে কতগুলি কাগজপত্র পরীক্ষা করছি।

আমি বললাম, 'কে?'

কোনো উত্তর দিল না কেউ। আবার দরজায় টোকা। যদিও পুলিশ কোয়ার্টার্সে সাধারণ ক্রিমিন্যাল বদ-মতলবে ঢুকবে না, তবু সাবধানের মার নেই।

আমি ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বার করলাম। তারপর দরজা খুললাম।

দেখলাম এক রোগা বৃদ্ধ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

আমি বললাম, "কে আপনি? কী চান?"

লোকটি বলল, "আমাকে চিনবেন না। আপনি তো সমীরবাবু, ব্যাঙ্ক-ডাকাত শরদিন্দু রায়কে খুঁজছেন?

আমি চমকে উঠলাম। শরদিন্দু রায় যে এই ডাকাতদলের নেতা এটা অত্যন্ত গোপন খবর। এ খবর আমার এক সোর্স দিয়েছে। কিন্তু এখবর আমি ডি.সি.ডি.কেও বলিনি। খবরের কাগজকে বলেছি, এটা উত্তরপ্রদেশের একটা গ্যাং-এর কীর্তি। তারা এ-নিয়ে রঙ চড়িয়ে অনেক কিছু লিখেছে।

আমি বললাম, 'আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

লোকটি বলল, 'আমি শরদিন্দুর বাবা।'

শুনে আমি চমকে উঠলাম। ভদ্রলোক বললেন, 'নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দিতে এসেছি। শরদিন্দু আমার একমাত্র ছেলে। ম-মরা ছেলে। বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছিলাম। কিন্তু

সে যে এমন অমানুষ হয়ে যাবে, তা ভাবিনি।

"আপনি বাবা হয়ে ছেলেকে ধরিয়ে দেবেন?"

আপনি যদি ওকে আজকালের মধ্যে গ্রেফতার না করেন, তাহলে ও খুন হয়ে যাবে। টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দলের মধ্যে ভীষণ গোলমাল দেখা দিয়েছে। আমি বাবা, ছেলে যে-যে অন্যায় করেছে, তার জন্য আইনে যা শাস্তি আছে পাক। কিন্তু ওর প্রাণটা বাঁচুক। আপনি ওকে গ্রেফতার করুন।"

"কীভাবে?"

"আমি বলে দেব ও কোথায় আছে।"

আপনি এত কথা কী করে জানলেন?"

" দয়া করে ও-কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে আমি সব দেখতে পাই। কে কোথায কী করছে সব জানতে পারি। আপনি আর জানতে চাইবেন না। আসামিকে গ্রেফতার করুন।"

"কবে নিয়ে যাবেন?"

"আগামীকাল এই সময় আসব, তৈরী থাকবেন।"

সেই সময় হঠাৎ দমকা হাওয়ায় মোমবাতিটা নিভে গেল। কিছু বলতে যাবার আগে ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির সামনে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

খুব খটকা লাগল পুরো ব্যাপারটা। কোনো ট্রাপ নয় তো? এইভাবে ফাঁদ পেতে অনেক পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। আমি অবশ্য চিরকাল ডেয়ারিং, সবাই জানে। নয়তো চিনের বিখ্যাত ক্যারাটে লড়িয়ে লি চিয়া হুইকে সেই কোকেন কেসে অমন কাবু করতে পারতাম না।

পরদিন পাঁচজনের একটা সাদা পোশাকের ফোর্স নিয়ে রেডি থাকলাম।

ঠিক ন'টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে লোডশেডিং হয়ে গেল। আর মিনিট দশেকের মধ্যে দবজায় খট্‌খট্‌ আওয়াজ।

দরজা খুলে দিলাম। বৃদ্ধ ঢুকলেন।

"রেডি?"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আর এলেন না।"

"কথা যখন দিয়েছি, আসবই। আর আপনার চেয়ে আমার দায় অনেক বেশি সমীরবাবু। আমার ছেলের জীবন নির্ভর করছে এর ওপর।"

"আপনি এখন কোথায় থাকেন?"

এবার বৃদ্ধ যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন। "এ-কথা জেনে আপনার লাভ কী?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

বৃদ্ধ বললেন, "অন্যায় কৌতূহল সংবরণ করুন। আমার সম্পর্কে বেশি জানতে চাইবেন না। আপনার পুলিশ কোডেই আছে, সোর্সকে সব সময় গোপন রেখে দিতে হয়। চলুন। আরে বাবা, এত ঘর-ভর্তি লোকের কোনো দরকার ছিল না।"

"ভুলে যাবেন না, আমরা বরযাত্রী যাচ্ছি না। দুর্ধর্ষ আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যালকে ধরতে যাচ্ছি।"

"আমার ছেলে মোটেই দুর্ধর্ষ নয়। ছেলেবেলায় সে আরশোলা দেখে ভয়ে শিউরে উঠত। সে ছিল আরামপ্রিয়, চরম ফাঁকিবাজ আর ভীষণ আদুরে। পড়াশোনায় ফাঁকি দিত ছেলেবেলা থেকে, মনটা নরম ছিল। একবার এক ভিখিরিকে আমার এক নতুন ধুতি দিয়ে দিয়েছিল বলে মার খেয়েছিল আমার কাছ থেকে। সেই ছেলে কীভাবে ডাকাত হয়ে গেল তা ভাবাই যায় না। জীবনে যে কাউকে কড়া-কথা বলেনি, মারধোর করেনি। পুজোয বলি দেখতে পারত না, বলত— আমার কষ্ট হয়। সেই ছেলে!"

আমি বললাম, "এমন হয়। কেউ তো আর জন্ম-অপরাধী হয় না। কুসঙ্গে পড়ে বহু ভাল ছেলে বিগড়ে যায়। চলুন, কোথায় যেতে হবে? আপনাকে আমার জিপে বসতে হবে।

আমার জিপে আমার পাশে ভদ্রলোক বসলেন। সত্যি কী রোগা মানুষ! মনে হচ্ছে একটা কঙ্কালের গায়ে কে যেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে দিয়েছে। উনি যে আমার পাশে বসে আছেন, আমি তা অনুভবও করতে পারছি না।

বৃদ্ধ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। আমাদের জিপ এসে থামল হ্যারিসন রোডের একটি হোটেলের সামনে। হোটেলের নাম ঃ জয়কৃষ্ণ লজ। ভদ্রলোক বললেন, "হে টেলেব চারতলার চিলেকোঠার ঘরে চলে যান। শরদিন্দুকে পাবেন। আমাব একান্ত অনুরোধ, তাকে মাবধোর করবেন না। আইনত যা শাস্তি তার পাওনা, তাই তাকে দেবেন। তার কোনো ক্ষতি করবেন না। আমি কিন্তু সব কিছুই দেখছি। নিজের ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছি, বুঝতেই পারছেন আমি সাধারণের থেকে একটু আলাদা।"

"আপনি গাড়িতে বসুন। ড্রাইভার রইল আপনার সঙ্গে।"

"না, আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারব না। আমি চলি। দরকার হলেই আমাকে পাবেন।"

"আপনার ঠিকানা?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেলেন। আমরা জয়কৃষ্ণ লজের দিকে ধীরে ধীরে এগোলাম। শরদিন্দুকে পাওয়া গেল ঠিক চিলেকোঠার ঘরে। মানস পাত্র, এই নামে বানিগঞ্জেব ব্যবসায়ী সেজে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল।

সমীরেব মুখে শরদিন্দুব গ্রেফতারেব রহস্য শুনেছিলাম। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি শরদিন্দুর বাবা তিনি আর আসেননি। সমীরও এ নিয়ে শরদিন্দুকে কিছু বলেনি। শবদিন্দু জেরার মুখে স্বীকার কবে ব্যাঙ্ক-লুঠের টাকা কোথায় আছে। তার মধ্যে এক জায়গার নাম কবে, সেটি প্যারাডাইস অ্যাপার্টমেন্ট। আর ওই প্যাবাডাইস অ্যাপার্টমেন্টে লুকোনো টাকা সে যখন দেখাতে আসে, তখনই ঘটে সেই ঘটনাটি।

সমীরের বক্তব্য অনুসাবে শরদিন্দু আর সমীর শোবার ঘরে ঢোকে। কনস্টেবলরা দরজার বাইরে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ শরদিন্দু আলমারির ড্রয়ার খুঁজবার ভান করে। তারপর জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। জানালার কোনো গ্রিল ছিল না। হঠাৎ নিমেষের মধ্যে শরদিন্দু পঁচিশ তলা থেকে মরণ-ঝাঁপ দেয়। সমীর চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে কনস্টেবলদের বলে.

'সর্বনাশ হয়ে গেছে! আসামি ঝাঁপ দিয়েছে। চলো, নীচে চলো।"

শরদিন্দুর এই মৃত্যু সমীরের মতে আত্মহত্যা। কিন্তু একজন বিচারাধীন আসামির পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় এই যে অস্বাভাবিক মৃত্যু, এর সমস্ত দায় সমীরের ওপর এসে পড়েছে। তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

কিন্তু ঘটনা এখানেই থেমে যেত, যদি না একটি দৈনিক পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার সঞ্জয় সেন তিনটি প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করতেন যে, শরদিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। শরদিন্দু নাকি লুকোনো টাকার হদিস ঠিকই দিয়েছিল, কিন্তু ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সমীর ওই টাকা আত্মসাৎ করতে উৎসুক। আর এই টাকা আত্মসাৎ করা খুবই সহজ হয়ে দাঁড়ায়, যদি শরদিন্দুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। নয়তো ওই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। ওই বাড়ির মালিক সিন্ধি ব্যবসায়ীর সঙ্গে শবদিন্দুর মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। ওই ভদ্রলোকের আরও ফ্ল্যাট আছে। শরদিন্দু সম্ভবত ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনতে চেয়েছিল। এছাড়া আর কোনো সম্পর্ক ছিল না শরদিন্দুর সঙ্গে। সমীর ওই ফ্ল্যাটে এর আগে একবার এসেছিল। তখনই শরদিন্দুকে হত্যা কবার পরিকল্পনা করে সে।

এই প্রতিবেদন নিয়ে সারা শহরেই হইচই পড়ে। আর আমার ওপর পড়ে একটি অপ্রিয় কাজের ভার। এই ঘটনার তদন্ত। আমাকে বার করতে হবে, সত্যি-সত্যি ইচ্ছা করেই সমীর শরদিন্দুকে ফেলে দিয়েছে কি না।

আমি যতদূর সমীরকে জানি, সে একজন সৎ ও দক্ষ অফিসার। সে কেন এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে যাবে। তার একটা বড় ভুল হয়েছিল শরদিন্দুকে নিয়ে ওইভাবে ঘরে ঢোকা! বিশেষ করে জানালায় যখন গ্রিল নেই। কিন্তু আমাকে সমীর বলেছিল, " বিশ্বাস করুন স্যার, আমার একদম মনে হয়নি শরদিন্দু আত্মহত্যা করতে পারে। সে ভেতরে-ভেতরে খুব অনুতপ্ত হয়েছিল। সমস্ত ঘটনার স্বীকারোক্তি কবেছিল। তার স্টেটমেন্টের ওপব ভিত্তি কবে গোটা দলটাকে আমরা ধরে ফেলি। কিন্তু শরদিন্দু নিজে যে এভাবে ঝাঁপ দেবে তা বুঝতে পারিনি।"

আমি বলেছিলাম, "সমীর, কিছু মনে কোরো না, তদন্ত না করে আমি তোমার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো রায় দিতে পারব বলে মনে হয় না। তুমি আমাকে একবাব এই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখাবে কী ভাবে শরদিন্দু ঝাঁপ দিয়েছিল?"

সমীর বলল, "নিশ্চয়ই। আপনি যেদিন বলবেন।"

আমি বললাম, "চলো, কালই আমরা যাব।"

উঁচুবাড়ির পঁচিশতলা থেকে কলকাতাকে অপূর্ব দেখায়। মনেই হয় না কলকাতার চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথাও আছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে নীচের মানুষজনকে। জানালাটা একটু উঁচুতে। একজনকে উঠতে গেলে লাফিয়ে উঠতে হবে। একটি জলজ্যান্ত লোক জানালার উপব উঠল, নীচে ঝাঁপ দিল, এতে তো সময় লেগেছে কিছুটা। কিন্তু সমীব তখন কবছিল কী? তার উচিত হয়নি অতখানি অন্যমনস্ক

হওয়া।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও এত চমকাতাম না। দেখি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কোন ফাঁকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। নিমেষের মধ্যে বৃদ্ধ এগিয়ে গেলেন সমীরের দিকে।

সমীর তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরুল না। আমি ছুটে যাবার আগে দেখলাম জানালায় দুজনের ধস্তাধস্তি হচ্ছে।

বৃদ্ধ এক ঝটকায় সমীরকে যেন শূন্যে তুলে ধরলেন। তারপর যেমনভাবে কোনো ভারী জিনিস কেউ ফেলে দেয়, তেমনি করে সমীরকে ফেলে দিলেন খোলা জানালা দিয়ে। সমীরও বোধহয় লোকটির গলা জড়িয়ে ধরেছিল। সেও একই সঙ্গে নীচে পড়ল। চোখের সামনে নিমেষের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ততক্ষণে আমার সঙ্গীরা সবাই এসে গেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে শুধু বললাম, "সর্বনাশ হয়েছে।"

কিন্তু কোথায় গেল সেই বৃদ্ধের মৃতদেহ ? তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার মৃতদেহ পাওয়া গেল না! শুধু শান-বাঁধানো মেঝের ওপর সমীরের থেঁতলানো দেহটা পড়ে আছে।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত জায়গাটা।

এই ঘটনার পর আমার পক্ষে মানসম্ভ্রম নিয়ে চাকরিতে টিঁকে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

একটি খুনের কিনারা কবতে গিয়ে পবোক্ষভাবে আমি আর একটি মর্মান্তিক মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। আমার প্রথম কাজ হল শরদিন্দুর বাবা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া। এতদিন ধরে যে রহস্যময় লোকটি সমীরকে অনিবার্য পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, কে সে? সে কি কোনো বাস্তব অস্তিত্ব?

অনেক খোঁজখবর করে যে তথ্য জোগাড় করলাম তাতে আমি স্তম্ভিত। আজ থেকে পাঁচবছর আগে উত্তর প্রদেশের এক অখ্যাত শহরে মৃত্যু হয়েছিল যোগেন্দ্রমোহন রায়ের।

শরদিন্দুব বাবা যোগেন্দ্রমোহন উত্তরপ্রদেশ থেকে তাঁর যে ছবিটি যোগাড় করেছিলাম, সেটি দেখে চমকে উঠলাম। এই তো সেই বৃদ্ধ। যাকে আমি ক্ষণিকের জন্য দেখেছিলাম শীর্ণ হাত দুটি নিয়ে প্যারাডাইস অ্যাপার্টমেন্টের জানালা থেকে সমীরকে ফেলে দিতে। কিন্তু সমীরকে তিনি হত্যা করবেন কেন? তবে কি সত্যিই সমীর টাকার লোভে শবদিন্দুকে হত্যা করে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছিল? ঘটনাটা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত।

সমীরের মৃত্যুর জের মেটাতে হয় আমার পুলিশি জীবনের অবসান ঘটিয়ে। তদন্ত কমিটিতে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছি। প্রমাণিত হয়েছে ঃ সমীরের মৃত্যু আত্মহত্যা।

পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আমি এখন একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাই।

সন্তু কোথায়

প্রদীপচন্দ্র বসু

খেলাব মাঠে সন্তুব সঙ্গে কথা হয়েছিল বাত্রে আম কুড়োতে যাব।

সন্তু আমার বাড়ির পাশেই থাকত। ঠিক এগাবোটায় ঘড়িব কাঁটা মিলিয়ে ও এসে হাজিব হল। বাড়ির বাইবেব দিকে পড়াব ঘবে ওর জন্যে অপেক্ষা কবছিলাম আমি। বাবা, দাদা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভেতব থেকে কাবও গলাব আওয়াজ পাচ্ছিলাম না। শুতে যাবাব আগে মা দেখে গেছেন আমি পড়ছি। গ্রীষ্মের ছুটিব পব স্কুল খুললে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা। সেজন্য মা কয়েকদিন আগে পড়াব ঘরেই আমাব শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, পড়তে পড়তে ঘুম পেলে আমি যাতে ওখানেই শুতে পাবি। আমি যথেষ্ট বড় হয়ে গেছি। একলা শুতে আজকাল আব ভয় করে না।

সন্তু এসে ডাকতে আমি চুপিচুপি পড়ার ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আম কুড়োতে যাবাব কথা বাড়িব কাউকে বলিনি। বললে এত রাত্রে কেউ আমাদেব যেতে দিতেন না। ছোটবেলায় ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ার সময় বন্ধুরা মিলে প্রায় রোজই বিকেলবেলা আমবাগানে যেতাম। কুড়িয়ে পাওয়া আম খাবার লোভ উঁচু ক্লাসে ওঠার পব চলে গেছে। সেদিন

খেলার মাঠে অনেকদিন পর পুরোনো ইচ্ছেটা কেন জানি হঠাৎ আমার আর সন্তুর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল!

সেসময় আমরা মালদা জেলার মানিকচকে থাকতাম। মানিকচককে ঠিক শহর বলা যায় না। গঞ্জের মতো ছিল জায়গাটা। এমনিতেই মালদার আমের যথেষ্ট নামডাক আছে। মানিকচকের আমবাগান আবার জেলাবিখ্যাত। তবে আমাদের নিজস্ব কোনও আমবাগান ছিল না। ঠাকুর্দা মারা যাবার আগে ভিটেবাড়িটা ছাড়া আর সব জমিজমা বিক্রি করে ফেলেছিলেন পিসীদের বিয়ে দিতে। ধানচালের ব্যবসা করে বাবা সংসার চালাতেন। আমরা বাজার থেকে আম কিনে খেতাম। এ ছাড়া চুরি করে, কুড়িয়ে খাওয়া-টাওয়া তো ছিলই।

বিকেলে অল্পস্বল্প ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় আকাশ পরিষ্কার ছিল। সন্তু আর আমি বাইরে বেবিয়ে দেখি চারপাশে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। আমাদের বাড়ি থেকে আমবাগানগুলি বেশ খানিকটা দূরে। লোকালয় ছাড়িয়ে যেতে হবে। সেজন্য দুই বন্ধু মিলে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। বাড়ির লোকেরা টের পাবার আগেই ফিরে আসতে হবে।

নিস্তব্ধ রাত। পাতলা বাতাসে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। দিনের গরমভাব এখন নেই। পরিষ্কার জ্যোৎস্নার আলোয় মেঠো রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে আমার ভালই লাগছিল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী রে বাবলা, ব্যাগ এনেছিস তো?"

"এনেছি। পকেটে আছে।" নিচু গলায় সন্তুকে বললাম আমি।

মিনিট দশেক হাঁটার পর পালেদের আমবাগানে আমরা প্রথম ঢুকলাম। বাগানটা খুব বড না হলেও পুরনো। আমও ধরেছে অনেক। গাছের ওপর ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নায় আমগুলো ধূসব দেখাচ্ছিল। বেশ বড় বড় ফজলি আম ঝুলে আছে থোকায় থোকায়।

কিন্তু গাছতলায় খুঁজেপেতে একটা আমও পেলাম না দুজনে। আশ্চর্য ব্যাপার! বিকেলে ঝড় হল, অথচ একটা আমও বাগানে পড়ে নেই. এর মধ্যে কারা যেন সব কুড়িয়ে নিয়েছে! এদিককার আমবাগানে পাহারাদার বা মালি রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। ঢিল ছুঁড়ে বা চুরি করে কেউ আম খায় না। লোকে গাছতলায় কুড়িয়ে যা পায় তাই যথেষ্ট। কুড়িয়ে পাওয়া আম নিলে বাগানের মালিকও কিছু বলে না।

প্রথম বাগানে আম না পাওয়ায় আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। এরপর দুই বন্ধু ঢুকলাম পাশের বাগানে। বাগানটা এক মারোয়াড়ির। আমরা নাম জানতাম না। এই বাগানের গাছগুলি বেশ ঝাঁকড়া আর ঘন করে লাগানো। ফলে আগের বাগানের মত গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো বাগানে বিশেষ ঢুকছিল না। তাহলেও যা ঢুকছিল তাতে গাছতলার মাটি দেখতে পাচ্ছিলাম কোনোমতে। কিন্তু আমি আর সন্তু পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না ভাল করে।

এ বাগানেও যখন একটা আমও কুড়িয়ে পেলাম না, খুব হতাশ হয়ে পড়লাম আমি। ঝড়ে পড়া আম সব কারা কুড়িয়ে নিল? সেই ছোটবেলা থেকে আম কুড়োচ্ছি, এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি কখনও। হঠাৎ খেয়াল করলাম, আম খুঁজতে খুঁজতে আমি আর সন্তু

আলাদা হয়ে গেছি! আধো-অন্ধকারে সন্তুকে ধারে-কাছে দেখা যাচ্ছে না। আমার সঙ্গে টর্চ নেই। বাড়ি থেকে আনতে ভুলে গেছি।

সন্তুকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি বাগানের মধ্যে অস্থিরভাবে ঘুরতে শুরু করলাম। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মধ্যে টুপটাপ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। ওগুলো পাতা ঝরার শব্দ। গাছ থেকে আম পড়লে ওরকম শব্দ হয় না। কারুর পায়ের শব্দও ওরকম নয়। তাহলে সন্তু গেল কোথায়? আম কুড়োনোর কথা আমার মাথায় উঠল। এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠল আমার হাত-পা।

একা-একা সেই অন্ধকার বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি ডাকতে লাগলাম, "সন্তু! এই সন্তু! তুই কোথায়?" কেউ সাড়া দিল না। তার বদলে একটা রাতজাগা পাখি মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে বিকট স্বরে ডেকে উঠল। আচমকা পাখির বিকট ডাক শুনে ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। গায়ের লোম সব খাড়া হয়ে গেছে। আমি এখন কী করব?

এমন সময় পাশ থেকে কে যেন খুব আস্তে আমার নাম ধরে ডাকল। গলার স্বর শুনেই বুঝলাম সন্তু, অথচ বুঝতে পারলাম না কখন ও পাশে এসে দাঁড়াল। চোখ খুলে ওর দিকে ঘুরে বললাম, "কী রে, তুই কোথায় চলে গিয়েছিলি?"

"আমি তোর পাশেই ছিলাম।" উত্তর দিল সন্তু।

"তাহলে আমি তোকে দেখতে পাচ্ছিলাম না কেন?"

"অন্ধকারে ওরকম হয়।"

সন্তু আমার পাশে এসে দাঁড়ালেও ওর মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে ওকে কাছে পাওয়ায় আমার ভয়টা কমতে শুরু করল।

আমি বললাম, "সন্তু, একটা আমও পাচ্ছি না আজ। কপাল খারাপ। চল বাড়ি ফিরে যাই।"

আমার কথায় গুরুত্ব দিল না সন্তু। বলল, "ফিরে যাব কী! তার চেয়ে বাবলা—চল আমরা গড়পারের আমবাগানে যাই। এদিককার বাগানের আম ধারে-কাছের লোকজন কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। অতদূরে কেউ আম কুড়োতে যায় না। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

সন্তুর কথা শুনে আমি একটু অবাক হলাম। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি কি সব লোপ পেয়ে গেছে? গড়পারের আমবাগান এখান থেকে অন্তত মাইল দুয়ের দূর হবে। নদীর সরু বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে একটানা। দিনের বেলা হলে না হয় একটা কথা ছিল। এই নিশুতি রাতে ওখানে কেউ যায় বলে আমি শুনিনি। ধারে-কাছে মানুষের বাড়িঘর নেই।

বাগানের মধ্যে এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খানিক আগে পাখির চিৎকার শুনে আচমকা ভয় পাওয়ায় সেই ক্লান্তি এখন শরীরে জেঁকে বসেছে। রাত কত হয়েছে জানি না! একবার ভাবলাম গড়পারের আমবাগানে যাব না। ফিরতে দেরি হলে বাড়ির লোক জেনে যেতে পারে। তখন আম কুড়ানো বরাবরের জন্যে ঘুচে যাবে। আবার ভাবলাম,

এত কষ্ট করার পরেও একটা আম নিয়ে বাড়ি ফিরব না? পকেটের ব্যাগ পকেটেই থেকে যাবে? সাতপাঁচ ভেবে শেষপর্যন্ত সন্তুর কথায় রাজী হয়ে গেলাম। ওকে বললাম, "সন্তু গড়পাড়ের বাগানে যেতে পারি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

"নিশ্চয়ই!" একটু মুচকি হেসে সম্মতি জানাল সন্তু। অন্ধকারে ওর মুখের হাসি দেখতে না পেলেও গলার স্বর শুনে তা বুঝলাম। আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি ভেবে বোধ হয় ওর ওই হাসি।

নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে আমরা দুজনে হাঁটছি। হাঁটছি তো হাঁটছিই। বাঁধটা সরু থাকায় দুজনের পাশাপাশি হাঁটা সম্ভব হচ্ছিল না। সেজন্য সন্তু আগে যাচ্ছিল, আমি পেছনে। তাড়া থাকায় সন্তু এবার এত জোরে হাঁটতে শুরু করেছে যে আমি কিছুতেই ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিলাম না। পেছন থেকে মনে হচ্ছিল ও যেন উড়ে যাচ্ছে।

নদীর চড়া, জলের মৃদু স্রোত চারপাশের গাছপালা, পাটক্ষেত দূরের আমবাগান, সামনে সন্তু—জ্যোৎস্নার আলোয় চারপাশের সবকিছুই আবছা দেখালেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আমার মনে হল নদীর ধারে জ্যোৎস্না লোকালয় থেকে আরো বেশি উজ্জ্বল হয়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাঁধের পাশে মাঝিদের কুঁড়েঘর পার হয়ে গেলাম। সন্তু আগে থাকায় আমাদের কথাবার্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুজনেই চেষ্টা করছিলাম গড়পাড়ের আমবাগানে কত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়।

তাড়াতাড়ি করায় হাঁটতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই সরু বাঁধের ওপর পা ঠিকমত পড়ছিল না। হড়কে যাচ্ছিল। দু একবার হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে গেছি। বাঁধের ওপর আবার গরমের দিনে সাপের ভয় খুব। না দেখে শুনে একবার পা ফেললে আর নিস্তার নেই। অথচ সন্তুর হাঁটা দেখে মনে হচ্ছিল ও এসবের কোনো পরোয়া করছে না।

কতক্ষণ এভাবে একটানা হেঁটেছি মনে পড়ছে না। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ছুটে এসে আমায় জাপটে ধরল। আমি ছটফট করে নিজেকে ছাড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আমার ছটফটানি থামাতে সে পেছন থেকেই আমার গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মারল। চড় খেয়ে আমি নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি উদাস মিশ্র আমাকে ধরে রেখেছে। উদাস মিশ্র নৌকা চালায়। আমাদের খুব পরিচিত মাঝি ও। চোখাচোখি হতেই ও বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেউ কোথাও নেই, এই নিশুতি রাতে একা-একা তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? মরার সাধ হয়েছে তোমার?"

"মরতে যাব কেন? আমি আর সন্তু গড়ের বাগানে আম কুড়োতে যাচ্ছিলাম" ধরা গলায় উদাস মিশ্রর জেরার উত্তর দিলাম আমি।

"কোথায় সন্তু? আমি তো কাউকেই দেখছি না তোমার সঙ্গে?" উদাসের গলার স্বর আবার কাঁপিয়ে তুলল রাত্রির নিস্তব্ধতাকে।

সামনের দিকে হাত দেখিয়ে আমি বললাম, "ওই তো! আগে হেঁটে যাচ্ছে।"

আমার আর উদাসের কথাবার্তা শুনে সন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হাত তুলে ওকে দেখাতেই

ও পেছন ফিরে তাকাল।

এদিকে চড় খেয়ে উদাসের হাতের বাঁধনের মধ্যেই আমি তখন থরথর করে কাঁপছি।

সন্তু পেছন ফিরে তাকাতেই ওর মুখের চেহারা দেখে আমার বুকের রক্ত আরো হিম হয়ে গেল। ও কী রকম মুখের চেহারা সন্তুর? সন্তুর অত সুন্দর মুখটাকে এক নিমেষে কে এরকম হিংস্র করে দিল? গলার স্বরটাও বদলে ভয়ংকর হয়ে উঠল হঠাৎ। ওরকম গলার স্বর কোনো মানুষের হতে পারে না। এই সন্তুকে আমি চিনি না। এই সন্তুকে আমি দেখিনি কোনোদিন।

কিন্তু ও আমাকে চেনে। জিজ্ঞেস করল, "কী রে বাবলা? আম কুড়োতে আর যাবি না?"

উত্তর দেবার মত অবস্থায় আমি তখন নেই। উদাস মিঞার চড় খাবার পরেও শরীরে যা জোর ছিল, সন্তুর বীভৎস মুখ আর ভয়ংকর গলার স্বর শুনে তাও হারিয়ে গেছে। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। ঠোঁট দুটোতেও কোনো সাড় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমি কিছু বলছি না দেখে ও আবার বলল, "যা—! এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেলি।"

কথা শেষ হতে না হতেই আমার চোখের সামনে সন্তুর চেহারাটা যেন ভোজবাজিতে হঠাৎ মিলিয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরতে দেখি মায়ের বিছানায় শুয়ে আছি। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মা, বাবা, দাদা, উদাস মিঞা আর সবার সামনে সন্তু।

সন্তুকে সবার সঙ্গে দেখতে পেয়ে আমি কী রকম বোকা হয়ে গেলাম। ওর বীভৎস মুখের চেহারা ভয়ংকর গলার আওয়াজ আবার আমার মনে পড়ে গেল।

বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসে ভয়ার্ত গলায় বললাম, "সন্তু! তুই এখানে?"

সন্তু কিছু বলল না। আমার কথা শুনে বাবা এক পা সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "সন্তু বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল।" তারপর শান্তগলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কার সঙ্গে আম কুড়োতে যাচ্ছিলি বাবলা?"

কার সঙ্গে আবার? সন্তুর সঙ্গে। মনে মনে উত্তর দিলাম আমি।

কিন্তু বাবা বলছেন, সন্তু বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল। তাছাড়া উদাস মিঞাও আমার সঙ্গে সন্তুকে দেখতে পায়নি। তাহলে কে আমার সঙ্গে আম কুড়োতে গিয়েছিল? উদাস আমাকে ধরে না ফেললে সে আমাকে কোথায় নিয়ে যেত? কোন বাগানে আজ আম কুড়োতাম আমি?

অনেক চিন্তা করেও সেই মুহূর্তে আমি নিজের থেকে এর উত্তর খুঁজে পেলাম না।

অনুতোষের অন্তর্ধান

শচীন দাস

প্রায় ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসেই ট্রেনটা ধরতে হলো। এমন যে হবে আগে বুঝতে পারিনি। বেরিয়েছি তো কত তাড়াতাড়ি। ট্রেনের সময়েরও প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে। ভেবেছিলাম, বাড়ির সামনেই বাস স্ট্যান্ড। আস্তে ধীরে ধীবে বাসে বসে একসময় হাওড়ায় পৌঁছলেই চলবে। তারপর টিকিট কেটে আর ট্রেনে উঠতে কতক্ষণ!

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোতেই সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল। বাস স্ট্যান্ডে বাস নেই। হাওড়ার দিকে নাকি প্রচণ্ড জ্যাম। তাই বাস কখন আসবে ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। অগত্যা হাতের পাঁচ ট্যাক্সি। এদিকে ওদিকে দেখতে দেখতে একটা যোগাড় হয়ে গেল। কিন্তু দরজা খুলে উঠতেই ড্রাইভার ভুরু কোঁচকালো।

যাচ্ছেন তো, কিন্তু হাওড়া ব্রিজ ধরে যেতে গেলে আজ আর পৌঁছতে পারবেন না। তার চেয়ে আমি বলি বাবুঘাট থেকে লঞ্চ এ পার হয়ে যান। ঠিক সময়েই ট্রেন ধরতে পারবেন।

বুদ্ধিটা মন্দ নয়। অতএব তাই হলো। অন্তত শেষ সময়ে হলেও ছুটতে ছুটতে এসে তবু

ট্রেনটা ধরতে পারলাম।

কিন্তু ট্রেনে উঠতেই অবাক। লোক কোথায়! অত বড় একটা কামরায় চার পাঁচজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে!

অনুতোষ ঠিকই বলেছিল, এ সময়টায় এ ট্রেনে তেমন ভিড় হয় না ; দরকার হলে শুয়ে শুয়েও আসতে পারবি। তবে দেখিস ঘুমিয়ে পড়িস না ; ট্রেন কিন্তু ঠিক রাত ন'টায় বাঁকুড়ায় পৌঁছোবে।

তা যে পৌঁছবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যেমন কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে ছাড়ল। ভাবলাম, ঘুমিয়ে তো পড়বই না, উপরন্তু শুয়েও যাবো না। নতুন জায়গা, যাইনি কোনোদিন—জানলার পাশের সীট যখন খালি আছে দেখতে দেখতেই যাবো।

বেশ ভালো দেখে একটা জায়গায় বসে পকেটের রুমালটা টেনে আনলাম। অনেকটা ছুটতে হয়েছে, তাই এই শীতেও ঘামছি আমি। ভালো করে চেপে চেপে ঘামটা মুছতেই হঠাৎ কে যেন আমাকে ডেকে উঠল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই অবাক হলাম।

অনুতোষ!

এ কীরে! তুই এখানে? কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাসনি!

কর্মক্ষেত্র মানে, অনুতোষের অফিস বাঁকুড়ায়। বছর দুই হলো ওখানে ট্রান্সফাব হয়ে গেছে সে। আর গিয়ে অবধি আমাকে অসংখ্য চিঠি দিয়েছে আর প্রতি চিঠিতেই অনুরোধ জানিয়েছে একবার অন্তত আমি যেন বাঁকুড়া থেকে ঘুরে আসি।

অনুতোষ অনুরোধ জানাত আর আমিও প্রতি চিঠিতে জবাব দেওয়ার সময় জানাতাম, এবারে যাবো......এই যাচ্ছি—কিন্তু যাবো যাচ্ছি করেও যখন যেতে পাবিনি এ দু'বছরে তখন অনুতোষেব দিক থেকে যেন উৎসাহ কমে গেল। অনুতোষ আসত ; কলকাতায এসেই আমার সঙ্গে দেখা করত কিন্তু যাবার কথা আর বলত না। শেষে আমিই, এই সেদিন ও কলকাতায় এলে দিন-তারিখ দিয়ে বলেছিলাম, এবার আমি সত্যিই যাচ্ছি। স্টেশনে যেন ও দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার কথায় অনুতোষ লাফিয়ে উঠেছিল। আমি যাবো বলাতে ও জানিয়েছিল, ওকে আগে যেতেই হবে। না হলে আমাকে নিয়েই একসঙ্গে যেত সে। যাক্‌গে, তার জন্য কোনো অসুবিধে হবে না। সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে বলেছিল, বাঁকুড়া স্টেশনে সে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে। রাত ন'টায় ট্রেন ঢুকবে। আর ট্রেন থেকে নেমেই আমি ওকে দেখতে পাবো।

তা এই কথাই তো ঠিক হয়েছিল ; হঠাৎ এর ভেতরে আবার কী ঘটল। তবে কি কোনো কারণে অনুতোষের যাওয়াও পিছিয়ে গেছে। আগের তারিখের বদলে সে আজই রওনা হয়েছে! কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো অনুতোষ ওকে একটা খবর দিত। একই সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে তাহলে যাওয়া যেত।

কিছুই বুঝতে না পেবে একটু অবাক হযে তাকাতেই অনুতোষ হাসল। আমাব সামনের জানলাব পাশেব সীটটায় বসে পড়ে বলল, খুব অবাক হয়েছিস, তাই না? আসলে বাড়িতে মাযেব অসুখের জন্যই যাওয়াটা পিছিযে গেল।

মনে মনে এবাবে একটু আহত হলাম। বেশ ক্ষোভেব সঙ্গেই জানালাম, কিন্তু তাই বলে একটা খবব দিতে পারলি না? দেখা না হলে তো আলাদা আলাদাই যেতাম।

অনুতোষ দেখি মিটিমিটি হাসছে, হ্যাঁ, খবর একটা দিতে পাবতাম; তবে ইচ্ছে করেই দিইনি—

ইচ্ছে কবে!

হ্যাঁ—অনুতোষ তখনো তেমনি হাসছে, কেন জানিস? কথা দিয়েও তো এ-দু'বছরে তোব যাওযা হযনি, তাই ভাবলাম আজ দেখি তুই কেমন সত্যি সত্যিই কথা বাখিস।

এবাবে আমি না হেসে পাবলাম না। সত্যি, অনুতোষটা এখনো তেমনি আছে। ছেলেবেলা থেকেই ও এবকম। যখন আমবা সবাই একদম বোবা হযে গেছি, কী কববো কিছুই বুঝতে পাবছি না, সেই সমযে সবাইকে অবাক কবে দিযে অনুতোষই বুদ্ধিমত্তাব পবিচয দিযেছে।

এখনও দিল।

আমি বললাম, যাক্ গে এ-একবকম ভালোই হলো। বেশ কথা বলতে বলতে যাওযা যাবে। তোর মা কেমন আছেন?

এখন ভালোই। সেজন্যই তো দেবি হযে গেল।

অনুতোষ জানলাব বাইবে মুখ বাখল।

ডিসেম্ববেব বেলা। দিন ছোট। একটু আগে যে সূর্য পশ্চিম আকাশে লাল খুনি বঙ ছড়িযে বিদায নিচ্ছিল এখন সেখানে গাঢ অন্ধকাব। বাইবে গাছপালাও ভালো চোখে পড়ে না।

বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। আমাব দিকেব জানালাব কাচটা নামিযে অনুতোষকে বললাম, তোব দিকেবটাও নামিযে দে অনুতোষ। ঠাণ্ডা আসছে।

ধুস্। ঠাণ্ডা কোথায! আমার তো ভীষণ গবম লাগছে। গাযে বোধহয ফোস্কা পড়ে গেল। এই দেখ দেখ—

বলতে বলতে জামাব হাতাব বেশ খানিকটা তুলে আমাব দিকে হাতটা বাড়িযে ধবল অনুতোষ।

আর তাকাতেই আমি চমকে উঠলাম।

অনুতোষেব বাহুতে ছোট ছোট আঙুরের মতো দু'তিনটে ফোস্কা।

এ কী রে, ডাক্তাব দেখাসনি!

হুঁ। দেখিয়েছি। ওষুধ খেতে দিয়েছে। লাগাবার মলমও দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কমছে না। এবার ভাবছি—

কী ভাবছে আব জানা গেল না। তাব আগেই একজন হকাব এসে কাছে দাঁড়াল।

অনুতোষ বলল, মুড়ি খাবি .. ..ঝালমুড়ি—

বলেই হকার এব দিকে তাকাল, এই যে এখানে দেখি ..ঝাল কিন্তু কম কবেই দিও।

মুড়িওয়ালা মাথা নেড়েই তার মুড়ি নামাল। ট্রেন ততক্ষণে ফুলেশ্বরে দাঁড়িয়েছে।

জানলা দিয়ে একবাব তাকিয়ে, স্টেশনটা দেখে অনুতোষ জানাল, বুঝলি আমাব আব ওখানে ভালো লাগছে না , কবে যে আবাব কলকাতায আসতে পারবো—

বিষন্ন হয়ে আমাব চোখে চোখ বাখল অনুতোষ। আব সেই সময়েই আমি চমকে উঠলাম। অনুতোষেব চোখেব ভিতবটায যেন মণি নেই, শুধুই অন্ধকার। কিন্তু তাও এক ঝলক মাত্র, পবেই আবাব চোখেব সেই বিষন্নতা ফিবে এল।

এমন সময ঝমঝম করে শব্দ উঠলো। অনুতোষ ও আমি—আমবা দু'জনেই বাইবে তাকালাম। আধো অন্ধকাব। আধো আলো। তাবই ভেতব দিযে ট্রেন ছুটছে এখন রূপনাবাযণেব ওপব দিয়ে।

অনুতোষ লাফিয়ে উঠল। আবে কোলাঘাট! আমবা একবার পিকনিকে এসেছিলাম মনে আছে?

থাকবে না আবার। ইলিশ না পেয়ে তুই তো জেলেদেব নৌকোয় চলে গিযেছিলি।

আমি না গেলে তোবা কি সেদিন ইলিশ পেতিস নাকি? তা অবশ্য ঠিক। শুধু ইলিশ কেন, এমনি যে কোনো ব্যাপাবে, যে কোনো দিকে আমরা কোনো সমস্যায পডলেই জানি ঠিক সমযমতোই এসে হাজিব হবে অনুতোষ। আমাবে বিপদ থেকে উদ্ধাব কববে। তাছাডা ছেলেবেলা থেকেই আমবা একসঙ্গে পড়াশোনা করছি, বন্ধুত্বটা সেজন্য আমাব সঙ্গেই প্রবল।

মুডিওযালাকে পযসা দিতে যাচ্ছিল, হাত বাডিযে অনুতোযকে বাধা দিতে গিযেই চমকে উঠলাম। এ কী—! অনুতোষেব হাত দুটো এত ঠাণ্ডা কেন! যেন ববফেব ভেতরে ঢুকিযে বেখেছিল অনেকক্ষণ। তাতেই হাত দুটো এত ঠাণ্ডা আব শক্ত।

কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, আব আগেই অনু জানাল, কী হলো, অবাক হলি! আসলে ভযে আমাব হাত-পা এমনি ঠাণ্ডা মেবে আসছে যে তোকে কী বলব।

কেন? আমি জিজ্ঞেস কবলাম।

তবে খুলেই বলি—

বলেই অনু আবও আমাব দিকে ঝুঁকে পডল। আব তখুনি কেমন একটা গন্ধ ভেসে এল আমাব নাকে। গন্ধটা ওষুধেব।

অনুতোষ বলল, বাড়ি থেকে বেবোবাব সমযই হঠাৎ একটা হাঁচির শব্দ কানে এল। ব্যস, তখন থেকেই মনটা খুঁত খুঁত করছিল। ভাবছিলাম, আজ ভালোয় ভালোয পৌছতে পারলে হয়। বাস্তায না দুর্ঘটনায় পড়ি—

ধুর, ওসব তোব কুসংস্কার—

না বে, না—অনুতোষ কাতব গলায় বলে উঠল, বাস্তাযও বেবোলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা বাস প্রায় ঘাডেব ওপবে. .

ইস্ সে কী—

হ্যারে, একদম গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। তবে হ্যাঁ, মারা যে যাইনি এই রক্ষে—

অনুতোষ খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

ইস্! কি বিচ্ছিরি হাসিটা। এমন তো হাসতো না ও কোনোদিন! কী জানি, হয়তো বাইরে গিয়েই এসব ওর পাল্টেছে। আমি চোখ ফেরালাম।

গাড়ি দাঁড়াল এসে মেদিনীপুরে। জানলার শার্সিটা একটু তুলে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু অনুতোষ জানলা খুলে তেমনি নির্বিকার।

একসময় আমি একটা সিগারেট ধরালাম। কিন্তু দেশলাইটা জ্বালাতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, এ কী—না-না-না. .

অনুতোষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ-চোখে ভীষণ ভয়। ওর ভয়ার্ত মুখটা দেখে আশেপাশের সীটের দু'চারজনও এগিয়ে এল।

আমি বললাম, কী হয়েছে অনু?

অনুতোষ বসে পড়ল ; মুখের ওপরে দু'হাত দিয়ে ঢেকে বলল, একটু আগুন ....ব্যস, আগুনটা তারপর—

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না। দেশলাইটা ততক্ষণে পকেটে রেখেছি। সিগারেটটাও যথাস্থানে। ঠিকঠাক রেখে শুধু অনুতোষকেই লক্ষ্য করছি। ট্রেন-এর মধ্যে ফেলে এল আরও কয়েকটা স্টেশন। রাত প্রায় আটটা চল্লিশ।

বিষ্ণুপুর আসতেই অনুতোষ উঠে দাঁড়াল। এবারে দরজার কাছে দাঁড়াই। দেখতে দেখতে তো বাঁকুড়া এসে যাবে—

দেখতে দেখতে বাঁকুড়া এসে গেল একসময়। দুই বন্ধুতে স্যুটকেস নিয়েই নামলাম। একটু হেঁটে একটা রিকশায়ও তুলল অনুতোষ। রিকশাটা লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে এগোল।

যদিও রাত বেশি নয়, সবে ন'টা। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাস্তা তাই সুনশান। লোক প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দু'একটা দোকান অবশ্য খোলা আছে, কিন্তু লোক সেখানেও নেই।

দু'ধারে ইউক্যালিপট্সের সারি। তারই মধ্যে কালো পাথরের মতো রাস্তা। রিকশাটা এগোল সেই রাস্তা ধরে। আমি ততক্ষণে কাঁপছি। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করে শব্দও হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু অনুতোষের কোনো বিকার নেই।

হঠাৎ গান ধরল অনুতোষ। ......ও মন পাখি—কী ফল খেলি বাগানে।

আশ্চর্য! চমৎকার গলা। এমন গলা কোথায় পেল ও! যতদূর জানি ও তো কোনোদিন গান গাইত না। ঠিক এমনি সুরের একটা গান আমি আব্বাসউদ্দিনের গলায় শুনেছিলাম। ঠিক তেমনি সুর।

গান থামিয়ে অনুতোষ বলল, ব্যস, এসে গেছি। ঐ স্কুলডাঙা। আর ঐ যে আমার বাড়ি। মানে আমি যে বাড়িতে ভাড়া আছি।

অনুতোষের অন্তর্ধান

রিকশাওলা নির্দেশ পেয়ে, প্রায় ফাঁকা ছোট্ট একটা মাঠের সামনের একটা দোতলা বাড়ির কাছাকাছি এনে রিকশাটা দাঁড় করালো।

নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগোচ্ছি, অনুতোষ হঠাৎ হাওয়া। আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। ওর গানের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতেই এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ পাশে কাউকে না দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

কী ব্যাপার! অনুতোষটা গেল কোথায়! এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ঘুরঘুটে অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে চোখ জোড়া অন্ধকারে মানিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, সামনেই বাড়ির দরজা। পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে জ্বালালাম। দরজার মাথায় কলিং-বেলও আছে।

আশ্চর্য! এখানে নেমে অনুতোষ কোথায় গেল। একটু সময় আবার ভালো করে তাকিয়েই অনুতোষের নাম ধরে ডেকে উঠলাম—.

অনু..... অনুতোষ—

সাড়া নেই।

একটু পরে আবারও ডাকলাম, অনুতোষ....অনুতোষ....কী ব্যাপার কী!

এবারেও সাড়া এল না। তবে দোতলার ওপরের একটা জানলা খুলে গেল।

আসছি—এখুনি আসছি। আপনি দাঁড়ান—

যত দ্রুত বলেছিল, তার চেয়েও দ্রুত বোধহয় স্বরের মালিক নেমে এল।

ওফ্, আপনি এলেন তাহলে! দুদিন ধরে কী যমে মানুষে টানাটানিই না চলছে ওকে নিয়ে।

কাকে নিয়ে! কি বলছেন আপনি?

আপনা থেকেই গলা দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল আমার।

ভদ্রমহিলা বললেন, সে কী! আপনি কলকাতা থেকে আসছেন না?

হ্যাঁ, তাইতো আসছি—

তবে! টেলিগ্রাম পাননি এখান থেকে—

কিসের টেলিগ্রাম?

ভদ্রমহিলা তড়িঘড়ি আমাকে ভেতরে নিযে গেলেন। নিচেই একটা চেয়ারে বসিয়ে যা বললেন তাতে আমি চমকে উঠলাম।

মাত্র তিন দিন আগে বাসে পুরুলিয়া যাবার সময় এক ভয়ংকর দুর্ঘটনায়পড়ে অনুতোষ। সারা দেহে আগুন লেগে যায়। মাথায়ও চোট পায়। সব থেকে খারাপ পেটের দিকটা। এখনও বেঁচে আছে। তবে তিন দিন ধরে জ্ঞান নেই। জ্ঞান ফেরাতে পারছেও না ডাক্তাররা। জানি না কী হবে—! আপনি তো ওর দাদা?

মাথা নাড়লাম। প্রকৃত সম্পর্কটা বললাম।

বলবো কী, তখনো যে আমিই নিজে বিশ্বাস করতে পারছি না। পারছি না আরও এই

কারণে যে অনুতোষ তো মারা যায়নি!

বাতটা কোনো রকমে কাটল।

কিন্তু পরের দিন বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে যেতেই সব শেষ। শুনলাম, প্রায় তিন দিন 'কোমা' অবস্থায় থাকার পর আজ সকালেই অনুতোষ মাবা গেছে।

প্রচন্ড ধাক্কায় মনটা ভেঙে পড়ল। কৌতূহলকে তবু চেপে রাখতে পারলাম না। তিন দিন ধরে হাসপাতালে অনুতোষ ছিল বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অবস্থায়। কোমা-র ভেতরে। তাহলে ঐ সময়টাতেই কি সে নিজের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল আমার কাছে! আর একটা অনুতোষ হয়ে?

অদ্ভুতুড়ে রাতে

পরেশ সরকার

শীতকালের প্রায় মাঝরাত। চারদিক নিস্তব্ধ। ভয়ঙ্কর ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। কয়েক হাত দূরেরও কিছুই চোখে দেখা যায় না। তার মধ্যেই নেমেছে ঘনকুয়াশা। কলাপাতা বেয়ে টপটপ করে পড়ছে ভোরের শিশির। বেশির ভাগ পাড়াগাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ ঘুমে অচেতন। মাঝে মাঝে এপাড়া সে পাড়ার দু একটা কুকুর চিৎকার করছে দূরে দূরে। পাড়া ফেলে মাঠ, মাঠ ফেলে বাগানের মধ্য দিয়ে আসছিল অভয়চরণ কলকাতা থেকে। লাস্ট ট্রেন থেকে নেমে একা একা যেতে যে তার ভয় হচ্ছিল না তা নয়। তবে তা ভূতের নয় মানুষের।

রাত প্রায় বারোটা বাজতে চলল। দু'ব্যাটারি টর্চটা জ্বালতেই মেজাজটা তার খারাপ হয়ে গেল। জোনাকির মতো মিনমিনে আলোয় ভাল করে পথও দেখা যায় না। বাস থেকে নেমে কাঁচা রাস্তা ধরে চলছিল সোজা পূর্বদিকে। গাঁয়ের রাস্তা এবড়ো খেবড়ো। বর্ষার কাদা শুকিয়ে যেতেই খানাখন্দে ভরে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে অসংখ্য ছোট-বড় ডোবাপুকুর। খুবই সন্তর্পণে রাস্তাটা পার হচ্ছিল অভয়চরণ। রাস্তার যা ছিরি। যেমনি সরু তেমনি বিপদসঙ্কুল। একটু এদিক ওদিক হলেই পড়তে হবে ঝপাং করে শীতের পুকুরে।

টর্চটা দিয়ে কোন রকমে বাঁকা রাস্তা পার হয়েই একটু চওড়া রাস্তায় পা দিল সে। সামনেই বিশাল শ্মশান। এদিকে মস্ত বটগাছ। নিরিবিলি বিশাল ধানের ক্ষেত উত্তরে দক্ষিণে। এখনো সব মাঠের ধান কাটা হয়নি। কোন কোন মাঠে বেশ জল জমে আছে। ছোট্ট ডোবায় শোল, ল্যাটা, কই মাছের ঘাইয়ের আওয়াজও পাচ্ছি। হাড়কাঁপানো উত্তরে হাওয়া। শরীরে যেন শীত সূচের মতো বিঁধছে। শ্মশানের কাছাকাছি বটপাকুড়ের জটলার তলায় এসে কেমন যেন ভয়ে হিম হয়ে পড়ল ।

বটপাকুড় পাতার মধ্যে ঝটাপট আওয়াজ। টর্চের যা অবস্থা আলো দেখে চলারও উপায় নেই। ভয়ে শরীর কাঠ হয়ে যাচ্ছিল, গলা শুকিয়ে আসছে। মনে হচ্ছিল কেযেন ডালপালা ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে। গুটিকয়েক জোনাকি, পাতার জটলার মধ্যে মনো হলো জ্বলছে নিভছে। কাউকে ডাকলেও কেউ সাড়া দেবে না। মনে পড়ল এখানেই ঐ বটগাছে দেবদাস বছর কয়েক আগে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিল। তাকে অভয়চরণ ঝুলে মরে থাকতে দেখেছিল পরদিন সকালেই। লোকে বলতো ভূতেরা নাকি তাকে জোর করেই গাছে তুলে নিয়ে মেরেছে। মনে হলো দেবদাস যেন সেভাবেই ঝুলছে সেই ডালটায়। ভয়ে ভিরমি খাবার উপক্রম। এগোতে পারছিল না আবার পিছোতেও পারছিল না অভয়চরণ। ছুটে যে পিছনে পালাবে তারও উপায় নেই। গায়ে যেন কোন শক্তিই নেই তার। ঐ গাছের তলা দিয়েই যে তাকে এগোতে হবে।

শ্মশানের ওপাশে একটা ক্লাবঘর। ওখানেই কার্তিক মাসে শ্মশানকালীর পুজো হয়। মাঝে মধ্যে এখানে শবদাহও করা হয়। ওপাশেই বৈষ্ণবদের কবরস্থান। ওখানে মৃত বৈষ্ণবকে বসিয়ে কবরও দিতে সে দেখেছে। কাছাকাছি প্রচুর তুলসী মঞ্চ। মনের মধ্যে একটু জোর পেতেই এক দৌড়ে অভয়চরণ বটপাকুড়ের তলাটি পার হলো। বুক তার ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। মনে মনে কয়েকবার বলল, 'ভূত মোর পুত শাঁকচুন্নি আমার ঝি/রামলক্ষ্মণ বুকে আছে করবি আমার কী? তবুও মনে পুরো জোর আসে না। ভয়ে তার বুক্ দুরদুর করছিল। তার সঙ্গে আবার ভয়ঙ্কর শীতের কামড়। পিছনে আর সে তাকাতেই চায় না। ঝটাপট আওয়াজ চলছে বটপাকুড়ের ঝোপের মধ্যে। মনে মনে ভাবল তাহলে কি ছাতার ঘুঘুপাখি ধরার জন্য বাজশকুনের আক্রমণে ঐ দক্ষযজ্ঞ বেঁধে গিয়েছিল গাছের মাথায়? তা হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। তবে এটা তো ঠিক ঐ ডালের মাঝখানে দেবদাস দড়ির ফাঁকে ঝুলছিল, তা সে নিজের চোখে দেখেছে।

দ্রুতপায়ে সে কলাবাগান, সবেদা বাগান, আম, জামের বাগান পার হয়ে এসে পড়ল আবার একটা ফাঁকা মাঠে। এতো ভয় অভয়চরণ এর আগে কোনদিন পায়নি। অবশ্য এতো রাতেও সে কোন দিন এর আগে বাড়ি ফেরেনি কলকাতার কলেজ থেকে। নাইট কলেজ করে সে বাড়ি ফেরে, দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই । আজ যে তাকে লাস্ট ট্রেন ধরে আসতে হবে তা সে ভাবেনি। এখন আর শীতের কাঁপুনি তার নেই। ঘামে ভিজে গেছে গায়ের জামা ভয়ে। যদি গলায় দড়ি লাগিয়ে ভূত তাকেই টেনে গাছ তুলে নিতো? না আর ভাবতেই

পাবে না অভযচবণ। এখন বাড়িতে পৌঁছতে পাবলেই বাঁচে। এতোদিন সে ভূত আছে বিশ্বাসই কবতো না। কিন্তু এই যে ভয, ভূতেব ভয এটা তো আছে। তা সে এখনই টেব পেযেছে হাতে নাতে। দুদিকে ধানেব জমি। মাঝখানে আলপথ। ধানগাছগুলি ঝুঁকে পড়েছে বাস্তাব ওপব। ভিজে সপসপ করে শিশিবে। পাযে লাগতেই বুঝতে পাবছে ধানেব শিসগুলিও ভিজে । ভিজে গেছে দুপাশেব ঘাসও। পাযেব চটিও শিশিব ঘাসে ভিজে গেছে। বেশ ঠাণ্ডাও লাগছে। হঠাৎ যেন আবও ঘন অন্ধকাবেব সামনে এসে পডল সে। এগোনো যায না। পিছোনোও যায না। ক্ষীণ আলোব টর্চটা আদৌ জ্বলছে না। বাকি বাস্তাটা যে তাকে অন্ধেব মতোই পাব হতে হবে হাতড়ে হাতড়ে। সামনে আবাব একটা বিশাল বাঁশবাগান।

ভাবি বিপদে পডল অভযচবণ। বাড়িব কাছাকাছি প্রায সে এসে গেছে। বাঁশবাগানটা পাব হলেই আবও বাঁক পড়বে ডাইনে। আবও একটা বাঁক পড়বে বাঁযে তাবপবই সেই চণ্ডীতলাব চণ্ডীমন্দিব। মন্দি বেব দক্ষিণেই বাড়ি তাদেব। টর্চটা কিছুতেই জ্বলছে না। মনে হলো টুনিটা কেটে গেছে। একপা একপা কবে আন্দাজে আন্দাজে পা ফেলছিল সে। এ বাস্তাব নাড়িনক্ষত্র তাব চেনা। ছেলেবেলা থেকেই যাতাযাত কবছে। অমাবস্যাব এই ঘুবঘুট্টে শীতেব বাতেব অন্ধকাবে সে যেন সত্যিই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হযে পড়েছে। দাঁড়িযে থাকলে চলবে না। এগোতেই হবে। এগোতেই হবে ভযঙ্কব অন্ধকাব ফুঁড়ে। আবাব শীতও কবছে। চললে ঠাণ্ডা লাগে কম, শবীবটা বেশ গবম হয পবিশ্রমেব জন্য।

হঠাৎ ওপবেব দিকে তাকাতেই তাব চক্ষু চড়কগাছ হবাব উপক্রম। বাঁশবাগানেব মাঝখানে বিশাল দেবদারু গাছেব মাথায এতো লাল নীল আলো এলো কোথা থেকে? দপদপ কবে জ্বলছে আবাব নিভছে। সবাই যা বলে তবে কি সেই ভূতেব আলো? এতো বাতে দেবদারু গাছেব মাথায এক সঙ্গে জটলা কবা জোনাকিব আলো তো এত উজ্জ্বল হবে না। তবে কি শকুন, চিল জাতীয প্রাণীবা ওখানে বসে আছে আব তাদেব হাঁ কবা মুখেব ভেতব থেকে মাঝে মাঝে ফসফবাস জাতীয আলোব ফুলকি? তাও বা হবে কী কবে?

এইসব ভাবতে ভাবতে হাত পা শবীব ঝিমঝিম কবছিল অভযচবণেব। অথচ ঐ বাঁশবাগানেব পাশ দিযেই তাকে বাড়ি ফিবতে হবে। কিন্তু এগোবেই বা কীভাবে? ভুতুড়ে কাণ্ডেব মতো হাতেব টর্চটা টিপতেই আবাব জ্বলে উঠলো। আলোবও জোব একটু বেড়েছে। অভযচবণ আবাব এগোতে লাগলো। মাঠ পেবিযে এসে বাঁশবাগানেব কাছেই সে পৌঁছলো। হন হন কবে সে চলছে। হাফ ছেড়েও বলা যায। দেবদারুগাছেব মাথাব দিকে তাকাবাব মতো সাহস আব তাব নেই। ভযে বুক তাব হিম হয়ে যাচ্ছে।

বাঁশবাগানেব মাঝামাঝি আসতেই গা টা আবাব ছমছম কবে উঠলো। মড়মড়ে বাঁশপাতাব ওপব কে হেঁটে যাচ্ছে মনে হলো। অভয়চরণ ভাবলো ও নির্ঘাৎ শেযাল। বাঁশেব ডগা নুয়ে পড়েছে আশেপাশেব গাছেব মাথায়। সামনে একটা বিশাল শিবিষ গাছ। বেশ কিছু বাঁশেব ডগা সেখানে এসে পড়েছে। মস্ত একটা ঝোপ। একটা আওয়াজ সে শুনতে পেল খস্ খস। মনে হলো সেই শিবিষ গাছেব মগডালে কে যেন বাঁশেব ঝুঁটি ধবে নাড়িযে যাচ্ছে একটানা।

ওপাশে একটা গাছে একটানা ডাকখেরি ডেকে চলেছে। কুব্‌কুব্‌ করে ডেকে চলেছে আরও কয়েকটি পাখি। নির্জনতা এখানে নেই। কিছু ভয়ঙ্কর ভয় যেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পুরো বাঁশবাগানটাই। অদ্ভুতুড়ে পরিবেশ। কিন্তু ছাতার পাখির ডানার ঝটপটানিও শোনা যাচ্ছে একটু এগিয়ে যেতেই। হঠাৎ যেন মনে হলো বাঁশঝাড়ের পাশেই রাস্তার মাঝখানে কে যেন ছায়া মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ঙ্কর কালো হাড় জিরজিরে কঙ্কালের মতো চেহারা। এই ভয়ঙ্কর শীতে গায়ে তার কোন শীতবস্ত্রও নেই। ভয়ে সারা শরীর তখন ঠকঠক করে কাঁপছে।

অভয়চরণের মনে হলো এই বুঝি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। চোখ দুটিতে ধোঁয়া জমাট বাঁধা। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না আর সামনে। সেই ছায়ামূর্তিটা তারপর আস্তে আস্তে সরে গেল। এত ভয়েও সে রাম রাম করছিল জোরে জোরে। ভূতেরা মনে হয় রামনাম সহ্যই করতে পারে না। তাই সে ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল। এবার শরীরে একটু জোর পাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। হাতের টর্চটা জোনাকির মতোই হয়ে গেছে। অভয়চরণ একটু ধাতস্থ হতেই বাবাগো. . ভূ. ভূ. ভূ ভূ-ত ভ-ভূ-ভ-ত বলেই এক দৌড়ে বাকি বাঁশবাগানটা পার হলো। শুকনো বাঁশপাতার ওপর মচমচ করে আওয়াজটা বেড়ে গেছে ভয়ঙ্করভাবে। তার এই আওয়াজ কারও কানেই গেল না। কারণ সারা পাড়াই এই গভীররাতে শীতের মধ্যে লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে।
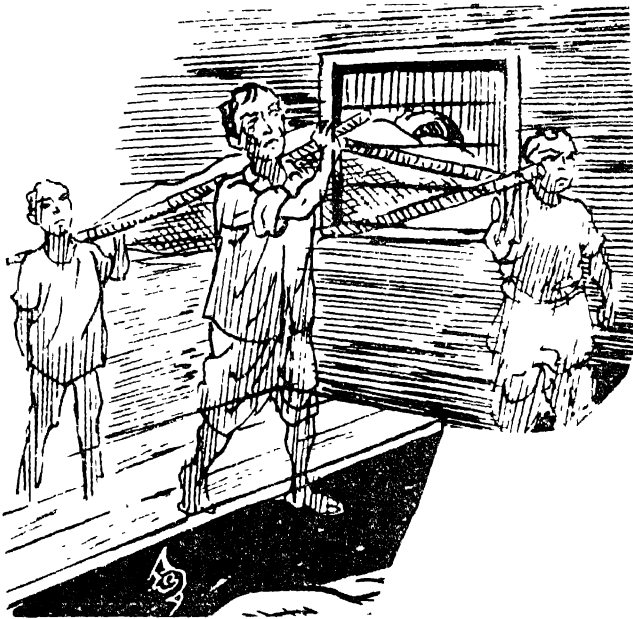
গেষ্ট হাউসে সেই রাত

সুদীপ রায়চৌধুরী

রাত তখন প্রায় নটা রাজীব একটা বই নিয়ে বিছানায় ছোট্ট ল্যাম্পটা জ্বেলে শুয়ে পড়ল। যদিও মফস্বলের এদিকে এখনও ইলেকট্রিসিটির প্রচলনটা ভালোভাবে হয়ে ওঠেনি। তবুও গেষ্ট হাউসটাতে ইলেকট্রিসিটি চালু আছে।

বইটা হাতের সামনে ধরতেই বহু পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল রাজীবের। তা আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগের কথা। কলকাতার কাছেই একটা শহরতলীতে থাকতো ওরা। ওরা বলতে বাবা, দুই দিদি আর রাজীব। রাজীবের ১ বছর বয়সে মা ব্লাড ক্যান্সারে মারা যান। ছোট দিদিই রাজীবকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে। তাই দিদির ভূমিকাটা ওর জীবনে এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই রাজীবের মাথা ভীষণ ভাল ছিল। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় কোনদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি। তারপর কলেজের পড়া শেষ করে ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করতে আমেরিকা যাত্রা করে রাজীব। সেই তখনই শেষ দেখা দিদির সঙ্গে। তারপর আবার ১ বছর পরই খবর পায় যে ছোটদিদি একটা স্ট্রীট অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তখন ইচ্ছা থাকলেও দেশে ফিরতে পারেনি রাজীব। তারপর

বিদেশে আস্তে আস্তে ৫ টা বছর কেটে যায়, বিরাট নামকরা একজন ফিজিসিস্ট হয়ে রাজীব দেশে ফিরে আসে কিন্তু তখন পৈতৃক বাড়ীতে আর কেউই ছিল না, ঠিক ২ বছর আগেই বাবা মারা যায়। বড়দিদির বিয়ে হয়ে গিয়ে ফরেনে চলে যায়। ফলতঃ সেই বাড়ীটা এখন খাঁ খাঁ করছে। আর এরপরই রাজীবের জীবনে কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায় যার ব্যাখ্যা ও আজও পর্যন্ত করে উঠতে পারে নি।

প্রথম ঘটনাটা ঘটে ঐ পৈতৃক বাড়ীতে, বাড়ীটাতে কেউ নেই, শুধু বাড়ীটা পড়ে থাকবে বলে রাজীব বাড়ীটাকে বিক্রি করে দেওয়াই মনস্থ করে। যেদিন বাড়ীটা বিক্রি হবার কথা তার আগেরদিন ও রাত্রিবেলা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ এক সময় ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই গোটা বাড়ীটা বিকট অন্ধকার বলে কিছু বুঝে উঠতে পারল না। ঠিক তখনই মনে হল পাশের ঘরে যেন একটা খুটখুট আওয়াজ হচ্ছে। ঠিক মনে হল কেউ যেন কিছু সরাচ্ছে বা চুরি করছে। রাজীব পা টিপে টিপে বিছানা থেকে নেমে টর্চটা হাতে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে টর্চটা জ্বালতেই মনে হল যেন একটা ছায়ামূর্তি চট্ করে সরে গেল। কিন্তু তারপর ঘরের চারিদিকে আলো ফেলেও দেখতে পেল না কোত্থেকে আওয়াজটা আসছে। আর টর্চ জ্বালানোমাত্রই আওয়াজটাও আর শোনা যাচ্ছিল না। কিছু বুঝতে না পেরে আবার ঘরে ফিরে আসছে এমন সময় দমাস্ করে হঠাৎ ওর শোবার ঘরে একটা আওয়াজ শুনে ছুটে এসে দেখে যেখানে ও শুয়েছিল ঠিক তার মাথার উপর থেকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশাল এক সিমেন্টের চাঙড় ভেঙে পড়েছে। আর কিছুক্ষণ আগে হলে এতক্ষণে রাজীবের মৃতদেহটাই ওখানে পড়ে থাকত। তখনও রাজীবের কিছু সন্দেহ হয়নি।

এরপরের ঘটনাটা ঘটে মাউন্ট আবুতে বেড়াতে গিয়ে। সারাদিন বেড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা গাড়ীটা ড্রাইভ করে পাহাড়ের উপব হোটেলে ফিরছে, এমন সময় মাঝপথে হঠাৎ বুঝতে পারল গাডিটা ব্রেক ফেল করেছে। ভীষণ অসহায় বোধ করতে শুরু করলো রাজীব। রাস্তার একদিকে গভীর খাদ অপর দিকে উঠে গেছে পাহাড়। কোন দিক থেকেই কোন সাহায্য পাবার সুযোগ নেই। এমন সময় কিছুদূরে পাহাড় থেকে মনে হল একটা ছায়ামূর্তি একটা পাথর ঠেলে দিচ্ছে পাথরটাও তখন আস্তে আস্তে গড়াতে গড়াতে রাস্তার উপর এসে পড়ল। গাড়ীটা দ্রুতবেগে পাথরটার দিকে যাচ্ছে দেখে রাজীব তাড়াতাড়ি ড্রাইভিং সীট থেকে পিছনের সীটে এসে বসামাত্রই গাড়ীটা গিয়ে ধাক্কা মারল পাথরটাতে আর গাড়ীটাও থেমে গেল। রাজীব প্রায় অক্ষত দেহে গাড়ী থেকে নেমে দেখল সামনের দিকটা একটু তুবড়ে গেছে। কিন্তু তারপর পাহাড়ের উপর দিকে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না। এই ঘটনাটা তারপর বহু লোককেই বলেছে কিন্তু কেউই সেকথা বিশ্বাস করে নি। কারণ ঐ পাহাড়ী অঞ্চলে যখন তখন অকারণে পাথর গড়িয়ে পড়ে। তারজন্য কাউকে ঠেলতে হয়না কিন্তু তখন থেকেই রাজীবের মনে আস্তে আস্তে সন্দেহের বীজ বেড়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু কোন অদৃশ্য নিয়তি যে ওকে বারবার বাঁচিয়ে তুলছে শত চেষ্টাতেও তা বুঝে উঠতে পারল না।

গেষ্ট হাউসে সেই রাত

এই ঘটনার মাস ৪/৫ বাদে ও যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স বিভাগে নিজের চেম্বারে বসে দুপুরবেলা কাজ করতে শুরু করেছে, তখন ২/৩ মিনিট পর, একজন আর্দালী এসে খবর দিল যে বাইরে একজন মহিলা ডাকছেন, শুনে রাজীব বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে যখন খুঁজে দেখছে যে কে ওকে ডাকছে তখন পিছনে একটা হৈ-চৈ শুনে দেখে ডিপার্টমেন্ট থেকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে সমস্ত লোক বেরিয়ে আসছে আর গোটা বাড়ীটায় শর্ট সার্কিটের জন্য আগুন ধরে গেছে। রাজীব যদি না বেরিয়ে আসতো তাহলে ওকেও হয়তো এই আগুনে পুড়ে মরতে হত। তখন রাজীবের মনে আবার সেই সন্দেহের কাঁটাটা খচ্‌খচ্ করে উঠল সেই অদৃশ্য নিয়তি সম্বন্ধে।

আর ঠিক সেই সময় দরজায় হঠাৎ খট্‌খট্ করে কড়া নাড়ার আওয়াজ, দরজা খুলে রাজীব দেখল গেষ্ট হাউসের দারোয়ানটা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দারোয়ানটা ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জিজ্ঞেস করলো।

—এখনও ঘুমোননি স্যার?

—না, ঘুম আসছে না।

—তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন স্যার এখানে আবার রাতবিরেতে নানা রকম উপদ্রব শুরু হয়।

রাজীব আর কথা না বাড়িয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিতেই একরাশ অন্ধকার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরটার মধ্যে। রাজীব আস্তে আস্তে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে গোটা গেষ্ট হাউসের বাগানটাতে। এক অপূর্ব মায়াবী আলোয় ভরে গেছে চারদিক। রাজীব মুগ্ধ হয়ে চারিদিক দেখছিল এমন সময় দেখল গেট পেরিয়ে সাদাশাড়ী পরা কে একজন মহিলা আস্তে আস্তে ওর ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। রাজীব খুব আশ্চর্য হয়ে গেল কারণ এত রাত্রে ঐ মহিলা কি করতে আসছে। ক্রমশঃ যখন ঐ মহিলা জানালার তলায় এসে দাঁড়িয়ে উপর দিকে চাইল রাজীব এক প্রচন্ড বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে দেখল ৮ বছর আগে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়া সেই ছোটদিদি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর রাজীবকে অবাক করে দিয়ে সেই ছায়ামূর্তি বলে উঠল কিরে রাজীব কেমন আছিস? রাজীব কোন কথার উত্তর দিতে না পেরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই ছায়ামূর্তিটি মনে হল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল আর দুরের দিকে একবার তাকিয়েই সেই শীতল কিন্তু অস্থির গলায় বলে উঠল। রাজীব বাবা আর দেরী করিস্‌না। শীগগিরি তোর জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আয় নইলে ঐ ডাকাতগুলো এসে পড়বে আর সমস্ত বাড়ীটা লুঠপাট করে বাড়ীটা জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু রাজীবের মনে হল কে যেন ওর পাটাকে মেঝের সাথে আটকে রেখেছে ও নড়াচড়া করতে পারছে না। আর তখনই সেই ছায়ামূর্তি যখন ওর হাত স্পর্শ করলো সেই বরফ ঠান্ডা শীতল হাতের স্পর্শ পেয়ে ও আর দেরী না করে গেষ্ট হাউসের থেকে বেরিয়ে এল। তখন আর সামনে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না রাজীব শুধুমাত্র

একটা নুপুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। রাজীবের মনে পড়ল ছোটবেলায় বাবা ছোটদিদিকে একজোড়া নূপুর গড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর কিছুদূর গিয়ে একটা ঝোপের সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রাজীব ব্যস চোখের সামনেটা কেমন অন্ধকার হয়ে গেল আর কিছু মনে নেই রাজীবের।

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসতে উঠে বসল রাজীব। মাথাটা প্রচন্ড ভার ভার লাগছে তারপব বাতাসে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ পেয়ে পিছনে তাকাতেই দেখল কিছুদূরে গেষ্ট হাউসটাব পোড়া ধ্বংসাবশেষ থেকে কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। আর তখনই মনে পড়ে গেল গত রাত্রের কথা। বুঝতে পারলো গতরাত্রে ছোটদিদিই এসে ঐ বিভীষিকার হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে বুঝতে পারল রাজীব যে দিদির আত্মাই ওকে এতদিন সব বিপদ থেকে রক্ষা করে এসেছে। আবার সেই আত্মাই গতরাত্রে ওকে বাঁচিয়েছে। রাজীব এরপর উঠতে গিয়ে হঠাৎ দেখল হাতের উপর রয়েছে ছোট ছোট একজোড়া নূপুর। তবে কি এই দুটোই ফেরত দিতে দিদি বারবার ছুটে আসতে চাইত রাজীবের কাছে? কিছু বুঝতে না পেরে ক্লান্ত শরীরে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করে রাজীব।

মাঝেরহাট ব্রিজে রাত বারোটা

জীবন ভৌমিক

ঘটনাটা ঘটেছিল দেড় বছর আগে। এতদিন কাউকে বলিনি। কারণ মনে-মনে ভয় ছিল। এখন ভয় কেটে গেছে। কেউ বিশ্বাস করুক আর না-করুক, আসল ঘটনাটি সকলকে জানানো দরকার। তাছাড়া আমার ভয়টাই বা কী! আমি তো আর খুন করিনি। ঐ জোড়া হত্যার মধ্যে তখনও পুলিস আমার নামগন্ধ পায় নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। এবং একথাও আমি হলফ করে বলতে পারি যে, ঐ জোড়া হত্যার রহস্য-সমাধান পুলিস আর কোনও দিন করতে পারবে না।

এবার তা হলে বলি। সংক্ষেপেই বলব। কিন্তু খবরের কাগজের সেই কাটিংটা গেল কোথায়! ঐ খবরটা দিয়েই তো শুরু করব ভেবেছিলাম। এই তো পেয়েছি।—

স্টাফ রিপোর্টার। ৫ ডিসেম্বর। গতকাল ভোরবেলায় ডায়মন্ড হারবার রোডের মাঝেরহাট ব্রিজের নীচে রেললাইনের উপর দুই ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। দুজনেরই বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। পুলিসের সন্দেহ যে, ব্রিজের ওপর থেকে ওদের নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। মাঝেরহাট স্টেশনের ঐ রেললাইন দিয়ে গতরাত্রে ১১ টা ৪৮ মিনিটে গাড়ি গেছে। তখন ওখানে মৃতদেহ দুটি ছিল না। পরদিন সকালের ফার্স্ট ট্রেন যাওয়ার আগেই ঐ মৃতদেহ একজনের নজরে পড়ে। রাত বারোটার পর এই হত্যাকান্ড ঘটেছে বলে পুলিসের অনুমান। তাদের মতে ঐ ব্রিজ যতখানি উঁচু, তাতে সেখান থেকে কাউকে ফেলে দিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু হবার কথা নয়। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠানো হয়েছে। কেউ এখনও গ্রেপ্তার হয়নি। জোর তল্লাশি চলছে। জানা গেছে ঐ দুই ব্যক্তি দক্ষিণ শহরতলির একটি বস্তির বাসিন্দা ছিল। এবং একজনের নাম ছিনতাইকারী হিসেবে পুলিসের খাতায় ইতিমধ্যেই রয়েছে।

খবরের কাগজ থেকে খবরের এই অংশটুকু কেটে আমি সেদিন খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। ঘটনাটি আমার চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠছে।

আমি খড়্গপুরে রেল কোম্পানিতে চাকরি করি। সেখানে আমার কোয়ার্টার্স। অফিসের কাজে মাঝে-মধ্যে আমাকে কলকাতায় দু-তিনদিনের জন্যে আসতে হয়। কলকাতায় এলে আমি বেহালায় দিদির বাড়ি থাকি।

সেদিন শিয়ালদায় রেল অফিসের কাজ সেরে আমি দেখলাম রাত দশটা বেজেছে। ডিসেম্বরের শীত। আধ ঘণ্টা বেহালার বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম যে, বাসের অপেক্ষায় আর না থেকে শিয়ালদা থেকে লাস্ট ট্রেনে মাঝেরহাট স্টেশন চলে যাওয়াই ভাল। তা না হলে শেষে হয়তো ফিরতেই পারব না। মাত্র দুটি তো স্টেশন! এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব। মাঝেরহাট থেকে বাস বা ট্রাম না পেলেও আধঘণ্টা হেঁটেই বেহালা পৌঁছে যাওয়া যাবে।

এর আগে শিয়ালদা থেকে মাঝেরহাট স্টেশন হয়ে বেহালায় আরও তিন-চারবার ফিরেছি। অবশ্য এত রাতে নয়। বেশি রাতে মাঝেরহাট ব্রিজ খুব নিরাপদ নয় বলে শুনেছিলাম। শীতকালের রাত এগারোটার রাস্তাঘাট নির্জন না হলেও নির্জন হয়ে পড়ে। তবু সব দিক ভেবে ট্রেনেই ফিরছিলাম। ট্রেনের সব কামরা প্রায় ফাঁকা। আমাদের কামরায় পাঁচ-সাতজন যাত্রী।

সন্ধ্যো থেকেই আকাশে কিছু কালো মেঘ ছিল। খুব ঠান্ডা হাওয়া। শীতটা বেশ পড়েছিল। তার ওপর বৃষ্টি শুরু হল। কালীঘাট স্টেশন আসার আগেই যখন বৃষ্টি এল ভাবলাম বাঁচা গেল। আর তো মাত্র একটা স্টেশন। পাঁচ-ছ মিনিটের ব্যাপার।

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে খন্ডাবে কে! কালীঘাট স্টেশনের কাছাকাছি এসে আমাদের গাড়ি থেমে গেল। হয়তো সিগন্যাল পায় নি। দু-এক মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে। কিন্তু মিনিট দশ পব একজন বাইরে উঁকি দিয়ে বলল, সিগন্যাল তো রয়েছে! কী হল বলুন তো? কী

করে বলি বলুন, আপনিও যেখানে আমরাও সেখানে। এইসব কথাবার্তা। একজন বললে, চেন টেনেছে বোধহয়।

আমাদের কমপার্টমেন্টের চারজন নামবে কালীঘাটে। একজন মাঝেরহাটে। ইতিমধ্যে ঘড়িতে এগারোটা দশ। আমি মনে-মনে অস্থির হয়ে উঠলাম। এই সময় বাইরে তাকিয়ে দেখি দু-তিনজন লোক গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে গাড়ির পেছন দিকে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল মশাই?" বললে, "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। গাড়ি থেকে একজন পড়ে গেছে।"

যাদের কালীঘাটে নামবার কথা তারা চারজন এই সময় লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। কারণ লাইন ধরে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটলেই স্টেশন।

ট্রেন কতক্ষণ আটকে থাকবে কে জানে! আমার কামরায় তখন মাত্র দু'জন যাত্রী। আমি আর এক ভদ্রলোক। সেই ভদ্রলোক বললেন, "কী আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, ফাঁকা গাড়ি থেকে লোক পড়ে যায় কী করে?" আমি বললাম, "তাই তো ভাবছি।" আসলে আমি তখন ভাবছিলাম, রাত সাড়ে এগারোটা বাজে, দুর্যোগের রাত। মাঝেরহাটে নেমে যদি একজনও সঙ্গী না পাই তাহলে তো একটু গা-ছমছম করবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে ঠান্ডার মধ্যেও ঘামে আমার কপাল ভিজে উঠল।

পৌনে বারোটার সময় দেখলাম, যে তিনজন লোক গাড়ির লেজের দিকে গিয়েছিল তারা ফিরে আসছে। তাদের কাছে জানা গেল যে, চলন্ত গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে খুব ঠান্ডা হাওয়া আসছিল বলে ওদের কামরার একজন যাত্রী দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে গাড়ি থেকে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চেন টানা হয়েছে। লোকটা মারা গেছে। তার সঙ্গে কেউ ছিল না।

যাই হোক, দুর্ঘটনার বলি মৃতদেহটিকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গার্ডসাহেব গাড়ি ছাড়লেন। মাঝেরহাট স্টেশনে যখন গাড়ি এল আমার ঘড়িতে তখন এগারোটা পঞ্চাশ।

বৃষ্টি তখন নেই। কনকনে ঠান্ডা, একটা এলোমেলো বাতাস চারদিকে দাপাদাপি করছে। প্লাটফর্মে নেমে আমি সামনে-পেছনে তাকিয়ে দেখি মাঝেরহাট স্টেশনে আমি ছাড়া অন্য কেউ নামেনি। এমনিতেই ছোট স্টেশন। সকালে বিকেলে কিছু ভিড় হয়। এত রাতে এই স্টেশনের যাত্রী কে থাকবে। কিন্তু না। একজন নেমেছে। আমার সামনের কামরা থেকেই বোধহয় নেমেছে। আমি খেয়াল করিনি। ভয়ের মধ্যে এবার একটু ভরসা পেলাম।

গায়ে মাথার চাদর। পরনে ধুতি। লোকটা কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলেছে। আমি তার পেছন পেছন। "ও দাদা, শুনছেন!" দুবার ডাকলাম। শুনতে পায়নি। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে উঠে না ডাকতেই লোকটি ফিরে তাকাল নীচে আমার দিকে। হাওয়ায় তার চাদর উড়ছে। চাদরের ভেতর থেকে লোকটাকে দেখাই যাচ্ছে না। লোকটি আমার দিকে একবার ঘুরে কিছু না বলে বাকি কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজের ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

রাত বারোটায় মাঝেরহাট ব্রিজ একেবারে জনশূন্য। এমনকি, যে দু-চারজন ভিখারি ব্রিজের ফুটপাথে রাত কাটায় তারাও আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। মাঝেমাঝে মালবোঝাই কয়েকটি লরি ট্রাক ব্রিজ কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে। হাওয়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই।

বিজের উপর এসে আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোনদিকে যাবেন?" সে বললে, "নিউ আলিপুরের দিকে।" আমি বললাম, "তবে তো ভালই হল, আমি বেহালা যাব। চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক, ট্রাম বাস তো বন্ধ হয়ে গেছে।" লোকটা একটু ইতস্তত করে বললে, "চলুন।"

ব্রিজের রাস্তা ক্রস করে আমরা বাঁ দিকের ফুটপাথে উঠলাম। আর সেই সময় অতর্কিতে কোথা থেকে যেন দুজন লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের একজনের হাতে ছুরি। তারা বললে, 'টাকা-পয়সা ঘড়ি আংটি যা আছে চটপট দিয়ে দিন।" আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আমাব হাতে দামি ঘড়ি আছে। পাথব বসানো সোনার আংটি আছে, পকেটে গোটা চল্লিশ টাকা আছে। পকেট হাতড়ে কোনও মতে টাকাটা বের করছি, এমন সময় দুর্বৃত্তরা আমার সঙ্গী লোকটিকে বললে, "চাদরের নীচে কী লুকিয়ে রাখা হচ্ছে? বের করুন, নয়তো খতম করে দেব।" লোকটি তখন চাদবেব ভেতর থেকে একাট বড় প্যাকেট বের করে আমার হাতে দিল এবং এক অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় দুর্বৃত্ত দুজনের গলা টিপে ধরে ব্রিজেব রেলিং-এর ওপর ঠেলে নিয়ে গেল। একজন দুর্বৃত্ত ছুরি চালাল। কিন্তু লোকটির গায়ে লাগল না। আমি ভয়ে দৌড়ে পালাতে গেলাম। কিন্তু আমার হাত-পা এমন কাঁপছিল যে, আমি এগোতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখি দুজন দুর্বৃত্তই মাটিতে পড়ে আছে। লোকটি একে একে দুজনকে তুলে রেলিং-এর ওপর দিয়ে ব্রিজের নীচে ফেলে দিল।

সমস্ত ঘটনা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। কোনও মানুষের যে এত সাহস এবং শক্তি থাকতে পাবে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

লোকটি আমার কাছে এসে বললে, "দিন আমার প্যাকেট। চলুন।"

যেন কিছুই হয়নি। এদিকে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি কোনও কথা বলতে পারছি না। শেষে কি খুনের দায়ে পডব নাকি!

লোকটি যেন আমার মনের কথা শুনতে পেল। বলল, "আপনার কোনও ভয় নেই।"

আমরা দুজনে মাঝেরহাট ব্রিজ ছেড়ে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে হাঁটছি। কিছুক্ষণ পরে লোকটি আপনমনে বলল, "এই প্যাকেটটি খড়্গপুর পৌঁছে দেওয়া খুব দরকার।" উৎসুক হয়ে বলি, "খড়্গপুরে আপনার কে আছে? আমি খড়্গপুরে থাকি।" চলতে চলতে সে বলল, "যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমিও খড়্গপুরে থাকি। ব্যবসা আছে। নিউ আলিপুরে আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিলাম। আমার এক প্রতিবেশীর মেয়ের বিয়ে। নিজের মেয়ের মতোই। এই বেনারসী খানা তার জন্যে কিনেছি। কিন্তু আমার পক্ষে এখন খড়্গপুর ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। অথচ এই শাড়িখানা কালকেই পৌঁছুনো চাই। পরশু মেয়েটির বিয়ে।"

'একদমে কথাগুলো বলে লোকটি থামল। আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। তার কথাগুলে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল।

আমরা ইতিমধ্যে নিউ আলিপুরের রাস্তার কাছে এসে গেছি। হঠাৎ সে কর্কশ গলায় বলল, "প্যাকেটটা ধরুন। আমার নাম করে কালকেই ঠিকমতো পৌঁছে দেবেন। ঠিকানা লিখে নিন। আমার নামটাও।"

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যজনক হয়ে উঠছিল। আজকালকার দিনে, যতই অসুবিধে থাক, একটা সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের হাতে কেউ তিন-চারশো টাকার জিনিস দিয়ে দেয়? কিন্তু তার কথা অমান্য করার বা তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস আমার ছিল না। আমি কোনোক্রমে বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচি।

লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কলম বের করে কাপড়ের প্যাকেটের ওপরই আমি ঠিকানা লিখে নিলাম। এবং লোকটির নামটিও। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি মানুষটি নিউ আলিপুরের রাস্তায় না ঢুকে আবার মাঝের-হাট ব্রিজের দিকে ফিরে চলেছে। আশ্চর্য।

আমি এক মুহূর্তে ওখানে না দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলে এলাম। দিদি দরজা খুলে দিল! আমাকে দেখে বললে, "কী হয়েছে তোর! এ কী চেহারা হয়েছে? এত রাত হল কেন?"

আমি শুধু বললাম, "বাইরে খুব দুর্যোগ তো!"

পরদিন সকালে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম মাঝেরহাট ব্রিজে জোড়া খুনের সংবাদ বড় করে ছাপা হয়েছে। এবং অন্য পৃষ্ঠায় ছোট করে একটি পথ দুর্ঘটনার সংবাদ। কাগজ থেকে আমি দুটো সংবাদের অংশই সযত্নে কেটে রেখেছিলাম। পথ দুর্ঘটনা শীর্ষক সংবাদে কালীঘাট স্টেশনের কাছে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত খড়্গপুর-নিবাসী যার নাম কাগজে ছাপা হয়ছিল সেই নামটি তারই নির্দেশে আমি লিখে নিয়েছিলাম! আমি আর ভাবতে পারছি না।

সকালের ট্রেনেই আমি খড়্গপুর ফিরে গিয়েছিলাম। বেনারসীর প্যাকেটের ওপর ঠিকানা লেখা বাড়ি খুঁজে যখন সেখানে গেছি তখন বিয়েবাড়ির কোনও হৈ-চৈ ছিল না। চারিদিকে একটা শোকের ছায়া। পাশের একটি বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ। বুঝতে পারলাম দুর্ঘটনাব খবর পৌঁছে গেছে।

লোকটির নাম করে বেনারসী শাড়ীর প্যাকেটটি যথাস্থানে দিতেই সমস্ত বাড়িটা যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। আশপাশের বাড়ি থেকেও লোকজন এল। আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইনি। কারণ আমি জানতাম যে, আমাকে নানা রকম কথা জিজ্ঞেস করা হবে। এবং এও জানতাম যে, ঐ লোকটির ট্রেনে কাটা পড়ার এক ঘণ্টা পর মাঝেরহাট ব্রিজের রাত বারোটার কাহিনীর একটি বর্ণও কেউ বিশ্বাস করবে না। আমাকে ভুল বুঝবে। আমি নতুন ঝামেলায় পড়ে যাব।

দুর্ঘটনার রাতে

সুধীন্দ্র সরকার

দাঁইহাট আর কাটোয়া জংশনের মাঝে গয়া প্যাসেঞ্জার যখন লাইন থেকে ছিটকে গেল, তখন রাত প্রায় দশটা। যাত্রীদের আর্তচিৎকারে জায়গাটার তখন এক ভয়াবহ অবস্থা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে, নির্জন প্রান্তরে রক্তমাখা অবস্থায় কুমুদ কয়েক মুহূর্ত্ত কী যেন চিন্তা করল, তারপর কোনোরকমে সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়াল। বাঁ-হাতটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ভয়ানকভাবে কেটে যাওয়া ছাড়া, হাতের হাড়ও ভেঙ্গেছিল বোধ হয়। অন্ধকারে কামরার ভেতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হল, পায়ের তলাতে বোধহয়, কোন মানুষের অচৈতন্য দেহ।

স্টেশন এখানে থেকে অনেকটা দূরের পথ। কুমুদ হামাগুড়ি দিয়ে দরজাব কাছে গেল। বাঁ হাতটা নাড়াতেই পারছিল না। ডানহাতে কোনক্রমে হাতড়ে হাতড়ে কামরার বাইরে এল। ইতিমধ্যে আরো অনেক যাত্রী কামরার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ওর মতো আহত। কেউবা আরো বেশি।

কুমুদ ঐ পরিবেশে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হাতের যন্ত্রণা ক্রমাগত বাড়ছিল।

রিলিফ ট্রেন কখন আসবে তারও কোনো ঠিকানা নেই। আর আশেপাশের গ্রাম থেকে সাহায্য আসতে হয়ত মাঝরাত গড়িয়ে যাবে।

হাঁটতে শুরু করল কুমুদ। ধানক্ষেত আর মাঠেব মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হবে ওকে। দু-ক্রোশ পথ পেরিয়ে তবেই ও পৌঁছবে শ্রীবাটি গ্রামে। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে পা চালাতে চেষ্টা করল ও।

মাইলখানেক পথ এবড়ো খেবড়ো ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটার ফলে পা দুটো আর চলতে চাইছিল না। কেমন যেন টলতে লাগল ওর পা। মাথার মধ্যে হঠাৎ কে যেন হাতুড়ি পেটাতে শুরু করেছে তখন। সেই মুহূর্তে হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল কুমুদ। সামনেই একটা একতলা পাকাবাড়ি। হঠাৎ ধান ক্ষেতের শেষে বাড়িটা দেখে খানিকটা আশার আলো দেখতে পেল। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। আর কিছু না হোক, ঐ বাড়িতে একগ্লাস জল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

বাড়িটার সামনে এসে বাড়তি শক্তি এল বুকে। বাড়িটা বসত বাড়ি নয়। ডাক্তারখানা। দরজার ওপরে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডে লেখা "দাতব্য চিকিৎসালয়।" কিন্তু, ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ। এত রাতে ডাক্তারবাবুকে কী পাওয়া যাবে? ডাক্তারখানার কাছাকাছি কোনো বাড়ি ওর চোখে পড়ল না। দূরে কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু পথ অনেকটা।

"ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!" বলে চিৎকার করতে করতে কুমুদ প্রাণপণ শক্তিতে দরজা ধাক্কাতে শুরু করল। ওর মনে হল, গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আরও কয়েকবার নিষ্ফল ধাক্কা মারতে চেষ্টা করল, তারপরই ওর শরীরটা ডাক্তারখানার দরজার ওপরে বিকট শব্দ করে পড়ে গেল। গোঙানির মতো অস্ফুট কয়েকটা আওযাজ কবে জ্ঞান হারাল কুমুদ।

এমনি অবস্থায় কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। ....

.....কুমুদেব যখন জ্ঞান ফিরল, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। ও দেখল একটা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে. ঘরে আসবাবপত্র বলতে খাট, টেবিল, চেয়ার আর একটা বন্ধ আলমারি। দেওয়ালে একটা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ আর বড় একটা কাঠের র‍্যাকে বিভিন্ন আকারের শিশি বোতলে ভর্তি ওষুধপত্র। টেবিলের ওপরে হ্যারিকেনেব মৃদু আলো জ্বলছিল টিমটিম করে।

হঠাৎ এমন একটা অচেনা পরিবেশে নিজেকে আবিষ্কার কবে প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল ও। ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়। বাঁ-হাতটায় প্লাস্টার করা। হাতটা গলার সঙ্গে ঝোলানো। ঠিক তখনি অচেনা একটা স্বরে চমকে উঠল কুমুদ।

"কেমন লাগছে এখন? আগের থেকে নিশ্চয় অনেকটা সুস্থ?"

কুমুদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। ওর সামনে একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক স্টেথো হাতে দাঁড়িয়ে। যুবক ডাক্তারটি এগিয়ে এল ওর দিকে। ওর হাতের প্লাস্টারে কয়েকবার আঙুল ছুঁইয়ে, বুকে পিঠে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর

নাড়ি দেখে বলল "কোয়াইট ও-কে।"

"আমি এখানে কেন? কী হয়েছিল আমার?" কুমুদ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

"সে কি! কিছু মনে নেই? ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে—

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ না হতেই কুমুদের চোখের সামনে ভেসে উঠল ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের সেই ভয়াবহ দৃশ্য। ও চকিতে নিজের প্লাস্টার করা হাতটা চেপে ধরল। নাড়ালও কয়েকবার। অশ্চর্য! যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র অনুভূতি নেই। যুবক ডাক্তারটিকে এতক্ষণ ওর কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ছিল। বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সব। লজ্জায় কানদুটো লাল হয়ে উঠল কুমুদের। বলল, "আমাকে ক্ষমা করবেন ডাক্তারবাবু। কিছু মনে ছিল না আমার।"

"ছিঃ! ছিঃ! ক্ষমাটমার কথা কী বলছেন?"

"অন্ধকারে পথ চিনে আসতে পেরেছিলেন বলেই না ঠিকমতো চিকিৎসা হল।"

"তা ঠিক। কিন্তু আপনার ফিজ?"

"টাকা পয়সা এখানে লাগে না। এটা দাতব্য চিকিৎসালয়।"

"আমি তাহলে এখন উঠি। আমাকে আবার সেই শ্রীবাটি গাঁয়ে যেতে হবে।"

"আগে সকাল হোক। বাকী রাতটুকু এখানে বিশ্রাম করে যান।"

হ্যারিকেনের সেই ঝাপসা আলো-আঁধারিতে ডাক্তারবাবু বন্ধ আলমারিব দিকে এগিয়ে গেলেন। কুমুদ আর কোনো কথা বলল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জানালার বাইরের দিকে তাকাল। তখনও তারা দেখা যাচ্ছিল আকাশে। কুমুদ শরীরটাকে এলিয়ে দিল বিছানায়। ডাক্তারবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল ওর। যে নিঃস্বার্থ সেবার নিদর্শন যুবক ডাক্তারটি দেখালেন, তা তুলনাহীন। কিন্তু, ডাক্তারবাবুর নামটা তো জানা হল না। হঠাৎ কোথায় গেলেন উনি। ঘবের দরজায় খিল লাগানো। খিড়কির দরজাও বন্ধ! কুমুদ কয়েকবার ডাক্তারবাবু!' বলে ডাকল। কোনো সাড়া পেল না। ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক দেখল। কিন্তু কোথাও তাঁর হদিস নেই। ক্লান্তিতে দুচোখ বুজে আসছিল ওর। আর জেগে থাকতে পারল না কুমুদ।

ভোর হতে না হতেই হৈচৈ পড়ে গেল গ্রামে। ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট দেখতে গাঁয়ের সব লোক তখন ছুটছে রেললাইনের ধারে।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কুমুদের। আগের চেয়ে ওর শরীর এখন অনেকটা সুস্থ। বাঁহাতের প্লাস্টার শুকিয়ে খটখটে। খাট থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। ডান হাতে খিল খুলে দেখল, বাইরে একজন মধ্য বয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। একনজর দেখেই কুমুদ বুঝতে পারল, আগন্তুক ভদ্রলোক একজন ডাক্তার। ভদ্রলোক অবাক চোখে কুমুদের পা থেকে মাথা অব্দি একবার দেখলেন। ভদ্রলোকের হাতে একটা চামড়ার ডাক্তারি ব্যাগ। গলায় ঝোলানো স্টেথোস্কোপ। ডাক্তার ভদ্রলোক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এখানে কী করে এলেন? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?"

কুমুদ বলল, "কাল রাতে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের পর এখানে এসেছিলাম। বাঁ হাতটা ভেঙে

গিয়েছিল। এখানে যে ডাক্তারবাবু ছিলেন, তিনি আমার হাত প্লাস্টার করে রাতটুকু বিশ্রাম নিতে বলেছিলন।"

"ডাক্তারবাবু!' ডাক্তারের চোখে মুখে বিস্ময়। "আমি ছাড়া অন্য কোনো ডাক্তার তো এখানে নেই? আর, কম্পাউন্ডার যিনি আছেন তিনি তো কাল রাতে আমার সঙ্গেই গিয়েছিলেন। এতক্ষণ হয়ত উনি সদর হাসপাতালে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের রিপোর্ট দিতে পৌঁছে গেছেন।'

"তাহলে উনি কে?" কুমুদ হাঁ হয়েগেল ডাক্তারের কথায়।

ডাক্তারবাবু কুমুদকে খাটে বসালেন। হাতের ব্যাগ টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "যিনি আপনার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন, তিনিই কী এই ঘরের তালা খুলেছিলেন।"

"সে কথা তো বলতে পারব না।" কুমুদ বলল, "আমি এখানে পৌঁছতেই জ্ঞান হারাই।"

"তারপর?"

"জ্ঞান যখন ফিরল দেখলাম, এই খাটে শুয়ে। বাঁহাতে প্লাস্টার করা।"

"যিনি প্লাস্টার করেছিলেন তাঁকে দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। জ্ঞান ফেরার পর উনি আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন যখন, তখন দেখেছিলাম। পরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। তারপর আর দেখিনি ওঁকে। উনি আমাকে একলা ফেলে কোথায় যে চলে গেলেন? কত ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু, কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না"

"আশ্চর্য! এই গাঁয়ে ভাঙা হাত জোড়া দিতে পারে, এমন কোনো লোক আছে বলে তো শুনিনি? কেমন দেখতে ছিলেন সেই ডাক্তারটি?"

"পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। চেহারাও বেশ ভাল। লম্বা-চওড়া। মুখে চাপ দাড়ি। সত্যি অমন ভদ্রলোক জীবনে দুটো দেখিনি আমি। ট্রিটমেন্ট করলেন, অথচ একটা পয়সাও নিলেন না আমার থেকে। বললেন, এটা দাতব্য চিকিৎসালয়।"

"হুম!" বলে ডাক্তারবাবু ঝিম মেরে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। উনি কিছুতেই ভাবতে পারছিলেন না, কে সেই ডাক্তার। যে দরজার তালা খুলে চিকিৎসা করার সাহস রাখে। এই গাঁয়ের কোনো ছেলে কী তবে ডাক্তারী পড়ছে? তাই বা কী করে হয়? গাঁয়ের সকলেই ওঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, আর এই সুখবরটা ওকে কেউ জানাবে না? গয়া প্যাসেঞ্জারের অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে, মানবিকতার খাতিরে ওঁকে দৌড়তে হয়েছিল আহত যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য। রেলের রিলিফ ট্রেন এল সেই ভোরবেলা। নইলে, আরও আগে হয়ত উনি ফিরতে পারতেন। চাক্ষুষ দেখতে পেতেন যুবক ডাক্তারটি গেলই বা কোথায়। এই লোকটা বানানো গল্প বলছে না তো? কোন বদ মতলবে ঘরে ঢোকেনি তো? এদিকে লোকটার চেহারা আর জামাকাপড়ে রক্ত দেখে মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে ফিরেছে।

কুমুদ চুপচাপ বসে ছিল। হঠাৎ দেওয়ালে টাঙানো ফোটোগ্রাফের দিকে চোখ পড়তেই

চমকে উঠল ও। চিৎকার করে ছবির দিকে আঙুল তুলে বলল, "ঐতো সেই ডাক্তারবাবু!"

সম্বিত ফিরে পেয়ে ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন, "কই?" তারপর— ছবির দিকে চকিতে তাকিয়ে ফের বললেন, "ও এসেছিল?" কুমুদ ঘাড় নেড়ে সায় দিল। দ্রুত বুক ওঠানামা করতে শুরু করল ডাক্তারবাবুর। "কিন্তু!" ডাক্তারের চাহনি হঠাৎ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেল। বন্ধ আলমারির দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলেন, "অসম্ভব!" তাবপর কুমুদের কাঁধে দুহাত রেখে উত্তেজিত হয়ে ঝাকুনি দিলেন, "ঠিক বলছেন আপনি? ছবিতে যাকে দেখছেন, সেই এসেছিল?"

কুমুদ ছবিটা আর একবার দেখে নিশ্চিন্ত হল। বিনয়ীভাবে বলল, "অমন ভদ্র ডাক্তারের নামে, আমি কী মিথ্যে কথা বলতে পারি? অজ্ঞান অবস্থা থেকে তুলে এনে উনি যেভাবে আমার চিকিৎসা করলেন, তা কী আমি ভুলতে পারি?" অভিভূত কুমুদ। ডাক্তারবাবু বোবার মতো নিশ্চুপ। কুমুদ ফের জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার বলুন তো? ছবিটা কার?"

ডাক্তারবাবু কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে গলা থেকে স্টেথোস্কোপ খুলে বললেন, "সত্যি যদি ও এসে থাকে, আর স্বচক্ষে দেখে থাকে, ওর কথা আমি রেখেছি। তাহলে এতদিনের পরিশ্রম আমার সার্থক।"

কুমুদ মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ডাক্তারবাবুর কথা কেমন যেন হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছিল ওর।

"এতদিন কাউকে যে কথা বলতে পারিনি, আজ আপনাকে সেই কথা বলছি। আমার কাছে বড় মর্মান্তিক ঘটনা!" ডাক্তারবাবু বলতে লাগলেন, "বছর বিশেক, আগের কথা। সিরাজুল আর আমি একই সঙ্গে ডাক্তারি পড়তাম। দুজনে ছিলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বেশ ভাল স্টুডেন্ট ছিল ও। কলেজের ছাত্রছাত্রী মহলে ও ছিল খুব পপুলার। ওর জীবনের ধ্যান জ্ঞান ছিল আর্তের সেবা। ডাক্তারি পড়তে পড়তে নিজের পকেট খরচা থেকে গরীব মানুষের চিকিৎসা করত, ওষুধ পথ্যিও কিনে দিত। ওর খুব ইচ্ছে ছিল, ভবিষ্যতে আমরা দুজনে কোনো গ্রামে গিয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলি। কিন্তু কী যে হল, ঘটনাটা হঠাৎই ঘটে গেল যেন। মাত্র তিনদিনের জ্বরে সিরাজুল চলে গেল আমাদের ছেড়ে। ডাক্তারিশাস্ত্রের কোনো বিদ্যাই ওকে বাঁচাতে পারল না। তখন আমার ফোর্থ ইয়ারে পড়তাম। ডাক্তার হওয়া আর হল না সিরাজুলের। কলেজে এমন কোনো স্টুডেন্ট বা ডাক্তার ছিল না যে, ওর জন্য চোখের জল ফেলেনি।" কথা বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল ডাক্তারবাবুর।

শিরশির করে উঠল কুমুদের গোটা শরীর। ও আড়চোখে একবার হাতের প্লাস্টারের দিকে তাকাল। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনো স্বর বেরল না গলা দিয়ে।

ডাক্তারবাবু রুমালে চোখ মুছতে মুছতে ফের বললেন, "ওর মতো মানসিকতা আমি আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখিনি। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে আমাকে দু-হাত ধরে অনুরোধ করেছিল, ওর কঙ্কালটা যেন ডাক্তারি স্টুডেন্টের ব্যবহারের জন্য কাজে লাগাই। সিরাজুলের মৃত্যুর বছরখানেক পরে আমি ওর কবর থেকে কঙ্কালটা চুপি চুপি তুলে এনেছিলাম

বটে, কিন্তু কোনো হসপিটালে দিইনি। বন্ধুপ্রীতি আমাদের দুজনকে কাছছাড়া করতে পারেনি। এই দাতব্য চিকিৎসালয়েই ওকে লুকিয়ে রেখেছি আমি।”

ভয়ে শিউরে উঠল কুমুদ। ডাক্তারবাবু ধীর পায়ে বন্ধ আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। আলমারির পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

কুমুদ উঁকি মেরে দেখল, আলমারির মধ্যে একটা কঙ্কাল আংটায় ঝোলানো রয়েছে। কঙ্কালটা চোখে পড়তেই ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠল ও। মনে হল, শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল মাথা। পা দুটো হঠাৎ ভারী হয়ে গেল খুব। বিড় বিড় করতে করতে ফের জ্ঞান হারাল কুমুদ।

অভিশপ্ত গোরস্থান

মহম্মদ ইলিয়াস

আব্বাজান অনেক করে বলেছিল হাবিব ঐ ভোর রাতে উঠে আব যাস না আমার ভয় করে, মনটা কেমন কেমন করে....

ভাইজান শোনেনি সে কথা, জানো ফুফু আমিও কতো করে বলেছি, ভাইজান তুমি কেন কাবখানা থেকে ফিরে আসো কারখানায়ই থেকে যাও না। ছুটির দিনে না হয বাড়িতে থাকলে, তা কে কার কথা শোনে?

আর দুঃখ করে কি হবে বল, যে যাওয়ার সে চলে গেছে, আল্লা নিয়ে চলে গেছে, আল্লার কাছে দোয়া কর যেন আগামী জন্মে দীর্ঘায়ু হয়।

জাহানারা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ইদ্রিশ আলী খাটের এককোণে বসে নোনা ধরা দেওয়ালের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে একটাই মাত্র ছেলে অকালে চলে গেল, আর পাঁচটা ছেলের সাথে ওর কোন মিল নেই, অভাবের সংসার আব্বাজান পঙ্গু, আব্বাজানও বাঁচতো না, ঐ একই জায়গায় আব্বাজানের উপরেও অভিশাপ নেমে এসেছিল। জাহানারা ভেবে পায় না, ওখানে কি আছে? কেন ঐ জায়গাটুকু ওদের কাছে অভিশপ্ত, কি এমন অন্যায়

করেছে তারা প্রথমে মরলো আম্মা, ঠিক ঐ জায়গায় গোরস্থানের পাশে, নিম গাছটার নীচে। আম্মা ফুফুর বাড়ীতে বেড়াতে গেছে। বিকেল বিকেল ফেরার কথা, সন্ধ্যে কেটে রাত হোলো তবুও ফিরছে না, ইদ্রিশ আলী তখন বলিষ্ঠ মানুষ, গায়ে গতরে খেটে পয়সা রোজগার করে। সারাদিন খাটে সন্ধ্যেবেলায় মনটাকে আর ধরে রাখতে পারে না। ভাঁটি খানায় ঢুকে বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে পড়ে, তারপর যখন বাড়ি ফেরে একেবারে অন্য মানুষ জাহানারা হাবিব দুটোই তখন ছোট, সেদিন বাড়ি ফেরার সাথে সাথে জাহানারা বলল আব্বাজান আম্মা এখনও ফিরলো না কেন?

ইদ্রিশ আলী একবার রক্তবর্ণ চক্ষু মেলে জাহানারাকে দেখে নেয়, বিড় বিড় করে আপন মনে কি যেন বলে, তারপর বিছানায় দেহটাকে আছড়ে ফেলে।

জাহানারা ভয়ার্ত চোখে আব্বাজানের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাবিব হ্যারিকেনের পাশে বই নিয়ে বসে বিড় বিড় করে পড়ছে জাহানারা কাঠের দরজাটা খুলে একবার রাস্তার দিকে উঁকি দেয়, ঘন অন্ধকারে ঢাকা গোটা চত্বরটা, দুহাত অন্তরের বস্তু চোখে পড়ে না, ফিরে আসে আবার ঘরে। দরজা বন্ধ করে মনটা কুডাক ডাকে। হাবিব আদরের গলায় বলে ক্ষিদে পেয়েছে।

জাহানারা অসহায় দৃষ্টিতে একবার ভাইজানের দিকে তাকায়। চোখ ফিরিয়ে তাকায় আব্বাজানের দিকে, টানটান হয়ে ঘুমোচ্ছে, নাক ডাকার শব্দে ঘর গম গম করছে।

সারারাত ফেরেনি তার আম্মা, হাবিব কয়েকবার খাবারের বাসনা করে এক সময় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জাহানারা জেগে বসে আছে, ওর চোখ ছাপিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল, দুবার ধাক্কা দিয়েছিল আব্বাজানকে ওঠেনি, ভোর রাতে ঘুম ভাঙলো আব্বাজানের যখন জানতে পারলো জাহানারার আম্মা ফেরেনি, তখন রেগে গেল, লুঙ্গি আর পাঞ্জাবীটা গলিয়ে বেরিয়ে পড়লো। হাবিব তখন ঘুমিয়ে, জাহানারা আব্বাজানের পিছু নিলো।

দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল গোরস্থানের পাশে মানুষ গোল হয়ে কি যেন দেখছে। ওরা উপস্থিত হতেই সবাই সরে দাঁড়ালো। জাহানারা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, তাঁর আম্মা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে, সেদিনের কথা আজও ভোলেনি। এখনও শরীর শির্‌শির্ করে।

তারপর আব্বা সেই একই জায়গায়, আব্বাজান তবুও বেঁচে ফিরেছে। পা দুটো জন্মের মতো হারিয়েছে। যখন আব্বাজান ঐ ঘটনার কথা বর্ণনা করছিল তখন জাহানারার মনে হচ্ছিল আব্বাজানের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

তারপর দীর্ঘদিন আর কিছু হলো না, আস্তে আস্তে সব সয়ে গেছিলো, হঠাৎ করেই আবার অভিশাপ নেমে এলো। ঘরের একমাত্র রোজগেরে হাবিব তাকেও শেষ করলো।

আব্বাজান পই পই করে বারণ করেছিল হাবিব ঐ পথ ধরে যাস না, স্টেশানের পথ দিয়ে যাস। একটু দেরী হলেও ক্ষতি-নেই, স্টেশানের পথ ধরেই যেতো হাবিব, কিন্তু সেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে যাওয়ায় গোরস্থানের পথ ধরলো আর সেইদিন সকালেই

পাওয়া গেল তার রক্তাক্ত মৃতদেহ। দেখে মনে হয়েছিল কতকগুলো নেকড়ে তার ভাইজানের দেহটাকে খুবলে খুবলে খেয়েছে।

সারাদিন সারারাত কেঁদে চলেছে জাহানারা, মন কিছুতেই মানে না। আব্বাজান কাঁদতে কাঁদতে ভুলে গেছে, খবরটা পাওয়ার সাথে সাথে সেই যেভাবে বসেছিল, এখনও সেই ভাবে বসে আছে, এক ফোঁটা জল এখনও পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। জাহানারা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে আব্বাজানের কাছে, ধরা গলায় ডাকলো— আব্বা, আব্বাজান।

কোন সাড়া দিল না, জাহানারা আব্বাজানের পিঠে মৃদু-ধাক্কা দিয়ে ডাকলো আব্বাজান।

হুঁ, বলে জাহানারার দিকে চোখ ফিরালো ইদ্রিশ আলী, ফ্যাকাশে দৃষ্টি, থেকে থেকে শরীরটা কেঁপে উঠছে।

আব্বাজান, সব শেষ হয়ে গেল। আমরা আর কেন বেঁচে থাকি, কেন এমন হচ্ছে বলতে পারো?

ঝরঝর করে কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়লো আব্বাজানের বুকে, জাহানারার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ইদ্রীশ আলী বলল— কাঁদিস না, কেঁদে কি হবে, সব আমারই জন্যে শেষ হয়েছে। আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো— তোর আম্মা, হাবিব আমি....

—কেন, কেন আপনি কি করেছিলেন আব্বাজান?

—খুন, খুন করেছিলাম। জ্যান্ত মানুষটিকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলাম। শুধু পয়সার জন্য সেদিন কি ভেবেছিলাম আমার কৃতকর্মের প্রতিশোধ সে এইভাবে নেবে?

—এ তুমি কি করলে আব্বাজান, কেন খুন করলে, কার জন্য খুন করলে! এবার আমাকেও শেষ করো, আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলো জাহানারা, ফুফু এগিয়ে এসে বুকে টেনে নিলো জাহানারাকে, সান্ত্বনা দিতে লাগল।

জাহানারা জানে একদিন আব্বাজানকেও শেষ করবে, ওকেও শেষ করবে। মনে মনে আল্লার কাছে প্রার্থনা করে আল্লা, তুমি আগে আমাকেও নিও তারপর আব্বাকে, আগে আমাকে...

বন্ধুত্বের পরিচয়

অতীন ঠাকুর

সুবোধ আর স্বপন, যেন হরিহর আত্মা। দুজনেই রানাঘাটের কাছে গাঙ্গনাপুব নামে একটি গ্রামে বাস করে। ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে পড়াশুনা করেছে। ওরা একই কলেজ থেকে পাশ করেছে! সুবোধ এখন ডাক্তারি পড়ছে। কিন্তু স্বপনের কলেজের গন্ডি পার কবে অর্থনৈতিক কারণে আর পড়াশুনা চালানো হয়ে ওঠেনি। বাধ্য হয়ে তাকে চাকবী করতে হয় এবং জামসেদপুরে টেলকো কোম্পানীতে একটা চাকরীও পায় সে। স্বপনের বাবাব মৃত্যুর পর মা, ছোট ভাই ও বোনকে নিয়ে বেশ কষ্টেই দিন কাটছিল। চাকরীটা পাবার পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

কিন্তু সুবোধদের অবস্থা প্রথম থেকেই ভালো, বাবা মেডিকেল কলেজেব নামকরা ডাক্তার। ফলে সুবোধের পড়াশুনা চালানোর কোন অসুবিধাই তার বাবা রাখেনি। দুজনের অর্থনৈতিক অবস্থা দু-রকম হলেও কোনদিন তাদের মধ্যে বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি, বরং বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়েছে. এই গভীরতা এতখানি নিবিড় ছিল যে কেউ কাউকে একদিন না দেখে থাকতে পারত না। অথচ ভাগ্যের পরিহাস, স্বপনকে চাকরী নিয়ে সপরিবারে জামসেদপুরে চলে

যেতে হলো। জামসেদপুরে আসার পর স্বপন সুবোধকে নিয়মিত চিঠি দেয়। সুবোধও নিয়মিত চিঠির মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের দূরত্বকে নিকটে আনার চেষ্টা করত। এভাবেই দুজনের দিন কাটতে লাগল। সুবোধ একসময় ডাক্তারি পাশ করার পর ওর বাবার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে জুনিয়ার ডাক্তার হিসাবে প্রাক্‌টিস্ করতে লাগল, এদিকে সুবোধের ঠাকুমার পিড়াপিড়িতে সুবোধের বাবা সুবোধের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগল। আঠারই মাঘ বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল। সুবোধ নিজে একদিন জামসেদপুরে স্বপনদের বাড়িতে গিয়ে সেই শুভ সংবাদ জানায় এবং বিয়েতে আসার জন্য সকলকেই অনুরোধ করে। বন্ধুর বিয়ের খবর শুনে স্বপন তো আনন্দে আত্মহারা। সুবোধের বিয়েতে যাবার জন্য স্বপন কোম্পানীতে ছুটির জন্য আবেদন করে এবং ছুটিও পায় সে। স্বপন ঠিক করে, বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় ডিউটি থেকে ফিরে বাড়ির সকলকে নিয়ে রাত্রির ট্রেনে সুবোধের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবে। একসময় বিয়ের সেই নির্দিষ্ট, অতি আকাঙ্খিত দিনটিও এসে পড়ে। সেদিন স্বপন যথারীতি ডিউটিতে যায় এবং সে ঠিক করে কারখানা থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি বের হবে, এরই মধ্যে খবর পায় কারখানায় দ্বিতীয় হেভী ক্রেনটি কাজ করছে না। কোন গোলমাল হয়েছে। স্বপন নিজে গিয়ে অভ্যাসমত ক্রেনটির এটা-ওটা নাড়তে লাগল যাতে ক্রেনটি চলে। ক্রেনের তলায় দাঁড়িয়ে যন্ত্রপাতি টিপতে লাগল, শেকলে বাঁধা অবস্থায় ক্রেনটি ঝুলছিল। ভুলবশত অটোমেটিক সুইচে আঙুল পড়তেই শিকল খুলে ক্রেনটি নিচে দাঁড়িয়ে থাকা স্বপনের মাথায় পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল। কারখানার শ্রমিকরা শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল, হতবাক হয়ে গেল এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়। স্বপনের এই পরিণতির খবরে তার মা, ভাই-বোনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। যার ফলে সুবোধদের বাড়িতে আর কারোর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এদিকে সুবোধদের বাড়িতে আনন্দের বান ডেকেছে, যথারীতি বিয়ে করতে যাওয়ার আয়োজন চলছে, সুবোধ বাড়ির বারান্দায় পাইচারি করছে আর ভাবছে স্বপনরা এখনও কেন আসছে না, তবে কি স্বপনের কোন অসুখ করেছে, না ছুটি পায়নি! এই ধরনের নানান চিন্তা মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগলো। ক্রমে দিন গড়িয়ে রাত্রি। রাত্রির লগ্নে সুবোধ বিয়ে করতে যায় এবং ফিরেও আসে বিয়ে করে। বৌভাতের দিন বিকেল থেকে সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল তবুও স্বপনের দেখা নেই। তার এই বিয়ের দিনে বন্ধু স্বপন পাশে না থাকায় সুবোধের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। একটা চাপা অভিমান সুবোধের মনে বারবার উঁকি মারে। সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে এরপর থেকে স্বপনের সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না বা তার বাড়িতেও যাবে না। কিসের বন্ধু— এত বলা সত্ত্বেও একবার আসতে পারল না। হঠাৎ সুবোধ দেখতে পেল স্বপন হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে গেট ঠেলে বাড়ির ভিতরে এগিয়ে আসছে। স্বপনকে দেখে সুবোধ তো আনন্দে আত্মহারা। ছি ছি না জানি কি সব খারাপ চিন্তা এতক্ষণ সে করছিল। স্বপনকে দেখে সুবোধদের বাড়িতেও খুশির জোয়ার বয়ে যায়। সুবোধ স্বপনকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নতুন বৌয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সুবোধ স্বপনের আরো আগে না আসার

কারণ সুবোধ জানতে চাওয়ায় স্বপন বলে 'আমি আসার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় মার পুরনো সেই পেটের ব্যথাটা ওঠে, খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে মা, বাধ্য হয়ে সেদিন আর আসা হয়নি। মাকে একটু সুস্থ করে আজই এলাম।" স্বপন আরও জানালো মায়ের অসুস্থতার জন্য খাওয়া-দাওয়া করে আজই সে ফিরে যাবে। সুবোধেব বাবা মা-তো স্বপনকে কিছুতেই ছাড়বে না, শেষে তার মায়ের অসুস্থতার কথা চিন্তা করে মেনে নিল। সুবোধ নিজে তদারকি করে স্বপনকে খাইয়ে দিল। খাওয়া-দাওয়া করে স্বপন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুবোধের সঙ্গে স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হল। অনেকক্ষণ যাবৎ সুবোধ লক্ষ্য করেছে যে, স্বপনকে ভীষণ বিষণ্ন দেখাচ্ছে। হয়ত এতটা পথ জার্নি করে এসেছে সেই ধকলের জন্যই হোক বা মায়ের অসুস্থতার জন্যই হোক। বন্ধুকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে সুবোধ ফিরে আসল। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। যদিও বা এলো বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। যাই হোক বিয়ের অনুষ্ঠান মিটে যাবার দুই-তিন দিন পর সুবোধ এক সাংঘাতিক চিঠি পেল। চিঠি লিখেছে স্বপনের মা, সেই চিঠি পড়ে সুবোধ জানতে পারে সতেরই মাঘ, কারখানায় ক্রেনের শিকল ছিঁড়ে স্বপনের মৃত্যু হয়। শোকে হতবাক হয়ে পড়ে সুবোধ। তার বাড়িতেও শোকের ছায়া নেমে আসে। কিন্তু পাশাপাশি একটা প্রশ্ন সবার মনে বার বার উঁকি মারে, বৌভাতের দিন অর্থাৎ একুশে মাঘ স্বপন কিভাবে এল, ওতো সতেবই মাঘ মারা গেছে। ঘটনাটা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না।

সুবোধ সেদিনই জামসেদপুরে স্বপনদের বাড়ি যায় এবং গিয়ে সব জানতে পাবে যে স্বপনের মা যে চিঠি লিখেছিল তা সম্পূর্ণ সত্যি, কারখানায় খোঁজ নিয়ে আর জানতে বাকী থাকে না যে স্বপনের মৃত্যু হয়েছে। স্বপনের মাকে সুবোধ সমস্ত ঘটনাটা বলে, কিভাবে স্বপন বৌভাতে এল। স্বপনের মা, ভাই, বোন শুধু শোনে আর আকুল হয়ে চোখের জল ফেলে, সুবোধ সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় নেয়, সামনে থানায় গিয়ে জানতে পারলো মৃত্যুব ঘটনায় কারখানার কর্মচারীরা ডাইরি কবেছে। পুলিশ অফিসারকে সুবোধ সমস্ত বিষয় খুলে বলল কিভাবে মৃত্যুর পরেও স্বপন তাকে দেখা দিয়েছিল। অফিসাব সব শুনে একটা পুরানো ফাইল বাব করে সুবোধকে দেখায়। সুবোধ দেখে এধরনেব আরেকটি ঘটনা বহু বছর আগে ঘটে গেছে। পুলিশ অফিসার সুবোধকে বললেন— 'নিবিড় বন্ধুত্বের পরিচয় রাখবার জন্য মৃত্যুর পরেও স্বপনের আত্মা এসে দেখা দিয়ে গেছে'। সবকথা শুনে সুবোধ আস্তে-আস্তে থানা থেকে বেরিয়ে আসলো। দূরে তাকিয়ে বইল সেই কারখানাটির দিকে, দৈত্যের মত যে কারখানাটি তার প্রাণের বন্ধুকে কেড়ে নিয়েছে— মনে পড়ল স্বপনের সেই বিষণ্ন, করুণ, ক্লান্ত মুখটি। প্রচন্ড এক দুঃখে সুবোধের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা। হাহাকার করে বুক চিরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যেন বলতে চাইছে— বন্ধু, তুমি কোথায়— ?

আলী দী ম্যান

ইমদাদুল হক মিলন

রবিনের স্কুল ছুটি হয় চারটের সময়। একা একা বাড়ি ফেরার পথে রবিন দেখে, তাদের ক্লাশের চারটে ছেলে, রেল লাইনের কাছে যে ভাঙাচোরা বিশাল বাড়ি, গাছপালায় ভরা, মধ্যিখানে খেলার মাঠ আর একপাশে মজা দীঘি সেখানে বসে আড্ডা দেয়। কখনো দল বেঁধে বসে থাকে মাঠের মধ্যে, কখনো দীঘির ভাঙা ঘাটটায়। একদিন রবিন দেখে চারজনেই সিগারেট খাচ্ছে। দেখে ভারি রাগ হয়েছে রবিনের। এতোটুকু ছেলে, সবাই রবিনের বয়সী, ক্লাশ সেভেনের ছাত্র, এই বয়সেই যদি সিগারেট খায়! রবিনের ইচ্ছে হয়েছিলো তক্ষুনি গিয়ে হাত থেকে সিগারেট কেড়ে নেয়। যাওয়া হয়নি। ছেলেগুলো বাজে, এই বয়সেই বখে গেছে। স্কুল থেকে প্রায় রোজই পালায়। কখনো এক নাগাড়ে অনেকদিন স্কুলেই যায় না। রবিন দেখেছে যেদিন ওরা স্কুলে যায় না, সেদিন সারাদিনই ঐ ভাঙা বাড়িটায় আড্ডা দেয়, সিগারেট খায়। একে অন্যকে যা ইচ্ছে তাই বলে গালাগাল করে, মারপিট করে। ওদেরকে তাসও খেলতে দেখেছে রবিন। স্কুলে যেতে আসতেই ওদের সঙ্গে দেখা হয় রবিনের। ঐ ভাঙা বাড়িটার পাশ দিয়েই রবিনের স্কুলে যাওয়ার পথ, বাড়ি ফেরার পথ।

আলী দী ম্যান

রবিনরা থাকে শহরের একটু বাইরে। রেললাইন পেরিয়ে কাঁচা মাটির সুন্দর একটা পথ, দুপাশে বস্তির মতন ঘরদোর। এসব ছাড়িয়ে বিশাল একটা খেলার মাঠ, একটা বড়ো পুকুর তার চারদিকে সারি সারি আম কাঁঠালের গাছ। এই গাছপালা, মাঠ ছাড়িয়ে আরো খানিকটা গেলে পর রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে টিনের বাংলো প্যাটার্নের সুন্দর বাড়ি রবিনদের। গেটে কুঞ্জলতার ঝাড়। গেটটা ইঁটের গাঁথনী করা, শাদা রঙের। কপালে শ্বেত পাথরে লেখা 'প্রান্তিক'। রবিনদের বাড়ির নাম। পথের একেবারে শেষ প্রান্তে বলে 'প্রান্তিক' নামটা রেখেছিলেন বাবা। বাবা নেই। মারা গেছেন দুবছর আগে। তখন রবিনরা মাত্র এ বাড়িতে এসেছে। তার আগে থাকতো শহরের ভেতর ঘিঞ্জি মতন একাট পাড়ায়। এই বাড়িটা তখন তৈরি হচ্ছে কেবল। রবিন মাঝে মধ্যে বাবার সঙ্গে এই বাড়িতে ঘুরতে আসতো। খোলা মাঠের মতন একটা জায়গায় চারদিকে দেয়াল তুলে মাঝখানের ঘরদোর তোলা হচ্ছিলো। বাবা অফিসথেকে ফিরে রোজ বিকেলেই এ বাড়িতে আসতেন। মিস্ত্রিরা রাত দিন কাজ করছে, বেড়াতে এসে রবিন দেখতো। নিজেদের বাড়ি হচ্ছে, কি যে ভালো লাগতো। তাছাড়া জায়গাটা খুব সুন্দর বলে, চারদিকে গাছপালা আর খোলা মাঠ আছে বলে এখানটায় এলে রবিনের আর শহরের ঘিঞ্জি পাড়ায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করতো না।

রবিন ছোটবেলা থেকেই একটু উদাস প্রকৃতির। তার ভালো লাগে গাছপালা ফুল প্রজাপতি পাখি ধু ধু খোলা মাঠ আর টলটলে জলের পুকুর। এখানটায় কম বেশি এর সব কিছুই আছে। যেমন রবিনদের বাড়িতেই প্রচুর গাছপালা। বাবা সুন্দর একটা বাগান করেছিলেন, সেখানে প্রজাপতি ওড়ে। ফুল তো আছেই। তাছাড়া চারদিকে তখনো এতো বাড়িঘর তৈরি হয়নি। বেশ একাট নির্জনতা পাওয়া যেতো। নির্জনে ঘুরে বেড়াতে ছোটবেলা থেকেই রবিনেব খুব ভালো লাগে।

প্রথম প্রথম এ বাড়িতে এসে স্কুল ছুটির দিন, দুপুরবেলা রবিন একাকী ঘুরতে বেরুতো। খোলা মাঠটায় যেতো, সেখানে খাঁ খাঁ রোদ। বাতাস উঠলে মিহিন ধুলোবালি উড়তো। বিকেল বেলা মাঠে রবিনের বয়সী, রবিনের চেয়ে একটু বড়ো ছেলেরা ফুটবল খেলতো বলে মাঠের দুদিকে দুটো বাঁশের বারপোস্ট ছিলো। দুপুরবেলা নির্জনে মাঠটাকে পড়ে থাকতে দেখলে এবং বারপোস্ট দুটোর দিকে তাকালে রবিনের যে কতো কি মনে পড়তো! ইচ্ছে করতো রোদেলা মাঠে দাঁড়িয়ে একাকী বারপোস্ট দুটোর সঙ্গে খেলা করে। একদিন দুপুরবেলা পুকুর পাড়ে বেড়াতে গিয়ে জলের ভেতর বিরাট একাট মাছ দেখেছিলো রবিন। শোল মাছ। টুকটুকে লাল চোখে জলের ভেতের থেকে ঠিক রবিনের চোখের দিকে তাকিয়েছিলো। এই পুকুরে গোসল করতে এসে রবিন একদিন শুনেছিলো, দুবছর আগে রবিনের বয়সী একটি মেয়ে এখানে ডুবে মরেছে। তাকে নাকি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেদিন সেই মাছটাকে দেখে রবিনের মনে হয়েছিলো, এই সেই মেয়েটা। পুকুরে ডুবে মাছ হয়ে গেছে। তারপর থেকে রবিন প্রায়ই পুকুর পাড়ে যেতো। মাছটা খুঁজতো। কিন্তু আর কখনো সেই মাছটা দেখেনি রবিন। রবিন এই রকম। একটু উদাসীন, একটু ভাবুক। বাবা বলতেন, রবিন

বড়ো হয়ে তুমি কবি হবে। স্কুল থেকে ফেরার পথে রবিনের কেবল বাবার কথা মনে পড়ে। বাড়িটা শেষ করে একমাসও সময় পেলেন না বাবা। সকাল বেলা বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মারা গেলেন। বাবার কথা ভাবলে রবিনের তাই বড়ো মন খারাপ হয়ে থাকে। একদিন রবিনদের স্কুলে বাংলা-টিচারও বললেন, রবিন, বড়ো হয়ে তুমি কবি হবে। কেন যে বললেন, কে জানে!

শুনে রবিন খুব খুশি। বাড়ি ফেরার পথে বাবা এবং বাংলার টিচার দুজনের কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটে। ভাঙা বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই একত্রে চারটে সাইকেল চারদিক থেকে এসে রবিনকে ঘিরে ধরে। প্রথমে খুব চমকে যায় রবিন। লাফ দিয়ে ওঠে। দেখে তাদের ক্লাশের সেই চারটে ছেলে। এক পা সাইকেলে, এক পা মাটিতে রেখে রবিনের চারপাশ ঘিরে আছে। রবিন বুঝতে পারে চারটেই ভাড়ার সাইকেল। লাইনের ধারে মিয়াচানের সাইকেল ভাড়া দেওয়ার দোকান আছে। আট আনা ঘণ্টা। ওবা সেখান থেকে সাইকেল নিয়ে সারা শহব দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

একজন বললো, এই রবিন একটা টাকা দে!

শুনে রবিনতো হা! এমনিতেই তার ভীষণ মেজাজ খাবাপ হয়ে গেছে। এখন টাকাব কথা শুনে আরো রেগে যায় ববিন। তবুও নিজেকে কায়দা করে ঠাণ্ডা রাখে। বলে, আমার কাছে টাকা নেই।

আব একজন ববিনেব মুখেব ওপর সিগারেটের ধোঁযা ছেড়ে সিনেমাব গুণ্ডাদের মতন গলায বললো, টাকা দে নইলে দাঁত ভেঙে ফেলবো।

ববিন খুব চালাক ছেলে, বুজতে পারল এখন যে কোনোভাবে ছেলেগুলো চাইছে রবিনের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে। ঝগড়া বাধলে ওরাই জিতবে। ওরা দলে ভারি, চারজন। আর রবিন একা। ববিনেব কাছে টাকা থাকলে এক্ষুনি দিয়ে দিতো। কিন্তু টাকা যে নেই। রবিন এখন কি করে!

ববিন বললো, খুব ঠাণ্ডা গলায, আজতো আমার কাছে পয়সা নেই। যদি বলো তাহলে কাল দিতে পারি।

শুনে সবাই হো হো কবে হেসে উঠলো। একজন বললো, পয়সা দিতে হবে না। তারচেয়ে একটা সিগারেট খা। বলে পকেট থেকে সবুজ রঙেব একটা সিগাবেটের প্যাকেট বের করে রবিনের দিকে এগিয়ে দেয়।

রবিন সিগারেট নেয় না। রাগে তাব ভেতরটা জ্বলতে থাকে। একলা থাকলে ছেলেটাকে সে ঘুষি মেরে নাক ভেঙে দিতো। কিন্তু ওবা চারজন। মারপিট লাগলে রবিনকে খুব মার খেতে হবে। রবিন নিজেকে ঠাণ্ডা রাখে। বলে, 'আমি সিগারেট খাই না! তোমরা খাও।' তারপর হাঁটতে শুরু করে। পেছন থেকে ছেলেগুলো হো হো হি হি করে হাসে। রবিন একবারও পেছনে তাকায় না। রাগে তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে সে।

খানিক দূর এসেছে, তখুনি চারটে সাইকেল একত্রে এসে হুড়মুড় করে তার পিঠের উপর পড়ে। রবিন কিছু বুঝে ওঠাব আগেই দেখে সে রাস্তার ওপর কাৎ হয়ে পড়েছে। তার হাতের বই খাতাগুলো করুণ ভঙ্গিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে। দূরে চারটে সাইকেল পাখির মতন উড়ে যাচ্ছে।

রবিন কয়েক মুহূর্ত কিছু বুঝতে পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন দেখে বিশাল একজন মানুষ, কালো কুচকুচে দেখতে, সুন্দর জামাকাপড় পরা। চোখে পাইলটদের মতন কালো চশমা, রবিনের বই খাতাগুলো কুড়িয়ে দিচ্ছে। রবিন অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকায়।

বই খাতা কুডিয়ে রবিনেব কাছে আসে লোকটা। দুহাতে যত্ন করে ধরে দাঁড় করার রবিনকে। মিষ্টি হেসে বই খাতাগুলো দেয তার হাতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, তোমার কোথাও লাগেনি তো রবিন?

রবিন আকাশের দিকে তাকানোর মতো করে লোকটার মুখের দিকে তাকায় তারপর খুশিতে প্রায লাফিয়ে ওঠে, চিনেছি! চিনেছি! তুমি—

আমি মোহম্মদ আলি ক্লে! তোমাকে ব্যথা পেতে দেখেই এলাম।

শুনে ববিনেব একটু অভিমান হয়। ভাবি গলায় বলে, ওরা আমাকে মারলো, তুমি দেখলে না?

রবিনের মাথার ওপর থেকে মোহাম্মদ আলী বললেন, দেখেছি।

তাহলে তুমি কিছু বললে না কেন? তুমি একটা করে ঘুযি মারলেই তো ওরা মরে যেতো!

মোহাম্মদ আলী মিষ্টি হেসে বললেন, আমি কাউকে মারি না। পৃথিবীর সব মানুষকে আমি বড়ো ভালোবাসি।

যারা অন্যায় করে তাদেরকেও ভালোবাসো? এই কথাটা বলতে পেরে রবিন খুব খুশি হয়। ভাবে, বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন হযেছে। মোহাম্মদ আলী এর জবাব দিতে পারবেন না!

কিন্তু এ কথাযও মোহাম্মদ আলী হাসেন। বলেন, যারা অন্যায় করে তাদেরকেও তুমি ভালোবাসো, দেখবে তারা আব অন্যায় করছে না।

শুনে ববিন খুব রেগে যায়। বলে, বারে যারা আমাকে মারবে তাদেরকে আমি ছেড়ে দেবো! তুমি একটা বোকা। দাঁড়াও, আমিও একদিন তোমার মতো বক্সার হবো। তারপর সবাইকে দেখে নেবো। বলে রবিন আর দাঁড়ায় না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো, বাড়ির পথ এখনো অনেকটা বাকি। মা চিন্তা করবেন। পেছনে মোহাম্মদ আলী পড়ে রইলেন, রবিন ভুলেই গেলো।

বাড়ি ফিরে সন্ধ্যেবেলা রবিন একটা অদ্ভুত কাজ করলো। বাগানের ভেতর স্তূপ করা ছিলো কিছু বালি, সেখান থেকে বেশ কিছুটা বালি নিয়ে একটা মোটা কাপড়ের ব্যাগের ভেতর ভরে, ব্যাগটা টাঙ্গিয়ে দিলো তার ঘরের বারান্দায়। দেখে মা বললেন, ও কি করছিস রবিন?

রবিন ব্যাগটার গায়ে সব শক্তি একত্র করে দুটো ঘুষি মারলো। তারপর মার দিকে তাকিয়ে বললো, বক্সিং প্র্যাকটিস করবো। মোহাম্মদ আলী ক্লের মতো বক্সার হব।

ভাইয়া তার কজন বন্ধু নিয়ে চা খাচ্ছিলেন ঘরে। রবিনের কথা শুনে বেরিয়ে এলেন। ভাইয়াকে দেখে মা বললেন, দেখেছিস কাণ্ড!

বালির ব্যাগটা ঝুলতে দেখে ভাইয়া হেসে ফেললেন, কি হবে?

রবিন বললো, বক্সিং।

বক্সিং শিখে কার মুণ্ডু ফাটাবে?

ওদের!

ওরা কারা?

রবিন খুব উত্তেজিত ছিলো। গড়গড় করে ছেলেগুলোর কথা বলে গেলো। শুনে ভাইয়া বললেন, তার জন্য তোমার বক্সিং শিখতে হবে! বাবা না বলেছিলেন, তুমি কবি হবে!

হ্যাঁ। আমাদের বাংলার টিচারও আজ বলেছেন। তাহলে?

না, আমি কবি হবো না। কবি হলে আমাকে সবাই মারবে, আমি কাউকে মারতে পারবো না।

এসব শুনে মা এবং ভাইয়া খুব হাসেন। তাদের হাসতে দেখে রবিনের হঠাৎ করে মোহম্মদ আলী ক্লের কথা মনে পড়ে। ভাইয়াকে বলে, জানো ভাইয়া, ছেলেগুলো যখন আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গেলো, আমার বই খাতাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো রাস্তায়— তখন মোহাম্মদ আলী ক্লে এসে প্রথমে আমার বই খাতাগুলো কুড়িয়ে দিলেন, তারপর আমাকে ধরে তুললেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার কোথাও লাগেনি তো রবিন!

এইটুকু শুনে ভাইয়া আরো জোরে হেসে ওঠেন। হাসতে হাসতে বলেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে রবিন! তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, সন্ধে হয়েছে যাও পড়তে বসো গে।

ভাইয়ার কথায় ভারি একটা অভিমান হয় রবিনের। মোহম্মদ আলী যে তার বই খাতা কুড়িয়ে দিলেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, তাকে অতোগুলো কথা বলে গেলেন, এ সবের কিছুই ভাইয়া বিশ্বেস করলেন না। আশ্চর্য তো! আর একদিন দেখা হোক মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে, তাঁকে সে বাড়ি নিয়ে আসবে। বললেন মোহাম্মদ আলী নিশ্চয়ই আসবেন। বড়ো ভালো লোক, রবিন বুঝে গেছে! মোহাম্মদ আলীকে বাড়ি ডেকে এনে ভাইয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে রবিন। ভাইয়া আজ তার কথা বিশ্বেসই করলো না!

মাঝ রাতে বালির ব্যাগে ঘুষি মারার শব্দে ঘুম ভাঙে রবিনের। চোখ মেলেই দেখে তার ঘরের দরোজা খোলা। দরোজা দিয়ে তাকালে বারান্দাটা পুরো দেখা যায়, বালির ব্যাগটা দেখা যায়। আজ কি পূর্ণিমা? নইলে বারান্দায় অমন জ্যোৎস্না পড়লো কোত্থেকে।

রবিন বিছানায় উঠে বসে। বসেই বারান্দায় দিকে তাকায়। বারান্দায় তার বালির ব্যাগটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক মানুষ খালি গা, শাদা হাফ প্যান্ট পরা, হাতে গ্লাভস।

অনবরত ঘুষি মেরে যাচ্ছে রবিনের ব্যাগে।

উঠে বারান্দায় আসে রবিন। চিনতে পারে, মোহাম্মদ আলী ক্লে। চিনতে পেরেই মনটা খুব ভালো হয়ে যায় রবিনের। ভাবে এক্ষুনি ভাইয়াকে ডেকে এনে দেখাবে।

রবিনকে দেখে ঘুষি মারা থামান মোহাম্মদ আলী। হাতের গ্লাভস খুলে রবিনের কাছে আসেন। রবিন বললো, তুমি কখন এলে?

মোহম্মদ আলী হেসে বললেন, সেই বিকেল বেলাই তো তোমার পিছু পিছু এলাম।

তাহলে আমার সঙ্গে আর দেখা করলে না কেন?

এমনি। ভাবলাম রাতের বেলা দেখা করবো। তাছাড়া আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। নয়তো তুমি বক্সিং শেখার জন্যে এই যে বালির ব্যাগ বানালে, এটা কি ঠিক হতো! আমিই তো তোমাকে সব শিখিয়ে দিলাম। এখন টেস্ট করে দেখছি সব ঠিকঠাক আছে কিনা! ঠিক না থাকলে তুমি কখনো আমার মতন বক্সার হতে পারবে না!

রবিন বললো, ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

ঘুষি মারবো?

মারো।

রবিন বালির ব্যাগে ঘুষি মারতে যাবে, মোহাম্মদ আলী তার হাত ধরলেন। খালি হাতে ঘুষি মারতে নেই। এই নাও গ্লাভস। বলে রবিনের হাতে গ্লাভস পরিয়ে দিলেন। খুশি হয়ে রবিন মোহাম্মদ আলীর মতো অনবরত ঘুষি মেরে যেতে লাগলো বালির ব্যাগের ওপর।

খানিক পর ক্লান্ত হয়ে থামে রবিন। হাত থেকে গ্লাভস খুলে মোহাম্মদ আলীর দিকে তাকিয়ে বলে, মনে হচ্ছে কালই আমি ঐ ছেলে চারটাকে ঘুষিয়ে মেরে ফেলতে পাববো।

মোহাম্মদ আলী ওর হাত ধরলেন। নিশ্চয় পারবে। কিন্তু সব কিছু পারতে নেই রবিন। পৃথিবীর সেরা সেরা সব বক্সারের সঙ্গে লড়েছি আমি, কিন্তু কখনো কাউকে মেরে ফেলতে চাইনি। আমাকে অনেকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। আমি তাদের ভালোবেসেছি। ভালোবেসে হারিয়ে দিয়েছি সবাইকে। তুমি জানো না রবিন, মানুষের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্রই হচ্ছে ভালোবাসা। ভালোবাসতে পারলে দেখবে সবাই তোমার কাছে হেরে গেছে।

রবিন বললো, তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসতে শিখিয়ে দাও।

মোহম্মদ আলী বললেন, ঠিক আছে, তুমি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করো!

কি প্রতিজ্ঞা?

কখনো কাউকে বলবে না, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো।

কিন্তু আমি যে ভাইয়াকে সন্ধে বেলা—

ভাইয়া বিশ্বেস করেন নি। ঠিক আছে তুমি কখনো আর কাউকে বলবে না।

ঠিক আছে।

প্রমিজ!

প্রমিজ!

আমার হাত ধরো। মোহাম্মদ আলী তার ডান হাতটা রবিনের দিকে বাড়িয়ে দেন। রবিন হাতটা ধরে। মোহাম্মদ আলী বললেন, এবার বলো আমি কখনো কারো ওপর প্রতিশোধ নেবো না। সবাইকে ভালোবাসবো। তিনবার। রবিন হুবহু বলে গেলো। পরপর তিনবার।

মোহম্মদ আলী বললেন, এবার চোখ বোঁজো।

রবিন চোখ বুঁজলো। মোহাম্মদ আলী নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, খোদা হাফেজ রবিন।

রবিন চোখ বুঁজেই বললো, খোদা হাফেজ।

পরদিন সকালবেলা পৃথিবী বড়ো সুন্দর লাগে রবিনের কাছে, সব মানুষকে অকারণে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে। স্কুলে যেতে যেতে সেই ছেলেগুলোর কথা মনে পড়ে। যদি দেখা হয় রবিন তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কেমন আছো? এখন আর তাদের ওপর একটুও রাগ নেই রবিনের। মোহাম্মদ আলী তার সব রাগ নিয়ে গেছেন।

জালালউদ্দিনের বেহালা

শেখ মমতাজ

জালালউদ্দিন রশিদের নাম আমি প্রথম জানতে পাবি মকবুলের কাছ থেকে। মকবুলেব চাচা নাকি তার বন্ধু ছিলেন। মকবুলেব দেওয়া ঠিকানাতেই প্রথম তার কাছে ইন্টাবভিউ নিতে যাই। তা আজ থেকে বছব সাতেক আগে। তখন আমি 'নবজীবন' — এর পার্টটাইমাব ছিলাম।

নতুন নতুন চাঞ্চল্যকর সব তথ্য সংগ্রহ করে আডটরের কাছে পেশ করাই তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল। যদি স্টাফ রিপোর্টারের কাজটা পাকা হয় এই ভরসায়।

জালালউদ্দিন সাহেব প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রমী ছিলেন। তার জন্ম ১৯২০ সালের ৩রা ডিসেম্বর বহমপুব গঞ্জে। তারা রহমপুর, বিলাসীকাঁচি, আলমপুর ও চাঁদ বাজারের রাজকর্তা ছিলেন। শোনা যায় লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে তারা এই অঞ্চলের জমিদার হয়েছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার এই প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীব জীবনাবসান হয়। তিনি তার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকার ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নি। সারাজীবন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে

নিজের জীবনকে সঁপে দেন শোনা যায়। জয় বাংলার সময়ও তিনি রাস্তায় নেমে ছিলেন। এহেন মানুষের মৃত্যু ঘটল, অথচ কাকপক্ষীও টের পেল না। সত্যি অবাক লাগে।

ঢাকা থেকে রহমপুর সাড়ে তিন ঘণ্টার রেলপথ। অবিশ্যি যদি ঠিক সময়ে ছাড়ে। আমি ট্রেনে উঠলাম। ঘড়িতে এখন ঠিক সাড়ে ছটা। রহমপুর স্টেশনে পৌছে আরও তিন ক্রোশ পথ। অর্থাৎ গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে রাত দশটা বেজে যাবে।

ট্রেন ছুটে চলেছে। আমি একেবারে জানালার ধারে ব'সে। কাঁচা বাড়ী, ধান ক্ষেত, কলা বাগান গুলো রাতের হিম, হিম কুয়াশা মাখা অন্ধকারে ছুটে চলেছে পিছনের দিকে। আর আমার স্মৃতির বলাকা ছুটছে সামনের দিকে।

মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা। আমি জালালউদ্দিন সাহেবের ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছি রহমপুরে। সঙ্গে মকবুল।

প্রথম যখন তার দেখা মিলেছিল তখন রাত প্রায় আটটা হবে। উচ্চতা হবে প্রায় সাড়ে পাঁচফুট। স্বাস্থ্য ভাল, সাহেবি রং মাথায় পাকা চুলের টাক, পরনে পাঞ্জাবী ও ধুতি। দেখলে ব্রাহ্ম হিন্দু বলে মনে হয়।

স্বাস্থ্য থেকে এখনও সেই তেজ ঝরছে। কিন্তু মনের অবস্থাটা ছিল অন্য রকম। সবের উপব একটা বিতৃষ্ণার ভাব। বোধ হয় দেশের বর্তমান কথা ভেবেই। সেদিন বেয়ারা আপ্যায়ন করে নিয়ে একটা ঘরে বসালেন। ঘরটা বেশ বড়। বোধ হয় হল ঘর। একটা রাজ প্রাসাদ যেন। ঘরে হাতে টানা পাখা এখনও আছে। এতে বোঝা যায় তিনি এখনও আধুনিক যুগের সাথে সামলে উঠতে পারেন নি।

বেয়াবা একটু পরেই দুগ্লাস সরবৎ দিয়ে গেল। আমরা তা উদরস্থ করতেই এসে পডলেন তিনি।

'কি ব্যাপার আপনারা?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম আমরা এসেছি "নবজীবন" পত্রিকা থেকে। আপনার একটা ইন্টারভিউ এর জন্য।

'আমার ইন্টারভিউ? আজ-কাল এসবেরও দরকার পড়ে নাকি?'

আমার বেশ মনে আছে একথা আমাকে শির নত করেছিল।

সেদিন তাকে খুব বিরক্ত করেছিলাম। শেষ প্রশ্ন করেছিলাম আপনার জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আমাদের অবাক করে তিনি যে উত্তরটি দিয়েছিলেন তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত।

বিপ্লব, আন্দোলন এসব ছাড়াও যে তার জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে পারে তা কল্পনাও করা যায় নি।

তিনি যা বলেছিলেন আমি তা হুবহু তুলে দিলাম ঃ-

"তখন আমার বয়স ষোল কি সতেরো, আমার একটাই শখ ছিল সেটা বেহালা। বেহালা বাজানো আমার নেশাও বলতে পারেন।

এটি আমি শিখেছিলাম আমার পিতামহের কাছে। তিনি খুব ভাল বেহালা বাজাতেন।

জালালউদ্দিনের বেহালা

সালটা ১৯৩৭। তখনও আমি 'সরোজ সূর্য সমিতি'-তে যোগ দিই নি। একদিন আমাদের বাড়ীতে এলেন ওয়ান্টকট্ সাহেব। তিনি আমাদের খাজনা রোজি ছিলেন। শুনেছিলাম তিনি নাকি খুব অত্যাচারী ছিলেন। সে যাই হোক্ তখন আমার তো তা মনে হয়নি।

তিনি আমার বেহালা শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। এবং আমাকে একটা বিলেতি বেহালা দেবেন বলেছিলেন। আমি এই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি বেহালা আমার প্রাণ।

তাই একদিন সময় করে কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ হাজির হলাম ওয়ান্টকট্ এর বাংলোয়। খুব সুন্দর বাড়ি।বেশ সাজানো গুছানো।

ওয়ান্টকট সাহেব বাড়িতে একাই ছিলেন দু-চার কথার পরে তিনি নিয়ে এলেন তার বেহালাটা।

তিনি ওটা আমার হাতে তুলে দেওয়ার আগে এই বেহালা সম্বন্ধে এক গল্প শুনিয়েছিলেন।

ওয়ান্টকট্ সাহেবদের পৈতৃক ভিটা উত্তর ইংলণ্ডের ফাসেক্সে।

তার পিতামহ হেনরি ওয়ান্টকট্ও ভাল বেহালা বাজাতেন। অনেকটা আমার নানার মত। একদিন মাঝ রাতে হেনরি তার ঘরে এসে তাকে ঘুম ভাঙিয়ে ঐ বেহালাটা উপহার দেন। ওয়ান্টকট্ তখন খুব ছোট্ট, ঘুম ভেঙে শিশু ওটা হাতে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে তিনি জানতে পারেন হেনরি ওযান্টকট্ তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

কিন্তু ছোট ওয়ান্টকট্ সাহেবের কাছে কিভাবে ঐ বেহালাটা এসেছিল সেটা নাকি তার (ওয়ান্টকট) কাছে রহস্য জনক।

যাই হোক্ এই গল্প বলে ওয়ান্টকট সাহেব আমাব হাতে বেহালাটা তুলে দিলেন এবং ভাঙা ভাঙা বাংলা ইংরাজিতে বললেন এ যে, 'এটা যোগ্য লোকের হাতে যাচ্ছে জেনে তিনি খুশি।'

আমি ওই বেহালাটা হাতে নিয়ে স্টেশনের রাস্তার দিকে আসছিলাম। এমন সময় এক চায়ের দোকানে কতকগুলি লোক আলোচনা করছে। তাদের মধ্যে থেকেই একটা আওয়াজ ভেসে এল আমার কানে।

'ওয়ান্টকট মরেছে ঠিক হয়েছে, শালা কুত্তার জাত।'

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। যার বাড়ি থেকে এখন আসছি সে কি করে মরবে।

ভাবলাম হয়ত অন্য কোন ওয়ান্টকটের কথা বলছে।

যাইহোক্ সে রাতটা তো বাড়ি ফিরলাম। পরের দিন নানা সকাল থেকেই নাকি আমাকে খুঁজছিলেন, কি একটা খবর শোনাবেন বলে।

আমার সাথে দেখা হতে বললেন "মনু জানিস যে লোকটা তোর বেহালা শুনে প্রশংসা করেছিল, আরে সেই সাহেব, ... ওয়ান্টকট, সে ব্যাটা পরশু মরেছে নবাব গাঁয়ের চাষীরা

ওরে কেটেছে।

আমি কথাটাকে বিশ্বাস করব কিনা তা নিয়ে দ্বিধায় ছিলাম, কিন্তু পরে জেনেছিলাম এ ঘটনা সত্যি। আমি এক সাহেব ভূতের কাছ থেকে এই বেহালাটা পেয়েছিলাম। এটাই আমার জীবনে সবচেয়ে রহস্যবহুল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বলে জালালউদ্দিন থামলেন।

এই ঘটনা আমি 'নবজীবনে' প্রকাশ করেই স্টাফ রিপোর্টার হয়েছি তাই জালালউদ্দিন রশিদকে ভুলতে পারিনি। তাকেই শ্রদ্ধা জানাতে আজ আবার যাচ্ছি তার বিদেহী আত্মার কাছে।

হাত ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে দেখি রাত সাড়ে আটটা। আর বেশি দেরি নেই। ট্রেনটা এখন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে।

দেখি একদল লোক খুব উৎসাহ নিয়ে আমাদের বগিতে উঠলেন। সঙ্গে দু-একজন মেয়েছেলেও আছে।

আমি এক ভদ্দরলোককে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি খেঁকিয়ে বললেন "আরে মশায় রহমপুরে এক পক্ষকাল ধরে যাত্রা চলছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম..... নাকি ক'লকাতা থেকেও পার্টি এসেছে। এরা তাই দেখতে যাচ্ছে।"

আমাদের ট্রেন যখন রহমপুরে থামল তখন বাজে ঠিক রাত ন'টা পঁচিশ। আমাদের সঙ্গে নামল উৎসাহী যাত্রাপ্রেমিকেরা। আমি রিক্সা স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে বললাম, রহমপুর রাজবাড়ি চল। রিক্সাওয়ালা এক কথাতেই চিনে নিলেন।

যখন রাজবাড়িতে পৌঁছলাম তখন দশটা বাজতে দশ। বাইরে শীতেল হাওয়া বইছে। আজ পূর্ণিমা। তাই অন্ধকারে সদর দুয়ার চিনে নিতে অসুবিধা হল না।

বাড়ীতে ঢুকতেই এক বেয়াবার দেখা পেলাম। এ সেই বেয়ারা যে এর আগেব দিনও ছিল। নিজেব পবিচয় দিয়ে বললাম 'ম্যানেজার বাবুর সাথে দেখা করতে চাই।

'আজ তো আর হবে না. সে চলি গেছে' — সে বলল।

সে আরো বলল "চিন্তার কিছু নেই। ম্যানেজার বাবু বলি গেছেন ঢাকা থেকে কেউ এলি তাকে রেতেব ব্যবস্থা করি দিতে।"

যাক আল্লার লাখ লাখ দুয়া।

রাজবাড়ির অন্দর মহল দেখে মনেই হয় না দু'শ বছরেরও বেশি পুরানো। মীনার কাজ, পাথরের কাজ আজও তেমনই আছে।

দেখে বোঝা যায় এর প্রত্যহ পরিচর্যা করা হয়।

বেয়ারা আমার জন্য খাবার ব্যবস্থা করে শয়ন কক্ষ দেখিয়ে দিল।

আমি খেয়ে শুতে যাবার আগে বেয়ারাকে বললাম—'ঢাকা থেকে আর কি কেউ এসেছে' সে বলল—আসে নি। তবে পাশের ঘরে এক ভদ্দর লোক আছেন। তিনি যাত্রা পার্টির লোক।

তারও ম্যানেজার বাবুরে দরকার।

আমি বললাম, 'এখানে কোথায় যাত্রা হচ্ছে?'

—'হাইস্কুল মাঠে।' উত্তর দিল সে।

রাত্রির বেলায় বিছানাতে শুয়ে যাত্রার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর বেশ শোনা যাচ্ছিল।

এর মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আর কখন যে সকাল হয়েছে তার হুঁশ্ নেই। ঘুম ভাঙল বেয়ারার কপাট্ ধাক্কায়।

দেখি সে চা নিয়ে এসেছে।

আড়মোড়া ভেঙে জিজ্ঞাসা করলাম 'ম্যানেজার বাবু এসেছে?' সে বলল 'হ্যাঁ।'

সকালে হাত মুখ ধুয়ে ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে আলাপ হল।

আমি জালালউদ্দিনের সম্পর্কে একটি আর্টিক্যাল লিখব বলে তার সাহায্য চাওয়াতে তিনি এক কথায় সম্মত হলেন।

এর পর আলাপ হল সেই যাত্রা বাবুটির সঙ্গে, তিনি দেখি কাঁধে একটা বাক্স সমেত বেহালা নিয়ে দ্রুত পদে সদর দুয়ারের দিকে চলেছেন।

ম্যানেজার বাবু তাকে ডাকলেন, 'আপনি কে মশায়?'

পেছন থেকে বেয়ারা জবাব দিল ''বাবু আপনি কাল রেতে চলি যাবার পর ইনি এসেছেন।

হাইস্কুল মাঠে যাত্রা হচ্ছি সেখানে ইনি বাজান।'

ম্যানেজার বাবু বললেন 'তা এখানে? কি মনে করে।'

সে শান্তকণ্ঠে জবাব দিল 'এই এটা নিতে এসেছিলাম —নিয়ে গেলাম।'

'কি ওটা?' ম্যানেজার বাবু শুধালেন 'জালালউদ্দিন সাহেবের বেহালা?'

উনি গত বুধবার যাত্রা মাঠে আমার বাজনা শুনে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। পালার পর এক লোকের হাতে একটি চিঠিতে তো তিনি আমার প্রশংসা করে এই পুরানো আমলের বেহালাটা দেবেন বলেছিলেন। চিঠিতে, গতকাল রাতে আসতে বলেছিলেন।' এই বলে তিনি একটা চিঠি বার করলেন। 'কাল রাতেই যখন শুয়ে পড়েছিলাম তখন উনি আমার ঘরে এসে এটা দিয়ে গেলেন।' বলে বক্তা থামলেন।

আমরা তো শুনে থ।

"উনি বোধ হয় এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। অনেক রাতে ঘুমোতে যান তো তাই উঠতে বোধ হয় দেরি হয়।

আচ্ছা চলি আবার দেখা হবে। সাহেব কে বলবেন আমি ওনার প্রতি কৃতজ্ঞ। হাজার হোক দু'শ বছর আগেকার বিলিতি বেহালা" উনি যে আমাকে যোগ্য মনে করেছেন তাতেই আমি ধন্য।

শাঁকচুন্নীর বিয়ে

সমর পাল

শাঁকচুন্নীব বিয়ে?

বাঁশ বাগানে বর এসেছেন টোপর মাথায় দিয়ে। টোপরটা কি? শোলার নাকি! না না, তবে কি তার মাথায়! টোপর তবে আছে ঠিকই তৈরী কলাপাতায়।

শাঁকচুন্নীর বয়স কত? জানি না ভাই অতশত।

পাত্র হলো চার কুড়ি আর পাত্রী সে এক ছুঁড়ী!

বিয়ের রাতে সবার হাতে মন্ডা-মিঠাই-পুরি।

বিয়ের পরেই খাবে সবাই সামলে যে যার ভুরি।

নিশুতে রাতে বাঁশ বাগানে, ভূতরা মাতে জলসা গানে। নাচ গানের মধ্যেই নাকি ভূতের বিয়ের রীতি। শাঁকচুন্নী পড়বে সিঁদুর রাঙিয়ে যে তার সিঁথি!

বরের সাজে ব্রহ্মদৈত্যি, বয়স হলেও দারুণ! সত্যি। গামছা গলায় বর এসেছেন কোমর বেঁধে আটিয়া। পণ নিয়েছেন মাত্র একটি শ্মশান ঘাটের খাটিয়া! বিয়ের আগে থাকতো শুধু গাছের ডালে ঝুলে। বিয়ের পরে থাকলে যে তাই বউ দেবে কান মুলে। তাই সাত-পাঁচ

ভেবেই কিনা করেন দাবী খাটের! না নিলে ফের গুনতে হবে পয়সা নিজের গাঁটের।

লগ্ন কটায়? একটা সাতে। শাঁকচুন্নী মালা হাতে। মালা বদল। কিসের মালা? মালা তো নয় ডালপালা। তাই দিয়ে হয় শুভ পরিণয়।

শাঁকচুন্নী ভীষণ লাজে স্পর্শ করে পতির পা যে। প্রণাম ক'রে পাত্রী নিজে বললো তোমায় ডাকবো কি যে! পতি পরম গুরু কিনা! মায়ের বারণ—'নাম করবি না'।

ব্রহ্মদৈত্যি বলল হেসে শাঁকচুন্নীকে ভালবেসে। প্রণাম করে নেই কোন কাজ; তুমি আমার বধূ যে আজ। তোমার সুখেই আমি সুখী রূপবতী পঞ্চমুখী।

বিয়ের পাট মিটলো বটে। খিদেয় নাড়া দিচ্ছে ঘটে। মাংস মাছের গন্ধ ভাসে। ভূতরা ঘোরে আশে পাশে। অবশেষে বসল সবাই জ্যান্ত মাছ আর মুরগী জবাই। কচিপাঠার স্বাদটা খাসা। ধন্য ওদের বিয়েয় আসা। মন্ডা-মিঠাই হাঁড়ি হাঁড়ি, খাচ্ছে সবাই কাড়ি কারি। মিঠাই তৈরী টাট্‌কা ছানায়। সবাই খুশি বিয়ের খানায়।

শাঁকচুন্নী ব্রহ্মদৈত্যি থাকবে উপোষ রাতে। নেই কোন পাপ নিলে শুধু গরুর দুগ্ধ পাতে। গরু কিনা কৃষ্ণের বাহন! ভূতরাও জানে সে সব কাহন।

খাওয়ার পর্ব মিটল যখন ঘড়ির কাটা তিনে। বাঁশবাগানে বইছে বাতাস নিশুতি ফিন্ ফিনে। এই লগ্নেই যাত্রা শুরু শ্বশুর বাড়ি কনের। শাঁকচুন্নীর শঙ্কা দারুণ অবস্থা কি মনের! নিজের ভিটে ছেড়ে এখন যাবে শ্বশুর বাড়ি। দুঃখ হলেও নিয়ম মতো দেবে সেথায় পাড়ি।

বর আর কনে উঠল বসে শ্মশান খাটের ওপর। নতুন জামা কাপড় পরে মাথায় দিয়ে টোপর। শঙ্খ-উলু সহকারে খাটকে তুলে কাঁধে; ভূতরা চলে খুশি মনে হেঁকে কৃষ্ণ-রাধে!

বনের ভেতর নর্দমা আর পেরিয়ে খানা খন্দ, শাঁকচুন্নীর যেতে সেথায লাগছে না খুব মন্দ।

অবশেষে উঠল গিয়ে পড়ো বাড়ির ঘরে। চামচিকেরা করলো বরণ বিদঘুটে সব স্বরে। ঝুল ভর্তি ঘরের ভেতর সাপের আনাগোনা। হিস্ হিস্ হিস্ শব্দে শুধু রহস্যে জাল বোনা। গোটা দুই তিন কঙ্কালেরই বিকট সুরে হাসি। শাঁকচুন্নীর হলেন এরা ননদ, দেওর, মাসি। নতুন বউয়ের আগমনে আহ্লাদে আটখানা। হাত-পা ছুড়ে জুড়ল সবাই বিদেশী সব গানা।

শাঁকচুন্নীর দেওর খানা হলো স্কন্ধকাটা। বৌদিকে সে প্রণাম করে ছুঁয়ে তেনার পা-টা! বৌদি বলে ছিঃ ছিঃ ভাই করছো প্রণামটাকি; দেখলে তোমার দাদার শ্বশুর বিগড়ে যাবেন নাকি

বড় গিন্নী মায়ের মতো ভূত বংশও জানে। তোমার বাবাও নিশ্চয় ঠিক এবচনটাও মানে। ঠিক বলেছ ভাইটি আমার, তোমার আচরণে, সত্যি আমি খুশি হলাম প্রাণে এবং মনে।

পরের দিনে রাত বারোটায় আসল সবাই বৌভাতে। ফুলের তোড়া ভূতের প্রীতি সাদরে নেয় বৌ হাতে।

· ' দৈত্যি ব্যস্ত আছেন অতিথিদের আপ্যায়ণে। বলেন— প্রাণ খুলে খান মাছ মাংস

মন্ডা মিঠাই খুশি মনে। আপনাদের সেবায় আমার আয়ুটা হোক দশ কুড়ি। যেন খোকা-খুকুর ভয়কে আমি নিজেই বশ করি!

ব্রহ্মদৈত্যির কথা শুনে বলেন সবাই হাত তুলে, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি অমর থাকবে সবার জাত কুলে।

ভূতের বরে ব্রহ্মদৈত্যি আছেন আজও জীবিত। তাইতো ভূতের গল্পের বই আজও আমরা কিনি তো!

শাঁকচুন্নী নতুন করে পাতানো তাদের সংসারেই। তাই কিনেছেন সাদা কাপড় লাল পাড়েরই রং শাড়ি!

শাঁকচুন্নীর বিয়ের কথা দিলাম বলে গোপনে। গল্প এখন বেড়াক ঘুরে সবার মনের সোপানে।

মিথ্যে ভূতের গল্প

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল থেকেই পেট ফুলে উঠছে বদ্রিনাথের। কাল রাতে যে সে নিমতলায় ভূত দেখেছে সে কথাটা কাউকে ফলাও করে না বলা পর্যন্ত কিছুতেই মনটা শান্ত হচ্ছে না বদ্রির। বহুসময় গাঁয়ের বটগাছের চাতালে বসে বসে সে অপেক্ষা করছে তার কথা শোনার লোকের জন্য। কিন্তু কোথায় সে লোক? মানুষ তো দূরের কথা একটা কাকপক্ষীরও টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না বদ্রি।এদিকে রোদের জ্বালায় আর খিদের তাণ্ডবে বদ্রিনাথের মাথা ঘোরার উপক্রম। কোমরের খুট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করে এরই মধ্যে বার কয়েক সে নস্যি নিয়ে ফেলেছে। হ্যাঁচ্চে-হ্যাঁচ্চো করে হাঁচিও দিয়েছে গণ্ডা কয়েক। কিন্তু তাতেও মৌজ আসছে না। এখনই ভূতের কথাটা না বললেই নয়। এমন সময় বদ্রির সামনে একটা গোবরভরা বালতি হাতে এসে দাঁড়ালো হরকান্ত পাড়ুই। হরকান্ত যেমন মোটা, তার গোঁফজোড়াও তেমন মানানসই। গোঁফের নিচে ঠোঁট দুটো অদৃশ্য। পেল্লায় গোঁফখানা নাড়িয়ে গোল গোল চোখে চেয়ে হরকান্ত জিগ্যেস করলো, "কি খবর হে মিথ্যুক?" বদ্রিকে গাঁয়ের লোকেরা মিথ্যুক বলেই ডাকে। ও-নামেই এখন বদ্রির খুব পরিচিতি। আগে কেউ মিথ্যুক বললে

তাকে দু'ছড়া গালাগাল শুনতে হ'ত বদ্রির কাছে। গালাগালে কোনো কাজ হয় না দেখে এখন কেউ মিথ্যুক বললে বদ্রি আর রাগে না। বরং তাকে একটু রাগাবার জন্যে একটা জুতসই মিথ্যে কথা পেড়ে বসে। বদ্রি ঠিক করলো হর পাড়ইকেই ভূতের কথাটা বলা যাক। নিমতলার ভূতের কথা শুনে ভয় পাওয়াতো দূরের কথা, হর পাড়ই হেসেই অস্থির। সে যত হাসে ভুঁড়িখানা ততই ধক্‌ধক করে নাচে। ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসতে হাসতে হরকান্তর দমবন্ধ অবস্থা। হরকান্ত হাসছে দেখে বদ্রির মনে বড্ড দুঃখ হল। তার দু' চোখ ফেটে কান্না পেলো। মিথ্যে বলে বলে এখন আর কেউ তাকে বিশ্বাসই করতে পারে না। বদ্রির কথা শেষ না হতেই হর পাড়ই বেদম হাসতে হাসতে গোবর ভরা বালতি হাতে পিঠটান দিলো। যাও বা একখানা শ্রোতা পাওয়া গেছিলো তাও ফসকে গেলো।

হরকান্ত চলে যেতেই বদ্রি চোখের জল মুছে আকাশের দিকে তাকিয়ে মিনমিন করে বললো, 'হে ভগবান, নিমতলার গল্পটা শোনার মত কি লোক নেই সারাগাঁয়ে? এমন সময় পিছন থেকে মিহিগলায় কে যেন বলে উঠলো, 'থাঁকবেনা কেঁনে? খুঁ-উ-ব আঁছে। তঁবে সকঁলেই এখুঁন কাঁজ -কঁম্মে ব্যঁস্ত কিনাঁ, তাঁই সন্ধের পঁর বটতঁলায় আসঁলেই তাদেঁর দেখাঁ পাওঁয়া যাঁবে।"

বদ্রি চারদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। দু'টো ছাগল একটু দূরে ঘাসপাতা খাচ্ছে। একটা গরু বাছুরের গা চেটে দিচ্ছে। সকালের মিঠে হাওয়ায় কুঁচপাতা আর গাছগাছালি মাথা দোলাচ্ছে। দু'চারটে কাক বটের ডালে বসে গায়ের পোকা খুঁজছে। কে বললো কথাটা? লোক জন না দেখতে পেয়ে বদ্রি মনে মনে বললো, যেই বলুক না কেন, কথাটা খুব খাঁটি। সকালে সকলেই কাজকম্মে ব্যস্ত। সবুর করে বদ্রির কথা শোনার লোক কোথায়? তার উপর বদ্রির মিথ্যেবাদী বলে বদনাম রটে গেছে সাত-গাঁয়ে। তার চেয়ে বরং বিকেল গড়ালেই আসা যাবে বটতলায়। নিমতলার ভূতের কথাটা না বললে কিছুতেই মনটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। কেবলি গলা ছেড়ে বলতে ইচ্ছে করচে 'কাল রাতে নিমতলায় ঠিক বারোটা নাগাদ যখন আমি খাওয়া শেষে পায়চারী করতে গিয়েছিলাম, ঠিক তখনই একখানা মিসকালো মামদো এসে আমায় বললো, 'বাঁদ্রি নাঁকি? তাঁ এখঁন অসঁময়ে কিঁ মঁনে কঁরে? ..." এসব কথা ভাবতে ভাবতে বদ্রিনাথ ঘরের পানে পা-বাড়ালো।

বিকেলে হলুদ লালচে আলোতে হাতিমপুর গাঁয়ের মেঠোপথের দুধারে ঝোপ-ঝাড়গুলো হালকা বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। ঝোপে ঝাড়ে হলুদ-সাদা প্রজাপতি উড়ছে। ফড়িং নাচছে। মহা উৎসাহে বদ্রিনাথ হাতে এক থোকা বুনোফুল নিয়ে বটতলার দিকে চললো। বুনোফুল খুব পছন্দ করে বদ্রি। লাল-হলুদ-নীল-সাদা-গোলাপী-বেগুনী-কত না রং-বেরঙের মেলা। তবুও কেউ বুনোফুল তোলে না। শোঁকে না, যত্ন করে না, সাজায় না। বদ্রিনাথ তাই বুনোফুলই গাছ থেকে তোলে। শোঁকে আর হাতে নিয়ে ঘোরায়। বটতলায় পৌঁছে বদ্রি দেখলো কৈবর্তমশাই সেখানে বসে বসে আপনমনে হুঁকো খাচ্ছেন। ভ-র-র্-ফ-র-র্-করে ধোঁয়া ছাড়ছেন। বদ্রিকে আসতে দেখে হুঁকো নামিয়ে কৈবর্তমশাই বললেন, কি হে খোকা, আজ

হঠাৎ হেথায় এলে বড় ? উদ্দেশ্য টা কি শুনি !" বদ্রি হাত কচলে বললো, "এমনি। আকাশে মেঘ করেছে কিনা, তাই এলুম !"

কথা শুনে তো কৈবর্তমশাইয়ের হাত থেকে হুঁকো খসে পড়ার উপক্রম। 'মেঘ করেছে মানে ? এমন টাটকা সুন্দর একটা ঝকঝকে বিকেল আর তুমি বলছো কিনা মেঘ করেছে? আচ্ছা মিথ্যুক ছেলে তো !" কৈবর্তমশাই দাঁত কড়মড় করে বটতলা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কথা আর না বাড়িয়ে জোরপায়ে হাঁটা লাগালেন অন্যদিকে। বদ্রির খুব আফশোস হল। বিকেলবেলায় যাও বা একজন ভালো কথা বলার লোক পাওয়া গেল, তাও ফসকালো। কেন যে মিছে কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, সেকথা ভেবে নিজেকে আপনমনে খুব খানিক ধমকে, বদ্রি উদাসমনে বটতলায় বসে বুনো ফুলগুলো শুঁকতে থাকলো।

বসে থাকতে থাকতে কখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমেছে বটতলায় আশেপাশে। অমাবস্যা বলে চাঁদের দেখা নেই। জোনাকির আলোতে আশেপাশের ঝোপঝাড়গুলো সরগরম। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে কানে তালা লাগবার জোগাড়। বসে থাকতে থাকতে বদ্রির হঠাৎ মনে হল চারপাশে কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে। একজন-দু'জন নয়। জনা দশেক তো হবেই। বদ্রি যারপরনাই খুশি হয়ে পা -জোড়া করে বুনোফুল হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে গুরুমশাইয়ের মত আঁটোসাটো হয়ে বসলো। মুহূর্তের মধ্যে বটতলায় বসা বদ্রিনাথের চারপাশে বহু লোক জুটে গেল। লোকগুলো সকলেই মিশকালো। শাঁকালুর মতো সাদা সাদা দাঁতে ঠক্‌ঠক আওয়াজ তুলে সবথেকে বয়স্ক লোকটি বললো, "কাঁল রাঁতের নিঁমতলার গল্পটা বঁলে ফেঁলুন দিকিঁনি। গল্পটা নাঁ শুনলেঁই নঁয়। গল্পটা শুনেঁই আমাঁদের আঁবাঁর ভোঁজসভাঁয় যেঁতে হবেঁ কিনাঁ। বড্ডঁ তাড়াঁ আছে। কিঁ বঁলিস ?" চারপাশের লোকগুলো সে কথা সমর্থন করে মিনমিনে নেকোগলায় বললো, "খুঁব খাঁটি বাঁত্‌ ! বড্ডঁ তাঁড়া আঁছে বঁটে !"

এমন উৎসাহী শ্রোতা এর আগে বদ্রি কোনোদিনও পায়নি। কস্মিনকালেও একসঙ্গে এতলোক বদ্রিনাথের গাঁজাখুরি গল্প শুনতে চায়নি। তাই মহা আনন্দে আর উত্তেজনায় বদ্রি বললো,"গল্পটা খুব ছোট হলেও, এমন গল্পকে খুব বড়ো করে বলতে চাই। আপনারা নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না ?"

--"ছিঁ ছিঁ আঁপত্তি করঁবো কেঁনে ? গঁল্প শুনলেঁ আঁমাদের নাচঁতে ইঁচ্ছে করেঁ, গাঁইতে ইচ্ছেঁ করেঁ, ডিগঁবাজী খেঁতে আঁর লাঁফাতে ইঁচ্ছে যাঁয়। গঁল্প আমঁরা বেঁজাঁয় পছঁন্দ করিঁকিনা।" ভীড়ের মাঝ থেকে একজন বেঁটেপানা লোক বুক বাজিয়ে বললো। দ্বিগুণ উৎসাহে বদ্রি গতকালের নিমতলার গল্পটা বলতে শুরু করলো। বলতে বলতে বদ্রি দেখলো শ্রোতাব সংখ্যা যেন খুব বেড়ে গেছে। মাটিতে, চারপাশের ঝোপের উপরে গাছের ডালে এমনকি বটগাছের মগডাল পর্যন্ত পল্প শুনিয়ে লোকে ঠাসা ! গল্প শুনতে শুনতে লোকগুলো কখনো হাসছে, কখনো হাততালি দিচ্ছে কখনো এ ওকে চিমটি কাটছে। গল্পের আয়তন ছিল খুব ছোটো। কিন্তু সে গল্পে কল্পনা আর মিথ্যের জাল বুনতে বুনতে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এরই মধ্যে ঘন্টা চারেক সময় কখন শেষ হয়ে এখন প্রায় মধ্যরাত্তির। নিমতলা আর মামদোভূত

ছাড়িয়ে সে গল্প এখন মামদো ভূতের শ্রাদ্ধে এসে ঠেকেছে। মামদো এতক্ষণ ভীড়ের মধ্যে পেয়ারা গাছের উঁচু ডালে বসে মন দিয়ে গতকালের গল্পটা শুনছিল আর বহু কষ্টে বদ্রিনাথের মুখের উপর ঝগড়া করবার ইচ্ছেটা চেপে রাখছিল। কিন্তু নিজের শ্রাদ্ধের কথা শুনলে কার না মেজাজ গরম হয়? বদ্রিনাথ যখন হৈহৈ করে হাতের বুনোফুলগুলো হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে জোর গলায় বলে উঠলো, "... তারপর মামদোর শ্রাদ্ধে গরম লুচি... মাংস... ইলিশমাছ.... বেগুনী... চাটনি... দরবেশ... রাজভোগ..." তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে তরতর করে পেয়ারাগাছ থেকে একলাফে বদ্রিনাথের সামনে হাজির হয়ে মামদো বললো, "আঁর টু শব্দ কঁরেছিঁস কিঁ জিঁব ছিঁড়ে গঁলা মঁটকে দোঁবোঁ হঁতভাঁগা.." মামদোকে চিনতে একটুও সময় লাগেনি বদ্রির। গতকালই তাকে সে নিমতলায় দেখেছিল কিনা! বদ্রি সঙ্গে সঙ্গে বাবাগো-বাচাঁও গো-মেরে ফেললে গো" বলে চিল্লোতে চিল্লোতে প্রাণপণ দৌড় মারলো গাঁয়ের মেঠোপথ ধরে। বদ্রির গা থেকে ঘাম ঝরছে টপ্ টপ্ করে। কান থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে। এমন দৌড় এর আগে কোনোদিনও মারেনি বদ্রিনাথ। দৌড়-দৌড় আর দৌড়— রুদ্ধশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে বদ্রিনাথ একসাথে অনেকগুলো নেকো গলার আওয়াজ শুনতে পেলো — 'মিথ্যুঁক্ কোঁথাকাঁর....।"

—ঃ সমাপ্ত ঃ—